

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৫০শ বর্ষ { চৈত্র, ১৪০৪ { ২য় সংখ্যা



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত নারায়ণ মহারাজ

যুগ্ম-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত আচার্য মহারাজ

—ঃ কার্যালয় ঃ—

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন : ৫৫৫-৮৯৭৩

২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বোধায়ন মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি.এ.বি.টি. কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন

শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা
প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

[মাসিক]

পঞ্চাশৎ-বর্ষ [১ম-১২শ সংখ্যা]

[শ্রীগৌরান্দ ৫১১ বিষ্ণু হইতে ৫১২ গোবিন্দ
বঙ্গাব্দ ১৪০৪ ফাল্গুন হইতে ১৪০৫ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৯৮ মার্চ হইতে ১৯৯৯ ফেব্রুয়ারী ।]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদ্বান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত আচার্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিশ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বোধায়ন মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি.এ.বি.টি. কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন

শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা
প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

পঞ্চাশৎ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অনর্থ	৮।২৯৪
‘অপি চেৎ সুদুরাচারঃ’-শ্লোকের নিগূঢ় তাৎপর্য	১২।৪৫৮
অভিমান [কবিতা]	৫।১৮১
আততায়ী	১১।৪১১
আত্মনিবেদন	৭।২৫৮
‘আবির্ভাব-শতবার্ষিকী’ পালন কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ?	১।৩২
ইন্দুকৃত-শ্রীকৃষ্ণজুতি	৫।১৬১
কীর্তন	৪।১৩৫
কৃষ্ণ দয়াময় [কবিতা]	৮।২৯৮
কৃষ্ণপঞ্চকম্—শ্রী	১২।৪৪১
কেশবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	২।৪১
গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীদামোদর-ব্রতে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	২।৬৪, ৩।১০৮, ৪।১৪৭, ৫।১৮৭, ৬।২২৬, ৭।২৬৮, ৮।৩১৩, ৯।৩৫৩, ১০।৩৯১, ১১।৪২৪
গুরুতত্ত্ব-বিচার [কবিতা]	৩।৯১
গুরুদেবের চরণে কৃপা-প্রার্থনা—শ্রী [কবিতা]	৬।২২৫
গুরুসেবকের কৃত্য	৬।২২২
গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব	১০।৩৮৫
গোবিন্দ-স্তোত্র—শ্রীশ্রী	১।১৪, ২।৫২
গৌরসুন্দর-নুতি-সূত্রকম্—শ্রীশ্রী	৬।২০১, ৭।২৪১, ৮।২৮১, ৯।৩২১, ১০।৩৬১, ১১।৪০১
গৌর দয়াময় [কবিতা]	৪।১৪০
গৌরাঙ্গ-স্তোত্ররত্নম্—শ্রী	১।১
গৌড়ীয়ের পঞ্চাশৎ-বর্ষ	১।৩৭
চাতুর্মাস্য-ব্রত	৬।২১৫
চৈতন্য-ভাব বনাম অচৈতন্য-যুক্তি—শ্রী	১২।৪৬২
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৩।১১৯
জন্মাষ্টমী	৬।২৩৪
জিজ্ঞাসা—সমাধান	১১।৪১৮

জীবের কৃত্য	৩।১০৪, ৪।১৪১, ৫।১৮২, ৬।২১৭, ৭।২৬৩, ৮।৩১০, ৯।৩৩৯, ১০।৩৮৭, ১১।৪৩২, ১২।৪৫৪
বুলনযাত্রা ও জন্মাস্তমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৫।১৯৯
ত্রিদিগ্ধি-সন্ন্যাসীকে কেন মহারাজ সম্বোধন?	৯।৩৩২
দুর্গা	৮।২৯৯
ধিকার ও ভিক্ষা [কবিতা]	১২।৪৭২
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	২।৭৫
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১১।৪৩৯
নন্দ-বন্দনা [কবিতা]	৭।২৫৬
নন্দের গৃহে আনন্দ [কবিতা]	৭।২৭৬
নন্দোৎসব—শ্রী	৭।২৫৫
নামাপরাধ [কবিতা]	৪।১৫৩
নিতাই বন্দনা [কবিতা]	৪।১৪০
পরমার্থ	১।২০
পরলোকে শ্রীপাদ বজ্রনাভ ব্রজবাসী প্রভু	৩।১১৭
পরাদর ও পরনিন্দা	১।১১
পরিতাপ ও প্রার্থনা [কবিতা]	৯।৩৫১
পাদসেবন	৬।২১২
পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-প্রচার	২।৭০, ৫।১৯৩, ১১।৪৩৫
প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী	
মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	১১।৪২১
প্রভুপাদের হরিকথামৃত—শ্রীল	২।৪৬, ৩।৮৫, ৪।১২৭, ৫।১৬৬, ৬।২০৯, ৭।২৫১, ৮।২৯০, ৯।৩২৮, ১০।৩৬৯, ১১।৪০৭, ১২।৪৪৬
প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ	১২।৪৬৯
প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	২।৪৩, ৩।৮৩, ৪।১২৪, ৫।১৬৩, ৬।২০৪, ৭।২৪৪, ৮।২৮৪, ৯।৩২৪, ১০।৩৬৪, ১১।৪০৩, ১২।৪৪৩
প্রেমভক্তি ও শ্রীগৌরানন্দদেব	১।৩
বন্দন	৫।১৭৪
বহুধর্মী নাস্তিকতা-ব্যাধি ও তদুপশম-ব্যবস্থা	১।১৫
বিরহ	১।২৮
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি	৪।১২৯, ৮।২৮৯,
বিষুন্মায়া	১০।৩৭৬, ১১।৪১৩
বৈধীভক্তি ও রাগভক্তি	৩।৯৬

বৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা—শ্রী [কবিতা]	১০।৩৯১
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি	১০।৩৭২
ব্যাসপূজা-মহোৎসব ও আবির্ভাব-শতবার্ষিকী—শ্রী [বিবরণ]	২।৭৩
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১০।৪০০
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	১১।৪৩৭
ব্রজ ও ব্রজেশ্বর	৫।১৭৬
ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৮।৩১৯
ভগবান্ শ্রীচৈতন্য	২।৫৬
ভগবান্ ও স্বয়ং ভগবান্	১০।৩৮০
ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৭।২৭৯
ভক্তিবিনোদ প্রভুবরাষ্টকম্—শ্রী	৩।৮১
ভক্তিবিনোদ বিরহ-স্মৃতি—শ্রীল	৪।১৫৫
ভ্রম-সংশোধন	৩।১০৩, ৫।১৮০, ১২।৪৪৯
মহৎ-কৃপা	৪।১৫৮, ৫।১৬৯
যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন	১২।৪৫০
রাধারমণ-গুরুবর-স্মরণাষ্টকম্—শ্রী	৪।১২১
লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব	৭।২৫৩
শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ (!)	৯।৩৪৩
শিক্ষক ও শিক্ষিত	১।৬
শুকদেব—শ্রী	৯।৩৩৬
শূন্যবাদ ও নির্বিশেষবাদ	২।৫৩
শ্রবণ	৩।৯২
সত্যবস্তু [কবিতা]	১১।৪৩৯
সনাতন ধর্ম	১।৮, ২।৪৯, ৩।৮৭, ৪।১৩০
সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা	১।৩৬, ২।৫৮
স্মরণ	১।২৪
হরিকীর্তনের আবশ্যকতা—শ্রী	৮।৩০৪
Statement about Shri Goudiya-Patrika	১।৪০

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার
আজীবন সদস্যগণের তালিকা (১৯৯৮)

- ১। শ্রীমতী অঞ্জলি গুপ্ত
C/O - শ্রীমন্ময় গুপ্ত
মহেশমাটি রোড, মালদা - ৭৩২১০১ (পশ্চিমবঙ্গ)।
- ২। শ্রীবিকাশ মণ্ডল
১২৬, আদ্যনাথ সাহা রোড, লেক টাউন, কলিকাতা - ৭০০ ০৪৮
- ৩। বাদলা হরিসভা
C/O - শ্রীমনোজ কুমার দত্ত
গ্রাম ও পোঃ—বাদলা, জেলা—বর্ধমান - ৭১৩১২২
- ৪। শ্রীনিমাইচাঁদ মণ্ডল
C/O - রাজলক্ষ্মী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্
স্টেশন্ রোড, পোঃ—পাণ্ডুরা, জেলা—হুগলী - ৭১২১৪৯
- ৫। শ্রীরামকৃষ্ণ দাস
C/O - শ্রীকৃষ্ণবিহারী দাস
গ্রাম ও পোঃ—কার্তিকখালি, জেলা—মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ)।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো হইতেছে যে, শ্রীপত্রিকার আজীবন সদস্য গ্রহণ করা হইতেছে। যাঁহারা আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১০০১ (এক হাজার এক) টাকা এককালীন অথবা এক বৎসরে চারিটি সমান কিস্তিতে দিয়া সদস্য হইতে পারেন। এ ব্যাপারে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগ করুন।

বিনীত নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ,
—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাসৌ জয়তঃ

✠	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্কেজে।	✠
ধর্মঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাসু যঃ।		নোৎপাদয়েদযদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।
✠	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	✠

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম।

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।

অধোক্কেজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫০শ বর্ষ }

১ বিষ্ণু, ক্ষীরোদশায়ী, ৫১১ শ্রীগোবন্দ
২৯ ফাল্গুন, শনিবার, ১৪০৪, ইং. ১৪/৩/৯৮

{ ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগৌরান্দ্রস্তোত্রব্রহ্ম

শ্রীরাধিকারূপগোম্মিচৌরঃ, প্রতপ্তকর্ত্ত্বকান্তগৌরঃ।

বেদান্তবেদান্দ্র-পুরাণসারঃ, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥১॥

যিনি শ্রীরাধিকার রূপ ও গুণসমূহকে চুরি করিয়াছেন, প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার উজ্জ্বল কান্তি, বেদ-বেদান্দ্র-পুরাণসার করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥১॥

ব্রহ্মেন্দ্ররূদ্রস্তপাদপদ্মঃ, ঔদার্য্য-মাধুর্য্যগুণাক্সিসদ্রঃ।

রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রুপ্রমোদভারঃ, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥২॥

যাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও শিব-কর্ত্ত্বক স্তুত, যিনি ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য-সাগরের আধার, রোমাঞ্চকম্পাশ্রুপুলকাষিত করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥২॥

স্বরূপরূপাদিক-প্রাণনাথঃ, গোপাল-গোবিন্দমুকুন্দনাথঃ।

দরিদ্রদুর্জাত্যঘদুঃখদারঃ, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥৩॥

যিনি স্বরূপ-রূপ-গোপালভট্ট-গোবিন্দ ও মুকুন্দাদি ভক্তগণের প্রাণনাথ, দরিদ্র ও দুর্জাতিগণে দুঃখদূরকারী করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥৩॥

মায়ামতধ্বান্তনিকারহারী, বারাণসী-ন্যাসিসমূহতারী।

বিশুদ্ধসত্ত্বিক্তিপ্রসারকারী, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারী ॥৪॥

মায়াবাদরূপ অন্ধকারবিনাশকারী কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের ত্রাণকর্তা, বিশুদ্ধ ও নিত্য ভক্তির প্রসারকারী করুণাবতার শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥৪॥

শ্রীদ্বিধিজ্যেতৃদ্বিজদর্পহারী, শ্রীসার্বভৌমাতিপ্রসাদকারী।

অষ্টাদশাদেশপুরীবিহারী, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারী ॥৫॥

দ্বিধিজয়ী কেশবকাশ্মীরীর দর্পচূর্ণকারী, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রতি সাতিশয় কৃপালু, শ্রীজগন্নাথ পুরীতে অষ্টাদশবর্ষবিহারকারী করুণাবতার শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥৫॥

মহোজ্জ্বলপ্রেমরসপ্রদাতা, শ্রীনামসর্বোত্তমভক্তিধাতা।

গোলোকবৃন্দাবন-সদ্বিহারঃ, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥৬॥

উন্নতোজ্জ্বল প্রেমপ্রদাতা, সর্বোত্তম ভক্তি শ্রীনামসঙ্কীর্ণনের বিধাতা, গোলোক ও বৃন্দাবনে নিত্যবিহারী করুণাবতার শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥৬॥

সদা হরেকৃষ্ণসুগানমত্তঃ, যোগীন্দ্রমুনীন্দ্রসমাধিবিত্তঃ।

দত্তব্রজপ্রেমসুধাসুসারঃ, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥৭॥

যিনি 'হরে কৃষ্ণ' এই নাম গানে নিরন্তর প্রমত্ত, যিনি যোগী ও মুনিশ্রেষ্ঠগণের সমাধিমাত্রলভ্য সম্পত্তি, অমৃতের সার ব্রজপ্রেম যিনি বিতরণ করিয়াছেন, সেই করুণাবতার শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥৭॥

কবাটবক্ষোদনবপদ্বনেত্রঃ, শ্রীসচ্চিদানন্দঘনাসুগাত্রঃ।

স্বাস্থ্যপ্রভানিন্দিতকোটিমারঃ, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥৮॥

যাঁহার বক্ষ কপাটসদৃশ প্রশস্ত, নেত্র নবারবিন্দতুল্য, যাঁহার চিত্ত ও শ্রীঅঙ্গ সচ্চিদানন্দঘন, যিনি স্বীয় অঙ্গপ্রভাধারা কোটি কন্দর্পকে হেয় করিতেছেন, করুণাবতার সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥৮॥

নীলাদ্রি-শুভ্রাংশু-সুধাচকোরঃ, রথাগ্রসঙ্গীতসুধাবিধুরঃ।

শ্রীবৈষ্ণবব্রাতলসচ্ছরীরঃ, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥৯॥

যিনি নীলাচলচন্দ্রের জ্যোৎস্নার চকোরস্বরূপ, যিনি রথাগ্রে সঙ্কীর্ণনামৃত লোলুপ, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ বৈষ্ণবচিহ্নদ্বারা পরিশোভিত, করুণাবতার সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥৯॥

ভক্তাবলীমানসরাজহংসঃ, সন্ন্যাসিভূদেবকুলাবতংসঃ।

শ্রীমজ্জগন্নাথশচীকুমারঃ, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥১০॥

যিনি ভক্তগণের চিত্তরূপ সরোবরের রাজহংস সদৃশ, যিনি সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণকুলের

শিরোভূষণস্বরূপ, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নন্দন সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন॥১০॥

গৌরস্তুতিং গায়তি ভক্তিপূর্ব্বং, প্রাপ্নোতি সুপ্রেমসুধাং সঃ সর্ব্বম্।

ত্রিতাপদাবানল-দুঃখমুক্তঃ, প্রমোদতে কৃষ্ণপদাজ্জভক্তঃ॥১১॥

যিনি ভক্তিসহকারে শ্রীগৌরস্তুতি গান করেন, তিনি সমগ্র প্রেমামৃত লাভ করেন, ত্রিতাপদাবানলদুঃখ হইতে মুক্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন॥১১॥

প্রেমভক্তি ও শ্রীগৌরাঙ্গদেব

প্রেমের সংজ্ঞা ; কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়

আদৌ প্রেম কি তাহা আলোচনা করি, পরে ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে বলিতে চেষ্টা করিব। প্রেম একটি প্রবৃত্তিবিশেষ। তাহার স্বরূপ,—

আকর্ষ সন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তঃ দৃশ্যতে যথা।

অগোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রেমলক্ষণম্॥

এই প্রেমের আধার—ভক্ত-জীব এবং বিষয়-কৃষ্ণ। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর প্রেমের বিষয় হইতে পারেন না। কৃষ্ণ একটি তত্ত্ব ; তাহাই ভগবত্ত্বের সীমা। সুতরাং একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়। এট বিষয়টী একটি পরমতত্ত্ব, কেবল নামের বিবাদ নয়।

কাম ও প্রেমের পার্থক্য

সেই প্রেম সম্পূর্ণ চিন্ময়। জীব অণুচৈতন্য বলিয়াও পূর্ণ চিন্ময় পদার্থ। যে-কোন কারণেই হউক, আমরা মায়া-বিকারে বিকৃত। সেই প্রেম এখন জড়-বিষয়-প্রেম। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের এই সিদ্ধান্ত যে, বিষয়-প্রেমের নাম ‘কাম’ ও কৃষ্ণ-কামের নাম ‘প্রেম’। কাম ঘেরূপ অধম, প্রেম সেই পরিমাণে উপাদেয়। কাম জীবের প্রেয়ঃ, প্রেম জীবের শ্রেয়ঃ। আজকাল জড় বদ্ধজীবের প্রেমের স্বরূপ বোধ না হওয়ার কামকেই প্রেম বলিয়া মনে হয়। উভয়ের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও একটি অনর্থ, অন্যটি অর্থ।

পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম-প্রাপ্তির ক্রম

হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। প্রভু প্রেমকে পঞ্চম-পুরুষার্থ বলিয়াছেন। সেই পরম দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম আমাদের হৃদয়ে কিরূপে উদয় হয়। উপেয় সাধনে অবশ্য যত্নের প্রয়োজন। যে যত্ন কি?—সাধন-ভক্তি। প্রেমপ্রাপ্তির ক্রম মহাপ্রভু বলিয়াছেন;—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের ‘শ্রদ্ধা’ যদি হয়।

তবে সেই জীব ‘সাধুসঙ্গ’ করয়॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় ‘শ্রবণ-কীর্তন’।

সাধন-ভক্ত্যে হয় ‘সর্ব্বানর্থ-নিবর্তন’॥

অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
 নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়।।
 রুচি ভক্তি হৈতে হয় আসক্তি প্রচুর।
 আসক্তি হৈতে চিন্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যক্ষুর।।
 সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
 সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্বানন্দ-ধাম।। (চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৩-১৭)

কৃষ্ণ-প্রেমোদয়ে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি লাভ

প্রেমাকুর উদয় হইলে পুলকাক্ষ, স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ্যাদি বিকার উদয় হয়। সুতরাং ঐ সকলই প্রেমের অনুভাব বা প্রমাণ। এখন দেখুন, প্রেম কি দুর্লভ, প্রেম কি উপাদেয়। যে-প্রেমের নিকট মুক্তি পর্য্যন্ত তুচ্ছ, সে-প্রেম কতদূর প্রার্থনীয়। প্রেম নিত্যসিদ্ধ হইলেও সাধনার দ্বারা বিকশিত হয়। আজকাল কপট লক্ষণে অনেকেই প্রেম পাইয়াছি বলিয়া প্রচার করেন। যাত্রার বৈষ্ণব, রামায়ণের কালনেমী—ইহারা কপট প্রেমের উদাহরণ। সেই সব কপট পুরুষ বা স্ত্রী কেবল তদ্বারা কামারকে ইম্পাৎ ফাঁকি দিয়া আপনাকে বঞ্চনা করেন। ধিক্ আমাদের কুপ্রবৃত্তি !

সনাতন-ধর্ম বা বৈষ্ণব-ধর্মের নামান্তরই—প্রেম-ধর্ম

যদি আমাদের সেই বৈকুণ্ঠ দুর্লভ প্রেম পাইবার ইচ্ছা হয়, তবে আমাদের প্রাণ-গৌরাদ্বয়ের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আর গতি কি আছে? এই প্রেমই বৈষ্ণব-ধর্ম বা জৈবধর্ম। এই প্রেমের এককণ যদি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারি, তবে আমাদের জীবন সার্থক হয়। এই প্রেমের নাম করিয়া জগতে যে-সকল ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে-সকল ধর্মাপেক্ষা বৈষ্ণব-ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা যতদূর দেখিতে পাই, অন্যত্র বিশুদ্ধ-প্রেমের লক্ষণ পাই না। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করি, বা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে অন্বেষণ করি, কোথাও বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রেমধর্ম দেখি না। সর্বদেশ ভ্রমণ করিয়া, সকল সম্প্রদায় অন্বেষণ করিয়া যখন শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম দেখি, তখনই প্রেমের ফলক আসিয়া আমাদের দেহে বিকার উৎপন্ন করে, ইন্দ্রিয়সকলকে ক্ষোভিত করে এবং সমস্ত সত্তাকে বিচিত্রানন্দে কম্পিত করে।

শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব :—তিনি সর্বাবতারী অভিন্ন-

ব্রজেন্দ্রনন্দন ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা

ভাইসকল, আমার প্রভু গৌরাঙ্গ কে?—এই অনুসন্ধানে সমস্ত মঙ্গল নিহিত আছে। আমার গৌরাঙ্গ উপাস্যের শিরোমণি, গুরুদিগের পরম-গুরু, অবতারগণের চূড়ামণি। উপাস্যগণের মুকুটমণি কৃষ্ণই আমার প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আচার্য্য-সমূহের অগ্রগণ্য অসংখ্য অবতারের অবতারী কৃষ্ণস্বরূপের কোন বিষয়ের অভাব পূরণকারী অবতার—আমার শচীনন্দন বিশ্বম্ভর!

বিভিন্নশাস্ত্রে শ্রীচৈতন্যাবতারের উল্লেখ

“ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।” আমার কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচ্ছন্ন

অবতার। যদিও সকল পুরাণে তাঁহার বিস্তৃত বর্ণন নিষেধ ছিল, তথাপি বেদ-পুরাণ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে তাঁহার কথা দেদীপ্যমান আছে।

বেদে—‘মহান্ প্রভুবৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্তকঃ’, ‘যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্ষবর্ণম্’, ‘সুবর্ণজ্যোতিঃ পুরুষঃ’ ইত্যাদি।

মনুও বলিয়াছেন,—‘রুক্ষাভং স্বপ্নধীগম্যম্’।

গীতায়,—‘আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ’।

মহাভারত দানধর্ম্মে—‘সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ’।

ভাগবতে,—‘কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাংকৃষ্ণং’ প্রভৃতি।

এইরূপ সকল পুরাণে, তন্ত্রে শ্রীচৈতন্যাবতারের কথা আছে। ঋষিদিগের এইপ্রকার অনুভব শাস্ত্র-সহস্রে লিখিত আছে।

ভগবৎকৃপায় ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি ও অনাস্থিত-জনের দুর্দশা

এতদতিরক্তি বিদ্বদনুভবই সকলের মূল। যাহার প্রতি তাঁহার কৃপা হয়, তাহার নিকট তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন। স্বপ্রকাশ বস্তুর এই একমাত্র প্রমাণ। শ্রীপ্রবোধানন্দ কহিয়াছেন;—

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।

সুপ্রকাশিত-রত্নৌষে যো দীনো দীন এব সঃ॥

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।

যে ন মজ্জন্তি মজ্জন্তি তে মহানর্থ-সাগরে॥

সর্বশ্রেণী জীবের প্রতি প্রেমমূর্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমদান-লীলা

আমার মহাপ্রভু স্বয়ং প্রেমমূর্তি। দীনজনের নিকট দীনভাবে আকুতি-মিনতি করিয়া প্রেম বিতরণ করেন। পণ্ডিতজনের নিকট অপার পাণ্ডিত্য দেখাইয়া তাঁহাদের চিন্তে প্রেম উৎপাদন করেন। বিষয়ী লোককে কৃপা করিয়া অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে করিতে প্রেম লাভ করিতে উপদেশ দেন। বিষয়-ত্যাগীকে সর্বসঙ্গ-ত্যাগপূর্বক নিরন্তর কৃষ্ণভজন করান। বৈদ্য, চিকিৎসকদিগকে প্রেম-দান করিয়া ভবরোগের ঔষধ-দানে যোগ্য করেন।

সমগ্র বিশ্বে প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের আশা পোষণ

যত যত গৌরচর্চা বিস্তারিত হইবে, তত ততই সর্বচর্চাকে নিস্তন্ধ করিয়া গৌর-চর্চা প্রবল হইবে। গৌর-ধর্ম্ম সূর্য্যের ন্যায় অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হইবে। শ্রীকবিকর্ণপুরের সহিত গৌর-ভক্তগণ সকলেই এই কথা বলুন ;—

“পুনীমশ্চণ্ডালানপি খলু ধুনীমোহখিলমলং

লুনীমঃ সংস্কারানপি হৃদি তদীয়ানতিদৃঢ়ান্।

কৃপা দেবী তস্য প্রকটয়তি দৃকপাতমিহ চেৎ

তদা তেষামন্তঃ কমপি রসভাবঞ্চ তনুমঃ॥

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শিক্ষক ও শিক্ষিত

শিক্ষানীতিতে যাঁহারা দক্ষ, তাঁহারা 'শিক্ষক'-শব্দবাচ্য। শিক্ষকের নিকট নিরুপদ্রবে শিক্ষা লাভ করিবার বাসনাবিশিষ্ট জনগণই শ্রবণের অধিকারী। যিনি অবিচলিত-চিত্তে শ্রবণ করেন এবং শ্রুতবিষয় গ্রহণ করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের বিপরীত গতিকে রোধ করিতে সমর্থ হন, তিনিই 'শিক্ষিত'।

শিক্ষিতের ভাগ্যে শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষা-লাভে নানাপ্রকার ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন শ্রদ্ধারহিত শিক্ষালাভার্থী শিক্ষকের শিক্ষার নীতির প্রতি শ্রদ্ধাধান থাকেন না, তৎকালে তাঁহার শিক্ষককে শিক্ষ-দানের অনুপযোগী জ্ঞান করায় শিক্ষক-পদে বরণ করেন না। যে-স্থলে কপটতাদ্বারা ঐরূপ বরণের অভিনয় প্রদর্শিত হয়, সে-স্থলে অনবধান-বশতঃ আর কিছু চিন্তা করেন; শিক্ষকের বাণী তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না, যদিও শব্দাকারে শিক্ষকের কথিত শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তথাপি তাঁহার অনবধান-বশতঃ বিপরীত চিন্তাশ্রোত পূর্ব অনভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করিয়া উপলব্ধির প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে। আবার যে-স্থলে কোন নূতন কথা অভিনব জ্ঞান উৎপাদন করিবার প্রয়াস করে, সে-স্থলে পূর্বসঞ্চিত বিরুদ্ধজ্ঞান উহাকে বাধা দিয়া শিক্ষকের মর্যাদার লাঘব করে। এইরূপ শিক্ষার্থীর বাধা-সমূহকে বিচারক-সম্প্রদায় 'অনর্থ' নামে অভিহিত করেন। উহা প্রয়োজনীয় বিষয় মনে না করায় এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়কেই 'অর্থ' জ্ঞান করায় প্রকৃত জ্ঞানের উপলব্ধিকে বাধা দেয়। বিপ্রলিপ্সা-নামক কপটতা অনেক সময় শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার দিয়া তাঁহার প্রতিকূল ব্যাপারসমূহের অনুসন্ধান নিযুক্ত করে।

শাস্ত্রে আমরা শিক্ষাগুরুর কথা শ্রবণ করি। সেই শিক্ষাগুরু অনভিজ্ঞ জনকে যে-সকল শিক্ষা প্রদান করেন, জড় জগতের শিক্ষক-সম্প্রদায় সেই সম্পত্তির অধিকারী নহে। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দ্বারা ভোগীর অভিজ্ঞান-জন্য যে প্রাপ্ত-শিক্ষা, তাহাই জগতে 'শিক্ষক' নামধারি-জনগণ অপর অনভিজ্ঞ জনগণকে তাঁহাদের শিষ্য হইবার উপযোগী জানিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। অনেকে শিক্ষার্থীর ভাগে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জ্ঞাতসারে অশিক্ষিতকে শিক্ষা-গুরুপদে বরণ করেন। শিক্ষাগুরুব্রহ্মও তৎকালে তাদৃশ বঞ্চিত শিক্ষার্থীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহাকে ঠকাইতে থাকেন। এই শ্রেণীর বঞ্চক শিক্ষক ও বঞ্চিত শিক্ষার্থী—উভয়েরই যে দুর্গতি লাভ ঘটে, তাহা নিরপেক্ষ বিচারকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। চৌর্য্যস্বভাব-সম্পন্ন শিক্ষার্থী লাম্পট্যদোষে অভিহিত; তাদৃশ ইন্দ্রিয়সুখে প্রমত্ত হিতাহিত-বিবেকশূন্য জনগণ নিজ নিজ রুচির বশবর্তী হইয়া তত্তদ্বিষয়ে পারদর্শী কপট গুরুব্রহ্মবগণকে শিক্ষাগুরুপদে বরণ করিয়া বিষয়জালে আবদ্ধ হন।

শ্রীচৈতন্য তজ্জন্য কৃষ্ণতত্ত্ববিৎকেই 'গুরু' বলিয়া জগতে উপদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা কৃষ্ণসেবাবিমুখ হইয়া জড়জগতে প্রভুত্বকামী, সেই সকল ভোগিব্যক্তি কখনই শিক্ষাগুরু হইতে পারে না। তাহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিলে শিষ্যেরও কোন

মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। জাগতিক ভোগজালে নিগড়িত হইবার প্রয়াস যাঁহারা করেন না, তাঁহারা ভোগজালের রজ্জুতে আত্মবন্ধন করিয়া ‘মুক্তপুরুষ’ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। তাদৃশী মুক্তি ভোগেরই অন্যপ্রকার ভাব।

যাঁহারা এই সকল সূক্ষ্ম কথার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মস্বরূপের কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শিক্ষাগুরুর অনুসন্ধান করেন। অন্তর্যামিরূপে চৈত্র্য-শিক্ষক, মহান্ত-শিক্ষককে বহুমানন করিতে শিক্ষা দেন। এস্থলে বলাবাহুল্য যে, চৈত্র্য-শিক্ষক ভগবান্ গৌরসুন্দর বদ্ধজীবের যোগ্যতানুসারে অনর্থের হস্ত হইতে যে পরিমাণে যিনি মুক্ত, তাঁহাকে সেই পরিমাণে মহান্ত-শিক্ষকের নিকট উপদেশ লাভ করিবার সুযোগ প্রদান করেন—যিনি ভগবানকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে নিজ ভোগ-প্রবণতার জন্য বা নিজের ত্যাগের বাহাদুরীতে নিজে শাস্ত হইবার জন্য ব্যস্ত, ভুক্তি ও মুক্তি পিশাচীদ্বয়ের দ্বারা গ্রস্ত সেই বদ্ধজীবের চৈতন্য প্রদান করিয়া শুদ্ধভক্তিধর্মের উপদেশের প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া দেন।

প্রাকৃত-সাহজিক নিজ আত্মস্তরিতা-বশতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের অমায়ায় করুণালাভে বঞ্চিত হইয়া অচৈতন্য প্রতিকূল-বুদ্ধিকেই শ্রীচৈতন্যদেব মনে করিয়া শিক্ষক-নির্বাচনে ভ্রম করিয়া বসেন। উহা তাঁহাদের সুকৃতির অভাব মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ একপ্রকার শিক্ষাগুরু লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বহিরঙ্গাশক্তি-পরিণত জগতের ভোগে প্রমত্ত জনগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ জানিয়া প্রাকৃত সহজিয়াকে শিক্ষাগুরু জানেন এবং শুদ্ধভক্তির শিক্ষার্থীকে আক্রমণ করেন। ইহা তাঁহাদের স্বভাব জানিতে হইবে। পিত্তোপতপ্ত জিহ্বা যেরূপ মৎস্যগুণিকাকে স্বাদু মনে করে না এবং রোগনাশক জানে না, তদ্রূপ প্রাকৃত-সহজিয়া-গুরুর শিষ্যসম্প্রদায় আপনাদের বিদ্বা ভক্তিকেই নিজ মঙ্গলের উপায় জ্ঞান করেন। প্রেয়ঃপন্থী প্রাকৃত সহজিয়াগণ শিক্ষাগুরুর শ্রেয়ঃ পথকে আদর করেন না, তাহার ফলে জগতে হরিভক্তি অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

শিক্ষকের অভাব-হেতু কুশিক্ষক-সম্প্রদায় শিক্ষক-কৈতবে আত্মপরিচয় দিতে গিয়া জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহারা জগৎকে ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীর কবলে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছেন। পরম করুণাবতরী শ্রীগৌরসুন্দর জীবকুলকে উদ্ধার করিবার মানসে তাঁহার নিজ জনগণকে নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য জগতে প্রেরণ করেন। তৎকালে প্রকৃতি স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভাগ্যহীন জীবের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে ও সদস্য বিচারকে আবরণ করে। শিক্ষাগুরু জীবকুলকে বাস্তব-শিক্ষা প্রদান করেন, আবার ভাগ্যহীন অসদ্ব্যক্তিগণ হরিবিমুখ জনগণকে বহুমানন করিয়া ‘শিক্ষক’পদে বরণ করেন। সুতরাং শিক্ষকের নিকট শিক্ষার্থী কোন্ শিক্ষা গ্রহণ করিবেন, তাহার মীমাংসা না করিয়া যাঁহারা শিক্ষা-গ্রহণের অভিনয় করেন, তাঁহারা হয় বঞ্চক, না হয় বঞ্চিত।

সনাতন ধর্ম

অজ্ঞান-তিমিরাক্ষয় জ্ঞানাজন-শলাকয়া।

চক্ষুরন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণশ্রেম-প্রদায় তে।

কৃষ্ণায় 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

আজকেও আমি আপনাদের নিকট বসে দুকথা আলোচনা করব। আজকে কথা আছে 'সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে আলোচনা হবে। সনাতন-শব্দটি নিপাতনে সিদ্ধ হয়েছে, সদা + তন্ ইতি সনাতন। তন্-ধাতু অর্থে বিস্তার, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সদা বিস্তৃত থাকে যে ধর্ম তাকে বলে সনাতন ধর্ম। যে ধর্মের বিনাশ নাই, সেই ধর্মকেই সনাতন বললে সর্বদা ধর্মটা আছে এই-ই বোঝায়। নতুন করে সৃষ্টি হল, কিছুদিন থাকল, পরে নষ্ট হয়ে গেল, এরূপ ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলে না। সনাতন ধর্মের সৃষ্টি নাই, ধ্বংস নাই, চিরকাল স্থিতি। প্রত্যেক দার্শনিক জগৎ একটা লজিক্যাল থিয়োরি অ্যাডমিট করে নিয়েছে। এটা অ্যাক্সিওমেটিক ট্রুথ—যে বস্তুর সৃষ্টি হয়, তার লয় হবেই। যার আদি আছে, তার অন্ত আছে—এগুলো দার্শনিক জগতের অ্যাক্সিওমেটিক ট্রুথ, সকলেই মেনে নিয়েছে। যে ধর্ম জন্মগ্রহণ করেছে সে ধর্ম মরবে, ধ্বংস হবে, নষ্ট হবে। সনাতন ধর্ম সেই প্রকৃতির ধর্ম নয়। সনাতন ধর্ম সৃষ্টিও হয়নি, ধ্বংসও হবে না; আমরা যেমন আজকাল অনেক ধর্মের কথা শুনি, দেখি, বুঝি, বিচার করি।

আজকাল ঐতিহাসিক দৃষ্টির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের কথা পাই। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে শাক্যসিংহের পুত্র বুদ্ধদেব এই ধর্মটি প্রবর্তন করেন। তাহলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি হয়েছে, বৌদ্ধধর্ম জন্মগ্রহণ করেছে, এখনও তার কিছু কিছু আছে। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অনেক দেশে কিছু কিছু আছে। যে ধর্মটা জন্মগ্রহণ করেছে তা লয়প্রাপ্ত হবেই—এটা অ্যাক্সিওমেটিক ট্রুথ। আজ হোক, কাল হোক বা দুদিন পরেই হোক। এই যে বৌদ্ধধর্ম প্রায় ২৫০০ (আড়াই হাজার) বৎসর পূর্বে সৃষ্টি হয়। জৈনধর্মের সঙ্গে প্রায় ২০-৫০ বৎসরের তফাৎ মাত্র। এমনকি এই যে খ্রীষ্টীয় ১৯৬৭ সাল, তারও দিন তারিখ বাঁধা আছে। এর পূর্বে এসব ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। যে ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না, তাকে সনাতন ধর্ম বলা হয় না। মুসলমান ধর্ম প্রায় ১৫০০ (দেড় হাজার) বৎসরের কাছাকাছি, ওর পূর্বে ঐ ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না—নূতন হয়েছে। কাজেই যার জন্ম আছে, তার মৃত্যু আছে। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করেছে তখন নিশ্চয়ই মরবে। তর্কশাস্ত্র বা লজিক ওয়েষ্টার্ন হোক আর ইস্টার্ন হোক, প্রত্যেক দার্শনিক জগৎ একথা মেনে নিয়েছে। এ বিষয়ে ত' অস্বীকার করবার কিছু নেই।

আমার এখানে আলোচনার বিষয় সনাতন ধর্ম। শুধু এই কয়টি ধর্মের কথা

বলছি তা নয়। তা ছাড়াও ভারতে বহু ধর্ম আছে। গুরু নানকের শিখ সম্প্রদায়ের ধর্ম—এ ধর্মগুলো উদ্ভূত হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে। এদের আবির্ভাবের পূর্বে এসব ছিল না। শুধু তাই নয়—তাদের বিচার, যুক্তি, দার্শনিক বিজ্ঞান যদি আপনারা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করেন, পড়ে দেখেন, তাহলে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন এগুলো সনাতন ধর্ম নয়। সনাতন ধর্মে একটা ফাণ্ডামেন্টাল প্রিন্সিপ্যাল হচ্ছে এই যে,—সনাতন ধর্মে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন—এই তিনটি তত্ত্ব বিচারিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মের প্রত্যেক শাস্ত্রের ভিতরে বিচারের কথা সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। সম্বন্ধ বলতে ভগবানের সাথে আমাদের কি সম্বন্ধ? ভগবানের সাথে আমাদের রিলেশনশিপটা কি? আমরা সেই ভগবানকে পাব কি করে? বা পাবার দরকার আছে কিনা? কিজন্য ভগবানের উপাসনা করব? উপাসনা না করলে ক্ষতি কি? করব কেন? না করলে কি হবে? যে জন্য করব বা উপাসনা করে যেটা লাভ করব, সেটার নাম প্রয়োজন। যে উপাসনা তাকে বলে অভিধেয়। সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন—এই তিনটি তত্ত্ব নিয়ে ভারতবর্ষের সমস্ত শাস্ত্র বিভক্ত হয়েছে। বেদে একলক্ষ শ্লোক আছে। মহাভারতে একলক্ষ শ্লোক আছে এবং তার পরিশিষ্ট হরিবংশ তাতেও একলক্ষ শ্লোক আছে। অষ্টাদশ পুরাণ—তার মধ্যে ঋন্দপুরাণে পঁচাত্তর হাজার শ্লোক, পদ্মপুরাণে পঞ্চদশ হাজার শ্লোক, শ্রীমদ্ভাগবতে আঠার হাজার শ্লোক। এই এক একখানা বিরাট গ্রন্থ, তার প্রত্যেকটারই মূল বেসিক সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।

আমরা কার সঙ্গে রিলেটেড? আমরা বর্তমানে সংসারে সম্বন্ধযুক্ত, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, বন্ধু, সমাজ, চাকর-বাকর—এই রিলেটিভিটি আমাদের ভিতরে দেখতে পাই। ভগবান্ একজন, ভগবান্ বহু নন। হিন্দুর সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য একেশ্বরবাদিতা। এক ভগবানের উপাসনা করা কেন? এক ভগবানের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রাণীজগৎ, প্রাণীর অতীত জগৎ যা কিছু সবই সেই একই ভগবানের। ভগবানকে পূর্ণবস্তু বলা হয়। পূর্ণবস্তু বললে তাতে কিছু অভাব থাকে না। এই জিনিসটা ভগবানের মধ্যে নেই—একথা বলা চলবে না। এমন একটা তত্ত্বকে স্বীকার করেছে সনাতন ধর্ম—যে ধর্ম নিত্যকাল স্থায়ী থাকে। সেই ধর্মের মূল তিনটি প্রিন্সিপ্যাল—উপাস্য-তত্ত্ব, উপাসক-তত্ত্ব, উপাসনা-তত্ত্ব। উপাস্য বস্তু হচ্ছেন ভগবান্, উপাসক হচ্ছে তাতে অবস্থিত জীবসকল, আর তার ভিতরে যে সম্বন্ধ—রিলেশনশিপ—সেটা হচ্ছে উপাসনা। এই তিনটি জিনিষই সত্য। এই তিনটি জিনিষই নিত্যকাল স্থায়ী। এর নাম সনাতন ধর্ম। উপাস্য চিরকাল থাকবে, উপাসক চিরকাল থাকবে, উপাসনাও চিরকাল থাকবে। এই তিনটির যদি কোন একটা খানিকক্ষণ আছে, হাজার-দু'হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার, এক লক্ষ বছর থাকবে, তার পরে আর থাকবে না বলা হয়, তাহলে সেটা অনিত্য হয়ে গেল, সনাতনত্বের ব্যাঘাত জন্মে গেল। আমরা যদি বলি ঈশ্বর তিন কোটি বছর থাকবে, তাহলে সনাতনত্বের ব্যাঘাত হয়ে গেল। যদি বলি, জীব মাত্র ৮৪ লক্ষ জন্ম থাকবে, তাহলে সনাতনত্বের ব্যাঘাত হয়ে গেল। জীবের ধর্ম দশ হাজার, বিশ হাজার বছর থাকবে, তারপরে আর থাকবে না—এই যদি বলা হয়, তাহলে সনাতনত্বের ব্যাঘাত হয়ে গেল। সনাতন ধর্ম সেইটাই—যে ধর্মে উপাস্য, উপাসক, উপাসনা তিনটাই

নিত্য। সনাতন—সর্বদা অবস্থিত আছে,—এই দর্শনটি যারা স্বীকার করেছে, তারাই সনাতন-ধর্মী। এই দর্শনটি, এই বিচারটি যারা স্বীকার করেননি, তাদেরকে সনাতন-ধর্মী বলা হয় না। যেমন উদাহরণ দিচ্ছি—বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান ধর্ম। এই যে অনেকগুলো ধর্ম-সম্প্রদায়, এই সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে, কিছুকাল থাকবে, পরে ধ্বংস হবে। মানুষ জন্মগ্রহণ করলেই যেমন মরবে, তেমনই ধর্ম সৃষ্টি হলে তার বিনাশ হবে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ অনুসৃত আছে।

এই যে জগৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। শুধু জগৎ বলতে গেলে আমরা এই পৃথিবীটাকে লক্ষ্য করব তা নয়। এইরকম অনন্তকোটি পৃথিবী আছে। আমরা অমাবস্যার রাতে আকাশের দিকে তাকালে অনন্তকোটি নক্ষত্র লক্ষ্য করি, এগুলো জগৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। এই যে অনন্তকোটি জ্যোতিষ্ক, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির কথা শাস্ত্রে পাই এগুলো সমস্ত সৃষ্টি হয়েছে। তাই ধ্বংস অনিবার্য হবে হবেই। আমরা অনেক সময় দেখি, একটা নক্ষত্র ছুটে গেল, পড়ে গেল, অর্থাৎ একটা জগৎ ধ্বংস হয়ে গেল! সেই প্রকার আমরা এই যে পৃথিবীতে বসে রাজত্ব করছি, নানা কথা আলোচনা করছি, এই বিশ্বও ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বাধ্য, হবেই হবে। এই এ্যান্টিওমেটিক্ টুথ্‌টা সর্বদেশে সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। জন্মগ্রহণ করলেই মরবে, সৃষ্টি হলেই ধ্বংস হবে—এগুলো অস্বীকৃত হয়নি কোন ধর্মেতে।

বিষয়টা এখন বিচার্য—কাকে সনাতনধর্মী বলব? কে সনাতন-পদ্ধতি কতটা অবলম্বন করেছে, কার বিচারটা কতদূর নিত্যতা লাভ করেছে, সেটাই এই বিচারের মাপকাঠি। সনাতন-শব্দের প্রতিশব্দে আমরা নিত্য-শব্দ ব্যবহার করি। এখন দার্শনিক নিত্য, সাহিত্যিক নিত্য এবং স্মৃতির নিত্যতার মধ্যে তফাৎ আছে। যেমন—স্মৃতিশাস্ত্রে নিত্যকর্ম-পদ্ধতি বলে একটা বই আছে, গ্রন্থ আছে, বিচার আছে। এই নিত্যকর্ম-পদ্ধতি বললে যে নিত্য বলা হয়, এটা প্রকৃত নিত্য নয়। সাহিত্যিকগণ যে নিত্য ব্যবহার করেন, সেটাত' মোটেই নিত্য নয়। দার্শনিক বিচারের দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে নিত্য-শব্দের দ্বারা সনাতনকে লক্ষ্য করে। সনাতন-শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে নিত্য। কাজেই নিত্যধর্ম বা সনাতন-ধর্ম একই বস্তু। নিত্যধর্ম বলতে গেলে উদাহরণস্বরূপ বলি—আমরা এখন জীব। অনন্তকোটি জীব পৃথিবীতে বাস করেছে—বৃক্ষ, লতা, মানুষ, দেবতা, দৈত্য, দানব প্রভৃতি। আমরা যদি বলি যে, এখন আমরা জীব আছি বটে ; মৃত্যু হয়ে গেলে পর ভগবান্ হয়ে যাব, আর জীব থাকব না—এই প্রিন্সিপ্যাল্‌টা যদি এ্যাডপ্ট করতে হয়, তাহলে সনাতন ধর্মের বাইরে যেতে হবে। তাকে আর সনাতন ধর্ম বলা যাবে না। কেন?—তারা জীবের সত্ত্বাটা স্বীকার করছেন না, জীব আর থাকবে না। এখন যে জীব দেখছি সেটা আর থাকবে না, জীব নষ্ট হয়ে যাবে। অনেক সময় কথায় কথায় লোকে বলে থাকে,—“পাশ-বন্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশ-মুক্তঃ সদাশিব।”

সনাতন ধর্মের কথা নয় এটা। দার্শনিক বিচার, বেদান্ত দর্শন, মহাভারত, গীতা, উপনিষদ, বেদ, শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বিচার করলে দেখা যাবে এ যুক্তি, এ কথা কখনও সনাতন ধর্মে বলেনি। সনাতন ধর্ম এদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। ধর্মকে যদি নিত্য বলে স্বীকার করতে হয়, তবে দেশে সেই ধর্ম যাজন করবে কে—জীব যদি

না থাকে? জীব নাই, ধর্ম কোথায় থাকবে? ধর্ম যাজন করবে কে? কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন অনেক জায়গায়—“পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ঘৃণা কর না।”—একথাটা একদম নাস্তিকতাপূর্ণ। পাপ করে কে? পাপ কি হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়? নাকি গাছে গাছে থাকে? পাপাচরণকারী যে ব্যক্তি সে পাপী। তাকে ঘৃণা করতেই হবে। যে পাপের আশ্রয়দাতা, প্রশ্রয়দাতা, তাকে ঘৃণা না করলে চলবে কেন? পাপীকে ঘৃণা কর না, পাপকে ঘৃণা কর—কথাটার কোন অর্থ হয় না। ধর্ম থাকবে না, জীবও থাকবে না। কথায় বলতে গেলে ভগবানও থাকবে না। যখন থাকবে না নিয়েই বিচার হচ্ছে, তখন এই জিনিষটাকে বলে নাস্তিক্যবাদ। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

পরাদর ও পরনিন্দা

“পরের আদর”

পরনিন্দা ও পরচর্চা করা বড় অন্যায় ও ভক্তি-হানিকারক। নিন্দা হিংসার সমতুল্য; কোন জীবের প্রতি অবজ্ঞা, হিংসা, নিন্দা ও ঘৃণা করিলে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুতি হয়। জীবকে পীড়ন করা, দুঃখ দেওয়া ও হিংসা-নিন্দা করা প্রীতির বিপরীত। ভক্তি নির্মমের ধর্ম। সেখানে মৎসরতার কোন কথা নাই। ভক্ত সমদর্শী। তাঁহার বিষম-দর্শন না থাকায়—সর্বত্র ভগবৎ-সম্পর্ক-দৃষ্টি থাকায় তিনি সকলকেই কৃষ্ণাধিষ্ঠান-বুদ্ধিতে সম্মান করিয়া থাকেন। ভক্তের স্বভাব এইরূপ,—

উত্তম হঞ বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।

জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।। (চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৫)

আমার হৃদয়ে যে রূপ ভগবান্ আছেন, বৃক্ষ-লতা, হস্তী-পিপীলিকা, ধার্মিক-অধার্মিক, নর-নারী, সৎ-অসৎ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ-সকলের মধ্যেও সেইরূপ শ্রীভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন। সাধুগুরু-কৃপায় ইহা উপলব্ধি করিয়া নিজের ন্যায় পরেরও মঙ্গল-অনুসন্ধানকেই প্রকৃত সাধন বলে। ইহার পরিণতিকেই মহাজনগণ সমদর্শন বলিয়াছেন। প্রত্যেক জীবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে। নিজের ন্যায় পরেরও উপকার করিতে হইবে। তবে নামাশ্রিত ভগবদ্ভক্তকে বেশী আদর করিতে হইবে, আর অন্য জীবের প্রতি যথাসাধ্য সম্মানাদি প্রদর্শন করা বিশেষ কর্তব্য। শ্রীভগবান্-বিষুই অন্তর্যামি-স্বরূপে জীব-হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সমস্ত পরিদর্শন করিতেছেন—ইহা জানিয়া সকল প্রাণিকেই মনে মনে সম্মান করিয়া প্রণাম করিতে হইবে—ইহাই সাধু-শাস্ত্র-ভগবদাদেশ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।

ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি।। (ভাঃ ৩।২৯।৩৪)

বিসৃজ্য ময়মানান্ স্বীন্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।

প্রণমেদগুবদ্ভুমাবান্ধ-চণ্ডাল-গোথরম্।। (ভাঃ ১১।২৯।১৬)

উপহাসকারী-বন্ধুগণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া এবং দেহ-বিষয়ে উচ্চ-নীচ ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কুকুর-চণ্ডাল-গদর্দভাদি সকল প্রাণিকেই ভগবদধিষ্ঠান জানিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া সন্মান করিবে।

ব্রাহ্মণাদি কুকুর চণ্ডাল অন্ত করি।

দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি।।

এই সে বৈষ্ণবধর্ম—সবারে প্রণতি।

সেই ধর্মধ্বজী, যা'র ইথে নাহি রতি।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।২৮-২৯)

যাঁহারা প্রাথমিক উপাসক অর্থাৎ লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অর্চন ও নাম করেন, তাঁহারা সর্বভূতে আদর করিতে অবশ্য শিখিবেন—ইহাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি। এই বিধি লঙ্ঘনে তাঁহাদের কোন দিনই মঙ্গল হইবে না। যাঁহারা দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্, তাঁহাদের সর্বত্রই শ্রীভগবানের বৈভব-স্মৃতি হয় বলিয়া তাঁহারা স্বতঃই সকলকে আদর ও প্রণতি করিয়া থাকেন। যাঁহাদের সর্বত্র ইষ্টস্মৃতি, সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে যাঁহারা ভগবানের সম্পর্কিত দর্শন করেন, জগৎকে যাঁহারা জগদীশের সেরোপকরণ বলিয়া জানেন, সকল বস্তুকেই তাঁহারা গুরুজ্ঞানে সেবাপূজা করেন। যিনি সেবক, তাঁহার সর্বত্রই সেব্য-সম্পর্ক-দৃষ্টি। যাঁহার হরিভক্তি আছে, তাঁহার অহিংসা-গুণ স্বাভাবিক। শ্রীনারদের কৃপাপাত্র জনৈক ভক্ত-ব্যাধের আচরণে আমরা তাহা দেখিতে পাই।

এতে ন হৃদ্ব্যথা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।

হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।। (স্কান্দ-বচন)

অর্থাৎ—হে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসাদি-গুণসমূহ কিছুই অদ্ভুত নহে। কারণ যাঁহারা হরিভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা কখনও পরপীড়ক হন না।

ভগবদ্ভক্ত জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে কখনও আদর করেন না। মায়াবশযোগ্য জীব কখনও মায়াবীশ ঈশ্বর হইতে পারে না। “জীবে সন্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান”—এই বিচারেই ভক্ত জীবকে আদর করিয়া থাকেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে জানাইয়াছেন,—

“পরমসিদ্ধানাঞ্চ ‘সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ’ (ভাঃ ১১।২।৪৭) ইত্যাদ্যনুসারেণ সিদ্ধ এব সঃ। তত্র সাধকানাং যত্ন ‘যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন’ (ভাঃ ৪।৩১।১৪) ইত্যাদৌ তদান্যোপাসনানাং পুনরুক্তত্বমুপলভ্যতে, তৎ পুনঃ কেবলস্বতন্ত্র-তত্ত্বদৃষ্টোপাসনানামেব। অত্র তু তত্ত্বদধিষ্ঠানক-ভগবদুপাসনমেব বিধীয়তে। তদাদরা-বশ্যকত্বঞ্চ তৎ সম্বন্ধেনৈব সম্পদ্যতে। তচ্চান্যত্র ঝটিতি রাগদ্বেষণিবৃত্তার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। অতএব কেবলভূতানুকম্পয়া শ্রীভগবদর্চনং ত্যক্তবতো ভরতস্যাস্তুরায়ঃ। তস্মাদ্ভূতদয়েব ভগবদভক্তির্মুখ্যা নার্চনমিতি নিরস্তম্।”

শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত হইয়া সহসা দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্বক যাঁহারা পরমহংস-অবস্থা লাভ করেন, তাঁহাদের নির্মাৎসরতা ও সর্বভূতে আদরই স্বাভাবিক ধর্ম হয়,—এই বিচার অনুসারেই পরমসিদ্ধ পুরুষগণে সর্বভূতের প্রতি আদর দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ যিনি সর্বভূতে বহির্দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া আত্মায়-চিহ্নিলাস শ্রীভগবানের

আবির্ভাব ও আত্মস্বরূপ শ্রীহরিতে চিহ্নিলাসোপকরণসমূহ দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম। বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচনের দ্বারা যেরূপ তাহার ক্ষুদ্র, শাখা, উপশাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রূপ অচ্যুত-সেবাতেই সর্বভূতের পূজা হয়; সুতরাং পৃথগ্ভাবে অন্যান্য প্রাণীর প্রতি আদর করিবার প্রয়োজন্য নাই। একরূপ স্থলে বক্তব্য এই যে— অন্যান্য প্রাণীতে অন্তর্যামী-ঈশ্বররূপে অধিষ্ঠানযুক্ত শ্রীভগবানেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে এবং ভগবৎ-সম্বন্ধেই অর্থাৎ নিজ উপাস্য হরিসম্বন্ধি-বস্তুজ্ঞানেই সেইসকল প্রাণীর প্রতি আদর করা একান্ত কর্তব্য। নিজ-ব্যতীত অপরাপর প্রাণীতে শীঘ্রই যাহাতে রাগ-দ্বেষের নিবৃত্তি ঘটে, তন্নিমিত্তই সেইরূপ আদর করা বিহিত বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব কেবল কৰ্ম্মাদি-বাসনাময় ভূতদয়া বা ভূতাদরবশে শ্রীভগবানের অর্চন পরিত্যাগ করিলে যে ভীষণ দুর্গতি হয়, তাহা প্রেমিক ভক্তবর জড়ভরত হরিণদেহ লাভ করিবার অভিনয়ের দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। জড়ভরত প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পতন বা ভগবৎপ্রাপ্তির অন্তরায় ঘটিতে পারে না; কিন্তু ভগবদ্ভক্তও যদি কেবলমাত্র প্রাণীর বহির্মুখ দেহের প্রতি আসক্তি-নিবন্ধন কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বিচার অনুসরণ করিয়া কাহারও দৈহিক ও মানসিক প্রীতিবিধানে ব্যস্ত হন এবং তজ্জন্য শ্রীভগবানের সেবায় শিথিলতা প্রদর্শন করেন, অথবা বহির্মুখ জীব-সেবাকে অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবা বলিয়া কল্পনা করেন, তবে তাঁহারও বন্ধন অনিবার্য্য। এইরূপ পরের আদর করিয়াও ভক্তিহীন হইলে পতন অবশ্যজ্ঞাবী। সুতরাং পরনিন্দার ত' কথাই নাই।

সাধুর কথা দূরে থাকুক, সাধারণ জীবকেও যাহারা অবজ্ঞা, নিন্দা বা হিংসা করে, সর্বান্তর্যামী শ্রীহরি তাহাদের পূজা গ্রহণ করেন না। বিশেষতঃ সাধুনিন্দার মত অপরাধ আর নাই। সাধারণ জীবের নিন্দা করিলেই ভগবান্ অসন্তুষ্ট হন, আর ভগবৎপ্রিয় সাধুর নিন্দা করিলে কি আর নিস্তার আছে? ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতা বা অন্য কাহারও নিন্দা করা উচিত নহে। শ্রীহরি সর্ব্বারাধ্য হইলেও ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ নিন্দা বা অবজ্ঞার পাত্র নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা করিয়া অন্যান্য শাস্ত্রের নিন্দা না করাই কর্তব্য। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ বলেন,—

গোপালং পূজয়েদ্ যস্ত নিন্দয়েদন্যদেবতাম্।

অস্ত্য তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোহপি নশ্যতি। (ভঃ সং ১০৫ সংখ্যা)

অর্থাৎ যিনি শ্রীগোপালের পূজা করেন অথচ অন্য দেবতার নিন্দা করেন, তাহার পরম-ধর্ম্ম লাভ দূরে থাকুক, পূর্ব্বধর্ম্মও বিনষ্ট হয়।

যো মাং সমর্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমশ্রিতম্।

বিনিদন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ (ভঃ সং ১০৫ সংখ্যা)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—ঐকান্তিকী ভক্তি আশ্রয় করিয়াও কেহ যদি মহাদেবের নিন্দা করিয়া আমাকে নিত্য পূজা করে, সে নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-স্তোত্র

চিন্তামণিপ্রকরসদ্যসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃত্তেষু সুরভীরতিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মী-সহস্রশত-সম্ভ্রম-সেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।১।।

‘চিন্তামণি’-শব্দে জড় চিন্তামণি নয়।
গোলোকের চিন্তামণি সুদুর্লভ হয়।।
জড় পঞ্চভূত-দ্বারে জগৎ গঠন।
চিৎ-চিন্তামণি-দ্বারে গোলোক রচন।।
হেন চিন্তামণি দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-আলয়।
রচিয়াছে চিচ্ছক্তি অপ্রাকৃতময়।।
সাধারণ কল্পবৃক্ষ ধর্ম-অর্থ-কাম।
মোক্ষরূপ তুচ্ছফল করয়ে প্রদান।।
কৃষ্ণালয়ে কল্পবৃক্ষ প্রেমরূপ ফল।
প্রদানি’ জীবের জন্ম করয়ে সফল।।
সাধারণ কাম-ধেনুগণেরে দোহিলে।
সেইক্ষণে দুগ্ধমাত্র তাহা হ’তে মিলে।।
কিন্তু শুন, গোলোকেতে কামধেনুগণ।
সাধারণ দুগ্ধ কভু না করে প্রদান।।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নাশকারী চিদানন্দ-স্রাবী।
প্রেম-প্রস্রবণ-রূপ দুগ্ধ ভক্ত লভি।।
হেন প্রেম-দুগ্ধ-সমুদ্রেতে ভক্তগণ।
পান স্নান করে সদা হ’য়ে নিগমন।।
প্রেমানন্দ দুগ্ধস্রাবী কামধেনুগণ।
কৃষ্ণচন্দ্র তথায় করয়ে পালন।।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীগণ যাঁহারে সেবয়।

(সেই) আদিপুরুষ গোবিন্দে ভজহ হিয়ায়।। ১।।

বেণুং ক্রনন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতান্মুদ-সুন্দরাক্ষম্।
কন্দর্পকোটী-কমনীয়-বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।২।।

জড়বস্তু-সম কৃষ্ণের রূপ নাই হয়।
জড়রূপ বিকৃতি হেয়-ধর্মময়।।

ভক্তিরূপ চিৎ-সমাধিতে ব্রহ্মা যাহা।
 হেরিলেন স্তব-কালে, গাহিলেন তাহা॥
 বেণু-গানে রত থাকি' সব চেতনেরে।
 রমণীয় স্বর-যোগে চিত্ত-বিভ হরে॥
 স্নিগ্ধতা বর্ষণ করে যেন পদ্মদল।
 সেইমত কৃষ্ণ দৃষ্টি করে নিরমল॥
 ময়ূরের পুচ্ছ আর শিরের ভূষণ।
 অপ্রাকৃত শোভা হয় অতি মনোরম॥
 নীলমেঘ-সম বর্ণ কৃষ্ণের শরীর।
 চিন্ময়-শ্যামল বলি' কহে সব ধীর॥
 কোটি কন্দর্পের রূপ একত্র করিলে।
 কৃষ্ণরূপ-সম নাহি হয় কোনকালে॥
 কোটি কোটি কন্দর্পেরে মোহয়ে যে রূপ।
 সেই ত' আদিপুরুষ গোবিন্দের রূপ॥
 অতি অপরূপ রূপ ভগবান্ যিনি।
 (সেই) আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দেরে ভজি আমি॥ ২॥

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ

বহুরূপী নাস্তিকতা-ব্যাদি ও তদুপশম-ব্যবস্থা

ভগবান্, জীব ও মায়া—এই তিন তত্ত্ব পারমার্থিক সত্য ও নিত্য হইলেও ভগবান্ই তিন তত্ত্বের মূল। এই তিন তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ ও সম্পর্কও নিত্য। ভগবানের নিত্যদাসত্ব বা সেবনবৃত্তিই জীব ও মায়ার স্বরূপগত ধর্ম। আদিসৃষ্টিতে তটস্থশক্তি জীব-সত্তা দুই প্রকারে পরিলক্ষিত হয়—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ অবস্থা। নিত্যমুক্তগণ নিত্যকাল শুদ্ধভাবে ভগবদ্বাক্যে অবস্থানপূর্বক ভগবৎ-পার্ষদরূপে তাঁহার সেবামগ্ন থাকেন। আর নিত্যবদ্ধগণ ভগবদ্বাক্য বিস্মৃত হইয়া জড়মায়া-সম্বন্ধপ্রযুক্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সেই অনন্ত জীবগণ যে চৌরাশী (৮৪) লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছেন শাস্ত্রে তাহার নিম্নরূপ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।—

“জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।

কুময়ো রুদ্রসংখ্যকা পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।

ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥”

জলজ প্রাণীরূপে নয় লক্ষবার, স্থাবর-জন্ম বিশ লক্ষ, কুমি-কীটরূপে এগার লক্ষবার, পক্ষী-জন্ম দশ লক্ষবার, পশুরূপে ত্রিশ লক্ষবার এবং মনুষ্য-জন্ম চারি লক্ষবার—এই ৮৪ লক্ষ জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহে অখিল ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বদ্ধ-জীবসমূহ প্রতিনিয়ত নিমজ্জিত হইতেছে।

মায়াবদ্ধজীবগণের চৌরাশীলক্ষ জন্মের ক্রমপর্যায় ব্যাখ্যামুখে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উক্তি,—

এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ। চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি। তার সমসৃক্ষ জীবের 'স্বরূপ' বিচারি॥
তার মধ্যে 'স্বাবর'-'জঙ্গম'—দুই ভেদ। জঙ্গমে তির্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর। তার মধ্যে স্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্ধেক বেদ মুখে মানে। বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে॥
ধর্মচারি-মধ্যে বহুত কস্মিনিষ্ঠ। কোটি-কস্মিনিষ্ঠ-মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি-জ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন মুক্ত। কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি 'অশান্ত'॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৩৮-১৪৯)

ভগবৎসৃষ্ট জীবগণের চেতনতার বিকাশক্রমে তাহাদিগকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে,—আচ্ছাদিত-চেতন, সঙ্কুচিত-চেতন, মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন ও পূর্ণ-বিকচিত-চেতন। ইহার মধ্যে স্বাবর-অচল পর্বত-বৃক্ষ-লতা ; জঙ্গম-সচল জলচর-স্থলচর-তির্যক্-কৃমি-কীট, পক্ষী এবং পশু ইত্যাদি আচ্ছাদিত ও সঙ্কুচিত-চেতনমধ্যে পরিগণিত। স্থলচরের মধ্যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবই অতি অল্পসংখ্যক, ইহারা ওয় প্রকার মুকুলিত-চেতন নামে অভিহিত। তন্মধ্যে অসভ্য, বন্য, স্লেচ্ছ, অন্তর্জ প্রভৃতি ব্যতীত যাহারা বৈদিক বা বেদানুগ বলিয়া অভিমান করেন, তাহাদেরও অনেকেই বেদনিষিদ্ধ কস্ম-জ্ঞান-যোগাদির অনুষ্ঠানপূর্বক নিরীশ্বর-নৈনৈতিক ও নিরীশ্বর-নৈতিক নামে অভিহিত হইয়া বাস্তব-ধর্ম হইতে চ্যুত। যাহারা সেশ্বর-নৈতিক, তাহারাই আন্তিক্যবাদী বা দৈবভাবাপন্ন ভক্ত-সম্প্রদায়, আর যাহারা নিরীশ্বরবাদী তাহারাই নাস্তিক; অভক্ত বা অসুর-স্বভাববিশিষ্ট। তাই শাস্ত্র নিবৃত্তি-প্রবৃত্তিমার্গ ও নিষ্কাম-সকামভেদে মানবশ্রেণীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।

বিষ্ণুভক্তো ভবেদৈব আসুরস্তদ্বিপর্যায়ঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

বিষ্ণুভক্তগণই নিষ্কাম বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেবভাবাপন্ন 'আস্তিক' এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ বিষ্ণুবিদ্বেষী কস্মী-জ্ঞানী-যোগীমাত্রই সকাম আসুরিক-স্বভাববিশিষ্ট 'নাস্তিক' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই শেষোক্ত বিষ্ণু-বিদ্বেষী বা বিদ্রোহাচরণ ব্যাপ্তি ও সমষ্টিগতভাবে জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অজ্ঞ, অল্পবুদ্ধি মানবের অনাশ্রিত অবস্থায় ধর্মের অননুষ্ঠান বা অজ্ঞতাপ্রসূত পাপাদি-ক্ষালনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু যাহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম-গ্রহণের ভাণ করিয়া সুস্থ মস্তিষ্কে সজ্ঞানে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া অপরাধের আবাহনপূর্বক চরমে অশেষ দুর্গতি বরণ করে, সেই নাস্তিকগণের উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া তাহারা জন্ম-মৃত্যুরূপ অপগতিই লাভ করে, সংসার বন্ধন-দশা হইতে নিজেদের চেষ্টাদ্বারা তাহারা কখনই মুক্ত হইতে পারে না। ফল কথা এই যে, ভগবদ্ভজন-বিরোধী যত প্রকার চিন্তাপ্রোত সকলই নাস্তিকতা এবং ইহাই নাস্তিক্যের চরম বিপর্যয় ও মৃত্যুবাণ-স্বরূপ। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে ঐরূপ বহুমুখী নাস্তিকতার তালিকা প্রদানপূর্বক তাহার

প্রতিকার বা উপশম-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। হরিকথা-শ্রবণ ও ভগবদ্ভজন-বিমুখ চারিপ্রকার সাধারণ নাস্তিকের তালিকা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে,— স্ব-বিড়্‌বরাহোষ্ট্র-খরৈঃ সংস্কৃতঃ পুরুষঃ পশুঃ।

ন যৎ কর্ণ-পথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ।। (ভাঃ ২।৩।১৯)

ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অপর সকল প্রকার বহিস্মুখ মানবই দ্বিপদ-নর-পশুতুল্য। গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের নাম যাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না, সেই সকল পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ গর্দভাদি পশু-সদৃশ ও তাহাদের সম্মানিত।

(ক) সারমেয়-কর্তৃক পূজিত ব্যক্তি।—কুকুর যেরূপ বিনা কারণেও বৃথা চীৎকার করিতে থাকে, কখনও রাস্তায় হাতী দেখিয়া অধিক জোরে ঘেউ ঘেউ করে, কখনও কুকুরী-কর্তৃক পদত্যাগিত হইয়াও তাহার সঙ্গ কামনা করে, সেইরূপ যাহারা বিনা কারণে সাধুগণকে দেখিলেই রাগিয়া উঠে, কামের বশে অসৎকথায় ও সাধুগণের নিন্দাতেই আনন্দবোধ করে, তাহারা এবং তাহাদের অনুগত ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্তের মুখে হরিকথা শ্রবণ বা তাহাদের কৃপা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় না।

(খ) বিষয়-বিষ্ঠা-ভক্ষণকারী শূকরের পূজ্য লৌকিক সম্মানের জন্য লালায়িত ব্যক্তি।—গ্রাম্য-শূকর সর্বদা বিষ্ঠাভোজন এবং কর্দমের মধ্যে ক্রীড়া করে। যাহারা জাগতিক শ্রেষ্ঠতা, সুখ ও মলিনতাকে সর্বদা লেপন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে, তাহারা সজ্জনগণের নিকট কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের গুণ ও প্রশংসা শুনিতে চাহে না।

(গ) উষ্ট্রের পূজ্য সংসার-ভোগে মত্ত ব্যক্তি।—উট কাঁটা, ঘাস খাইতে ভালবাসে। এমন কি, কাঁটাতে তাহার মুখ ক্ষত হইয়া রক্ত পড়িলেও সে কাঁটা খাওয়ার স্বভাব ও লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে না। ঐরূপ যাহাদের নানাপ্রকার কু-বিষয়ের কাঁটা ভক্ষণ করিবার স্বভাব, তাহাদের মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেলেও তাহারা নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহাদের নিকট বিষয়-কথাই পরম সুখকর খাদ্য এবং সাধু-শাস্ত্র-কীর্তিত মঙ্গলময়ী হরিকথা তিক্ত বলিয়া বোধ হয়।

(ঘ) শাস্ত্রের ভারবাহী গর্দভের পূজ্য পণ্ডিতাভিমानी ব্যক্তি।—গর্দভ নিজের পৃষ্ঠে অনেক চিনির বস্তা বহন করে বটে, কিন্তু চিনির স্বাদ কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। ঐরূপ ধোপার পালিত পশুরূপেও লোকের মলিন বস্ত্রের ভার বহন করে। সেইরূপ যাহারা বহু শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াও শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য বিষ্ণু-ভক্তির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, অথবা যাহারা প্রায়শ্চিত্তাদি কর্মকাণ্ডীয় ব্যবস্থাপকগণের অনুগত হইয়া লোকের পাপমলিন-বসন অর্থাৎ লোকের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাবরণের মলিনতার বোঝাই শুধু বহন করে, তাহাদের পরমকল্যাণপ্রদ হরিকথা শ্রবণের আদৌ রুচি হয় না।

(ক) করীন্দ্রে ভ্রাজমানেহপি স্তুয়মানে সুপুরুষৈঃ।

বুদ্ধি সারমেয়াশ্চেৎ কা ক্ষতিস্তস্য জায়তে?? (শ্রীসিদ্ধান্তদর্পণম্ ৮।১)

হস্তি চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার।

সাধুনকো দুর্ভাবনা নহি যো নিন্দে সংসার।। (শ্রীতুলসীদাস)

—ইত্যাদি শাস্ত্র ও মহাজন বাক্যানুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, করীন্দ্ররূপী সজ্জন পথচারীর প্রতি কামুক মাৎসর্য্য-পরায়ণ সারমেয়তুল্য দুর্জনগণের কদর্য্য-রব বা বৃথা সমালোচনা কখনই কার্য্যকরী হয় না ও ইহা দ্বারা তাহাদের স্ব-স্ব অসৎস্বভাবই

ব্যক্ত হইয়া পড়ে। কুকুরের বৃথা চীৎকার যেরূপ ভীতিজনিত স্বাভাবিক দুর্বলতা ও অসৌজন্যের পরিচায়ক, তদ্রূপ সজ্জন-বিদেষী মৎসরগণের বৃথা সমালোচনা বা মন্তব্য-প্রকাশকে তাহাদের বহুপুষ্ট অসৎ-প্রবৃত্তির উদ্দীপনা জানিয়া ভক্তবৃন্দ তাহাতে আদৌ আশ্রয় করেন না। “Barking creatures seldom bite”—ইহা তাঁহারা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। আয়ুক্ষয় ও মূল্যবান সময় নষ্ট হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাণহানিরও সম্ভাবনা থাকে। নীতিশাস্ত্রে বর্ণিত রজকের পালিত কুকুরের লগুড়াঘাতে মৃত্যুই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সারমেয়-তুল্য ব্যক্তিগণ প্রাকৃতদৃষ্টিতে নিষ্কাম ভক্তের বহুড়ম্বর দেখিতে না পাইয়া তাঁহাদিগকে অলস, পরমুখাপেক্ষী, সমাজের পরগাছা ভাবিয়া নিজেদের অশাস্ত্রীয় কর্মের দুস্পার স্পৃহা ও বাহাদুরি খ্যাপন করেন। কাণাকড়ি-স্বর্কস্ব কন্মিগণ নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সর্বদাই—“out of breath for no purpose and very busy about nothing.” ঐরূপ বৃথা কর্মব্যস্ততা যে তাহাদের নিজেদের ও জগতের কোন ভাবী সুফল ও মঙ্গল প্রসার করিবে না, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অহর্নিশ কামলা-রোগীর ন্যায় স্থায়ী ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা ও চিন্তাস্রোতানুসারে সমগ্র বিশ্বকে তাহাদের ভোগের উপকরণ মনে করিয়া তাহাতেই ধাবিত হয়। এই সকল ভোগী কর্ম-জড়গণকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র তুলনামূলক বিচার করিয়াছেন,—“নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ। জগদ্ধনময়ং লুপ্তা কামুকাঃ কামিনীময়ম্।” ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া তাহারা কালযাপনপূর্বক নিজেদের বিচারকে বহুমানন করে।

(খ) গ্রাম্য-শূকর যেরূপ কদর্ম-লিপ্তাবস্থায় বিষ্ঠাভোজী হইয়া তাহার স্ত্রী শাবকগণসহ বংশবৃদ্ধি-কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, তদ্রূপ বিষয়-বিষ্ঠাভোজী দুর্জ্ঞানগণও পরিণামে দুঃখজনক মৈথুনাди-ক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া সাংসারিক অনিত্য সুখ ও মলিনতাকেই আশ্রয় করত গৃহব্রত বা গৃহমেধী হইয়া পড়ে। তাহারা মায়ার বৈভব জড়ীয় প্রতিষ্ঠালাভ করত তুচ্ছ বিষয়-সুখ উপভোগে ব্যস্ত বলিয়া ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রশংসা ও মহিমা তাহাদের নিকট অস্বস্তিকর বোধ হয়। বিষয়িগণের পরম আদৃত সংস্পর্শজনিত স্ত্রী-সঙ্গরূপ সুখের স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয়ঃ এব তে।

আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ (গীঃ ৫।২১)

জগতের আপাত সুখমত্ত বিষয়িগণের ভোগের পরিণাম সম্বন্ধে ইন্দ্রের শুকরযোনি-প্রাপ্তি ও ব্রহ্মা-কর্তৃক তদদশা হইতে মুক্তি-প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে,—

স্বর্গের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রের গুরু বৃহস্পতি একদিন ইন্দ্রকে উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত স্বর্গে গমন করেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা-পূজাদি না করিয়া অঙ্গরাগণের সহিত নৃত্য-গীতাদিতে মত্ত রহিলেন। অতিথি-স্থানীয় ব্রাহ্মণ-গুরুর পূজার পরিবর্তে স্ত্রী-সন্তোষাদি তুচ্ছ বিষয়ে প্রমত্ত থাকায় ইন্দ্রের শুকরযোনি লাভ হইল। তুলনা করিলে স্বর্গের রাজা ও গ্রাম্য-শূকরে বিষয়ে-সুখ একইরূপ।—“সেই পুণ্যে, সেই পাপে করে বিষয়-ভোগ।” ইন্দ্রের কামনানুসারে তাহার বিষয়-ভোগই জুটিয়া গেল। শূকর-দেহ লাভ করিয়া ইন্দ্র একটা শূকরীর সহিত মিলিত হওয়ায় কতকগুলি শাবক হইল। এইরূপে সকলে একত্র মিলিত হইয়া বিষ্ঠা-ভোজনাদিরূপ পার্থিব তুচ্ছ সুখকেই একমাত্র কাম্য জানিয়া বিষ্ঠা-কদর্মাক্ত গৃহের কর্তা বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

দেবরাজ ইন্দ্রের এইরূপ দুর্দশা দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী ব্রহ্মা শূকররূপী সেই ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—“হে ইন্দ্র! তুমি ত’ স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর! তুমি তথাকার অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা-ভোজনে লিপ্ত হইয়াছ কেন এবং এই ক্রোধপূর্ণ স্থানই কি তোমার বাসযোগ্য?” ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে শূকর তাহাকে শত্রুজ্ঞানে আক্রমণ করিল। ব্রহ্মা কোনমতেই শূকরকে তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে উদ্ধুদ্ধ করিতে পারিলেন না। কারণ সে বিষ্ঠাভোজন, সন্তানাদিসহ শূকরীর সঙ্গসুখকেই তাহার ধর্ম-কর্ম এবং তাহার আত্মীয়স্বজনে পরিপূর্ণ ক্রোধলিপ্ত স্থানকে শাস্তিময় স্বদেশ জ্ঞান করিয়া তাহাতেই মসৃণ ও দরদী হইয়া উহার উন্নতি-সাধনেই ব্যস্ত। শূকররূপী ইন্দ্র দুঃখপূর্ণ ইন্দ্রিয়-সুখে মত্ত হইয়া তাহার স্বরূপ ও স্বদেশ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিতেছে না দেখিয়া ব্রহ্মা একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি স্বরূপোপলব্ধি ও নিত্যসুখের ব্যাঘাতজনক মায়িক আসক্তির বস্তুগুলিকে নষ্ট করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন, শূকরের শাবকগুলি এবং পরে শূকরীকেও চিরতরে জগৎ হইতে অপসারিত করিলেন। শাবক ও শূকরীর মৃত্যুকালে শূকরের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, সে করুণস্বরে চীৎকার করিতে করিতে মঙ্গলময় ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিল। অবশেষে স্বজনশূন্য অবস্থায় নিরাশ্রয় হইয়া সেই শূকর তাহার বিপদকালে মধুসূদনের শরণাপন্ন হইল। তখন ব্রহ্মার কথায় আত্মস্থাপন-পূর্বক সে জানিতে পারিল যে, শূকরদেহ তাহার নিত্যদেহ বা স্বরূপ নহে, সে নিত্য-স্বরূপে ভগবদ্দাস ইন্দ্র এবং ভগবদাজ্ঞায় স্বর্গরাজ্য-পালনই তাহার কর্তব্য ও ধর্ম। এইরূপে ব্রহ্মার কৃপায় ইন্দ্র শূকরযোনি হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন।

পরদুঃখকাতর বৈষ্ণব ও সদ্গুরু অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণের ত্রিতাপক্লেশ দূরীকরণে অকপটভাবে চেষ্টাশ্রিত হইলেও, স্বরূপভ্রান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীব নিত্য-স্বরূপের উদ্বোধক কৃষ্ণভক্তিপর হরিকথা শ্রবণে প্রাজ্ঞ হইয়া মঙ্গলকামী উপদেশদাতাকে শত্রুজ্ঞান করে। অনভিজ্ঞ জনসাধারণ গণমতের যাহা ভাল লাগে তাহাতে সায় দিয়া ভ্রান্ত ধারণা পোষণ-পূর্বক বাস্তব সত্য-প্রচারকগণকে শত্রু ও তাহাদের নিত্য-স্বাস্থ্যলাভের অনুকূল ভগবৎ-কথা প্রচারকে হিংসা বলিয়া মনে করে।

জগতের সকলপ্রকার বিপদাপদই পরমার্থ-পথে আমাদের মঙ্গললাভের সুবর্ণ সুযোগ। এইরূপ বিপদ-পাতকে ভক্তগণ ভজনের সহায়ক বিবেচনা করেন। ইহাকে কখনই ভগবানের নির্দয়তা বা ক্রুরতা মনে করা উচিত নয়। আমরা জাগতিক সকলপ্রকার সম্বল বা আশ্রয়শূন্য হইলেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা ভগবানের কথায় শ্রদ্ধালাভ করি ও নিষ্কপটে বলিতে পারি—“নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।” জাগতিক কৌলিন্য, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্যের অভিমানে মত্ত থাকিলে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে পরহিতব্রত সাধুর কথায় কর্ণপাত করিতে ইচ্ছা হয় না। শরণাগত জীবই সদ্গুরুর নিকট হইতে তাহার নিত্যস্বরূপের ও নিত্যস্বদেশের কথা জানিতে পারেন। জাগতিক সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি-চেষ্টা নিত্যধর্ম নহে, বরং উহা স্বরূপ-বিরোধী। একমাত্র হরিকথা ও ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখকর যাবতীয় বিষয়-চেষ্টা বিষ্ঠায় বিহার মাত্র।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবৈদ্য বামন গোস্বামী মহারাজ

পরমার্থ

প্রয়োজন অনুসারে কার্য বা কর্তব্য নির্ধারিত হইয়া থাকে। প্রয়োজনের ভিন্নতায় কর্তব্যও ভিন্নভাবে আচরিত হয়। মায়িক জগতের অধিবাসী মায়াগ্রস্ত হইয়া মিথ্যাভিনিবেশ হেতু যে-প্রকার দেহে যুক্ত হয় সেই দেহকে অহংবুদ্ধি করত দেহের সুখ বা প্রীতিকেই কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে। মনুষ্যের প্রাণী দূরের কথা, মনুষ্যদেহ ধারণ করত নানাবিধ বিষয়ে উন্নত জ্ঞানী ব্যক্তিও এই দেহসুখকেই চরম প্রয়োজনজ্ঞানে ছুটিতেছে। এই দেহসুখকে লক্ষ্য করিয়া নানাদেশে নানাপ্রকার সমাজব্যবস্থা প্রচলিত। এই দেহের সুখলাভার্থে আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি বিষয়ক কত না কত উন্নত ব্যবস্থা বা আবিষ্কার করিয়া নিজকে উন্নত ও স্বদেশের উন্নতি বলিয়া মনে করে। ‘Eat drink and be merry’—এই প্রবাদবাক্যটি তত্ত্বদেশে সর্বোচ্চ আদরণীয়। ভারতেও এই শ্রেণীর লোককে চার্বাকপন্থী বলে। তাহাদের মতে—“ঋণং কৃতা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবৎ সুখং জীবৎ।” কিন্তু এই বিচার মনুষ্যের প্রাণীতেও একমাত্র বর্তমান। এতদ্ব্যতীত তাহারা অন্য কিছুই প্রয়োজনবোধ করে না। তজ্জন্য এই বিচারকে পশুধর্ম বা পশ্বাচার বলিয়া আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতীয় বিজ্ঞব্যক্তিগণ বলেন,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নাগাম্।

ধর্মো হি তেযামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

বর্তমানকালে ভারতবর্ষভূত দেশকে উন্নত বলা হইতেছে এবং তাহাদের আদর্শে ভারত পরিবর্তন সাধন করত উন্নত হইতেছে ও হইয়াছে বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে। আকাশচুম্বী অট্টালিকা, তাহাতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, বিলাসবহুল শয্যা ও আসবাবপত্রকে উন্নতি না বলিলে মূর্থ ও অজ্ঞানী বলিয়া বিবেচিত হইতে হইবে না কি? সুপ্রশস্ত সমতল মসৃণ সরণী, দুইপার্শ্বে মনোরম পুষ্প ও ছায়াসংযুক্ত বৃক্ষলতার সংযোগ এবং তাহাতে অত্যন্ত বেগশালী যানবাহন, আকাশপথে অত্যন্ত সময়ের মধ্যে সুদূরবর্তী দেশবিদেশে গমনাগমন, এমন কি দুই একদিনে সারা পৃথিবী পরিক্রমা, সর্বোচ্চ দ্রুতগামী রকেটকে উন্নতি না বলিলে শাস্তিযোগ্য হইতে হইবে, সত্যের অপলাপ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এককথায়, যাহা মনুষ্যের ইন্দ্রিয়তর্পণকর তাহাই উন্নতি—এই ধারণাই বর্তমান বিশ্বে তথা ভারতেও প্রবল। ইন্দ্রিয়সুখের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রধান মৈথুন্য বা যৌনসুখ—ইহা অনস্বীকার্য। ইহা অনুন্নত ও সর্বোচ্চ জড়দশাপ্রাপ্ত প্রাণীতেও লক্ষিত বা আদৃত হয়। ইহাকে অনাদর করা কি-প্রকারে উন্নতি হইতে পারে, তাহা ধারণাতীত। গ্রাসাচ্ছাদন-বিষয়ক উন্নতির বিচার ত্যাগ করিলেও যৌনসুখচেষ্টা ত্যাগ করিলে মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কি?—ইহাই অধিকাংশ ব্যক্তির ধারণাতীত।

পরন্তু পরমার্থ-লাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে এই যৌষিৎসঙ্গ সর্বোচ্চ প্রতিবন্ধক। এই যৌষিৎসঙ্গের নিন্দা ও বর্জন সর্বশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। এমন কি, স্ত্রীসঙ্গী-সঙ্গকেও নরকের দ্বার বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত দেখা যায়।—

“মহৎসেবাং দ্বারমাত্ত্বির্মুক্তোস্তমোদ্বারং যৌষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।” (ভাঃ ৫।৫।২)—
অর্থাৎ মহতের সেবাদ্বারা প্রেমভক্তি লাভ হয়, আর স্ত্রীসঙ্গকারীর সঙ্গফলে নরকগমন ঘটে।

“নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্বসাগরস্য।

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু।।”

অর্থাৎ মুক্তিকামী ও ভগবদ্ভজনেচ্ছুর পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রীসন্দর্শন বিষপান অপেক্ষাও ক্ষতিকারক। এই প্রবৃত্তিকে বিদমিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন।—

“যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং কণ্ডুয়ত্নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।

তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ কণ্ডুতিবগ্ননসিজং বিষহেত ধীরঃ।।

(ভাঃ ৭।৯।৪৫)

গৃহমেধিগণের স্ত্রীসঙ্গজনিত সুখ অতীব তুচ্ছ, দ্রব বা চুলকনায়ুক্ত করদ্বয় সংঘর্ষণ-কালে দুঃখকে সুখবৎ অনুভূত হইলেও তাহা বাস্তব অত্যন্ত দুঃখ। কামুক ব্যক্তিগণ বহুদুঃখভোগ করিয়াও ঐ যৌনসুখে পরিতৃপ্ত হয় না। অতএব ধীর ব্যক্তি ঐ সুখপ্রবৃত্তিকে দমন করিবেন।

স্ত্রীসঙ্গ যদি এত অহিতকর ও তুচ্ছ হয়, তবে শাস্ত্রে বিবাহ করিবার বিধি কেন প্রদত্ত হইয়াছে? এতদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—ইহা বিধি নহে, ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। যাহারা পশুতুল্য বিবেকহীন ও কামাসক্ত মনুষ্য, তাহাদের সেই অধিকার হইতে উন্নীত করিবার জন্য শাস্ত্র তাহাদিগকে বিবাহ করত ক্রমশঃ ঐ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করাইবার জন্য এই বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ঐ বিবাহিত ব্যক্তিকে তজ্জন্য ৫০ বৎসর অতীত হইলে, বাণপ্রস্থ অবলম্বন করত স্ত্রীসঙ্গ বর্জিত করিতে আদেশ বা বিধি দিয়াছেন। আরও মনুষ্যকে অবশ্যই বিবাহ করিতে হইবে—এরূপ বিধি শাস্ত্রে নাই। সকল মনুষ্যকে—ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগকে অবশ্য বিবাহ করিতে হইবে বলা হয় নাই। বিবাহ না করিলে সকলের দোষ হইবে বলা হয় নাই। পরন্তু বিবাহ বর্জিত করত ভগবদুপাসনা করাই শাস্ত্রের উপদেশ। যথা—

লোকে ব্যবয়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্ত জন্তোনহি তত্র চোদনা।

ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা।। (ভাঃ ১১।৫।১১)

জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ ভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতির প্রবৃত্তি সকল প্রাণীরই নিত্য অর্থাৎ তত্তদ্বিষয়ে প্রাণীদিগের স্বাভাবিক আসক্তি আছে। শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা অপালনে প্রত্যবায় বা দোষ নাই। এই প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তির জন্য বিবাহাদির ব্যবস্থা।

ভারতে প্রচলিত বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিই ভোগবাদকেই প্রধান ও মুখ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। বহির্দেশের দুঃসঙ্গই ইহার কারণ। ভোগপ্রবণ দেশের সংসর্গে ভারতের পারমার্থিক শ্রেষ্ঠতা ও প্রয়োজনবোধ বিনষ্ট হইয়াছে। বিদেশীয় চিন্তাধারায় মোহিত ও আক্রান্ত হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেইজন্য বহির্দেশের অনুকরণে ভারত আজ গব্ব অনুভব করে। ইহাই স্বাধীনতার সুফল বলে মনে করে। স্বীয় দেশীয় বিজ্ঞানকে পদদলিত করিয়া বিদেশীয় বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। যৌনসুখকেই পরম উন্নতি জ্ঞান করত তদনুকূল ব্যবস্থা সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে। বর্তমান ভারতীয় স্ত্রীজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা অনুভূত হইয়া থাকে।

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী—এই পঞ্চকন্যা এবং সতী সাবিত্রীর আদর্শ অনাদৃত ও বর্জিত হইয়াছে। ‘লজ্জা নারীণাং ভূষণম্’ স্থলে ‘লজ্জা নারীণাং

দূষণম্’ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সিনেমার অভিনেত্রীগণ বর্তমান স্ত্রীজাতির আদর্শস্থানীয় হইয়াছে। ‘পরদারেষু মাতৃবৎ’-বাক্য এক্ষণে অরুচিকর, অর্থাৎ ‘মা’ বলিয়া সম্বোধন করিলে অনেকেই বিরক্ত হইবেন, পরিবর্তে ‘বৌদি’-সম্বোধন আনন্দদায়ক হইয়াছে। নারীদের যোগ্যতা থাকুক বা নাই থাকুক সর্বক্ষেত্রে তাহাদের জন্য নিয়োগ ব্যবস্থার সংরক্ষণ আছে।

উদ্ধারোহণ বড়ই কষ্টসাধ্য, কিন্তু অধঃপতন সহজসাধ্য ব্যাপার। এই কারণে দুঃসঙ্গজনিত ভারতের এই অধঃপতন এত অল্পকালমধ্যেই সংঘটিত হইয়াছে। এতদূর অধঃপাত হইতে স্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ভারত নিজকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার মাহাত্ম্য কি তাহা সে এখন ভাবিতেও অক্ষম। পরন্তু বহির্দেশীয় বিজ্ঞানীগণ ভারতের মহত্ত্ব নিষ্কপটে কীর্তন করিতেছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক Victor Cousin লিখিয়াছেন,—“The Upanishads contain truths so profound that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the east and to see this, the native land of the highest philosophy.” অর্থাৎ, উপনিষদেই সুগভীর বাস্তব সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, যে জন্য আমরা প্রাচ্যের এই দর্শনের নিকট নতজানু হইয়া প্রণাম করি এবং যে দেশে এই সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনের জন্ম, সেই দেশকে দর্শন করিতে অভিলষী।

বর্তমান ভারতের বিচার—‘ধর্ম ধর্ম করিয়া ভারতের অধঃপতন হইয়াছে। তজ্জন্য ধর্মান্ধ্রিত ব্যক্তিকে কর্তৃত্বে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। নিজের নাক কাটিয়াও পরের যাত্রা ভঙ্গ করিতে হইবে।’ ইহাই বর্তমান রাজনীতিক্ষেত্রে প্রকটিত চিত্র। সুতরাং বর্তমান ভারত পরমার্থ কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। শান্তির জন্য, এমনকি বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টাও ভুল পথে ধাবিত হইতেছে। Disarmament conference, Sitting of league of nations, Free trade plan গুলিও অব্যর্থকায় পর্য্যবসিত হইতেছে। কিন্তু সনাতন ধর্মের উপনিষদ কোন পথে শান্তিলাভ তাহা জানাইয়াছেন।—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাশ্চেষাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্॥

(কঠ ২।২।১৩)

আত্মস্থ ভগবান্ই সকলের মূল এবং কামনা পূরণকারী ও শান্তিদাতা। যাহারা তাহাকে নিরন্তর সেবা করেন তাহারাই চিরশান্তি লাভ করেন। অন্য পথে শান্তিলাভ হইবে না। ‘তস্মিন্দ্রষ্টে জগদ্রুষ্টং’ বাক্যেও তাহাই প্রমাণিত।

সুতরাং ধর্ম বা ভগবৎসেবাই মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল। ধর্ম ব্যতীত মঙ্গল নাই। তাই বলিয়া ধর্মোন্মাদনাকে প্রকৃত ধর্মজ্ঞান করা সঙ্গত নহে। ধর্মোন্মাদনা এবং ভগবৎপ্রেম একবস্তু নহে। প্রেমেই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সাম্যবাদ সম্ভব। তাহাতেই বিশ্বশান্তি বিরাজিত।

সনাতন ধর্মশাস্ত্র তথা ভারতীয় দর্শন ভগবদ্ভক্তিকেই পরমার্থ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। “ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।” (মাঠর শ্রুতি)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ (ভাঃ ১।২।৬)

যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাतीত শ্রীকৃষ্ণেঃ শ্রবণাদি লক্ষণা ফলাভিসন্ধানরহিত ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষ ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই ভক্তিবলে আত্মা সুষ্ঠুরূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

শ্রীভগবানে এই ভক্তিযোগ নাম-সঙ্কীর্ণনযোগেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।—

এতাবানৈব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্মাম-গ্রহণাদিভিঃ ॥ (ভাঃ ৬।৩।২২)

অর্থাৎ নাম-সঙ্কীর্ণনযোগে ভগবানে যে ভক্তিযোগ তাহাই এ জগতে জীবের পরমধর্ম বলিয়া কথিত হয়। স্বনামধন্য প্রেমিক ভক্ত শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীর্ণনের মাধুর্য্য সম্যক্ আশ্বাদন করত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যকৃত্য, ত্রিসন্ধ্যাগান ও দেব-পিত্রাদির তর্পণকৃত্যের প্রতি বিরমিত হইয়া যাদব-শিরোমণি কংস-বিনাশী শ্রীকৃষ্ণনাম যে কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া স্মারজনিতভাবে তন্ময়তাদ্বারা অখিলকাল অতিবাহিত করি, অন্য সকল ক্রিয়া স্তব্ধ হউক।—

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্ত ভবতে ভো স্নান তুভ্যং নমো

ভো দেবাপিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।

যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ

স্মারং স্মারমঘং নয়ামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ॥

শ্রীযমরাজ আরও বলিয়াছেন—“এবং বিমৃশ্য সুধীয়ো ভগবত্যানন্তে সর্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্। তে মে ন দণ্ডমহর্ত্ত্যথ যদমীষাং স্যাৎ পাতকং তদপি হস্ত্যরুণায়বাদঃ ॥”

অর্থাৎ যাঁহারা সুবুদ্ধিবিশিষ্ট তাঁহারা এই সমস্ত বাক্য বিচারপূর্ব্বক অনন্ত ভগবানে ‘ভাবযোগ’ বিধান করেন। এই ভাবযোগ অর্থাৎ ভাবভক্তিই প্রেমভক্তিরূপে সর্বোত্তম পরমার্থ।

স্বীসঙ্গ বর্জন করাই পরমার্থ নহে। পরন্তু তাহা পরমার্থের প্রধান অনুকূল কৃত্য। পরমার্থ বলিতে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানকেই লক্ষ্য করে। নিজসুখচেষ্টা কাম এবং কৃষ্ণসুখচেষ্টা প্রেম বা পরমার্থ। পরন্তু প্রতিপক্ষের বিচার,—ভগবান্ সুখময় তত্ত্ব। তাঁহার সুখাভাব নাই। তিনিই সকলের সুখদাতা। এক্ষেত্রে তাঁহাকে সুখদানচেষ্টা অসঙ্গত ব্যাপার। বিষয়টি জটিল। ভগবান্ সুখময় হইলেও তিনি প্রেমের কাম্পাল। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্যশিখিল প্রেমে নহে মোর প্রীত ॥

আমারে ঈশ্বর মানে, আপনারে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি। এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥

আপনাকে বড় মানে, আমারে সম হীন। সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। অতি হীনজ্ঞানে করে লালন পালন ॥

সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন্ বড়লোক—তুমি আমি সম ॥

প্রিয়া যদি মান করি’ করয়ে ভৎসন। বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥

বিশেষতঃ কলিকালে হরিনাম ব্যতীত অন্য কোনও উপায় বা পথ নাই—ইহাই শাস্ত্রের বিচার।

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
ইতি ষোড়শকং নান্নাং কলিকল্মষনাশকম্।

নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে॥ (কলিসস্তুরণোপনিষৎ)

প্রবন্ধের পরিসমাপ্তিতে পরমার্থের পরাকাষ্ঠা নির্ণয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীই একমাত্র উল্লেখ্য। কোন শাস্ত্রে, কোন ধর্মে, কোন দেশে এতদপেক্ষা কোন উন্নততর ধারণা অদ্যাবধি দৃষ্ট হয় না। এই ভারত ব্যতীত পৃথিবীর কোন স্থানে ইহার মাহাত্ম্যের অনুশীলন নাই বলিয়াই মহাপ্রভুর প্রতি মহাবদান্য ও অনর্পিতচরীং চিরাৎ বাক্যগুলির প্রযুক্তি। ভারতের মধ্যে গৌড়দেশে ইহার আবির্ভাব হওয়ায় এই দেশই সর্বাধিকরূপে ধন্য বুঝিতে হইবে। ইহার অনুশীলন সাধারণ মনুষ্য বিশেষতঃ ভোগ-ত্যাগপ্রবণ অথবা অদ্বৈতসিদ্ধিপ্রাপ্তদিগের সুদূরপর্যন্ত। শ্রীকৃষ্ণভক্তের প্রতি এইরূপ ভাবজনিত সম্বন্ধই জীবের পরমার্থের পরাকাষ্ঠা।—

“আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনাম্মহতাং করোতু বা।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ (শিক্ষাষ্টক ৮)

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন অথবা অদর্শনদ্বারা মর্ম্মাহত করুন, সেই লম্পট তাঁহার ইচ্ছামত যথেষ্ট আচরণ করুন না কেন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহ নহে।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত্রিবিক্রম মহারাজ

স্মরণ

নববিধা ভক্তির অন্যতম প্রধান অঙ্গ ‘স্মরণ’। ‘স্মৃ’ ভাবে ‘অনট্’ প্রত্যয় করিয়া ‘স্মরণ’-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘স্মরণ’ বলিতে সাধারণতঃ স্মৃতি, পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান, মনন, চিন্তন প্রভৃতি বুঝায়। ইহজগতে অনেকস্থলে যে ‘স্মরণ’-শব্দের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কিন্তু ‘স্মরণ’ পদবাচ্য নহে; যেহেতু তদ্বারা কাহারও নিত্যমঙ্গল লাভ সম্ভবপর নয়। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে জগচ্চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির চিন্তনের নামই ‘স্মরণ’। শাস্ত্র ‘স্মরণে’র সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

সর্বত্র পরিপূর্ণস্য পরমানন্দবারিধেঃ।

রূপ-সঞ্চিস্তনং বিবেগ স্মরণং পরিকীর্তিতম্॥

(হরিভক্তিকল্পলতিকা ৬।১)

“সর্বাবস্থায় পরিপূর্ণ, পরমানন্দ-বারিধি-স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর রূপ চিন্তনই ‘স্মরণ’ নামে পরিকীর্তিত হইয়া থাকে।”

তৎপ্রাপ্তিসিদ্ধমন্ত্রাণাং স্বরূপাণাং মুরদ্বিষঃ।

মনসা চিন্তনং নান্নাং স্মরণং কেচিদুচিরে॥ (হঃ ভঃ কঃ লঃ ৬।২)

“কেহ কেহ মনদ্বারা মুরদ্বিষ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ, তদীয় প্রাপ্তি-বিষয়ে সিদ্ধমন্ত্রসমূহ ও তাঁহার নামসমূহের চিন্তনকে ‘স্মরণ’ বলিয়া থাকেন।” “সর্বধর্ম্মনিষ্ঠয়া রাগদ্বৈষাদি-নিবৃত্ত্যা স্মরণম্” অর্থাৎ “স্বধর্ম্মনিষ্ঠাদ্বারা রাগদ্বৈষাদির অপগম হইলেই স্মরণ হয়।”

স্মরণ পঞ্চবিধ—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি। যৎকিঞ্চিৎ মনন বা অনুসন্ধানের নাম ‘স্মরণ’। বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণপূর্বক সামান্যাকারে মনোধারণের নাম ‘ধারণা’। বিশেষরূপে রূপাদির চিন্তনের নাম ‘ধ্যান’। অমৃতধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম ‘ধ্রুবানুস্মৃতি’ এবং ধ্যেয়বস্তুর স্মৃতির নাম ‘সমাধি’। স্মৃতি ও ধ্যানের ভেদ এই যে, স্মৃতিতে নাম, রূপ, গুণ, লীলা, মন্ত্রাদির কথঞ্চিৎ উদয় হয়; আর ধ্যানে রূপ, গুণ, লীলাদির সুষ্ঠুরূপে চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে গাঢ় করিতে পারিলে ‘নিদিধ্যাসন’ হয়। ধ্যানকে দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখার নাম ‘ধারণা’। অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকে ক্রোড়ীভূত করিয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুস্মরণই—মুখ্যবিধি ও সর্বমঙ্গলের আকর

কৃষ্ণমায়ায় বিমুক্ত কর্তৃত্বাভিমानी জীব কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা ভুলিয়া গিয়াছে। মঙ্গলময় ভগবানের বিস্মৃতির জন্য অমঙ্গলসমূহ তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে হরিসেবোন্মুখতা তাহার স্মৃতিপথে উদয় হয়, তখনই তাহার সকল অমঙ্গল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ত্রিগুণসেবারহিত হইয়া তাহার ভজনীয় ভগবানের সেবাপ্রবৃত্তি উদয় হয়।

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।

সর্বের বিধিনিষেধাঃ সুরেত্যয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

“ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র সর্বদা স্মর্তব্য, কখনই তাঁহাকে বিস্মরণ হওয়া উচিত নয় অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুস্মরণই মুখ্য বিধি ও শ্রীবিষ্ণুবিস্মরণই মুখ্য নিষেধ।” বিষ্ণুস্মৃতি-বিহীন স্থানগুলিই পাপস্থান নামে অভিহিত। সেই স্থানই অবর-যোনিপ্রাপ্ত ভূত, প্রেত, ডাকিনী প্রভৃতির বসতিস্থল। জীব যখন কফ, শুক্র, শোণিতধারার চর্ম্মময় কোষরূপ এই স্থূলদেহে বিচিত্র জড়রসাস্বাদনার্থ পরম উৎসাহভরে রত হন, তখনই চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে অলসতা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে। যিনি স্ত্রীদর্শন ও তদ্বিষয়ক শ্রবণ-স্মরণাদি হইতে বিরত হইয়াছেন, তাহারই মন শ্রীকৃষ্ণচরণে নিশ্চল হইয়া শান্ত হয়।

যেখানে নারায়ণ-স্মৃতি চরম ফল নহে, সেখানে সাংখ্যশাস্ত্র আত্মানাত্মবিবেকে অসমর্থ, সেবনোপযোগী ভগবৎসান্নিধ্যে যোগশাস্ত্র অসমর্থ। স্বধর্মাচরণরূপ নারায়ণস্মৃতির অভাবে নাস্তিক্যের প্রত্যক্ষবাদের আচরণ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। নারায়ণ-স্মরণ-তাৎপর্য্য রহিত হইয়া যে বিষয়-ভোগপ্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমূলে কল্লিত সাধনপ্রণালী তাহা কখনই সর্বানন্দময় নহে। শ্রীভাগবত (২।১।৬) “এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং” শ্লোকে জন্মান্তে নারায়ণ-স্মৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্যবস্তুর বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। যাঁহারা ভক্তিসহকারে শ্রীহরির গুণাবলী সর্বদা স্মরণ করেন, তাঁহাদিগের কলুষরাষিপ্রকৃষ্টরূপে ক্ষয় হইয়া যায় এবং তাঁহারা ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন।

প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্মাম স্মরতাং নৃণাম্।

সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমন্তুস্মৈ চিদাত্মনে॥

“মরণকালে বা জীবদশায় যাঁহার নাম স্মরণ করিলে মানবগণের পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, সেই চিন্ময় বিগ্রহকে প্রণাম করি।” বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

স্মৃতে সকলকল্যাণভাজং যত্র জায়তে।

পুরুষস্তুমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্॥

“যাঁহাকে স্মরণ করিলে পুরুষ সকল কল্যাণের পাত্র হয়, আমি সেই জন্মরহিত নিত্যতত্ত্ব শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিলাম।” বিষ্ণুপুরাণে যম-যমদূত সংবাদে পাওয়া যায়,—

কলিকলুষমলেন यस্য নাত্মা বিমলমতেমলিনীকৃতস্তমেনম্।

মনসি কৃত জনার্দনং মনুষ্যং সততমবেহি হরেরতীবভক্তম্॥

“যিনি বিমলমতির আত্মা কলিকলুষরূপ মলদ্বারা মলিনীকৃত হন না এবং যিনি সর্বদা মনোমধ্যে জনার্দনকে স্মরণ করেন, তাঁহাকে হরির অতিশয় ভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে।”

গত্বা গত্বা নিবর্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।

অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে দ্বাদশাঙ্করচিন্তকাঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

“চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণ পুনঃ পুনঃ গমন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা দ্বাদশাঙ্কর মন্ত্র স্মরণ করিয়াছেন, তাঁহারা অদ্যাপি ফিরিয়া আসেন নাই।”

বিষ্ণুচ্চারণমাত্রেন কৃষ্ণস্য স্মরণাদ্বরে।

সর্ববিঘ্নানি নশ্যন্তি মঙ্গলং স্যান্নসংশয়ঃ॥

“বিষ্ণুনা্মের এতই মাহাত্ম্য যে, এই নাম উচ্চারণ ও স্মরণের দ্বারা যাবতীয় বিঘ্ন দূর হইয়া মঙ্গল অবশ্যপ্তাবী, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।”

স্মরণকারী—ভগবান্-কর্ত্ত্বক সর্বদাই রক্ষিত

কাজীকর্ত্ত্বক বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিবার কালে নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর কৃষ্ণস্মরণে মত্ত থাকায় কোন দুঃখ অনুভব করেন নাই।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করেন হরিদাস।

নামানন্দে দেহ-দুঃখ না হয় প্রকাশ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১০২)

নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—
দেখিলে পাতক, মোরে পরশিলে স্নান। মুখিও কি বলিব প্রভু তোমার আখ্যান॥

এক সত্য করিয়াছ আপন-বদনে। যে-জন তোমার করে চরণ স্মরণে॥

কীটতুল্য হয় যদি—তারে নাহি ছাড়। ইহাতে অন্যথা হইলে নরেন্দ্রে পোড়॥

এই বল নাহি মোর—স্মরণবিহীন। স্মরণ করিলে মাত্র রাখ তুমি দীন॥

সভামধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন। আনিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন-দুঃশাসন॥

সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণ তোমা সঙরিলা। স্মরণপ্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা॥

স্মরণপ্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত। তথাপিহ না জানিল সে-সব দুরন্ত॥

কোনকালে পার্বতীরে ডাকিনীর গণে। বেড়িয়া থাইতে কৈল তোমার স্মরণে॥

স্মরণপ্রভাবে তুমি আবির্ভূত হঞ। করিলা সবার শাস্তি বৈষ্ণবী তারিয়া॥

হেন তোমা-স্মরণবিহীন মুখিও পাপ। মোরে তোর চরণে শরণ দেহ বাপ॥

বিষ, সর্প, অগ্নি, জলে, পাথরে বান্ধিয়া। ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া॥

প্রহ্লাদ করিল তোর চরণ-স্মরণ। স্মরণপ্রভাবে সর্বদুঃখ বৈমোচন॥

কারো বা ভাঙ্গিল দন্ত, কারো তেজোনাশ। স্মরণপ্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ॥

পাণ্ডুপুত্রসঙরিল দুর্কাসার ভয়ে। অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে॥

চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির, হের দেখ আমি। আমি দিব মুনিভিক্ষা, বসি' থাক তুমি।।
 অবশেষ এক শাক আছিল হাঁড়িতে। সন্তোষে খাইল নিজ সেবক রাখিতে।।
 স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে। সেইমত সব ঋষি পলাইলা ডরে।।
 স্মরণ প্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন। এ সব কৌতুক তোর স্মরণ-কারণ।।
 অখণ্ড স্মরণ-ধর্ম, ইহা সবাকার। তেত্রিঃ চিত্র নহে, ইহা সবার উদ্ধার।।
 অজামিল-স্মরণের মহিমা অপার। সর্বধর্মহীন তাহা বই নাহি আর।।
 দূতভয়ে পুত্রস্নেহে দেখি' পুত্রমুখ। সঙরিল পুত্রনামে নারায়ণরূপ।।
 তেই সঙরণে সব খণ্ডিল আপদ। তেত্রিঃ চিত্র নহে ভক্তস্মরণ-সম্পদ।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৬০-৮১)

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের স্মরণেই জীবের সর্ববিঘ্ন বিনাশ হইয়া থাকে।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব তিনের স্মরণ।

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।। (শ্রীল নরোত্তম)

কীর্তনাধীন স্মরণ ব্যতীত প্রকৃত মঙ্গললাভ অসম্ভব

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ আমাদিগকে মনঃশিক্ষাতে জানাইয়াছেন,—“কীর্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নিজ্জন সম্ভব।” শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির প্রথমতঃ শ্রবণ, তদনন্তর কীর্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুভাবে সাধিত না হইলে কোনপ্রকারে কখনও মানবগণের হৃদয়গগনে ‘স্মরণাখ্য’ ভক্ত্যঙ্গ উদয়ের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীনামকীর্তন-প্রভাবেই সহজ স্মরণ হইবে। ভগবান্নামকীর্তন অনুশীলনেই রূপকীর্তনানুশীলন, গুণকীর্তনানুশীলন, লীলাদিকীর্তনানুশীলন সম্পূর্ণ রহিয়াছে। যেখানে কৃত্রিমভাবে স্মরণ বা কল্পনাচেষ্টা, সেখানেই নামকীর্তনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। উহা স্মরণও নহে, নামকীর্তনও নহে; স্মরণের ছলে বা নামকীর্তনের ছলে নামাপরাধ। কীর্তন ও স্মরণ উভয়ই যদি শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখসাধক অভিধেয় হয়, তবে সেখানে কোন ব্যাঘাতের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। যেখানে কৃত্রিমতা, সেখানেই অনর্থের সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—“রাগানুগা ভক্তিতে মুখ্য যে স্মরণ, তাহারও কীর্তনাধীনতাই অবশ্য বক্তব্য হইতেছে, কারণ এই কলিযুগে কীর্তনেরই অধিকার এবং সমস্ত ভক্তিমার্গে সর্বশাস্ত্রদ্বারা একমাত্র কীর্তনেরই সর্বোৎকর্ষতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।”

কৃষ্ণপদারবিন্দ যুগলস্মৃতি মানবগণের অশুভবিনাশ, চিন্তাশুদ্ধি, হরিভক্তি এবং বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত-জ্ঞান ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে। ভগবৎস্মৃতি জীবের শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে সেবাবৃত্তি আনয়ন করিয়া আত্মসম্বন্ধ বিজ্ঞান ও কৃষ্ণেতর বস্তুতে স্বাভাবিক বিরাগ প্রকাশ করিয়া অমঙ্গল হইতে তাহাকে রক্ষা করে। ভগবৎস্মৃতিতে কেবল অমঙ্গল বিনষ্ট হয় তাহা নহে; পরন্তু বাস্তব মঙ্গল প্রচুর পরিমাণে লাভ হয়। সর্ববিষয়ে, সর্বসময়ে, সর্বকর্মে সাধুগণ সর্ববিঘ্ন-বিনাশকারী মাধবের নাম মনে মনে এবং বাক্যদ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন। “স্মরন্তি সাধবঃ সর্বৈ সর্বকার্যেষু মাধবম্।” পৃথিবীর কোন বিষয়ই আমাদের চিন্তনীয় নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বাস্তব সত্যবস্তু, সপরিচয় সেই বাস্তবসত্যই আমাদের স্মরণীয় বিষয় হওয়া উচিত।

—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদ্য বোধায়ন মহারাজ

বিরহ

‘বিরহ’-শব্দের অর্থ হইতেছে বিশেষভাবে নিত্য অবস্থান। যে যাহাকে ভালবাসে, সেই ভালবাসায় যখন কোন স্বার্থগন্ধ থাকে না, তখন সেই প্রিয়ের চিন্তাই ধ্যান-জ্ঞান হয়—এই প্রকার যে মগ্ন অবস্থা তাহাকে বিরহ বলা যায়। এ জগতে দেখা যায়—কাহারও তথাকথিত আপনজন চলিয়া গেলে কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভালভাবে বিচার করিলে দেখা যায়—সে তাহার জন্য কাঁদে না। কেবল নিজের ভোগরাহিত্য হয় বলিয়া কাঁদে, তাহা কিন্তু বিরহ নয়।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত গোপীগণের যে বিরোগ বা বিরহ তাহাতে কোন সন্তাপ নাই। সেখানে কেবল কৃষ্ণচিন্তাময় অবস্থা। সর্বদাই অন্তরে প্রগাঢ় ভালবাসার নিত্য অবস্থান। প্রত্যক্ষ মিলনের ন্যায় সেই বিরহ আনন্দময় হয়। এমন কি শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্বদাই প্রাণনাথের চিন্তায় আকুল অবস্থা। এই বিরহ প্রত্যক্ষ মিলন অপেক্ষা আরও আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। এইজন্য পারমার্থিক জগতে ‘বিরহ মহোৎসব’ বলা হইয়াছে।

কংস অক্রুরকে কৃষ্ণ ও বলরামকে লইয়া আসিবার জন্য ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। অক্রুর যখন কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে লইয়া আসিতেছেন তখন ললিতা-বিশাখাসহ অষ্টসখীর শিরোমণি শ্রীমতী রাধারানী জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেমসিদ্ধি এতই উত্থলিয়া উঠিল যে কৃষ্ণছাড়া বৃন্দাবন অন্ধকার দেখিলেন। কৃষ্ণের বিরহে কাঁদিতে কাঁদিতে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের নিমেষ শতযুগ সমান হইল। তাঁহারা আপনহারা হইয়া পাগলিনীপ্রায় হইলেন। বিশেষভাবে প্রাণপ্রিয় বৃন্দাবনচন্দ্রের বিরহে শ্রীমতী রাধারানীর চরমদশার উপস্থিতি হয়।

শাস্ত্রে বিরহে দশটি দশার উদয় হয় বলিয়াছেন।—

“চিন্তাত্র জাগরদ্বৈগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।

প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহা মৃত্যুর্দশা দশাঃ॥”

অর্থাৎ চিন্তাদশা, জাগরদশা, উদ্বৈগদশা, তানবদশা, মলিনদশা, প্রলাপদশা, ব্যাধিদশা, উন্মাদদশা, মোহদশা ও মৃত্যুদশা।

শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণবিরহে এমন নিমগ্ন যে তিনি নিজকে স্থির রাখিতে পারেন নাই। কৃষ্ণচিন্তাতেই মগ্ন। জাগরদশাতে একেবারে নিদ্রা নাই, নিদ্রাহীন অবস্থা। উদ্বৈগদশাতে কেবলই বিলাপ। তানবদশাতে কেবলই ক্রন্দন। প্রিয়-চিন্তায় শরীরের ক্ষীণ অবস্থা। মলিনদশাতে প্রিয়-অদর্শনহেতু আকুল হৃদয়। জীবনের আশা পরিত্যাগ, ব্যাকুলতা। প্রলাপদশায় অর্দ্ধবাহ্যজ্ঞান অবস্থায় ভুল বকা।

নিম্নলিখিত পদাবলীতে শ্রীমতী রাধারানীর প্রলাপদশার বিবরণ পাওয়া যায়।—

“নব ঘনশ্যাম,

ওহে প্রাণ বঁধুয়া,

(আমি) তোমা পাসরিতে নারি।

তোমার বদনশশী,

অমিয় মধুর হাসি,

তিল আধ না দেখিলে মরি।।

তোমার নামের আদি, হৃদয়ে লিখিতাম যদি,
 তবে তোমা দেখিতাম সদাই।
 এমন গুণের নিধি, হরিয়া লইল বিধি,
 এবে তোমা না দেখিতে পাই।।
 এমন বেথিত হয়, পিয়ারে আনিয়া দেয়,
 তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
 মরম কহিনু তোরে, পরাণ কেমন করে,
 কি কহিব কহনে না যায়।।
 এবে যে বুঝিনু সখী, পরাণ সংশয় দেখি,
 মোর মন কিছু নাহি ভায়।
 যে কিছু মনের সাধ, বিধাতা পাড়িলে বাজ,
 নরোত্তম জীবন অপার।।”

শ্রীমতী কৃষ্ণবিরহে অর্দ্ধবাহ্যদশায় বিলাপ করিতেছেন। সেই বিলাপেও কৃষ্ণসেবার মধুরিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
 অনলে পশিব কিবা যমুনায় ঝাঁপ।।
 একবার পাইলে রাগা চরণ দুখানি।
 হিয়ার মাঝারে থুইয়া জুড়াব পরাণি।।
 মুখের মুছিব ঘাম খাওয়ার পান গুয়া।
 শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া।।
 মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল।
 বনাইয়া বাঁধব চূড়া কুন্তল ভার।।
 কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
 নরোত্তম দাস কহে পিরীতির ফাঁদ।।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ নিম্নোক্ত শ্লোকটী কীর্তন করিয়া ভজন-লালসায় উদ্দীপ্ত হইয়া কৃষ্ণবিরহভাবে বিভাবিত হইয়া অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থান করিতেন।

“অয়ি দীনদয়ার্দ্দনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
 হৃদয়ং তদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।”

বিরহে এমন ভাবের উদয়—হইবে তখন ভক্ত বলিবেন,—

“আমি কেমন করে কোথায় পাব কৃষ্ণচাঁদের দেখা।
 সে আকাশে উঠবে কিসে কৃষ্ণশশী লেখা।।”

শ্রীমতী রাধার দিব্যোন্মাদ-দশার বর্ণনা আমরা পাই,—

“কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
 কাঁহা মোর গুণনিধি ও চাঁদবদন।।
 কাঁহা মোর প্রাণবন্ধু নবঘনশ্যাম।
 কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর কোটি কোটি কাম।।

কাঁহা মোর মৃগমদ কোটিন্দু শীতল।

কাঁহা মোর নবাম্বুদ সুধা নিরমল॥

এঁহন প্রলাপিতে ভেল মুরছিল।

এ রাধামোহন পঙ্খ বিরহ চরিত॥

বাহ্যদশাতেও তাঁহার বিলাপের বিরতি নাই। শ্রীমতী বলিতেছেন,—

এই ত' মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া

যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।

পিয়া বিনে হিয়া কেনে ফাটিয়া না পড়ে গো

নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥

* * *

এতেক দিবস হইল প্রাণনাথ না আইল

কার মুখে না পাই সংবাদ।

গোবিন্দদাস চল শ্যাম বুঝাইতে

বাড়ল বিরহ বিষাদ॥

এইভাবে কৃষ্ণস্মরণে, কৃষ্ণাধ্যানে, কৃষ্ণ অদর্শনে পাগলিনীপারা শ্রীমতী রাধারাণীর দশমীদশা উপস্থিত হইল। অর্থাৎ এই দশায় যে-প্রকার অবস্থা তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব ব্যাপার। তিনি প্রাণ আর রাখিবেন না—এই ভাব। তিনি শ্রীকৃষ্ণবিরহে মূর্ছিতা হইয়া রহিয়াছেন—সখীগণ এই দশা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সখীরা তাঁহার নাসিকায় তুলা ধরিয়া দেখিলেন, কিন্তু প্রাণ আছে কিনা বুঝিতে পারিলেন না। চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা চন্দ্রাবলীকে এই সংবাদ দিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু চন্দ্রাবলী বলিলেন,—‘হাসহিস কেন সখী! ইহা আমাদের সকলেরই চিন্তার কথা।’

আরও বলিলেন,—‘হায় হায়! রাধারাণীর জন্য কৃষ্ণচন্দ্র একদিন না একদিন অবশ্যই ব্রজে আসিতেন। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি রাধারাণীর প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে শ্যামচাঁদ আর এখানে আসিবেন না।’—এই বলিয়া চন্দ্রাবলী কাঁদিয়া উঠিলেন।

কে আবার বাজাবে বাঁশি শ্যাম ব্রজে নাই গো শ্যাম ব্রজে নাই।

মনদুখে কাঁদে একা কমলিনী রাই গো কমলিনী রাই॥

ফুলের বাসরখানি সাজায়ে রাই বিনোদিনী—

কত নিশি কাঁদে বসি শ্যাম আসে নাই গো শ্যাম আসে নাই।

শ্যামের বিরহে কাঁদে কাঁদে ব্রজনারী,

শ্যামের বিরহে কাঁদে কাঁদে শুক-শারী,

বাজে না শ্যামের বেণু গোঠেতে চরে না ধেনু

ছেড়ে গেছে ব্রজপুরী ব্রজের কানাই—

শ্যাম ব্রজে নাই গো শ্যাম ব্রজে নাই॥

কবি বিদ্যাপতি রাধারাণীর বিরহ বর্ণন করিলেন।

শ্রীমতী রাধারাণী ললিতাকে বলিতেছেন,—

মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব।

কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব॥

প্রেমিক ভক্ত রায়রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন,—প্রেমবিলাসবিবর্ত বলিয়া একটি ভাব আছে। বিরহ ছাড়া মিলনের উৎকর্ষতা হয় না। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে বলিয়াছেন,—

স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সন্তোগোন্নতি কারকঃ ।

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সন্তোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে ॥

প্রেমবিলাস মিলনেও যে-প্রকার আনন্দ, বিরহেও সেইপ্রকার আনন্দ। বিরহে কৃষ্ণসেবায় বিশেষভাবে উদ্দীপনা আসে, তন্ময়তা আসে। এমন কি শ্রীমতী রাধারানীর তমালাদিতেও কৃষ্ণজ্ঞান হইয়াছিল। ভ্রমরকে দেখিয়া কৃষ্ণভাবে বিভারিত অবস্থা। অধিকৃত মহাভাব অবস্থা।

ভালবাসা যদি বিরহবিহীন কিবা আছে তার দাম।

বিরহের মাঝে আজও বেঁচে আছে প্রেমময় রাধাশ্যাম ॥

সুতরাং বিরহে প্রিয়জনের আবির্ভাব ঘটে। উহা প্রেম ও ভালবাসাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

‘আবির্ভাব-শতবার্ষিকী’ পালন কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ?

গুরুবর্গের আবির্ভাব বা তিরোভাব-সম্বন্ধে শতবার্ষিকী পালনীয় কি অপালনীয়—তাহা লইয়া অনেক সংশয় ও বিতর্ক। এই সংশয় এবং বিতর্ক অস্বাভাবিক কিছুই নহে। কারণ, যতদূর জানা যায়, এইপ্রকার অনুষ্ঠান-বিষয়ে পূর্বের বৈষ্ণবগণ বিশেষ তৎপর ছিলেন না। তবে বিরোধীও ছিলেন কিনা—তাহাও জানা যায় না। বিশেষতঃ চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে ইহা অন্তর্ভুক্ত নহে, আবার ‘মহাজন-পস্থা’ও নহে বলিয়া এই ব্যাপারে অনেকেই নিঃস্পৃহত্ব অবলম্বন করেন।

হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের ‘আবির্ভাব’ বা ‘তিরোভাব’ কালান্বিত কোন বস্তু নহে। “এইসব লীলার নাহি পরিচ্ছেদ। ‘আবির্ভাব’, ‘তিরোভাব’ মাত্র কহে বেদ ॥” সুতরাং অর্দ্ধশতবার্ষিকী, শতবার্ষিকী প্রভৃতি পারমার্থিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত করিতে গেলে আবির্ভাব, তিরোভাবের নিত্যত্ব থাকে না। কালাতীত বস্তুকে কালান্বিত করিবার প্রয়াস তত্ত্ববিরুদ্ধ, সুতরাং তাহা অনুচিত।

‘শতবার্ষিকী-উদ্‌যাপন’—ব্যাপারটি আধুনিক কালেরই এক রীতি-বিশেষ। ‘সিলভার-জুবিলি’, ‘গোল্ডেন-জুবিলি’—প্রভৃতি নামে মন্তব্য পূর্বের ভারতবর্ষে দেখা যাইত না। ইহা বিদেশ হইতে আমদানিকৃত হইয়া এখনকার আমজনতাকে তাহা রীতিমত পাইয়া বসিয়াছে। সাধারণ জাগতিক বিষয়ে উহারা একপ্রকার হইলেও পারমার্থিক-বিষয়ে এইসকল বৈদেশিক প্রথার প্রচলন অশাস্তিকর।—এইপ্রকারে ভগবৎ ও ভাগবত-বিষয়ে ‘শতবার্ষিকী’ প্রভৃতি অপালনীয়ই বলিয়া বিচারিত হয়। কিন্তু ইহার পরেও কিছু কথা আছে, যাহা আলোচনা করিলে ইহাকে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করা যায় না।

চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে ‘শতবার্ষিকী’ বা সে-জাতীয় কোন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নাই। তবে সেইসকল ভক্ত্যঙ্গের যে তাৎপর্য, উহা গুরুবর্গের সম্বন্ধে শতবার্ষিকী-পালনের উদ্দেশ্যেরই অনুরূপ বৈ পরিপন্থী নহে। আইনের মধ্যে সকল বিষয়ই যে

সাক্ষাৎরূপে উল্লিখিত হয়, এমন নহে। উল্লিখিত বিষয়সমূহের তাৎপর্য লইয়া অনুল্লিখিত বিষয়ের সমাধান করিবারও বিধান আছে। শাস্ত্রীয় সকল আইন-কানূনের মূল তাৎপর্য হইল,—“স্মৰ্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিষ্মৰ্তব্যো ন জাতুচিৎ।

সর্বের বিধিনিষেধাঃ সুরেতয়োরেব কিস্করাঃ।।” (পদ্মপুরাণ)

শাস্ত্র যাহা কর্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই ‘বিধি’; শাস্ত্র যাহাকে অকর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা ‘নিষেধ’। কিন্তু শাস্ত্রের সমস্ত বিধি ও নিষেধ আলোচনা করিবার অবসর জীবের নাই বলিয়া শাস্ত্রেই সকল বিধি-নিষেধের মূলসূত্র প্রদত্ত হইয়াছে। জীবনের সর্বসময়েই ভগবান্ বিষ্ণু স্মরণীয়—ইহা মূল-বিধি; এবং সেই ভগবানকে কখনই বিস্মরণ করা যাইবে না,—ইহাই মূল-নিষেধ। শাস্ত্রে কথিত সকল প্রকার বিধি-নিষেধ উক্ত ‘মূল-বিধি’ ও ‘মূল-নিষেধের’ই কিস্কর অর্থাৎ অনুগামী। গুরুবর্গের সম্বন্ধে শতবার্ষিকী পালনে যেহেতু হরি-তত্ত্ব, গুরু-তত্ত্ব, বৈষ্ণব-তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনাই একমাত্র উদ্দেশ্য, সুতরাং তাহা ‘বিধি’ বলিয়াই গণ্য। অপরদিকে তাহাতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের বিষয়ে বিস্মরণের অবকাশ না থাকায় তাহা নিষেধরূপেও পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং ইহা বিধিমাগী ভক্তগণের জন্য যে বিশেষ উপাদেয়—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাগানুগা-ভক্তিয়াজন প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পাঁচপ্রকারে সকল প্রকার অনুষ্ঠানকে বিভক্ত করিতে বলিয়াছেন,—নিজ অতীষ্ট ভাবময়, নিজ অতীষ্ট ভাবসম্বন্ধী, নিজ অতীষ্ট ভাবানুকূল, নিজ অতীষ্ট ভাবের অবিরুদ্ধ এবং নিজ অতীষ্ট ভাব-বিরুদ্ধ। এইপ্রকারে রাগানুগ-মাগী ভক্তগণ সকলপ্রকার ভক্ত্যঙ্গকে নিজ অতীষ্ট ভাবের উদ্দীপক, কি অনুদ্দীপক অথবা তটস্থ ইত্যাদিরূপে বিচার করিয়াই তাহাতে ব্রতী হন। বলাবাহুল্য এবম্প্রকার শতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগে তাঁহাদের নিজ অতীষ্ট ভাব সম্বন্ধিতই হয় বলিয়া তাঁহারাও উল্লসিত হইয়া থাকেন। গুরুবর্গের আবির্ভাব-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সাক্ষাৎ কীর্তনঙ্গ, শ্রবণঙ্গ, স্মরণঙ্গ-ভক্তিয়াজনের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় ইহাতে “ভাব-সম্বন্ধিত্বই” প্রমাণিত হয়। সুতরাং ইহা যে রাগানুগমার্গের পরিপন্থী নয়, বরং সহায়ক—তাহাও প্রমাণিত হয়।

শ্রীহরি স্বয়ং অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব এবং গুরু-বৈষ্ণবগণ অদ্বয়জ্ঞানান্তর্গত তত্ত্ব। সুতরাং কালের অতীত রাজ্যেই তাঁহাদের বিচরণ। কিন্তু কালপ্রবাহে ভাসমান অদ্বয়জ্ঞান-চ্যুত এই বদ্ধজীবের উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের পক্ষে কালান্তর্গত না হইয়াই বা উপায় কি? জলনিমগ্ন প্রাণীকে উদ্ধারের জন্য ডুবুরীর জলে না নামা ব্যতীত আর কোন্ উপায় থাকে? কিন্তু ডুবুরী জলে নামিয়াও উহাতে কোনপ্রকার ক্লিষ্ট হন না—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। তদ্রূপ কালাতীত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব কালান্তর্গত হইয়াও কালাক্রান্ত হন না, ইহাই তাঁহাদের মহিমা।

“এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদুণৈঃ।

ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।” (ভাঃ ১।১১।৩৯)

ঈশ্বরের ঈশিতা এই যে, তিনি কার্য্যবশে প্রকৃতিস্থ হইলেও প্রকৃতির কোন গুণেই তিনি যুক্ত হন না। তাঁহার পার্শ্বদগণ সেই তদাতচিৎ হওয়ায় তাঁহারাও একই প্রকারে প্রপঞ্চিত হইলেও প্রপঞ্চাতীত হইয়াই থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে,—শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পার্শ্বদবর্গও কালান্তর্গত হইয়া থাকেন, কিন্তু তাহা স্বেচ্ছাধীন এবং তাঁহারা

কালক্রিষ্ট হন না—ইহাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের কালান্তর্গত আবির্ভাব ও তিরোভাব-প্রসঙ্গ সুতরাং কালের হিসাবে গণিত হইবেই। বরং গণনা-পদ্ধতিই সেই প্রকার গণনায় নিযুক্ত হইয়া সার্থক হয়। ‘গৌরানন্দ’ বা ‘কেশবানন্দ’ ইত্যাদির প্রবর্তন নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে কালান্তর্গত করিবার কোন প্রয়াস হইতে হয় নাই। এইপ্রকার ‘অন্দের’ বিচারে তদাশ্রিতগণ বরং ইষ্টদেবের স্মৃতি ক্ষণিক হইলেও লাভ করেন। জীবের নিত্যমঙ্গলের বীজ ‘সুকৃতি’রূপে উহাতেও নিহিত থাকে। সুতরাং উহাদিগকে কোনপ্রকারে ‘শ্রীষ্টানন্দ’ বা ‘বিক্রমানন্দ’ প্রভৃতির সহিত সমান করা যাইতে পারে না।

কাল-প্রসীড়িত বদ্ধজীবের পক্ষে কালাতীতত্ব কিংবা কালের নিত্যত্বের ধারণা অসম্ভব। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাদের ধারণা কালের চক্রেই আবর্তিত হইতে থাকে। এই কালের করাল গ্রাস হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই প্রতি বৎসর বিশেষ বিশেষ কালে জন্মাষ্টমী, গৌরপূর্ণিমা, গুরুবর্গের আবির্ভাব-তিথি, তিরোভাব-তিথি প্রভৃতি আবির্ভূত হন। এইসকল বাৎসরিক তিথির পূজা ও সেই উপলক্ষে মহামহোৎসব পালনে তাঁহাদিগকে কালান্তর্গত করা হয় না, আবার তজ্জন্য ইহাতে তাঁহাদের কালাতীতত্ব নষ্ট কিংবা অবজ্ঞাতও হয় না। জীবের এইপ্রকার ‘বাৎসরিক-প্রবৃত্তি’ যখন ক্রমে ক্রমে প্রতি মাস, প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্ত, প্রতিক্ষণ, প্রতিপল বিচারে উপনীত হয়, তখন তিনি ‘নিত্যকালে’ প্রবেশাধিকার লাভ করেন। সেকালে তিনি নিশ্চয়ই সেই ‘বাৎসরিক-প্রবৃত্তির’ বিচারকে কালান্তর্গত-জ্ঞানে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান করেন না, কারণ উহাতেই তাঁহার কালাতীত হইবার বীজ নিহিত।

গুরুবর্গের বার্ষিকী আবির্ভাব-মহোৎসব পালনে কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু তাহা ‘শতবার্ষিকী’ হইলেই কাল-দুষ্ট হইবার অবস্থা কিংবা বৈদেশিক গন্ধে দূষিত হইবার শঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এইপ্রকার শঙ্কা নিতান্ত অমূলক। ‘কেশবানন্দ’ যেকালে ‘১০০’ বলিয়া ‘বিশুদ্ধ সারস্বত চৈতন্য পঞ্জিকা’য় প্রকাশিত হন, সেকালে ‘অপ্রাকৃত-তত্ত্ব’ নিশ্চয়ই প্রাকৃত কালের গণনায় গৌণ হইয়া পড়েন না। সুতরাং শ্রীশ্রীল ভক্তিশ্রদ্ধা কেশব গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-শতবার্ষিকীতেও সেইপ্রকার দূষণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ‘শত’-শব্দটি কোন বৈদেশিক শব্দ নহে,—ইহা শাস্ত্রীয়ই। ‘বালাগ্র-শতভাগস্য’ (শেতাশ্বঃ ৫।৯), আবার ‘অবতার-শতৈক-বীজম্’ (ভাঃ ৩।৯।২), ‘পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশঃ’ (গীতা ১১।৫), ‘রাধিকার তরে শতবার মরি’ (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর), ‘শতের মধ্যে দশ আছে’ (‘সম্ভব’-নামক প্রমাণ)—এইপ্রকার দৈনন্দিন শাস্ত্রচর্চায়ও ‘শত’-শব্দের প্রয়োগ সর্বদাই দেখা যায়। আবার ‘শত’, ‘সহস্র’ প্রভৃতিতে সাধারণভাবেই এক পূর্ণতার ভাব আছে, যাহা ৪০, ৮০ কিংবা ৯৯৯ সংখ্যাতেও নাই। তাই ‘শতের’ আগমনে সেই পূর্ণত্বের এক ভাবহেতু এবং বিশেষ করিয়া তাহা পরম ইষ্টবস্তু-সম্পর্কিত হইলে চিত্ত আনন্দিত হয় বৈকি। সেই আনন্দে ইষ্টদেবের গুণগানে মুখর হইলে তাহা নিশ্চয়ই আর প্রাকৃত আবিলতায় স্পৃষ্ট হইয়া থাকে না।

‘শতবার্ষিকী’ যে এক লৌকিক ক্রিয়া—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁহার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—যিনি কৃষ্ণগর্থে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট, তিনি জগতের যাবতীয় লৌকিক ক্রিয়া এবং বৈদিকী ক্রিয়া এক হরিসেবানুকূলেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

“লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।

হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।” (নারদ পঞ্চরাত্র)

কার্যগণ ধর্মাদ্বৈত বিচার অপেক্ষাও শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যায়ই বহুমানন করেন। সেই ‘প্রচুর পরিচর্য্যার’ ক্রিয়ায় সুতরাং কেবল বৈদিকী নয়, লৌকিকী ক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার বৈদিকী হইলেই যে সেই পরিচর্য্যার অনুকূল হইবে এবং লৌকিকী হইলেই প্রতিকূল—এরূপ নহে। “হরিসেবায় যাহা অনুকূল। বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।।”—ইহাই তাঁহাদের অখিল চেষ্টার মূলসূত্র। সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই শতবার্ষিকী লৌকিকী হইলেও উহাতে হরিসেবার আনুকূল্যই দৃষ্ট হয়।

শতবার্ষিকীর সূত্রপাত যে বিদেশ হইতেই হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। লৌকিকতার সাদৃশ্যে এরূপ ধারণা করিয়া লওয়া উচিত নহে। আবার ফ্রান্সে সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদগণ খননকার্য্যে এক দুর্গামন্দির আবিষ্কার করিয়াছেন। উক্ত মন্দিরে শক্তি-মূর্তির সহিত এক বিষ্ণুমূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ-কর্তৃক প্রচারকার্য্যে লগুনে প্রেরিত হইয়া শ্রীঅতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সেস্থানে এক অত্যন্ত প্রাচীন ‘অধোক্ষজ’ বিষ্ণু-বিগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। এইপ্রকার পূর্বেও বিদেশে বহু বহু স্থানে কোথাও শ্রীমন্দির, কোথাও শ্রীবিগ্রহ, কোথাও উভয়ই আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে। সুতরাং ‘বিদেশ’-মাত্রই ‘অচ্ছুৎ’—এরূপ ধারণা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। তবে ভারতভূমির অপার মহিমার তুলনায় অন্যসকল যে নিষ্প্রভ—ইহাতে সন্দেহ নাই।

তর্কের খাতিরে ‘শতবার্ষিকী’ বৈদেশিক হইলেও, তাহা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। “ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ”—ঈশোপনিষদোক্ত এই সূত্রে শ্রীভগবান্ জগতে সকল কিছুরই অধিপতি—তাঁহার আধিপত্য হইতে বিদেশ-ভূমিকে নিশ্চয়ই বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। আবার ‘লৌকিকী’—এই শব্দটিতে কেবল ভারতীয়ই, বৈদেশিক নহে, এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে কি? তাহা হইলে বৈদেশিক যে-সকল জড়বিজ্ঞান-প্রসূত সুবিধাদি, উহাদিগকেও হরিসেবার বিরোধিজ্ঞানে সমূল বিসর্জন দিতে হয়। ইহাতে শ্রীহরির একচ্ছত্র ভোক্তৃত্বের বিচারকে সম্মান করা হইবে কি?

সংরক্ষণশীলতার প্রয়োজনীয়তা লইয়া কোন তর্ক চলিতে পারে না। বিশেষ করিয়া ধর্মক্ষেত্রে ইহার সম্বন্ধে সচেতন না থাকিলে ‘অবস্তু’র অনুপ্রবেশ ঘটিতে বাধ্য। কিন্তু সেই সংরক্ষণশীলতা কেবল বাহ্যিক আচরণ-নিষ্ঠ না হইয়া তদপেক্ষা আভ্যন্তরীণ বিচারনিষ্ঠ হইলেই সর্ব্বসুষ্ঠু হয়। কারণ ভাবগ্রাহী জনার্দন জীবের হৃদয়নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ফল প্রদান করেন, বাহ্যিক আচরণ দেখিয়া নহে। “ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ সঃ পদ্মাঃ।”—ইহা অতীব সত্য কথা। “তাতস্য কৃপঃ”—কে ‘মহাজন-পদ্মা’ ভাবিয়া সংরক্ষণশীল হইলে উহাতে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটে না। মহাজনের হৃদয়-গুহায় প্রবেশ না করিলে ‘মহাজন-পদ্মা’ খুঁজিয়া পাওয়া মুশ্কিল।

মোটকথা, শতবার্ষিকী প্রভৃতি পালন করিতেই হইবে, এরূপ নহে। কিন্তু পালন করিলে তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ভক্তিবিরুদ্ধ কিংবা মহাজন-পদ্মা-বিরুদ্ধ হয় না। কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টার তালিকায় তাহা সহজেই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা

স্থান, কাল এবং পাত্রের উপর নির্ভর করিয়া এক এক সময় এক একটা শব্দ ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে। ক্রমে উহা একটা Fashion হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাহার অর্থ ও ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ একপ্রকার চরম উদাসীন্য পোষণ করে এবং ‘কথার কথা’ বলিয়া যত্র তত্র ইহার অপব্যবহার করিয়া থাকে। সাম্প্রতিক-কালে ‘সম্প্রদায়’ ও ‘সাম্প্রদায়িকতা’-শব্দ দুইটা এইরূপে যত্র তত্র যথেষ্টাচার ও স্বেচ্ছাচারের কবলে কবলিত হইতে দেখা যাইতেছে। বস্তুতঃ শব্দ দুইটির বাস্তব অর্থ অনেকেই অবহিত নহেন।

‘সম্প্রদায়’-শব্দের অর্থ হইল গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত সদুপদেশ বা শ্রীত-আম্নায়-ধারা; অথবা যাহা পরমসত্যকে সম্যগ্ভাবে প্রদান করে, তাহাই ‘সম্প্রদায়’। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক। বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের গৌরব, তাই ভারতীয় আন্তিক্য-সমাজে এই সম্প্রদায়-প্রণালী চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। বিদেশীয় নাস্তিক্য সাম্যবাদ বা Sectarian thought-দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়া বর্তমান সমাজ সনাতন আর্য্যঋষিগণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায়-প্রণালীর উপর আঘাত হানিয়া নিজদের উন্মানসিকতার পরিচয় দিতেছে।

কোন একটা মতবাদ, একটা নীতি, নিয়ম, আদর্শ, আইন বা ধর্ম্ম এমন কি ভাল-মন্দ, সদসৎ সম্বন্ধে ধারণাও একই সময়ে পৃথিবীর সমস্ত লোককর্তৃক কখনই অনুসৃত হয় না—ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখনই কোন একটা ধর্ম্মমত, পৃথিবীর একশত লোক হউক, আর শতকোটি লোক হউক, তাহা গ্রহণ করেন; তখনই তাঁহাদের ‘সাম্প্রদায়িক’ ও তাঁহাদের আচরণবিধিকে ‘সাম্প্রদায়িকতা’ আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে বিশেষভাবে রাজনৈতিক দলগুলি ইঁদুর-দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করিয়া দেয়।

যাঁহারা একই নীতির, একই আদর্শের বা একই ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিককে সাধারণতঃ একটা সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হয়। এই হিসাবে হিন্দু-সম্প্রদায়, মুসলমান-সম্প্রদায়, খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়, বৌদ্ধ-সম্প্রদায়, জৈন-সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেও আবার অজস্র সম্প্রদায়-ভেদ দেখা যায়। যেমন হিন্দুদের মধ্যে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি এবং মুসলমানদের মধ্যে শিয়া, সুন্নী, সুফী ভেদে প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভেদ দেখা যায়। শিল্পীদের মধ্যে সঙ্গীত-শিল্পী, নৃত্য-শিল্পী, চারু-শিল্পী, যন্ত্র-শিল্পী; আবার সঙ্গীত-শিল্পীদের মধ্যেও শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত-শিল্পী, আধুনিক সঙ্গীত-শিল্পী ভেদ। শাস্ত্রীয় বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যে আবার ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ভেদ। তাহার মধ্যেও আবার ‘ঘরাণা’ ভেদে শিল্পীদের সম্প্রদায় বিচার করা হয়। রাজনীতির মধ্যেও এইরূপ মুষ্টিমেয় কিছু লোক একটা বিশেষ মতবাদ লইয়া এক একটা দল গঠন করেন। তাঁহাদের সকলেরই মৌলিক উদ্দেশ্য কিন্তু ‘জনসেবা’ ও ‘দেশসেবা’ বলিয়া তাঁহারা প্রচার করেন। তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে এত মারামারি, কোন্দল, কলহ কিসের? সকলেরই ত’ উদ্দেশ্য এক (?)। আশ্চর্য্য্য হই, তখন কিন্তু তাঁহারা কাহাকেও ‘সাম্প্রদায়িক’ আখ্যা দেন না। কিন্তু একটু ধর্ম্মের গন্ধ থাকিলেই

তাহাকে সাম্প্রদায়িক বলা হইল এবং তাহা একটা খারাপ গালাগালি হিসাবেই যেন ব্যবহার করা হইল।

বস্তুতঃ কোন সংগঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং লক্ষ্যবস্তুর সহিত পরিচয়ের অভাব, সেইহেতু হিংসা, ঘেঁষ, মাৎসর্য্য, অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা অপরকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা, ইহাই সঙ্কীর্ণতা। এই সঙ্কীর্ণতা যখন ঐরূপ কোন সম্প্রদায়ে ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে, তখন সেই সম্প্রদায়ের ভাবকে সাধারণ অর্থে ‘সাম্প্রদায়িকতা’ এবং সেই ব্যক্তিগণকে ‘সাম্প্রদায়িক’ বলা হয়। অন্যথায় এই কথাগুলির প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতাই থাকে না।

এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা কখনও একটা বংশগত, জাতিগত, সমাজগত এবং ধর্মগতও হইতে পারে। “আমরা যে বংশে, যে জাতিতে বা যে সমাজে জন্মিয়াছি উহাই কুলীন, শ্রেষ্ঠ, পবিত্র, উন্নত আচার ও আদব-কায়দা-সম্পন্ন; অন্য জাতি বা সমাজ আমাদের অপেক্ষা অনেক হেয়, আমরা সকলের অপেক্ষা বেশী বুঝি”—এই সঙ্কীর্ণতা হইতে উক্ত সাম্প্রদায়িকতার বীজ উদ্ভূত হয়। আবার আমি যে ধর্মের অনুসরণ করিয়া থাকি, তাহাই মুক্তির একমাত্র উপায়; আমার যাহা সাধন-প্রণালী, তাহাই একমাত্র ফলপ্রদ পন্থা; অপরের সাধন-প্রণালী ভ্রান্তিপূর্ণ ও নিরর্থক, অপরে মুক্তির যে ধারণা পোষণ করেন, তাহাও ভ্রান্ত” ইত্যাদি যে সঙ্কীর্ণ ভাব, তাহাই ধর্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িকতার মূল। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়ার পঞ্চাশৎ-বর্ষ

ধর্মনীতি ও রাজনীতির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পঞ্চাশৎ-বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। সুদীর্ঘ এক বর্ষকালের মধ্যে ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীর ঘটনাবল্লব বহু পরিবর্তন, পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইলেও শ্রীপত্রিকা নব-নবায়মানরূপে তাঁহার নিজস্বরূপ প্রকাশপূর্ব্বক জীবকল্যাণের নিমিত্ত বরাভয়প্রদ হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। বিগত বর্ষ “রাজনৈতিক জটিলতাময় দুর্যোগপূর্ণ বৎসর” বলিয়া ভারতের চিন্তাশীল মনীষী ও সুধীসমাজ উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাই। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কোনদেশে আংশিকভাবে সফলতা লাভ করিলেও, ভারতের পক্ষে তাহা সুদূরপরাহত। আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, একদেশদর্শী নীতি, দলীয় সুবিধাবাদ, মতানৈক্য, ক্ষমতাধিকারের প্রতিযোগিতা কখনই সুফল প্রসব করে না। ব্যাপক বিশৃঙ্খলতা ও নৈরাশ্যের মধ্যে দেশের নানা পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। রাজনৈতিক দলাদলি, সহাবস্থাননীতি ও বন্টনবিধির দোষ-ত্রুটি সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষকে সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রীভাব হইতে দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক এক অস্বস্তিকর অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। রাজনীতিরূপ কূটনীতি কোনদিনই বিশ্বের সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রীরূপ কল্যাণ আনয়নে সমর্থ নহে। জাগতিক সকল প্রচেষ্টা দোষ-ত্রুটিযুক্ত ও তাহাতে বিবিধ সমস্যার সমাধান ও শান্তিলাভ সম্ভবপর নহে। পরদুঃখদুঃখী শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা জীবকল্যাণের নিমিত্ত সর্বদা চেষ্টা-বিশিষ্ট।

মহাজন-বাণীই বা আপ্তবাক্যই শ্রীপত্রিকার জীবন

শ্রীপত্রিকা পূর্ব পূর্ব-গুরুবর্গ ও গৌড়ীয় মহাজনগণের অপ্রাকৃত ভাবপুষ্ট আত্যন্তিক কল্যাণজনক প্রবন্ধাদিতে সমলঙ্কৃত। জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব গোস্বামী, স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহাজনগণের লিখিত গভীর দার্শনিক বিচারপূর্ণ প্রবন্ধাদি ও বিভিন্নস্থানে প্রদত্ত ভাষণাদি প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। “মহাজনো যেন গতঃ সং পস্থাঃ”—“মহাজনের যেই মত, তাতে হব অনুরত, পূর্বাপর করিয়া বিচার।”—তুলনামূলক আলোচনাপূর্ণ প্রবন্ধাদি অনুশীলনদ্বারা সংসিদ্ধান্ত-বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায়। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয়-বিবর্জিত তত্ত্বানুশীলনে জীবের বাস্তব কল্যাণ নিহিত। মহাজনবাণী বা আপ্তবাক্যই আমাদের প্রকৃত গন্তব্যস্থানে পৌছাইয়া দিতে সক্ষম।

শ্রীগুরুদেবের অর্চাবিগ্রহ-প্রকাশে শাস্ত্রীয় শিক্ষা

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব গোস্বামীর শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সমিতির সেবকগণ বর্ষব্যাপী ভারতের ও বহির্ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহার অপ্রাকৃত মহিমা-মাহাত্ম্য ও শ্রীমদ্ভক্তপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারকার্যে নিরত থাকিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাপ্রচারকল্পে গত ২৬শে বৈশাখ, ১৪০৪ (ইং ৯।৫।১৯৯৭) শুক্রবার—অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীসমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অর্চা-শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ, নবনির্মিত শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীশ্রীগুরু-গৌরানন্দ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীমূর্তি-গণের শ্রীমন্দিরে শুভবিজয়ানুষ্ঠান মহোৎসব বিরাটভাবে সুসম্পন্ন হয়। রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে আজকাল ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ব্যবহারিক সমাজে গুরু-বৈষ্ণবপূজার রীতিনীতি বা প্রচলন না থাকিলেও জনতা-জনদর্দনের সেবার (?) কথা প্রায়ই প্রতিধ্বনিত হয়। “Voice of the people is the voice of the God”—ইহাই বর্তমান নাস্তিক্য সমাজের ভ্রান্ত ধারণা। মানুষের বুলি কখনও শ্রীভগবানের বাণী হইতে পারে না, পক্ষান্তরে শ্রীভগবানের বাণীই মনুষ্যগোষ্ঠী শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করিলে তাঁহাদের পরমকল্যাণ। জড়বাদ বা ভোগবাদ আজ সমগ্র দুনিয়াকে গ্রাস করিয়াছে। তথাকথিত শিক্ষিতসমাজ বহু কিছু জানিয়া-শুনিয়াও অবুঝের ভাগ করে, ইহা বিশেষ দুর্দৈব। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের যথার্থ সম্মান রক্ষা ব্যক্তিপূজার অন্তর্গত ব্যাপারবিশেষ নহে। আমরা মুনি-ঋষিগণের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হইতে পারিলেই আমাদের সকলের সম্মান সুরক্ষিত হয় এবং তাহাই বাস্তব সমাজকল্যাণজনক বিধি-ব্যবস্থা।

আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বহুমুখী মহিমা-মাহাত্ম্য

শ্রীগুরুদেব অনুক্ষণ কীর্তন ব্যতীত আর কিছুই করেন না। তিনি হরিকথা-কীর্তন-বিগ্রহ ও শ্রীহরির পরমপ্রিয়। তাঁহার বাণীই শ্রুতি, তাঁহার কৃপাতেই আমরা ভগবানের স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ, লীলা সবই জানিতে পারি। তাঁহার কৃপায় মুকও

বাচাল হয়। তাঁহার কৃপাতেই জীব হরিগুণ-কীর্তনের অধিকারী হন। তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীহরির যশোরত্ন ভাণ্ডার। এই অমূল্যনিধি শ্রীহরি একমাত্র তাঁহার প্রিয়তম (শ্রীগুরুদেব)-সন্নিধানেই গচ্ছিত রাখিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব যে-সে ভক্ত নন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তিনি নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী। মধুররসে তিনি ব্রজগোপী বা ব্রজাঙ্গনা। শ্রীগুরুদেব আচার্য্যরূপী ভগবান্। তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমবাধ্য। তাঁহার ইচ্ছাই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা, তাঁহার কৃপা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা। গুরুদর্শনই কৃষ্ণদর্শন, গুরুপ্রীতিই কৃষ্ণপ্রীতি। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

“যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শিক্ষাগুরুকে ত’ জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥”

জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের মনোহরীষ্টপূরণে বিশ্রান্তসেবা

প্রেমাবতারা শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাভূমি ষোলক্লোশ শ্রীনবদ্বীপধাম নবধা ভক্তির পীঠস্থান। অষ্টদলপদ্মের ন্যায় কর্ণিকার আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, তাহার চতুষ্পার্শ্বে শ্রবণ-কীর্তনাদির পীঠস্থান-স্বরূপ অপর ৮টি দ্বীপ অবস্থিত। তন্মধ্যে পাদসেবনাখ্য অপরাধ-ভঞ্জনের পাট কোলদ্বীপ বা কুলিয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অবস্থিত। জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের মনোহরীষ্ট ছিল—৯টি দ্বীপেই শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য সেবাপূজা প্রচলিত হউক। তাঁহার অতীষ্ট বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্যই অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বিরোধী সহজিয়া গৌরনাগরী, স্মার্তকুল-অধ্যুষিত এই নবদ্বীপ-সহরে মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করেন। শ্রীধামে অপ্রাকৃত ধামবাসিগণই অবস্থানপূর্বক তাঁহার সেবার অধিকারী, তথায় ধামাপরাধী দুর্জ্ঞানগণের কোন স্থান নাই বা থাকিতে পারে না। শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যরাশি উলূকের ন্যায় তাঁহাদের কখনই দর্শনের বিষয়ীভূত বস্তু নহে। “দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে য়েছে সূর্য্যের কিরণ॥” আবার “অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥”—আলো-অন্ধকার, সজ্জন-দুর্জ্ঞান চিরদিনই পাশাপাশি অবস্থিত।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপাশীস্ প্রার্থনা

বর্তমান বর্ষে পূর্ব পূর্ব শ্রীগুরুবর্গের লেখনী-নিঃসৃত দার্শনিক প্রবন্ধাবলী শ্রীপত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবস্মৃতি-বিষয়ক, সংসমালোচনা-মূলক, অতিমর্ত্য জীবনী-শিক্ষা-সম্বলিত, শ্রীনাম-মহিমা-সম্বিত প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়ায় সর্বস্তরের পাঠকবর্গের তত্ত্ব-সিদ্ধান্তানুশীলনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অপরাপর পদ্য-গদ্য রচনাগুলিও সুধী সজ্জন-সমাজের তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ প্রদান করিয়াছে।

পরিশেষে শ্রীপত্রিকার গ্রাহকবর্গ, সেবানুকূল্য-বিধানকারী ও উপদেষ্টগণকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদনসহ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ, শ্রীলক্ষ্মী-বরাহ-নৃসিংহদেব, শ্রীরাধা-গিরিধারীজীউর অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনামুখে বক্তব্য সমাপন করিলাম।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali
month, i.e. once in a month.
3. Printer's name—Tridandi Swami Bhakti Vedanta
Acharyya Maharaj
Nationality—Indian Goudiya-Vaishnaba
Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W.B.
4. Publisher's Name —Do
Nationality — Do
Address — Do
5. Editor's Name—Tridandi Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Narayan Maharaj
Nationality—Indian Goudiya-Vaishnaba
Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W.B.
6. Name and address of individuals who own the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital,— Tridandi Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 28.2.98

Sd./ *Swami B.V. Acharyya*
Signature of Publisher

✠	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্কেজে।	✠
ধর্মঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাসু যঃ।		নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।
✠	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	✠

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্কেজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫০শ বর্ষ }

৩ মধুসূদন, প্রদ্যুম্ন, ৫১২ শ্রীগৌরান্দ
৩১ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৪০৪, ইং ১৪/৪/৯৮

{ ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীকেশবাস্টকম্

[শ্রীমদ-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীকেশবায় নমঃ

নব-প্রিয়কমঞ্জরীরচিত-কর্ণপূব-শ্রিয়ং
বিনিদ্রতর-মালতীকলিত-শেখরেগোজ্জ্বলম্।
দরোচ্ছ্বসিত-যুথিকাগ্রথিত-বল্লু-বৈকঙ্ককং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ১ ॥

অভিনব কদম্ব-মঞ্জরী যাঁহার কর্ণভূষণ, বিকশিত মালতী-মালায় যাঁহার মৌলি
সুশোভিত ও যিনি ঈষৎ-বিকশিত অতি সুন্দর যুথিকামালা গলদেশে ধারণ করিয়া সাযংকালে
বন হইতে ব্রজধামে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

পিশঙ্গি মণিকস্তনি প্রণতশৃঙ্গি পিঙ্গেক্ষণে
মৃদঙ্গমুখি ধুমলে শবলি হংসি বংশিপ্রিয়ে।

ইতি স্ব-সুরভীকুলং তরলমাহুয়ন্তং মুদা

ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ২ ॥

“হে পিশঙ্গি! হে মণিকস্তনি! হে প্রণতশৃঙ্গি! হে পিঙ্গেক্ষণে! হে মৃদঙ্গমুখি! হে ধূমলে! হে শবলি! হে হংসি! হে বংশিপ্রিয়ে!”—ইত্যাদি সম্বোধন-বাক্যে স্বীয় গাভীগণকে ব্যগ্র হইয়া আহ্বান করিতে করিতে যিনি বনমধ্য হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ২ ॥

ঘনপ্রণয়-মেদুরান্ মধুর-নন্দগোষ্ঠী-কলা-

বিলাস-নিলয়ান্ মিলদ্বিবিধ-বেশ-বিদ্যোতিনঃ ।

সখীনখিল-সারয়া পথিসু হাসয়ন্তং গিরা

ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৩ ॥

যাঁহারা প্রগাঢ়-প্রণয়হেতু অতি-স্নিগ্ধ, সুমধুর পরিহাস-বাক্যে ও নৃত্য-গীতাদি কলাবিলাসে কুশল এবং যাঁহারা নানাপ্রকার বেশভূষায় সুশোভিত, এবম্বিধ বয়স্যদিগের সহিত হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে অরণ্য হইতে যিনি ব্রজমধ্যে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥

শ্রমাস্থ-কণিকাবলী-দরবিলীঢ়-গণ্ডান্তরং

সমূঢ়-গিরিধাতুভিলিখিত-চারু-পত্রাকুরম্ ।

উদঞ্চদলিমগুলী-রুচিবিড়ম্বি-বক্রালকং

ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৪ ॥

বিন্দু-বিন্দু শ্রমজলে যাঁহার গণ্ডদেশ সুশোভিত, যাঁহার মুখমণ্ডলে নানাবিধ গৈরিক ধাতুদ্বারা পত্রাকুর লিখিত হইয়াছে এবং যাঁহার কুটিল-কুন্তলের শোভায় মধুলোভে চঞ্চল অলিবৃন্দের শোভা তিরস্কৃত হইয়াছে, এইরূপ বেশে বিপিন হইতে ব্রজমধ্যে সমাগত নন্দনন্দন সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥

নিবদ্ধ-নব-তর্গকাবলী-বিলোকনোৎকণ্ঠয়া

নটং-খুরপুটাঞ্চলৈরলঘুভির্ভুবং ভিন্দতীম্ ।

কলেন ধবলাঘটাং লঘু নিবর্তয়ন্তং পুরো

ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৫ ॥

যে-সকল গাভী গোষ্ঠে আবদ্ধ অভিনব বৎসদিগকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া খুরাঘ্রদ্বারা ভূমি খনন করিতেছে, তাহাদিগকে বেনুনিদাদদ্বারা নিবর্তন করিতে করিতে যিনি বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৫ ॥

পদাঙ্কততিভির্বরাং বিরচয়ন্তমধ্ব-শ্রিয়ং

চলন্তরল-নৈচিকীনিচয়-ধূলি-ধূস্রশ্রজম্ ।

মরুপ্লহরী-চঞ্চলীকৃত-দুকূল-চূড়াঞ্চলং

ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৬ ॥

যিনি ধবজ-বজ্রাদি চরণচিহ্নদ্বারা পথের অতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছেন অগ্রে ধাবমান গাভীগণের খুরোখিত ধূলি-পটলে যাঁহার বনমালা ধূস্রবর্ণ হইয়াছে, মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চালিত হওয়ায় যাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ও চূড়া চঞ্চলিত হইতেছে, এইরূপ বেশে যিনি বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৬ ॥

বিলাস-মুরলী-কলধবনিভিরুল্লসন্মানসাঃ
ক্ষণাদখিলবল্লবীঃ পুলকয়ন্তুমন্তুর্গৃহে ।
মুখবর্দধতং হৃদি প্রমুদিতাঞ্চ গোষ্ঠেশ্বরীং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥

যিনি বিলাস-মুরলীর মধুর-ধবনিদ্বারা গৃহাবস্থিত মাতৃতুল্য যাবতীয় ব্রজাঙ্গনাগণের চিত্ত উল্লাসিত ও অতিশয় আনন্দহেতু তাঁহাদিগের কলেবর পুলকিত করিতেছেন এবং যিনি জননী যশোদার হৃদয়ে অতিশয় আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চিতং
স্মিতাক্ষুর-করশ্চিত্তৈনটদপাঙ্গ-ভঙ্গীশতৈঃ ।
স্তনস্তবক-সঞ্চরনয়ন-চঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৮ ॥

দর্শনের নিমিত্ত অট্টালিকায় আরুঢ়, ঈষৎ-হাস্যযুক্ত ব্রজ-যুবতীগণের কটাক্ষমালায় যিনি সংকৃত হইতেছেন এবং যিনি পুষ্পস্তবকে ভ্রমর-গতির ন্যায় তাহাদিগের কুচাগ্রমণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অরণ্য হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, আমি সেই শ্রীকেশবকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

ইদং নিখিল-বল্লবীকুল-মহোৎসবোল্লাসনং
ক্রমেণ কিল যঃ পুমান্ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকম্ ।
তমুজ্জ্বলধিয়ং সদা নিজ-পদারবিন্দদ্বয়ে
রতিং দদদচঞ্চলাং সুখয়তাদ্বিশাখা-সখাং ॥ ৯ ॥

যিনি ব্রজ-রমণীগণের আনন্দবর্দ্ধক অতি মনোহর এই পদ্যাষ্টক যথাক্রমে শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন, বিশাখা-সখা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উজ্জ্বল-ধীসম্পন্ন করিয়া নিজ পাদপদ্মে অচলা রতি জন্মাইয়া চিরসুখী করেন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৭ পৃষ্ঠার পর]

১৩। ভক্তি-প্রতিকূল ষড়্ বেগ সাধকের কি অনিষ্ট করে?

“কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা—এই সকল উৎপাত মানবের মনে সর্বদা উদ্ভিত হইয়া, বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বৈগকর বচনের প্রয়োগের দ্বারা, মানসের বেগ অর্থাৎ নানাবিধ মনোরথের দ্বারা, ক্রোধের বেগ অর্থাৎ রূঢ়-বাক্যাদির প্রয়োগদ্বারা,

জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত-ভেদে ষড়্‌বিধ রস-লালসার দ্বারা উদরের বেগ অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজন-প্রয়াসের দ্বারা, উপস্থের বেগ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগ-লালসার দ্বারা মনকে অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট করে, সুতরাং চিত্তে ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন হয় না।”

—পাঃ পঃ বৃঃ ১

১৪। অক্-চন্দন-বনিতা-ভোগাদির সুখ নিত্য,—না অনিত্য?

“স্ত্রী-সন্তোগ, আহার, গাত্রমার্জ্জন, অনুলেপন, সুগন্ধি-সেবন প্রভৃতি যত প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ আছে, তাহা অত্যন্ত অনিত্য, ভোগ হইবামাত্রই দুঃখের উদয় হয়। মদ্যপায়ী ও বেশ্যাগামী পুরুষদিগের চরিত্রই ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। স্বর্গের নন্দন-কানন, উর্বরশী-মেনকাদি অঙ্গরার নৃত্য ও ভোগ এবং অমৃত পানেই বা কি নিত্যসুখ আছে? সেই সমুদায়ই ইন্দ্রিয়সুখের কাল্পনিক উৎকৃষ্টতা মাত্র।”

—তঃ সূঃ ২৭ সূঃ

১৫। দ্রব্যাসক্তি ভক্তি-বিঘ্নকর কেন? উহা কিরূপে দূরীভূত হয়?

“দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহদ্বারে, ব্যবহার্য্য-দ্রব্যে, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজ-শরীরে, ভোজ্য-বস্তুতে, বৃক্ষ-পশু প্রভৃতিতে গৃহী লোকের নিসর্গসিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন কোন লোকের ধূমপানে, তাম্বুল-ভোজনে, মৎস্য-মাংসাদিতে এবং মাদক বস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থ-সাধনে তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্যাদির লোভে ভগবৎ-প্রসাদাদিতে আদর করে না। ধূমপানে মুহূর্মুহু স্পৃহা দ্বারা অনেকের ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি আশ্বাদন এবং দেবমন্দিরে বহুক্ষণ অবস্থিতি নিবারিত হয়। নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহু যত্নপূর্ব্বক সেই সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজনসুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি ভক্তিপূর্ণ চেষ্টার দ্বারা ঐ সকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করা চাই। ভগবদ্ভক্তিসম্মত ব্রতচারণের দ্বারা ঐ সকল দূরীভূত হইয়া থাকে।”

—সঙ্গত্যাগ, সঃ তোঃ ১১। ১১

১৬। ভোগ্যদ্রব্য-সঙ্গ কি কি? অনুকল্প-বিধানে কোন্ কোন্ দ্রব্যের সঙ্গত্যাগ ও সঙ্কোচ করিবার বিধি আছে? কিরূপে দ্রব্যসঙ্গ-ত্যাগ হইতে পারে?

“ভোগ্যদ্রব্য দুই প্রকার—অর্থাৎ প্রাণরক্ষক ও ইন্দ্রিয়তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্যই প্রাণরক্ষক এবং মৎস্য, মাংস, তাম্বুল, মাদকদ্রব্য, তাম্রকূটাদির ধূমপান—এই সমস্তই ইন্দ্রিয়-তোষক। ব্রতদিনে—ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ না করিলে ব্রত হয় না। (ব্রতদিনে) যতদূর সাধ্য প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহও পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থানুসারে যে অনুকল্পের বিধান, তাহাতে প্রাণরক্ষক দ্রব্য সকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহা করা চাই। ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্যের অনুকল্পাদি নাই, পরিত্যাগই বিধি। ভক্ত-জীবের ভোগ-প্রবৃত্তিই খর্ব্বাভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি এরূপ মনে হয়—‘কষ্টে-সৃষ্টে অদ্য ত্যাগ করিয়া আবার কল্য সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ করিব’, তবে ব্রতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না; কেন না, ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যসঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জন্য ব্রতসকল নির্ণীত হইয়াছে।”

—সঙ্গত্যাগ, সঃ তোঃ ১১। ১১

১৭। কোন্ ব্যক্তি অদর্শনীয়? কাহাদের সঙ্গ বিধেয়?

“গুরুর প্রতি অপরাধী দ্রুর ব্যক্তিগণকে কখনও দেখিবে না। গুরু ও বৈষ্ণবে যাঁহারা একনিষ্ঠ, এরূপ পুরুষদিগের সহিত সর্বদা সঙ্গ করিবে।”

—শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ, ৪৯, সং তোঃ ৭। ৪

১৮। বৈষ্ণব-নিন্দকের প্রতি মহাভাগবতের ব্যবহার কি?

“বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি।

ভকতি-বিনোদ, না সন্তাষে' তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি।।”

—কঃ কঃ ‘প্রার্থনা’ (লালসাময়ী)—৭

১৯। ভক্তির প্রতিকূলাচরণকারীর প্রতি শরণাগতের ব্যবহার কি?

“বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।

প্রতীপ-জনে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে।।”

—শঃ

২০। লোকাপেক্ষায় সত্যে ঐকান্তিকতা পরিত্যাগ করা কি উচিত?

“বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত, লোকাপেক্ষা করিয়া নানা-স্থানে নানা-মতে মত দেওয়া উচিত নয়।”

—‘সাধুবৃত্তি’, সং তোঃ ১১। ১২

২১। কাহাদের সহবাস উচিত নহে? বিষয়াতুরগণ যদি বৈষ্ণবচিহ্নধৃক হ'ন, তবে তাহাদের সঙ্গ কি বিধেয়?

“দেহাভিমানী ব্যক্তির সহিত সহবাস করিবে না। বিষয়াতুর বঞ্চকগণ যদি বৈষ্ণব-চিহ্নসকল ধারণ করে, তথাপি তাহাদের সহিত সহবাস করিবে না।”

—‘শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ’, ৪৬, সং তোঃ ৭। ৪

২২। জড়বিদ্যায় অনুরাগ ভক্তি-প্রতিকূল কেন?

“জড়-বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা।

মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা।।”

—শঃ

২৩। ভক্তি-প্রতিকূল ও ভক্তির অনুকূল বিদ্যাকে কিরূপভাবে বর্জন ও বরণ করিতে হইবে?

“ভক্তি বাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।।

—কঃ কঃ ‘উপদেশ’—১০

২৪। বিজ্ঞব্যক্তি কি বৃদ্ধ কালের জন্য হরিভজন স্থগিত রাখেন?

“জীবন-সমাপ্তিকালে, করিব ভজন,
এবে করি গৃহ সুখ।

কখন এ কথা নাহি,

বলে বিজ্ঞজন,

এ দেহ পতনোন্মুখ ॥”

—কঃ কঃ ‘প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি’—৪

২৫। ভক্তগণের জীবনযাত্রার বিধি কি? আধিক্য ও ন্যূনতায় কি অসুবিধা হয়?

“ভাল ভাল ভোগ্যদ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না। স্বল্পায়াস-লব্ধ পবিত্র ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ কর। ইহাই ভক্তদিগের জীবনযাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর। অধিক বা অল্প আহরণে শুভ ফল হইবে না। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। আবার উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায়-স্বরূপ শরীরের রক্ষা হইবে না।”

—‘অত্যাহার’, সং তোঃ ১০।৯

২৬। দেবতান্ত্রের নিন্দা ভক্তি-প্রতিকূল কেন?

“অন্য দেবতার অবজ্ঞা করা নিতান্ত নিষিদ্ধ ; * * তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া কৃষ্ণভক্তি-বর প্রার্থনা করিবেন,—কোন জীবকেই অবজ্ঞা করিবেন না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে-সকল দেবোপাসনার লিঙ্গ পূজিত হয় সে-সমুদয়কে সম্মান করিবেন ; যেহেতু তত্তলিঙ্গদ্বারা নিম্নাধিকারস্থ জীবসকল ভক্তির প্রাগ্ভাব শিক্ষা করিতেছে। অবজ্ঞা করিলে নিজের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়, অকিঞ্চনতা-বুদ্ধি খর্ব্ব হইয়া যায়,—চিত্ত আর ভক্তি-পীঠ হইবার যোগ্য থাকে না।

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

২৭। বৈষ্ণব-চিহ্নধৃক ও বৈষ্ণবাভিমानी কোন্ কোন্ ব্যক্তির সঙ্গে পরিত্যজ্য?

বৈষ্ণবচিহ্নধারী ও বৈষ্ণব-অভিমানকারীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে অবশ্য পরিহার করিবে,—

(১) যাহারা কেবল ধূর্ততাপূর্ব্বক বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করে। (২) কেবল অভেদবাদ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চালাইবার জন্য যাহারা বৈষ্ণব-আচার্য্যদিগের অনুগত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়। (৩) অর্থ-লোভে, প্রতিষ্ঠা-লোভে বা কোনপ্রকার ভোগ-লোভে যাহারা বৈষ্ণবপক্ষীয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।” —চৈঃ শিঃ ৩।২

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

“যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা

য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশ-বিভবঃ।

ষড়ৈশ্বর্যোঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং

ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥”

ভগবান্ একই বস্তু ; বিভিন্ন ভূমিকা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যে বিভিন্ন প্রতীতি, তাহাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ নামে অভিহিত। ব্রহ্ম ভগবানের অঙ্গকান্তি। সমগ্র জগতে অন্তর্যামিসূত্রে যে তিনি ব্যাপ্ত আছেন তাহাই তাঁহার পরমাত্মস্বরূপ। স্বয়ংবস্তুর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিত্যলীলাময় স্বরূপে যে অবস্থান তাহাই ভগবত্তা। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্। তিনি

কেবল অর্চা বা বৈভবাবতার নহেন। একই ভগবান্ অর্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্ব—এই পঞ্চভাবে প্রকাশিত। মূলবস্তু এক। তিনি মূলবস্তু। তিনি নারায়ণের অবতার নহেন। নারায়ণ তাঁহারই ঐশ্বর্য্যময় প্রকাশ। ইনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—অদ্বিতীয়, চৈতন্য-কৃষ্ণ অপেক্ষা জগতে শ্রেষ্ঠবস্তু আর কিছুই নাই। তিনি পরতত্ত্ব, সকল কারণের কারণ। তাঁহার আকর্ষণে জড়ের রূপ-রসাদির আকর্ষণের সামর্থ্য নাই। ভগবানের সেবার্থ সকল বস্তু, শক্তি ও শক্তিপরিণত জগৎ। এই কৃষ্ণচৈতন্য বস্তুটিকে প্রণাম করিতে গিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার মহাবদান্যতার কথা আমাদেরকে জানাইয়াছেন,—

“নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।”

এই প্রণামমস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রকাশিত হইয়াছে। নাম—কৃষ্ণচৈতন্য, রূপ—গৌরবর্ণ, গুণ—মহাবদান্যতা, লীলা—প্রেমপদ। ভগবদ্বস্তু তিনি মহাপ্রেমপ্রদ মহাবদান্য—মাধুর্য্যের দাতা। মাধুর্য্যবিগ্রহ যে কৃষ্ণ অপকাশিত, তাহা যোগ্য ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হন, চৈতন্যচন্দ্রের দয়ায়। তাঁহার দান শারীরিক বা ঔপাধিক উন্নতিবিধায়ক মাত্র নহে। পরমাত্মার দান জীবকে আত্মবিৎ করা। মনোধর্ম্মী অনাত্মবিৎ দেহারামী, ইন্দ্রিয়তোষণপর বদ্ধ জীবমণ্ডলী চৈতন্যের বদান্যতা লাভে কেবল জড়ভাবমুক্ত নহেন। জড়ভাবমুক্তি তদীয় আংশিক দয়া। পরিমিত ও অপরিমিত দয়া পৃথগ্ বস্তু। যে কৃষ্ণের কথা কেহ জানিত না, তদ্বিষয়ের মধুরিমা তিনি তদাশ্রিত ব্যক্তির হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রেমের সীমা নাই। শ্রীউদ্ধব যে প্রেমদর্শনে উন্মাদিত হইয়াছিলেন, তিনি তাহা যোগ্যযোগ্য নিবির্বশেষে দান করিয়াছেন। কৃষ্ণ যে পরিমাণ নিজপ্রেম দান করিয়াছেন, ইনি তদপেক্ষা অধিক উদার হইয়া অকাতরে দান করিয়াছেন।

তদীয় রূপ কনকভ, শ্যাম নহে। উদারতার বিনিময়ে যেখানে মাধুর্য্য সেখানে শ্যামসুন্দর। উদারতার প্রাচুর্য্যে শ্যামসুন্দর-রূপ কনকবর্ণে আবৃত। নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদ্বারা বস্তুর পরিচয়। শ্রীরূপ গোস্বামী অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া নমস্কার করিতে প্রস্তুত হইয়া এই শ্লোকে সেবকাভিমান করিয়াছিলেন। দামোদরস্বরূপও শ্রীক্ষেত্রে তদীয় পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

“হেলোদ্ধ লিতখেদয়া বিশদয়া প্রোক্ষ্মীলদামোদয়া

শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।

শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া

শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমনোদয়া।।”

হেলাক্রমে যাঁহার দয়ায় আমাদের যাবতীয় ধূলির আবরণ আপনি বাতাসে উড়ীন হয়। ধূলিগুলি খেদের আকার। ত্রিতাপ বিনষ্ট হয়। বৈদান্তিকপ্রবর দামোদর কাশী হইতে সমস্ত বিদ্যালাভ করিয়া তদীয় স্বভাব হইতেই এই বাক্যগুলির অভিব্যক্তি করিয়াছেন। অন্যের দানে অমঙ্গল আনয়ন করে। ঔষধবিশেষ তাৎকালিক ব্যথা নিবৃত্ত করিয়া অন্য দোষ আনয়ন করে। তাঁহার দয়া ধনজাতীয়, ঋণজাতীয় নহে। উন্মীলদামোদয়া—প্রস্ফুটিত সুগন্ধযুক্ত। দুর্গন্ধহীন মাত্র নহে, সৌগন্ধবিস্তারী। বিশদয়া—নির্ম্মলা। তিনি শাস্ত্রগণের সমস্ত

বিবাদ প্রশমিত করিয়াছেন। তাঁহার দয়ায় তামস, রাজস, সাত্ত্বিক শাস্ত্রগুলির পারস্পরিক বিবাদ সমতা লাভ করিয়াছে। আপাতবিরোধী ব্যাপারসমূহ সমসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। ভেদবাদী ও অভেদবাদীর বিরোধ পূর্বে চলিতেছিল, গৌরসুন্দরের অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতবিচারে সে-সমস্ত প্রশমিত হইয়াছে। রসদা—তিনি রস দান করেন। বিকৃত, অসম্পূর্ণ, জাগতিক রস নহে। শাস্ত্রের বিবাদের প্রশমনে জীবমাত্রকে রসিক ও ভাবুক করিতে রসদান করিয়া চিন্তে উন্মাদনা অর্পণ করেন। মৎসর ভাব তত্ত্বদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া পরানন্দে উল্লসিত হইবার সুযোগ প্রদান করে। তাঁহার দয়া জীবকে নিরন্তর ভগবানের সেবায় রত করে, নিত্যদাস্যই জীবের স্বরূপ। জীব মুক্ত হইলে তাঁহার নিত্যদাস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দাস্যের প্রতি উদাসীন হইলে (জীব?) বিশ্বের প্রভু হন—অন্য বস্তুর সেব্য বা অভক্ত হন। নিত্যবস্তুর সেবায় আগ্রহ জন্মাইলে আবার ভক্ত হইব। তখন অন্যবস্তুর সেবাগ্রহণে উৎকণ্ঠা হইবে না। ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্যচেষ্টা যেন না থাকে, তখন ইহাই লক্ষ্য হইবে,—

“ঈহা যস্য হরেদাস্যে কৰ্ম্মণা মনসা গিরা।

নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে।।”

জীবন থাকাকালে বদ্ধ ভাবাপন্ন হইলে ভোগই কর্তব্য মনে হয়। বিশ্ব-দর্শনে ভোগসিদ্ধি। পরব্যোমের উপরিস্থ গোলোকান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবায় নিরত হইলেই মঙ্গল হইবে—ভোগবুদ্ধি হ্রাস পাইবে। তদন্যথায় অমঙ্গল।

“কৰ্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।

বিপশ্চিন্নশ্চরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।”

পরিবর্তনশীল জগৎ দর্শনে গুণজাতজগতে কৰ্ম্মপ্রবৃত্তি অমঙ্গলপ্রদ। বিরিঞ্চি লোক পর্য্যন্ত অমঙ্গলপূর্ণ। কৰ্ম্মের কর্তৃত্ব যে ভূমিতে ক্রিয়মাণ তাহাই অমঙ্গলপ্রদ। নিত্যতত্ত্বের অভাবে কৰ্ম্মকাণ্ড। কৰ্ম্মমিশ্রা ভক্তি কৰ্ম্মে পরিণত হইয়া অমঙ্গল আনয়ন করে। অতি ভাগ্যবান্ লোকেই ভগবদ্ভক্তি লাভ করে। নতুবা কৰ্ম্মমিশ্রা ভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত হয়। সমদা—ভগবন্নিষ্ঠাদানকারী। মাধুর্য্যমর্যাদা—ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মধুরিমার মহিমা প্রদান করে। আত্মবৃত্তিতে অবস্থিত করান মহাপ্রভু। কৃষ্ণের লীলায় কেবল যোগ্যব্যক্তিকে, কিন্তু চেতন্য-লীলায় আপামর সাধারণ সকল ব্যক্তিকেই প্রেমদান করিয়াছেন।

“যারে দেখ, তারে কহ, কৃষ্ণ উপদেশ।

আমার আজ্ঞায় গুরু হএগ তার এই দেশ।।”

কৰ্ম্মীরা কর্তৃত্বের অভিমানে কালান্তিপাত করেন। অহঙ্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্য প্রচেষ্টা হয়। শ্রীচৈতন্যের বিচার “কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।” অহঙ্কারীর হরিকীর্ত্তন হয় না। তাহার হরিকীর্ত্তন কেহ শুনে না।

“বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।

এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যঃ।।”

সমগ্র জগৎ বশীভূত করা যায় যদি সংযত হই।

সনাতন ধর্ম

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠার পর]

‘নাস্তিক্যবাদ’-শব্দটা আমাদের দেশে একটা গালাগালি বলে বলা হয়। লোকটা ‘নাস্তিক’ অর্থাৎ ভাল নয়। নাস্তিক-শব্দটা বিশ্লেষণ করুন—ন + অস্তি। অস্তি-শব্দের অর্থ হচ্ছে যা থাকে, বিদ্যমানতা লক্ষ্য করে। নাস্তি—যা থাকে না। নাস্তিক কোন্টা?—যারা বলে বিশ্ব নেই, পৃথিবী নেই, জগৎ মিথ্যা, তারাই নাস্তিক। যদি এই জগৎ মিথ্যা বলি, তাহলে এই জগৎটা নেই, এটা একটা নাস্তিক্যবাদের কথা। তারা বলে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম সত্য হয়ে লাভ কি? বা ব্রহ্ম সত্য না হয়ে যদি মিথ্যাই হয়, তাহলে আমাদের লোকসান কি? ‘ব্রহ্ম সত্য জগৎমিথ্যা’ বললেই বুঝতে হবে লোকটা নাস্তিক। যদি ব্রহ্ম সত্য স্বীকার করেন তাহলে জগৎ মিথ্যা বলতে গেলে ব্রহ্মও মিথ্যা হয়ে যাবে। আমরা যদি বলি সব ভগবান্—পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব ভগবান্, তাহলে সব ভগবান্ বলা যা কথা, আর ভগবান্ নেই বললেও সেই কথা। তফাৎ কিছু হয় না। আমরা সবাই যদি ভগবান্ সেজে যাই, আর যদি বলি ভগবান্ নেই, সে একই কথা। কিছুই তারতম্য হয় না। ভগবান্ আছে—একথা বলার সার্থকতা কিছু নেই। এগুলো লজিক্, তর্কশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ইহা স্বীকার করেছেন। এইজন্য সকলেই ভগবান্—এই যে বিচার, এটা নাস্তিকতাপূর্ণ। এটা সনাতন ধর্মের বিচার নয়। এটাকে সনাতন ধর্ম বলা হয় না।

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহা ভুলি’ গেল।

এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল।।

একরকম বলতে গেলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বের আমাদের বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ। তার ভিতরে সনাতন ধর্মের কথা বিচার করে দিয়েছে। সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—

‘কে আমি’, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।

ইহা নাহি জানি—‘কেমনে হিত হয়’।।

সনাতন গোস্বামী প্রাইম্ মিনিস্টার ছিলেন। সমগ্র ভারত চালাতেন তিনি। তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা সম্বন্ধে বহু গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এত বড় বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, উন্নত ব্যক্তি তিনি প্রশ্ন করেছেন মহাপ্রভুর কাছে,—“কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।” তিনি কি জানতেন না, তিনি কে? আমি কে আমার পরিচয়টা ঠিক করে দিন। আমি যদি কে না জানি তাহলে সনাতন ধর্ম যাজন করব কি করে? এইটী মূল প্রসিঙ্গ্যল্। ভগবান্—এই কথাটি বলা মাত্রই জীবনিচয় সমন্বিত তত্ত্ববস্তুকে বুঝায়। ভগবান্ আছেন, জীব নেই—একথার কোন সার্থকতা নেই। ভগবান্ আছেন, থাকেন থাকুন, জীব না থাকলে ভগবানকে মানছে কে? ঈশ্বর আছেন—একথা বললেই জীবতত্ত্ব আছে, তার উপাসক আছে, এটা বুঝতে হবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি

সূর্য্য। সূর্য্য বললেই সূর্য্যের যে আকার থালায় মত গোল এটাই বুঝি, সূর্য্যমণ্ডল বুঝি, তার কিরণগুলি বুঝি। সূর্য্য বললেই এ সকল জিনিষগুলো এতে অনুসৃত আছে। ওর কোনটাকে বাদ দিলে আর সূর্য্য থাকে না। থাকলেও সূর্য্য বলে স্বীকার করা হবে না। সূর্য্য অস্ত গিয়েছে তার মানে কিরণ সমেত, তেজ সমেত, জ্যোতি সমেত সমস্ত কিছু নিয়ে অস্ত গিয়েছে। সূর্য্য উদয় হয়েছে অর্থাৎ সবশুদ্ধ সূর্য্য উঠেছে। সূর্য্য বললেই তার কিরণকণা সমেত বোঝাবে, তা না হলে সূর্য্য বোঝায় না, সূর্য্যের কোন মানে হয় না। সেইপ্রকার ভগবান্ বললেই তাঁর সেবক নিয়ে, জীব নিয়ে—সবসমেত তাঁকে বুঝতে হবে। তাদের বাদ দিলে ভগবন্তা বলে আর কোন জিনিষ থাকে না।

জগৎ নিরীশ্বর হয়ে যাচ্ছে। নিরীশ্বর জগৎ হয়—চার্ব্বাক মুনি যে বিচার করেছেন, সে জগতের কোন ঈশ্বর নেই। পাশ্চাত্ত্য জগৎ, খ্রীষ্টান্ থিওরি, তারা বলেছে,—‘World is an accident.’ পৃথিবীটা কোথা থেকে এল? এ সম্বন্ধে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অস্বীকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে দার্শনিকরা বলেন,—‘World is an accident.’ হঠ করে কোথা থেকে একটা হয়ে পড়েছে। এর কোন যুক্তি, তর্ক, বিচার তাঁরা খুঁজে পান নি। তাঁদের দার্শনিক চিন্তার মধ্যে আসেনি। কিন্তু জগৎটা কি? এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ কি করে হল? কোথা থেকে এল? সনাতন ধর্ম্ম এর যুক্তি, তর্ক, বিচার দিয়েছেন।

এই যে আমরা পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করে বসে আছি এর হাত থেকে, প্রকৃতির হাত থেকে আমরা নিষ্কৃতি পেতে চাই। ভারতবর্ষে ছয়টি দর্শন আছে—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ববর্মীমাংসা ও জৈমিনীর উত্তর মীমাংসা—বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র। এই ছয়টি দর্শন আমাদের ভারতবর্ষে চলছে। এক একটা দর্শনের যা বিচার, যা গভীরত্ব, তাদের যে দার্শনিকত্ব সেটা বিচার করলে মনে হবে অসাধারণ ঋষিগণ সব বলে গেছেন। কিন্তু এই যে ছয়টি দর্শন এর মধ্যে প্রথম কয়টি দর্শনকে নাস্তিক্য দর্শন বলেছে। কেন না তারা ঈশ্বর মানে নি, ভগবান্ স্বীকার করেনি। তারা বলে জগৎ মিথ্যা, জগৎ বলে কিছু নেই। এখন মায়ার প্রভাবে ভুল করে আমরা দেখছি। প্রকৃতপ্রস্তাবে জগৎ বলে কিছু নেই।

তাহলে আমরা যেটা দেখছি সেটা কি প্রকার? ‘সর্পেতে রজ্জুভ্রম, আর রজ্জুতে সর্পভ্রম।’ অন্ধকারে রাস্তায় চলতে চলতে একটা দড়ি দেখেছি, সেই দড়িটা দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠেছি। কি এটা? একটা সাপ! কি একটা বস্তু রাস্তার উপরে আঁকাবাঁকা হয়ে পড়ে আছে, আমরা গেলেই কামড়ে দেবে। এই যে রজ্জুটা একে আমরা সাপ মনে করে ভয় পাচ্ছি! এই যে পৃথিবীটা এটা নেই। এটা জগৎ মনে করে সুখ, দুঃখ, হেন-তেন ইত্যাদি কত কিনা তার মধ্যে এনে হাজির করেছি। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, এটাও তেমনি, আসলে কিন্তু নেই। তথাপি আমরা একে জগৎ মনে করছি। এইপ্রকার যুক্তি দেখিয়ে বলেছে যে জগৎ নেই। আমাদের কথা হচ্ছে যে, যে দড়িটা দেখলাম, দড়িটা দেখে সর্পভ্রম হয়েছে। একটা হাতীভ্রম হয় নি, বা একটা তালগাছ ভ্রম হয় নি, বা একটা সুপারী গাছ পড়ে আছে এটাও মনে করিনি। দড়িটা দেখে সাপ মনে করেছি। ভ্রম স্বীকার করি, কিন্তু ভ্রমের লক্ষণ কি? সাদৃশ্যলক্ষণ ; এই জগৎটা “সর্ববৎ খন্দিদং

ব্রহ্মা” এটা জগৎ নয় এ ভ্রম, ভুল করে বলছ। নাস্তিক্য দর্শন থেকে এসব বিচার আসছে। “সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম”—উপনিষদের এ কথা আমরা অস্বীকার করি না। নাস্তিকরা এই উপনিষদ-বাক্যের যে অর্থ করেন, সেই অর্থটা নাস্তিকতাপূর্ণ। উপনিষদ বেদের বাক্য। তা আমরা ঘাড় হেঁট করে মানি। এগুলো সত্য কথা, অস্বীকার করবার উপায় নেই। এসব ব্রহ্ম বলে উড়িয়ে দিলে জগৎ বলে কিছু নেই কি?

বুদ্ধদেব বলেছেন,—সম্প্রোপম, ময়োপম। স্বয়ং শাক্যসিংহ বলেছেন,—বিশ্বজগৎটা শূন্যবাদ। তিনি স্থাপন করেছেন শূন্য থেকে সব সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের শঙ্করাচার্য্য তারই যুক্তি অবলম্বন করে এই কথাটা চালিয়ে দিচ্ছেন যে, কলি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। ভগবানের ইচ্ছা হয়েছে যে কলিকালটা চালাব। তা কলিটা চলবে কি করে? কতকগুলো কথা তাদের শিখিয়ে দেই। সেই কথা দিয়ে সংসারটা চালালে বেশ কলিটা চলবে ভাল। এজন্য স্বয়ং শিব আমাদের দেশে এসব হাজির করে দিয়েছেন। কলি-শব্দের অর্থ বিবাদ, তর্ক। একজন একটা কথা বললে তার সঙ্গে আর একটা কথার উত্তর দিতেই হবে। এ রহস্যের একটা যুক্তি দিচ্ছি,—

“একটা জেলখানায় একজন জেলপুলিশ একজন কয়েদিকে চাবুক মেরেছে। তা সেই কয়েদিটা তখন সেই জেলপুলিশকে বলছে যে, তুই আমাকে মারিস্, তুই জানিস্ না আমরা তোদের বাবা! বাবা কিরে? কয়েদি বলছে,—‘আমরা চুরি করি বলেই জেলখানা তৈরী হয়েছে। আমরা এই জেলখানায় বাস করি। আমাদের জন্য এ জেলখানা হয়েছে। আর এই জেলখানায় এসেছি বলেই তোর চাকরী হয়েছে। তুই তোর স্ত্রী, পুত্র, মা, বাপকে খাওয়াতে পারছিস্। আমরা যদি চুরি না করতাম তোর বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র খেতে পেত না। মরে যেতিস্। কাজেই আমরা তোর বাবা। আমরা চুরি করে জেলে এসেছি বলেই তোর চাকরী হয়েছে।”

‘যুক্তি’! কলিকালে যুক্তির কোন অভাব নেই। সত্যিই সেই চোরটা চুরি করে যদি জেলে না আসত, দেশে যদি চোর, ডাকাত না থাকত, দেশ থেকে যদি ক্রিমিন্যালগুলো উঠে যেত, তবে জেলখানা থেকে তোদের চাকরিও উঠে যেত। কলিতে এইপ্রকার ছলযুক্তি বহু আছে, এগুলো বলা হয়। এই কথাগুলো জগতে এইভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে। জগৎ নেই, এটা সম্প্রোপম! আমরা স্বপ্নে দেখছি বাঘ আসছে, ভয়েতে ঘাবড়ে গেছি। বাঘে আমাদের খেয়ে ফেলবে, ভয়ে স্বপ্নেতে চীৎকার করছি। কিন্তু কোথায় বাঘ, কোথায় কি স্বপ্নেতে হচ্ছে, এদিকে মশারীর নীচে শুয়ে আছি। এই বিশ্বজগৎটা মিথ্যা, তুমি স্বপ্ন দেখছ, যুক্তি দিচ্ছেন। যুক্তি দিয়ে বলা যাচ্ছে, কথাটা ঠিক ত’। বাঘ দেখেছি বেশ! এই যে রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে বেশ! একটা হাতীভ্রম হল না, তালগাছ ভ্রম হল না। এই যে স্বপ্নের বিকার এটা সাদৃশ্যালক্ষণ থেকে হচ্ছে। মিথ্যা থেকে হচ্ছে না। জগৎকে যদি আমি ব্রহ্ম বলি তাহলে ব্রহ্মটা এইপ্রকার। তারা যে ব্রহ্মযুক্তি দিচ্ছে সেই ব্রহ্মকে এইরকম বলতে হবে। দালান, কোঠাবাড়ী, লোকজন চলছে এইপ্রকার। তাহলে ব্রহ্মেতে জগৎ ভ্রম হবে কেন? ব্রহ্মেতে জগৎভ্রম হতে পারে, ব্রহ্মের সাদৃশ্যালক্ষণগুলি যদি জগতের মধ্যে থাকে তাহলে। আমরা ব্রহ্মকে জগৎ মনে করি,

আর সেই সাদৃশ্যলক্ষণগুলি যদি ব্রহ্মের মধ্যে বিন্দুমাত্র না থাকে তাহলে জগৎ ব্রহ্ম—
এটা বলা চলবে না। এটা মিথ্যা কথা। ভুলের প্রধান বস্তুই হচ্ছে সাদৃশ্যলক্ষণ।

‘সর্ব্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম’—শাস্ত্রের এই এ্যাডভান্টেজ্ নিয়ে এটাকে ব্রহ্ম বলে যদি
বলতে চাই ‘সোহং’—আমিও ব্রহ্ম। কোন যুক্তি অবলম্বন করে যদি এইসব কথা
বলতে চাই তাহলে সনাতন ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যেতে হবে। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-স্তোত্র

আলোলচন্দ্রক-লসদ্বনমাল্য-বংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়-কেলিকলা-বিলাসম্।
শ্যামং ত্রিভঙ্গ-ললিতং নিয়ম-প্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৩॥

চন্দ্র-সম শোভা, জন-মন-লোভা,
গলে বনমালা দোলে।

(যাঁর) বংশী, রত্নমালা, হস্ত করে আলা,
দরশে ভকত ভোলে॥

প্রণয়-কেলিতে, বিলাস করিতে—
রত থাকে সদা যিনি।

ললিত ত্রিভঙ্গ, সুন্দর শ্যামাঙ্গ,
শ্রীগোবিন্দদেব তিনি॥

শ্রীগোবিন্দরূপ, অতি অপরূপ,
তুলনা নাহিক তার।

সব ছাড়ি’ মন! গোবিন্দ-চরণ,
ভজ তুমি নিরন্তর॥ ৩॥

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমস্তি
পশ্যন্তি পাপ্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দ-চিন্ময়-সদুজ্জ্বল-বিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪॥

কৃষ্ণের বিগ্রহ হয় চিদানন্দময়।

কৃষ্ণনাম অপ্রাকৃত, জড়বস্তু নয়॥

নাম-রূপ-গুণ-লীলা সকলি চিন্ময়।

প্রাকৃত বস্তুর সম নশ্বর না হয়॥

যদিও চিচ্চক্তি-ছায়া বহিরঙ্গা মায়া।

তথাপিহ এক নয় বুঝ মন দিয়া॥

জড়েতে হেয়ত্ব দোষ আছেয়ে সতত।
 কিন্তু এই দোষ-শূন্য হয় চিৎ তত্ত্ব ॥
 কৃষ্ণের আত্মা ও দেহ একতত্ত্ব হয়।
 বদ্ধজীব-আত্মা, দেহ কভু এক নয় ॥
 অঙ্গী হ'লেও কৃষ্ণের সব আছে পূর্ণ।
 অঙ্গও শ্রীকৃষ্ণ হ'তে নহেক অপূর্ণ ॥
 চিদানন্দময় দেহ পরম উজ্জ্বল।
 সবেবদ্রিয়ে সর্বব্যাপ্য করয়ে একল ॥
 চিৎ-অচিৎ অনন্ত জীব-সমূহেরে।
 নিয়তই দর্শন-পালন যিনি করে ॥
 সেই আদি গোবিন্দের চরণ-যুগল।
 ভজহ সতত মন হ'য়ে নিরমল ॥

—ত্রিদিগ্গিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ

শূন্যবাদ ও নিবির্বশেষবাদ

মিথ্যাকে স্থাপন করিতে গিয়া বুদ্ধদেব সত্যকে অবলম্বন করায় অকৃতকার্য হইয়াছেন। সত্য বলিলে মিথ্যাকে মিথ্যা বলিতে হয়। বুদ্ধের শূন্যবাদ স্থাপনচেষ্টায় কপটতা, মিথ্যা বা মায়া নাই। তিনি সরলভাবে তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন ; কোনরূপ প্রচ্ছন্নতা, আবরণ, ধূতামি বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। এই কারণে শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; সর্বত্র সমাদৃত হয় নাই। দার্শনিকগণ তাঁহার মতবাদকে শূন্যবাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধের এই অকৃতকার্যতা উপলব্ধি করত সত্যকে আশ্রয় না করিয়া মিথ্যাকে আশ্রয় করত আচার্য্য শঙ্কর নিজ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন।

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।

বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৬৮)

আচার্য্য শঙ্করের এই চাতুর্য্যে তথাকথিত জ্ঞানিগণ মোহিত হইয়া ব্রহ্মকে নিবির্বশেষ তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরন্তু শঙ্করের এই নিবির্বশেষ, বুদ্ধের শূন্যবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে,—জ্ঞানিগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বুদ্ধদেব সরলভাবে ব্রহ্মকে শূন্য বা নাই বলিয়াছেন, আর শঙ্কর তাহাই 'নিবির্বশেষ' শব্দের আবরণে 'ব্রহ্ম' বলিয়াছেন। বিশেষহীন ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরাকার, নিঃশক্তিক, নিষ্ক্রিয়, নিঃশব্দ প্রভৃতি বাক্য ছলনা বা মিথ্যা বলিয়াছেন। এই কারণে প্রকৃত জ্ঞানিগণ শঙ্করবাদকে ফল্গাকার বলিয়াছেন। ব্রহ্ম বলা হইল, কিন্তু তাহার নাম, রূপ, গুণ, শক্তি, ক্রিয়া কিছুই নাই বলায় শূন্যই স্থাপিত হইয়াছে। ইহাই মিথ্যাশ্রয় ; ইহাই আচার্য্য শঙ্করের চাতুর্য্য।

আচার্য্য শঙ্কর এইরূপ কেন করিয়াছেন, তাহা পদ্মপুরাণে শঙ্কর নিজ উক্তি

প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবানের অসুরগণকে মোহিত করার ইচ্ছাকে সিদ্ধজন্যই ভক্ত-শঙ্করের এই লীলা। ভগবান্ তাঁহাকে আদেশ করিলেন,—

স্বাগমৈঃ কল্লিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।

মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।। (পঃ পুঃ উঃ খঃ ৬২।৩১)

ভগবান্ মহাদেবকে কহিলেন,—কল্লিত স্বাগমদ্বারা (আসুরিক) মানবগণকে আমার প্রতি বিমুখ কর, আমা হইতে বিমুখ করিয়া তাহাদিগকে সংসার-বুদ্ধিকার্য্যে আসক্ত কর।

এই শ্লোকটি বিশেষভাবে বিচার করিলে দেখা যায়,—বিবাহদ্বারা সৃষ্টিরক্ষা কার্য্যটি ভগবানের মোহন-লীলা। “সকলেই যদি বিবাহ না করে তাহা হইলে সৃষ্টি নাশ হইয়া যাইবে”—এরূপ কর্তব্যতা আসুরিক বিচার।

প্রবন্ধের মূল আলোচনায় অধিকরূপ দেখা যায়, আচার্য্য শঙ্কর নিজবাক্যেও তাঁহার মতবাদকে মিথ্যা বলিয়াছেন,—

মায়াবাদমসচ্ছাত্ত্বং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা।।

মহাদেব পার্শ্বতীকে কহিলেন,—দেবি! আমি কলিকালে ব্রাহ্মণরূপে বৌদ্ধবাদকে মায়াবাদরূপ অসচ্ছাত্ত্ব (মিথ্যাবাক্য)-দ্বারা প্রচার করিয়াছি।

বুদ্ধদেব বেদকে স্বীকার করেন নাই, এজন্য তাঁহাকে নাস্তিক বলা হয়। কারণ বেদ ব্রহ্মকে তত্ত্ব বলিয়া প্রকাশ করে। সুতরাং বেদ মানিলে সবিশেষ ব্রহ্মকে মানা হয়। ব্রহ্ম বলিলে চিদচিদ সমস্তই স্বীকার করা হয়। উপনিষদে ব্রহ্ম কি-প্রকার তাহা বলা হইয়াছে।—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিগ্জাসস্ব তদ্বন্দ্বোতি।” অর্থাৎ যাহা হইতে এই ভূতগণ (ক্ষিত্যাদি) সৃষ্ট হয়, রক্ষিত হয়, এবং পরিশেষে যাহাতে সংহত হইয়া প্রবিষ্ট হয় তিনিই ব্রহ্ম; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।

বৌদ্ধবাদের অসারতা সহজেই উপলব্ধ হয়। শূন্যই যদি সত্য হয়, কোন কিছুই যদি অস্তিত্ব না থাকে, তবে আলোচনা কেমন করিয়া সম্ভব হয়। কে কাহাকে জানাইতেছেন। ইহা চিন্তা করিলে বৌদ্ধবাদ অযৌক্তিক ও অসত্য সহজেই বোধগম্য হয়।

মায়াবাদও এই বিচারে অসত্য প্রতিপন্ন হয়। একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার না করিলে যুক্তি বিচারসহ হইতে পারে না। বেদ বা উপনিষদের অন্য বাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে। বিশেষহীন ব্রহ্ম সত্য হইলে—মায়া এবং বিবর্তগ্রস্ত কে হইল? ব্রহ্মের প্রতি কাহার বিবর্ত হইল? ব্রহ্ম নিজেই বিবর্ত করিয়া “ইদং সর্ব্বম্” বলিতেছেন না কি? নিঃশক্তিক ব্রহ্মের এইরূপ অনুভব করাও অসম্ভব নহে কি? বিবর্ত স্বীকার করিলে ব্রহ্মের পারতমত্ব ও অদ্বৈতত্ব বিনাশ পায়। আচার্য্য শঙ্কর যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাও কি বিবর্ত নহে? তাঁহার বিবর্ত আশ্রয় করিয়া কাহারও অদ্বৈতসিদ্ধি ঘটিবে কি? ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।

গীতাবাক্য বিচারকালে আচার্য্য শঙ্কর কৃষ্ণকে কখনও মায়াগ্রস্ত, কখনও নিরুপাধিক ব্রহ্ম বলিয়াছেন।—ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? “মন্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়” —গীতার ৭।৭ শ্লোক বিচারকালে গীতার বক্তা কি নিরুপাধিক ব্রহ্ম হইলেন? যদি তাহা স্বীকার করিতে হয়, তবে নিরুপাধিক ব্রহ্মের বাক্শক্তি অবশ্যই স্বীকৃত হইল। ইহাতে ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলা মিথ্যা হয়। পক্ষান্তরে বাক্শক্তিয়ুক্ত স্বীকার করিলে ব্রহ্ম সবিশেষ হয়েন। ব্রহ্ম কখনও নিঃশক্তিক, কখনও শক্তিমান্ হইলে দুইপ্রকার ব্রহ্ম স্বীকৃত হয়।

ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহা বেদের বাক্য। বেদ কি সত্য নহে, তাহা কি বিবর্তবাদ? এইরূপে আচার্য্য শঙ্কর উপাধিক ব্রহ্ম ও নিরুপাধিক ব্রহ্ম—দুই ব্রহ্মের স্বীকার করায় তাঁহার অদ্বৈতবাদ সত্য হয় না।

শাস্ত্রে পরমব্রহ্ম বাক্যের বিদ্যমানতাতে ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেও উন্নত তত্ত্বের প্রকাশ দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণতত্ত্বকেই পরমব্রহ্ম বলা হয় এবং ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহার আশ্রিতকে বুঝায়। পরম ব্রহ্মের অনন্ত রূপ বর্তমান। নিবির্বশেষ স্বরূপও পরমব্রহ্মের একটি রূপ। ব্রহ্মকে যাঁহারা নিবির্বশেষরূপে চিন্তা করেন তাঁহারা পরমব্রহ্মের নিবির্বশেষরূপকে লাভ করেন। ইহাতে তাঁহাদিগকে মোহিত বলিয়াই বোধ হয়। ব্রহ্মের সর্বপ্রকার হীনতা বা শূন্যতাই তাঁহাদের আদরনীয়। হেয়তাই তাহাদের রুচিকর হওয়া কি মোহ নহে? শেষকে অনাদর করত হেয়কে আদর করা দুর্ভাগ্য হয়। ইহাই পরমব্রহ্মের উক্তি :—“অব্যক্তাগতির্হি-দুঃখম্।” নিবির্বশেষ অদ্বৈতসিদ্ধি আনন্দ নহে, তাহা কেবল দুঃখ। ইহা অসুরগণের সুধার পরিবর্তে সমুদ্রোত্তিত বিষপান হয়।

গীতার “ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্” বাক্যটি বিচার করিলে ব্রহ্মকে আশ্রিত তত্ত্ব বুঝায়, কৃষ্ণকে আশ্রিত বুঝায় না। কৃষ্ণকে আশ্রয় বুঝায়। নিবির্বশেষ ব্রহ্ম গীতার উপদেশক হইতে পারেন না। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সর্বত্র বক্তা। কৃষ্ণকে নিবির্বশেষ ব্রহ্মের আশ্রিত জ্ঞান করা অজ্ঞতা ও আসুরিক বিচার। “মন্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়” —নিবির্বশেষ ব্রহ্মের উক্তি নহে, ইহা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। কৃষ্ণের শরীরকে পাঞ্চভৌতিক মনুষ্যশরীর মনে করিলে মূঢ়তা ও অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। শ্যামসুন্দরকে বেদ-উপনিষদে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের আশ্রয় বলিয়াছে। “জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপম্ অতুলং শ্যামসুন্দরম্”—ইহাই বুঝায়।

গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদের দেহরক্ষার পরেও শঙ্করাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎকার এবং আচার্য্য শঙ্করের রচিত মাণ্ড্যকারিকার ভাষ্য দেখিয়া তাহার প্রশংসা করা সত্য হইলেও গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদের অদ্বৈতসিদ্ধি হয় নাই স্বীকার করিতে হয়। বিদ্যারণ্য ভারতীকে আচার্য্য শঙ্করের অবতার বলিয়া স্বীকার করিলে শঙ্করাচার্য্যেরও অদ্বৈতসিদ্ধি হয় নাই প্রকাশ পায়।

জীব মুক্ত হইলেও ব্রহ্ম বা ভগবান্ হয় না, কারণ জীবাত্মার স্বরূপ নিত্য ও সনাতন। তাহার স্বরূপের পরিবর্তন ঘটে না। জীব অংশ এবং তটস্থা বা জীব শক্তির অংশ বলিয়া গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।”

মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম হইলে সনাতনত্ব থাকে না। অণুস্বরূপ পরিবর্তিত হইয়া বৃহদব্রহ্ম হয় না। অংশকে অংশী বলা অসঙ্গত হয়। আরও বিচার্য্য বিষয়—একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই যখন বর্তমানতা নাই, তখন মায়া বা পাশ, জীব তত্ত্বের বর্তমানতা কোথায়? মায়া যদি ব্রহ্মকে বদ্ধ করিতে পারে তবে মায়াই বৃহদব্রহ্ম হয় না কি? এই সমস্ত বিচারে নির্বিশেষবাদের অসত্যতা প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ ব্রহ্ম সর্বিশেষ, নির্বিশেষ নহে। শূন্যবাদ-প্রচারক বুদ্ধ ও ভগবান্ বুদ্ধ নহেন। বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরাও তাঁহাকে ভগবান্ বলেন না। শূন্যবাদ-প্রচারক বুদ্ধ অষ্টাদশ বুদ্ধ। ইনি নেপালের নিকটবর্তী কপিলাবস্তু স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ বুদ্ধ কীকটদেশে গয়াতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের মাতার নাম—অঞ্জনা ; গৌতমবুদ্ধের মাতার নাম—মায়াদেবী। পিতার নাম—শুদ্ধোদন। গৌতমবুদ্ধ শূন্যবাদের প্রচারক ; ভগবান্ বুদ্ধ অহিংসা পরমধর্মের প্রচারক এবং দশাবতারের অন্যতম।

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসুত্র ত্রিবিক্রম মহারাজ

ভগবান্ শ্রীচৈতন্য

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহাকে মহাপুরুষ, ধর্মপ্রচারক, সমাজ-সংস্কারক মনে করেন। আবার কেহ কেহ অবতার মনে করেন। কিন্তু মানবমেধা তাঁহার অসমোদ্ধ তত্ত্বের ধারেও পৌঁছিতে পারেন না। শ্রীমহাপ্রভু সকল অবতারের অবতারী। সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ। রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ।

নন্দসুত বলি' যাঁরে ভাগবতে গাই।

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি।।

জগৎ উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমহাপ্রভুরূপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-গৃহে শচীগর্ভ সিন্ধুমাবে উদয় হইয়াছিলেন।

মহারাজ নিমিকে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজন মুনি বলিতেছেন,—

“ইতি দ্বাপর উবর্ষীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্।

নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।।

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাহকৃষ্ণং সাক্ষোপাস্ত্র-পার্ষদম্।

যজ্ঞেঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।। (ভাঃ ১১।৫।৩২)

যিনি কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় কীর্তনপর কৃষ্ণ উপদেষ্টা অথবা ‘কৃষ্ণ’ এই বর্ণদ্বয় কীর্তনের দ্বারা কৃষ্ণ অনুসন্ধান তৎপর, যাঁহার ‘অঙ্গ’—শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত প্রভুদ্বয় এবং ‘উপাস্ত্র’—তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ, যাঁহার ‘অস্ত্র’—হরিনাম মহামন্ত্র এবং পার্ষদ—শ্রীগদাধর-দামোদরস্বরূপ, রামানন্দ, রূপ, সনাতন প্রভৃতি। যিনি কান্তিতে ‘অকৃষ্ণ’ অর্থাৎ পীত (গৌর), সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরকে কলিয়ুগে সুমেধাগণ সঙ্কীর্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

কলিযুগে যুগধৰ্ম নামের প্রচার।

তথি লাগি' পীতবর্ণ চৈতন্য অবতার।।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন,—

“অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।

কলৌ সঙ্কীর্ণনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাস্রিতাঃ।।”

বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন।

“মহান্ প্রভুর্বে পুরুষঃ সত্ত্বসৌষ প্রবর্তকঃ।

সুনির্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।।” (শ্বেতাস্থতর উপনিষদ)

অর্থাৎ—এই পুরুষই মহাপ্রভু। ইনিই বুদ্ধিবৃদ্ধির প্রবর্তক। ইহার কৃপাতেই সর্বদোষ বিবর্জিত নিত্যশান্তি পাওয়া যায়। ইনি জ্যোতির্ময় অর্থাৎ মূর্তিমান্ হইয়াও অব্যয়। ইনি অনাদি ও অনন্ত।

মহাভারত অনুশাসন-পর্বের শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে দেখা যায়,—

“সুবর্ণবর্ণো হেমাস্তো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।

সন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।।”

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

“আসন্ বর্ণাঙ্গয়োহস্য গৃহুতোহনুযুগং তনুঃ।

শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।” (ভাঃ ১০।৮।১৩)

গর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সংস্কারের সময় নন্দমহারাজকে বলিতেছেন,— এই যে শ্যামল বালক—ইনি প্রত্যেক যুগেই দেহধারণ করেন। ইনি ক্রমশঃ শ্বেত, রক্ত এবং পীতবর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।—“পীতবর্ণ কলিপাবন গোরা।”

অনন্ত সংহিতায়,—

অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।

শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বধুনী-পরিবারিতে।।

ঐ অনন্ত সংহিতায় পার্বতী দেবীর প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব বলিতেছেন,—

“য আদিদেবোহখিললোকনাথো, যস্মাদিদং সর্বমভূৎ পরাত্মা।

লয়ং পুনর্যাস্যতি যত্র চান্তে, তং কৃষ্ণচৈতন্যমবেহি কান্তে।।”

অর্থাৎ—হে দুর্গে! যিনি আদিদেব, অখিললোকের স্বামী, পরমাত্মা এবং যাঁহা হইতে সমগ্র জগতের উৎপত্তি এবং যাঁহাতে সমগ্র জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়, সেই তিনিই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুই একমাত্র পরম দেবতা এবং সর্বরূপী। তিনিই অন্যান্য যুগে শ্বেত, রক্ত, শ্যামলরূপ ধারণ করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, চিৎশক্তিমান্, বেদান্তবেদ্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। পরমাত্মা সর্বচৈতন্যস্বরূপ। তিনিই সঙ্কর্ষণ বাসুদেব। তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা, চন্দ্র, বৃহস্পতি সমস্ত দেবতা, চরাচর জীব এবং নিত্য অনিত্য সমস্ত বস্তুই উৎপন্ন হইয়াছে।

তৈরিক বিপ্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভু অষ্টভূজ মূর্তি দেখাইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে রাধাকৃষ্ণ মিলিততনু গৌরহরিরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ বলিলেন,—

“পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসীস্বরূপ।

এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ।।

তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।

তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা।।

তাহাতে প্রকট দেখি স-বংশীবদন।

নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন।।” (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৬৭-২৬৯)

শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম মহাপ্রভুর ষড়্ভূজ মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমুরারিগুপ্ত তাঁহার বরাহরূপ ও চতুর্ভূজরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গনাথ ধামে যুধিষ্ঠির-নামে এক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীবেঙ্কটভট্ট তাঁহাকে কৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।—এই প্রকার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতার নহেন, তিনি অবতারী। তিনি সর্বকারণ-কারণ।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৭ পৃষ্ঠার পর]

“রসো বৈ সঃ।” রস-স্বরূপ পরতত্ত্ব রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত রস-বৈচিত্র্য বিদ্যমান। সকল বৈচিত্র্যে সকলের চিত্ত সমানভাবে আকৃষ্ট হয় না। লোকের রুচি এবং প্রকৃতিও একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন রস-বৈচিত্র্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের চিত্ত ন্যূনাধিক আকৃষ্ট হয়। তাই উপাস্য-ভাবের এবং উপাসনা-প্রণালীতেও স্বাভাবিকভাবেই পার্থক্য থাকিবে এবং বিভিন্ন রসের উপাসকগণও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িবেনই। সেই কারণে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রতিকূলতা থাকিবে, তাহারও কোন ন্যায়সঙ্গত হেতু নাই। প্রকৃতপক্ষে এইরূপে নিকৃষ্টভাবে যাহা সাম্প্রদায়িক নহে, এমন কোনও একটা জিনিষ হইতে পার্থক্য সূচনার জন্যই “সাম্প্রদায়িক-ধর্ম” কথাটির প্রয়োগ। এই অর্থে সকল ধর্মই যখন সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে, কোন ধর্মই যখন অসাম্প্রদায়িক থাকে না, তখন নিশ্চিতভাবেই বুঝিতে হইবে, সম্প্রদায়-বিশেষের আচরিত বলিয়াই কোনও ধর্মকে ‘সাম্প্রদায়িক-ধর্ম’ বলা সমীচীন নহে।

প্রতিটি দর্শনেরই দুইটি বিচার আছে—একটি সাধারণ, অপরটি বিশেষ—যাহা উন্নত অধিকারের। সাধারণ বিচারে সকলেই মানুষ হিসাবে পরিচিত হইলেও, বিশেষ বিচারে আমাদের সকলেরই একটি পিতৃ-পরিচয় বা বংশ-পরিচয় থাকে এবং ইহাও পরিচয়ের একটি বিশেষ মাপকাঠি।

যাহাদের এই পরিচয় নাই তাহারা অনেক সময় বংশাভিজাত্যকে সঙ্কীর্ণচেতা বলিয়া ভ্রান্ত উদারচেতা দেখাইতে গিয়া মিথ্যা গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া থাকেন।

কিন্তু পিতৃ-পরিচয়হীন ও বংশ-পরিচয়হীন জন্ম বাস্তবক্ষেত্রে সমাজের চক্ষে যে কতখানি কলঙ্কের ও লজ্জার, তাহা নিশ্চয়ই কেহই অস্বীকার করিবেন না। তদ্রূপ সাধন-ভজনের ক্ষেত্রেও সাধক-সাধিকার একটা বংশগত পরিচয় থাকে, যাহা “গুরু-পরম্পরা” বা “সম্প্রদায়” বলিয়া পরিচিত। যাহাদের সেই পরিচয় নাই, তাহারা যতই মাথা খুঁড়িয়া মরুক না কেন, সমস্তই অরণ্যে রোদনে পরিণত হইবে এবং তাহাদের পরিচয়ও ঐরূপ লজ্জাজনক ও উৎপাতের কারণ হইবে। শাস্ত্রে ইহা সুস্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে।—

“সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রান্তে বিফলা মতাঃ।

শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।।” (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ সম্প্রদায়-বিহীন যে মন্ত্র তাহা কখনই ফলদায়ী নহে। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই ধরণীকে পবিত্র করে বা উদ্ধার করে।

বুদ্ধিমান্ অভিজ্ঞ কৃষক বপনোদ্দেশ্যে যখন বীজ সংগ্রহ করেন, তখন তিনি যেস্থান সেস্থান হইতে বীজ পাইলেই তাহা লইয়া বপন করেন না। কারণ তিনি জানেন, তাহাতে শুধু তাঁহার পণ্ডশ্রম, সময় নষ্ট ও অর্থদণ্ড মাত্রই হইতে পারে। ওই বীজ হইতে ফল লাভ করা ত’ দূরের কথা, হয়ত’ তাহাতে অঙ্কুরোদগমই হইবে না। তজ্জন্য তিনি বিশ্বস্ত ও সর্বজন-স্বীকৃত স্বনামধন্য বীজ-ব্যবসায়ীর নিকট হইতেই বীজ সংগ্রহ করিবেন। কারণ সেই বীজের ভালমন্দের জন্য সেই দোকানদার দায়ী থাকেন। তদ্রূপ ফললাভেচ্ছু ভজনশীল ব্যক্তিও উক্ত চারিটা সর্বশাস্ত্র-স্বীকৃত সম্প্রদায় হইতেই ভক্তিলতারূপ বীজমন্ত্র সংগ্রহ করিবেন এবং তাঁহারাই সৌভাগ্যবান্ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিবেচিত হইবেন। কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে—

“সম্বন্ধ জানিয়া ভজে,

তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,

আর সব মরে অকারণে।।

শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটা সম্প্রদায়ের সংক্ষেপে মূল কথা হইল যথাক্রমে :—

(১) শ্রী-সম্প্রদায় :— শ্রীরামানুজাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য। ইঁহার অভ্যুদয়কাল ৯৩৯ শকাব্দ, মতান্তরে ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। এই সম্প্রদায়ের মতবাদের নাম হইল “বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ”। এই দর্শনে পরতত্ত্ব—‘ঈশ্বর’, ‘চিৎ’, ও ‘অচিৎ’—এই তিন প্রকার বিভাগে নিজ-শক্তিদ্বারা নিত্য প্রকাশমান্ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। বস্তুর অদ্বয়তা ব্যাখ্যাত না হইয়া বস্তু-শক্তির বৈচিত্র্যে ভগবান্ তিন প্রকারে নিত্যকাল লীলাবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। ‘চিৎ’ ও ‘অচিৎ’—এই উভয়ের ‘ঈশ্বর’ অখিলকল্যাণগুণৈক-নিলয় পুরুষোত্তম ভগবান্। তিনি অনন্ত নিত্য শক্তিমান্ সর্বিশেষ-বস্তু। স্বগত, স্বজাতীয়, ও বিজাতীয়-বিশেষ তাঁহাতে নিত্য বিরাজমান। ইঁহারা শক্তি পরিণামবাদী।

(২) ব্রহ্ম-মধ্ব সম্প্রদায় :—শ্রীমধ্বাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য। ইঁহার আবির্ভাবকাল ১০৪০ শকাব্দ, মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দ। এই সম্প্রদায়ের মতবাদের নাম হইল “শুদ্ধদ্বৈতবাদ”। এই দর্শনে সর্বশক্তিমান্ রসময় ভগবান্ ও আশ্রয়রূপ

ভক্ত—নিত্য সেব্য-সেবক-সম্বন্ধবিশিষ্ট। আশ্রয়রূপ জড়বস্তু সেব্য-সেবক-সম্বন্ধরহিত হইয়া তৃতীয় বস্তু। বিষয় এক হইলেও আশ্রয়ের বহুত্ব নিবন্ধন ভক্ত অসংখ্য এবং জড়বস্তুও অসংখ্য। এইভাবে পাঁচপ্রকার নিত্যভেদসত্তা সর্বদা শ্রীভগবানে নিত্যবৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতেছে।

(৩) রুদ্র-সম্প্রদায় :—শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীধরস্বামী এই সম্প্রদায়ের বিখ্যাত দুই আচার্য্য। “শুদ্ধাদ্বৈতবাদ” হইল এই সম্প্রদায়ের মতবাদ। এই দর্শনে ভগবত্তায় জড়ের হেয়তা ও ভেদ আরোপিত হয় না। ভগবদুন্মুখ হইলেই চিদর্শন জড়ের ভেদগত-সত্তা-দর্শনের ও সত্য দর্শনের বাধা দেয় না, আবার চিদ্বৈচিত্র্যের নিত্য অস্তিত্বের হস্তারকও হয় না। বিভূ-চৈতন্যের সহিত অণুচৈতন্যের সেব্য-সেবক-ভাবে লীলা, অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক নহে। ভগবদ্বস্তুর অংশ—‘জীব’, বস্তুর শক্তি—‘মায়া’, তজ্জন্য জীব, মায়া ও মায়িকজগৎ—সকলই ‘বস্তু’-শব্দবাচ্য; উহারা ‘বস্তু’ হইতে স্বতন্ত্র নহে। ইহাই হইল ‘শুদ্ধাদ্বৈতবাদ’। ইহাতে কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত ক্ষুরধারের ন্যায় সূক্ষ্ম প্রভেদ। কেবলাদ্বৈতবাদ মায়াকে—অবস্তু, বস্তুকে—নিবির্বশেষ, জীব ও ব্রহ্ম ত্রিবিধ ভেদহীন অভেদ, জগৎ—অসত্য, জৈবজ্ঞানের বিবর্তজন্য তাৎকালিক অনুভূতিময়, জ্ঞান-প্রাকট্য অনুভবকারী, অনুভবনীয়, অনুভবাত্মক প্রভৃতি শুদ্ধাদ্বৈত-বিরোধী বিচার-বিশিষ্ট।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বস্তুপরিণামবাদ হইলেও কেবলাদ্বৈতীর অংশাংশি-বিচারাভাব, বস্তু এবং মায়া-বিচার, চিন্মাত্র-বিচার, জগন্মিথ্যাত্ব-বিচার প্রভৃতির অকস্মণ্যতা শুদ্ধাদ্বৈতী ও বিশিষ্টাদ্বৈতী দেখাইয়া দেন।

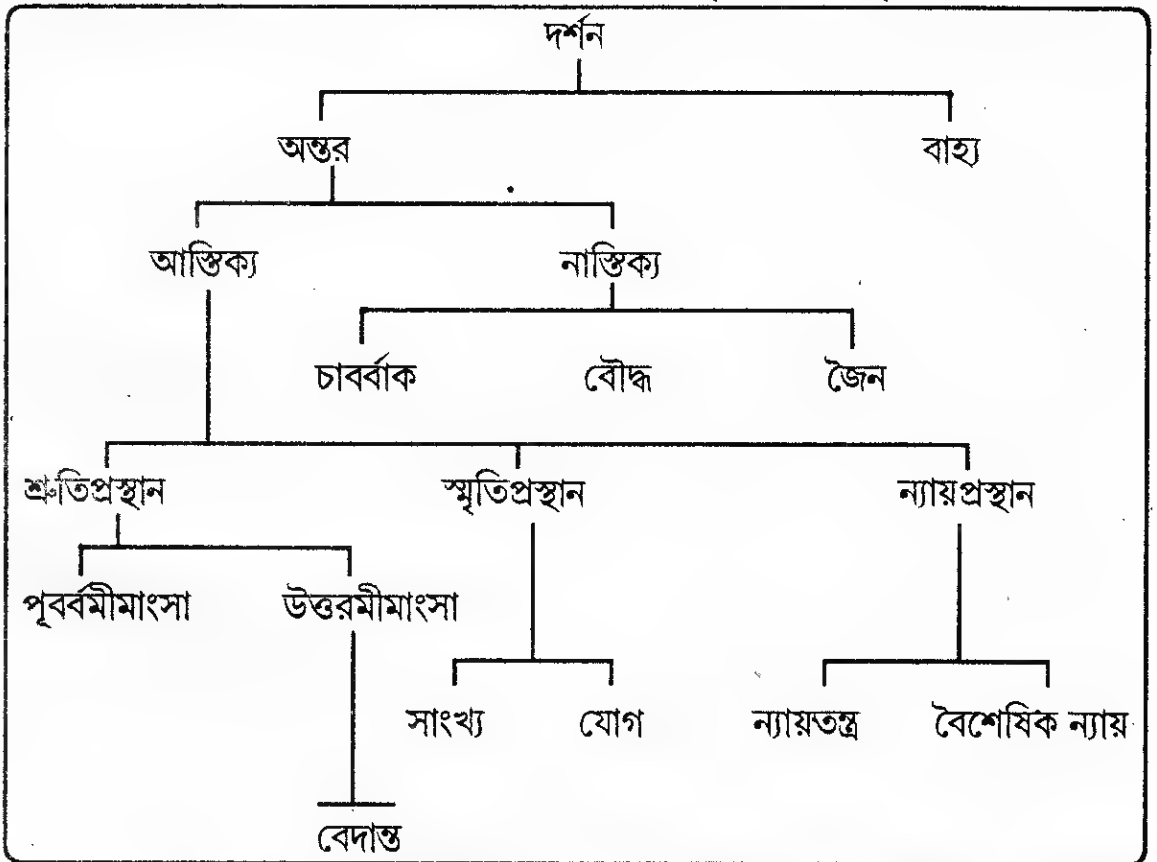
(৪) সনক-সম্প্রদায় :—শ্রীনিব্বাদিত্য এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য। তজ্জন্য এই সম্প্রদায়ের নাম “নিব্বার্ক-সম্প্রদায়”। এই সম্প্রদায়ের মতবাদের নাম “দ্বৈতাদ্বৈতবাদ”। এই দর্শনে চিন্ময় রসবিগ্রহ ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়গত সামগ্রীরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যেস্থানে নিম্নলিখিত আশ্রয়গত চিৎসত্তা, সেস্থানে নিত্যসত্তায় ঘনানন্দের সম্বৈতরূপে শ্রীভগবান্ লীলাময়। যথায় নম্বর সমল আশ্রয়রূপ জড়সত্তা, তথায় শ্রীভগবানের লীলা কৃষ্ণদর্শনে সঙ্কুচিত—বৈকুণ্ঠ হইলেও প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্যত্ব মাত্র দৃষ্ট হয়।

সাম্প্রতিককালে অন্তঃসারশূন্য রঙীন ফানুসের মত বিভিন্ন মতবাদ, বাদানুবাদ ও প্রতিবাদের ঝড় তুলিয়া নিজেরা শুধুই বাদ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যে দর্শনের সুদৃঢ় গ্রাণাইটের উপর এই চারিটি সম্প্রদায়ের চারিটি মতবাদ অদ্যাপিও স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহার একটু মূলানুসন্ধান কর্তব্য। তৎপূর্বে তত্ত্ব-দর্শন, তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত ও মতবাদ শব্দগুলির অর্থ একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। কোনও জ্ঞানী, গুণী বা মহাজন কোন একটী ধারণা পোষণ করিলেন অথবা তাঁহার অনুভবলব্ধ কোন জ্ঞানকে প্রকাশ ও প্রচার করিলেন। তখন তাহা একটী মতবাদ হইল। যে কোন সাধারণ লোকেরও ইহা থাকিতে পারে, তখন কিন্তু ইহা মতবাদ না হইয়া মতামত হইবে।

মতবাদ যখন শাস্ত্রযুক্তির সহিত বিভিন্ন মহাজনানুগ হইয়া একটী সারগ্রাহী বক্তব্য হইবে ও সর্বসাধারণে সমাদৃত ও গৃহীত হইবে, তখন তাহা সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। অতএব সিদ্ধান্ত কখনই নাস্তিক ও অস্তির হইবে না।

দর্শন অর্থে দেখা, বাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা যে দর্শন, তাহা স্থূলদর্শন বা জড়দর্শন ; আর অন্তরেন্দ্রিয়ের বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দর্শন হইল অন্তর্দর্শন। অন্তর্দর্শন দুই প্রকার—আস্তিক্য ও নাস্তিক্য। যাঁহারা বেদ মানেন তাঁহারা আস্তিক্য ; আর যাঁহারা বেদ মানেন না তাঁহারা নাস্তিক্য। বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক প্রভৃতি নাস্তিক্য-দর্শন।

আস্তিক্য দর্শনে তিনটি প্রস্থান আছে—শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান ও ন্যায়প্রস্থান। প্রতিটি প্রস্থানের আবার দুইটি করিয়া ভাগ হইয়া মোট ছয়টি দর্শন হইয়াছে, ইহাই ষড়্‌দর্শন। শ্রুতিপ্রস্থানকে অপৌরুষেয় বলা হয়, কারণ ইহা কোন মনীষীদ্বারা রচিত হয় নাই। ইহা শ্রীভগবানের নিঃস্বসিত বাণী। শ্রুতির দুইটি বিভাগ হইল—পূর্ববমীমাংসা বা কর্মকাণ্ড এবং উত্তর মীমাংসা বা জ্ঞানকাণ্ড। উত্তর মীমাংসা হইতেই বেদান্ত-দর্শন বা ৫৫৫টি ব্রহ্মসূত্র নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্মৃতি-প্রস্থানের দুইটি বিভাগ হইল—কপিলমুনির সাংখ্যযোগ ও পাতঞ্জল মুনির যোগশাস্ত্র। ন্যায়-প্রস্থানের দুইটি বিভাগ হইল গৌতম মুনির ন্যায়তন্ত্র ও কণাদপাদের বৈশেষিক ন্যায়। এই ষড়্‌দর্শনের সম্পূর্ণ চিত্রটি নিম্নরূপ—



ষড়্‌দর্শনের প্রথম তিনটি দর্শন যথা,—পূর্ববমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা ও সাংখ্য বেদ মানেন, কিন্তু ভগবান্ মানেন না। পরবর্তী তিনটি দর্শন—যোগ, গৌতমের ন্যায়, এবং কণাদের বৈশেষিক বেদ এবং ভগবান্ উভয়কেই স্বীকার করেন। বেদান্ত দর্শন হইতেই ক্ষিতিপাবন চারিটি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তবে কেন ইহা ভগবানকে স্বীকার করেন না বলা হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, আচার্য্য শঙ্কর নাস্তিক্যবাদের কবল হইতে বেদকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীভগবানের বিশেষ আদেশে মায়াবাদ বা শারীরক-ভাষ্য প্রচার করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল অসুরদের মোহিত করিয়া আপাততঃ বেদকে রক্ষা করা। বেদ রক্ষা হইলে ভগবান্ স্বীকৃত হইবেনই।

সেই সময়ে বেদান্তের উপর তাঁহার শারীরিক-ভাষ্যই সর্বত্র বিপুলভাবে প্রচারিত হয়। অন্যান্য আচার্য্যগণ তখনও আবির্ভূত হন নাই। সেইজন্য সাধারণ লোক বেদান্ত দর্শনকেও ভগবদ্ভিশ্বাসী নহে বলিয়া থাকে।

পরবর্তিকালে ব্রহ্ম, রুদ্র, শ্রী ও সনক-সম্প্রদায়ের চারি আচার্য্য আবির্ভূত হইয়া মায়াবাদকে খণ্ড করিয়া বেদান্ত দর্শনের উপরেই তাঁহাদের মতবাদ স্থাপিত করিলেন। যাহার সিদ্ধান্ত হইল ঈশ্বর, জীব ও জগৎ সত্য। ইহাতে ময়াবাদ খণ্ডন হইল কিন্তু শঙ্করের সহিত বিরোধ হইল না, কারণ তাঁহারা জানেন—“শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণ স্বয়ম্।” শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, আচার্য্যের দোষ নাই। ঈশ্বরের আজ্ঞাতেই বিশেষ প্রয়োজনে তিনি এই কাজ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু চারিটি সম্প্রদায়ের চারিটি মতবাদের কোন্ মতবাদটি গ্রহণ করিয়াছিলেন? তিনি নূতন কোন মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিনা?—ইত্যাদি নানান অবাস্তব প্রশ্ন শুনিতে পাওয়া যায়। একটু বিশ্লেষণ করিলে সমস্ত জটিলতার অবসান ঘটিবে। মহাপ্রভু যে তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন সেই তত্ত্বের নাম “অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব”। ইহা কোন মতবাদ নহে। মতবাদ কোন উন্নত মনুষ্য-কর্তৃক প্রচারিত হইল, কিন্তু পরবর্তিকালে তদপেক্ষা কোন উন্নততর বাগ্মী ব্যক্তি তাঁহার বাগ্মিতা দ্বারা পূর্বের মতবাদ খণ্ডন করিয়া নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন।

‘তত্ত্ব’ নিত্যসত্য, সনাতন, শাস্ত্র, অনাদি, অবিনশ্বর। যেমন জীব ‘মরণশীল’, ‘মাধ্যাকর্ষণ’ প্রভৃতি। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, অনাদিরও আদি, সেইজন্য তাঁহার সবকিছুই নিত্য ও চিরন্তন সত্য। সৃষ্টি হইলে তাহার বিনাশ আছে। মহাপ্রভু নিত্যসত্য অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বকে প্রকাশিত ও প্রচারিত করিলেন মাত্র। যাহা ষড়ঙ্গ বেদাদি দর্শনের মধ্যেই নিহিত ছিল। ইহা নূতন কিছু সৃষ্টি নহে। সেইজন্য এই তত্ত্ব চারিটি মতবাদের বিরুদ্ধে নহে, পরস্তু উর্দ্ধে।

তত্ত্বটি কিরূপ? “অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।” সেই অনাদিরাদিগোবিন্দ যিনি সমস্ত কারণেরও কারণ তাঁহা হইতেই সমস্ত জীবজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তজ্জন্য “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম”, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” প্রভৃতি বাক্যানুসারে বস্তুগতভাবে তাঁহার সহিত সকলের অভেদত্ব থাকিলেও গুণগতভাবে বহুপ্রকার ভেদ বর্তমান। আবার এই ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ বর্তমান। ইহা কিরূপে সম্ভব? তাহা চিন্তার অতীত। তাই ইহা অচিন্ত্য।

বিষয়জাতীয় ভগবানের সহিত আশ্রয়জাতীয় জীবের নিত্যভেদ বর্তমান থাকিলেও সেবাদ্বারা অণুচৈতন্য জীব সেই ‘রসো বৈ সঃ’ রসস্বরূপ বিভূ ভগবানের কত প্রগাঢ়তম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রসাস্বাদন করিতে পারে, তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিশিষ্টতা ও বিচিত্রতা। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন নবীন সৃষ্টি নহে, নিত্যসত্য তত্ত্ব। বেদান্ত দর্শন এবং চারিটি সম্প্রদায় বা মতবাদ-বহির্ভূত কোন বস্তু নহে, আবার চারিটি সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ একটা মতবাদের অন্তর্গতও নহে। ইহা একটা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। যে বস্তু যত তত্ত্বানুগত সেই বস্তু তত মূল্যবান্ ও গ্রাহ্য, আর যে বস্তুর তত্ত্বের সহিত যত অমিল বা বিরোধ সেই বস্তু তত মূল্যহীন।

কখনও কখনও এই সৎসম্প্রদায়গুলির মধ্যেও নানা উপশাখা বর্দ্ধিত হইয়া আসল

শাখাকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া দেয়। তখন আর সংসম্প্রদায়ের কোন বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কাজে কাজেই সাধারণ মানুষও আর তাহাতে আস্থা বা শ্রদ্ধা রাখিতে পারে না। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে উপশাখার গুরুত্ব বুঝিয়া স্বয়ং ভগবানকে বা তাঁহার একান্ত প্রিয় পার্শ্বদকে আসিতে হয় ইহার উচ্ছেদকল্পে। স্বয়ং অবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তজ্জন্যই অদ্য হইতে পঞ্চাশতাব্দিক বৎসর পূর্বের অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় এই সম্প্রদায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিশেষ কয়েকটি অপসম্প্রদায়কে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। এইগুলি হইল,—

“আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।

সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাত-গোসাঞি॥

অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।

তোতা কহে, এ তেরর সঙ্গ নাহি করি।।”

শ্রীমহাপ্রভু এই তেরটিকে অপসম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করিয়া ইহাদের সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের কিছুদিন পরেই আবার বহু অপসম্প্রদায় সং-সম্প্রদায়কে গ্রাস করিয়াছিল। ভগবৎপার্ষদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এগুলিকে চিহ্নিত করিয়া কঠোরভাবে সম্প্রদায়ের উপর সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিলেন। শ্রীভগবৎ প্রেষ্ঠবর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সেই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া পুনরায় অপসম্প্রদায়গুলিকে সমূলে উৎখাত করিতে প্রয়াসী হইলেন। তথাপি বর্তমানে অসংখ্য অপসম্প্রদায় নির্লজ্জভাবে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় যত্র তত্র গজাইয়া উঠিতেছে। কলিযুগের কি অপার মহিমা! সাধারণ মানুষ ইহাতেই প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইতেছে। ভক্তকবি তুলসীদাস বহুদিন পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন,—

“সাচ্চা কহে তো মারে লাঠা বুটা জগৎ ভুলাই।

গোরস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠল বিকাই।।

চোরকে ছোড়ে সাধকে বাঁধে পথিক্কো লাগায় ফাঁসি।

ধন্য কলিযুগ তেরী তামাসা দুখ্ লাগে অউর হাঁসি।।”

আমরা খুব শান্তভাবে বিচার করিয়া, যাহাতে অপর কাহারও আঘাত না লাগে এইরূপ কৌশলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথকেই সাদরে বরণ করিয়া সানন্দে সুনিশ্চিত মঙ্গলের পথে চলিব। সেই একমাত্র মঙ্গলের পথ হইল এইরূপ,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়সুন্দরাম বৃন্দাবনং

রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্লিতা।

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যেভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই (বেদান্ত-ভাষ্য) নির্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ— ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩২ পৃষ্ঠার পর]

নমো দেব! দামোদরানন্ত! বিষ্ণে! প্রসীদ প্রভো! দুঃখ-জালান্ধি-মগ্নম্।

কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্টাতিদীনং বতানুগ্হাণেশ! মামঞ্জমেধ্যাক্ষি-দৃশ্যঃ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ :—হে (দিব্যরূপ-বিশিষ্ট) দেব! আপনাকে নমস্কার। হে (ভক্তবৎসল) দামোদর! হে (অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিয়ুক্ত) অনন্ত! হে (সর্বব্যাপক) বিষ্ণে! হে (মদীয় ঈশ্বর) প্রভো! হে (পরম-স্বতন্ত্র) ঈশ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমার ন্যায় বহুবিধ সংসার-দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত, অতি দীন, অঞ্জ ব্যক্তিকে (অনুগ্রহ করে) উদ্ধার করুন, এবং কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করে আপনি আমার নয়নের গোচরীভূত হউন ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ :—“এরূপ স্তুতির প্রভাবে সদ্য উদিত প্রেমবিশেষের দ্বারা সাক্ষাৎ-ভাবে তাঁকে দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন পদকর্তা। সাক্ষাৎ-দর্শন-বিষয়ে একমাত্র শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনই শ্রেষ্ঠ উপায়—ইহা মনে মনে স্থির করে ‘তথৈব’—সেই রূপেই, অর্থাৎ শ্রীনাম-কীর্তনমুখেই প্রণত হয়ে কাতরতার সহিত প্রার্থনা করছেন। ভগবানের সাক্ষাদর্শনের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন। এটা মনে মনে স্থির করেছেন ঋষি। তাই সেইভাবে শ্রীনাম-কীর্তন-মুখে প্রার্থনা করছেন—‘নমঃ’ ইত্যাদি। মূল শ্লোকে ‘তুভ্যং’-পদটি অধ্যাহার (যোগ) করতেই হবে। তিনি ভয়, গৌরবাদি অথবা প্রেম-বিকলতা-প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রেমের উদ্বেকে বিবশতাহেতু সাক্ষাত্তাবে ‘তুভ্যং’ অর্থাৎ ‘তোমাকে’ এই শব্দটি প্রয়োগ করেন নি।

সাধারণতঃ আমরা বলি আরাধ্যদেবকে ভয়ে ভক্তি করতে হয়—এটা একটা কথা মাত্র। এ জিনিষটা খুব ছোট বিচার। ভয়ে ভক্তি হয়নি বা ভয়ে ধর্মযাজনের কথা আসেনি—যে কথা বর্তমান দুনিয়ার লোক ব্যাখ্যা করে। শ্রদ্ধাতেই ভক্তি এবং শ্রদ্ধাতেই সাধন-ভজনের কথা এসেছে। আমি ধর্মাচরণ করব ভয়ে পড়ে—এমন কোন কথা নয়; বা কোনরূপ বিপদ-আপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আমি ধর্মাচরণ করব, এটাও ধর্মাচরণের উদ্দেশ্য নয়—শাস্ত্রে তাহা বুঝানো আছে। সাধারণ মানুষ বলেন—ভয়ে ভক্তি, ভয়ে ভক্তি। আসলে ভয়ে ভক্তি হয় না। এখানে যে ‘তুভ্যং’—‘তোমাকে’-শব্দ ব্যবহার করেছেন, এই শব্দের মধ্যে কোনরকম ধরণের ভয়ের কথা নেই। স্বাভাবিক প্রীতি, স্নেহ ভাব নিয়ে তোমাকে প্রণাম করি, তোমাকে নমস্কার করি—একথা বলা হয়েছে।

“হে প্রভো! হে মদীয় ঈশ্বর! (তোমাকে নমস্কার), তুমি প্রসন্ন হও।” ‘নমস্কার’-শব্দের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। কাকে নমস্কার বলব?—আমার যা কিছু অহঙ্কার, অভিমান, দান্তিকতা সব কিছু তোমার চরণে ফেলে দিলাম। আমার দান্তিকতা, অহঙ্কার, বাহাদুরি বলে কিছু নেই। আমার যা কিছু গরিমা সবই তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। আমার বলতে কিছু রাখছি না। “আমার নহিত” আমি—মহাজন-পদের মধ্যে রয়েছে। এটাই হল বাস্তব শরণাগতি, আত্মসমর্পণ। “যেহেতু আমি দুঃখ-জালান্ধি-মগ্নম্” অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণাদি-রূপ সাংসারিক দুঃখসমূহ অথবা তোমার অদর্শনজনিত দুঃখ-পরম্পরার অসীমত্বহেতু সমুদ্রতুল্য তুমি ; আমি স্বকর্মবশে তাতে নিমগ্ন হয়েছি, তুমি আমায়

উদ্ধার কর, রক্ষা কর সংসার-সমুদ্র থেকে। জন্ম-মরণাদি-রূপ যে সাংসারিক দুঃখ তার থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর। অদর্শন—তোমার দর্শন পাচ্ছি না, তোমার স্মৃতি নেই, তুমি আমাকে দর্শন দিয়ে সেই দুঃখ থেকে মোচন কর। এইসব দুঃখের উৎপীড়নে আমি অত্যন্ত পীড়িত ; সুতরাং আমার প্রতি প্রসন্ন হও।” তোমার প্রসন্নতাই আমার একমাত্র কাম্য। তুমি যদি প্রসন্ন না হও আমার প্রতি, তাহলে আমার কিছু করবার নেই।

কে বললেন কথাটা?—বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন একটা শ্লোকে,—“তয়ি প্রসন্নে কিমিহা পরৈর্ন তব্যপ্রসন্নে কিমিহা পরৈর্ন।” তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হও তাহলে আমার আর কোন চিন্তা নেই, আর তুমি যদি আমার প্রতি অপ্রসন্ন হও, তাহলে আমার সব গেল, আমার কিছু নেই আর। যেমন গুরুবৃষ্টিকমের মধ্যে আছে,—“যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো যস্যপ্রসাদান্ গতিঃ কুতোহপি”—যাঁর প্রসাদে সব লাভ হয়, যাঁর অহৈতুকী দয়ায়, করুণায় সব লাভ হয়, আর যাঁর অকরুণায় কিছু লাভ হয় না, সবকিছু থেকে বঞ্চিত হতে হয়—এমন কথা বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের মধ্যে। তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তাহলে আমার সব আছে, আর তুমি যদি আমার প্রতি অপ্রসন্ন হও, তাহলে আমার কিছু নেই। ভগবান্ যাঁকে মেনে নিয়েছেন সেবক-সেবিকারূপে তাঁর আবার চিন্তা কিসের? ভগবান্ যাঁকে নিজের বলে মেনে নিয়েছেন, আত্মস্থ করেছেন, তাঁর ত’ কোন চিন্তা নেই, তিনি ত’ নিশ্চিন্ত। “অরির্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্মং ধর্মোচ্যতে। সুপ্রসন্নে হৃদীকেশে বিপরীতে বিপর্যয়ঃ।।”—কথাটা আছে। ভগবান্ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, গুরু-বৈষ্ণবগণ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহলে কি হবে—‘অরির্মিত্রম্’। আমার কোন শত্রু থাকা উচিত নয়, সবাই আমার মিত্র—এই ভাব নিয়ে আমি চলব। তথাপি যদি কেউ বিরুদ্ধাচরণকারী থাকেন, তিনি আমার মিত্র হয়ে যাবেন। কি করে হবে? ভগবান্ আমার পক্ষে আছেন। “বিষং পথ্যম্”—আমাকে যদি কেউ বিষ দিয়ে দেয় ঈর্ষ্যা, হিংসা করে, ওটা পথ্য হয়ে যাবে। বিষ আর বিষ থাকবে না; ভগবৎকৃপাপ্রভাবে অমৃত হয়ে যাবে। এমন ঘটনা অনেক আছে। প্রহ্লাদকে বিষ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বিষটা অমৃতে পরিণত হয়ে গেছে। মীরাবাইকে বিষ দেওয়া হয়েছিল, সে বিষও অমৃত হয়ে গিয়েছিল। কি করে হয় এটা? ভক্ত ত’ ভগবানকে না দিয়ে খান না। ভক্ত ভগবানকে সবটাই সমর্পণ করেন এবং তাঁর অবশেষ প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। সুতরাং যখন ঐ বিষটা ভগবানকে অর্পণ করেন, তখনই বিষ অমৃত হয়ে যায়। অমৃত খেলে লোক মরে না। “অধর্মং ধর্মোচ্যতে”—সাধারণ বিচারে অধর্ম বলে মনে হচ্ছে একটা জিনিষ ; কিন্তু সেটা ধর্মো পরিগণিত হবে যদি ভগবান্ আমার সহায় থাকেন। এমন অঘটনও হয়?—হ্যাঁ, হবে। যদি ভগবান্ আমার দিকে থাকেন তাহলে হবে। কথাটা সাধারণের মাথায় ঢেকে না, এটা কি করে হবে? এটা ভগবানের বিশেষ করুণায়, বিশেষ ব্যবস্থাপনায় হবে। যেমন কথাটা আছে—“কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়।” ঠিক সেরকম কথা। কাক ত’ কখনও গরুড় হতে পারে না, কিন্তু যদি ভগবান ইচ্ছা করেন, বিশেষ ব্যবস্থা নেন, তাহলে কাককে তিনি গরুড় করতে পারেন। তাঁর ক্ষমতা আছে। অসীম ক্ষমতাবান্ তিনি, তাঁর পক্ষে

সব সম্ভব। ‘সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে’—ভগবান্ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হন তবে। ‘বিপরীতে বিপর্যায়ঃ’—ভগবান্ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন না হন, তাহলে সব উন্টে গেল।

কৃষ্ণ স্বয়ং শুয়ে আছেন, তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে বসলেন সখা অর্জুন ; আর অভিমানী দুর্যোধন মাথার কাছে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। রাজা বলে কথা! কথা ছিল—ভগবান্ প্রথমে যার দিকে তাকাবেন তার সঙ্গে কথা বলবেন। সুতরাং চোখটা খুলতে পায়ের ধারে বসা অর্জুনকে প্রথমে দেখতে পেলেন। তার সঙ্গে কথা হয়েছে। কি চাই তোমার? প্রভু, আপনি ত’ আছেন, আমার আর কোন চাওয়ার বালাই নেই, প্রয়োজন নেই। দুর্যোধন, তোমার কি চাই? আপনি না থাকলেও হবে, তবে আপনার নারায়ণী সেনা পেলে আমি খুশী। ভগবানের নারায়ণী সেনা চাইছে কেন?—ভগবানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হবে। ভগবানের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের বিরুদ্ধে। ভগবদ্ভক্তের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলে ভগবানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা হল। সেই জিনিষটা ঘটছে। ভগবান্ বললেন,—তথাস্তু। ভগবান্কে চাই, সেটা বলতে পারলেন না, কিন্তু ভগবানের নারায়ণী সেনা চাই বললেন। বোকা কোথাকার! আর অর্জুনকে বলতে তিনি বললেন, ঠাকুর তুমি ত’ আছ আমার, তুমি থাকলে আমার সব। বুদ্ধিমান্, যিনি থাকলে আমার সব থাকলেন, যাঁকে পেলে আমার সব পাওয়া হয়, যাঁকে জানলে সব জানা হয়, আমি তাঁকে ত’ চাইব। সেটাই ত’ বুদ্ধিমত্তা। “যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি, যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্বমিদং প্রাপ্তং ভবতি।”—যাঁকে জানলে সব জানা হয়, যাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়, সেই বস্তুকেই ত’ চাইব আমি। দুর্যোধন চাইতে ভুল করেছে। ভগবান্কে চাইল না, নারায়ণী সেনা চাইল। আর অর্জুন বললেন, তুমি আছ ত’ সব আছে আমার। অন্য কিছু দরকার নেই আমার, তুমি থাকলেই হবে। কেন?—“যতো ধর্মাস্ততো জয়ঃ।” যে দলে ভগবান্ আছেন সেই দলের জয় হবে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে—মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছেন—কোন দলের জয় হবে? উত্তরটা কি এসেছে?—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণে যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিধ্ববা নীতিস্মৃতিস্মম্॥

যে দলে ভগবান্ আছেন, সেই দলের জয় হবে ; যেখানে ধনুর্ধর পার্থ আছেন, সেই দলের জয় হবে—এটাই আমার স্থির বিশ্বাস। এটা ত’ কখনও এদিক ওদিক হয় না।

‘অতি-দীনং’—এই শব্দের অন্যপ্রকার অর্থ দেখাচ্ছেন,—আমি সাধুসঙ্গ ও সহায়হীন এবং সাধন-ভজন-শূন্য বলে অত্যন্ত দীন দরিদ্র, অথবা আমি তোমার অদর্শন-জন্য মৃতপ্রায় বা জীবিত থেকেও মৃততুল্য।” বহুকথা এর ভিতরে আছে। সাধুসঙ্গ যিনি লাভ করেননি, তার ত’ কোন সহায় নেই, তিনি সহায়-সম্বলহীন। একথা খুব সত্য। “আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।” আশ্রয় ত’ চাই। আশ্রয়দাতা কে?—প্রথমক্ষেত্রে আশ্রয়দাতা গুরু-বৈষ্ণব। শেষের দিকে—চরম আশ্রয়দাতা হলেন স্বয়ং ভগবান্, বিষয়বিগ্রহ। আশ্রয়বিগ্রহ এবং বিষয়বিগ্রহ দুইই আছেন। আশ্রয়বিগ্রহ কখনও অহঙ্কার প্রকাশ করেন না, কিন্তু বিষয়বিগ্রহ তিনি সবসময় তাঁর নিজের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত। আশ্রয়বিগ্রহের কোন অহঙ্কার, অভিমান নেই ; বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ তিনিও কখনও অহঙ্কার করেন না, তাঁরও যথেষ্ট দৈন্য আছে, মমতা আছে। সেই

দৈন্য-মমতা আবার আশ্রয়বিগ্রহ গুরু-বৈষ্ণবগণও পেয়েছেন। Guardian এর না থাকলে আর পাবে কোথা থেকে? তদধীন ব্যক্তি সেই গুণ পাবেন কোথা থেকে যদি Guardian এর নেই। সম্পত্তির অধিকার মূল মালিকই দিচ্ছেন, মূল মালিকের আছে বলেই তদধীন ব্যক্তিগণ কিছু পাচ্ছেন। তা না হলে পাবেন কোথা থেকে। সাধুসঙ্গ যারা পাননি, তারা নিশ্চয় সহায়-সম্বলহীন।

কোন চিঠি-পত্র লিখতে গেলে শিরোনামায় মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ আমরা লিখি ‘শ্রীহরি সহায়’। ভগবান্ যদি সহায় তাহলে ভক্তও সহায়। কারণ ভক্ত ছাড়া ত’ আর ভগবান্ নন। “শ্রীশ্রীগুরুগৌরাদেৌ জয়তঃ” গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের চিঠি লেখার পাঠ। গুরু ছেড়ে গৌরাদ্গ নন, আবার গৌরাদ্গ ছেড়ে কৃষ্ণও নন। তাহলে গুরুকে ছেড়ে গৌরাদ্গ নন; গৌরাদ্গ ছেড়ে কৃষ্ণ নন, এক তাৎপর্য্যপূর্ণ। ‘গুরু ছাড়ি’ গৌরাদ্গ ভজে। সে পাপী নরকে মজে।।’ কারও কৃপা বাদ দিয়ে যদি আমি প্রার্থনা করি তাহলে হবে না কৃপালাভ। কৃপাই পাওয়া যাবে না। Recommendation না হলে ত’ কৃপা পাওয়া যাচ্ছে না, পরন্তু কৃপা পাওয়া দরকার। আমি ত’ চিনি না, জানি না, সুতরাং Media—মাধ্যম দরকার।

তাহলে সাধন-ভজন-শূন্য বলে অত্যন্ত দীন দরিদ্র আমি। আমি দীন দরিদ্র—এটা অনেকে আমরা বলি। পার্থিব অবস্থানুসারে যাদের খেতে পরতে কষ্ট, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা নির্বাহ করতে কষ্ট, তারা অনেকে একথা বলেন। কিন্তু এখানে দীন দরিদ্রের সে ব্যাখ্যা নয়। এখানে যারা আমরা সাধন-ভজন-শূন্য তারা হলেন দীন দরিদ্র। খুব বড় কথা এটা, অত্যন্ত উন্নতাদিকারের কথা। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলেছেন যে কথাটা, আমাদের মাথায় ঢুকছে না, সেই কথাটা কি?—

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।

দাস করি’ দেহ মোরে বেতন প্রেমধন।।

খুব উচ্চ চিন্তা। প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। মহাপ্রভু তাই কান্নাকাটি করছেন। তিনি কি চাচ্ছেন?—‘দাস করি’ দেহ মোরে বেতন প্রেমধন।।’ আমাকে দাস করে নাও, প্রেমধন আমাকে দাও। কি ব্যাপার! রাধাভাবে শ্রীগৌরাদ্গ। সেই ব্যাপার নিয়ে কথাটা এসেছে। রাধারাণীর যে প্রার্থনা কৃষ্ণের কাছে সেই প্রার্থনাই মহাপ্রভু বলে ফেলছেন ওখানে। আমাদের মাথায় ত’ ঢুকছে না। সাধন-ভজন-শূন্য যে ব্যক্তি তিনিই বাস্তব দরিদ্র। ভগবানের ভক্তিধনে ধনী যিনি তিনি নিশ্চয় দরিদ্র নন। তাঁরা ধনী। ভুরিদ, ভুরিদ। তাঁরা কিছু দিতে পারেন। যার কিছু নেই সে দেবে কোথা থেকে? কিন্তু যাঁর অনেক আছে তিনি অনেক দিতে পারেন, বা অল্পস্বল্পও দিতে পারেন। আবার প্রেমময় ভগবানের একটা স্বভাব হল তিনি অল্প পেলে খুব খুশী। ‘অল্প সেবা বহু করি মানি।’—এই হল সেই ভগবানের উদারতা। ভক্ত যদি সামান্য কিছু দেন তিনি বলেন, খুব হয়েছে, প্রচুর প্রচুর, খুব খুশী, খুব সন্তুষ্ট। “তুষ্টোহহং ভো বিজশ্রেষ্ঠাঃ”—কৃষ্ণ-সুদামা-উপাখ্যানে কৃষ্ণ সুদামার ভক্তিতে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। গুরুসেবায় খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন গুরু সান্দীপনি। ‘বিজ’ বললেন কেন? ব্রাহ্মণ না হয় একজন ছিলেন, দুজনকে ধরলেন

কেন? কৃষ্ণ-সুদামার ভিতরে ব্রাহ্মণ একজন ছিলেন সুদামা। কৃষ্ণ ত' ব্রাহ্মণ ছিলেন না, গোয়ালার ছিলেন। তা তাঁকে সহ বলছেন কেন? “তুষ্টোহহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ”—সান্দীপনি গুরু এমন সম্বোধন করছেন কেন? তিনি এমন উন্টোপান্টা কথা বলে ফেললেন কেন? একজন অব্রাহ্মণকে তিনি ব্রাহ্মণ বললেন কেন? বিচারের কথা। কি বিচারের কথা? চলবে না বামুনগিরি। ঐ গোয়ালার ছেলেটাকে প্রণাম করতেই হবে,—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

আমি যদি ঐ গোয়ালার ছেলেটাকে প্রণাম না করি, তাহলে আমার ব্রাহ্মণতা থাকবে না। সেজন্য প্রণাম করতে হয়েছে ‘ব্রহ্মণ্যদেব’ বলে। অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যধর্মের সংরক্ষক, পালক, পোষক হলেন ভগবান্। ভগবান্ সনাতন ধর্ম রক্ষা করছেন, পালন-পোষণ করছেন—সেকথা শাস্ত্রের সর্বত্র লেখা আছে। যদি তাই হয় তাহলে আবার পরে আবার জাতিবিচার কেন? উনি কোন্ জাতি? জাতি সৃষ্টি করল কে? “তোর শীল তোর নোড়া তোর ভাঙি দাঁতের গোড়া।”

সত্যযুগে কোন জাতি ছিল না। একজাতি ছিল—হংসজাতি। এই হংসজাতি হল সাধারণ। ওর ভিতরে আবার আর এক জাতি ছিলেন। তার নাম পরমহংস। এই পরমহংস যাঁরা তাঁরা হলেন সাধন-ভজনকারী ব্যক্তি। তাঁদেরই বিশেষণ ছিল পরমহংস। আর হংস ছিল সাধারণ জাতি। তাহলে তখনও ত' জাতি দুটো ছিল, এক ছিল না। ধর্ম, উপাস্য এক ছিল বুঝলাম, কিন্তু হরিভজন করা আর না করা—এই দুটো দল সবসময় ছিল। কি ব্যাপার তাহলে, বুঝবার কথা। ত্রেতাযুগ যখন এসেছে তখন বর্ণবিভাগ হয়েছে। ত্রেতাযুগের আগে ত' বর্ণবিভাগ হয়নি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং চার আশ্রমী—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। আজকাল বহু জায়গায় দেখছি ব্রহ্মচর্য্য-শব্দটা আগে দেওয়া হচ্ছে না, আগে গার্হস্থ্য-শব্দ দেওয়া হচ্ছে। তারপরে ব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস দেওয়া হচ্ছে। কেন? এরূপ লেখার মধ্যে দুরভিসন্ধি—*Uterior motive* আছে। যারা তথাকথিত বর্ণাভিমानी তাদের দ্বারাই এগুলো হচ্ছে। তারা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, গার্হস্থ্যধর্ম সবচেয়ে বড়। সেজন্য গার্হস্থ্য-শব্দটা আগে লিখছেন। শাস্ত্রের ধারা কি আছে? শাস্ত্রে কি বর্ণনা আছে? শাস্ত্রে লেখা আছে—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস। আগে যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন না করেন কোন ব্যক্তি, তিনি যদি গুরুগৃহে না যান, বেদাধ্যয়ন যদি না করেন, তবে তার গার্হস্থ্যালি চলবে না। তাকে সংযত হতে হবে, সবকিছু শিক্ষালাভ করতে হবে, তারপরে গার্হস্থ্যধর্মে প্রবেশ করবেন। এখন কিন্তু কথাটা উন্টে দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মচর্য্য বাদ দিয়ে সব গার্হস্থ্যধর্মে এসে গেল। শাস্ত্রের কোন্ শ্লোকে লেখা আছে? সব জায়গায় ব্রহ্মচর্য্যকে প্রাথমিক আশ্রম বলা হয়েছে। প্রথমে শুচি-শুদ্ধ হয়ে, সবারকম ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের পরীক্ষায় পাশ করে তবে গার্হস্থ্যধর্মে প্রবেশ করবেন। তারপরে তার next promotion হচ্ছে বাণপ্রস্থ এবং তারপরে সন্ন্যাস। এইসব উন্টোপান্টা চলছে বর্তমানে। শাস্ত্রের যে Process, Procedure সেটাকে মেনে নেওয়া হচ্ছে না।

ভগবানেরও জাতিবিচার আরম্ভ হয়েছে। ভগবান্ মুন্সিলে পড়ে গেছেন। তাঁকেও জাতিবিচার থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না। বড়ই দুঃখের কথা! ওখানে সান্দীপনি গুরু কিন্তু এমন বিচার নেননি। তিনি শাস্ত্রের খাঁটি খাঁটি কথা বলেছেন। কি কথা? “তুষ্টোহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্যঃ সন্তু মনোরথাঃ।”—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আমি তোমাদের গুরুসেবায় সন্তুষ্ট হয়েছি, অতএব তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হউক, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক—আশীর্বাদ করছেন। “ছন্দাংস্য-যাতয়ামানি ভবন্তিহ পরত্র চ।।” কৃষ্ণ-বলদেব বেদাধ্যয়ন করতে গেছেন। তাঁদের আবার বেদাধ্যয়ন করার দরকার কি? যাঁর নিঃশ্বাসিত বাণী হল বেদ, তিনি আবার বেদাধ্যয়ন করতে যাচ্ছেন—এ আবার কি কথা! লোকশিক্ষার জন্য তাঁকে যেতে হচ্ছে। সান্দীপনি গুরুও মেনে নিলেন তাঁর গুরুত্ব, কৃষ্ণও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করলেন। সেবা করতে লাগলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার! আবার বলছেন কি?—আমি আশীর্বাদ করি তোমাদের হৃদয়ে এই বৈদিক জ্ঞান চির ভাস্বর, চির জাগরুক থাকুক। কাকে আশীর্বাদ করছেন?—ভগবানকে আশীর্বাদ করছেন। স্বয়ং ভগবানকে আশীর্বাদ করছেন সান্দীপনি গুরু। এ ক্ষমতা তাঁকে দিয়েছেন ভগবান্ এবং তিনি মেনেও নিয়েছেন। ভগবান্ নিজেও মেনে নিয়েছেন। সান্দীপনি গুরু ত’ ভক্ত, কিন্তু ভগবানকে আশীর্বাদ করার যোগ্য। ভগবান্ আশীর্বাদ মেনে নিচ্ছেন। যেমন ধরুন—একজন ঋষি আর একজন গৃহস্থ রাজা। একজন হলেন দুর্ব্বাসা ঋষি। দুর্ব্বাসা সম্বন্ধে আমাদের সকলের খারাপ ধারণা আছে, ভাল ধারণা খুব কম লোকের আছে। কারও রাগ দেখলে দুর্ব্বাসার মত রাগ বলে ফেলি আমরা। দুর্ব্বাসা ঋষি কিন্তু ওরকম বস্তু নন, রুদ্রাংশে জন্ম তাঁর। সেজন্য হয়ত’ ওরকম ভাবটা আছে। কথায় কথায় চুল ছিঁড়ছেন, জটা ছিঁড়ছেন। হতে পারে, কিন্তু তিনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবোত্তম। এমন বৈষ্ণব যিনি রাধারানীকেও আশীর্বাদ দিতে পারেন এবং দিয়েছেনও। তাহলে দুর্ব্বাসার স্বরূপ চিনবে কে? সঙ্গত কারণে যদি রাগ হয়, তাহলে সেটা ঠিক, কিন্তু অসঙ্গত কারণে যদি কথায় কথায় রাগ হয় চণ্ডালের মত, তাহলে সেটা চলবে না। সেটা অকল্যাণজনক। যিনি সেরূপ করবেন তারও অকল্যাণ, এবং যাদের করবেন তাদেরও অকল্যাণ। সঙ্গত কারণে রাগ ত’ দেখাতে হবে আমার। সঙ্গত কারণটা কি? রাগ দেখাব কোথায়? আমাদের গুরুবর্গ তাঁরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন কোথায় কোন্টা প্রয়োগ করব। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ষড়্রিপূর মধ্যে পাঁচটাকে ভালভাবে Positive side এ কাজে লাগানো যায়। একটাকে পারা যায় না। ‘কাম’ মানে কামনা-বাসনা। কাম—কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে। ক্রোধ—ভগবদ্বিদ্বেষী, ভক্ত-বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধপ্রকাশ—Justified। লোভ—সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন। মোহ—ইষ্টলাভে। ভগবান্ কবে দয়া করবেন, কবে তোমার কৃপা পাব—এই ভাব সবসময় ভিতরে থাকবে ভক্তের। মদ—কৃষ্ণ-গুণগানে মত্ততা, ভগবানের নাম-গুণগানে মত্ততা। তাহলে ছয়টা জিনিষের মধ্যে পাঁচটাকে ভাল Side এ লাগান হয়েছে। একটাকে ভালদিকে লাগানো যায়নি। সেটা হল মাৎসর্য্য। এর সর্ব্বৈব খারাপ। এর আর কোন ভাল দিক নেই। বিষ্ঠার দুইদিকই খারাপ। মাৎসর্য্যকে এইজন্য বাদ দেওয়া হয়েছে। সব জিনিষের পিছনে একটা হিসাব আছে। (ক্রমশঃ)

পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি এবং সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত নারায়ণ মহারাজ চতুর্থবার বিদেশ প্রচারে রওনা হইয়া গত ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ শ্রীধাম মথুরা হইতে দিল্লী এবং ৩১শে ডিসেম্বর দিল্লী হইতে সিঙ্গাপুরে অবতরণ করেন। সিঙ্গাপুরে শ্রীদাউদয়াল গুপ্তার বাড়ীতে একরাত্রি যাপন করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীতে পৌঁছান। ২রা জানুয়ারী ১৯৯৮ সিডনী হইতে ফিজীস্থ Nadi বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। Nadi হইতে Lautokaতে সম্ভ্রান্ত খ্যাতনামা প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রীকান্তিলাল পুঞ্জা মহাশয়ের গৃহে শ্রীল মহারাজ অবস্থান করেন। ফিজী ৩৩০টি দ্বীপ লইয়া গঠিত। এখানকার জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ ভারতীয়। প্রবাসী ভারতীয়গণ হিন্দী বলিতে ও হিন্দীতে পাঠ-বক্তৃতা শুনিতে পছন্দ করেন। এখানকার বিদ্যালয়েও হিন্দীভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। দ্বীপটি অত্যন্ত সুন্দর ও রমণীয়। সর্বদা যেন চিরবসন্ত বিরাজমান। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ হইতে ২৬১৯ কিলোমিটার পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরে স্থিত এই ফিজী দ্বীপ। এখানকার অধিবাসিগণ প্রাচীনকাল হইতে এক বৃহদাকার সর্পের পূজা করিয়া থাকে। তাঁহাদের মতে ঐ সাপটি ছয়মাস দ্বীপে আসে এবং ছয়মাস সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে। প্রবাসী ভারতীয়রা এই দ্বীপটিকে ‘রমণক’ দ্বীপ বলিয়া থাকেন।

৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারী ফিজীর ‘BA’ নগরীতে এক বর্ণাঢ্য নগর-সকীর্তন শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়াছিল। ‘BA’ নগরীর প্রসিদ্ধ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে শ্রীল মহারাজের বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৫-৬ জানুয়ারী ফিজীর রাজধানী Suva মহানগরীর প্রখ্যাত শ্রীতুলসীমানস মন্দিরে সনাতন ধর্ম এবং মর্যাদাপূরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের মধুর লীলা সম্বন্ধে শ্রীল মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইয়া যান। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ এবং মন্দির কর্তৃপক্ষ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ইতঃপূর্বে ভারত হইতে বহু বক্তা এবং শ্রীরাম-কথাবাচক আসিয়াছেন, কিন্তু কাহারও নিকট এমন সুন্দর এবং শাস্ত্রীয় যুক্তিপূর্ণ বিচার ও সুমধুর কীর্তন শ্রবণ করেন নাই। Suva তে সকল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীবাসুদেব দাসাধিকারী এবং শ্রীউমাকান্ত প্যাটেল মহাশয় শ্রীসমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

৭ই জানুয়ারী পুনরায় Lautoka তে প্রত্যাবর্তন করিয়া Nadi তে ধর্মসভার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ভয়ঙ্কর সাইক্লোনের জন্য উক্ত অনুষ্ঠান স্থগিত করিয়া শ্রীকান্তিলাল পুঞ্জার বাসভবনে হরিকথার ব্যবস্থা হয়। ৮-১০ জানুয়ারী পর্যন্ত Lautokaস্থ শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে শ্রীল মহারাজ শ্রীব্যাস-নারদ-সংবাদ, শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাদ্বারা ফিজীবাসিগণকে ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ও শ্রীগৌরবাণীর সন্দেশ প্রদান করেন। শ্রীল মহারাজের সরলতা, নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা ছোট দ্বীপটির জনমানসকে মোহিত করিয়া দিয়াছে। ফিজীবাসীরা তাঁহাকে বারম্বার তাঁহাদের দেশে আসিবার জন্য নিবেদন করিয়াছেন। ফিজীতে শ্রীল মহারাজের প্রচারের বিবিধ ব্যবস্থা করিয়া শ্রীকান্তিলাল পুঞ্জা মহোদয় শ্রীসমিতির বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হন এবং সঙ্গীক শ্রীপুঞ্জা শ্রীল মহারাজের নিকট হইতে শ্রীনাম-দীক্ষাদি গ্রহণপূর্বক শ্রীসমিতির আশ্রিত হইয়াছেন।

১১ই জানুয়ারী তৃতীয় প্রহরে Nadi হইতে রওনা হইয়া অষ্ট্রেলিয়ার Brisbane বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। তৎপরে সদলবলে New South Wales এর Murwillumbah শহরের সন্নিকটস্থ Uki তে পৌঁছন। তথায় দ্বিশতধিক ভক্ত শ্রীল মহারাজের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল মহারাজের দর্শন পাইয়া সকলের মধ্যে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চারণ হয়। উচ্চ সঙ্কীর্ণ-নিমাদে সকলেই শ্রীল মহারাজকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল মহারাজ সংক্ষিপ্ত ভাষণদ্বারা উপস্থিত সকলকে উদ্দীপ্ত করেন। অতঃপর ১১ই জানুয়ারী হইতে ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীল মহারাজজী অষ্ট্রেলিয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন। অষ্ট্রেলিয়াতে শ্রীগুরুবর্ষটকের ব্যাখ্যা, শ্রীব্যাস-নারদ-সংবাদ, শ্রীরাঘনাথদাস গোস্বামীর জীবন চরিত এবং শ্রীমনঃশিক্ষা প্রসঙ্গে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৪।১।৯৮ তারিখে 'Daily News' পত্রিকার সাংবাদিক Luis Feliu শ্রীল মহারাজের Interview গ্রহণ করেন এবং পরদিবস ১৫।১।৯৮ তারিখে সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদ যথাযথ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

SWAMI VISITS THE TWEED

“HUNDREDS of Krishna consciousness devotees in the Tweed Valley this week celebrated the return visit to the Tweed of one of their spiritual teachers. Scores of devotees sprinkled colour and sound, bringing smiles to townsfolk, as they chanted mantras through Murwillumbah on several occasions this week.

Festivities, feasts and forums have marked the visit of one the world's leading exponents of pure devotional love, Swami Bhakti Vedanta Narayan Maharaj, who has been staying with devotees and their families at a property near Uki this week.

The 77 year old softly spoken renunciant monk from India, who visited the Tweed last year, is expected to draw up to 200 people at an open night tomorrow at Uki Hall from 6pm.

Shrila Maharaj, a formidable authority on Vedic scripture, has been holding classes and discussions for devotees and followers from throughout Australia this week. His books reveal insights into the nature of the soul, divinity and the ultimate goal and meaning to human life.

The internationally-renowned Swami carries forward a centuries-old tradition of giving the opportunity to people everywhere of attaining Krishna Prema (pure love of God).

The charismatic teacher gave a few insights during a discussion at the Uki retreat yesterday morning.

Shrila Maharaj said, many of the world's ills such as pollution and conflict would not be remedied by man-made methods but the spiritual enlightenment of individuals. Devotional love of the human spirit and the bond between the individual soul and the Supreme Being, he said, were at the core of a way of life which increasingly attracted followers in many Western countries."

১৪।১।৯৮ তারিখে মাধুর্য্য কাদম্বিনী আলোচনা প্রসঙ্গে অনিষ্ঠিতা ভক্তিতে উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যাটবিক্সা, নিয়মক্ষমা, বিষয়সঙ্গরা, তরঙ্গরঙ্গিনী প্রভৃতির হৃদয়স্পর্শী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ১৫।১।৯৮ তারিখে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবনচরিত প্রসঙ্গে শ্রীমন্নহাপ্রভুর আদেশ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সাধক-সাধিকা কিভাবে ক্রমশঃ ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইবেন মনঃশিক্ষা হইতে তাহা আলোচনা করেন। ১৬।১।৯৮ তারিখে অস্মদীয় পরম গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্বক্তাপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী-সভাতে বিভিন্ন সময়ের গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ, সেবা এবং গতির তুলনামূলক আলোচনা করেন।—

গুরু	শিষ্য	গতি
দ্রোণ পরশুরাম উদালক ধৌম্য সান্দীপনি	একলব্য কর্ণ আরুণি উপমন্যু কৃষ্ণ, সুদামা	সুদর্শন চক্রদ্বারা হত অর্জুনদ্বারা বধ গুরুব্রূপায় শাস্ত্রস্বৃতি গুরুব্রূপায় শাস্ত্রস্বৃতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইলেও নিষ্কপট গুরুসেবা- দ্বারা ৬৪ দিনে ৬৪ কলা বিদ্যালাভ ও জগতকে শিক্ষা দিলেন শ্রীগুরুসেবায় সর্বার্থসিদ্ধি সম্ভব। নিজ প্রাণ বিপন্ন করিয়াও শ্রীগুরুসেবাদ্বারা সর্ববর্জগৎকে শ্রীকৃষ্ণসেবা-শিক্ষা প্রদান।
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ	শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী	

১৬।১।৯৮ Gold Coast এর Journalist শ্রীল মহারাজের interview গ্রহণ করেন। ১৭।১।৯৮ তারিখে তাহা Gold Coast এ প্রকাশিত হয়। ১৭।১।৯৮ তারিখের সভাতেও (১) বর্ষপ্রদর্শক গুরু, (২) চৈতন্যগুরু, (৩) শিক্ষাগুরু ও (৪) দীক্ষাগুরুর মহিমা ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। ১৮।১।৯৮ তাং এ অন্যান্য অবতারণার অবদান অপেক্ষা ঔদার্য্যময় বিগ্রহ শ্রীমন্নহাপ্রভুর অবদান যে অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তৎসম্বন্ধে তুলনামূলক ভাষণ প্রদান করেন। ১৯।১।৯৮ তাং এ Brisbaneস্থিত Graceville State School এ 'বিজ্ঞানের আশীর্বাদ এবং অভিশাপ' প্রসঙ্গে আলোচনাকালে আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ২০।১।৯৮ হইতে ২৪।১।৯৮ তারিখ পর্যন্ত Perth এ ভক্তির সংজ্ঞা এবং উপদেশামৃতে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রদত্ত বিশেষ ব্যাখ্যা আলোচনা করেন। ২৪।১।৯৮—২৮।১।৯৮ পর্যন্ত Indonesiaস্থিত বালীতে শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণলীলা-

প্রসঙ্গে শ্রীবলদেব প্রভু-কর্তৃক ধেনুকাসুর-বধ-লীলার রহস্য, সাধক-জীবনে ইহার প্রভাব বিষয়ে পর্যালোচনা করেন। ২৭।১।৯৮ তাং এ শ্রীঅনন্ত গৌড়ীয় মঠের ভিত্তিস্থাপন করেন শ্রীল মহারাজ। ২৮।১।৯৮—৬।২।৯৮ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে গোকর্ণ-ধুকুকারী-উপাখ্যান, শ্রীশুকদেব গোস্বামীর পূর্ববজ্র-বৃত্তান্ত, শ্রীব্যাস-নারদ-সংবাদ, কপিল-দেবহুতি-সংবাদ, শ্রীধ্রুব-উপাখ্যান প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১।২।৯৮ তারিখে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে শ্রীবসন্ত-পঞ্চমী উপলক্ষে শ্রীদাস গোস্বামীর চরিত্র, শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র, ৩।২।৯৮ তাং এ শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমী-তিথিতে মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের চরিত্র এবং শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা ও ৩।২।৯৮ তারিখে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে সাংক্যালীন সভায় মর্যাদাপূরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র-লীলা-প্রসঙ্গে কৈকেয়ী, শূর্ণনখা ও সীতাদেবীর চরিত্র বিশ্লেষণ করেন। ৪।২।৯৮—৬।২।৯৮ পর্য্যন্ত চিত্রকেন্দ্র মহারাজের উপাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন-লীলা-রহস্য, সাধক-জীবনে ইহার প্রভাব, ফল বিক্রয়িনীর উপর কৃপা প্রভৃতি বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ৭।২।৯৮—১০।২।৯৮ পর্য্যন্ত সিঙ্গাপুরে সনাতন ধর্ম্ম এবং শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী উপলক্ষে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র এবং শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

অতঃপর শ্রীল মহারাজ সদলবলে ১১।২।৯৮ তারিখে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শ্রীসমিতির কলিকাতাস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করেন। বর্তমান বিদেশে প্রচারকালে শ্রীল মহারাজের সহিত শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এবং ত্রিশজন বিদেশী ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন।

অষ্ট্রেলিয়াতে শ্রীব্রজবল্লভ দাসাধিকারী, শ্রীপ্রকাশ রানিগা, শ্রীসুরেশ রানিগা, শ্রীযমুনাদাস, শ্রীবানোয়ারীলাল দাসাধিকারী, ইন্দোনেশিয়া প্রচারে শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারী, মালয়েশিয়া প্রচারে শ্রীপ্রাণকিশোর দাসাধিকারী, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীমতী জগজিৎ কারু (ব্যারিষ্টার), কুমারী ললিতা দেবী (ব্যারিষ্টার), সিঙ্গাপুরে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের অধ্যক্ষ এবং সিঙ্গাপুর চেম্বার অফ কমার্সের উপাধ্যক্ষ শ্রীদাউদয়াল গুপ্তা মহোদয় শ্রীল মহারাজের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়া শ্রীসমিতির ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যালঙ্কার

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ও আবির্ভাব-শতবার্ষিকী

পারমার্থিক ইতিহাস ও জড় ইতিহাস এক নহে। জড় ইতিহাস আলোচনায় তথ্য লাভ হয় মাত্র, কিন্তু তত্ত্ব নহে। পারমার্থিক ইতিহাসে তত্ত্ব ও তথ্য উভয়ই লাভ হয়। তথ্যের ভিত্তিতে এই উভয়ের মধ্যে সাধারণ দৃষ্টিতে সাদৃশ্য দেখা গেলেও বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আবির্ভাবাদি-প্রসঙ্গ তত্ত্বকেন্দ্রিক বলিয়াই তাহাতে জড় ইতিহাসের কোন জড়ীয়তা নাই। সূর্য্যের ন্যায় নিত্য বর্ণোজ্জ্বল-রূপেই তাঁহা জীবের হৃদয়াকশে উদিত হইয়া থাকেন—কালের কালিমায় তাঁহা কখনই মলিনতা লাভ করেন না।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাবৃন্দ গত ১লা ফাল্গুন, ১৪০৪ (ইং ১৪।২।৯৮) শনিবার তাঁহার প্রতিষ্ঠাতৃ-আচার্য্য-পাদপদ্ম নিতলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী-তিথিপূজা তথা ব্যাসপূজা বর্তমান সভাপতি-

আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত বার্মন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ৭৩ সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত নারায়ণ মহারাজের সুপরিচালনায় নবদ্বীপস্থ শ্রীমদে বানন্দ গৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করিলেন।

দিবসত্রয় পূর্ব হইতেই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বৈষ্ণবগুণী ঐশ্বর্য্যমঠে আসিয়া সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের হার্দিক উপস্থিতিতে ৩০শে মাঘ (ইং ১৩।২।১৯৮), শুক্রবার শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ এবং ধামেশ্বর শ্রীকোলদেবের মঙ্গলারতি ও সঙ্কীর্তনদ্বারা অধিবাস-দিবসের শুভসূচনা হয়। অপরাহ্নে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে বিশাল সুসজ্জিত নগর-সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রা নবদ্বীপ-শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে অধিবাস-কীর্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়।

১লা ফাল্গুন (ইং ১৪।২।১৯৮), শনিবার মঙ্গলারতি ও সঙ্কীর্তন যজ্ঞের দ্বারা শততম শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা এবং শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের শুভারম্ভ হয়। প্রাতঃ ৬টা হইতে শ্রীগুরুমহিমা-সূচক বন্দনাদি, মহাজন-পদাবলী কীর্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠানন্তর শ্রীগুরুপূজা ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। অনন্তর বেলা ১০ ঘটিকা হইতে ১টা পর্যন্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্য চরিত্র, তাঁহার অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন মঠ হইতে আগত বিশিষ্ট বক্তাগণ তাঁহাদের সুচিন্তিত বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীবিগ্রহের মধ্যাহ্ন-ভোগারতি ও তৎপশ্চাৎ আহুত, অনাহুত, রবাহুত প্রায় ত্রিশতাবধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দান করা হয়।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে পুনরায় ধর্মসভা শুরু হয়। ‘শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসতত্ত্ব’ সম্বন্ধে আলোচনা এবং শ্রীগুরু-মহিমা-সূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ প্রবন্ধাদি পাঠ ও তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

শ্রীব্যাসপূজায় আয়োজিত ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত পর্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত পরিব্রাজক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত পরমার্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তৃবৃন্দ।

২রা ফাল্গুন (ইং ১৬।২।১৯৮), রবিবার যথারীতি মঙ্গলারতি ও কীর্তন, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ, আরতি কীর্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে ধর্মসভায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বৈষ্ণবীয় দয়া ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ওরা ফাল্গুন (ই ১৬।২।৯৮), সোমবার মাঘী কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বি ষুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসরে ব্রাহ্মমুহূর্তে ঐ মঙ্গলারতি ও কীর্তনানন্তর শ্রীগুরু-মহিমাচূচক বন্দনাতি, মহাজন-পদাবলী কীর্তন ও শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। তদনন্তর শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য চরিত্র সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ এবং ভক্ত্যঞ্জলিরূপে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠপূর্বক শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীনবদ্বীপধাম ম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

হে অতীত কথা কও !! হে অনাদি কথা কও !! অতীত বুঝি আজও কথা কয়। আকাশে বাতাসে কর্ণ পাতিলে আজ ও তাহার ফিস্ফিসানি, পুরানো ভগ্ন ইটের পাঁজরে কর্ণ রাখিলে এখনও হয়ত তাহার অস্বুট চাপা আর্তনাদ কর্ণগোচর হইবে। তবে একটু অন্যরূপে অন্য রঙে। তাই আজ পৃথিবীময় সর্বত্রই কেমন যেন একটা বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা, অনিয়ম পরিলক্ষিত হইতেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সর্বত্রই একই দৃশ্য। সর্বত্রই যেন আদর্শবোধের, মূল্যবোধের পূর্ণ নর্মূল্যায়ন হইতেছে। এমনকি, প্রকৃতিও এই অনিয়মের খেলায় মাতিয়া উঠিয়া তাহার পরিচয় হারাইয়াছে। এখন আর ঋতু-বৈচিত্র্য নাই। এখন সর্বদাই বর্ষা, সর্বদাই শীত, আবার সর্বদাই গ্রীষ্ম। কাহারও কোন পৃথক্ বৈশিষ্ট্য, পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার। সব ফলে যেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—নিয়ম-শৃঙ্খলা আর রাখিবে না ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলির ন্যায়।

বিশেষজ্ঞগণ অবশ্য অন্য কথা বলিবেন। তাঁহারা বলেন,—কোন কিছুই অনিয়ম বিশৃঙ্খলার মধ্যে চলিতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে কিছু অনিয়ম মনে হইলেও, সমস্ত অনিয়ম একটী বৃহৎ নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ। বৃহৎ অনিয়ম আবার বৃহত্তর নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। এইভাবে বৃহত্তর অনিয়মের বৃহত্তম নিয়ম-শৃঙ্খলায় পর্যাবসান। ইহাই সেই পরম মহানের মহান নিয়ম। যেমন প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনা যাঁহাদের সঠিক অনুসন্ধানী দৃষ্টি আছে তাঁহারা জানেন প্রত্যেক বারো বৎসর অন্তর একবার এইভাবে প্রকৃতি তাহার নিয়ম হারাইয়া থাকে। সেই বৎসর গরমে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া উঠে। ‘পেরু’ প্রদেশে জল অনেক নীচে নামিয়া যায়। সেখানে সামুদ্রিক পাখী আসে না। ফলে সেই বৎসর পেরুতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনেক পানহানি হয়। এইভাবে পৃথিবীতে আবার সাম্যাবস্থা ফিরিয়া আসে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। রামসরাজ রাবণের চরম অনিয়মের পর রাক্ষসকুল ভস্মীভূত, অবশেষে রামরাজত্বের সুপ্রতিষ্ঠা। স্বাসরোধকারী, ষড়যন্ত্রকারী, দলবাজ লুণ্ঠেরাজের বিদায়ের পর অবশেষে কলিরাজের রাজধানীতেও ধর্মপুষ্পের মৃদু সৌরভের আভাস। অশুভ অধর্মের বিনাশের মধ্যেই ধর্মরথের শুভযাত্রার শুভসংকেত।

বলিতেছিলাম দোলযাত্রার কথা। বাংলা ও উড়িষ্যায় যদিও ইহাকে ‘দোলযাত্রা’ বলা

হয়, দক্ষিণাভ্যে ইহার নাম 'সিঙ্গা'। একেবারে দক্ষিণাঞ্চলে ইহার নাম 'কমলন'। আবার উত্তরভারতে ইহার নাম 'হোলি'। পুরানো ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দোলযাত্রা কিভাবে হোলি উৎসবে পরিণত হইল তাহা আমরা জানিতে পারি। স্বন্দপুরাণের 'ফাল্গুন-মাহাত্ম্যে' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারাজকে বৈরী-স্বভাবা 'চুন্টা' রাক্ষসীকে হৈ-হল্লা করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠদ্বারা পুড়াইয়া মারিয়া অবশেষে সত্যযুগের ধার্মিক রাজা রঘুর রাজ্যে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কোথাও কোথাও আবার চুন্টা রাক্ষসী ক্রমে ক্রমে মেণ্টাসুরে রূপান্তরিত হইয়াছে।

পুরাণ কাহিনী অনুসারে—ভক্ত প্রহ্লাদকে হত্যা করিবার সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাহার ভগ্নী হোলিকার শরণাপন্ন হইল। অগ্নি হোলিকার কোন ক্ষতি করিতে পারিত না। এমনকি, তাহার শরীরে কোন তাপও লাগিত না। তাই পরিকল্পনা-মাফিক হোলিকা প্রহ্লাদকে লইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিল যাহাতে প্রহ্লাদ অগ্নিতে পুড়িয়া মরিয়া যায়। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। “রাখে হরি মারে কে?” প্রহ্লাদ সুস্থাবস্থায় হরিনাম করিতে করিতে অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, আর হোলিকা সেই অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত হইল। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া আজও চাঁচর উৎসব পালিত এবং দোলযাত্রা হোলি উৎসবে পরিণত হইয়াছে। হোলিকাদাহ অশুভশক্তি-বিনাশের প্রতীক।

এই বৎসরও যথারীতি হোলিকা দাহ হইল, দোলযাত্রা আসিল। অশুভশক্তির বিনাশে সমস্ত উৎকর্ষার অবসান ঘটাইয়া অবশেষে বৈষ্ণবপ্রধান তাঁহার নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। সেই আনন্দে যথানিয়মে দেশ-বিদেশ হইতে বৈষ্ণবগণ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদান্ত নারায়ণ মহারাজ পাশ্চাত্য বিজয় করিয়া যথাসময়েই শ্রীমঠে আসিয়া উপস্থিত হন।

গত ২২শে ফাল্গুন ১৪০৪ (ইং ৭।৩।৯৮), শনিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্বক্তাপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুকম্পিত সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্বক্তাবিদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে, সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের উপস্থিতিতে অসংখ্য সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত শ্রীমঠে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার সংকল্প গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী প্রয়োজনীয় সেবার গ্রহণ করেন।

২৩শে ফাল্গুন (ইং ৮।৩।৯৮), রবিবার অতি প্রত্যাষে শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির বিজয়বিগ্রহ সুসজ্জিত পাক্ষীতে লইয়া বিশাল পরিক্রমামণ্ডলী সংকীর্ণনের সহিত শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হন। তদনন্তর গঙ্গা অতিক্রম করিয়া শ্রীগোদ্রুমকানন স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপালাভের জন্য বৃহৎ পরিক্রমামণ্ডলী প্রবেশ করেন। তথায় শ্রীঠাকুর মহাশয়ের অপ্রাকৃত জীবনের অবদান-বৈশিষ্ট্যালোচনা ভক্তগণের মর্ম্মস্পর্শ করে। তদনন্তর হরিহরক্ষেত্রে গিয়া তথাকার বহু প্রাচীন অপূর্ব শ্রীহরিহর বিগ্রহ দর্শন

করিতে না পাইয়া ভক্তগণ মর্ম্মাহত হন। শুনিলাম শ্রীবিগ্রহ চোর-কর্তৃক অপহৃত হইয়া বর্তমানে পুলিশ-কবলিত হইয়া আছেন এবং তাঁহাকে স্থানান্তরিত ও হস্তান্তরিত করিবার বহু অপচেষ্টা চলিতেছে। এ বিষয়ে সকল ভক্তসমাজের আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। অতঃপর সুবর্ণবিহার পরিক্রমা করিয়া যাত্রিগণ শ্রীন্সিংহপল্লীতে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীন্সিংহদেবের মহিমা কীর্তনান্তর ভক্ত এবং ভক্তির বিঘ্নবিনাশ প্রার্থনা করিয়া অগণিত স্থানীয়, ধামবাসী ও পরিক্রমাকারী ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে বামনপুরা হংসবাহন হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে শ্রীমঠে ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৪শে ফাল্গুন (ইং ৯।৩।৯৮), সোমবার আমলকী একাদশীর ব্রতোপবাসের দিন শ্রীকোলদ্বীপস্থ সমুদ্রগড়ে ভগবদ্ভক্ত রাজা শ্রীসমুদ্রসেন এবং ভগবৎ সখা শ্রীভীমসেনের উৎকর্ষতা প্রদর্শন করত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ পরস্পর যুক্তি-প্রতিযুক্তি খণ্ডন ও পুনঃস্থাপন করিয়া অবশেষে ক্রমান্বয়ে জ্ঞানীভক্ত, শুদ্ধভক্ত, প্রেমিকভক্ত, প্রেমপর ভক্ত ও প্রেমাতুর ভক্তের বৈশিষ্ট্য ও উপমাদ্বারা সকল ভক্তগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখেন। তদনন্তর অপ্রাকৃত কবি শ্রীল জয়দেবের স্মৃতিধন্য চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌর-গদাধর বিগ্রহ দর্শন ও তন্মহিমা কীর্তনপূর্ব্বক শ্রীমঠে প্রত্যাগমন করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীহরিবাসর উপলক্ষে বিশেষ হরিকথা পরিবেশিত হয়।

২৫শে ফাল্গুন (ইং ১০।৩।৯৮), মঙ্গলবার শ্রীঋতুদ্বীপান্তর্গত রাধাকুণ্ডতটে একাদশীর পারণ করিয়া শ্রীজহ্নুদ্বীপান্তর্গত বিদ্যানগরে শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্রীপাট ও শ্রীজহ্নুমুনির অবলুপ্ত আশ্রম দর্শন করিয়া মামগাছিতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে পৌঁছান হয়। তথায় মনোরম আশ্রকাননে পরিক্রমাকারী ভক্তের সহিত অসংখ্য স্থানীয় ভক্তগণ খেচরান্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমঠে যথারীতি ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৬শে ফাল্গুন (ইং ১১।৩।৯৮), বুধবার শ্রীকোলদ্বীপস্থ প্রৌঢ়ামায়াস্থান—পোড়ামাতলা, বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিস্থল দর্শন ও তাঁহার অপার্থিব জীবনচরিত আলোচনাপূর্ব্বক নিদয়ার ঘাটে উপস্থিত হইয়া সাম্প্রদায়িক বিচার প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুগভীর আলোচনা হয়। অনন্তর গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীযোগপীঠের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করা হয়। সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভায় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ হরিকথা পরিবেশন করেন।

২৭শে ফাল্গুন (ইং ১২।৩।৯৮), বৃহস্পতিবার আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রথম মিলনস্থলী শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবন, সঙ্কীর্তন-রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, আকর মঠরাজ শ্রীচেতন্য মঠ, শ্রীগৌর-বিনোদ-বাণী-বিগ্রহ জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, বৈরাগ্য-বিগ্রহ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির, কংসাংশে অবতীর্ণ মহাপ্রভুর কৃপাধন্য শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী দর্শন, হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ

বিতরণান্তে বাৎসরিক পরিক্রমা সমাপ্ত হয়। শ্রীভক্তিবিনোদ ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সহদয় সহযোগিতায় স্কুল-প্রাঙ্গণেই প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

২৮শে ফাল্গুন (ইং ১৩।৩।৯৮), শুক্রবার শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির শুভবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ সম্মিলিতভাবে সমগ্র দিবসব্যাপী শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করেন। অপরদিকে শুদ্ধভক্তিধারায় অনুপ্রাণিত হরিভজনেচ্ছু ভক্তগণ অধিকারানুযায়ী শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোপূলিলগ্নে শুভক্ষণে সঙ্কীর্তন-মুখে শ্রীশচীনন্দনের অভিষেক-ক্রিয়া, অর্চন, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি আরম্ভ হয়। প্রকৃতিদেবীর চাপল্যবশতঃ ঠিক সেই সময়েই অস্বাভাবিকভাবে মুষলধারে বারিবর্ষণ ও তুমুল পবন-প্রবাহ হইতে থাকে। ভক্তগণ দেবরাজের সেই বারিব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়াই অবনত মস্তকে সমস্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

২৯শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।৯৮), শনিবার শ্রীগৌর-জয়ন্তীর পারণ ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব উপলক্ষে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে শ্রীমঠের প্রসাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই মহোৎসবে সর্বসমেত প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১লা চৈত্র (ইং ১৫।৩।৯৮), রবিবার এক শুভমুহূর্তে শ্রীচিন্ময়ানন্দ দাস ব্রহ্মচারী,



বামদিক হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ভাগবত মহারাজ,
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ গিরি মহারাজ এবং
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ পর্বত মহারাজ

শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলরাম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্যদেবের নিকট হইতে সাত্ত-বিধান-নুযায়ী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্বত মহারাজ নামে পরিচিত হন এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজবাসী, শ্রীক্ষীরোদশায়ী ব্রজবাসী ও শ্রীহৃষীকেশ ব্রজবাসী বাবাজীবেষ গ্রহণপূর্বক যথাক্রমে শ্রীব্রজবিনোদ বাবাজী মহারাজ, শ্রীক্ষীরোদশায়ী বাবাজী মহারাজ ও শ্রীহৃষীকেশ বাবাজী মহারাজ নামে



বামদিক হইতে শ্রীক্ষীরোদশায়ী বাবাজী মহারাজ, শ্রীহৃষীকেশ বাবাজী মহারাজ এবং শ্রীব্রজবিনোদ বাবাজী মহারাজ

পরিচিত হন। উক্ত সন্ন্যাসগ্রহণ অনুষ্ঠান-কার্য পরিচালনা করেন সমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

পূর্বেই বলিয়াছি এই বৎসর সবই যেন কেমন অসংলগ্ন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব যেন শেষ হইয়াও শেষ হয় নাই, সর্বদাই বর্তমান। আমাদের সমিতির উৎসবও তাহার ব্যতিক্রম নহে। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-শতবার্ষিকী উৎসব ত' বর্ষব্যাপী চলিল। এদিকে দোলযাত্রার পর ২রা চৈত্র (ইং ১৬।৩।৯৮) সোমবার হঠাৎই সমিতির বার্ষিক সাধারণ-সভায় একটা আনন্দজনক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে, সমিতির আদি মঠ “শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ”, চৌমাথা, টুঁচুড়া, হুগলীতে পুনর্নির্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন ৪ঠা চৈত্র ১৪০৪ (ইং ১৮।৩।৯৮)

বুধবার। তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত হইল। এই মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ বহুদিন যাবৎ সেবিত হইতেছেন। উক্ত শ্রীবিগ্রহ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ পার্শ্বদবর শ্রীনিবাস পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত এবং সেবিত বলিয়া জানা যায়। প্রথমে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে তিনশত বৎসর পূর্বের গঙ্গার অপরপারে নৈহাটী নামক স্থানে এই শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার কিছুদিন পর কোন এক সময়ে এই শ্রীবিগ্রহ শ্রীমঠে পূজিত ও সেবিত



শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

হইতে থাকেন। অসাধারণ এই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহের পাশাপাশি শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ ও সহ-সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠানকার্য্য পরিচালনা করেন। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবসে শ্রীমঠে অগণিত ভক্তসমাগম হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও মধ্যাহ্ন ভোগারতির পর সকল ভক্তগণকে বিচিত্র সুস্বাদু মহাপ্রসাদ দান করা হয়।

নূতন শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভিতরে এবং বাহিরে সর্বত্রই অশুভ শক্তির বিনাশে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের আশায় শপথবাক্য ধ্বনিত হইল। আসুন আমরাও অধর্ম্মের বিনাশে ধর্ম্মস্থাপনের জন্য শপথ গ্রহণ করি। আমরা শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভুর এবং শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীচরণকমলে এই প্রার্থনা করি—এইরূপ বর্ষ পুনরায় আসুক ক্ষতি নাই, কিন্তু শেষ জয়ে যেন, হই মোরা বিজয়ী, তোমারি কাছেতে হারিয়া। হে গৌরসুন্দর! হারিতে হয়ত' তোমার নিকট হারিব ; মরিতে হয়ত' তোমার হাতেই মরিব! অশুভ শক্তির নিকটে কদাচ নহে!!

—নিজস্ব সংবাদ

✠	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।	✠
ধর্মঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাসু যঃ।		নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি ক্ষেবলম্।
✠	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	✠

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫০শ বর্ষ }

৪ ত্রিবিক্রম, গর্ভোদশায়ী, ৫১২ শ্রীগৌরান্দ
৩১ বৈশাখ, শুক্রবার, ১৪০৪, ইং ১৫/৫/৯৮

{ ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রভুবরাষ্টকম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমভক্তিদেশিক-আচার্য্য-বিরচিতম্]

শ্রীগৌরপ্রের্তং মহতাং মহিষ্ঠং, রাগাধবনিষ্ঠং গুণবদগরিষ্ঠম্।

দয়ার্ণবং তত্ত্ববিচারজীবং, বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ১ ॥

যিনি শ্রীগৌরান্দের প্রিয়তম, মহৎগণের মধ্যে অতীব মহৎ, রাগমাগনিষ্ঠ, গুণিশ্রেষ্ঠ, করুণাসিন্ধু এবং তত্ত্ববিচারদক্ষ, সেই প্রভুবর শ্রীভক্তিবিনোদদেবকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

আচার্য্যবর্য্যং পরহংসধুর্য্যং, ভূতুল্যধৈর্য্যং পরশান্তিকার্য্যম্।

ভবাক্কিনাবং হাতদুঃখদাবং, বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ২ ॥

যিনি আচার্য্যশ্রেষ্ঠ, পরমহংসপ্রধান, পৃথিবীর ন্যায় ধৈর্য্যশালী, পরাশান্তিদাতা, ভবসমুদ্রের নৌকা-স্বরূপ ও দুঃখ-দাবাগ্নি-নির্ব্বাপণকারী, সেই প্রভুবর শ্রীভক্তিবিনোদ-দেবকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

বেদান্তদক্ষং পরিধূতমোক্ষং, সৎসঙ্গরক্তং কুকথাবিরক্তম্।

দীনৈকবন্ধুং হরিপ্রেমসিন্ধুং, বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ৩ ॥

যিনি বেদান্তশাস্ত্রে সুদক্ষ, নিবির্বশেষ মোক্ষ-পরিত্যাগকারী, সৎসঙ্গে অনুরক্ত, জড়বিষয়-কথায় উদাসীন, দীনব্যক্তিগণের একমাত্র বন্ধু ও কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রস্বরূপ, সেই প্রভুৱর শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপৈকবিত্তং, তন্মামসঞ্চারসুব্যাগ্রচিহ্নম্।

স্বাচারবন্তং সুপ্রচারচিহ্নং, বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ৪ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কৃপাধনের একমাত্র মহাজন, যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম-প্রচারে অতীব ব্যগ্রচিহ্ন, সদাচারী ও মঙ্গল-প্রচারে সতত চিহ্নিত, সেই প্রভুৱর শ্রীভক্তিবিনোদ-দেবকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

শ্রীনামসংকীর্ণনভক্তিলগ্নং, শ্রীরাধিকাকৃষ্ণরসাক্ষিমগ্নম্।

অবজ্জলাক্ষং শ্রিতভাবলক্ষং, বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ৫ ॥

যিনি শ্রীনাম-সংকীর্ণনাথ্য ভক্তিতে রত, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসসিঞ্চিতে নিমজ্জিত, রাধাভাবে বিভাবিত থাকায় সর্বদা অশ্রু-বিগলিত-নেত্র, সেই প্রভুৱর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-দেবকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীন্দুর্যস্যেহ মুর্ত্তঃ সুপ্রদাদসিঞ্চুঃ।

তনোতি সর্বত্র হরিপ্রভাবং, নমামি তং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ৬ ॥

যাঁহার মহৎকৃপাসিঞ্চুর মূর্ত্তি-স্বরূপ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী সর্বদেশে ভগবন্মহিমা প্রচার করিতেছেন, সেই ভক্তিবিনোদদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

মহাপ্রভোঃ প্রেরণয়া প্রলুপ্তং, তদ্ধাম-প্রাকট্যমিহ প্রণীতম্।

রূপানুগং ভাগবতানুরাগং, নমামি তং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ৭ ॥

যিনি মহাপ্রভুর প্রেরণা লাভ করিয়া তাঁহার লুপ্ত আবির্ভাব-স্থলী লোকসমক্ষে পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি রূপানুগ ভাগবতগণের প্রতি অনুরাগী সেই শ্রীভক্তিবিনোদ-দেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

শ্রীগৌরধাম ব্রজধাম চৈকং, জ্ঞাত্বা বিরেজে নিরবধ্যতর্ক্যম্।

শ্রীগোদ্রমে কুঞ্জগৃহে সুভব্যং, নমামি তং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥ ৮ ॥

যিনি তর্কাতীত গৌরধাম ও ব্রজধামকে অভিন্ন জানিয়া শ্রীগোদ্রমে (স্বানন্দসুখদ) কুঞ্জভবনে নিরবধি বিরাজিত, সেই পরম সাধু শ্রীভক্তিবিনোদদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

হে কৃষ্ণপাদাজপ্রমত্তভৃঙ্গ! হে শাস্ত্রসংবিদ! বুধসঙ্গরঙ্গ!

জগদ্গুরো! ভক্তিবিনোদদেব! প্রসীদ মন্দে ময়ি বৈ সদৈব ॥ ৯ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে অত্যাঙ্গত ভ্রমর! হে সম্যক্ শাস্ত্রজ্ঞ-প্রধান! হে পণ্ডিত-সঙ্গামোদী! হে জগদ্গুরো! হে ভক্তিবিনোদদেব! আমার ন্যায় মন্দের প্রতি সতত প্রসন্ন হউন ॥ ৯ ॥

পদ্যাস্তকং ভক্তিবিনোদসুপ্রভোঃ, পঠেদ্ য উচ্চৈরিহ রাধিকাবিভোঃ।

রমেত প্রেমাস্বনিধৌ মহাশয়ঃ, ব্রজাশ্রয়ং প্রাপ্য সদা ন সংশয়ঃ।।১০।।

যিনি শ্রীরাধা-বৈভব শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রভুবরের এই পদ্যাস্তক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, সেই মহাশয় ব্যক্তি ব্রজধামের আশ্রয় লাভ করিয়া সতত প্রেমসমুদ্রে রমণ করিবেন—ইহাতে সংশয় নাই।।১০।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৬ পৃষ্ঠার পর]

২৮। মায়াবাদীর সঙ্গ কি কর্তব্য?

“মুক্তাভিমানী মায়াবাদীর সঙ্গ কর্তব্য নয়।”

—“ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারঃ”, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৪।৪৭

২৯। মায়াবাদীতে ভাব-বিকার দুষ্ট হইলে কি তাঁহাকে বৈষ্ণব মনে করিতে হইবে না?

“মায়াবাদীর অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদিও কাজের নয়।”

—“মায়াবাদী কাহাকে বলি?” সং তোঃ ৫।১২

৩০। ভক্তিবহিস্মুখগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?

‘তব কই নিজ-মতে, ভক্তি-মুক্তি যাচত,

পাতই নানাবিধ ফাঁদ।

সো সবু বঞ্চক, তুয়া ভক্তিবহিস্মুখ,

ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ।।

বৈমুখ বঞ্চনে, ভটসো সবু,

নিরমিল বিবিধ পসার।

দণ্ডবৎ দুরতঃ, ভক্তিবিনোদ ভেল,

ভকত-চরণ করি’ সার।।”

—শঃ

৩১। বহুজন-সাধ্য ধর্ম-কার্য্য ভক্তি-প্রতিকূল হইলে তৎসম্বন্ধে কি কর্তব্য?

“বহুজনের সাহায্য ব্যতীত যে কার্য্য হয় না, অথচ সেরূপ সাহায্য প্রাপ্তির সহজ উপায় নাই, সে-কার্য্যের উদ্যম করা শ্রেয়ঃ নয় ; কেবল ভজনের ব্যাঘাত করিবে। মঠ, আখড়া, মন্দির, সভা ইত্যাদি বৃহদ্বহু কার্য্য উক্ত বিধিক্রমে কঠিন হইলে তাহাতে যত্নমাত্র করিবে না।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৩২। সাধক কি মাদক-দ্রব্য সেবন করিতে পারেন?

“মদ্য, গাজা, অহিফেন, চরস, সিদ্ধি, গুলির ত’ কথাই নাই তামাক পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের সেবনীয় নয় ; এই সকল বস্তুর সেবন বৈষ্ণব-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। তামাকের ধূমপানের দ্বারা জীব তাহার অত্যন্ত বশীভূত হয় ; এমত কি, তাহার জন্য অসংসঙ্গ করিতে বাধ্য হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৩৩। উত্তম ভোজনাদি ও আসব-পানাদিতে লোভ অথবা পাপজনক ও পুণ্যময় বস্তুতে আসক্তি ভক্তি-প্রতিকূল কেন?

“ভালরূপ ভোজন, পান, শয়ন ও ধূম্র-আসবাদি সেবায় যে লোভ থাকে, সেই লোকদ্বারা জীবের ভক্তি সঙ্কুচিত হয়। আসব ও কনক-কামিনীতে লোভ ভক্তির নিতান্ত বিরোধী। যাঁহাদের শুদ্ধভক্তি-লাভের বাসনা থাকে, তাঁহারা অতি যত্নে ঐ সকল লোভ পরিত্যাগ করিবেন। পাপ-বস্তুতেই হউক, বা পুণ্যময় বিষয়েই হউক, ইতর লোভ অত্যন্ত হেয়। কেবল কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভই সর্বমঙ্গলের হেতু।”

—‘লৌল্য’, সং তোঃ ১০।১১

৩৪। বিষয়ি-লোকের মনস্তৃষ্টি-সাধনার্থ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা-বিরুদ্ধ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে কি?

“কেবল সংসারী-লোকদিগকে সন্তোষ করিতে গেলে ক্রমশঃ অনর্থের উদয় হইবে, তাঁহাদের মতে মত দিয়া নিরবচ্ছিন্ন মায়াবাদ-ঢেউতে ভাসিতে থাকিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তি প্রচার করিবার জন্য সেই সকল সংসারী লোকের নির্দোষ সহায়তা গ্রহণ করা ভাল। কিন্তু তাহাদিগের মনস্তৃষ্টি-সাধনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা-বিরুদ্ধ কথা স্বীকার করা অতীব অন্যায়।”

—‘শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ’, সং তোঃ ১১।৩

৩৫। জিহ্বা-লালসা কি ভক্তি-প্রতিকূল?

“জিহ্বার লালসায় যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট।”

—‘ধৈর্য্য’, সং তোঃ ১১।৫

৩৬। দ্যুতক্রীড়া কি কি? তাহা কি ভক্তি-প্রতিকূল?

“যে-স্থলে অপ্রাণী বস্তুর দ্বারা ক্রীড়া হয়, তাহাই দ্যুতক্রীড়া-স্থান। তাস, পাশা, সতরঞ্চ, দশ-পাঁচিশ, বাঘবন্দীরূপ যতপ্রকার ক্রীড়া আছে, সে-সকল স্থানকে ‘দ্যুতক্রীড়া’-স্থান বলা যায়। অধুনাতন ‘লটারি’ গৃহকেও দ্যুতক্রীড়া স্থান বলা যায়। নলরাজা, যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন, শকুনি প্রভৃতি রাজন্যবর্গের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দ্যুতক্রীড়া-স্থানে জুয়াচুরি, কপটতা প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা অর্থ-লাভের জন্য বিষম কলহ ও সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখনও যে-সকল ক্রীড়ামন্দির আছে, সে-সকল স্থানে অনেকের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—চতুর্বর্গের নাশ হইতেছে। এই সকল ক্রীড়ায় তাহারা রত হয়, তাহারা ভয়ঙ্কর আলস্য ও কলহ-প্রিয়তা লাভ করে; তাহাদের দ্বারা কোন ধর্ম-কর্ম হইতে পারে না।”

—‘কলি’, সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সং তোঃ ১৫।১

৩৭। পশু-পক্ষী-পালন কি ভক্তি-প্রতিকূল?

“পশু-পক্ষীর প্রতিপালনে আসক্তি করিবে না।”

—‘ভক্তিপ্রাকৃতিক্যবিচারঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৪।৩৭

৩৮। ‘মাৎস্য্য’ কাহাকে বলে? মাৎস্য্য ও প্রেম কি পরস্পর-বিরোধী?

“পরসুখে দুঃখী ও পরদুঃখে সুখী হওয়ার নাম—‘মাৎস্য্য’। ‘মাৎস্য্য’ ও ‘প্রেম’—

পরস্পর-বিরুদ্ধ। যেখানে মাৎসর্য্য, সেখানে প্রেম নাই এবং যেখানে প্রেম, সেখানে মাৎসর্য্য নাই।”

—‘ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব’, সং তোঃ ৪।৬

৩৯। ‘মাৎসর্য্য’ সকল রিপূর প্রধান কেন?

“কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ—এই পাঁচটি মাৎসর্য্যের অন্তর্ভূত। ক্রোধে কাম আছে; লোভে ক্রোধ ও কাম আছে; মোহে লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে; মদে মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে এবং মাৎসর্য্যে মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে।”

—‘মাৎসর্য্য’, সং তোঃ ৪।৭

৪০। বৈষ্ণবধর্ম্ম নির্ম্মৎসর-ধর্ম্ম কেন?

“জীব দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবারূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম একদিকে এবং মাৎসর্য্য আর একদিকে অবস্থিতি করে।”

—‘মাৎসর্য্য’, সং তোঃ ৪।৭

৪১। জীবের মুক্তি ও বন্ধন কি?

“নির্ম্মৎসরতাই জীবের মুক্তি এবং মাৎসর্য্যই জীবের বন্ধন।”

—‘মাৎসর্য্য’, সং তোঃ ৪।৭

৪২। মৎসর ব্যক্তি কি জীবের প্রতি দয়াবিশিষ্ট, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ও তৃণাদপি সূনীচ হইতে পারে?

“যিনি পরসুখে দুঃখী, তিনি কখনই জীবে দয়া, করেন না, ভগবানের প্রতিও তাঁহার সরলভাবের উদয় হয় না, বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার নিসর্গজনিত ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকে। যিনি মাৎসর্য্যশূন্য, তিনিই ‘তৃণাদপি’-শ্লোকের তাৎপর্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন।”

—‘মাৎসর্য্য’, সং তোঃ ৪।৭

৪৩। কপটি কি ধার্ম্মিক হইতে পারেন?

“কাপটি পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ না করিলে ধার্ম্মিক হইতে পারে না; ধর্ম্মের ছলে পাপ আচরণ করিয়া জগদ্বঞ্চক হইয়া পড়ে।”

—‘নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ’, সং তোঃ ৮।৯

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রুতিশাস্ত্র সর্ব্বাণ্ড্রে অনুশীলনীয়। পরে দর্শনশাস্ত্র। দ্রষ্টব্য-বিষয়ের শ্রবণ বিনা দর্শন ভ্রমপূর্ণ। চক্ষুস্থান জনগণের দৃষ্ট বিষয়েরই শ্রবণ আবশ্যিক। “শ্রবণং কীর্তনং বিবেচনং।” প্রভৃতি নবধাতুস্তির মধ্যে আদৌ শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা। শ্রৌতপথ সর্ব্বাণ্ড্রে। শ্রুতবিষয়ের কীর্তনের পর স্মরণ। পূর্ণের দর্শন চক্ষুচক্ষুদ্বারা হয় না। বেদশাস্ত্রে শ্রবণের কথা বর্ণিত আছে। সীমাবিশিষ্ট শক্তির পরিচয় এই প্রদেশে আছে। বৃহত্তের বিষয় জ্ঞানলাভ করিতে হইলে উপনিষদ্ শ্রবণ করিতে হইবে।

“যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধন্তে সবিশেষমেব।

বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রয়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।”

শ্রুতি বলেন,—সেইবস্তু “অবাজ্ঞনসগোচরঃ”। অর্থাৎ যে বস্তু বাস্তব-নিত্যবর্তমান, তাহা জড়েন্দ্রিয় বা মনের গোচরীভূত নহে। উহা জাগতিক বস্তুর সমান মনে করিতে হইবে না। জ্ঞাতবস্তু শ্রবণের প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মোত্তর পরিচ্ছিন্ন বস্তুর জ্ঞান মানবের আছে। অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর জ্ঞানলাভই মানবের প্রয়োজনীয়। আমরা জড়জগতে জীবশক্তি-ভিন্ন অন্য কোন শক্তির প্রাধান্য না দেখিয়া বিবেচনা করি যে, জীবশক্তিদ্বারাই সকল কার্য্য সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু জীবশক্তির মূলীভূত যিনি, যাঁহা হইতে জীব শক্তি লাভ করিয়া স্ব-স্ব-কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, তাঁহার বিষয় বিস্মৃত হইলে তিনি আমাদের শাসন করিয়া থাকেন এবং তিনিই যে সকল শক্তির একমাত্র আধার, তাঁহাকে বাদ দিলে যে সকলেই নিষ্ক্রিয়, সেই কথা আমাদের বুঝাইয়া দেন। তলবকার উপনিষদে বর্ণিত ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের স্ব-স্ব-প্রাধান্য লইয়া বিবাদের কালে শ্রীভগবান্-কর্তৃক তত্ত্বৎ অহঙ্কার চূর্ণ করিবার যে আখ্যায়িকা প্রসিদ্ধ আছে তদ্বারা আমরা এ বিষয়ের সুষ্ঠু প্রমাণ পাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও কবিরাজ গোস্বামী আমাদের জানাইয়াছেন,—“লৌহ যৈছে অগ্নিশক্ত্যে করয়ে জারণ।” জড়ের স্বয়ং কোন কার্য্য করিবার শক্তি নাই। চেতনাদ্বারা তাহা পরিচালিত হওয়া চাই।

জড়ের ধর্ম্ম শুদ্ধ হইলে নির্বিশেষবাদ। চেতন জগতে জড়বিশেষ বর্তমান নাই, কিন্তু চেতনের বিচিত্রতা আছে। চেতনের বিচিত্রতার উপলব্ধি করিতে হইলে জড়-বিচিত্রতার অভিনিবেশ নিরস্ত করিতে হইবে। মায়াশক্তির পরিণাম জড়জগতের হেয়তা-দর্শনে চিচ্ছক্তি-পরিণত জগতে হেয়তা আসিবার আশঙ্কার প্রয়োজন নাই। সেই প্রকার আশঙ্কা হইতেই ব্রহ্মের নিঃশক্তিকত্ববাদ প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু ঐপ্রকার ধারণা নির্বুদ্ধিতামাত্র। ভগবদ্বস্তু নিগুণ অর্থাৎ জড়গুণরহিত কিন্তু তাহাতে চিদগুণসকল নিত্য বর্তমান। সুতরাং তিনি নিগুণ হইয়াও সগুণ। সেই চিৎসবিশেষবস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অন্যাত্মিলাষিতা শূন্য হইয়া অধোক্ষজ ভগবানে শুদ্ধভক্তি লাভের প্রয়োজন।

“কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিংশপূরাকশপুষ্পায়তে

দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাত-দংষ্ট্রায়তে।

বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে

যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তমঃ।।”

নির্বিশেষবিচারকগণ যে কৈবল্যের কথা বলেন, অধোক্ষজে ভক্তিলাভ করিলে সেই কৈবল্যও অতি জুগুপ্সিত ব্যাপার বলিয়া উপলব্ধি হয়। ঐপ্রকার কৈবল্যে জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিচার না থাকায় তাহাতে আনন্দের অভাব। বাস্তব আনন্দ সেব্যের সেবাতেই নিত্য বর্তমান। কিন্তু সেব্য-সেবকভাবের অবর্তমানে সেবারও অভাব। সুতরাং তদবস্থায় আনন্দের সম্ভাবনা নাই।

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

সনাতন ধর্ম

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৯ পৃষ্ঠার পর]

বিশ্ব ধ্বংস হবে ; কিন্তু জীব ধ্বংস হবে না। জীব কোন্টা? এই যে বাহ্য শরীর ধারণ করেছি, এটা জীব নয়। বা এই শরীরের মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ও যে সূক্ষ্ম শরীর আছে ওটাও জীব নয়। তার অন্তরালে যে জীবাত্মা—আত্মা বলে যে জিনিসটা আছে, সেটা হচ্ছে জীব। তার ধ্বংস হয় না, মরে না, জন্মগ্রহণ করে না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্মায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যাতে হন্যামানে শরীরে।। (গীঃ ২।২০)

শ্রীমদ্ভগবদগীতা জীবের স্বরূপ-লক্ষণ দিয়েছে, জীব কি প্রকার? জীবাত্মা কি?

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।

অচ্ছেদ্যোহমদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।

নিত্যঃ সর্ববগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ।। (গীঃ ২।২৩-২৪)

আগুন দিয়ে আত্মাকে পোড়ানো যায় না, শাস্ত্রের দ্বারা আত্মাকে কেটে ভাগ ভাগ করা যায় না, বায়ু তাকে শোষণ করে নিতে পারে না। সেই আত্মাকে নিত্য, শাস্বত, সত্য, সনাতন বলেছে উপনিষদে, গীতায়। এর বিরুদ্ধে বিচার গ্রহণ করতে গেলেই আমাদের অসুবিধা এসে যাবে। মানুষ একটু উন্নত হলেই তাকে ভগবান বলে দেয়! মানুষ কখনও ভগবান নয়। সনাতন ধর্মে এটা ব্যাপটিস্ট। এটা সর্বদাই মনে রাখবেন।

যে একটু বড় হয়েছে, যার দু-পাঁচ হাজার শিষ্য হয়েছে, যার পিছনে পিছনে বহু লোক ছুটছে, অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, সে ভগবান হয়ে গেছে। তখনই বুঝতে হবে এ লোকটা সনাতন ধর্ম থেকে ডিভিয়াস্ করেছে। সনাতন ধর্মের বিচার এই প্রকার নয়। মানুষ কখনও ভগবান নন, মানুষ মানুষই।

মেক্লে পাশ্চাত্য জগতের একজন হিস্টোরিয়ান, বেস্ট রাইটার, চারশ বছর আগেকার লোক। তিনি বলেছেন,—“মোর্ দ্যান্ এ ম্যান্ ইউ ক্যান্ নট্ বি।” আপনারা স্কুল-কলেজে পড়েছেন, মেক্লে হিস্ট্রি পড়ে দেখুন, তার মধ্যে তুমি মানুষের চেয়ে বড় কিছু হতে পার না, ঠেলে ঠুলে তুমি মানুষ পর্য্যন্ত। ম্যাক্সিমাম্ তোমাকে মানুষ হতে হবে। আজকাল যেমন মানবতা মানবতা করে চিৎকার চলছে, সেই মানবতা পর্য্যন্ত হতে পারে মানুষ। তার অতিরিক্ত কিছু হওয়ার উপায় নেই। তার অতিরিক্ত কিছু হতে পারে না। এই মানুষ কখন পশু হয়ে যায়, গাছ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী জগতে যায়, চুরাশি লক্ষবার সেই জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন কুলেতে জন্মগ্রহণ করেছে। ঈশ্বরের কথা ব্যাসদেব শাস্ত্রেতে মেন্সন্ করেছেন এবং কয়টি অবতার শাস্ত্রে তা লেখা আছে। দশাবতারের কথা আপনারা জানেন,—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, নৃসিংহ, পরশুরাম, দাশরথি-রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কঙ্কি। বুদ্ধ মানে এই যে শাক্যসিংহ

বুদ্ধ, সে বুদ্ধ তিনি নন। শাক্যসিংহ ভগবান্ নন। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, যে বৌদ্ধধর্ম আমাদের দেশে প্রচার করেছেন অশোকের সাহায্যে, আমাদের দেশের সম্রাটের সাহায্যে, তিনি ভগবান্ নন।

অনেক হিস্টোরিয়ান্ আমাদের দেশে এই বুদ্ধদেবকে ভগবান্ বলেছেন। আমি সেই জন্যই এই কথাটা বলছি আপনাদের কাছে। তিনি নিতান্ত ভুল করেছেন। বিরাট ভুল করেছেন। কেন? এককথায় আমি আপনাদের বুঝিয়ে দেব কিসে? বৌদ্ধদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, তারা তাঁকে ভগবান্ বলে কিনা? আমরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, আমরা তাকে ভগবান্ ভগবান্ বলে চিৎকার করছি। বৌদ্ধরা কি বলেন? তারা তাঁকে কখনও ভগবান্ বলে না, বলবেও না। বৌদ্ধ-বিচারের কথা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। পয়সা দিলেই কিনতে পাওয়া যায়। এখনও তাদের বই আছে। ‘ললিতবিস্তার’ গ্রন্থখানি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ১০০/১৫০ বছর পূর্বে ছেপেছে। সেই বৌদ্ধগ্রন্থের ভিতরে বুদ্ধদেবের ড্রেসক্রিপশন্ আছে। এই যে শাক্যসিংহ বুদ্ধ ইনি অষ্টাদশ বুদ্ধ। এর পূর্বে ১৭ জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছেন, গত হয়ে গিয়েছেন। এইটিন্থ বুদ্ধ হলেন শাক্যসিংহ। তারপরেও ৬ জন বুদ্ধ হয়েছেন। ২৪ জন বুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে, কি গ্রন্থের মধ্যে?—“অমরকোষ”, সংস্কৃত ভাষার কোষগ্রন্থ। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধগ্রন্থ সব পুড়িয়ে দিয়েছেন আগুন জ্বালিয়ে। এই বৌদ্ধগ্রন্থখানা—অমরকোষখানা তিনি রেখে দিয়েছিলেন, অমরকোষের প্রকাশক শঙ্করাচার্য্য। তার মধ্যে এই ২৪ জন বুদ্ধের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে শাক্যসিংহ এইটিন্থ এবং আরও ৬ জনের কথা আছে।

বৌদ্ধগ্রন্থ—ললিতবিস্তার গ্রন্থ। ছোট চটি বই অনেক লাইব্রেরীতে আছে। এতে রাবণ এরোপ্সেনে করে তথাগত বুদ্ধের নিকট যেতেন। এই বইটী প্রকাশিত হবার পর পাশ্চাত্ত্য জগৎ এরোপ্সেন আবিষ্কার করেন। এর পূর্বে ঐ ধারণা ছিল না পাশ্চাত্ত্যে। আমাদের আজকালকার দিনে সভ্যজগৎ যেমন বলছে, পাশ্চাত্ত্য জগৎ আমাদের সভ্য করে তুলেছে, আমরা আগে মূর্খ ছিলাম, আমাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না, এটা সম্পূর্ণ বিদ্বেষপূর্ণ হিংসামূলক। পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে প্রিভাইজড্ হয়ে এ সমস্ত কথা বলছে। আমরা এ সমস্ত কিছুতেই বিশ্বাস করি না। ঐতিহ্য থেকে ইতিহাসটাকে প্রমাণ বলে মানতে হয়। বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রধান অস্ত্রই হল ইতিহাস। সমস্ত জিনিসটাকে ইতিহাসের খপ্পরে ফেলে দিতে চায়। অমুকগ্রন্থ, এই বেশীদিন হবে না। এই তিন চার হাজার বছর, এই রকম ঐতিহাসিক হিসাবের মধ্যে ফেলতে চায়। এই ঐতিহাসিক দিক থেকে আমি বলতে চাই।—

ব্রিটিশ যখন ভারতে আসে, তখন স্টিমারে করে এসেছিল। সেই স্টিমারে পাল তুলে এসেছিল, ইঞ্জিন ছিল না, জাহাজে পাল তুলে ভারতবর্ষে এসেছে। ভারত অধিকার করার পর ভারতের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ, সংস্কৃত বই, এগুলো সমস্ত আলোচনা করে এক একটা বৈজ্ঞানিক বিস্ফোরণ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষে আসবার পূর্বে পাশ্চাত্ত্য জগতে বিজ্ঞানের কি ছিল? তারা বলে দিতে পারে, প্রমাণ করে দিতে পারে, তারা ভারতে ঢুকবার পূর্বে এসব করেছে? এটাও না। ভারতে এসে ওরা মানুষ হয়েছে,

এর আরও আগে ছিল অসভ্য জন্তুবিশেষ, বন্য জাতি। এই প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যা কিছু সমস্ত ভারতে আসার পর। এখনও ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থগুলি—বেদ-উপনিষদ প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থগুলি বিলেতে পড়ে আছে, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে সেগুলো তারা ফেরৎ দেয়নি। এমনকি সেগুলো দেখতে পর্য্যন্ত দেয়নি তারা। শুধু ইণ্ডিয়ানদের কেন? অন্য দেশের লোককেও দেখতে দেয়নি। ওরা সেই সমস্ত আলোচনা করে। বৈদিক ঋষিদের সম্বন্ধে ওদের একটা বিশ্বাস আছে যে, হিন্দুধর্মের ভিতরে যে ঋষিরা, তারা মিথ্যাবাদী নয়, তারা জোচ্চোর নয়। যা সত্য তা স্থাপন করে গেছেন।

মেঘের আড়াল থেকে ইন্দ্রজিৎ রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এসব রামায়ণের মধ্যে লেখা আছে। এটা মিথ্যা কথা নয়। এই আবিষ্কার হবার পূর্বে এসব মিথ্যা কথা, আজগুবি, ঋষিদের কল্পনা ইত্যাদি বলে আমাদের দেশে চলত। যখন আবিষ্কার হয়ে গেল, সেটা চুপ হয়ে গেল। এই প্রকার এই আগ্নেয় অস্ত্রাদি সব কিছু। এই যে এখানে বসে কথা বলছি। ১০ হাজার মাইল দূরে থেকে সেই কথা শুনতে পাচ্ছে। এসব পরে আবিষ্কার করেছে। আমাদের পুরাণে, মহাভারতে ও অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে সমস্ত বর্ণনা আছে। ইংরেজরা সেগুলোকে মৌলিক গ্রন্থ বলে তার পূজা করে। কিন্তু আমাদের ভারত তাকে সম্মান দিতে শেখেনি। সে সম্মান দিতে পারল না তারা।

দেশটা স্বাধীন হয়েছে। আমাদের দেশের প্রধান কর্তব্য ছিল যে, আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থগুলো রিসার্চ করা হোক। আর্য্যঋষিরা সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে আমাদের দেশ সম্বন্ধে কি বলেছেন? আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছেন? আইন, আদালত, বিজ্ঞান এই সমস্ত করা হল না! আরও উন্টে কি? সংস্কৃত ভাষা তুলে দাও। ওটা পড়ে কিছু হবে না। ওটা ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ, ও ভাষায় কথা বলা চলে না, ও ভাষায় বিজ্ঞান শেখা যায় না। এইসব কতকগুলো অযথা যুক্তি-তর্ক দিয়ে আমরা বলি, পাশ্চাত্য দেশের ইনফ্লুয়েন্সের দ্বারা এই চিন্তাধারা ভারতের মধ্যে ঢুকেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে যে কলির বর্ণনা আছে, অমুক সাল থেকে অমুক সাল পর্য্যন্ত কলি থাকবে। পঞ্জিকা খুলে দেখুন কলির টাইম দেওয়া আছে। সত্যযুগের টাইম দেওয়া আছে। সমস্ত যুগের টাইম দেওয়া আছে এবং কোন্ যুগে লোকের কি-প্রকার মনোভাব হবে, তারও বর্ণনা দেওয়া আছে। তা হুবহু মিলে যাচ্ছে। এই যে বিচার আমাদের, এগুলো কি দেখবার বিষয় নয়। কাজেই সনাতন ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই সমস্ত কথা না বলে পারছি না। আপনারা একটু এ বিষয়ে চেষ্টা করবেন। চেষ্টার অসাধ্য কিছু কর্ম নেই। আপনারা অনুসন্ধান করলে পারবেন। আমাদের দেশে সংস্কৃত চর্চা হোক। সংস্কৃত টোল হোক। বহু অর্থ ব্যয় করে আপনারা লাইব্রেরী করেছেন। এখানে একটা টোলের পণ্ডিত নিয়ে এসে একটা টোল খুলে দিন। ছেলেরা মিলেমিশে পড়বে। নাইট স্কুলে পড়বে, সন্ধ্যার পর নাইট স্কুল যেমন হয়। এরকম করে পড়বে, যেটা আমাদের দেশের গৌরবের বিষয়।

বাংলা ভাষা ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা হল কেন? এই বাংলা ভাষা সংস্কৃতের সবচেয়ে নিকটস্থ ভাষা—নিয়ারেষ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ্। সংস্কৃতের অত্যন্ত কাছে থাকার দরুণ বাংলা এত উন্নত হয়েছে। এখন সেটাকে নামিয়ে দেওয়া হল, সংস্কৃতের ধার ধরা হবে না।

সংস্কৃত ভাষাকে নামিয়ে দাও। যুক্ত অক্ষর আর রেখো না, ঠারে ঠারে কথা বললেই হবে। এই কতকগুলো কথা আমাদের সর্বনাশ করেছে। উচ্চশিক্ষাটাকে জোর করে দাবিয়ে নীচে নামিয়ে নিম্ন শিক্ষার সঙ্গে সমান করে দেওয়া হচ্ছে কেন? নিম্ন শিক্ষাটাকে তুলে উঁচুতে নিলেই হয়।

এ বিষয়ে স্যার আশুতোষ দেশকে অনেক উন্নত করেছেন। সংস্কৃতটা কম্পাল্‌সারি ছিল। তার দ্বারা বাংলা ভাষা রাইজ্ করে গেছে। এখন সে-সব ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে যাচ্ছে। আপনারা সবাই শিক্ষিত লোক, বুদ্ধিমান ব্যক্তি, বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতি। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের একটা গৌরব—বাঙ্গালী বুদ্ধিমান। আমরা বুদ্ধিমান থাকব, অন্য জায়গা থেকে বোকারা এসে আমাদের বোকা বানিয়ে দেবে? আমাদের নিজস্বতা আমরা বজায় রাখতে পারব না? সেইজন্যই আমরা এই সনাতন ধর্মের আলোচনা করে থাকি। পাশ্চাত্যদেশে একটা বিশ্বাস আছে, তারা বলে থাকে,—“ইণ্ডিয়ান্স্ আর বর্ণ ফিলোজফার।” জন্মগত তাদের ধর্মনিষ্ঠা। দার্শনিক চিন্তা আমরা ছেড়ে দেব কেন? আমরা ভারতবাসী, সেটা ডেভল্যাপ্ করব। অন্যের ধার করা বিচার আমরা নেব কেন? আমাদের নিজস্ব যেটা জন্মগত, সেটা আমরা হারিয়ে দেব? জোর করে ভুলবার চেষ্টা করব?

যখন দেশটা স্বাধীন হল তখন সংস্কৃত শিক্ষা তুলে দাও। আমি খুব প্রোটেষ্ট করেছিলাম। বড় বড় জায়গায় মিটিং করে বহু যুক্তি-বিচার দিয়ে বক্তৃতা দিয়েছি। দুটো একটা পেপারে সেই বক্তৃতা তুলেছে। বক্তৃতা তুলে তার নীচে রিমার্কস্ করে দিয়েছে—ইহা বক্তার মত। অর্থাৎ দেশের মত নয়। এটা অন্য লোকের গ্রহণ করতে হবে না। যাক্ ভগবানের ইচ্ছায় এটা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেনি, কিছুটা ধুনি জ্বালিয়ে রেখেছে। একটু চেষ্টা চলছে, এখন একটু তার শিক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। ভারতবর্ষের নাগরিক জন্মগত ধার্মিক, কেন না তারা সনাতন দেশে, সনাতন রাজ্যে, সনাতন ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছে। জীব সনাতন বস্তু, ঈশ্বরও সনাতন বস্তু। উদাহরণস্বরূপ সূর্যের তেজ, কিরণগুলো বাদ দিলে যেমন সূর্যের আর সূর্যত্ব থাকে না, সেইপ্রকার ভগবান্ বললে জীবসমূহ নিয়েই ভগবান্, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটাও নিত্য। এটা ধ্বংস হবে না। আমরা কি করব? এখন ভগবানের থেকে ছুটে চলে এসেছি, আলাদা হয়ে গেছি। যে জীবাত্মা আমাদের ভিতরে আছে তার উপরে আবরণ পড়ে গেছে।

একটা সূক্ষ্ম আবরণ মনের, আর একটা স্থূল আবরণ এই শরীরের। এই স্থূল আবরণ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আপনারা তা চোখের উপর দেখছেন। ৫০/৬০/১০০ বছরের মধ্যে মানুষ মরে যাচ্ছে, তাকে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলছেন। কিন্তু মনের যে সূক্ষ্ম আবরণ, সেটার সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করে বুঝি, বিচার করে বুঝি; কিন্তু তার অতীত আত্মা, পাশ্চাত্য দর্শন স্বীকার করতে পারেনি। ওদের মাথায় ঢোকেনি।

—জগদগুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

গুরুতত্ত্ব-বিচার

সাক্ষাৎ হরিত্ব বলি' শাস্ত্রে গীত হয়।
অনঙ্গ মঞ্জুরী বলি' ভজনঙ্গ কয়।।
আপন গুরুরে কেহ ছোট নাহি মানে।
অষ্টোত্তর জগদগুরু প্রিয় শিষ্য 'জানে'।।
আচার্য্য মাং বিজানীয়াং নাবমন্যেত কহিচিৎ।
হেন বাক্যে শিষ্যবৃন্দ, সদাই শঙ্কিত।।
যদ্যপি আমার গুরু শূড়ি-বাড়ী যায়।
তথাপি জানিয়ে তাঁ'রে নিত্যানন্দ রায়।।
নিত্যানন্দাভিন্ন তত্ত্ব গুরুর স্বরূপ।
অপ্রাকৃত অতিমর্ত্য সব অপরূপ।।
প্রতিবর্ণে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ বর্ণনা।
প্রেষ্ঠশিষ্য গুরুপ্রতি সেরূপ রচনা।।
মদগুরু জগদগুরু বাক্য আছেয়ে প্রচার।
গুরুর মহিমা তাহে অনন্ত অপার।।
গুরুতত্ত্বে হেন গুণ অবশ্য আছয়।
অগুরুরে গুরুজ্ঞান মিথ্যা সুনিশ্চয়।।
ভাবি' দেখ নিজ মনে শিষ্য মহাশয়।
বদ্ধজীব নাহি বুঝে গুরু-গুণচয়।।
না জানিয়া, না বুঝিয়া বলা অনুচিৎ।
অগুরুরে গুরু বলা মিথ্যা সুগর্হিত।।
অজ্ঞানেও যোগ্যপ্রতি হইলে যোজিত।
সুনিশ্চিত মহাভাগ্য শাস্ত্রেতে ঘোষিত।।
বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।
ইহার সত্য অর্থ অতীব নিগূঢ়।।
বস্তুতে বিশ্বাস আর অবস্তু-বিশ্বাস।
পৃথক্ ফল দান করে অবশ্য প্রকাশ।
অবস্তু-বিশ্বাসে ফল—মিথ্যা, দুঃখ, শোক।
হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা গেলে উপহাসে লোক।।
শিষ্যবাক্য-শ্রবণে হয় গুরুর সন্তোষ।
অগুরুর অতিস্তুতি শ্রবণেতে দোষ।।

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রবণ

গত্যর্থ ‘শ্র’ ধাতু হইতে শ্রবণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কোনও বস্তু বা বিষয়ের সম্যগর্থবোধক শব্দ কর্ণরন্ধ্র-পথ দিয়া হৃদয়মাঝে প্রবেশ করিলে তদ্বিষয়ের উপলব্ধি-সূচক সমর্থনকেই সাধারণতঃ ‘শ্রবণ’ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। “তচ্চ নামরূপ-গুণলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ”—শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় শব্দসমূহের শ্রবণেন্দ্রিয়স্পর্শই ‘শ্রবণ’ নামে কথিত। ‘শ্রবণ’-শব্দে যে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির ‘শ্রবণ’ই উদ্দিষ্ট, তাহা “শ্রবণমাত্র নামগুণাদীনাং” শ্লোক হইতে পরিষ্কাররূপে জানা যায়। অনুকূল ভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণই কৃষ্ণভক্তির ‘স্বরূপ’ লক্ষণ। শ্রবণাদি নববিধ সাধনভক্তি হইতে কৃষ্ণে যে প্রেমভক্তির উদ্গম হয়, তাহাই ‘পঞ্চম পুরুষার্থ’ এবং তাহাই পুরুষার্থের সীমা। অনেক জন্মের মহাসুকৃতিফলেই সংসঙ্গ এবং শাস্ত্রশ্রবণজনিত সম্বন্ধজ্ঞানলাভ প্রকৃত শুদ্ধভক্তির আরম্ভ হয়। শ্রবণাখ্যা ভক্তিতেই যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ পর্যাবসিত। শ্রবণ ব্যতীত কীর্তনাদি বিষয়ে জ্ঞান হয় না বলিয়া এই শ্রবণকে তাহাদের অপেক্ষা পূর্বকর্তব্যরূপে জানিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ভাঃ ৭।৫।১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় পাওয়া যায়,—“শ্রবণ ভিন্ন কীর্তনাদি অর্থাৎ কোন বস্তু কিরূপভাবে কীর্তনাদি করা কর্তব্য, তাহা জানা যায় না বলিয়াই কীর্তনাদি সর্ববিধ ভক্ত্যাঙ্গের পূর্বে শ্রবণের বিধি বা ব্যবস্থা অর্থাৎ শ্রবণের আদিভক্ত্যাঙ্গত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ যদি সাক্ষাৎভাবেই মহাজন-কৃত কীর্তনের শ্রবণ-সৌভাগ্য ঘটে, তাহা হইলেই তখন শ্রীনামের নিজের পৃথক কীর্তন সম্ভব হয়, এইজন্য ভক্তিসাধনে শ্রবণেরই প্রাধান্য কথিত হইল।” অন্যান্য ভক্ত্যাঙ্গসমূহের শ্রবণাখ্যা ভক্তিমূলেই প্রবৃ্ত্তি বলিয়া শ্রবণাখ্যা ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য উপায়ের দ্বারা সংসারোত্তরণের অসম্ভাবনা যুক্তিযুক্ত।

হরিকথা শ্রবণই কর্ণের চরম সুখ। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণভগবৎস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণ কেবলমাত্র পরমভাগ্যহেতুই সম্ভবপর হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ভাঃ ৩।৯।৫ এর “যে তু হৃদীয় চরণাম্বুজকোষগন্ধম্” শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—“যে রূপ মাধ্যাকর্ষণ বায়ু পরমাণু সমূহকে আকর্ষণ করিয়া স্থূল পিণ্ড প্রদর্শন করে এবং আদিত্য সূর্য্যমণ্ডলস্থ গ্রহ নক্ষত্রদিগকে বায়ুর দ্বারা আকর্ষণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মগন্ধবাহী বায়ু শ্রোতপন্থার বিষয় বা বেদ। সেই বেদবায়ু শ্রীগুরুদেবের ও সাহচরণের মুখে উন্নীত হইয়া ভাগ্যবান্ জীবের কর্ণে প্রবেশ করে।” মন ত’ অস্থির। শ্রবণের অর্থ আচরণ করা। শ্রবণীয় বিষয় আচরণ না করিলে কি করিয়া ফললাভ হইবে? এইজন্যই প্রাণ দিয়া হরিকথা শুনিতে হইবে, তবেই ফললাভ হইবে। ভাঃ ১।১৯।১৭ শ্লোকে “ভগবানের লীলাকথা শ্রবণেই মুমূর্ষু জীবের কর্তব্যতার চরম পর্য্যবসান অর্থাৎ হরিলীলা-কথা শ্রবণই যে মুমূর্ষু জীবের শেষ কর্তব্য” তাহা পরিলক্ষিত হইতেছে। সাধু, গুরু বা বৈষ্ণবের শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলে শুশ্রূষাজীবমাত্রেরই কর্ণরন্ধ্রে সেই উচ্চারিত বৈকুণ্ঠ-শব্দ প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে মায়াবন্ধন হইতে মোচন করে। তৎকালে জীবের স্বরূপ বিচার উদিত হয়, সেই স্বরূপের বৃত্তিই ‘কৃষ্ণভক্তি’ বলিয়া কথিত। জীবের কর্ণদ্বয় সম্বন্ধ-

জ্ঞানের নিত্য আহাৰ্য্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিলে জীবাত্মার শুদ্ধভক্তির উন্মেষফলে তিনি অখিল চেষ্টাদ্বারা ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবা করিতে থাকেন। ভাঃ ২।২।৩৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—“ভক্তগণের হৃদয়ে প্রকাশমান ভগবান্ শ্রীহরির কথামৃত কর্ণরন্ধ্রে রাখিয়া পান করেন, তাহারা বিষয়বিষাক্ত অন্তঃকরণকে শোধন করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করেন।” মহৎ-সেবাদ্বারা ভাগবত-ধৰ্ম্মে শ্রদ্ধা এবং তাহা হইতে হরিকথা শ্রবণেচ্ছা জন্মে, তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ ও শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিরই ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের কথায় রুচি উদিত হয়। শ্রীভাগবতে (ভাঃ ৫।১২।১৩) রহুগণের প্রতি জড়ভরতের উক্তি,—“যে-সকল মহাভাগবতগণের সভায় বিষয়বার্তা-প্রসঙ্গনাশন ভগবদ্গুণানুবাদ প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিত হয়, তাঁহাদের মুখোদগীর্ণ সেইসকল কথা সতত আদরপূর্বক শ্রবণ করিতে করিতে মুমুক্শুগণেরও মোক্ষবাসনা বিদূরিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে শুদ্ধরতির উদয় হয়।”

ভগবানের নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে চণ্ডালও সংসার হইতে বিমুক্ত হয়। চণ্ডালের একবার মাত্র শ্রবণেই মুক্তিফলপ্রাপ্তিহেতু ভক্তের তৎশ্রবণে পরমভক্তিই ফলরূপে অভিপ্রেত হইয়াছে, ভাঃ ৬।১৬।৪৪ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি শ্রীচিত্রকেতু মহারাজের উক্তি হইতে পাওয়া যায়। শ্রীভাগবতে (৩।১৩।৪) শ্রীমৈত্রেয়ের প্রতি শ্রীবিদুরের উক্তি,—

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য, নম্রঞ্জসা সুরিভিরীড়িতোহর্থঃ।

তত্ত্বদগুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥

“যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ মুকুন্দের পাদপদ্ম বিরাজিত, সেই সকল ভক্তগণের গুণকথার পুনঃ পুনঃ শ্রবণই পুরুষগণের বহু আয়াসসাধ্য বেদাধ্যয়নের ফল—ইহা পণ্ডিতগণ শ্লাঘা সহকারে বলিয়া থাকেন।” ভাঃ ৩।৭।১৪ “অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে গুণানুবাদশ্রবণং মুরারে” শ্লোকে মুরারির গুণানুবাদশ্রবণে অশেষ ক্লেশের নিবৃত্তি হয় বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণং নৃণাং পরমমঙ্গলম্।

কর্ণপীযুষমাস্বাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ॥ (ভাঃ ১১।৬।৪৪)

“হে কৃষ্ণ! ভবদীয় লীলাচরিতসমূহ মানবগণের পরমমঙ্গল এবং শ্রবণে অমৃতস্বরূপ বলিয়া তাঁহারা তাহা আস্বাদন করিয়া অন্য স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।” শ্রীভাগবতে (৪।২৯।৪০-৪১) দেবর্ষি নারদ রাজা প্রাচীনবর্হিকে বলিয়াছেন,—“সাধুসঙ্গে মহাজনমুখরিত মধুসূদনচরিতপীযুষশেষসরিৎসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। যাঁহারা অবিতৃষ্ণ হইয়া গাঢ়কর্ণদ্বারা তাহা পান করেন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক বা মোহ তাহাদিগকে স্পর্শ করে না।” ভগবানের বিমলকীর্তিশ্রবণজনিতা প্রকৃষ্ট শ্রদ্ধাদ্বারা সাধুগণের যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ হয়, বিষয়বাসনায়ুক্ত মনুষ্যগণের উপাসনা, বেদার্থশ্রবণ, অধ্যয়ন, দান ও তপস্যাদ্বারা তাদৃশ বিশুদ্ধি লাভ হয় না—ইহা ভাঃ ১১।৬।৯ “শুদ্ধির্নৃণাং ন তু” শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী রুক্মিণীদেবী নিখিলবস্তু-লাভাত্মক শ্রীকৃষ্ণের গুণরাশি ও সৌন্দর্য্যের কথা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ বিষ্ণুর কথামৃত অহর্নিশ কর্ণকুহরে পান করেন, তাঁহাদের কোন জড়ীয় মোহ উপস্থিত হইতে পারে না। শ্রীভাগবতে শ্রীল সূত গোস্বামী বলিয়াছেন,—ভগবানে সর্বান্তঃকরণ সমর্পিত ছিল বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণ-কোপোখিত প্রাণনাশক মহাসর্প হইতেও মোহপ্রাপ্ত হন নাই; তাঁহার এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে, কারণ যাঁহারা উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ বিষ্ণুর কথায় নিবিষ্ট এবং সর্বদা ভগবৎকথামৃত পান ও তাঁহার চরণযুগল স্মরণ করেন, তাঁহাদিগের অন্তিমকালে কোন মোহ হয় না।”

গৃহাসক্ত পঞ্চ সূণাপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্তি ও তদন্তর্গত জীবতত্ত্ব আলোচনা করেন না। ‘আমরা কে?’ ‘আমাদের কর্তব্য কি?’ ‘আমাদের গতি কি?’ ‘কিরূপে উদ্ধার পাইব?’—ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধানরহিত মানবগণের সহস্র সহস্র শ্রোতব্য বিষয় আছে। শ্রীকৃষ্ণগুণানুবাদ নিবৃত্ততৃষ্ণ পুরুষগণকর্তৃক উপগীয়মান হইয়া থাকে, ইহা ভবৌষধ ও শোত্রমনোহভিরামস্বরূপ। পশুঘ্ন ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ তাহা হইতে বিরত হইতে পারে কি?—এই প্রশ্ন করিয়াছেন ভাগবতের ১০।১।৪ শ্লোক। শ্রীশুকদেব গোস্বামীর মুখপদ্ম-বিগলিত হরিকথামৃতপানহেতু অতি দুঃসহ ক্ষুধাও মহারাজ পরীক্ষিৎকে অভিভূত করিতে পারে নাই। যাহার কর্ণকুহরে শ্রীহরিকথা কখনও প্রবেশ করে নাই, তাহার জীবনধারণই বৃথা, তাহার কর্ণদ্বয় কেবল ছিদ্রসদৃশ। যাহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, শ্রীভাগবতের (২।৩।১৯) “স্ববিড়্‌বরাহোষ্ট্বখরৈঃ” শ্লোক সেই মানবকে কুকুর, শূকর, উষ্ট্র ও গর্দভতুল্য পশু বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১১।১০),—“যাহার ভাগ্যে দুঃখের পর দুঃখ অবশ্যস্তাবী, সেই ব্যক্তিই নিঃশেষিত-দুঃখ গাভী, অসতী স্ত্রী, পরাধীন দেহ, অসৎ পুত্র, সুপাত্রে অপ্রদত্ত ধন এবং ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিশূন্য গ্রাম্যকথার আশ্রয় গ্রহণ করেন।” ভোগ্যপ্রসঙ্গ বা গ্রাম্যপ্রসঙ্গ শ্রবণে সংসারের উৎপত্তি, আর সেব্যপ্রসঙ্গ বা ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ হইলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বা ভক্তি হয়। শ্রবণ হরিপ্রসঙ্গে না হইলেই ভোগ্যপ্রসঙ্গে হইয়া যাইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—“গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবাক্য না কহিবে।” যাহারা হরিভজনে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ও রুচিসম্পন্ন তাঁহাদের জন্যই এইকথাগুলি বলা হইয়াছে। অসদ্বাক্য বা গ্রাম্যকথা বেশ্যা-সদৃশী, তাহা জীবের চিত্ত কলুষিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া হরিভজনে বাধা সৃষ্টি করে। বাজে কথায় যাহাদের অত্যন্ত রুচি, তাহাদের হরিকথায় স্বাভাবিক রুচির অভাব জানিতে হইবে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বলিয়াছেন,—“অসদ্বাক্য-বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্বস্বহরীণিঃ।” গ্রাম্যকথা শুনা ও বলার ইচ্ছা ও তাহাতে রুচি হরিভজন হইতে তফাৎ করিয়া জীবকে বিপথগামী করিবে এবং অবশ্যই তাহার ভজন হইতে ছুটি হইবে। যাহারা অজের জন্ম, নিত্যলীলাবিলাসের কথা শ্রবণ করেন না, তাহারা অমঙ্গলসমূহের আকরস্বরূপ শুষ্ক বৈরাগ্যের আবাহন করেন এবং মায়াবাদী হইয়া ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যের কথা হইতে দূরে অবস্থান করেন। ভাগবত ৩।৯।৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—যে-সকল ব্যক্তি ভগবানের সর্বদুঃখনিবর্তক লীলাকথার শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইয়া তুচ্ছ

কামসুখের আশায় লোভাভিভূত-হৃদয়ে নিরন্তর অমঙ্গলজনক কৰ্মসমূহ করিয়া থাকেন, তাহারা নিশ্চয়ই দৈবকর্তৃক হতবুদ্ধি ও দুৰ্ভাগা।”

ভগবত্তত্ত্ব-বিচার ও ভগবলীলাদির বর্ণনরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র, বৈষ্ণব-জীবন-চরিত্র ও বৈষ্ণব-জগতের পৌরাণিক ইতিহাসাদির শ্রবণকে শাস্ত্র শ্রবণ বলা হয়। বেদান্ত তাৎপর্যসহকারে অবৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত নিরসনপূর্বক যে-সকল তত্ত্ব-গ্রন্থ মহানুভবগণ-কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করাও প্রধান ভগবদনুশীলন কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। হরিকথা ও হরিতত্ত্ব গুণিতে গুণিতে শাস্ত্রচর্চা হয়। হরিকথা শ্রবণের দ্বারা পরানুশীলন ও প্রত্যাহার—এই উভয়ই সম্পাদিত হয়। শ্রবণের দুই অবস্থা—শ্রদ্ধা উদয়ের পূর্বে সাধুগণের মুখে যে কৃষ্ণগুণানুবাদ শ্রবণ করা হয়, তাহা প্রাথমিক শ্রবণ। সেই শ্রবণ হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধার উদিত হইলে গাঢ় পিপাসার সহিত কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। তদনন্তর গুরু-বৈষ্ণবের মুখে নিঃসৃত যে কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করা হয়, তাহারই নাম পূর্ণ শ্রবণ। সাধনকালে গুরু-বৈষ্ণবের মুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে সিদ্ধকালের শ্রবণ উদিত হয়। শ্রীভগবানের নামাদি শ্রবণ প্রথমতঃ পরশ্রেষঃ-স্বরূপ, তন্মধ্যেও মহাজনকর্তৃক কীর্তিত হইলে ততোহধিক এবং শ্রীভাগবত শ্রবণ তদপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে। আবার ভাগবত যদি মহাজনকর্তৃক কীর্তিত হয়, তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা অধিকরূপে জানিতে হইবে। শ্রবণমধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ণ।। (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫৪)

শ্রবণের তারতম্য সম্বন্ধে ভাঃ ৭।৫।১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টিকায় পাওয়া যায়,—
“শ্রীভগবান্ ও ভক্তের নাম, রূপ, গুণ, লীলার শব্দসমূহ শ্রবণপথগত হইলে তাহাকে শ্রবণ বলা হয়। সাধনের প্রারম্ভে অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত ভগবন্নাম শ্রবণের অপেক্ষা থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ বিষয়-মল-মুক্ত হইলে ভগবানের রূপসম্বন্ধী কথা শ্রবণ এবং তৎফলে অন্তরে ঐ রূপের উদয় যোগ্যতা লাভ হয়। রূপের কথা শ্রবণপ্রভাবে রূপের সম্যক্ উদয় হইলে গুণের স্ফূর্তি হইয়া থাকে। গুণের সম্যক্ স্ফূর্তি হইলে পরিকরবর্গের সেবাবৈচিত্র্য এবং তৎসহ তলীলাবৈশিষ্ট্যও স্ফুরিত হয়। এইরূপে তদীয় নাম-রূপাদির স্ফুরণে তাঁহার লীলা সর্বাদ্গসম্পন্না হইয়া সুন্দরভাবে স্ফুরিতা হন। সেই শ্রবণের মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ পরম শ্রেষ্ঠ।” মহামুনিকৃত শ্রীমদ্ভাগবত-বিষয়ে শ্রবণেচ্ছু কৃতিগণ শ্রবণের মাধ্যমে ভগবানকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া থাকেন, কিন্তু অপর শাস্ত্রসমূহদ্বারা সর্বদা তাহা হয় না।

যাঁহার কথা শ্রবণ-কীৰ্ত্তন পরমপাবন, সাধুদিগের হিতকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অন্তর্য্যামি-চৈতন্যগুরুরূপে অবস্থানপূর্বক তাঁহাদের হৃদয়ের কামাদি বাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন। এতৎ প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—

শৃংখলঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণত্যাগ স্বচেষ্টিতম্।

নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।। (ভাঃ ২।৮।৪)

“যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গলকথা শ্রদ্ধাপূর্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতি শীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন।” শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মের সেবার কথা ব্যতীত আর বড় কথা পারমার্থিক জগতে অর্থাৎ Theistic world-এ নাই। অধোক্ষজ-সেবাবঞ্চিত হইয়া যাহাতে আধ্যাত্মিক হইয়া না পড়ি তজ্জন্য সর্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করা আবশ্যিক। বিবিধ দুঃখ-দাবানলদগ্ধ, অতি দুস্তর সংসার-সমুদ্রের পরপারে গমনাভিলাষী ব্যক্তির ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথারস কর্ণপুটে সেবন ব্যতীত এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

বৈধীভক্তি ও রাগভক্তি

শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া অথবা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী বিধি অনুসারে যে ভজন করা হয়, তাকে বৈধীভক্তি বলে। কেবলমাত্র শাস্ত্রের অনুশাসনে ভজনে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, কিন্তু অনুরাগ জন্মায় নাই,—ইহা হইতেছে বৈধীভক্তি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বৈধীভক্তির ৬৪টি অঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন,—

“শ্রবণাদি-ক্রিয়া তার ‘স্বরূপ’-লক্ষণ।

‘তটস্থ’-লক্ষণে উপজয় প্রেমধন।।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম ‘সাধ্য’ কভু নয়।

শ্রবণাদি-গুণচিহ্নে করয়ে উদয়।।

এই ত’ সাধনভক্তি—দুই ত’ প্রকার।

এক ‘বৈধী-ভক্তি’, ‘রাগানুগা-ভক্তি’ আর।।

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।

‘বৈধী-ভক্তি’ বলি’ তারে সর্বশাস্ত্রে গায়।।

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তির বহুত’ বিস্তার।

সংক্ষেপে कहিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ-সার।।

গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।

সদ্ধর্ম্মশিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধুমাগ্নানুগমন।।

কৃষ্ণপ্ৰীত্যে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।

যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ, একাদশ্যপবাস।।

ধাত্র্যশ্বখগোবিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।

সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জন।।

অবৈষ্ণব-সঙ্গত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব।

বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখ্যান বর্জিব।।

হানি-লাভে সম, শোকাতির বশ না হইব।
 অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব।।
 বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্তা না শুনিব।
 প্রাণিমায়ে মনোবাক্যে উদ্বিগ্ন না দিব।।
 শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
 পরিচর্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।।
 অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবদতি।
 অভ্যুত্থান, অনুরজ্যা, তীর্থগৃহে গতি।।
 পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীৰ্তন।
 ধূপ-মাল্য-গন্ধ-মহাপ্রসাদ-ভোজন।।
 আরাট্রিক-মহোৎসব-শ্রীমূর্তি-দর্শন।
 নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন।।
 ‘তদীয়’—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
 এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত।।
 কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
 জন্ম-দিনাদি-মহোৎসব লঞা ভক্তগণ।।
 সর্বথা শরণাপত্তি, কার্তিকাদি-ব্রত।
 ‘চতুঃষষ্টি অঙ্গ’ এই পরম-মহত্ত্ব।।

তন্মধ্যে পাঁচটি ভক্ত্যঙ্গ সর্বশ্রেষ্ঠ—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ।
 মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
 সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
 কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ সঙ্গ।।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে বলিয়াছেন,—

“কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যতাবা সা সাধনাভিধা।
 নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।।”

রাগ :—ভজনীয় বস্তুতে স্বাভাবিকভাবে ভক্তের আবেশ এবং তৎপ্রতি গাঢ় প্রীতি বা প্রেমপূর্ণ উৎকণ্ঠা অথবা প্রেমপিপাসা দেখা দিলে তখন তাহাকে ‘রাগ’ বলে। সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর যে গাঢ় অনুরাগ ও প্রেম, তাহা রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ অথবা তিনি পূজনীয়—এইপ্রকার চিন্তা বিন্দুমাত্র নাই।

রাগাত্মিকার অনুগতা যে ভক্তি তাহা রাগানুগা ভক্তি। ব্রজবাসিগণের মধ্যে যে ভক্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহা রাগানুগা ভক্তি। ব্রজে মা যশোমতী, পিতা নন্দমহারাজ, শ্রীদাম-সুদামাদি সখাগণ বা উদ্ধবদির যে সমস্ত ভক্তির অনুশীলন, তাহা রাগানুগা ভক্তি। ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে দেখা যায়,—

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

“বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরু মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্য মুদারপাণি রমণান্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ
কুর্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥”
বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মথুরামণ্ডল।
তদপেক্ষা বৃন্দাবন—যথা রাসস্থল ॥
তদপেক্ষা গোবর্দ্ধন—নিত্যকেলিস্থান।
রাধাকুণ্ডে তদপেক্ষা প্রেমের বিজ্ঞান ॥

গোপীকারা কৃষ্ণকামনায় সর্বপ্রকার বিষয়বাসনা জলাঞ্জলি দিয়া নিতান্ত অনুরক্ত-
চিত্তে এক কৃষ্ণপানেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় সংসারের
কোন বস্তুর সহিত সামান্যতম সম্বন্ধের গন্ধমাত্রও রাখেন নাই। তাঁহাদের নিজপ্রিয় কোন
সামগ্রীই ছিল না, কেবল ভগবৎপ্রীতিই একমাত্র কামনা।

তাঁহারা বৈধর্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া মর্যাদার দিকে দৃকপাত না করিয়া সমস্ত বাধা
অতিক্রমপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ-সকাশে উপনীত হইয়াছিলেন—সমস্ত বিধি সেখানে স্তব্ধীভূত
হইয়া গিয়াছিল। গোপীগণের প্রেম, শ্রীমতী রাধারানীর প্রেম কেবলমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-
প্রীতিবাঞ্ছামূলক। সেখানে নিজসুখবাঞ্ছা বিন্দুমাত্র নাই। সেখানে কেবলমাত্র “কৃষ্ণের
চাহিয়ে সন্তোষ।” এই কৃষ্ণ-সন্তোষরূপ শুদ্ধাভক্তিতেই কৃষ্ণচন্দ্র বশীভূত। এমন কি,
কৃষ্ণচন্দ্র নিজমুখে বলিয়াছেন,—“রাধে! তব ঋণ নারিনু শোধিতে।” তিনি ঋণী হইয়া
পড়িয়াছেন।

“নির্ধূতামৃত মাধুরী পরিমলঃ কল্যাণি বিশ্বাধরো
বক্তং পঙ্কজসৌরভং কুহরিত শ্লাঘাভিদন্তে গিরঃ।
অঙ্গং চন্দন শীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্য সর্বভাক্
ত্বামাসাদ্য মম ইদং ইন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহূর্মোদতে ॥”

শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীকে বলিলেন,—হে কল্যাণি! বিশ্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ তোমার
অধরামৃতে মাধুরী পরিমলকে পরাজিত করিয়াছে। তোমার বদন কমলের ন্যায় সৌরভ-
যুক্ত, তোমার বাক্য কোকিলের কুণ্ঠবনির গর্ব হরণ করে। তোমার অঙ্গ চন্দন হইতেও
সুশীতল বা স্নিগ্ধ। তোমার এই দেহ সর্বসৌন্দর্য্যের আধার। হে রাধে! তোমার মাধুর্য্য
আস্বাদনে আমার ইন্দ্রিয়সমূহ মুহূর্মুহ হর্ষযুক্ত হইতেছে।

সুতরাং শ্রীমতী রাধারানীর বিশুদ্ধ প্রেমে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বশীভূত। ভক্তিরসে ভগবান্
বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় ব্রজপ্রেমে ভগবান্ বশীভূত হইয়া
পড়িয়াছেন।

শ্রীউদ্ধব বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি বৃহস্পতির ছাত্র
এবং সর্বশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার রূপ ঠিক কৃষ্ণের ন্যায় ছিল। এহেন
উদ্ধব বিগলিতচিত্তে আর্তিসহকারে গোপীগণের পদধূলিতে অভিষিক্ত হইবার জন্য
প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

“আসামহো চরণরেণু-জুষামহং স্যাং, বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা, ভেজুমুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।”

অর্থাৎ—আমি এইসকল গোপীদিগের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনের গুল্ম-লতা প্রভৃতি ঔষধিগণের মধ্যে যেন একটি হই। যেহেতু এই গোপীগণ দুস্ত্যজ আত্মীয়-স্বজন এবং সদাচার-রীতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিসকলের অশ্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবী আশ্রয় করিয়াছিলেন। কারণ—

“এতাঃ পরং তনুভূতো ভুবি গোপবন্ধো-
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছতি যদ্ববভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রজজন্মভিরনন্ত-কথারসস্য।।”

এইসকল গোপবধুগণের জন্ম সফল।

শ্রীউদ্ধব দশমাস ব্রজে বাস করিয়াছিলেন। তারপর তিনি যখন ব্রজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন, তখন ভাবে বিভাবিত হইয়া গদগদ স্বরে ব্রজের সকলকে বলিতেছেন,—
“আমাকে বিদায় দিন, আমি এখন আসি।” তাঁহার এইপ্রকার আবেগপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী রাধারাণী সাস্থ্যনয়নে বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন,—“আমরা আর কি বলিব। তিনি যে ব্রজের কথা, পিতামাতার কথা, সখাগণের কথা, গোপগোপীগণের কথা, বিশেষ করিয়া মাদৃশ অধমার কথা স্মৃতিপটে রাখিয়াছেন—ইহা অপেক্ষা আমাদের সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে! তিনি যেখানেই থাকুন না কেন—সুখে থাকুন। তাঁহার সুখেই আমাদের সুখ। আমাদের নিজের কোন সুখের প্রয়োজন নাই। হে উদ্ধব! তোমাকে একটি অনুরোধ জানাই,—তুমি প্রাণপ্রিয় গোবিন্দকে আমাদের বিরহের কথা অর্থাৎ আমরা যে বিরহী—তাঁহার অদর্শনে আমরা যে বিরহ-সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছি, তাহা তাঁহাকে বলিও না। তিনি ব্রজ হইতে যাওয়ার সময় বলিয়াছিলেন,—‘আমি আবার আসিব।’—এই আশাতেই আমরা কোনরকমে প্রাণে বাঁচিয়া আছি। আমাদের পাগলিনী-প্রায় অবস্থা তাঁহার নিকট ধীরে ধীরে বলিও।”

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আসিবার জন্য অনুরোধ করিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমতী রাধারাণী নিষেধ করিলেন। বলিলেন,—“প্রাণপ্রিয় যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এখানে আসিবেন, তখন তাঁহার মধুর অধরে মধুর হাসি আমরা দেখিতে পাইব। তাহা দেখিয়াই আমাদের হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা চলিয়া যাইবে।”

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলিলেন,—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টুমামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

আমি কৃষ্ণপদদাসী, তঁহো রস সুখরাশি,

আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।

কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর প্রাণ-মন,

তবু তিহোঁ মোর প্রাণনাথ।।

একদিন দ্বারকায় নারদ গিয়া দেখিলেন,—কৃষ্ণের খুব মাথার যন্ত্রণা হইয়াছে। ছটফট করিতেছেন। তাহা দেখিয়া নারদ অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিভাবে যন্ত্রণার উপশম হয়। কৃষ্ণ বলিলেন,—ইহার একমাত্র ঔষধ ‘ভক্তপদধূলি’। একটু ভক্তপদধূলি হইলে আমার শিরঃপীড়ার উপশম হইবে। নারদ রুক্মিণীদেবীকে বলিলেন। রুক্মিণীদেবী তদুত্তরে বলিলেন,—‘পতি পরম গুরু। তাঁহাকে পদধূলি কি করিয়া দিব? নরকে যাইতে হইবে।’ তিনি সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণের নিকট বিফলমনোরথ হইয়া ভক্তপদধূলির জন্য ত্রিভুবন ঘুরিলেন। কিন্তু কেইবা ভগবানকে পদধূলি দিবে। সকলেই পদধূলি দিতে অস্বীকার করায় কোথাও না পাইয়া শেষে ব্রজে আসিলেন। নারদকে দেখিয়া ব্রজগোপীগণ ও শ্রীমতী রাধারানী অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং পাগলপারা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“নারদ! আমাদের প্রাণেশ্বর শ্যামচাঁদ কেমন আছেন?” নারদ বলিলেন,—“তাঁহার খুব শিরঃপীড়া হইয়াছে। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন।” তাঁহারা বলিলেন,—“তবে তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিলে?” নারদ কহিলেন,—“আমি কি আর সাধে আসিয়াছি। ঔষধের জন্য চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কোথাও পাইলাম না।” তাঁহারা

ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিলে নারদ বলিলেন,—“ভক্তপদধূলি হইলে তাঁহার শিরঃপীড়ার উপশম হইবে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের কোন ভক্তই নরকে যাইবার ভয়ে পদধূলি দিতে সন্মত হইলেন না।” তখন শ্রীমতী রাধারানী বলিলেন,—“নারদ! আমরা ত’ ভক্ত নই, আমরা যদি ভক্ত হইতাম তাহা হইলে তিনি আমাদের ছাড়িয়া যাইবেন কেন? তবে জান নারদ, আমরা ভক্ত না হইলেও আমরা কৃষ্ণকে ভালবাসি। কৃষ্ণ আমাদের জীবনসর্বস্ব। আমরা পদধূলি দিতেছি, সত্বর লইয়া যাও।”—এই বলিয়া শ্রীমতী রাধারানী ও সকল গোপীগণ পদধূলি দিয়া বলিলেন,—“নারদ! কৃষ্ণের একমুহূর্ত সুখবিধানের জন্য আমরা অনন্তকাল নরকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। শীঘ্র যাও, প্রাণসংহার কষ্ট লাঘব কর।”—ইহাই আত্মসমর্পণ, শরণাগতি, আত্মনিবেদন ও রাগভক্তির জ্বলন্ত উদাহরণ।

রাগমার্গীয় ভজনের উদাহরণ আমরা অপর একটি লীলায় দেখিতে পাই।—একদিন মধ্যরাত্রে রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পদসেবা করিতে গিয়া দেখিলেন,—কৃষ্ণের পায়ে তলদেশ পুড়িয়া গিয়া ফোঁস্কা হইয়াছে। রুক্মিণীদেবী কাঁদিয়া আকুল। পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনার পায়ে এইরূপ ফোঁস্কা কিরূপে হইল? আগুন কোথা হইতে আসিল এবং কেমন করিয়া পায়ে লাগিল?” কৃষ্ণচন্দ্র চুপ করিয়া আছেন, কিছুই বলিতেছেন না। রুক্মিণী বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে তাঁহার আকুলতা দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন,—“আজ রাধারানী তোমার অতিথি হইয়াছিলেন। তুমি তাঁহাকে বিশেষভাবে আদর-আপ্যায়ন করিয়াছিলে। তাঁহার আগমনে ও দর্শনে তুমি এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলে যে তুমি নিজকে ভুলিয়া গিয়াছিলে। তাঁহাকে তুমি অনেক রকমের সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য খাওয়াইয়াছিলে। কিন্তু তাঁহার প্রিয় দুগ্ধ পান না করাইয়া জল দিয়াছিলে। আমি তোমাকে ইঙ্গিত করায় তুমি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বিশ্রামস্থানে তাঁহাকে একগ্লাস গরম দুধ দিয়াছিলে। শ্রীমতী রাধারানীর সংস্পর্শে আসার জন্য তোমার রাগময়ী প্রেমের উদয় হইয়াছিল। তুমি আত্মবিস্মৃতা হইয়া পড়িয়াছিলে। তজ্জন্য দুধটা এত গরম ছিল বুঝিতে পার নাই। তুমি প্রেমে মত্ত হইয়া বিবশ অবস্থায় যেহেতু রাধারানীর হাতে গরম দুগ্ধের গ্লাসটি দিলে তখনই তাঁহার হাত হইতে গ্লাসটি পড়িয়া যায়।”

রুক্মিণী বলিলেন,—“আচ্ছা কথা বলিলেন ত’! গরম দুধ রাধারানীর হাত হইতে তাঁহার ক্রোড়দেশে পড়িল, আর তাহাতে আপনার পায়ে ফোঁস্কা কেন হইবে তাহা বুঝিলাম না।” শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন,—“রুক্মিণী! তুমি এসব বুঝিবে না। শ্রীমতী রাধারানী সর্বক্ষণ মানসী সেবাতে মগ্ন। তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবিতা মতিবিশিষ্টা। তুমি যখন তাঁহার হাতে গরম দুগ্ধের গ্লাস দিয়াছিলে তখন তিনি আমার চরণ দুইখানা তাঁহার ক্রোড়দেশে রাখিয়া মানসে সেবা করিতেছিলেন। সেই সময় তোমার প্রদত্ত গরম দুধ তাঁহার ক্রোড়স্থিত আমার পায়ে পড়িয়া এইপ্রকার ফোঁস্কা হইয়াছে।”

শ্রীমতী রাধারানীর কি-প্রকার প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেম—কৃষ্ণসেবাচেষ্টা—কৃষ্ণভজন—তাহা বুঝিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তিনি কৃষ্ণগর্থে—কৃষ্ণসেবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

লোকধৰ্ম, বেদধৰ্ম, দেহধৰ্ম, কৰ্ম।
 লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মৰ্ম।
 দুস্ত্যজ আৰ্য্যপথ, নিজ পরিজন।
 স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভৎসন॥
 সৰ্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
 কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥
 ইহাকে कहিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
 স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
 কৃষ্ণ লাগি' আর সব করে পরিত্যাগ।
 কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

এই কীর্তনটী করিয়া উপসংহার করিতেছি,—

দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে
 নিজ স্থল পরিচয়।
 নয়নে হেরিব ব্রজপুরশোভা
 নিত্য চিদানন্দময়॥
 বৃষভানুপুরে জনম লইব
 যাবটে বিবাহ হবে।
 ব্রজগোপীভাব হইবে স্বভাব
 আন ভাব না রহিবে॥
 নিজ সিদ্ধদেহ নিজ সিদ্ধনাম
 নিজ রূপ স্ববসন।
 রাধাকৃপাবলে লভিব বা কবে
 কৃষ্ণপ্রেম প্রকরণ॥
 যামুন সলিল আহরণে গিয়া
 বুঝিব যুগল রস।
 প্রেমমুগ্ধ হয়ে পাগলিনীপ্রায়
 গাহিব রাধার যশ॥”

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৫০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৫ পৃষ্ঠার ৭ পঙ্ক্তিতে “তয়ি প্রসন্নে
 কিমিহা পরৈর্ন ত্য্যপ্রসন্নে কিমিহা পরৈর্ন।” স্থলে “তয়িপ্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নত্ব্য্যপ্রসন্নে
 কিমিহাপরৈর্নঃ॥” হইবে।

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৪ পৃষ্ঠার পর]

কলিকালে চারিবর্ণ আচারভ্রষ্ট ও পাপপরায়ণ হওয়ায় জন্মানুসারে বর্ণ-নিরূপণ আদৌ শোভনীয় নয় ও তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ কি-প্রকারে ব্রাহ্মণতা লাভ করবে? তদুত্তরে মহাভারতে উল্লিখিত উমাদেবী ও মহেশ্বরের কথোপকথন স্মরণীয়,—

“এতন্মে সংশয়ং দেব বদ ভূতপতেহনঘ।

ব্রয়ো বর্ণা প্রকৃতেব কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ॥

স্থিতো ব্রাহ্মণ-ধর্মোণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।

ক্ষত্রিয়ো বাহথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ঃ স গচ্ছতি॥”

(মহাভারত অনুঃ শাল্যপর্ব ১৪৩। ৫, ৮)

উমা বললেন,—হে দেব! ভূতপতে, অনঘ, ত্রিবর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কি-প্রকারে নিজ স্বভাবদ্বারা ব্রাহ্মণতা লাভ করবেন—এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হয়েছে। মহেশ্বর তদুত্তরে বললেন,—ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য যদিও ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হয়ে ব্রহ্মবৃত্তি জীবিকায় দিন যাপন করেন, তাহলে তাদৃশাচরণকারি-ব্যক্তি ব্রাহ্মণতা লাভ করতে পারেন।’

মহাভারতে আরও কথিত হয়েছে,—

“ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।

কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥

সর্বোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধায়তে।

বৃত্তে স্থিতস্ত শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥”

(মহাভারত অনুঃ শাঃ পর্ব ১৪৩। ৫০, ৫১)

“জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি—কোনটাই দ্বিজত্বের কারণ নয়, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঞ্জক-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।”

পদ্মপুরাণে ব্রহ্মার বাক্য হতে জানা যায়,—

“সচ্ছত্রিয়কুলে জাত অক্রিয়ো নৈব পূজিতঃ।

অসৎ ক্ষেত্রকুলে পূজ্যো ব্যাসবৈভাণ্ডকৌ যথা॥

ক্ষত্রিয়াণাং কুলে জাতো বিশ্বামিত্রোহস্তি মৎসমঃ।

বৈশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠশ্চ অন্যে সিদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ॥

* * * *

যস্য তস্য কুলে জাতো গুণবাণেব তৈর্গুণৈঃ।

সান্ধাদব্রহ্মময়ো বিপ্রঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥”

(পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে ৪৩ অধ্যায় ৩২১ ও ৩২২ পৃষ্ঠা, গৌড়ীয়-সংস্করণ)

“শ্রীব্রহ্মা বললেন,—সচ্ছত্রিয়কুলে জাত সদাচাররহিত ব্যক্তি কখনই পূজিত নন। অসৎ ক্ষেত্র বা কুলে আবির্ভূত ব্যাস ও বৈভাগুক মুনি পূজার্ত। ক্ষত্রিয়কুলে জাত বিশ্বামিত্রও মন্তুল্য। বেশ্যার ক্ষেত্রে উদ্ধৃত বশিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণগুণোপেত অন্য ব্যক্তিগণও ব্রাহ্মণ বলেই সিদ্ধ। যে সে কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, গুণবান্ তাঁর গুণসমূহের দ্বারাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ব্রাহ্মণ, তাঁকে বিশেষ যত্নের সহিত পূজা করা কর্তব্য।”

অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রমধ্যে যে কোন কুলে জন্ম হোক না কেন, মনুষ্যগণ গুণের দ্বারা পরিচিত হয়। উপনিষদে কথিত হয়েছে,—

“এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মান্নোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।।”

(বৃহদারণ্যক ৩।৯।১০)

অর্থাৎ—“হে গার্গি! যিনি সেই অচ্যুততত্ত্বকে অবগত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।”

শাস্ত্রের জন্মগত বর্ণবিধানের প্রাধান্য নেই, বরং বৃত্তগত বর্ণবিধানেরই অধিকতর প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। মরীচিনন্দন মহর্ষি কশ্যপ ও তৎপত্নী প্রাচেতস দক্ষকন্যা দিতির দুই যমজ পুত্র হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু উভয়েই মহাভয়ঙ্কর অসুর হন। আবার হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করলেও অসুর নন, পরন্তু সর্বলোকপাবন মহাভাগবত। মনুপুত্র প্রিয়ব্রতের বংশে ঋষভদেব জন্মগ্রহণ করেন। ঋষভদেব দেবদত্তা জয়ন্তী-ভার্য্যার গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁর একশত পুত্রের মধ্যে ভরত ভারতবর্ষের রাজা হন। নয়জন নবদ্বীপের বা বর্ষের অধিপতি হন ; আর নয়জন মহাভাগবত নবযোগেন্দ্র নামে খ্যাত হন। অবশিষ্ট একাশীজন কর্মশাস্ত্রের প্রবর্তক ব্রাহ্মণ হন। এক্ষণে একই জন্মাদিকারে জন্মগ্রহণ করেও নিজ নিজ গুণ-কর্মানুসারে কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ মহাভাগবত হয়েছিলেন। ‘হরিবংশে’ (১১শ অধ্যায়) কথিত হয়েছে,—“নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।।” অর্থাৎ ‘নাভাগ এবং দিষ্টপুত্র এই বৈশ্যদ্বয় ব্রাহ্মণতা লাভ করেছেন।’

পদ্মপুরাণে উক্ত হয়েছে,—

“নাসৌ পৌত্রায়ণঃ শূদ্রঃ শুচাদ্দ্রবণমেব হি শূদ্রত্বম্।”

অর্থাৎ ‘রাজা পৌত্রায়ণ ক্ষত্রিয় হলেও শোকের বশবর্তী হওয়ায় রৈক মুনি-কর্তৃক শূদ্র বলে কথিত হয়েছেন।’

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডে জবালা-তনয় সত্যকাম ও গৌতমের প্রসঙ্গে বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা বা দৈক্ষ্য-ব্রাহ্মণতার বিচার প্রদর্শিত হয়েছে। তাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, গৌতমমুনি সত্যবাদিতা ও সরলতা-গুণ বিচারপূর্বক সত্যকাম-জাবালের বর্ণ নির্ণয় করে তাকে সাবিত্র্য-সংস্কার প্রদান করেছিলেন। ছান্দোগ্যে (৪।৪।৪) শ্লোকে উল্লিখিত আছে,—“অপৃচ্ছং মাতরম্। সা মা প্রত্যব্রবীদ্বহুং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে।” অর্থাৎ “(সত্যকাম বলছেন)—আমি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছেন,—আমি যৌবনে পরিচারিণীরূপে বহুলোকের পরিচর্যা করতে করতে তোমাকে পুত্ররূপে পেয়েছি।” ‘বহুং’-শব্দের অর্থ ‘বহুল

পরিচর্য্যা’—এ কথা অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে ‘বহুহং’-শব্দের অর্থ ‘বাহুল্যেন’ হবে। তাঁদের মতানুসারে ‘বাহুল্যেন’-শব্দটি স্বীকার করলে জবালা বহুলভাবে পতি পরিচর্য্যা করেছিলেন—ইহাই বুঝায়। এক্ষণে যদি জবালা তাঁর পতিকে বহুলভাবে পরিচর্য্যা করে থাকেন, তাহলে তিনি কি পতির নাম বা গোত্র ভুলে যাবেন? অথবা জানবেন না? জবালা সত্যকামকে বলেছেন,—“সাহং এতৎ ন বেদ যদগোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামা অহমস্মি। সত্যকামো নাম ত্বমসীতি।” অর্থাৎ “তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা আমি জানি না। আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম।” পতিব্রতা স্ত্রী যদি পতির নাম উচ্চারণ না করেন, তথাপি পতির গোত্র বলতে স্ত্রীর আপত্তি বা বাধা থাকতে পারে না। বিবাহের মন্ত্র পাঠের সময় সতী স্ত্রী তাঁর পতির গোত্র কি শোনে নী? গর্ভাধান কালের মন্ত্রে পতির গোত্রের কথাও কি জবালা শুনতে পাননি? জবালা তাঁর পুত্র সত্যকামের কোন্ গোত্র তা জানেন না এবং ‘যৌবনে ত্বামলভে’ অর্থাৎ ‘যৌবনে সত্যকামকে লাভ করেছেন’—এইরূপ বাক্যে জবালার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহই প্রকাশ পায়। যৌবনকালেই সন্তান জন্মগ্রহণ করে ইহা সর্বজনবিদিত এবং জবালারও ইহা জানা থাকা সত্ত্বেও পুত্র সত্যকামকে ‘যৌবনে পুত্ররূপে তোমাকে পেয়েছি’—এরূপ বাক্য জবালা বলল কেন? ‘যৌবনে’ শব্দটির মধ্যে একটা গোপন ইঙ্গিত না থাকলে উহা জবালা-কর্তৃক উচ্চারিত হত না; সুতরাং এক্ষেত্রে ‘যৌবনে’ শব্দটির উল্লেখ নিরর্থক হতে পারে না। “বহুহং যৌবনে ত্বামলভে”—এই উক্তিযে যৌবনের মন্তৃতায় বা যৌবনকালে যৌনক্ষুধার তাড়নায় বহুলোকের পরিচর্য্যার ফলস্বরূপ তোমাকে পেয়েছি’—এরূপ অর্থ হয় না কি? ‘বহুহং’-পদে ‘বহু’-শব্দটি এস্থলে সঙ্জবাচকরূপে বা ক্রিয়া বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সত্যকামের জন্মদাতা পিতার নাম বা গোত্র যদি জবালা জানতেন, তাহলে নানাভাবে বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ করেও সত্যকামের পিতৃ-পরিচয় তথা নাম, গোত্রাদি বলতেন। কিন্তু যুবতী বয়সে তারুণ্যের উন্মাদনায় বহুলোকের পরিচারিণীরূপে নিযুক্ত থেকে তাঁদের পরিচর্য্যা করতে করতে সত্যকামকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হওয়ায় সত্যকামের পিতার নাম বা গোত্র বলা জবালার পক্ষে সম্ভব ছিল না। জবালা সত্যকামকে যাহা যাহা বলেছিলেন, সত্যকাম তাহাই গৌতমমুনির সমীপে অকপটে সরল হৃদয়ে ব্যক্ত করায় এবং “সোহহং সত্যকামো জাবালোহস্মি তে ইতি”—সেই আমি সত্যকাম জাবাল—বলে নিজকে পরিচয় দেওয়ায় গৌতমমুনি সত্যকামের সত্যবাদিতা ও সরলতার প্রশংসা করেন। বালক সত্যকাম তার মাতার চরিত্র সম্বন্ধে জেনেও তাহা গোপন না করে এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্মানহানিকর ঘটনা উপেক্ষা করেও গৌতমমুনির নিকট সত্য উদ্ঘাটন করায় মুনি সত্যকামকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে উপনয়ন প্রদান করেন। ঋতিতে কথিত গৌতম-বাক্য,—“উপ ত্বা নেষ্যে” অর্থাৎ “আমি তোমাকে উপনয়ন প্রদান করব।” ছান্দোগ্য ঋতির সহিত ছান্দোগ্যের মাধবভাষ্যধৃত সাম-সংহিতা-বাক্যের সমন্বয় করিলে সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।—

“আজ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোহনাজ্জবলক্ষণঃ।

গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ।।”

“ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্তমান। হারিদ্রমত-গৌতম এইরূপ গুণ বিচার করেই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্য-সংস্কার প্রদান করেছিলেন।”

মৃত পিতৃদিগের অন্যজাতীয় প্রাণিমধ্যে অনেক জাত্যদ্ভূত মহর্ষিগণ উৎপন্ন হয়েছেন। কুম্ভ হতে অগস্ত্য, কুশ হতে কৌশিক, মৃগী হতে ঋষ্যশৃঙ্গ, জম্বুক হতে জাম্বুক ঋষি প্রভৃতির উৎপন্ন হওয়ার কাহিনী শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। তাই জাতিকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

এই কলিকালে সারা বিশ্বে জন্মগত বর্ণাশ্রমধর্মেরই প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের নির্দেশ,—“বেদ প্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদ্বিপর্যায়ঃ” (ভাঃ ৬।১।৪০) অর্থাৎ—যাহা বেদবিহিত তাহাই ধর্ম ; আর যাহা তার বিপরীত অথবা বেদে যাহা নিষিদ্ধ তাহাই অধর্ম। বেদবিহিত কর্ম করার জন্যই ভগবানের আদেশ। বর্ণাশ্রম ধর্ম বেদবিহিত কর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনদ্বারা কেহ কেহ বিষয়ভোগজনিত সুখপ্রাপ্তির চেষ্টা করে, আবার কেহ কেহ রোগ, শোক, জরাদির দুঃখ হতে নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করে। এইভাবে প্রবৃত্তিমার্গে ও নিবৃত্তিমার্গে বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। প্রবৃত্তিমার্গে দুইপ্রকার বিষয়ভোগ হয়,—প্রথমতঃ যারা ধর্মকে আশ্রয় করে বিষয়ভোগ করে, তাদের পুণ্যবান্ বলা হয় ; দ্বিতীয়তঃ যারা অধর্মকে অশ্রয় করে বিষয়ভোগ করে, তাদের পাপী বলা হয়। প্রবৃত্তিমার্গে বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুশীলন ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গদ্বারা সাধিত হয়। এই ত্রিবর্গ সাধনের ফল স্বর্গপ্রাপ্তি বা মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে উচ্চলোক প্রাপ্তি। “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি”—(গীতা ৯।২১) —পুণ্যক্ষয় হলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। পাপকর্মের দ্বারা বিষয়ভোগে অধিককাল সুখ পাওয়া যায় না, বরং তাতে অধিক দুঃখই প্রাপ্তি হয়। পাপকর্মের পরিণামে পরবর্তী জন্মে নীচ-যোনি প্রাপ্তি হয় এবং এমনকি, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুকুর, সর্প প্রভৃতি ইতর প্রাণীরূপেও জন্মলাভ হয়। পশু-পক্ষী-কীটাদি জন্মে বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না। একমাত্র মনুষ্যের জন্যই বেদবিহিত কর্মের বিধান বা বর্ণাশ্রম ধর্মোদিত কর্ম রচিত হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে আমরা অনেকে পশু হতেও নিন্দনীয় কর্ম করে থাকি। যেমন খাদ্যাভ্যাসের প্রসঙ্গে আমরা অনেকে পশুর ন্যায় খাদ্য আহার করে থাকি। বনের পশুরা অন্য প্রাণীর কাঁচা মাংস খায়, আর আমরা Rational হয়েও অনেকে রান্না করা মাংসাদি চর্ব্য-চুষ্য করে তৃপ্তিসহকারে আহার করি। কোন কোন ধর্মধবজী বলেন,—মাংস, পেঁয়াজ, রসুন খাই না, ওগুলি কুখাদ্য। খাদ্য হিসাবে মাছ, শাক-সব্জী খাই। কিন্তু তাঁরা ভাবেন না যে, ছাগলের মাংস খাওয়া ত্যাগ করলেও মাছের মাংস খাওয়া ত্যাগ করতে পারেননি। মাছও প্রাণী এবং আমিষ পর্যায়েই খাদ্য।

ধর্মপথে চলার প্রথম সোপানই আহারশুদ্ধি। শাস্ত্র বলেছেন,—“আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ। স্মৃতিশুদ্ধে সর্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।।” (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭।২৬।২) অর্থাৎ—‘আহারশুদ্ধিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে ভগবানে অবিচ্ছিন্না স্মৃতি হয়, অবিচ্ছিন্না স্মৃতিতে পাপ বিনষ্ট হয়।’ শাস্ত্র না মানলেও মানুষের শরীরে দ্রব্যগুণের প্রভাব জড় বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। আহারের

দ্বারা শরীরের ও মনের পরিবর্তন ঘটে। মদ্যপান করলে দেহ-মন যেরূপ হয়, দুধ পান করলে সেরূপ হয় না। মদের ক্রিয়া ও দুধের ক্রিয়া সম্পূর্ণ পৃথক্। ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী হিংস্র প্রাণীর স্বভাব, আর গরু-ছাগলাদি তৃণভোজী প্রাণীর স্বভাব এক নয়। মানুষের প্রকৃতিগত আহার বিচার করলে জানা যায় যে, মানুষ নিরামিষাশী প্রাণী। কারণ নিরামিষাশী প্রাণী তথা হাতী, গরু, ছাগল প্রভৃতির চুমুক দিয়ে জলপান করে, আর আমিষাশী প্রাণী তথা ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতির জিহ্বা দ্বারা লেহন করে বা চেটে চেটে জলপান করে—ইহা আমরা সচরাচর লক্ষ্য করি। মানুষমাত্রেই চুমুক দিয়া জলপান করে। নিরামিষাশী ও আমিষাশী প্রাণিগণের জলপানের লক্ষণটুকু দেখলে ও কারণ বিশ্লেষণ করলে ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হয় যে, ভগবান্ মানুষকেই নিরামিষাশী করেই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমরা অনেকে ভগবানের এবশ্বিধ আজ্ঞাপালনে পরাজুখ হয়ে আসুরিক মত ও পথ অবলম্বন করে প্রবৃত্তিমাগে হিংসাশ্রয়ী হয়ে আমিষাশী হয়ে পড়েছি।

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৯ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণ-সুদামা দুজনে গেছেন গুরুগৃহে। সেখানে গিয়ে কেমন সেবা করেছেন, যে সেবায় পরিতুষ্ট হলেন গুরু সান্দীপনি। তখন শিষ্যদের ভয়ানক কষ্ট করতে হত গুরুগৃহে। জ্বালানি কাঠ নেই। গুরুমা বলেছেন, তোমরা কিছু জ্বালানি কাঠ নিয়ে এস। কৃষ্ণ-সুদামা গেছেন বনে, বহু কাঠ যোগাড় করেছেন, বাঙিল বাঁধা হয়েছে। যে-সময় কাঠ নিয়ে বেরিয়ে আসছেন সে-সময় ভীষণ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। সে বৃষ্টির আর শেষ নেই, যেন প্লাবন আরম্ভ হয়ে গেছে। সেই কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে দুজনে দাঁড়িয়ে থাকলেন সারারাত বনের মধ্যে। এদিকে গুরু সান্দীপনি বাড়ীতে ছিলেন না, তিনি ফিরে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘কৃষ্ণ-সুদামা কোথায়?’ তখন তিনি বললেন,—তাদেরকে কাঠ আনতে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা এখনও ত’ ফিরল না, রাত অনেক হয়ে গেল! লণ্ঠন জ্বলে নিয়ে গুরু সান্দীপনি বনের চারিদিকে ঘুরছেন শিষ্য দুটোর খোঁজে। হে কৃষ্ণ! হে সুদামা! তোমরা কোথায় আছ। রাত শেষ হয়ে গেছে। তখন তাঁরা বন থেকে বেরিয়ে এসে গুরুদেবের কাছে কাঠের বোঝা নামিয়ে দণ্ডবৎ-প্রণাম করলেন। আমরা আপনার আশীর্ব্বাদে সুস্থ আছি। কি ব্যাপার? আমরা রাতের অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছিলাম না।

যিনি জগতের সমস্ত জীবকে পথ প্রদর্শন করছেন, জ্ঞানালোক দান করছেন, সেই ভগবান্ তিনি আর পথ দেখতে পাননি রাত্রে! আবার ভেসে যাবেন জঙ্গলে জলের তোড়ে—সেই ভয়ে গাছ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছেন কৃষ্ণ-সুদামা। ঐ সেবায় সন্তুষ্ট হয়েছেন গুরু সান্দীপনি। আমার জন্য তোমরা জীবনপণ করেছ, তোমাদের সব জলাঞ্জলি দিলে সারারাত এইভাবে! সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্ব্বাদ করছেন,—

“তুষ্টোহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্যাঃ সন্তু মনোরথাঃ।

ছন্দ্যাংস্যাতয়ামানি ভবন্তিহ পরত্র চ।।”

গুরুর আশীর্ব্বাদে সবই প্রবেশ করছে শিষ্যের হৃদয়ে। বৈদিকজ্ঞান গুরুর আশীর্ব্বাদেই লাভ হয়।

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন একজন, খুব ঘরোয়া কাজ করতেন যিনি, রান্নাবান্না করে শঙ্করাচার্য্যকে খাওয়াতেন। নাম তার গোবিন্দ। তোটক, সুরেশ্বরচার্য্য প্রভৃতি বড় বড় শিষ্য ছিল শঙ্করাচার্য্যের। এদের সামনে সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন শঙ্করাচার্য্য। একদিন গোবিন্দ রান্নাবান্না করে বাসন মাজার এবং আচার্য্যের কাপড়-চোপড় কাচার জন্য গেছেন গোদাবরী নদীতে। এদিকে সুরেশ্বর, তোটক প্রভৃতি শিষ্যগণ শঙ্করাচার্য্যকে বলছেন,—আপনি ছান্দোগ্য উপনিষৎ ব্যাখ্যা আরম্ভ করুন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বার বার বলছেন—গোবিন্দ আসুক, গোবিন্দ আসুক। ও না আসা পর্য্যন্ত আমি পাঠ করব না। গোবিন্দ মূর্খলোক, লেখাপড়া জানে না, ওর জন্য কেন দেরী করবেন? এই কথা যখন বলেছেন তখন তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন আবার এক ধমক দিলেন—গোবিন্দ না এলে আমি পাঠ আরম্ভ করব না। তারপর কাপড়-চোপড় ধুয়ে, বাসনপত্র মেজে গোবিন্দ এসেছেন। তখন আচার্য্য বললেন,—কি, তোমার হল? বললেন, হ্যাঁ। এখানে এস, আজ তোমাকে ছান্দোগ্যশ্রুতির ব্যাখ্যা করতে হবে। গোবিন্দ বললেন,—আমি কি ব্যাখ্যা করব, আমি ত’ বোকা লোক! তুমি বসে পড়, সব হয়ে যাবে। আমাকে দেখে যদি তোমার লজ্জা হয়, তাহলে আমি সরে যাচ্ছি এখান থেকে। উপায় নেই। গুরুর আজ্ঞা—“গুরোরাজ্ঞাহ্যবিচারণীয়া”। বসে গেলেন তিনি, ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন তিনি। তখন বড় বড় শিষ্যমণ্ডলী, পণ্ডিত শ্রোতাগণ সব অবাক। তারা গিয়ে তখন ক্ষমা চাইলেন শঙ্করাচার্য্যের কাছে, গোবিন্দের কাছে। তাহলে যার গুরুকৃপা হবে, তাকে কে ঠেকাবে? কেউ ঠেকাতে পারবে না। সব জিনিষের একটা বিচার আছে। সে বিচার আমাদের নিতে হবে।

কৃষ্ণের নিঃশ্বাসিত বাণী হল বেদ। সেই কৃষ্ণ আবার বেদ পড়তে গেলেন একজনের কাছে! তিনি আবার আশীর্ব্বাদ করছেন এবং সে আশীর্ব্বাদও মেনে নিচ্ছেন! কয়দিন বেদ পড়লেন? ‘দ্বাদশবর্ষমধীতে’—বার বৎসরে বেদপাঠ হয়। বেদালোচনা বার বৎসর গুরুগৃহে থেকে করতে হয়—নিয়ম আছে। কৃষ্ণ-সুদামা কয়দিন গুরুদেবের কাছে থেকে বেদপাঠ করলেন?—মাত্র ৬৪ দিন। এই ৬৪ দিন বেদাধ্যয়ন করে ৬৪ কলা বিদ্যাভ্যাস সমাপ্ত হল। তাঁর পক্ষে সব সম্ভব। ৬৪ দিনে কেন, ৪ দিনেও হতে পারত। তথাপি ৬৪ কলা বলে ৬৪ দিন লাগালেন। তাঁর ত’ সবই জানা। সেই যে সবজান্তা ব্যক্তি, নিখিল বিশ্বাস্তর্য্যামী যে ভগবান্, তাঁর সব জানা আছে। তথাপি লৌকিক, ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য তাঁকে গুরুগৃহে যেতে হচ্ছে।

এখানে বলছেন সাধন-ভজন শূন্য বলে তারা দীন দরিদ্র। তাহলে ধনী কে?—কৃষ্ণধনে ধনী, সাধন-ভজন-ধনে ধনী যিনি তিনি হলেন ঠিক ঠিক ধনী। “তোমার অদর্শন-জন্য মৃতপ্রায় বা জীবিত থেকেও আমরা মৃততুল্য।” ভগবদদর্শন সত্য যাদের মিলছে

না বা মিলবে না, এমন যদি বুঝে বসে আছি আমরা, তাহলে সত্যিই আমরা জীবিত থেকেও মৃত। বেঁচে থেকেও আমরা জীবন্মৃত।

“নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।

ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্মপি মৃতো হি সঃ॥”

আমরা সংসারে যে-সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করছি সে-সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের কি দরকার, এই কর্ম্ম যদি ধর্মের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত না হয়? ‘নেহ যৎকর্ম্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।’—এই কর্ম্ম যদি বৈরাগ্যের উদ্দেশ্যে না হয়? ‘ন তীর্থপাদসেবায়ৈ’—তীর্থপদ যে ভগবান, তাঁর সেবায় যদি এই ধর্মকে নিযুক্ত করা না হয়, তাহলে ‘জীবন্মপি মৃতো হি সঃ’—সেই ব্যক্তিকে মৃত বলা হবে। জীবিত থেকেও সে মৃত বলে গণ্য হবে, তাকে জীবিত বলা হবে না, প্রমাণ নেই তার। ‘জীবঞ্জবঃ’—জীবিত শব্দ। সেইজন্য কথাটা এসেছে জীবিত হলেও মৃততুল্য। পদকর্তা বলছেন,—

মানুষ আকার, হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম।

দিবস-রজনী, আবোল তাবোল, পচাল পাড়িতে পার।

তার মধ্যে, কখনও কেন কি, গোবিন্দ বলিতে নার॥

বাস্তব সত্য, খাঁটি কথা বলেছেন। ভগবানের নামকীর্তন করতে হবে, সাধন-ভজন করতে হবে। সাধন-ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিরও কল্যাণ, ইচ্ছা করলেও কল্যাণ, আরম্ভ করলে ত’ আর ভাল, ঠিক ঠিক করতে পারলে আরও ভাল। সিদ্ধিলাভ করলে সব ভাল। যার পরে আর ভাল নেই। যদি ভগবানের দর্শন আমরা না পাই, যদি ভগবানের সাক্ষাৎ কৃপা আমরা লাভ না করতে পারি, তাহলে জীবিত থেকেও মৃততুল্য। “তাতে আবার দুঃখসমূহের প্রতিকার-বিষয়ে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ।” আমার যে দুঃখ-ক্লেশ এ সংসারে, এর কি করে প্রতিকার হবে তা আমার ঠিক জানা নেই। কারও জানা নেই। “অশেষক্লেশবিল্লেশি-পরেশাবেশ-সাধিনী”—কথাটা আছে। “Annihilation of age-long sufferings.” আমাদের সবসময় এই যে কষ্ট চলছে—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই যে ত্রিতাপজ্বালায় জজ্জরিত হচ্ছি, দগ্ধীভূত হচ্ছি, এর থেকে উদ্ধার পাব কি করে? Process, Procedure জানা নেই। ‘পরেশাবেশ-সাধিনী’—ভগবানের সেবা-পূজা করলে ওই ক্লেশের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া আছে। এই কষ্টের হাত থেকে আমরা কোনভাবে রেহাই পেতে পারি না যদি না আমরা ভগবানের সাধন-ভজন করি।

“অতএব আপনি কৃপা করে আপনার ঈক্ষণ-বৃষ্টিদ্বারা অথবা আপনার কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃত-বর্ষণদ্বারা আমাকে এই দুঃখার্ণব হতে উদ্ধার করে পুনর্জীবিত করুন।”—দামোদরের কাছে এই প্রার্থনা হচ্ছে। আপনার কৃপাদৃষ্টি আমার দরকার, তা না হলে বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই আমার। মৃত আমি, আমাকে কৃপাদৃষ্টিদ্বারা সঞ্জীবিত করুন—এই প্রার্থনা করছেন। পাণ্ডবগীতার মধ্যে একটা শ্লোক আছে, কৃপাচার্য্য বলছেন সেই শ্লোকটা,—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।

তদভূতা-ভূতা-পরিচারক-ভূতা-ভূতা ভূতাস্য ভূতা ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥

হে লোকনাথ ভগবান্, তুমি আমাকে তোমার দাসের দাসের দাসের দাস বলে মেনে নাও। আবার তুমি আমার প্রতি যে বিধান কর না কেন, আমি সব বিধান মেনে নেওয়ার জন্য বসে আছি। একথাটাও আর একজন বললেন,—

“বিরচয় ময়ি দগুং দীনবন্ধো দয়াস্বা
গতিরিহ ন ভবন্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটি-নির্ভরং বা নবান্ত-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তুয়তে চাতকেন।।”

হে দীনবন্ধু ভগবান্ কৃষ্ণ, তুমি আমার প্রতি যে বিধান দাও না কেন, আমি তা মেনে নেওয়ার জন্য বসে আছি। আমি অন্যায় করছি, আমার প্রতি দণ্ডবিধান করুন। ‘দীনবন্ধো দয়াস্বা’—তুমি দীনবন্ধু, আমাকে অহৈতুকী দয়া, করুণা করতে পার। তা যদি কর তাহলে বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। ‘গতিরিহ ন ভবন্তঃ’—তুমি ছাড়া আর আমার অন্য কোন গতি নেই। ‘কাচিদন্যা মমাস্তি’—তুমি ছাড়া আমার আর কেউ আছে বলে বিশ্বাস নেই। তুমিই আমার একমাত্র গতি।

ভগবানের আর একনাম স্বার্থগতি। কোথায় আছে?—“ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।” যারা দুরাশয় তারা ঐ বাইরের অর্থটা নেয়, অন্তদর্শন নেয় না। গৌণ অর্থ নেয়, মুখ্যার্থ নেয় না। ভগবান্ হলেন স্বার্থগতি। যাঁর সাধন-ভজন করলে, সেবাপূজা করলে আমাদের ‘সর্বস্বার্থোহপি লভ্যতে’—সবথেকে শ্রেষ্ঠ স্বার্থ যেটা সেটা লাভ করা যায়। সব থেকে শ্রেষ্ঠ স্বার্থ হচ্ছে—ভগবদ্ভজন, হরিভজন এবং তার পিছনে ভগবদ্ভক্তি, প্রেমভক্তি লাভ। সে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আপনার কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃতবর্ষণদ্বারা আমাকে এই দুঃখার্ণব হতে উদ্ধার করে পুনর্জীবিত করুন।

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্য।

দুর্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য চৈতন্যচন্দ্র! মম দেহি কৃপাবলম্বম্।।

সংসারমোহ পড়েছি আমি। কি করতে হবে আমাকে?—আমাকে রক্ষা কর।

দুষ্কর্্মকোটিনিরতস্য দুরন্তঘোর-দুর্বাসনানিগড়শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্।

ক্লিষ্টান্মতেঃ কুমতিকোটিকদর্থিতস্য গৌড়ং বিনাদ্য মম কো ভবিতোহ বন্ধুঃ ॥

সেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ছাড়া আমার আর কেউ মিত্র নেই, বান্ধব নেই, রক্ষাকর্তা নেই। জগতে যত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আছে কেউ আমাকে দেখে না, দেখছে না, দেখবে না। একজনের পরে নির্ভর করতে হচ্ছে। নিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। কে তিনি?—প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেছেন সেই কথা,—

সা মে ন মাতা স চ মে পিতা ন, স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন।

স মে ন মিত্রং স চ মে গুরুর্ন, যো মে ন রাধাবন-বাসমিচ্ছেৎ।।

‘রাধাবন’ হচ্ছে ‘নবদ্বীপধাম’। নবদ্বীপধামবাসী যিনি বা যারা আমাকে সাহায্য করেন না, তারা আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেউ নয়। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ সাধন-ভজনের এমন নিষ্ঠার কথা বলেছেন।

“ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই সকলপ্রকার সাধনের প্রকৃষ্ট ফল। তাহার দ্বারা সর্বতোভাবে মায়া আমূল অর্থাৎ বীজ-সমেত বিনষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাও বর্ধিত হতে থাকে।

(এক্ষণে প্রাচীন দৃষ্টান্তদ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শনের পরম উপাদেয়ত্ব প্রমাণ করছেন)—
হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী কয়াধু ; তাহার পুত্র শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ প্রভৃতি ভক্তগণ নিজ নিজ হৃদয়ে ভগবদর্শন করলেও তাঁরা পরমোপাদেয়ত্বহেতু সর্বশক্তিমান্ প্রভুকে সর্বদা চক্ষু-ইন্দ্রিয়দ্বারাই দেখতে ইচ্ছা করতেন—ইহা সুনিশ্চিত। তার প্রমাণ—প্রহ্লাদ মহারাজ সমুদ্রতীরে একদিন ভগবানের দর্শন লাভ করবার পর তিনি প্রেম-বিশেষ লাভ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে ‘হরিভক্তিসুখোদয়’ নামক গ্রন্থ বিশেষভাবে আলোচ্য।” বর্ণনায় প্রত্যক্ষ-দর্শন অপেক্ষা মানস-দর্শন শ্রেষ্ঠ। এখানে আবার প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন প্রত্যক্ষ-দর্শনের উপাদেয়ত্ব আছে কিনা। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানকে অন্তরে, হৃদয়ে দর্শন করলেও ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর খুব ছিল। প্রমাণস্বরূপে সেটা ‘হরিভক্তিসুখোদয়’-গ্রন্থে বর্ণিত আছে—সমুদ্রতীরে একদিন ভগবানের দর্শন লাভ করেছিলেন এবং সেজন্য তিনি খুব আকাঙ্ক্ষিতও ছিলেন। যার জন্য ভগবানকে হয়ত’ বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। “শ্রীমদ্ভাগবতের ‘তে বা অমুষ্য’ ইত্যাদি (৩।১৫।৪৪) শ্লোক অবলম্বন করে যদি কেহ বলেন যে, সনকাদি ঋষিগণ ভগবানের সাক্ষাৎকালে উদ্ধাদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর সহস্র বদনকমল দর্শন করেছিলেন এবং পুনরায় নিম্নদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে তাঁর পদ-নখ-শোভা দর্শন করেছিলেন। তৎপর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলের সসীমতাপ্রযুক্ত তাঁরা এককালীন যুগপৎ সর্বোঙ্গের লাভ্যাশোভা গ্রহণে অশক্তবিধায় সকলেই নয়ন মুদ্রিত করে আপাদমস্তক ধ্যান করতে লাগলেন।—ইহার দ্বারা চাক্ষুষ-দর্শনের পর মুনিগণের ধ্যানাবিষ্টের কথা জানা যায়। সুতরাং চাক্ষুষ-দর্শন অপেক্ষা ধ্যানই শ্রেষ্ঠ? ইহার উত্তরে ‘কৃষ্ণ্য’ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বর্তমানে ভগবদ্ভক্তগণের ভগবন্মূর্তি দর্শনের ফল-তারতম্য বিচারপূর্বক চাক্ষুষ-দর্শনের সর্বোত্তমতার বিরোধ-সমাধান করে সঙ্গতি করছেন)—সনকাদি মুনিগণ একবার ভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শনকালে তাঁর সহস্র বদনকমল দর্শন করেছেন, আর একবার পদকমল দর্শন করেছেন। তার পরে চক্ষুমুদ্রিত করে তাঁর সর্বোঙ্গ দর্শন করেছেন। তারপরে আবার অন্তরেন্দ্রিয়দ্বারা দর্শন করছেন। তাহলে এর দ্বারা কি প্রমাণ পাওয়া যায়? সাক্ষাদর্শনের পর আবার ধ্যানস্থ হতে হচ্ছে কেন? তাহলে চাক্ষুষ-দর্শন অপেক্ষা কি ধ্যান শ্রেষ্ঠ? তারই মীমাংসা করছেন শেষে।

“শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন-লাভ করার পর আনন্দভরে কারও যদি চক্ষুদ্বয় নিম্নলিত ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহ চেষ্টারহিত হয়, তাহলেও সেই চক্ষু-মুদ্রণাদিকে ‘ধ্যান’ বলা যাবে না। কিন্তু তাকে কম্প্রাশ্-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের ন্যায় প্রেম-বিকার-বিশেষ বলে জানবে।

এস্থলে আরও বিচার্য্য এই যে, ব্রহ্মা তপস্যাদ্বারা সমাধিযোগে ভগবদর্শন লাভ করে তাঁর স্পর্শ এবং তাঁর সহিত কথোপকথনরূপ প্রচুর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন—ইহা বর্ণিত হয়েছে।” তপস্যাদ্বারা সমাধিযোগে ভগবানকে লাভ করেছিলেন এবং তাঁর

সঙ্গে কথোপকথনও হয়েছে। “এর তাৎপর্য্য এই যে, ধ্যান বা সমাধিযোগে ‘কদাচিৎ’ কারও ভগবৎকৃপা লাভ হয়ে থাকে। ইহা কখনও সাধারণ নিয়ম বা রীতি নহে।” সাধারণ রীতি বা নিয়ম কি করে হবে? সমাধি হল শেষ কথা। কেহ ভাবসমাধি হয়েছে যদি বলা যায়, তাহলে সে ত’ শেষ কথা। প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। সমাধি ত’ শেষ অবস্থা, প্রাথমিক অবস্থা নয়। “উহা কেবল ব্রহ্মা বা তত্ত্বল্য ভগবদ্ভক্তের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।” অসাধারণ ব্যাপার! তিনি তপস্যা করেছেন, সমাধিযোগে ভগবদ্দর্শন করেছেন এবং ভগবান্ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন,—এসব ব্রহ্মার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। সকল ভক্তের পক্ষে যে সম্ভব হবে এমন কোনও কথা নয়। “পরন্তু ধ্যানদ্বারা মানস-দর্শন অপেক্ষা চক্ষুদ্বারা দর্শনে বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সান্নিধ্যে অধিক গাঢ়-সুখ লাভ হয়ে থাকে—ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।”

আবার বলছেন, মানস-দর্শন অপেক্ষা চক্ষুদ্বারা দর্শনে সুখানুভব অধিক হয়। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সবকিছু নির্ভর করে ভক্তের ভাবের উপর। মূল বিষয় হচ্ছে এটাই। আমরা যেভাবে যে চিন্তা-ভাবনা করি না কেন সবটা উপর উপর নয়। আন্তরদর্শনে যেখানে চিত্তের সঙ্গে ভগবানের যোগাযোগ এবং পূর্ণ মিলন, সেখানে অন্য কোনরকম ব্যাখ্যা হবে না, চলবে না। এর সবটাই নির্ভর করবে ভক্তের নিজের অধিকারের উপর, প্রেমসেবার উপর—সেই কথাটা বুঝাচ্ছেন এখানে।

মূল শ্লোকে যে অনুবাদ করেছেন, সে অনুবাদটা এখানে আলোচনা করছি।—“আপনি নিজে কৃপা করিয়া আপনার ঈক্ষণ-বৃষ্টিদ্বারা অথবা আপনার কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃত-বর্ষণদ্বারা আমাকে এই দুঃখার্ণব হতে উদ্ধার করে পুনর্জীবিত করুন। পরবর্তী ‘অন্ধিদৃশ্যঃ এধি’—‘তুমি আমার নয়নগোচর হও’—এই বাক্যদ্বারাও তা প্রকাশ করছে। ‘এই প্রার্থনাক্রমে নিবেদন করা হয়েছে।’—এর তাৎপর্য্য এই যে, প্রার্থিত বস্তুর পরম দুর্লভত্ব-হেতু সহসা প্রথমেই তাহা নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত নহে।” আমি যেটা প্রার্থনা করছি ভগবানের কাছে প্রথমমুখে সেটা বলা যায় না, বুঝানো যায় না। “অন্তরে (মনে) দর্শন হতে সাক্ষাৎ-দর্শনের মাহাত্ম্য শ্রীভগবৎ-পার্ষদগণই যুক্তির সহিত বর্ণন করেন।” অন্তরে যে দর্শন করেন সেই জিনিষটাই সাক্ষাৎ-দর্শনের জন্য ভগবৎ-পার্ষদগণ ভগবানের সামনে প্রশ্ন করেন। ভিতরে যদি সেই ভাব না থাকে তাহলে প্রশ্ন করা যাবে না। প্রশ্নটা আসে কোথা থেকে? অন্তরে নিহিত যে ভাব, সেটা নিহিত হয়ে প্রশ্ন হয়। ভিতরে যদি ভাবই না থাকে তাহলে প্রশ্ন করবে কি করে? ক্ষমতা নেই প্রশ্ন করার। আবার প্রশ্ন করতে গেলে কিছু অভিজ্ঞতার দরকার, কিছু আলোচনার দরকার পূর্বে। বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে যদি আমার কোন ধারণাই না থাকে, তাহলে আমি প্রশ্ন করব কি করে? প্রশ্ন করতে গেলে কিছু জানতে হবে, কিছু বুঝতে হবে, কিছু শুনতে হবে, তবে প্রশ্ন করা যাবে। আর তা যদি না হয় তাহলে সে প্রশ্ন প্রশ্ন নয়। যদি আমি পূর্ব্বাপর চিন্তা না করে কোন প্রশ্ন করি, সেটাকে প্রশ্নের বিষয়বস্তু বলে চিন্তা করা যাবে না। প্রশ্ন কাকে বলব? তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে প্রশ্ন বলব। সেটা কি করে সম্ভব হবে? অন্তরে সে ধারণা থাকা চাই, তবে আমি প্রশ্ন করতে পারব। প্রশ্ন করলেই হবে না। প্রশ্ন দুরকম।

এক হল তত্ত্বজিজ্ঞাসা—তত্ত্ব জানবার জন্য প্রশ্ন, আর একটা হল আমি অপরকে পরীক্ষা করব, সেজন্যও প্রশ্ন। অপরকে পরীক্ষা করা, অপরের বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা পরীক্ষা করা এক ধরনের প্রশ্ন। সে প্রশ্ন হল পার্থিব জগতের জাগতিক ব্যাপার। কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসা যেখানে আছে, সেখানে অহঙ্কার থাকবে না। নিরহঙ্কার, নিরভিমান ভাব। শুধু তত্ত্বদর্শন আমি জানব, শিখব এবং সেটা জেনে শুনে আমি আমার নিজের জীবনে আচরণ করব, তাতে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকব—এই জিজ্ঞাসা হল ঠিক প্রশ্ন।

প্রশ্ন করেছিলেন এই পৃথিবীর একটা ছেলে। এখান থেকেই গিয়েছিলেন পঞ্চমবর্ষীয় বালক। নাম তার নচিকেতা। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। তাঁর পিতা যজ্ঞস্থানে, যজ্ঞভূমিতে অনেক বৃদ্ধ গাভী দান করছিলেন। বাচ্চা ছেলে তা দেখে সহ্য করতে পারেনি। সে বলছে বাবা, এইসব বুড়ো বুড়ো গাভীগুলো তুমি দান করছ, এতে তোমার কি পুণ্য হবে? এতে ওদের কি উপকার হবে? এই গাভীগুলো দুধও দেবে না, বাচ্চাও দেবে না! “কিং তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা যা ন সুতে ন দুগ্ধদা।”—যে গাভী দুধ দেয় না, বাচ্চা দেয় না, সে গাভী কেন তুমি দান করছ? তুমি ত’ বুড়ো বুড়ো গাভীগুলো দান করে গোশালা খালি করে ফেললে। তা আমাকে কাকে দান করছ?—শেষকালে পুত্র প্রশ্ন করে বসেছে। বার বার এইরূপ বলায় তখন পিতা খুব ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন,— যা তোকে যমরাজকে দান করলাম। যমকে দিলে, ঠিক আছে চললাম। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যমালয়ে চললেন। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ—এই Subtle body—পাঞ্চভৌতিক দেহ নিয়ে সেখানে যাওয়া যায় না, কিন্তু তিনি চলে গেলেন। তাঁর—পঞ্চমবর্ষীয় বালকের সাধনার ক্ষমতা ছিল ঐরকম। ভগবান্ পারেন যেতে। কৃষ্ণ-বলরাম কয়েকবার গেলেন যমালয়ে সংযমনীপুরীতে। তাঁর ত’ সর্বত্র অধিকার। মুনি-ঋষিগণ যাচ্ছেন সব জায়গায় ইচ্ছামত। ইন্দ্রলোক, বরুণলোক, বায়ুলোক যখন যেখানে খুশী চলে যাচ্ছেন। নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা ভূ, ভুবঃ, স্ব—যে কোন লোকে যখন খুশী চলে যাচ্ছেন।

অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ সুর-সিদ্ধ-সাধ্য-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-নর-কিন্নর-নাগলোকান্।

মুক্তাশ্চরন্তি মুনিচারণভূতনাথ-বিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি কামম্।।

সব লোকে যাচ্ছেন তাঁরা। কি ব্যাপার? আমাদের এখান থেকে অন্য লোকে যেতে গেলে কতরকম ধরনের সব প্রচেষ্টা। নভশ্চর যারা তারা কতরকম জিনিসপত্র সব নিয়ে যাচ্ছেন। ওঁদের ত’ ওসব নিয়ে যেতে হয়নি। নারদমুনি যখন যেখানে খুশী চলে যাচ্ছেন।

নারদ মুনি, বাজায় বীণা, রাধিকারমণ-নামে।

নাম অমনি, উদিত হয়, ভকত-গীত-সামে।।

যখন যেখানে খুশী বীণাবাদন করতে করতে চলে যাচ্ছেন। ওঁদের কি gas cylinder নিতে হয়েছিল সঙ্গে?—না। অধিকার অনুসারে হয় এগুলো। সেই অধিকার নিয়ে চলেছেন ঋষিগণ। মুনি-ঋষিগণের সর্বত্র যাওয়ার অধিকার। সে অধিকার আমরা সমানভাবে পাই না, পাব না। কেন? সে অধিকার পেতে গেলে পৃথক্ শক্তি অর্জন

করতে হয়। ভগবানকে দর্শন করতে যাওয়া মুশ্কিল আছে। সব ফেল করে বসে আছি আমরা।

নচিকেতা যমালয়ে—সংযমনীপুরীতে গেছেন, কিন্তু সেখানে মালিকের সঙ্গে দেখা হয়নি। মালিকানি ঘরে ছিলেন, তিনি অনেক কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন। যমরাজের সহধর্মিণীর নাম হল শ্যামলা। তিনি অনেক অনুরোধ করেছেন নচিকেতাকে—আপনি আতিথ্য গ্রহণ করুন। তিনি বললেন,—যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আমি অন্ন-জল গ্রহণ করব না। দরজার গোড়ায় বসে থাকলেন তিনদিন। যমরাজ কে? তাঁকে Circle officer বলতে পারেন। এক জায়গায় বসে কাজ করবার তাঁর উপায় নেই, ঘুরতে ফিরতে হয় তাঁকে। যমালয়ের এলাকা বিরাট। বহু দেখাশুনা, বাহিরেও দরকার পড়লে যেতে হয় তাঁকে। তিনদিন অনুপস্থিত তিনি, আর নচিকেতা অভুক্ত অবস্থায় রয়েছেন। তিনদিন পর যখন যমরাজ এসেছেন তখন দেখেন একটা বাচ্চা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। নচিকেতা যমরাজকে প্রণাম করলেন। যমরাজও প্রতিপ্রণাম করলেন, কেন না বৈষ্ণব তিনি। আমি প্রথমে আপনার কাছে ক্ষমা চাই, আমার এখানে এসে আপনি তিনদিন ধরে উপবাসী আছেন, আমাকে ক্ষমা করুন; আমাকে অপরাধের হস্ত থেকে ত্রাণ করুন। তারপর বললেন, আপনি যে এখানে তিনদিন উপবাসী হয়ে বসে আছেন, এরজন্য আমি তিনটে বর দিতে চাই—আমার দোষ ক্ষালনের জন্য। ঠিক আছে দেন। আপনি বর চান। কি চাই? প্রথম বর চাইলেন—আমার বাবা আমার পরে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন,—তোকে যমকে দিলাম। আপনি যে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ যমরাজ, আপনার সাক্ষাৎ পাব এ ভরসা কোথায় আমার? কিন্তু বাবা রাগ করে ঐ সুযোগটা আমাকে করে দিয়েছেন। আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু এখন চিন্তা হচ্ছে—পিতার ক্রোধের কি কারণ হল, আর আমি বা কেন এরকম বলে ফেললাম? হয়ত' একটা কোন উদ্দেশ্য ছিল, ভগবান্ এটা ঘটিয়ে দিয়েছেন। আপনার দর্শনলাভ আমার হয়েছে। আমি আপনার তত্ত্ব, মহিমা জানি না, কে আপনি?

এমনিতে যমরাজের নাম শুনলে আমাদের খুব ভয়, কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা, তিনি ত' ধর্মরাজ। ন্যায় বিচারক তিনি। ভয় কাদের হবে? যারা দোষ-ত্রুটি, অপরাধ করেছে, তাদের ভয় হবে। বৈষ্ণবরাজ তিনি, তাঁকে দেখলে ভয়ের কোন কথা নেই, আশ্বস্ত হতে হবে। শাস্ত্রে যে তালিকা দেওয়া আছে,—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।

প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলিবৈয়াসকিবর্যম্॥

এই যে দ্বাদশজনের তালিকা দিয়েছেন এর মধ্যে 'বর্যম্'-শব্দে যমরাজ নিজেই বলছেন, আমিও এই তালিকার মধ্যে। স্বয়ম্ভু—ব্রহ্মা, শম্ভু—শিব, নারদ, কুমার—সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল—দেবহূতিনন্দন কপিল, মনু—সায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ মহারাজ, ভীষ্মদেব, বলিরাজ, বৈয়াসকি—বাসদেবের ছেলে শুকদেব, বর্যম্—যমরাজ নিজে। কথাগুলো বুঝানো আছে। একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব যমরাজ, তাঁকে দেখে ভয়ের কোন কথা নেই, তাঁর সহধর্মিণীকে দেখেও ভয়ের কোন কারণ নেই। এই ত্রয়োদশী-

তিথি আসছে সামনে—যার নাম যম-ত্রয়োদশী। সেই ত্রয়োদশী-তিথিতে মৃত্যুভয়-নিবারণের জন্য ঐ ধর্মরাজ ও তাঁর গৃহিণীর উদ্দেশ্যে সপ্তপ্রদীপ দিতে হয় বাড়ীর বাইরে। মন্ত্রও আছে,—

কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু ত্রয়োদশ্যাং নিশামুখে।

যমদীপং বহির্দ্যাদপমৃত্যুভিনশ্যতি।।

মৃত্যুনাং পাশদণ্ডাভ্যাং কালঃ শ্যামলয়াসহ।

ত্রয়োদশ্যাং দীপদানং সূর্য্যজঃ প্রীয়তামিতি।।

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর অভ্যর্থনা, সমাদর, প্রণাম, নমস্কার এগুলো। তাহলে যমরাজকে দেখে ভয়ের কিছু নেই।

নচিকেতা যমরাজকে বললেন, প্রথম বরে—আমার পিতার আমার পরে যে রাগ হয়েছে, তা যেন চলে যায়। দ্বিতীয় বর :—আমার জানবার ইচ্ছা ব্রহ্মতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব, আত্মদর্শন। দয়া করে বলুন। খুব সুন্দর করে উপদেশ করলেন যমরাজ। তৃতীয় বর :—আমি জন্ম-মৃত্যু-রহস্য জানতে চাই। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যমরাজ চুপ। I. B. Department এর খবর তুমি রাখতে চাও, এটা পরম গোপনীয় জিনিষ। কাকেও বলা হবে না। তুমি জেনে নেবে? নচিকেতাকে নানারকম প্রলোভন দিয়ে ওটা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সে ছেলে ত' ছাড়বার নয়। সে চিন্তা-ভাবনা করেই প্রশ্ন করেছে। যা নিয়ে দুনিয়া কষ্ট পাচ্ছে। কিছুতেই বলবেন না যমরাজ। আমি তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব দেব, শিবতত্ত্ব দেব, ইন্দ্রতত্ত্ব দেব, সাম্রাজ্যলক্ষ্মী দেব, কিন্তু কোনটাতে কিছু হচ্ছে না। আমি যা চেয়েছি তা বলতে হবে। শেষে এক ধমক দিয়েছেন। তিনি ত' শাসক। ছেলেটা যখন ওরকম শুষ্ক তর্ক করতে যাচ্ছে, তখন তিনি বললেন, এরকম তর্ক করলে কোনপ্রকার প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। “নৈষাতর্কমতিরাপনেয়া”। দেখ এরকম তর্ক করো না, নিষেধ করে দিচ্ছেন।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাধ্বৈ।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ।।

বহ উপদেশ দিয়েছেন আগে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে। এখানে এসে বলছেন, তুমি বৃথা তর্কের দ্বারা তোমার চিন্ত কঠোর করো না, শুষ্ক করো না। প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইছেন না তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। কিন্তু ছেলে ত' কিছুতে ছাড়বার পাত্র নয়। যমরাজ দেখলেন প্রশ্নের উত্তর না জেনে কিছুতেই ছাড়বে না। তখন বললেন, তুমি কাকেও বলবে না ত'? ভীষণ গোপনীয় খবর। এ খবর যদি দুনিয়ার লোক জানতে পারে, তাহলে সব মুস্কিল হয়ে যাবে। কি মুস্কিল হবে?—কেউ আর সংসার করবে না। এখন ভগবানের ইচ্ছা কি তা তিনিই জানেন। হয়ত' সংসারটাকে রক্ষা করতে হবে। ভাল-মন্দ পাশাপাশি রেখে দেওয়া হয়েছে। ভগবানের বিশেষ ইচ্ছা হয়ত' আছে ওতে। তিনি বললেন, তুমি বলবে না ত' কাকেও? যমরাজ তখন বলতে আরম্ভ করলেন। সব জেনে নিয়ে তারপর তিনি আতিথ্য-সংস্কার সব গ্রহণ করলেন এবং ফিরে গেলেন।

তিনি এসে যদি এ জগতে জন্ম-মৃত্যু-রহস্য না জানাতেন, তাহলে আমরা কি

করে জানতাম, বা উপনিষদের মধ্যে থেকে আলোচনা করে কিভাবে বুঝতাম, শিখতাম। ছান্দোগ্যশ্রুতি, বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে জন্ম-মৃত্যু-রহস্যের খুব পরিষ্কার ব্যাখ্যা আছে। আমরা জানতাম কি করে?

গুরু ত' বললেন—এটা বলো না, আর শিষ্য মহাশয় এসে সব বলে দিলেন। তাহলে এতে কি গুরুর বিরুদ্ধাচরণ করা হল? সাধারণভাবে যদি কেউ মনে করেন তাহলে হল কিছুটা, কিন্তু তিনি যদি এই তত্ত্বদর্শন জগৎকে না জানাতেন, তাহলে জগজ্জীব আমরা জানতে পারতাম কিনা—এটা হল বড় কথা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—সাধুগণ সত্যপ্রকাশার্থে জীবনপণ করেন, তার জন্য তাঁদের কোন আক্ষেপ নেই। এটা সাধুগণের স্বভাব। আপনারা দেখবেন শ্রীমদ্ভাগবতের অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যানের মধ্যে আছে কথাটা। সাধুগণ আত্মকল্যাণার্থে, জগৎকল্যাণার্থে নিজের জীবনের সমস্ত ঝুঁকি নিয়েও দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা সব কিছু সহ্য করেও জগৎকল্যাণের চিন্তা করেন। যে কোনরকম ধরণেই হেঁস্বীকারে তাঁরা পক্ষপাতী এবং তাঁরা সেরকম ত্যাগ স্বীকার করেনও। যেটা সাধারণ সবাই পারেন না। আমরা সবসময় স্বার্থপর মনোভাব নিয়ে চলি, নিজের ভালটুকু বুঝি, অন্যেরটা বুঝি না। কিন্তু সাধুসন্ত যাঁরা তাঁদের তা নয়। তাঁরা অপরের দুঃখ-কষ্ট দেখে এতই অভিভূত হন যে, সেজন্য তাঁদের যা কিছু ভাল সবটাই প্রয়োগ করেন। “পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।”

সুতরাং প্রশ্ন করলেই যে তর্ক হয়ে যাবে তা নয়। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্য যদি প্রশ্ন করি ঠিক ঠিক ভাবে, তাহলে সেটাকে শুদ্ধতর্ক বলা হবে না। শুদ্ধতর্ক তাকেই বলা হবে যেখানে জ্ঞান-গরিমার পরীক্ষা—যে জাতীয় প্রশ্ন কোন গুরুবর্গ বা উপরওয়ালার কাছে করা যায় না, এমন প্রশ্ন। (ক্রমশঃ)

পরলোকে শ্রীপাদ ব্রজনাভ ব্রজবাসী প্রভু

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ২৬শে কার্তিক, ১৪০৪ ; ইং ১২ই নভেম্বর, ১৯৯৭ বুধবার গৌর ত্রয়োদশী-তিথিতে দিবা ১০-৩০ মিনিটে স্বজ্ঞানে শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে চিরতরে আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার দিবাকরপুর গ্রামে ইং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীদ্বারিকানাথ সেনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা ছিলেন শ্রীমতী শৈলবালা সেন। তাঁহার পূর্বনাম ছিল শ্রীবিধুভূষণ সেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ মেদিনীপুরে প্রচারকালে হাঁসচড়া হইয়া দিবাকরপুর নিবাসী জমিদার শ্রীবিধুভূষণ সেন মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার গৃহে শুভাগমন করেন। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইং ১৯৭২ সালে শ্রীগৌর-পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণপূর্বক “শ্রীব্রজনাভ দাসাধিকারী” নামে পরিচিত হন এবং একনিষ্ঠভাবে শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেবকে লইয়া তিনি তিন-চারবার তাঁহার ছোট রান্সসখালির লাটে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী বিশেষভাবে প্রচার করাইয়াছিলেন। তথাকার তাঁহার প্রজাগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপের বাৎসরিক উৎসবাদিতে তাঁহারা চাউল ও অর্থাদি সাহায্য

করিতেন। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার তাঁহার প্রজাবৃন্দ ও দেশবাসী সকলকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিত।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার অবদান অনস্বীকার্য। মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কারাবরণও করিয়াছিলেন। ভারত সরকারের ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর অনুদান তিনি নির্দিষ্টায় পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

“আমি দেশের স্বার্থে

সেবা করিয়াছি, তজ্জন্য সরকারের কোন অনুদান গ্রহণ করিব না।” এছাড়াও বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যে তাঁহার বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তিকালে ইং ১৯৭৬ সালে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে যোগদান করেন এবং সমিতির প্রচারপাটীর সহিত বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-প্রচার ও আনুকূল্যাদি সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। মঠবাসী জীবনে তাঁর নিরভিমानी অমায়িক সরল ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার ন্যায় নিরলস অক্লান্তকর্মী, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের একজন বিশ্রান্ত সেবককে হারাইয়া আমরা নিজদিগকে বড়ই অসহায় ও দুর্ভাগা বলিয়া ভাবিতেছি। তিনি তাঁহার সাধনোচিত ধাম হইতে আমাদিগকে গুরুসেবানিষ্ঠায় অণুপ্রাণিত করুন—ইহাই প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাসৌ জয়তঃ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিষ্টার্ড)

☎ ৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২

জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

৩১শে বৈশাখ, ১৪০৫ (ইং ১৫।৫।৯৮)

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ৯ই আষাঢ়, ১৪০৫ (ইং ২৪।৬।৯৮) বুধবার হইতে ১৯শে আষাঢ়, ১৪০৫ (ইং ৪।৭।৯৮) শনিবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীৰ্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

সেবাপঞ্জী

১। ৯ই আষাঢ় (ইং ২৪।৬।৯৮), বুধবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। ১০ই আষাঢ় (ইং ২৫।৬।৯৮), বৃহস্পতিবার—পূর্বাহ্ন ৭ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীৰ্ত্তনমুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন এবং মঠে প্রত্যাবর্তন।

৩। ১১ই আষাঢ় (ইং ২৬।৬।৯৮), শুক্রবার—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা; অপরাহ্ন ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীৰ্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৪। ১২ই আষাঢ় (ইং ২৭।৬।৯৮), শনিবার হইতে ১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৫। ১৫ই আষাঢ়, ৩০শে জুন, মঙ্গলবার—হেরাপঞ্চমী-দিবसे শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে সঙ্কীৰ্ত্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

৬। ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই, বুধবার হইতে ১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই, শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৭। ১৯শে আষাঢ় (ইং ৪।৭।৯৮), শনিবার—অপরাহ্ন ৩টা হইতে সঙ্কীৰ্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ-মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে উক্ত সমিতির “সভাপতি-আচার্য” অথবা “সাধারণ-সম্পাদক”-এর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দো জয়তঃ

✠	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।	✠
ধর্মঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাসু যঃ।		নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।
✠	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	✠

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম্।

অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।

হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫০শ বর্ষ }

৫ বামন, সঙ্কর্যণ, ৫১২ শ্রীগৌরান্দ
৩১ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৪০৫, ইং ১৫/৬/৯৮

{ ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীরাধারমণ-গুরুবর-স্মরণাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-ঠাকুর-বিরচিতম্]

প্রাতঃ শ্রীতুলসী-নতিঃ স্ব-করতন্তু-পিণ্ডিকা-লেপনং

তৎসান্মুখ্যমথ স্থিতিঃ স্মৃতিরথ স্ব-স্বামিনোঃ পাদয়োঃ।

তৎসেবার্থ-বহ্ন-প্রসূন-চয়নং নিত্যং স্বয়ং যস্য তং

শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥ ১ ॥

যিনি প্রতিদিন শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণাম করেন এবং স্বহস্তে সেই তুলসীদেবীর পিণ্ডিকা (অর্থাৎ বেদি) লেপন করেন, অনন্তর তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়া আপন ইষ্টযুগলকে স্মরণ করেন এবং স্বয়ংই ইষ্টসেবা-নিমিত্ত বহুবিধ পুষ্প চয়ন করেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে আমি ক্ষিতিলুপ্তিত হইয়া হর্ষভরে বন্দনা করিতেছি ॥ ১ ॥

মধ্যাহ্নে তু নিজে-পাদ-কমল-ধ্যানার্চনান্নাপর্ণ-

প্রাদক্ষিণ্য-নতি-স্তুতি-প্রণয়িতা নৃত্য সঙ্গাং সংগতিঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতার্থ-সীধু-মধুরাস্বাদঃ সদা यस্য তং

শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥ ২ ॥

যিনি মধ্যাহ্নে প্রতিদিন অভীষ্ট-যুগলের চরণ-কমল ধ্যান ও অর্চন, অন্ন-নিবেদন, প্রদক্ষিণ, প্রণাম, স্তবপাঠ, প্রণয়-প্রকাশ, নৃত্য, সাধুসঙ্গ ও শ্রীমদ্ভাগবতার্থের মাধুর্য্য আশ্বাদন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে হর্ষভরে ক্ষিতি-লুণ্ঠিত হইয়া বন্দনা করিতেছি ॥ ২ ॥

প্রক্ষাল্যাঙিঘ্র-যুগং নতিস্তুতি-জয়ং কৰ্ত্তুং মনোহৃত্যৎসুকং

সায়ং গোষ্ঠমুপাগতং বনভুবো দ্রষ্টুং নিজ-স্বামিনম্ ।

প্রেমানন্দ-ভরেণ নেত্র-পুটয়োর্ধারা চিরাৎ यस্য তং

শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥ ৩ ॥

সায়ংকালে স্বামী গোচারণ করিয়া বনভূমি হইতে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার পাদযুগল প্রক্ষালন করিয়া প্রণাম, স্তবপাঠ, জয়-ঘোষণা করিবার জন্য যাঁহারা মন অত্যন্ত উৎসুক হয় এবং প্রেমানন্দভরে নেত্রযুগলে অবিরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে ভুলুণ্ঠিত হইয়া বন্দনা করিতেছি ॥ ৩ ॥

রাত্রৌ শ্রীজয়দেব-পদ্য-পঠনং তদঙ্গীত-গানং রসা-

স্বাদো ভক্ত-জনৈঃ কদাচিদভিতঃ সঙ্কীর্ণনে নর্ত্তনম্ ।

রাধাকৃষ্ণ-বিলাস-কেল্যানুভবাদ্ উন্নিদ্রতা यस্য তং

শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥ ৪ ॥

রাত্রিকালে যিনি শ্রীজয়দেব-রচিত কবিতা পাঠ করেন এবং তদ্রচিত গীত গান করেন ও ভক্তসমূহের সহিত রসাস্বাদ করেন, কোন সময়ে সঙ্কীর্ণনে চতুর্দিকে নৃত্য করেন এবং উন্নিদ্র হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসকেলি অনুভব করেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুণ্ঠিত হইয়া হর্ষভরে বন্দনা করিতেছি ॥ ৪ ॥

নিন্দেত্যঙ্করয়োর্দ্বয়ং পরিচয়ং প্রাপ্তং ন যৎকর্ণয়োঃ

সাধূনাং স্তুতিমেব যঃ স্বরসনামাস্বাদয়ত্যম্বহম্ ।

বিশ্বাস্যং জগদেব यस্য ন পুনঃ কুত্রাপি দোষগ্রহঃ

শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥ ৫ ॥

“নিন্দা”—এই অঙ্করযুগই যাঁহার কর্ণদ্বয়সহ পরিচয় করে নাই, যিনি প্রতিদিন আপন জিহ্বাকে সাধুসকলের স্তুতি আশ্বাদন করাইয়া থাকেন, যিনি সমগ্র জগৎকেই বিশ্বাস করেন, কোন স্থলেই দোষ গ্রহণ করেন না, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে ক্ষিতি-লুণ্ঠিত হইয়া আনন্দের সহিত বন্দনা করিতেছি ॥ ৫ ॥

যঃ কোহপ্যস্ত পদাজয়োর্নিপতিতো যঃ স্বীকরোত্যেব তং

শীঘ্রং স্বীয়-কৃপা-বলেন কুরুতে ভক্তৌ তু মত্বাস্পদম্ ।

পিত্যং ভক্তিরহস্য-শিক্ষণ-বিধিৰ্যস্য স্বভূত্যেষু তং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ ॥ ৬ ॥

যে কেহ পাদপদ্মে নিপতিত হইলেই যিনি তাহাকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, সুপাত্র জ্ঞানে শীঘ্রই তাঁহাকে ভক্তিমাৰ্গে প্রবর্তিত করেন, নিত্যই নিজ সেবক সকলকে ভক্তিরহস্য, বিধিক্রমে শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুপ্তিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বন্দনা করিতেছি ॥ ৬ ॥

সৰ্ব্বাঙ্গৈর্নত-ভূত্য-মুর্দ্ধিকৃপয়া यस্য স্বপাদার্পণং
স্মিতা চারু কৃপাবলোক-সুধয়া তন্মানসোদাসনম্ ।
তৎপ্রেমোদয়-হেতবে স্বপদয়োঃ সেবোপদেশঃ স্বয়ং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ ॥ ৭ ॥

কোন ভূত্য সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে যিনি কৃপা করিয়া আপন চরণ তাঁহার মস্তকে স্থাপন করেন এবং মনোহর ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কৃপাদৃষ্টিরূপ সুধা সঞ্চার করিয়া তাঁহার মানসকে বিষয়-বিরক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রেম সঞ্চারার্থ স্বয়ংই স্বপদের সেবা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুপ্তিত হইয়া হর্ষভরে প্রণাম করিতেছি ॥ ৭ ॥

রাধে ! কৃষ্ণ ! ইতি প্লুত-স্বর-যুতং নামামৃতং নাথয়ো-
জিহ্বাগ্রে নটয়নিরন্তরমহো ! নো বেত্তি বস্তু কচিৎ ।
যৎকিঞ্চিদ্ ব্যবহার-সাধকমপি প্রেমৈব মগ্নোহস্তি যঃ
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ ॥ ৮ ॥

যিনি প্লুতস্বরে স্বামি-যুগলের “হে রাধে ! হে কৃষ্ণ !” এই নামামৃত নিরন্তর জিহ্বাগ্রে নটন করাইয়া থাকেন এবং সংসার-নির্বাহোপযোগী কোন বস্তু অবগত হইতে পারেন না, কারণ সর্বদা প্রেমে মগ্ন থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামক গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুপ্তিত হইয়া আনন্দসহকারে বন্দনা করিতেছি ॥ ৮ ॥

ত্বৎপদাম্বুজ-সীধু-সূচকতয়া পদ্যাষ্টকং সৰ্ব্বথা
যাতং যৎপরমাণুতাং প্রভুবর ! প্রোদ্যৎ কৃপা-বারিধে !!
মচ্ছেতোদ্রমরোহবলস্য তদিদং প্রাপ্যাবিলম্বং ভবৎ-
সঙ্গং মঞ্জু-নিকুঞ্জ-ধান্নি যুযতাং তৎস্বামিনোঃ সৌরভম্ ॥ ৯ ॥

হে প্রভুবর ! হে প্রোদেলিত-কৃপাসমুদ্র ! এই পদ্যাষ্টক সর্বপ্রকারে আপনার পাদপদ্ম কমলের মধু সূচনা করিতেছে। আমি প্রার্থনা করি আমার চিত্ত-ভ্রমর সেই কমলকে অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে ভবৎ-সঙ্গগুণ মনোজ্ঞ-নিকুঞ্জ-রঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সৌরভ লাভ করুক ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৫ পৃষ্ঠার পর]

৪৪। ভগবদ্ভক্তের কি অন্যাভিলাষে দিনপাত করিবার সময় আছে?

“নিজ-নিজ ঐহিক-লাভে পরিতুষ্ট থাকিয়া পরমার্থে অবহেলা এবং শুদ্ধ ভক্তিবিশেষের হানিজনক কার্যে দিনপাত করিবার আর অবসর নাই।”

—‘সিদ্ধান্তরত্নম্ বা বেদান্তপীঠক’, সং তোঃ ৯।১২

৪৫। শুদ্ধভক্তের প্রার্থনা কি?

“যাহাতে তোমার পদসেবা-সুখ নাই।

সেই বর প্রভো, আমি কভু নাহি চাই।।”

—শঃ

৪৬। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের তর্ক কি ফলদায়ক নহে?

“নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তর্কিকগণ যে-সমস্ত তর্ক করেন, সে-সকলই বহির্নুখ বিবাদ মাত্র। চিন্তের বল ক্ষয় ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি ব্যতীত তাহাতে আর কোন ফল হয় না।”

—‘প্রজ্ঞান’, সং তোঃ ১০।১০

৪৭। ভগবদ্ভক্ত-বিষয়ক আলোচনায় তর্কস্পৃহা থাকা উচিত কি?

“ভক্তিসাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবদ্ভক্ত বা ভাগবত-চরিত্র আলোচনা করেন, তখন বৃথা তর্ক হইয়া না পড়ে,—এ বিষয়ে সর্বদা সাবধান থাকিবেন।”

—‘প্রজ্ঞান’, সং তোঃ ১০।১০

৪৮। শুদ্ধতর্কে শ্রীচৈতন্যলীলা বুঝা যায় না কেন?

“শ্রীচৈতন্যলীলা হয় গভীর সাগর।

মোচা-খোলা-রূপ তর্ক তথায় ফাঁপর।।

তর্ক করি’ এ সংসার তরিতে যে চায়।

বিফল তাহার চেষ্টা, কিছুই না পায়।।”

—নঃ মাঃ, ২য় অঃ

৪৯। পরহিদ্দানুসন্ধান পরিত্যজ্য কেন?

“পরদোষানুসন্ধান কেবল স্বীয় কুপ্রবৃত্তি-পরিচালনেই হইয়া থাকে; তাহা সর্বতোভাবে ত্যাজ্য।”

—‘প্রজ্ঞান’, সং তোঃ ১০।১০

৫০। পরচর্চা ভক্তিপ্রতিকূল কেন?

“অকারণ পরচর্চা করা—অতীব ভক্তিবিরোধী। অনেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য পরচর্চা করিয়া থাকেন। কোন-কোন লোক স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষপূর্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চা করেন। এই সকল বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হন, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে স্থির হইতে পারে না। পরচর্চা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তিসাধকের কর্তব্য। কিন্তু ভক্তি-সাধনের অনুকূল অনেক কথা আছে, তাহা পরচর্চা হইলেও দোষ হয় না।”

—‘প্রজ্ঞান’, সং তোঃ ১০।১০

৫১। গ্রাম্য সংবাদপত্র-পাঠ ভক্তি-প্রতিকূল কি ?

“সংবাদপত্রে অনেক বৃথা গল্প থাকে। ভক্তিসাধকগণের পক্ষে সংবাদপত্র পাঠ করা বড়ই অনিষ্টকর কার্য। তবে কোন বিশুদ্ধ ভক্তের কথা তাহাতে বর্ণিত থাকিলে তাহাই পাঠ্য হয়।”

—‘প্রজ্ঞান’, সং তোঃ ১০।১০

৫২। বহিস্মুখ লোকের সহিত গল্পকারী বা গ্রাম্য উপন্যাস পাঠক কি রূপানুগ ভক্ত হইতে পারে ?

“গ্রাম্য লোকেরা আহালাদি করিয়া প্রায়ই ধূমপান করিতে করিতে অন্য বহিস্মুখ লোকের সহিত বৃথা গল্পে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের পক্ষে রূপানুগ হওয়া বড়ই কঠিন। উপন্যাস পাঠ করাও তদ্রূপ। তবে যদি শ্রীমদ্ভাগবতের পুরঞ্জনোপাখ্যানের ন্যায় উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে ভক্তির বাধা হয় না, বরং তাহাতে লাভ আছে।”

—‘প্রজ্ঞান’, সং তোঃ ১০।১০

৫৩। গৃহত্যাগী ও গৃহস্থ-ভক্ত কি গ্রাম্য-কথা শ্রবণ-কীর্তন করিতে পারেন ?

“গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে গ্রাম্যকথা সর্বতোভাবে পরিহার্য; কিন্তু গৃহী-বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্ত্যনুকূলরূপে কিয়ৎপরিমাণে স্বীকার্য।”

—‘প্রজ্ঞান’, সং তোঃ ১০।১০

৫৪। মূল-বিধি কি ? উন্নতিকালে পূর্ববিধি-নিষ্ঠা-ত্যাগপূর্বক পরবিধি অবলম্বন না করিলে কি দোষ উপস্থিত হয় ?

“কৃষ্ণ-বিস্মৃতি কখনও কর্তব্য নয়—এই মূল নিষেধ হইতেই সমস্ত নিষেধ নিয়ম হইয়াছে। এই মূলবিধিকে স্মরণ করিয়া সাধক উন্নতিকালে পূর্ববিধির নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পর পর বিধি অবলম্বন করিবেন। তাহা না করিলে তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া উদ্ধগতি-লাভে অশক্ত হইবেন।”

—‘নিয়মাগ্রহ’, সং তোঃ ১০।১০

৫৫। পত্নী ভক্তিসাধনের প্রতিকূল হইলে তৎসঙ্গ কর্তব্য কি ?

“পত্নী যদি ভক্তিসাধনের বিরুদ্ধ হন, তবে বহু যত্নের সহিত তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত,—বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজের চরিত্র এস্থলে বিচারণীয়।”

—‘জনসঙ্গ’, সং তোঃ ১০।১১

৫৬। গৃহস্থের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক অর্থ সংগ্রহ ভক্তি-প্রতিকূল কি ?

“গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জনে অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাহার ভক্তি-সাধনে ও কৃষ্ণকৃপা-লাভে ব্যাঘাত হয়।”

—‘অত্যাহার’, সং তোঃ ১০।১৯

৫৭। গৃহস্থের শোকাদিতে অভিভূত হওয়া কি ভক্তিপ্রতিকূল ?

“গৃহীদিগের স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে বড়ই শোক হয়, কিন্তু ভক্তিসাধকের সেই সেই অবস্থা ঘটনাক্রমে উপস্থিত হওয়াতে শোক অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়। অল্পকালের মধ্যে শোক পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত হওয়াই তাঁহাদের কর্তব্য।”

—‘তত্ত্বৎকর্মপ্রবর্তন’, সং তোঃ ১১।৬

৫৮। সাধকের পক্ষে শোক-ক্রোধাদি পরিত্যজ্য কেন?

“শোক-ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত বেগকেই বৈষ্ণব-সাধক পরিত্যাগ করিবেন। নতুবা নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে।”

—‘তত্ত্বকর্ম্মপ্রবর্তন’, সঃ তোঃ ১১।৬

৫৯। শোক-মোহাদির দ্বারা কি অনিষ্ট হয়?

“আত্মীয় বিয়োগে শোক-মোহাদি করিলে কৃষ্ণ সেই হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হন না।”

—‘ভক্ত্যানুকূল্যবিচার’ শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৯০, বঙ্গানুবাদ

৬০। সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক হইলে কি অশুভ হইতে পারে?

“সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবের সংখ্যা স্বল্পই হওয়া স্বাভাবিক; অধিক হইলে উৎপাতের মধ্যে পরিগণিত হয়।”

—‘বিষয় ও বৈরাগ্য’, সঃ তোঃ ৪।২

৬১। কোন দ্রব্যভাবে গৃহত্যাগীর শোকাভিভূত হওয়া কর্তব্য কি?

“গৃহত্যাগীর কাঁথা, কমণ্ডলু বা ভিক্ষাদ্রব্য না থাকিলে অথবা কোন পশু বা মনুষ্য-কর্তৃক তাহা হত হইলে তাহাতে শোক করা উচিত নয়।”

—‘তত্ত্বকর্ম্মপ্রবর্তন’, সঃ তোঃ ১১।৬

৬২। গৃহত্যাগীর কোনরূপ স্ত্রীসম্ভাষণ সমর্থন-যোগ্য কি?

“গৃহত্যাগি-পুরুষের কোন প্রকারেই স্ত্রীসংস্পর্শ বা স্ত্রীসম্ভাষণ হইতে পারে না; হইলেই ভক্তিসাধন সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইবে। সেরূপ ভ্রষ্টাচারীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।”

—‘জনসঙ্গ’, সঃ তোঃ ১০।১১

৬৩। বৈরাগীর পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ কি কি?

“স্ত্রী-পুরুষ বিবাহিত হইয়া সন্তানাদি উৎপন্ন করত যে সংসার পত্তন করেন, সেই সংসার সম্বন্ধে যত কথাবার্তা, সকলই গ্রাম্য কথাবার্তা। তাহা বৈরাগী বৈষ্ণবের শ্রোতব্য বা বক্তব্য নয়। ভাল খাওয়া, ভাল পরা—ইহা বৈরাগীর উচিত নয়।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ৬।২৩৬, ২৩৭

৬৪। কি কি প্রয়াস ভক্তি-প্রতিকূল?

“জ্ঞান-প্রয়াস, কর্ম্ম-প্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তি-প্রয়াস, সংসার-প্রয়াস, বহিস্মুখ-জনসঙ্গ-প্রয়াস—এ সমস্তই নামাশ্রিত সাধকের বিরোধী তত্ত্ব। এই সকল প্রয়াসের দ্বারা ভজন নষ্ট হয়।”

—‘প্রয়াস’, সঃ তোঃ ১০।৯

৬৫। যে-কোন ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করা কি ভক্তির অনুকূল?

“সদগুরু-লালসা যত প্রবল হয়, ততই মঙ্গল। লালসা-নিবৃত্তির জন্য যে-কোন ব্যক্তিকে ‘গুরু’ বলিয়া বরণ করা উচিত নয়।”

—‘পঞ্চসংস্কার’, সঃ তোঃ ২।১

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

অর্চনের অধিকার কনিষ্ঠগত। সেখানে কেবল ভগবদর্চ্যামূর্তি শ্রদ্ধায় সেবার কথা দেখা যায়। তদবস্থায় কে ভগবানকে সর্বতোভাবে সেবা করিতেছেন বা কি পরিমাণে সেবা করিতেছেন, সেই বিষয়ের বিচার হয় না।

“অর্চয়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে ।

ন তদ্ভুক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥”

প্রাকৃতবস্তুর অবলম্বনে শ্রীসূক্তমন্ত্রের দ্বারা তিনি অর্চনে নিযুক্ত। অঃ ভক্তের সহিত ভক্তের ভেদের আলোচনা ও তিনি অনেক সময় করেন না। কে ভক্ত ইহা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত। সুতরাং কেবল অর্চ্যবতারের পূজা করেন। শ্রদ্ধায় পূজা অর্থে ৩২ প্রকার সেবাপরাধ বর্জন করিয়া অর্চনা। অর্চ্যবস্ত এই অধিকারে প্রাকৃত পদার্থবিশেষ জ্ঞান হইলে নারকীয় বিচার হইয়া যায়,—

“অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীশ্বরুশু নরমতিবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-

বিষ্ণেবর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহম্বুদ্বিঃ ।

শ্রীবিষ্ণের্ণান্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-

বিষ্ণৌ সর্বৈশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥”

আবার—“অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চেয়েতু যঃ ।

নাসৌ ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দান্তিকঃ স্মৃতঃ ॥”

এই অধিকারে প্রায়ই ভক্তের অবজ্ঞা ও তাহাদের তারতম্য-বিচারের অনাদরে আংশিক সেবাই হইয়া যায়। মহাপ্রসাদ পূজ্যব্যক্তিদিগকে দানের ব্যবস্থা, অন্যের প্রতি নহে। এই অবস্থায় কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি ও উত্তম শ্রদ্ধার ব্যবস্থা আছে, তাহাতেই ক্রমে উন্নতাদিকার।

“ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ ।

প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি সঃ মধ্যমঃ ॥”

মধ্যম ভাগবতের এই তিন প্রকার ব্যবস্থা দেখা যায়। ঈশ্বরবস্তুর প্রেম, তদধীন উত্তম, মধ্যম ও অধম ভাগবতগণে মিত্রতা, বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেশী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন মধ্যমাধিকারের লক্ষণ। ইচ্ছাসত্ত্বে অবিরোধে সেবায় উৎসুক ব্যক্তি কৃপার ভাজন হয়। ভোগ বা ত্যাগে নিযুক্ত না হইয়া ‘জীবে দয়া’ প্রদর্শন করিতে হইবে। জীব-অর্থে চেতনকে বুঝায়।

চেতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥

হরিভজনকারীর কেবল নিজে আচরণ স্বার্থপরতা। সুতরাং কেবল আচরণে আবদ্ধ না থাকিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগকেও হরিভজনে অধিকার দিতে হইবে। প্রচারের অভাবে কনিষ্ঠাধিকার।

আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।

তুমি সর্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য ॥

অন্যবিধ দয়া মন্দোদয়া দয়া ; তাহার ফল বিপরীত অর্থাৎ হরিবিমুখতা। অপরকে হরিভজন-চেষ্টায় সুযোগ না দিলে কেবল স্বার্থপরতা হইয়া যায়, তাহাতে হরিভজন হয় না।

“শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।

নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।।”

শ্রবণ করিয়া প্রচার না করিলে স্মরণ হয় না। ভগবৎকথা সর্বক্ষণ স্মরণপথে থাকা আবশ্যিক। যে-কথা অত্যন্ত দুর্লভ, সেই কথা শ্রবণের জন্য উৎকর্ষিত হওয়া আবশ্যিক। মানুষ সর্বত্রই বিষয়ী, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহাদের নিকট হইতে ভগবানের কথা শুনতে হবে। হরিকথার দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণেই পরার্থিতা। শ্রীদাস গোস্বামী বলিয়াছেন,—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমক্ষম্।

কৃপাস্বধির্ষঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।।

সেই সনাতন গোস্বামী প্রভুর আশ্রয় করি, যিনি আমি অত্যন্ত অনভীপ্সু হইলেও আমার মুখব্যাদান করিয়া বলপূর্ব্বক ভক্তিরস ঢালিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণের বিষয়ে বৈরাগ্য প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণবিষয়ে বৈরাগ্য হইলে হরিবিমুখতার অমঙ্গল আনয়ন করা হইবে। কৃষ্ণবিমুখ হইলে কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ আমাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করিবে। আমরা মৎসর ভাবাপন্ন হইব। কামাদি রিপুষ্টকের সমষ্টিই মাৎসর্য্য বা মৎসরতা।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-

স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।

উৎসৃজ্যেতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-

স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুক্ত্বাত্মদাস্যে।।

বিলাসের সাহচর্য্য কোনপ্রকারে যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহাতে ভক্তি নষ্ট হয়। আধিক্যের দরকার নাই, ন্যূনতারও প্রয়োজন নাই। যুক্তবৈরাগ্য আবশ্যিক।

“আধিক্যে ন্যূনতয়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।

যুক্তহারবিহারশ্চ যুক্তচেষ্টস্য কস্মসু।

যুক্তনিদ্রাবোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।।”

“ন নির্বিল্লো নাতিসন্তো ভক্তিয়োগোহস্য সিদ্ধিদঃ।”

ভক্তিটী রস—সরস। শুষ্ক নয়। তাহা তীব্র বিরাগ নহে। তীব্র বিরাগ ত্যাগ করিতে গিয়া ভোগপরায়ণ হইতে হইবে না।

কেহ কেহ বলেন, রাধাকুণ্ডে আসার কি আবশ্যিক? আমার বাড়ী থেকেও হরিভজন হয়। দুইটি জিনিষ একইপ্রকার মনে করা ভুল। ভক্তির অনুকূলবিচারে সাধুসঙ্গ এবং ভগবানের রাজ্যের আকাশ-বাতাস সকলই ভক্তির পরিপোষক। ‘পবিত্রমপবিত্রং বা।’ সবই যদি সমান বিচার হয়, তাহা হইলে শিক্ষালাভ হয় না। যদি বৈশিষ্ট্য-দর্শন না হয় তবে কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইবে।

‘জীবে দয়া’ বলিয়া যে কথা আছে—তাহার অর্থ সকলকে হরিভক্তনের কথা বলিয়া

দেওয়া। হরিভজনেই মঙ্গল হইবে, অন্যথায় দুর্গতি— এই কথা তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া। সংসারে আসক্ত ব্যক্তি হরিভজনের কথা শুনিতে নারাজ, তথাপি বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে এই সকল কথা শুনাইতেই হইবে। গৌড়ীয় মঠের ক্রিয়াকলাপ সাধারণ লোক বুঝিয়া উঠে না। তাঁহাদের গাড়ী-ঘোড়ায় চড়া এবং ইতরলোকের গাড়ী-ঘোড়ায় চড়া সমজাতীয় নহে। একটি ভক্তির অনুকূল হরিসেবার উদ্দেশ্যে কৃত, অপরটি ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। রামানন্দের ক্রিয়াকলাপ ও অভক্তের ক্রিয়াকলাপ সমজাতীয় মনে করিলে অমঙ্গল হইবে। গৌড়ীয় মঠ বাসুদেবের ভজন করেন। সেইজন্য অভক্তকে ভক্ত করিবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট। যজ্ঞ, যাজ্ঞ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান-প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। এই সকল যদি বিষ্ণুসেবা-তাৎপর্য্যপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে তাহার মূল্য অন্ধ কপর্দকমাত্র। কিন্তু গৌড়ীয় মঠ বৈষ্ণবসেবার জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের কার্য্য করেন। মর্কটবৈরাগ্য কোন কাজের নয়। যেমন কুণ্ডতীরে আসিতে হইলে হাঁটিয়াও আসা যায়, আবার গাড়ীতেও আসা যায়। কুণ্ডতীরে আসাই যখন প্রয়োজন, যতশীঘ্র পৌছান যায়, তাহাতেই লাভ। কুণ্ডতীরে আসিলেই আমার হরিভজন হইবে, যদি এই উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে যতশীঘ্র তথায় আসিয়া পৌছাইতে পারি তাহাতেই আমার লাভ। কিন্তু এই বিচার ছাড়িয়া বৈরাগ্যই আমার প্রয়োজন, আমি গাড়ীতে উঠিব না, কৃচ্ছ্রসাধন করিব, হাঁটাপথে চলিতে থাকিব—এইরূপ বুদ্ধি হইলে আমার কুণ্ডতীরে আসা হইবে না। আসিতে পারিলেও হরিভজন হইবে না। হরিভজনই প্রয়োজন, কৃচ্ছ্র তা নহে। কৃচ্ছ্রতায় অত্যাশক্তি হইলে কর্ম্মগ্রাহিতা ভক্তির প্রতিকূল হইবে।

আমদের গুরুশিষ্যের বিচার অনেক সময় উন্টাপান্টা হইয়া যায়। গুরু শিষ্যকে সেবক মনে করেন এবং শিষ্যও সেবাদ্বারা গুরুর নিকট কিছু আদায় করিয়া লয়েন। শিষ্যের বিচার যদি কেবল সেবাপর না হয়, তাহা হইলে বণিগ্ভাব আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিবে, ভক্তিলাভ তাহার পক্ষে কোনদিনই সম্ভবপর হইবে না। গুরুদেবও শিষ্যকে হরির সেবক করিয়া দেন, সুতরাং তাহাকেও গুরুবুদ্ধিতে দর্শন করেন। কিন্তু শিষ্য গুরুকে হরির সহিত অভিন্নজ্ঞানে তাঁহার প্রীতিবিধানে সর্ব্বদা তৎপর থাকেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো হইতেছে যে, শ্রীপত্রিকার আজীবন সদস্য গ্রহণ করা হইতেছে। যাঁহারা আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১০০১ (এক হাজার এক) টাকা এককালীন অথবা এক বৎসরে চারিটি সমান কিস্তিতে দিয়া সদস্য হইতে পারেন। এ ব্যাপারে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগ করুন।

বিনীত নিবেদক—

কার্য্যাধ্যক্ষ,

শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা

সনাতন ধর্ম

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯০ পৃষ্ঠার পর]



মনের অতীত আত্মা।
আত্মার সঙ্গে মনের সম্বন্ধ
যতদিন থাকবে ততদিনই আমরা
বদ্ধজীব। আমাদের জন্ম হতে
বাধ্য, পুনঃ পুনঃ জন্ম হবে
আমরা বলে থাকি। মন, বুদ্ধি,
অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারটি
সূক্ষ্ম দেহ। সূক্ষ্ম দেহ হচ্ছে মন,
মনের চারটি স্টেজ। মন কোন
একটা জিনিস দেখে বুদ্ধির কাছে
দেয়। বুদ্ধি সেটা বিচার করে
অহঙ্কারের কাছে দেয়। অহঙ্কার
সে জিনিসটা চিত্তের কাছে দেয়।

চিত্তে সেটা ইম্প্রেসড হয়ে ছাপ লেগে থাকে। অনেক সময় আপনার স্বপ্ন দেখেন। ২০/২৫
বৎসর সেগুলোর কোন কথা ভাবেন নি। হঠাৎ এমন একটা স্বপ্ন দেখেন, অর্থাৎ দেখেছেন
ভুলে গেছেন। চিত্তে সেটা ছাপ লেগেছিল, কোন কারণে সেটা স্বপ্নে দেখেছেন। এই সাধারণ
কথায়ও বলি ওর চিত্তবৃত্তি খারাপ।

এই যে চিত্ত, চিত্তবৃত্তি—এই শব্দটা সাংখ্যের, সাংখ্যকারের ভাষা। চিত্ত-সংস্রবটা
আত্মা যখন ছেড়ে দেবে, তখন সে মুক্তপুরুষ হয়ে যাবে। আমরা একটা উদাহরণ দিই
স্থূলভাবে—চীনাবাদাম। চীনাবাদামের উপরের খোলটা হল আমাদের শরীর। ভিতরের
লাল পর্দাটা হল চিত্ত। তার ভিতরে সাদা কালা দুটি, প্রত্যেক ফলের ভিতরে স্ত্রী-পুরুষ এই
দুটি থাকে ; এই থেকে সৃষ্টি হয়। সাংখ্যকার এটি স্বীকার করেনি বলে সাংখ্যকে নাস্তিক
বলা হয়েছে। সাংখ্য, পাতঞ্জল এরা নাস্তিক দর্শন। কেন? দুটি বস্তুর সংমিশ্রণে—স্ত্রী-পুরুষের
সংযোগে সৃষ্টিক্রিয়া হয়ে থাকে। সাংখ্য বলে শুধু স্ত্রী—প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করেছে। সাংখ্যের
প্রকৃতিবাদ—প্রকৃতি থেকে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এটি অযৌক্তিক উদাহরণ। এইজন্য
সনাতন ধর্মাবলম্বী বেদব্যাস এটাকে নাস্তিক বলেছেন। প্রত্যেক চীনাবাদামের ভিতরে দ্বিদল
দুটি সাদা বীজ থাকে। আপনি উপরের খোসাটা ফেলে দিন। উপরের যে লাল পর্দাটা আছে সেটা
সমেত মাটিতে পুঁতে দিন। জল দিন, গাছ হবে। আবার তাতে চীনাবাদাম হল, তার খোসা
হল। সেই খোসাটা ফেলে দিয়ে ঐ লাল পর্দাটা সমেত আবার মাটির নীচে পুঁতে দিন।
আবার তাতে গাছ হবে, বাদাম হবে। এটা প্রত্যক্ষ প্রকৃতির নিয়ম দেখা যাচ্ছে। আর ঐ লাল
পর্দাটাকে যদি হিট দিয়ে ভেজে দিয়ে দেন, পর্দাটা উঠল না। টিপ দিয়ে তুলে দিলে উঠে
যাবে। ঐ লাল পর্দাটা থাকা সত্ত্বেও যদি মাটির নীচে পুঁতে দেন তাহলে গাছ হবে না।
কেন? ওটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। বাহ্যিক দেখা যাচ্ছে যে আছে।

আমাদের অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তটা ঐ চীনাবাদামের লাল পর্দার মত। আমরা যদি সাধন-ভজন করে ঐ লাল পর্দাটাকে দূরে ফেলে দিই, চিত্তের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে দিই, তাহলে আমরা মুক্তপুরুষ। মুক্ত হলেই আত্মা—জীবাত্মা বৈকুণ্ঠে ভগবানের কাছে চলে যাবে। যেমন সূর্য্য অস্ত গলে পশ্চিম দেশে চলে গেল। সে তার কিরণকণা নিয়েই চলে গেল। আমরা সেই প্রকার এই বাহ্যিক জগতের সব পরিত্যাগ করে, সেই মুক্তজগৎ যে বৈকুণ্ঠ সেখানে কৃষ্ণের বা ভগবানের কাছে চলে যাব। সেখানে গেলে আর আমাদের জন্ম হবে না। তখন লাল পর্দাটা চলে গেছে। এইটাই হচ্ছে সনাতন ধর্মের নিত্যসাধন। এটা কি করে যায়? কেমন করে যায়? তার পদ্ধতিটা কি? সেইজন্যই আমাদের সাধন-ভজনের দরকার। মহাপ্রভু বলেছেন,—

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

ভগবানের নাম করলে আমরা সেই সিদ্ধিটা লাভ করব। শ্রীমদমহাপ্রভু বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র উদ্ধার করে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, ভগবানের নাম কর, নাম করলেই সিদ্ধি লাভ করতে পারবে। সাধারণতঃ আপনারা বৈষ্ণবদের নাম করতে দেখেন। নাম করে, হরিনাম করে, এর ফিলোজফিটা কি? নামের বিজ্ঞানটা কি? কি করে নাম করব আমরা, এই বিচারটা আমাদের করা দরকার।

যে নামভজন সনাতন রীতি, মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, সে নামভজনটা কি?

“নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচেতন্য-রসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।”

নাম সম্বন্ধে প্রশংসা আছে। নাম চিন্তামণিস্বরূপ, নামের কাছে মনে মনে যা ভাবব নাম আমাদের সেই সমস্ত কামনা-বাসনা পূরণ করবে। আমাদের মনোবৃত্তি সব পরিষ্কার করে দেবে। এইজন্য নামকে মন্ত্র বলা হয়। নামমন্ত্র গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্র-শব্দের অর্থ—“মনোনাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্র।” মানুষের যে ধর্ম চিন্তার ধর্ম। এর থেকে উদ্ধার লাভ করে দেয় যে জিনিষটা, মনন ধর্ম থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় যার দ্বারা তা মন্ত্র। সেটা শব্দব্রহ্ম, সেটা ভগবানের নাম, তাকে মন্ত্র বলা হচ্ছে। তাকে মহামন্ত্র বলা হচ্ছে। পঞ্জিকার মধ্যে দেখবেন সত্যযুগের মহামন্ত্র, ত্রেতাযুগের মহামন্ত্র, দ্বাপর যুগের মহামন্ত্র, কলিযুগের মহামন্ত্র উল্লেখ আছে। প্রত্যেকযুগে এগুলোর উল্লেখ আছে। এগুলো তারকব্রহ্মনাম, জপ করলে, কীর্তন করলে উদ্ধার লাভ—শাস্ত্রে বলেছেন। ‘নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচেতন্য-রসবিগ্রহঃ।’ নাম পূর্ণবস্তু, সেটা কোন অংশ নয়। কোন একটা শব্দের অংশ নয়, কোন বেদের একটা অংশ নয়। নাম পূর্ণ কেন?—‘অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ’—নাম আর নামী অভিন্ন, একই জিনিষ, আইডেন্টিক্যাল্। আইডেন্টিক্যাল্ বলতে গেলে ইন্ফাইনাইট এর আইডেন্টিটির মধ্যে দুটো জিনিষ হলে আইডেন্টিটি হয় না। একটা ট্রাই অ্যাঙ্গেল্ এর একটা সাইড্ আর একটার সঙ্গে সমান আছে এবং অ্যাঙ্গেলগুলোও সমান হলে আইডেন্টিক্যাল্। তার মানে দুটো জিনিষ। আমি যে আইডেন্টিক্যাল্ বলছি পাশ্চাত্যের ইংরেজী ভাষায় এসব জিনিসের

পরিভাষা নেই। সুতরাং ওরা ওসব তৈরী করতে পারেনি। কাজেই আমাদের সনাতন ধর্মের একস্প্রেসশন ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণরূপে হয় না। ওদের সে চিন্তা নেই, ধারণা নেই। প্রসঙ্গ ক্রমে এগুলো বলতে হয়।

এই যে আমরা বলছিলাম আর নামী আইডেন্টিক্যাল, এনসিলড্ এর আইডেন্টিক্যাল মনে করবেন না। বস্তুতঃই এক। ওয়ানস্ উইথ্ নো ডিফারেন্স্, এই জিনিষটা যে ওয়ান্ অ্যাণ্ড দি সেম্ এরূপ বিচার করতে হবে। কৃষ্ণ এই শব্দ উচ্চারিত হলে শব্দব্রহ্ম উচ্চারিত হচ্ছে। স্বয়ং কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে বলেছে নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্য এসব একটা জিনিষ। একটা জিনিষের মধ্যে সমস্ত জিনিষটা অনুসূত হয়ে আছে সেই ‘অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ’। নাম গ্রহণ করলে আমরা মুক্তিলাভ করতে পারব। সেই নামই আমাদের যথাসর্বস্ব। সেই নাম কিরূপ? শাস্ত্র বলেছে নাম হল অদ্বিতীয় বস্তু। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন। কাজেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। ‘ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।’

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। আমরা ত’ নাম জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ করছি, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলছি। শাস্ত্র বলছেন,—ভগবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন। বাহ্য জগতের অতীত বস্তু। তাঁকে কি লাভ করা যাবে? এইজন্য বলছেন—‘সেবোন্মুখে’। আমি ভগবানকে ডেকে নিয়ে আসব, আর তিনি আমার গোলাম, ডাকলেই আসবেন। তিনি কি আমার চাকর নাকি যে ডাকলেই হাজির হবেন? সেবার উন্মুখতায় ক্রমে জিহ্বায় এসে তিনি উদ্ভিত হন।

“কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।”

এই যে মহাজন পদাবলী, আমাদের দেশের কথা। কানের ভিতর দিয়া শব্দব্রহ্মমরমে প্রবেশ করলে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। সেই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ জিহ্বায় নৃত্য করে। কখন? —যখন সেবার উন্মুখতা হয়। আমরা কৃষ্ণসেবা করব, ভগবানের সেবা করব, এছাড়া আর কিছু করব না। আমাদের জীবনের আর কোন ব্রত নেই। এই একমাত্র ব্রত আমরা পালন করব এবং এর দ্বারা আমরা ভগবানকে লাভ করতে পারব। জিহ্বার দ্বারা ত’ তাঁকে পাওয়া যায় না, তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত। কিন্তু আমরা মায়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি, আমাদের সম্পূর্ণ সম্বল হল ইন্দ্রিয়। পাঁচটা ইন্দ্রিয়—চক্ষু, কণ্ঠ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। এছাড়া আমাদের আর কিছুই নেই। অথচ শাস্ত্রে বলেছে ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে না, তাঁর কাছে পৌঁছান যায় না—এটাই যদি বিচার হয়, তাহলে আমাদের উপায় কি?

বেদ আমাদের রাস্তা নির্দেশ করেছেন। বেদ বলেছে যে, শব্দব্রহ্ম গ্রহণ কর। শব্দব্রহ্ম আর শব্দসামান্য এক জিনিষ নয়। শব্দসামান্য কোন্গুলো? এই ইথারে যেগুলো জন্মগ্রহণ করেছে। ‘ভাইব্রেশন্ অফ্ এয়ার্ কে সাউণ্ড্ বলেন বিজ্ঞানীরা। বায়ুবিলোড়ন থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এই টোকা দিলাম, একটা শব্দ হল। বায়ু বিলোড়ন করার শব্দ। বৈয়াকরণিকেরা ব্যাকরণের মধ্যে শব্দের উচ্চারণ স্থান নির্ণয় করেছেন। ওষ্ঠ, দন্ত, তালু, মূর্দ্ধা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়। যেগুলো বৈয়াকরণিক শব্দ বা

বায়ুবিলোড়নে যে শব্দ, সেগুলো শব্দসামান্য। একে শব্দব্রহ্ম বলা হয় না। বৈদিক মন্ত্র, বীজ মন্ত্র, দীক্ষার মন্ত্র শব্দসামান্য নহে। অভিধানিক শব্দ নহে। সেগুলো শব্দব্রহ্ম। তা কিসের দ্বারা গ্রহণ করা হয়? এজন্য আমাদের বৈদিক গুরুর কাছে যাও, গুরু তোমাকে শব্দব্রহ্ম দিয়ে দেবেন। সদগুরুর কাছে যেতে হবে, যার তার কাছে গেলে হবে না। সদগুরু কি করবেন? যেহেতু আমাদের চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক কিছু চায় না, তখন তোমার কানটি আমাকে দাও। আমি যা দেব, তোমায় কানে দেব। অন্য কোন জায়গায় দেব না। কেন?—শাস্ত্র বলছে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। আমি এমন একটি জিনিস দেব, যে জিনিষটা কতকগুলি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতে পারে না। যেমন, আম একটি ফল। সেটাকে সামনে এনে রাখা হল। চক্ষু আমটার উপর পড়েছে। চক্ষু ইন্দ্রিয় আমটাকে দেখছে, হাত তাকে স্পর্শ করছে, নাসিকা ঘ্রাণ নিচ্ছে। জিহ্বায় তাকে খাচ্ছি। তাহলে একটা পদার্থের উপর চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক—এই চারটি ইন্দ্রিয় ইন্ফ্লুয়েন্স করছে।

আমরা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে কি করে পাব? এই পার্থিব বস্তু, জাগতিক বস্তুগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এমন কি, প্রায় প্রত্যেক বস্তুর উপরে ২/৪টি ইন্দ্রিয় তার অধিকার বিস্তার করেছে। কিন্তু শব্দব্রহ্ম কান গ্রহণ করছে। ঐ যে আমটাকে ৪টি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করেছে, কান কিন্তু চুপ করে আছে। তোমরা যেটা ছুঁয়ে গ্রহণ করেছ ও আমি নেব না। কানের একটা ইণ্ডিপেন্ডেন্স আছে, ভগবান্ এটা দিয়েছেন। তোরা ইন্দ্রিয় যা নিবি, আমি তা গ্রহণ করব না—কান বলছে। আর আমি যা গ্রহণ করব, তা তোদের দেব না। আমি গ্রহণ করি কি?—শব্দ। শব্দ চোখ দিয়ে দেখা যায় না। নাসিকায় ঘ্রাণ নেওয়া যায় না। ত্বকের দ্বারা স্পর্শ হয় না। জিহ্বার দ্বারা খাওয়া যায় না। বেদ বলছে—সদগুরুর কাছে যাও, গেলে তিনি শব্দব্রহ্ম কানের মধ্যে দিয়ে দেবেন। “কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।” তোমার প্রাণ আকুল করে দেবে সেই শব্দব্রহ্মের ধ্বনি ভিতরে গেলে।

আমরা জড় শব্দের দ্বারা উদাহরণ দিই—একজনকে গালাগালি দিলে তার চক্ষু রাগে লাল হয়ে যায়। আবার শোকের কথা তার কানের মধ্যে ঢুকলে চোখ দিয়ে দরদর করে জল বেরিয়ে যায়। শব্দের এইপ্রকার ইন্ফ্লুয়েন্স। আমাকে কখনও ক্রোধী করে দেয়, আবার কখনও শোকে আচ্ছন্ন করে দেয়। আমাকে উৎসাহসূচক বাক্য বললে আমি একা পাঁচটা লোকের কার্য্য করব; আর নিন্দনীয় কথা বললে আমি মরমে মরে যাব। এই ধ্বনি বা শব্দ কান গ্রহণ করে। কানের দ্বারা এই ইন্ফ্লুয়েন্সগুলো হয়ে যাচ্ছে আমাদের। এই যে বিচার এজন্য বেদ বলছে সদগুরুর কাছে যাও। তিনি শব্দ ব্রহ্ম দেবেন, শব্দসামান্য দেবেন না।

বই দেখে মন্ত্র নিলেই হয়। তন্ত্র-মন্ত্র বহু জায়গাতেই আছে। মহামন্ত্র পঞ্জিকায় দেখলেই পাওয়া যায়। সেখান থেকে নিলেই হয়। না, তা হয় না। সেজন্য গুরুর কাছে যেতে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতি কি? বেদ আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে, শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করার পূর্বে আমাদেরকে অক্ষর পরিচয় করতে হবে। পাঁচ বছরের শিশুকে অক্ষর পরিচয় করে দিতে হবে। অক্ষর মানে কি? যা কোনদিন ধ্বংস হয় না। অক্ষর ধ্বংসশীল বস্তু নয়। স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ এসব পড়ি। আগেই স্বরবর্ণ শেখাতে হয়। কেন? স্বরবর্ণ হল স্বাধীন।

ব্যঞ্জনবর্ণ তার অধীন। সেজন্য স্বরবর্ণ শেখাতে গিয়ে গুরু আগে ‘অ’ শেখায়। বলে লেখ ‘অ’। গীতা বলছে—“বর্ণানাং অকারোহস্মি।” গীতায় নিশ্চয় পড়েছেন আপনারা। বর্ণসমূহের মধ্যে আমি অ-কার। কাজেই অ-কারটী আগে শিখতে হবে। অ-কার কে?—কৃষ্ণ স্বয়ং, অক্ষর বস্তু। ধ্বংসশীল বস্তু নয়, নিত্য সনাতন বস্তু। ‘অ’—সনাতন বস্তু, স্বয়ং কৃষ্ণ অক্ষর। এটী আগে শিখতে হবে। গুরুমশাইদের কাছে শিখতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে গুরুমশাইদের আজকাল অক্ষর জ্ঞান নেই। অতিরিক্ত কোন বিদ্যা তাদের নেই। সেজন্য তারা পাঁচ বছরের শিশুকে অক্ষর পরিচয় করে দিতে পারে না। ক্ষর পরিচয় করে দিতে পারে।

বৈদিক শিক্ষা ছিল, তা না হলে আমাদের দেশটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যেত। এই বৈদিক পদ্ধতি চলে আসছে। প্রথম থেকে, বাল্যশিক্ষা থেকেই ওই সমস্ত ছিল। ক্রমশঃ সে-সব শিক্ষা উঠে যাচ্ছে। হরিনামামৃত ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যাকরণ। শ্রীল জীব গোস্বামী রচনা করেছেন। অন্যান্য বৈয়াকরণিকগণের যে-সমস্ত ভুল-ত্রুটি, সেগুলো তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক বৈয়াকরণিক আর্ষ প্রয়োগ, নিপাতনে সিদ্ধ প্রভৃতি কতকগুলো শব্দ বলেছেন। তাঁরা ব্যাকরণের একরকম সূত্র রচনা করতে পারেন নি, যার দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ বা আর্ষ প্রয়োগকে বৈয়াকরণিক শব্দের মধ্যে এনে দিতে পারে। তা তাঁরা পারেন নি; কিন্তু হরিনামামৃত ব্যাকরণে জীবগোস্বামী তা করেছেন। তিনি বলেছেন,—হরিনামামৃত ব্যাকরণ পড়। নিপাতনে সিদ্ধ বলে কিছু নেই, আর্ষপ্রয়োগ বলে কিছু নেই। এই ব্যাকরণের দ্বারা শব্দশাস্ত্র সম্পূর্ণ অধিগত করতে পারা যায়। আপনারা সেই বিষয়ে লক্ষ্য করুন; অনুশীলন করুন। আর লোকে যাতে এ বিষয়ে অগ্রসর হতে পারে, ধর্মজগতে—সনাতন জগতে যাতে অগ্রসর হতে পারে, সে বিষয়ে চেষ্টা করুন। নাস্তিকতা, নাস্তিকধর্ম, নাস্তিক উপদেশ পরিত্যাগ করুন।

নাস্তিক ব্রহ্ম কি? তাঁর আকার নেই, রূপ নেই, গুণ নেই, শক্তি নেই, দয়া-দাক্ষিণ্য নেই, ভয় নেই। সব নেই নেই করে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। ভগবানের যদি দয়া না থাকে তাহলে আমার সেখানে গিয়ে কি লাভ হবে? ভগবান্ দয়াময়, দয়াল পুরুষ, পূর্ণ শক্তিমান্, সর্বশক্তিমান্।

যিনি সর্বশক্তিমান্ তাঁকে যদি নিঃশক্তিক বলা হয়, সেটা অন্যায় কথা। নাস্তিক্য দর্শনের এই প্রকার বিচার। অনেকে বিচার করেছেন পরজন্ম আমাদের নেই, এই শেষ আমাদের। আমাদের যদি পরজন্ম না-ই হয়, তবে এত কষ্ট করার দরকার কি? যার যা ইচ্ছা তাই কর, “ইট্, ড্রিঙ্ক্ অ্যাণ্ড্ বি মেরি।” পরজন্ম আর নেই, শূন্য হয়ে যাবে, কিছু থাকবে না—এই যদি ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষা বিচার হয়, তাহলে তাকে কখনও সনাতন ধর্ম বলা যাবে না। পূর্বজন্ম মানে না কেউ, পরজন্ম কেউ কেউ মানে। এর মানে হচ্ছে অনিত্য আধুনিক কতকগুলো মত, যুক্তি-তর্কদ্বারা খাড়া করে দিয়েছে। এগুলো সনাতন ধর্ম নয়। এদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। এরা নাস্তিক, এদের দেখলেই বলব যে, তুমি বাবা দূরে থাক। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করব না।

ভগবান্ রূপবান্। তাঁর রূপ আছে। তাঁর নাম আছে, তাঁর লীলা আছে—বেদান্ত দর্শন পরিষ্কার করে বলেছে। “লোকবত্তু কৈবল্যম্”—ব্রহ্মসূত্রে এটা বলেছে। মহাপ্রভুর যে ধর্ম,

হয় গোস্বামী জগতে যে ধর্ম প্রচার করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে বেদান্ত দর্শনে স্থাপিত হয়েছে এবং গীতা সেই জিনিসটা বলে দিয়েছে। কতকগুলি আসুরিক ধর্ম, আর কতকগুলি দৈবধর্ম। গীতার ষোড়শ অধ্যায় বেশ ভাল করে পড়ে নিয়ে সেগুলো বাদ দিয়ে দেবেন। এই সমস্ত কথা যারা বলে আমরা তাদের অসুর বলে মনে করব। আমরা তাদের কাছে যাব না।

বাঙ্খাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

কীর্তন

৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ। ‘কৃত’ ভাবে ‘অনট্’ প্রত্যয় করিয়া ‘কীর্তন’-শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। আমরা সাধারণতঃ ওষ্ঠের স্পন্দনকেই ‘কীর্তন’ বলিয়া মনে করি। ‘ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রাণ তু কীর্তনম্।’ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির উচ্চৈঃস্বরে কখনকেই সকল শাস্ত্র কীর্তন বলিয়া নিদ্ধারণ করিয়াছেন। “নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্।” (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২/৬৩)। যাবতীয় শুভকর্মের অস্তিম ফল হরিকীর্তন। শুভকর্মসমূহ নশ্বর, হরিসেবা নিত্য। হরিকীর্তন হরিসেবনেরই মুখ্য অঙ্গবিশেষ। জ্ঞান ও দানের অপতিত ফলই হরিকীর্তন। শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তন কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অনুশীলন বা সেবা। কীর্তন করিতে করিতে ভুক্তিবাঙ্খা ও মুক্তিপিপাসারূপ অনর্থ দূরীভূত হয়। শ্রীনামের কৃপায় সকল অনর্থই ক্রমশঃ বিদূরিত হয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি হৃদ্যাত অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই একমাত্র অভিধেয়। যাহা দ্বারা নিজের বা অপরের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহা কীর্তন বা ভক্তি নহে। ভগবানের সুখের জন্য যে কীর্তন, তাহাই প্রকৃত কীর্তন বা শুদ্ধ কীর্তন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—হরিকীর্তনই প্রকৃত শিক্ষা। মানুষের কল্লিত বা রচিত ছড়াকীর্তন শ্রীনামকীর্তন নহে, উহা নামাপরাধ কীর্তন। উহা কৃষ্ণেইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভজন নহে, উহা আত্মেইন্দ্রিয়-তর্পণ অথবা ভজনের নামে ভোগ বা অপরাধ মাত্র। প্রকৃত নাম-কীর্তন ছাড়া অধোক্ষজ রাজ্যে প্রবেশের অন্য কোন উপায় নাই। ভগবানের নামকীর্তন সকলকে নির্দোষ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যদেব আদেশ করিয়াছেন,—“কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।” ‘সদা’-শব্দে কালের কোন ব্যবধান নাই। হরিকীর্তন ছাড়া মানুষের মুহূর্তমাত্রও অন্য কোন কর্ম বা কর্তব্য নাই। এমনকি, পশুপক্ষীর নিকটও হরিকীর্তন হইবে। শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তন সমগ্র জগতের একমাত্র মঙ্গলের উপায়। হরিকীর্তনই বিশ্রাম, তাহাতেই যাবতীয় শ্রম বা ক্লেশ দূরীভূত হয়। কীর্তন ছাড়িয়া মুহূর্তের জন্য অপরচেষ্টা—ভগবদ্ভিমুখতা। মহাভাগবতগণ ও তদনুগ সকলেই সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে হরিকথা কীর্তন করেন, তাঁহাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। কায়মনোবাক্যদ্বারা নিখিল অবস্থায় হরিকীর্তনই জীবিতাবস্থায় মুক্তির লক্ষণ। বদ্ধজীবের কর্মবীরত্বের কাহিনী বা গ্রাম্যকথা শ্রবণ-কীর্তনের যে স্বাভাবিক রুচি বা আগ্রহ আছে, তাহা একমাত্র শ্রীহরির কথা শ্রবণ-কীর্তনের মাধ্যমে বিদূরিত হইতে পারে। হরিকীর্তনের দ্বারা শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহাতে সর্বজীবের মঙ্গল সাধিত হয়। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির

দ্বারা ব্যষ্টি বা সমষ্টি কাহারও বাস্তব উপকার বা মঙ্গল হয় না। শব্দব্দের সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য বেদান্ত বলেন,—“অনাবৃতিঃ শব্দাৎ অনাবৃতিঃ শব্দাৎ।” শ্রীনামকীর্তনের ফলে অনর্থ-নিবৃতি ও পরমার্থ-প্রাপ্তি অনায়াসে হয়। নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ রহিয়াছে,—

সর্ব রোগোপনাশনং সর্বোপদ্রবনাশনম্।

শান্তিদং সর্বারিষ্টানাং হরেনামানুকীৰ্তনম্ ॥

“হরিনাম কীর্তন করিলে সর্বরোগের উপশম, সকলপ্রকার উপদ্রবনাশ এবং সর্বারিষ্টের শান্তি হইয়া থাকে।”

শ্রীহরিনামকীর্তন ও হরিকথা কীর্তনই সকল জীবের নিত্যধর্ম। যাহারা মনে করেন হরিকীর্তনের বিকল্প আছে, তাহারা তর্কপন্থী। হরিকীর্তনের বিকল্প বা Alternate কল্পনা করাই এই পৃথিবীর অকল্যাণজনক চিন্তাস্রোত। যাহারা খোদার উপর খোদাগিরি করিতে গিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ হরিকীর্তনের বিকল্প খুঁজিবার চেষ্টা করেন, তাহাদের কোনকালেই মঙ্গল হয় না। হরিকথা কীর্তন বাদ দিয়া যাহারা নিৰ্জ্জন ভজনের চেষ্টা করেন, তাহাদের পদে পদে নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয়। হরিকথা কীর্তন করিলে নিজের ও অপরের—উভয়ের শ্রবণই হইয়া থাকে। সুতরাং কীর্তনে আত্মমঙ্গল ও শ্রবণকারীর মঙ্গল অর্থাৎ নিজের উপকার ও পরোপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। কীর্তনে ত্রিবিধ হরিসেবা হইয়া থাকে—কীর্তনে হরিসেবা, নিজের শ্রবণে হরিসেবা ও অপরকে শ্রবণের সুযোগদানে হরিসেবা। এতদ্ব্যতীত কীর্তনপ্রভাবে স্মরণও হইয়া থাকে বলিয়া স্মরণের হরিসেবাও ঐ সঙ্গে হয়। অর্চন অপেক্ষা কীর্তনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। অর্চনের দ্বারা কেবলমাত্র নিজের মঙ্গল সাধিত হয়, আর কীর্তনে নিজের ও অপরের মঙ্গল হইয়া থাকে। অর্চন নিজে নিজে করা যায়, অপরে দেখে না, কিন্তু কীর্তন অপরের কর্ণে নিনাদিত হয়। সেইসব কথা শুনিয়া শ্রীগুরুদেব বা ভক্তগণ আমাদের ঋণী সংশোধন করিয়া দেন। তাহাতে কীর্তনকারীর শীঘ্রই মঙ্গল হয়। তৎফলে কীর্তন প্রাণময়, আচারময় ও শুদ্ধ হইয়া থাকে। কীর্তন বাদ দিয়া অন্য কোনপ্রকারে ভক্তি হইতে পারে না। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ভাঃ ৭।৫।২৩ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,— “যদপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কৰ্তব্য্যা, তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব কৰ্তব্য্যা।”

হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলেই সর্বক্ষণ হরিকীর্তনে যোগ্যতা লাভ হয়। নতুবা প্রাকৃত বস্তুতে বা শব্দে শ্রদ্ধা হইলে অনিত্য ভোগ পরিবর্তিত হয়। সেইজন্য কৃষ্ণের কথা পরিত্যাগ করিয়া সর্বক্ষণ হরিকথায় নিরত থাকিতে শাস্ত্র চরম উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রকৃষ্ট ফল লাভ করিতে হইলে ভক্তিবিন্যাসের দশবিধ নামাপরাধ বর্জনের বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে। নিরপরাধে কীর্তন না করিলে সুষ্ঠু ফল ‘শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধন’ পাওয়া যায় না। তৃণাদপি সূনীচ হইয়া হরিকীর্তন করিলে অতি সহজেই ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ জ্ঞানের মূলোৎপাটন হয়। কীর্তনকারী ভক্ত নিজকে শ্রীনামের সেবক বলিয়া জানেন। তিনি জগতের প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণভোগ্য ও প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়াই জ্ঞান করেন। যিনি নামকীর্তন করেন তাঁহার সর্বপ্রকার মঙ্গল হয়। যিনি নামকীর্তন করিবেন তাঁহাকে পূর্বের অবশ্যই শ্রবণ করিতে হইবে। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রবণ করিতে

হইবে, নতুবা অন্য কোন লোকের নিকট শুনিলে কোনকালে মঙ্গল হইবে না। গুরুপাদপদ্মের মুখে বা গুরুনিষ্ঠ শুদ্ধ ভক্তের মুখেই গৌরবিহিত কীর্তন বা কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাকীর্তন শ্রবণ করা একান্ত আবশ্যিক। অনর্থগ্রস্ত জীবের পক্ষে গৌরলীলা কীর্তন বা কৃষ্ণের বাল্যলীলাদির শ্রবণ-কীর্তন মঙ্গলজনক, কিন্তু তাহা না করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুঢ় লীলা অর্থাৎ শৃঙ্গাররস শ্রবণ-কীর্তনের চেষ্টা করিলে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলেরই উদয় হইয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,— “শ্রীরাধাগোবিন্দের গুঢ়লীলা শ্রবণ ও কীর্তন উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্যভজন। এই ভজনলীলা সর্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ।” ভগবদ্ভক্তগণ যেখানে অবস্থান করিয়া নিরন্তর ভগবৎকথা কীর্তন ও আলোচনা করেন, সেই স্থান ধাম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সেইসব স্থান নিত্যধামের চিহ্নিলাসক্ষেত্র। আজকাল জগতে বিপরীত নিয়ম হইয়া গিয়াছে, ভাড়াটিয়া কথক ও পাঠক শ্রবণ না করিয়া অর্থাৎ শিষ্য না হইয়াই গুরুর আসনে বসিয়া কীর্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছে। যে-সকল হতভাগ্য ব্যক্তি একমাত্র ভজন-শব্দবাচ্য শ্রীনামকীর্তনে উদাসীন হইয়া অন্য ভজনের ছলনা করেন এবং গুরু-বৈষ্ণবসেবা ছাড়িয়া নামভজন বা শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠাদি করিবার অভিনয় করেন, তাহারা দাস্তিক বলিয়া তাহাদের কোনদিন মঙ্গল হয় না।

যাহার দ্বারা চিত্তরূপ দর্পণ মার্জিত হয়, যাহার দ্বারা ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয়, যাহাতে জীবনের শ্রেয়ঃরূপ শুভ উৎপলের ভাবচন্দ্রিকা বিতরিত হয়, যাহার দ্বারা আনন্দসমুদ্র বর্দ্ধিত হয়, যাহা প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আশ্বাদ প্রদান করিয়া থাকেন এবং যাহা প্রাণ, মন ও আত্মাকে পরমানন্দরসে অবগাহন করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তনের জয়গান শ্রীচৈতন্যদেব বিশেষভাবে করিয়াছেন। “পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তনম্।” শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্তনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্তন বলিতে সর্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী গান্ধর্বিকা শ্রীমতী রাধার সহিত গিরিধর ব্রজেন্দ্রনন্দনের মহিমা কীর্তনকে বুঝায়। “বহুভিমিলিত্বা খোলকরতলাদি সংযোগেন যৎকীর্তনং তদেব সঙ্কীৰ্তনম্।” অর্থাৎ সকলে মিলিত হইয়া খোলকরতলাদি সহযোগে যে কীর্তন, তাহাই সংকীর্তন। সম্যক কীর্তন অর্থে সংকীর্তন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কীর্তনের নাম সংকীর্তন। শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীৰ্তন—সাধন সম্রাট। সর্বার্থসিদ্ধি লাভের একমাত্র অব্যর্থ সাধন—শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীৰ্তন। অন্য ভক্ত্যঙ্গ সাধন করিতে হইলেও শ্রীনামসঙ্কীৰ্তন-মুখেই তাহা করণীয়। কৃষ্ণনাম নন্দের নন্দন, কৃষ্ণনাম শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণনামসংকীর্তনই আমাদের একমাত্র অভিধেয় ও কর্তব্য—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির মঙ্গললাভ হয়। সাধুসঙ্গে শ্রীনামসঙ্কীৰ্তন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীনামসঙ্কীৰ্তন। মুক্তকুলেরও শ্রীনামসঙ্কীৰ্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। যিনি মন্ত্রোচ্চারণকারী, তিনি নিজকে শ্রীনামের পাদপদ্মে অর্পণ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীৰ্তনই মুখ্য ভজন। শ্রবণ-স্মরণাদি শ্রীনামসঙ্কীৰ্তনেরই অধীন। শ্রীনামের কৃপা না হইলে লীলাস্বৃতি হয় না। কীর্তন ছাড়িয়া পৃথগ্ভাবে স্মরণাদি চেষ্টা জড়প্রতিষ্ঠা মাত্র। সঙ্কীৰ্তন-প্রবর্তক কলিযুগপাবনাবতীরী

মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেব তৃণাদপি শ্লোকে চারিটি বাক্যে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনই যে জীবের একমাত্র কৃত্য, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তনে পরমার্থ জীবনযাপনের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা ও সর্বাভীষ্ট লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্বশক্তি, সর্বশোভা, সর্ব-আকাজ্জ্বল্য পরিপূর্তি, সর্বসাধনের চরম ফল ও সিদ্ধি নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনের আভাসে সর্বপাপ ক্ষয় ও সংসার-বন্ধন শিথিল হয়। নামাভাসে মুক্ত হইয়া জীব শ্রীনামসঙ্কীর্তনের অধিকারী হন। যাঁহারা সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক, নিত্যানন্দধনে ধনী হইতে অভিলাষী, তাঁহারা সতত অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সেবা শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তনমুখেই করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তনই ভাগবতধর্মের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চন—সাধারণমাত্র, কৃষ্ণসঙ্কীর্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহার্চনে তত্তদ্বিষয়ের পরিপূর্ণতা। শ্রীল প্রভুপাদ উপদেশ করিয়াছেন,—“সংকীর্তন ব্যতীত শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলিতনু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা হয় না, কেবল অর্চনের দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয় না, তজ্জন্য মহার্চন শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন বিশেষ আবশ্যক।”

কলিযুগ-ধর্ম হয় নামসংকীর্তন।

চারিযুগে চারিধর্ম জীবের কারণ। (চৈ ভাঃ আঃ ১৪।১৩৭)

শ্রীহরিনামসংকীর্তনই কলিযুগধর্ম। শ্রীভাগবতে উক্ত রহিয়াছে,—

কৃতে যদ্ব্যয়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্বরিকীর্তনাং।।

“সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা, দ্বাপরযুগে অর্চনমার্গে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাদ্বারা যে পুরুষার্থ হয়, কলিতে কেবল হরিকীর্তনদ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে।”

ধ্যায়ন্ কৃতে যপন্ যজ্ঞে ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্।

যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্।।

(পঃ পুঃ উঃ খঃ ৪২ অধ্যায়)

“ধ্যান ও জপের দ্বারা সত্যযুগে, যজ্ঞদ্বারা ত্রেতাযুগে এবং অর্চনদ্বারা দ্বাপরযুগে যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে তাহা হরিকীর্তনদ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে।” শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন,—

কলেদৌষনিধে রাজনস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।। (ভাঃ ১২।৩।৫১)

“হে রাজন্! সর্বদোষাশ্রয় কলিযুগের ইহাই একমাত্র মহাগুণ যে মানবগণ এই যুগে কৃষ্ণনামকীর্তনহেতুই মুক্তসঙ্গ হইয়া পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।”

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্য গুণজ্ঞা সারভাগিনঃ।

যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোহভিলভ্যতে।।

ন হ্যতঃ পরমোলাভো দেহিনাং ভ্রামতামিহ।

যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ।। (ভাঃ ১১।৫।৩৬-৩৭)

“এই কলিকালে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনদ্বারাই সর্বযুগের সর্বপুরুষার্থ লাভ হয়।

এইজন্য গুণগ্রাহী সারভাগী জনগণ এই যুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। সংসারে পার্শ্বমণশীল বদ্ধজীবগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণনামসংকীৰ্তন অপেক্ষা পরম মঙ্গলজনক আর কিছুই নাই, কারণ ইহা হইতে যাবতীয় দুঃখের অবসান ও কৃষ্ণপ্রেমানন্দরূপ পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে।” কলিকালে নামসংকীৰ্তনই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, পরন্তু ইহাই একমাত্র সাধন—একমাত্র সাধন—একমাত্র সাধন। কলিকালে হরিনাম কীর্তন ব্যতীত জীবের আর সাধন-ভজন কিছু নাই—নাই—নাই। এই শ্রীনামসংকীৰ্তন হইতে সৰ্বার্থসিদ্ধি হয়। বালক বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূৰ্খ, পাপী, পুণ্যবান্ প্রভৃতি যেই হউক না কেন, যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তাহাদের জন্য সংকীৰ্তন ব্যতীত অন্য সাধনপ্রণালী আর কিছুই নাই।

নাম বিনা কলিকালে আর নাই ধর্ম।

সর্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমন্ত্র॥

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।

কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীৰ্তন।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥ (চৈঃ চঃ)

কলিকালে সংকীৰ্তনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলেই সমস্ত কার্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়।

সংকীৰ্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।

সেই ত’ সুমেধা, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।৯)

কলিকালে বিক্ষিপ্তমনে সত্যযুগের ধ্যানের কথা পালিত হইতে পারে না। এইজন্যই শ্রীহরিকীর্তন মহাধ্যানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ধ্যানে দোষ প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া ত্রেতাযুগে যজ্ঞ প্রবর্তিত হইয়াছিল, এই কারণে কলিকালে মহাযজ্ঞ সংকীৰ্তনের বিধি। যজ্ঞে দোষ আরোপিত হওয়ায় দ্বাপরে অর্চনবিধি প্রকাশিত হইল। কলিতে মহার্চন বিধি। শ্রীকৃষ্ণনামসংকীৰ্তনই সেই মহার্চন।

বর্তমানে আমরা যে জগতে বাস করি, তথায় হরিকথা কীর্তনের বড়ই অভাব, তজ্জন্য লোকহিতৈষী শ্রীগৌরসুন্দর হরিকীর্তনমুখেই সর্ববিধ ভগবৎসেবা-বিধানের উপদেশ করিয়াছেন। নামসংকীৰ্তনদ্বারা হরিনাম-সেবা ব্যতীত যে-সকল অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা ভগবদ্বৈমুখ্যের পরিণতি মাত্র, উহাতে ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। সংকীৰ্তন-প্রবর্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্তনবিরোধী নিৰ্জ্ঞানতাপ্রিয় ধ্যানিগণকে ‘পাপী’ জানিয়া বর্জন করিয়াছেন। কীর্তনবিরোধী তপস্যা-নিরত ত্যক্তভোগ যতি, মুমুক্শু, জ্ঞানী, ভগবৎসান্নিধ্য-লাভেচ্ছু যোগী প্রভৃতির কোনকালে মঙ্গললাভ হয় না। অন্যাত্মলাষ, কৰ্ম ও জ্ঞানাদির উদ্দেশ্যে যাবতীয় অভিধেয় কখনও ‘কেবলাভক্তি’ শব্দবাচ্য নহে, কীর্তনাখ্যা ভক্তির অবিরোধে যে-সকল সাধনের কথা হইতে পারে, সে-সমস্ত কীর্তনের অনুগামী হওয়া উচিত।

—ত্রিদিগ্গিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বোধায়ন মহারাজ

গৌর দয়াময়

শচীর নন্দন জয় গৌরগোপাল ।
কলিযুগপাবন দীনদয়াল ॥
জীব উদ্ধারিতে আইলা শ্রীনন্দনন্দন ।
শোক-তাপ দূরে যায় লইলে শরণ ॥
নবদ্বীপ পুরন্দর প্রভু বিশ্বম্ভর ।
অবতরিলেন আলো করি' মায়াপুর ॥
যুগধর্ম কহিলেন নামসংকীৰ্ত্তন ।
আচণ্ডালে দেন প্রভু প্রেম মহাধন ॥
এমন দয়াল প্রভু কভু নাহি হয় ।
উচ্চৈঃস্বরে বল সবে গৌর দয়াময় ॥
গৌরনাম লৈলে আর ভবের ভয় নাই ।
গৌরনাম ভজ মন বলহ সদাই ॥
গৌরনাম হইতে হবে সর্বানর্থ নাশ ।
গৌরনাম গায় সদা অধম হরিদাস ॥

নিতাই বন্দনা

নিতাই-চরণ, ভজ ওরে মন,
কিছুই উপায় নাই।
নিতাই নাম লৈলে, দুঃখ যায় চলে,
বলরে মন সদাই॥
ব্রজের বলাই, হলেন নিতাই,
জীবের উদ্ধার তরে।
দ্বারে দ্বারে গিয়া, প্রেম বিলাইল,
আচণ্ডাল গেল তরে॥
পতিত অধম, দীন হীন জন,
নিতাই করুণাবলে।
অনায়াসে সবে, নাম-প্রেম লভে,
হয় নাই কোনকালে॥
নিতাই দয়াময়, হইয়া সদয়,
হরিদাসে কৃপা করি।
অন্তিম সময়ে, উদয় হইয়ে,
দিও শ্রীচরণতরী॥

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৮ পৃষ্ঠার পর]

প্রাণী-মাংস খাওয়ার আগ্রহ ও আমিষ-ভোজনে আগ্রহ আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন,—

কামমাস্রিত্য দুষ্পূরং দন্তমানমদাষিতাঃ।

মোহাদগ্ধীত্বাহসদগ্ৰাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিব্রতাঃ।। (গীতা ১৬।১০)

“সেই অসুর প্রকৃতি ব্যক্তিগণ দুষ্পূরণীয় কামকে আশ্রয় করে দন্ত, মান ও মদযুক্ত হয়ে মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে আগ্রহ অবলম্বনপূর্বক মদ্য-মাংসাদি গ্রহণরূপ কদাচার ব্রতপরায়ণ হয়ে, ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাদি কার্যে প্রবৃত্ত হয়।” সেই অসুর প্রকৃতির ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞও অহঙ্কারমূলক ও বেদ-বিধি-বহির্ভূত। যথা, শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রমাণ,—

আত্মসন্তাষিতাঃ স্ত্রীনা ধনমানমদাষিতাঃ।

যজন্তে নামযজ্ঞেস্তে দন্তেনাবিধিপূর্বকম্।। (গীতা ১৬।১৭)

“স্বয়ং গর্বিত, অনন্ন, ধন ও অভিমানে মদাষিত সেই অসুরগণ দন্তসহকারে ধন-মানের আশায় বেদবিধি-বহির্ভূতভাবে কেবল স্বকল্পিত দেবতার নামমাত্র যজ্ঞদ্বারা অবিধি-পূর্বক অশ্রদ্ধাভরে যজ্ঞ করে থাকে।” অসুর প্রকৃতির ব্যক্তিগণের স্বভাবজনিত ক্রিয়াদ্বারা তাদের অসুরভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় ও পরিণামে দুর্গতি হয়। এ সম্বন্ধে ভগবদুক্তি যথা,—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু।। (গীতা ১৬।১৯)

অর্থাৎ—আমি আমার শ্রীমূর্ত্তিবিদ্বেশী বা সাধু-বিদ্বেশী, নিষ্ঠুর, কেবল পশু-পীড়নাদিমূলক যজ্ঞ কার্যে নিজেদের অমঙ্গল আবাহনকারী অশুভকর্মকারী নরাধম সেই ব্যক্তিগণকে এই সংসারে আসুরী যোনিতেই অর্থাৎ হিংসা-তৃষ্ণাদিযুক্ত ম্লেচ্ছ ব্যাধ-যোনিতে কিংবা তন্ত্ৰৎ কর্মানুরূপ অত্যন্ত ক্রুর স্বভাব ব্যাঘ্র-সর্পাদি যোনিতেও সর্বদা নিক্ষেপ করি।

কর্মদোষে তির্য্যগাদি অধম যোনিতে জন্ম হলে অপরাধ ক্ষালনের সুযোগ ঘটে না। প্রবৃত্তিমার্গে ভোগের বশবর্তী হয়ে অন্যায় হিংসাদি কর্ম করলে দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করতে হবে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবানের বাক্যে আমরা জানতে পারি যে, যারা কামনা-বাসনা পূরণার্থ দেব-দেবী-পূজায় বা যজ্ঞে পশুবলি দিয়ে থাকেন, তারা অসুর শ্রেণীভুক্ত।

পুরাকালে সিদ্ধমহর্ষিগণ কোন কোন যজ্ঞে পশুবধ করে থাকলেও তাঁরা যোগবলে সেই পশুকে পুনর্জীবিত করে নবযৌবন প্রদান করতেন। ফলে সেই মৃত পশু পুনর্জীবন ও নবযৌবন লাভ করায় পশুর হিতসাধনই হত, ইহাতে জীব-হত্যাজনিত পাপ হতে পারে না। প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হতে জানা যায়—চাঁদকাজী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রবৃত্তিমার্গে গো-বধের বিধি আছে জানালে শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে কাজীকে বলেন,—

“প্রভু কহে—বেদে কহে গোবধ নিষেধ।

অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধ।।

জিয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী।
 বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা-বাণী।।
 অতএব জরদাব মারে মুনিগণ।
 বেদমন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন।।
 জরদাব হএণ যুবা হয় আরবার।
 তাতে তার বধ নহে হয় উপকার।।
 কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
 অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে।।

* * *
 তোমরা জিয়াইতে নার—বধমাত্র সার।
 নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার।।

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১৫৯-১৬৩, ১৬৫)

মহাশক্তিসম্পন্ন মহর্ষিগণের কার্য সাধারণের অনুকরণীয় নহে। কোন কোন তামস-রাজস পুরাণে দেবদেবীপূজায় পশুবলি দেওয়া বৈধ হিংসা হওয়ায় তাতে দোষ নেই—এরূপ কথিত হওয়ার কারণ—মানুষের আসুরিক বৃত্তিগুলিকে ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত করে পরিশেষে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন করাই উক্ত শাস্ত্রাদির উদ্দেশ্য। যাতে প্রবৃত্তিমার্গের ব্যক্তিগণ অতি সহজে খুব শীঘ্রই নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করতে পারেন, সেজন্য শাস্ত্র বলেছেন,—“যদ্ভ্যাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়ান্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।” (ভাঃ ১।৫।১৩)। অর্থাৎ ‘মদ্যের ঘাণরূপ ভক্ষণই বিহিত হয়েছে, পান বিহিত হয়নি। যজ্ঞে পশুর আলভনই বিহিত, হিংসা নয়।’ মদ্যপান, মাংস ভক্ষণ প্রভৃতিতে রাজস ও তামস প্রকৃতির ব্যক্তিগণের আসক্তি থাকায় তাহা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত করে পরিশেষে আসক্তি ত্যাগ করানোর জন্য শাস্ত্র এরূপ নিয়মের ব্যবস্থা করেছেন। মনুবাণ্য যথা,—(৫।৫৬)—“প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা”—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে জীবগণের প্রবৃত্তিমার্গ অপেক্ষা নিবৃত্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা ও নিবৃত্তিমার্গই মহাফলজনক বলে প্রতিপাদিত হয়েছে।

দেব-দেবীর পূজারূপ যজ্ঞে পশু-বধে পাপ হবেই এবং সেই পাপের ফল পুরোহিতকে ও অনুষ্ঠানকর্তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। শাস্ত্রানভিজ্ঞ বর্ণাশ্রমিগণ-কর্তৃক পশুবলির পরিণাম সম্পর্কে শাস্ত্র জানিয়েছেন,—

যে ত্বনেবং বিদোহসন্তঃ স্ত্রী সদ্ভিমানিনঃ।

পশূন দ্রুহন্তি বিশক্রাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।। (ভাঃ ১১।৫।১৪)

“ধর্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্বির্ভত, সদ্ভিমানী যে-সকল অসাধু ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হনন করে, সেই সকল পশু পরকালে তাহাদিগকেও ভক্ষণ করে থাকে।” সুরথ রাজা নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্য দুর্গাদেবীর পূজায় লক্ষ ছাগ বলি দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পাপের ফল তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল ; যথা—

ছাগং যো হন্তি তং হন্তি ছাগো ভূত্বা চ খড়্গাভূৎ।

সুরথং পরলোকে হি পশবো জঘুরিত্যত।। (উদ্ধৃষ্টান্নায় সংহিতা)

অর্থাৎ—“যে ছাগকে হনন করে, ছাগও পরজন্মে খড়্গাধারী হয়ে তাকে বধ করে। ‘বলি’ প্রদত্ত সমুদয় পশুই পরলোকে সুরথ রাজাকে হনন করেছিল।”

শাস্ত্র আরও বলেছেন,—“হিংসাজন্যঞ্চ পাপঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ।” (ব্রঃ বৈঃ পুঃ ৬৫।১০)। অর্থাৎ “বলিদানে জীবহত্যাজনিত পাপের ফল পূজককে ভোগ করতে হবে—এতে সন্দেহ নেই।” শাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের হিংসা হতে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,—

বৈধ হিংসা ন কৰ্তব্য্য বৈধ হিংসা তু রাজসী।

ব্রাহ্মণেঃ সা ন কৰ্তব্য্য যতন্তে সাত্ত্বিকা মতাঃ ॥

(শ্রাদ্ধবিবেক টীকা-কৃদ্ গোবিন্দানন্দ-ধৃত বৃহন্নুবচন)

ব্রাহ্মণের বৈধ হিংসা করাও কৰ্তব্য নয়। বৈধ হিংসা রজোগুণীর রাজসিক কার্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা কখনও কৰ্তব্য নয়। যেহেতু তাঁরা সাত্ত্বিক বলে নির্ণীত হন। সাত্ত্বিক গুণ ব্যতীত কেহ ব্রাহ্মণ হতে পারেন না।” উক্ত শ্লোকের মর্মার্থ এই যে, সত্ত্বগুণে পশুহিংসা থাকে না, রজোগুণে বৈধ পশুহিংসা, আর তমোগুণে অবৈধ পশুহিংসা থাকে উক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—তিনগুণই জীবের বন্ধনদশায় থাকে। সত্ত্বাদি গুণ-তারতম্যে প্রাপ্য লোকসমূহে যাতায়াত জীবের বন্ধনদশা মাত্র।

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।

জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ (গীতা ১৪।১৮)

“সত্ত্বগুণস্থ জনগণ স্বর্গাদি উর্দ্ধলোকসমূহে গমন করে থাকে, রজোগুণস্থিত ব্যক্তিগণ নরলোকে স্থান লাভ করে এবং নিকৃষ্ট তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ নরকাদি অধোলোকে গমন করে।” গুণাসক্তি যতদিন থাকে, ততদিন গুণ অতিক্রম করা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পক্ষেও দুঃসাধ্য। চারি বর্ণেরই পশুহিংসা ত্যাগ করা উচিত। পুরাকালে যজ্ঞকরণার্থ পশুদিগকে বলিযোগ্য করা হত, কিন্তু বলি দেওয়া হত না। ‘বলি’ কাকে বলে?—“বলিঃ পূজোপহারঃ”—‘বলি’ অর্থে পূজার উপহার বা নৈবেদ্যাদিকেই বুঝায়। কালিকাপুরাণে উক্ত আছে,—

কুশ্মাণ্ডমিক্ষুদগুঞ্চ মদ্যমাষসব এব চ।

এতে বলি সমাঃ প্রোক্তাস্তৃপ্তৌ ছাগ সমাঃ স্মৃতাঃ ॥

অর্থাৎ “কুশ্মাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, মদ্য ও মধু—এই সকল বলিদান করলে ছাগবলির তুল্য ফল ও দেবতার তৃপ্তি উভয়ই লাভ হয়। তবে “মদ্যমপেয়মদেয়মনির্গাহ্যম্”—এই উশনোক্ত বাক্যদ্বারা মদ্যকে অদেয় বলে নিষেধ করা হয়েছে। উক্ত বচনসমূহের তাৎপর্য জানা যায়, পশুঘাতন ব্যতীতও ইক্ষুদণ্ডাদি দ্বারাই ছাগবলির ফল লাভ ও শাস্ত্র-মর্যাদা রক্ষা হয়।”

দেবদেবীর পূজায় পশুবলি দিয়ে তার মাংস খাওয়ার জন্য শাস্ত্র আমাদের প্ররোচিত করেন নি। অত্যন্ত নিম্নস্তরের জীব যারা মাংস ভক্ষণের জন্য লালসায়ুক্ত, তারা যেন বাজার থেকে মাংস ক্রয় করে যথেষ্টভাবে না খায়, সেজন্য যজ্ঞে পশুবলি দিয়ে সেই মাংস ভক্ষণের জন্য ব্যবস্থা শাস্ত্রে নিরূপিত হয়েছে। হিংসা প্রবৃত্তি পরিত্যাগ না করলে মানুষ উচ্চস্তরে উন্নীত হবে কি করে? পশুবলির দ্বারা দেব-দেবীর পূজা হয় না,—দেবদেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে মানুষের জিহ্বার লালসা চরিতার্থই হয়ে থাকে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম বৈকুণ্ঠধর্ম নয়। বর্ণাশ্রমিগণ মায়িক ভূমিকায় অবস্থান করেন এবং তাঁরা মায়িকগুণে অধিষ্ঠিত। বর্ণাশ্রমিগণের মধ্যে যাঁরা রজঃ, তমঃ গুণে অধিষ্ঠিত, তাঁরাই বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবদেবীর পূজা করে থাকেন। যাঁরা মুমুক্শু নন এবং প্রবৃত্তিমার্গের উপাসক তাঁরাই শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও সন্তানাদির কামনায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করেন। যাদের হৃদয়ে হরিভক্তির অভাব, তাঁরাই অন্য দেবোপাসনা করে থাকেন এবং জাগতিক ভোগসুখের উদ্দেশ্যে দেবতাগণকে নিজেদ্রিয় তর্পণের সাহায্যকারী বস্তু বিশেষ জ্ঞান করেন। ইন্দ্রিয়তর্পণকে যারা ভক্তি বলে প্রচার করেন, তারা প্রাকৃত সহজিয়া। ভোগের ইচ্ছা থাকাকালে শুদ্ধ ভক্তি হয় না। নিজ জীবিকার জন্য অভিলাষ—ইহা রাজস, আর অভিলষিত বিষয় পেয়েও পুনরায় তদপেক্ষা অধিক বিষয় পাবার তৃষ্ণা—ইহা তামস।

রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।

পিতৃভূত প্রজেশাদীন্ শ্রীয়েশ্বর্য্য প্রজেন্সবঃ ॥ (ভাঃ ১।২।২৭)

“যে-সকল ব্যক্তি রজঃ-স্তমঃ প্রকৃতির, তাঁরা আপনাদের সমশীল দেবতাকেই ভজনা করেন। তাঁরা সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও সন্তানাদির কামনায় পিতৃপুরুষ, ভূতপতি ও প্রজাপতিদিগকে আরাধনা করেন।”

উক্ত শ্লোকের বিচারে জানা যায় যে, জীব যখন সাত্ত্বিক হয়, তখন বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন দেবতার ভজন করে না। এক্ষণে বর্ণাশ্রমিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই একমাত্র সত্ত্বগুণসম্পন্ন হওয়ায় বিষ্ণুপূজা ব্যতীত অন্য পূজা ব্রাহ্মণের কর্তব্য নয়। যে-সমস্ত ব্রাহ্মণ বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করেন ও পূজায় পশু বলিদান কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিলেও তাঁরা রজঃ-তমঃ গুণে আবিষ্ট হওয়ায় তাঁদের ব্রাহ্মণ বলা যায় না, পরন্তু সেই ব্রাহ্মণব্রহ্মগণ ‘দেবল’ নামে পরিচিত হওয়ার যোগ্য। যে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ক্রিয়ারহিত হয়ে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় প্রদান করে, সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণব্রহ্ম নামে সংজ্ঞিত। যথা,—

“যো ব্রাহ্মণঃ ক্রিয়ারহিতঃ আত্মানং ব্রাহ্মণং ব্রবীতি, স ব্রাহ্মণব্রহ্মঃ ॥”

(মনু ৭।৮৫)।

ভগবান্ বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবদেবীর পূজা যে ব্রাহ্মণের ক্রিয়া নয়, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত শ্রীমদ্ভগবদগীতায় কথিত হয়েছে,—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বত্র সংপ্লুতৌদকে।

তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ (গীতা ২।৪৬)

“কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে-সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক মহাজলাশয়ে সেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে থাকে। সেইপ্রকার বেদোক্ত বিভিন্ন দেবতার উপাসনাদ্বারা যে-যে ফল সিদ্ধ হয়, ভগবদুপাসনারূপ বেদতাত্পর্য্যবিদ্ ভক্তিয়ুক্ত ব্রাহ্মণের সেই সকল ফলই লাভ হয়ে থাকে।” বেদতাত্পর্য্যবিদ্ ভগবদর্পিত-হৃদয় ব্রাহ্মণ একনিষ্ঠ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা একমাত্র ভগবানেরই উপাসনা করবেন; কারণ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনাদ্বারাই সকল দেবতা সন্তুষ্ট হন—ইহাই উক্ত শ্লোকের তাত্পর্য্য। সমস্ত দেবতার মূল আকর (Fountain Head) বিষ্ণুবস্তু সম্বন্ধে আচমন-মন্ত্রে জানা যায়,—“ওঁ তদ্বিষেগঃ পরমং

পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীৰ চক্ষুরাততম্” (ঋগ্বেদ ১।২২।২০, সামবেদ ১৬।৭২, অথর্ববেদ ৭।২৬।৭, কঠোপনিষৎ ১।৩।৯, বরাহ ৫।৭৭) অর্থাৎ সেই দ্যোতমান রাজ্যে বিষ্ণুর পরম পদকে (বিষ্ণুতত্ত্বকে) তত্ত্বজ্ঞানী শুদ্ধভক্তগণ সর্বদা দর্শন করেন। সূরিগণ অবিদ্বান নন, তাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী, সেজন্য তাঁরা বিষ্ণুকেই পরম তত্ত্বরূপে দর্শন করে থাকেন। অবিদ্বৎ-প্রতীতিবশে বিষ্ণুতত্ত্বকে অন্য দেবতার সহিত সমান জ্ঞান হয়। এবম্বিধ আচমন-মন্ত্র উচ্চারণ করে ও পাঠ করেও যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহিত সমান জ্ঞান করেন, তিনি বেদ ও শ্রুতির উক্ত প্রসিদ্ধ মন্ত্রটীকে অবজ্ঞা করায় তিনি যে নরকগামী হবেন—ইহাতে সন্দেহ নেই।

পঞ্চোপাসকগণ ভগবান্ বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহিত সমান জ্ঞান করে থাকেন বলে সেই পূজায় ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন না ; কেননা ইহাতে বিষ্ণুর অসমোদ্ধ-পদকে ইতর দেবপর্যায়ের গণনা করা হয়। যথা শাস্ত্রবাণী,—

যস্তু নারায়ণং দেব ব্রহ্ম রুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।

সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে সমান জ্ঞান করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

“বিষ্ণৌ সর্বৈশ্বরেশে তদিতর সমধীৰ্যস্য বা নারকী সঃ ।”—অর্থাৎ “সর্বৈশ্বর বিষ্ণুর সহিত তদিতর দেববৃন্দকে যে সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।”

বহু দেবযাজীর প্রদত্ত বা অদীক্ষিত ব্যক্তির প্রদত্ত বস্তু ভগবান্ বিষ্ণু গ্রহণ করেন না। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান্ বলেছেন,—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্লামি প্রযতাত্মনঃ ॥ (গীতা ৯।২৬)

“যিনি ভক্তিয়ুক্ত চিত্তে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রদান করে থাকেন, আমি শুদ্ধচিত্ত সেই ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত সেই সমস্তই গ্রহণ করে থাকি।” অন্য দেব-আরাধনায় আয়াস বা ক্লেশ অধিক, কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণের আরাধনা অনায়াসসাধ্য। “ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি”—অর্থাৎ ভক্তিসহকারে প্রদান করেন এবং “ভক্ত্যুপহৃতম্” অর্থাৎ ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত—দুইবার ‘ভক্তি’ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ তুষ্ট হন এবং ভক্তির দ্বারাই জীবের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, অন্য উপায়ে হয় না—ইহাই সূচিত হয়। ভক্তিসহকারে প্রদত্ত বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন অর্থাৎ কারও অনুরোধে প্রদত্ত নয় বা তাৎকালিক শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত নয় ; অন্যাভিলাষ পোষণ করার স্বভাব পর্যন্ত শূন্য হয়ে, জ্ঞান-কর্মাদি স্বার্থপরতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগপূর্বক কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধমনা ভক্তের দ্বারা অর্পিত বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন—ইহাই তাৎপর্য। “প্রযতাত্মনঃ”—অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত জন। শুদ্ধ চিত্তভক্তের চিহ্ন কি? ভগবানের পাদ-সেবা ত্যাগে অসামর্থ্যই শুদ্ধ চিত্তভক্তের চিহ্ন অর্থাৎ নিষ্কাম ও ভগবদ্ অনুরক্ত ভক্তই শুদ্ধচিত্ত। শ্রীমদ্ভগবতে কথিত হয়েছে,—“ধৌমাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি” (ভাঃ ২।৮।৬) অর্থাৎ অন্তঃকরণ যাঁর পরিশুদ্ধ হয়েছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না। অতএব, কৃষ্ণ-ভক্ত ব্যতীত আর কারও উপহার ভক্তিপূর্বক বা

অত্যন্ত প্রীতির সহিত না হওয়ায় তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন না। দেবপূজকগণ দেবতাগণকে অবলম্বন করতে গিয়ে বিষ্ণুভক্তি হতে চ্যুত হয়ে লোকদেখানো বিষ্ণুপূজা করে থাকেন। অদীক্ষিত ব্যক্তি ভক্তিহীন; আর বহু দেবযাজিগণ ব্রাহ্মণ হলেও নিম্নপট্ট ঐকান্তিক ভক্ত না হওয়ায় তাঁদের প্রদত্ত বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন না। পরতত্ত্ব বিষ্ণুর আরাধনাই ব্রাহ্মণের কৃত্য। কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করলেও ব্রাহ্মণের গুণ যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যায় না। একজন পি. এইচ. ডি. ডিগ্রিধারীর পুত্র পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী না পাওয়া পর্যন্ত তাকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রিধারীরূপে গণ্য করা যায় না। ব্রাহ্মণত্ব একটা উচ্চমানের ডিগ্রীর অনুরূপ উচ্চবর্ণ, তাহা অর্জন না করা পর্যন্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি বা সদগুণাবলীর প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

কোন ব্যক্তি জন্মগত সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণ ব্রাহ্মণ জন্ম পেলেও কৰ্মদোষে পরবর্তী জন্মে যে কোন নীচ যোনি প্রাপ্ত হতে পারে, অথবা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি হয়েও জন্মাতে পারে। যেমন ক্ষত্রিয় রাজা পৌত্রায়ণ, রৈক মুনিকর্তৃক 'শূদ্র' বলে অভিহিত হয়েছিলেন। এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। জীবের জন্ম চ্যুতি বা স্থলন থেকেই ঘটে। বর্ণাশ্রমিগণ নিজেদের মধ্যে কেহ ভরদ্বাজ গোত্র, কেহ কাশ্যপ গোত্র, কেহ শাণ্ডিল্য গোত্র—এরূপ বংশানুক্রমে গোত্র নির্ণয় করে থাকে। যে ব্যক্তি ভরদ্বাজ গোত্রীয়, সে ভরদ্বাজ মুনির বংশধর বলে নিজেকে দাবী করে। এইরূপ প্রতি বর্ণাশ্রমীই গোত্র অনুসারে নিজেকে ঋষির সন্তান বলে পরিচয় প্রদান করে। ঋষিগণ সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন; সেই ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ বা শূদ্র হল কেন? এক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ-বংশীয় সন্তান ব্রাহ্মণেতর বর্ণ তথা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ প্রাপ্ত হয়েছে। জন্মগত বর্ণবিচ্যুতি হওয়ায় চারি বর্ণাশ্রমিগণ চ্যুত গোত্রীয়। জন্মগত গোত্র নশ্বর এবং হয়। বর্ণাশ্রমিগণের মধ্যে ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি গোত্র থাকায় বর্ণাশ্রমিগণ সকলেই যে পূর্ব ব্রাহ্মণ ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কৰ্মদোষে কাহারও মনুষ্যেতর নিকৃষ্ট যোনিতে অর্থাৎ শৃগাল, কুকুর, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতি জন্ম প্রাপ্ত হলেও তখন বর্ণই বা কোথায়, আর আশ্রমই বা কোথায় থাকবে? বদ্ধাবস্থায় যদি আমরা মনুষ্য জন্ম না পেতাম, তাহলে কুলধৰ্ম্ম ও বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম পালনের আবশ্যকতা থাকত না। বর্ণাশ্রমের সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণ ব্রাহ্মণ জন্ম হলেও উহা কৰ্মফলজাত বদ্ধদেহের অভিমান। আমরা বদ্ধজীবগণ স্ব-সুখ-বাসনার জন্যই এই জড়জগতে আসতে বাধ্য হয়েছি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণীতে পাই,—

“যে-সব জীবের ভোগবাঞ্ছা উপজিল।

পুরুষ ভাবেতে তারা জড়ে প্রবেশিল।।”

তাই বদ্ধজীবের মধ্যে স্ব-সুখবাসনা জন্মগত স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এই জড়জগৎ জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের ভোগের স্থান। অনেকে ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ভোগের দিকে ধাবিত হয়, আবার অনেকে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকে অনিত্য জেনে আত্মসুখের জন্য মোক্ষের দিকে ধাবিত হয়। বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্মানুশীলনে ধৰ্ম্ম (পুণ্যকৰ্ম্ম), অর্থ, কাম চরিতার্থরূপ প্রবৃত্তি-লক্ষণ এবং মোক্ষপ্রাপ্তি নিবৃত্তি-লক্ষণাত্মক ধৰ্ম্ম বিদ্যমান। প্রবৃত্ত্যাশ্রয়ক ধৰ্ম্ম ও নিবৃত্ত্যাশ্রয়ক ধৰ্ম্ম—

উভয় ক্ষেত্রেই স্ব-সুখবাসনা চরিতার্থ করার প্রবণতা থাকায় উভয় ধর্মাবলম্বীই স্ব-সুখবাদী, স্বার্থপর ও কপটী। আত্মার নিত্যপ্রিয় শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধান-প্রবৃত্তি ও তৎপ্রসঙ্গ উক্ত বর্ণাশ্রম ধর্মাস্তর্গত প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক ধর্মানুশীলনের মধ্যে নেই।

বর্ণাশ্রম ধর্মটি মায়ার গুণজাত ধর্ম। মায়া ও প্রকৃতিতে তিনটি গুণ বিদ্যমান, যথা,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। বিভিন্ন গুণে অধিষ্ঠিত মানুষের প্রবৃত্তি বিভিন্ন। মায়াবদ্ধ জীব মায়িক গুণের অতীত অপ্রাকৃত গুণে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। মায়িক গুণগুলিই মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত আকৃষ্ট করে। মায়াবদ্ধ জীব তমোগুণ থেকে ক্রমশঃ সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্ম উত্তমরূপে পালিত হলে বর্ণাশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য হরিতোষণ সম্ভব হয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৭ পৃষ্ঠার পর]

বহু প্রশ্ন আছে, যে প্রশ্ন উপরওয়ালার কাছে করা যায় না। ঠারে ঠারে বলতে হয়। কেউ ভাষণ দিচ্ছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন, শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করছেন, বলতে বলতে হয়ত' কোন একটা শব্দ বা হিসাব উন্টোপান্টা বলা হয়ে গেছে, যদি সেখানে তত্ত্বসিদ্ধান্তদর্শী ব্যক্তি কেউ থাকেন, তাহলে তিনি ঐ ভুলটা ধরিয়ে দিতে পারেন। তার ভাষা আছে আলাদা। সে ভাষা আমাদের জানা নেই কারও। ভাগবতে সে ভাষা শেখানো আছে। কিরকম? ঐ নিমিরাজ শিখিয়েছেন। কি ভাষা প্রয়োগ করব?—‘আপনি যা বলছেন, তা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি না, আমার বোধগম্য হচ্ছে না। দুই তিনবার বললে পর এর মানে হয়ে যাবে—যিনি কিছু বলছেন তাঁর কিছু ভুল হয়ে যাচ্ছে। তিনি নিজে বুঝতে পারছেন না, কিন্তু Slip of tongue হয়ে যাচ্ছে, বলাতে দোষ হয়ে যাচ্ছে। তিনি মনে করছেন আমি ঠিক বলছি, কিন্তু বলা ঠিক হচ্ছে না, হিসাবটা ঠিক হচ্ছে না। তখন তিনি সাবধান হয়ে যাবেন। এগুলো Eticcate আদব-কায়দা, শিষ্টাচার। গুরু-বৈষ্ণবের যদি ঐরকম ধরনের Slip of tongue হয়ে যায়, তাহলে সোজাসুজি বলা চলবে না। এগুলো শিষ্টাচার, শিখতে হয়। সমাজে চলতে গেলে আমাদের কতরকম ধরনের শিক্ষা আছে।

মুনি-ঋষিগণ কোন কথা বলেছেন, ভুল হয়ে গেছে, ওটাকে ভুল বলে ধরা হবে না। সংস্কৃত বলতে গিয়ে ভুল হয়ে গেল “মূর্খো বদতি বিষয়, ধীরো বদতি বিষয়ে।” মূর্খ লোক যে সংস্কৃত জানে না, সে ‘বিষয়’ বলে ফেলল, আর যারা পণ্ডিত ব্যক্তি তারা ব্যাকরণ ঠিক করে বলল ‘বিষয়ে নমঃ।’ যদি কোন মুনি-ঋষি ভুল করে ফেলেন বলবার সময়, ওটা ভুল বলে ধরা হবে না। ঐ ভুলই থেকে যাবে, ওটাই ঠিক। এর নাম আর্ষ প্রয়োগ। ঋষিগণের প্রয়োগ বলে ওটা মেনে নেওয়া হয়েছে। ওটাকে ভুল বলা চলবে না। এরকম উদাহরণও আছে। যেমন যমরাজের সময় হয়েছে। কিরকম?—

“অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্য ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।।”

এই যে কথাটা এটা যমরাজের কথা। যমরাজ ‘অহং বেত্তি’ বলে ফেলেছেন। কিন্তু হবে ‘বেত্তি’। ওটাকে ভুল বলে মানা হবে না, ওটা ঠিক আছে। কেন না, আর্ষ প্রয়োগ, মহৎ ব্যক্তি বলেছেন। তাঁর ভুল হতে পারে না। আমি এটাই মেনে নেব। ‘অহং বেত্তি’—আমি জানি, ‘শুকো বেত্তি’—শুকও জানেন। শুকদেব—যিনি ভাগবত ব্যাখ্যা করেছেন তিনি তত্ত্বদর্শন জানেন। ‘ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা’—ব্যাস জানতে পারেন, আবার নাও জানতে পারেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার! ব্যাসদেব ভাগবত প্রকাশ করলেন, আর তিনি জানতে পারেন, আবার নাও জানতে পারেন! না, ওখানে ওরকম অর্থ নয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যিনি তিনি ত’ নারায়ণ, তিনি ত’ সব জেনে শুনে বসে আছেন। তাহলে আবার এরকম কথা কার জন্য বলা হল? সেখানে বুঝাচ্ছেন ব্যাস অনেক। অনেক ব্যাস?—হ্যাঁ, কমপক্ষে ১৬ জন ব্যাস। ১৬ জন ব্যাস বিভিন্ন Rotation এ আসছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এসেছেন। মহাভারতের মধ্যে লেখা আছে—দ্রোণাচার্য্যের ছেলে অশ্বখামাও কখনও ব্যাস হয়ে আসবেন। তাহলে ১৬ জন ব্যাসের মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে ধরা হয়নি। ‘ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা’—ব্যাস জানেন বা না জানেন—এ কথা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সম্বন্ধে নয়। এটা অন্য ব্যাস সম্বন্ধে লেখা আছে। কি জিনিষ জানার কথা? “ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যম্”—প্রেমময় ভাগবত যদি বুঝতে হয়, তাহলে ভক্তির দ্বারা বুঝতে হবে। ভাগবত দুই প্রকার—গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত। এই দুই ভাগবতকে বুঝতে গেলে ভক্তির দরকার। ‘ন বুধ্যা ন চ টীকয়া’। আমার খুব বুদ্ধিবৃত্তি আছে, অনেক লেখাপড়া, অনেক গরিমা, হবে না, বুঝতে পারব না আমি।

আবার ঠিক ঐরকম ধরণের শ্লোক শিবঠাকুর বললেন এক জায়গায়—যেখানে অন্নপূর্ণার মন্দির—বারাণসীতে। বারাণসীতে একটা বিচার সভা উপস্থিত হয়েছিল। কি বিচারসভা?—শ্রীধরস্বামী বৈষ্ণব না মায়াবাদী? সেখানেও বিচারসভায় শিবঠাকুর স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সাক্ষী দিয়েছেন এবং বললেন,—

“অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।

শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ-প্রসাদতঃ ॥”

ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন, শেষের লাইনটা শুধু পান্টে দিয়েছেন।

জগদগুরু শ্রীধরস্বামী ‘গুরু’ করি’ মানি।

স্বামীরে যে না মানে, তারে বেশ্যামধ্যে গণি ॥

মহাপ্রভু যেটা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলেছেন, তারই সাক্ষী দিচ্ছেন তিনি। শ্রীধরস্বামী তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি, তিনি কখনও মায়াবাদী নন, তিনি বৈষ্ণব। “শ্রীনৃসিংহ-প্রসাদতঃ”—ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় তিনি সর্বতত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্ববিৎ। সুতরাং ভুল বলে যেটা আমরা মনে করছি, তাত্ত্বিক দর্শনে সেটা ভুল নয়। আবার বহু সংস্কৃত মন্ত্র ভাল করে পড়লাম আমি, কিন্তু মন্ত্রে কোন ফল হল না, এও আছে। খুব ভাল করে মন্ত্র পড়েও কিন্তু ফল উন্টে হয়ে গেল। “ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব” উচ্চারণ করতে গিয়ে ‘শত্রো’র উপর জোর পড়ে গিয়ে ফল উন্টে গেল। ইন্দ্রের শত্রু এই যজ্ঞাগ্নি থেকে উঠুক, কিন্তু মানে উন্টে হয়ে গেল। তাহলে মুস্কিল আছে। যদি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি না থাকে, আর আমি মন্ত্র উচ্চারণ করি, তাহলে ফল

কিছু হবে না। আর যদি শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি, তাহলে আমি যা বলি না কেন ভগবান্ সব মেনে নেবেন। কেননা তাঁর স্নেহ-প্রীতি সেখানে খুব প্রবল। সেখানে তিনি ওসব দেখবেন না।

বাচ্চা ছেলের আধো আধো বুলি মা-বাপ ত' খুব ভালবাসেন। অন্য লোক হয়ত' বুঝতে পারেন না, কিন্তু পিতা-মাতা ঠিক বুঝতে পারেন বাচ্চাটা কি বলছে। আধো আধো বুলির মধ্যে সে কি চাইছে সেটা বুঝতে পারেন এবং ব্যবস্থা নেন। সবগুলো বিচারের মধ্যে।

“অন্তরে (মনে) দর্শন হতে সাক্ষাৎ দর্শনের মাহাত্ম্য শ্রীভগবৎ-পার্বদগণই যুক্তির সহিত বর্ণন করেছেন। তাহা শ্রীমদ্ভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ড (৩।১৭৯-১৮২) শ্লোক হতে বিশেষভাবে জানা যায়।” “(মূল শ্লোকের প্রথমেই কীর্তনাখ্যা ভক্তি প্রকাশক ‘দেব’! ইত্যাদি সম্বোধনাত্মক পদগুলির তাৎপর্য দেখাচ্ছেন)—‘দেব’!—হে দিব্যরূপ! সুন্দর! ইহা দর্শনের ইচ্ছা উদ্ভিত করার হেতু।” ভগবানকে বলছেন সুন্দর। জগতে যদি সুন্দর কেহ থাকেন, তাহলে ভগবানই হলেন চিরসুন্দর, নিত্যসুন্দর। ভগবানই হলেন সুন্দর-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য। “দামোদর! (এইরূপ সম্বোধনহেতু) ভক্তবাৎসল্য-বিশেষে যিনি দামবন্ধন পর্য্যন্ত স্বীকার করেছিলেন।” ভগবান্ কিরকম সুন্দর? ভক্তের প্রেমবশ্যতা স্বীকার করলেন। এ বশ্যতা স্বীকার করা মুশ্কিল আছে, কিন্তু ভগবান্ স্বীকার করেছেন। কেন? তিনি দেখাচ্ছেন আমি আমার ভক্তের কাছে কোন বাহাদুরি রাখি না। ভক্তের কাছে আমি সবসময় প্রণত। ভাগবতের মধ্যে আছে শব্দটা—ভগবান্—ভক্ত-ভক্তিমান্; আর ভক্ত—ভগবদ্ভক্তিমান্। ভক্তের বিশেষণ হল—ভগবদ্ভক্তিমান্; আর ভগবানের বিশেষণ হল—ভক্ত-ভক্তিমান্। ভক্তকে ভক্তি করেন যিনি তিনি হলেন ভগবান্। ভয়ঙ্কর কথা!

আরাধনার ভিতরে কোন আরাধনা শ্রেষ্ঠ? শিবঠাকুরকে প্রশ্ন করেছেন শিবানী—
কার আরাধনা করব? কার আরাধনা শ্রেষ্ঠ?—

তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরী।

কারণং সর্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।।

জান দেবী, তুমি আমি সেই সর্বহেতুভূত মূল কারণ যে ভগবান্ কৃষ্ণ, তাঁর থেকে এসেছি। তিনি অনন্ত বিশ্বের কারণ। ‘স একঃ পরমেশ্বরঃ’—তিনি পরমেশ্বর, মূল মালিক—
Supreme Authority। কে তিনি? পরিচয় দেবেন একটু।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্।।

এই উত্তর এসেছে। তিনি হলেন আমাদের সকলের উপরওয়ালা, পরম ভজনীয় বস্তু। তাঁকে বাদ দিয়ে আর কার ভজন করব? যে ভগবান্ এত কৃতজ্ঞ, এত বদান্য, এত বাঞ্ছাকল্পতরু, তাঁর ভজন না করে আর কার ভজন করে সময় নষ্ট করব? ভক্তবাৎসল্য হেতু যিনি ‘দামোদর’—এই সম্বোধন পেয়েছেন। দামোদর মানে ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ করেছেন যিনি। “ভক্তবাৎসল্য-বিশেষে যিনি দামবন্ধন পর্য্যন্ত স্বীকার করেছিলেন। অতএব আমিও ভক্তিদ্বারা তাঁকে স্ব-চক্ষে দর্শন করতে পারব।” ঐ বাচ্চাকে—যাঁর দর্শন মেলে না,

যাঁর চাক্ষুষ-দর্শন আমাদের একেবারে অসম্ভব, তিনি চাক্ষুষ দর্শন দিচ্ছেন। ‘অনন্ত!—যাঁর অন্ত নেই, অর্থাৎ অসীম কৃপাময়।’ তাঁর কৃপার কোন তুলনা নেই, অসীম কৃপাময় তিনি। অপার করুণাময়, মেপে নেওয়া যাবে না। “সুতরাং তিনি কৃপাদৃষ্টি বিতরণে আমাদের অনুগৃহীত করতে পারেন”, তিনি হলেন সেই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবান্। আমার কোন কিছু নেই, কিন্তু যিনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করে আমাকে অনুগ্রহ করেন, তিনি হলেন অনন্ত। ‘প্রভো’-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। “প্রভো!—হে অচিন্ত্য, অনন্ত ও অদ্ভুত মহাশক্তি-সম্পন্ন! অতএব তোমার ন্যায় ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বস্তুরও চাক্ষুষ দর্শন (অচিন্ত্য মহাশক্তিপ্রভাবে) সংঘটিত হতে পারে।” যেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব তোমার অহৈতুকী কৃপাবলে সেটা সম্ভব। তুমি করে থাক সেটা। এটা তোমার দয়ার পরিচয়, করুণার পরিচয়, বাৎসল্যের পরিচয়। “ঈশ!—পরম স্বতন্ত্র!” ঈশ-শব্দ ব্যবহার করেছে। হে পরম স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বতন্ত্রতার উপরে আরও কিছু আছে। তিনি কাকেও কৃপা করতে পারেন, কাকেও ছেড়ে দিতে পারেন, আবার সবকিছু ঘুরিয়েও দিতে পারেন। সব ক্ষমতা আছে তাঁর।

চৈতন্যমহাপ্রভু যখন ঝারিখণ্ডের পথে গেলেন তখন সঙ্গে কে ছিলেন তাঁর?—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ছিলেন। যখন বনের হিংস্র প্রাণীগুলো—বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, সাপ ইত্যাদি সামনে আসছে, উনি “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।” বলছেন, আর তাঁর দেখাদেখি সেই সকল বন্যজন্তুগুলো ‘হাউ হাউ’ অর্থাৎ ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ’ বলছে।

স্বাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি।

সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্মৃতি।।

চেতনের বৃত্তি জেগে গেছে তাদের, তারা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলছে। বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের তা দেখে একটু একটু ভয় লাগছে। ভয় লাগলে কি হবে, মহাপ্রভু ত’ আছেন। বৈষ্ণবের আবার ভয় লাগে নাকি? লাগতে পারে কারও কারও। অধিকার অনুসারে কারও লাগতে পারে। কারও হয়ত’ নামের পরে বিশ্বাস নেই, সেজন্য হয়ত’ একটু ভয় ভয় লাগছে। রাম নামে নাকি ভূত পালায়? কৃষ্ণনামে কি ভূত পালায় নাকি? ‘রাম, কৃষ্ণ, হরি, মাধব, নরহরি।’ সবই ত’ নামপর্য্যায়। কাকেও বাদ দিলে ত’ কিছু হচ্ছে না। নামের মহিমা আছে। তাহলে আবার ভয় কেন? যদি আমি নামের আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তাহলে আবার ভূতের ভয় কেন, বাঘের ভয় কেন, ভাল্লুকের ভয় কেন? এও ত’ প্রশ্ন হতে পারে। ভয় থাকা উচিত। ভয় শুধু থাকবে—আমি ভগবানের নাম স্মরণ করতে পারছি না ঠিকমত। হে ভগবান্! তোমার যে অমৃতময় নাম তা আমি স্মরণপথে সবসময় রাখতে পারছি না। আমার স্মৃতিটা তুমি দাও। এমন স্মৃতি দাও যেন আমি কখনও তোমার নাম না ভুলি। এইরকম প্রার্থনা দরকার। ভগবানের নাম ভুলে যাওয়া, ভগবানকে ভুলে যাওয়া আমাদের চরম বিপর্য্যয়।

দুটো ছেলে রাস্তায় ঝগড়া করছিল। একজন একজনকে বলছে, দেখ, তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। আবার আর একটা ছেলে বলছে, তোর মায়ের নাম ভুলিয়ে দেব। যখন ছেলেদুটো এরকম বলছে তখন পাশ দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন,—

দেখ, বাপের নাম, মায়ের নাম তোদের ভুলাতে হবে না, ভগবানের নামটা মনে রাখিস্। তত্ত্বদর্শন এটা। জগতের সব ভুলে যেতে পারি আমরা, তাতে কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু ভগবানের নাম যেন না ভুলি, কৃষ্ণনাম যেন না ভুলি। কৃষ্ণনামের আগে যেন আর একজনকে লাগিয়ে দিই। তিনি হলেন শ্রীজী—লক্ষ্মীজী—সর্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধারানী। তিনিও সঙ্গে থাকবেন, তাঁকে বাদ দেওয়া চলবে না। তাঁকে যদি বাদ দিয়ে দেই, তাহলে নামে ফল পেলাম না। শক্তিছাড়া শক্তিমানকে চাচ্ছি, কিন্তু তা নয়, শক্তি নিয়েই তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁকে চাই। “অযোগ্য জনের প্রতিও এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশে কারও অপেক্ষা নেই।” আমি পরম অযোগ্য, আমার কোন যোগ্যতা নেই, তাহলে কেন আমি অহঙ্কার করে মরি। আমার অনেক রকম যোগ্যতা আছে, অধিকার আছে, ক্ষমতা আছে, বাহাদুরি আছে—কেন এটা বলতে যাচ্ছি? যখন আমি অন্তরে অন্তরে বুঝব আমি সর্বতোভাবে অযোগ্য তখন ভগবান আমাকে অনুগ্রহ করবেন, আমাকে নিজহে গ্রহণ করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার অহমিকা আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবান আমার থেকে অনেক দূর আছেন।

‘বিষেগ’ বলে সম্বোধন করেছেন। বিষেগ মানে সর্বব্যাপক। “হে সর্বব্যাপক! অথবা হে বৃন্দাবনের নিকুঞ্জস্থ নিভৃত গহুরাদিতেও প্রবেশশীল!” একটা বিশেষণ দিয়েছেন। যেখানে সাধারণ মানুষ প্রবেশ করতে পারে না, যেখানে প্রবেশ করা বড়ই কষ্ট, সেখানে ভগবান অনায়াসে প্রবেশ করছেন। কালযবন যখন মথুরা আক্রমণ করেছে ভগবান তখন তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছেন। কালযবন মনে করল—ও আমার ভয়ে পালাচ্ছে। কিন্তু ভগবান ওর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না, আর একটা ওর থেকে বড় কাজ আছে, সেজন্য চলে যাচ্ছেন। কালযবন তখন কৃষ্ণের অনুসরণ করলেন। উনি গিয়ে প্রবর্ষণ পর্বতে উঠে পড়েছেন। সেখানে ওনার এক ভক্ত—মুচুকুন্দ রাজা আছেন, তাঁকে দেখবার জন্য তিনি যাচ্ছেন। কালযবন ওঁর পিছেপিছে যাচ্ছে। ভগবান ওখানে এক গুহার মধ্যে ঢুকে গিয়েছেন, আর সেই গুহার মধ্যে মুচুকুন্দ রাজা ঘুমোচ্ছিলেন দেবতাদের আশীর্বাদ নিয়ে। কেমন রাজা দেখুন মুচুকুন্দ! আমাদের এখানকার রাজা তিনি, দেবতাদের হয়ে যুদ্ধ করেছেন। তখন কার্তিকের জন্ম হয়নি অর্থাৎ দেব-সেনাপতি নির্বাচিত হয়নি তখন। সেই সময় দেবতাগণকে রক্ষার জন্য সব দেবতা অনুরোধ করেছিলেন রাজা মুচুকুন্দকে। তিনি বহুকাল দেবতাগণকে রক্ষা করেছেন যুদ্ধ ইত্যাদি করে। সে-কারণে দেবতাগণ তাঁকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখে বললেন,—আপনি কিছুদিন বিশ্রাম করুন, নিদ্রাসুখ অনুভব করুন। কোথায় করব?—প্রবর্ষণ পর্বতে স্থান নির্বাচন করেছিলেন। সেখানে গিয়ে উনি ঘুমিয়েছিলেন। দেবতাগণ আশীর্বাদ দিয়েছিলেন—যদি কেউ আপনার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গায়, তাহলে সে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, ভস্ম হয়ে যাবে।

কালযবন গিয়ে ঐ গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে। দশচক্রে ভগবান ভূত। কালযবন মনে করেছে কৃষ্ণ বোধ হয় এখানে শুয়ে রয়েছে। এই ভেবে এক লাথি মেরেছে। মুচুকুন্দের কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে গেলে যেই তাকিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হয়ে গেল কালযবন। তারপরে কৃষ্ণ এসে ঢুকেছেন ঐ গুহার মধ্যে। কৃষ্ণ এসে ঢুকতে গুহা আলোয় আলোময়। আর তাকাতে পারছেন না মুচুকুন্দ রাজা। তখন বললেন,—আপনি কে, আমাকে পরিচয় দেন।

আপনি কি ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বায়ু, সাক্ষাৎ সূর্য্য? কি ব্যাপার? পরিচয় দিলেন কৃষ্ণ। যার জন্য অনন্ত বিশ্বের লোক কান্নাকাটি করে, আমি সেই বস্তু। আমি যদুকুলে এসেছি, আমি বাসুদেব কৃষ্ণ। আমার পরম সৌভাগ্য, তুমি আমার জন্য অনেক চিন্তা-ভাবনা করতে পূর্ব্বজন্মে, সেজন্য আমি তোমাকে দর্শন দিতে এসেছি। এই বন-জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়ে তোমাকে দর্শন দেওয়ার জন্যে আমি এসেছি। চিন্তা করুন, ভগবান্ ভক্তকে দর্শন দেওয়ার জন্য বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে ঢুকেছে, যেখানে কেউ ঢুকতে পারে না। তাঁর আবার অগম্য স্থান কি আছে বলুন, কোথায় তিনি যেতে পারেন না! পাহাড়ের গুহাতে তিনি চলে যাচ্ছেন বিশেষ করে ভক্তের জন্য। ভক্তের জন্য ভগবানের এইরকম স্নেহ-মমতা।

ঠিক এইরকম ব্যাপারটা দেখবেন নৃগরাজের বেলায়ও। যিনি দান করতে করতে একটা গাভীকে দুবার দান করে ফেলেছিলেন। একটা দান করা গাভী আবার এসে গেছে যা দান করা হবে সেই গাভীর মধ্যে। শেষকালে ব্রাহ্মণরা ঝগড়া করতে আরম্ভ করলেন। এক ব্রাহ্মণ বলছেন,—এই গাভী আমাকে দিয়েছেন নৃগরাজ। আর এক ব্রাহ্মণ বলছেন,—নৃগরাজ এই গাভী দিয়েছেন আমাকে। ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। শেষকালে রাজা বললেন,—এই দুই গাভী বাদ দেন আপনারা, আমি অন্য গাভী দিচ্ছি। একটা নয়, আমি অনেক গাভী দেব। তাঁরা শুনলেন না, চলে গেলেন। তারপরে নৃগরাজের সময় শেষ, যমালয়ে গিয়ে হাজির। বিচার হচ্ছে, যমরাজ বসে আছেন। দেখত' চিত্রগুপ্ত, এর কি আছে। এর সবই ত' ভাল, খুব দাতা লোক। কোথায় শিবিরাজ, কোথায় দাতা কর্ণ, তার থেকেও বড় দাতা ইনি। কোথাও কোন খারাপ আছে কিনা দেখত'। হ্যাঁ, একটু আছে। কি আছে? দান করতে গিয়ে একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে, সেজন্য ইনি এসেছেন। যমরাজ জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি প্রথমে পাপের ফল ভোগ করবেন, না পুণ্যের ফল ভোগ করবেন? রাজা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—আমি খারাপটা আগে ভোগ করব। খারাপটা কি? আপনার দান করতে গিয়ে উণ্টোপাণ্টা হয়ে গেছে, এইজন্য আপনি এখানে এসেছেন। ব্রহ্মস্ব, দেবস্ব হরণের দোষ-ক্রটি হয়ে গেছে। সেই পাপে এখানে আসতে হয়েছে। ঠিক আছে, আমি তাই ভোগ করব আগে। সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন ওঁর দেহ পাণ্টে গেছে। রাজশরীর পাণ্টে কুকলাস দেহ হয়ে গেল। কিন্তু ভগবানের এমনই দয়া (যেহেতু তিনি ভগবদ্ভক্ত, সব শাসন মেনে নিয়েছেন তিনি) তাঁকে দ্বারকাতে যেখানে ভগবান্ থাকেন সেখানকার একটা শুকনো কূয়োতে নিয়ে ফেললেন। যদুকুমারগণ সেখানে খেলাধুলা করতে করতে পিপাসার্ত হয়ে জল খুঁজতে গিয়ে দেখে কূয়োর মধ্যে বিরাট এক জানোয়ার (কুকলাস) পড়ে আছে। ওরা তাকে উপরে তুলতে না পেরে কৃষ্ণকে—বড় মালিককে ডেকেছে। এস, এস, দেখ! তিনি ত' সবই জানেন, সর্ব্বজ্ঞ। 'গিরিসম্ভব'—পাহাড়ের মত পড়ে আছে। কৃষ্ণ এসে লেজ ধরে অনায়াসে তুলে ফেললেন। তারপর দেখেন সেই কুকলাস দেহ মারা গিয়ে এক রাজশরীর বেরিয়ে এল। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করছেন তাঁকে, তুমি কে? তিনি বললেন,—প্রভু, আমি আপনার ভৃত্য। এখানে কেন পড়েছি তুমি? আমার যেমন কৰ্ম্ম, সেই কৰ্ম্মানুসারে এখানে এসে পড়েছি আমি। সমস্ত বিবরণ দিলেন। কৃষ্ণ সেখানে তাঁকে নিজহে গ্রহণ করেছেন। তিনি বললেন,—জন্মে জন্মে তুমি আমার কিঙ্কর। ভগবানের লীলা! ভগবান্ তাঁর নিজের ভক্তকে

দিয়েও এমন করান। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর দর্শনমাত্র সব কর্মফল শেষ হয়ে যায়। তথাপি তাঁর ভক্তকে দিয়ে তিনি এমন করাচ্ছেন।

মুচুকুন্দ রাজাকেও ঠিক এমন করলেন। তুমি মৃগয়া করতে গিয়েছিলে ক্ষত্রিয় রাজা। তজ্জন্য তোমাকে সাজা নিতে হবে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তারপরে আবার তুমি ভক্তগৃহে জন্মগ্রহণ কর। অথচ নিজে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়ে দিয়েছেন তাঁকে। তারপরেও যেন কিছু বাকী আছে। এগুলো সব বিচারের কথা। “হে সর্বব্যাপক! অথবা হে বৃন্দাবনের নিকুঞ্জস্থ নিভৃত গহুরাদিতেও প্রবেশশীল! এতেও নয়নগোচর-জন্য দুরাগমন-শ্রমাদির সম্ভাবনা নেই।” ভগবানের এই যে লীলা এটা অতি স্বাভাবিক। তিনিও দৌড়ঝাঁপ করতে পারেন। বৃন্দাবনে তিনি এক একদিন গোচারণে গেছেন, ইতিহাস যদি মাপা যায় তাহলে জায়গাটা হয় ২৫ মাইল, ৩০ মাইল, ৫০ মাইল। ৫০মাইল কেউ গোচারণ করতে পারে? বলুন, কার ক্ষমতা আছে? কিন্তু ভগবানের ঐশী শক্তি, যোগমায়া শক্তিতে এসব সংঘটিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

“উক্ত সম্বোধন-পদসমূহের অন্য প্রকার অর্থ দেখাচ্ছেন—হে ‘অনন্ত!’—অপরিচ্ছিন্ন! (সীমা-রহিত) ‘বিষেণ!’—সর্বব্যাপী, তথাপি ‘দামোদর!’—অর্থাৎ পরম বাৎসল্য-বিশেষ-বশে আপনার অকরণীয় কিছুই নেই—ইহাই ধ্বনিত হচ্ছে। অন্য সম্বোধন-পদগুলির অর্থ পূর্বের ন্যায় একপ্রকার থাকবে।”

ইতি দামোদরাস্তকের ষষ্ঠশ্লোকের শ্রীশ্রীল-সনাতন-গোস্বামি-কৃত
দিগদর্শিনী-নামক টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত। (ব্রহ্মশঃ)

নামাপরাধ

(১)

যাহা হ’তে কৃষ্ণতত্ত্ব হয় প্রকাশিত।
হেন সাধুনিন্দা কভুনা হয় উচিত।।
অতএব সাধুনিন্দা কভু না করিবে।
সাধুসঙ্গে অপরাধ সতত ত্যজিবে।।

(২)

‘গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।’
গুরুপদে অপরাধ ত্যজিবে যতনে।।
গুরুদেব-মনোহরীষ্ট পূরণ করিলে।
লভিবে কৃষ্ণের কৃপা অতি কুতূহলে।।

(৩)

“অবতার সব শ্রীকৃষ্ণের কলা—অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব অবতংস।।”

স্বতন্ত্রতা শিবাদির কভু না জানিবে।
কৃষ্ণাধীন না জানিলে অপরাধী হবে।।

(৪)

বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দা কভু না করিবে।
ভগবদ্বাক্য জানি শিরেতে ধরিবে।।
শাস্ত্রের হেলায় হয় গুরু অপরাধ।
সতত ত্যজিবে তাহা জানি' ভক্তিবাদ।।

(৫)

'স্তুতি মাত্র' কভু নহে মাহাত্ম্য নামের।
অতি সত্য নামতত্ত্ব জ্ঞাতব্য নরের।।
নামের মাহাত্ম্যে আছে সন্দেহ যাহার।
ভক্তিতে তাহার নাই কিছু অধিকার।।

(৬)

অন্যভাবে অন্যরূপে নামার্থ করিলে।
ভক্তিরত্ন হারাইবে অগাধ সলিলে।।
অতএব সেই পাপ করিয়া বর্জন।
অনায়াসে লভ তুমি ভক্তিরত্নধন।।

(৭)

যাগ-যজ্ঞ-পূজাদি শুভকর্মের সনে।
নামের তুলনা কভু না করিবে মনে।।
শুভকর্মের নামতত্ত্বে সমবুদ্ধি যার।
অধিকার নাই তার ভক্তি-লতিকার।।

(৮)

নামের বলেতে কভু পাপ না করিবে।
সে-পাপ করিলে তুমি নিরয়ে ডুবিবে।।
নামবলে পাপ-কার্য অতি গুরু হয়।
সে পাপের পাপী কভু ভক্তি না লভয়।।

(৯)

শ্রদ্ধাহীন জনে কভু মাহাত্ম্য নামের।
বলিবে না,—নামতত্ত্ব অজ্ঞেয় তাদের।।

সে নিষ্ফল চেষ্টা সদা পরিহার করি'।
সতত ভজহ তুমি নাম-নামী হরি ॥

(১০)

নামের মাহাত্ম্য জেনে (তায়) অপ্রীতি করিলে।
ঐকান্তিক-প্রীতিভরে নামে না সেবিলে ॥
কৃষ্ণপদে ভক্তিদ্বন্দ্ব কভু না মিলিবে।
অতএব, সেই দোষ কভু না করিবে ॥

—শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-বিরহ-স্মৃতি

ভক্তিদ্বারা কৃষ্ণ-বল্লভা বৃষভানুসুতার কিস্করীগণের বিনোদন-প্রদর্শনার্থ যে দয়ার প্রাকট
হয়, তাহাই ভক্তিবিনোদা দয়া। এই দয়া হেলায় চিত্তের যাবতীয় খেদ দূরীভূত করে এবং



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ইহা সর্ব-নির্মলতার
আলয় ; সকল বিষয়
আচ্ছাদিত করিয়া এই
দয়া পরমানন্দ প্রকাশ
করিয়া থাকে। এই
দয়ায় শাস্ত্রবিবাদ
প্রশমিত হইয়া থাকে।
এই দয়া সমতা দান
করে, এবং রসবর্ণনদ্বারা
চিত্তের উন্মত্ততা বিধান
করিয়া থাকে। এই
শুভদা দয়া মাধুর্য্য
মর্যাদায় ভরপূর
থাকিয়া বিনোদপ্রাণের
বিনোদন-কার্য্যে সুপটু।
হেঁয়তাবজ্জিত শুদ্ধ
শুভ শুভদহই ইহার
বৈশিষ্ট্য। শুধু
অমনোদয়া নহে, নিত্য
শুভদা এই দয়া। জগৎ
যখন অন্যাভিলাষিতা

ও চতুর্বর্গের ঘনাক্ষকারে আচ্ছন্ন হইয়া গৌর ও গৌরপরিকরগণের সুসিদ্ধান্ত-ভাস্করের আলোক-লাভে বঞ্চিত হইয়া মনোধর্মের তাণ্ডব প্রদর্শন করিতেছিল—যখন গৌরজন বলিয়া আত্মপরিচয়প্রদানকারিগণ পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত হারাইয়া কাম-কলুষতায় জঞ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল—যখন চিঞ্জড়সমন্বয়-প্রয়াসই বিবেকের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল, ফলে ভক্তিমুখ নিরীক্ষণেই যাহাদের সার্থকতা, সেই কন্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ-যোগাদিকে শুদ্ধভক্তির সমাসনে বসাইয়া উদারতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার আবাহন হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে—পরমার্থধ্বংসচেষ্টার সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তাঁহার ভক্তিবিনোদা দয়া জড় শাক্তেয়বাদিগণের প্রাকৃত বীর্য্যের অকিঞ্চিৎকরতা ও হেয়তা এবং মূল সঙ্কর্যণ বলদেব প্রভুর চিদ্বলের প্রভাব, তথা শুদ্ধ-শাক্তেয় আশ্রয়ভাবে বিষয়ের সেবা-চমৎকারিতা-প্রদর্শনকল্পে বীরনগরে প্রকটলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ ভক্তিবিনোদা দয়া লেখনী ও বাগরূপ কৃপাপ্রভঞ্জন-সাহায্যে অপরমার্থের কালিমালিপ্ত ঘনাবলী দূরে অপসারিত করিয়া জগদ্বাসীকে স্বীয় বৈশিষ্ট্য দর্শনের সুযোগ দিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই ভক্তিবিনোদা দয়াকে পরাংপর গুরুপাদপদ্মরূপে জানিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। সেই দয়ার বিগ্রহ ন্যূনাধিক পাদোদনশতাব্দীকাল প্রপঞ্চ অবস্থান করিয়া নিজের ও অপরের যুগপৎ কি-প্রকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার করা যায় তাহা ‘হাতে-কলমে’ শিক্ষা দিয়াছেন। সচ্চিদানন্দলীলাময় বিগ্রহের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিয়া অপরের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করিলে ঐ কার্য্যটি হইয়া থাকে। যিনি এই সেবায় নিযুক্ত, তিনি—সচ্চিদানন্দ-ভক্তিদ্বারাই যে তদ্বিনোদ হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়া সচ্চিদানন্দ—ভক্তিবিনোদরূপে পরিচিত হন। ঐ কার্য্যটি আচার্য্যদেবের। যে ভক্তিবিনোদা দয়াকে আমরা পরাংপর গুরুরূপে জানিতে পারিয়াছি তিনি শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামে পরিচিত। ভক্তিশিক্ষক আচার্য্যগণের সহিত এই আচার্য্যবর্য্যের অভিন্নত্ব-সম্বন্ধ সেবকগণ সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দয়ার অন্ত নাই। ইহা অসীমা বলিয়া ইহার কুল-কিনারা পাওয়া যায় না। ইহার দয়ার সম্বন্ধে যতই আলোচনা করা যায়, ততই বিস্ময়ে আত্মত না হইয়া থাকা যায় না। ঠাকুরের প্রকটকালে আমার ন্যায় যাহাদের তাঁহার পাদপদ্মসমীপে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য হয় নাই, তাঁহারা যদি ঠাকুরের শরণাগতি, কল্যাণ-কল্লতরু, গীতাবলী, গীতমালা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, মহাপ্রভুর শিক্ষা, জৈবধর্ম্ম, তত্ত্বসূত্র, হরিনাম-চিন্তামণি, ভাগবতার্কমরীচিমালা, নবদ্বীপ-শতক, নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনার সুযোগ পান, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন—তিনি ঐ গ্রন্থরাজির প্রত্যেকটীতে আমাদের জন্য পরমামৃত-বারিধি সংরক্ষণ করিয়াছেন। অজ্ঞগণ মুক্তার মূল্য বোঝে না, জহুরী তাহা জানাইতে পারে। ঠাকুর আমাদের জন্য যে পরম সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন আমাদের ন্যায় পরমার্থ-বিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞগণের পক্ষে তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই কৃপাময় ঠাকুর তাহা জানাইবার জন্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুবরকে গৌরকিশোরাম্বররূপে প্রপঞ্চ সংরক্ষণ করিয়াছেন। এই কার্য্যে আমরা গৌরশক্তি ভক্তিবিনোদা দয়ার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। অপ্রকট-রাজ্যে অবস্থানকালেও যে প্রকাশ-বিগ্রহের ভিতর দিয়া ভক্তিবিনোদা দয়া প্রকটিত থাকিয়া আমাদের মঙ্গলবিধান করেন, এই

ঘটনা তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। বস্তুসিদ্ধি-সময়েও সেবকগণকে বিপ্রলম্বভাবে বিভাবিত করিয়া “কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি পর” এই শিক্ষার আদর্শ প্রদর্শনপূর্বক ভক্তিবিনোদা দয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এই যে অপ্রকট-মুহূর্ত্তেও স্বরূপের প্রাকট্য, ইহা মাত্রই ভক্তিবিনোদা দয়ার পক্ষেই সম্ভব এবং ইহা এক অনির্বচনীয় চমৎকারিতা।

শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকাম-সেবায়ই ভক্তিবিনোদদয়ার চমৎকারিতা প্রস্ফুটিত। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্বত্র গৌরনাম প্রচার করিয়া এবং বিশ্বমাঝে এই নামের প্রচারভার উপযুক্ত পাত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া গৌরনাম-সেবা সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীগৌরধাম শ্রীমায়াপুর আবিষ্কার করিয়া তথায় গৌরসেবা প্রকাশ এবং উপযুক্ত পাত্রের উপর শ্রীধামোজ্জ্বল্য-সেবার ভার ন্যস্ত করিয়া শ্রীগৌরধাম-সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ও অন্যান্য গ্রন্থদ্বারা শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা স্বয়ং প্রচার করিয়া এবং উপযুক্ত পাত্রদ্বারা প্রচার করাইয়া ঠাকুর শ্রীগৌরকাম পরিপূরণ করিয়াছেন।

বাংলা ১৩২১ সালের ৯ই আষাঢ় অমাবস্যা-তিথিতে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বস্তুসিদ্ধি লাভের লীলাভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যাহ্নিকলীলায় প্রবেশ করেন। অমাবস্যা-তিথিতে চন্দ্র সূর্য্যকিরণের সহিত বাস করেন। ঠাকুরের এই তিথিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ কৃষ্ণসূর্য্যের সেবা-কিরণের সহিত শুদ্ধভক্ত-চন্দ্রিকার একত্র বাসের তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিতেছে। অমাবস্যার নৈশ অন্ধকার ঠাকুরের বিরহে ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে যে বিপ্রলম্বের উদয়, তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। এই বিপ্রলম্ব বাহ্যতঃ প্রাকৃত শোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান। বৈষ্ণবগণের বিপ্রলম্বভাবে প্রাকৃতির হেয়ত্ব বিন্দুমাত্রও নাই, অপ্রাকৃত কৃষ্ণশক্তির করুণা স্মৃতি-গবাক্ষের দ্বারা হৃদ্দেশে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে। তাহাতে সেবার চমৎকারিতাই পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিপ্রলম্বে প্রাকৃত শোকের হেয়ত্বের স্থানে অপ্রাকৃত সেবার বিকাশই হইয়া থাকে। অমাবস্যা রজনীর কৃষ্ণবর্ণত্ব কৃষ্ণশক্তির কৃষ্ণরূপের যে বর্ণন, তাহারই আভাস-প্রদর্শনকারী। বিপ্রলম্বে কৃষ্ণশক্তির স্মৃতিতে কৃষ্ণবর্ণের উজ্জ্বল আলোকে সেবকের হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। আবার কৃষ্ণসৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে বৃষভানুসুতার তপ্তকাঞ্চন বর্ণের সংযোগে। এই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা বার্ষভানবীদেবীর পদনখ-শোভাই ভক্তগণকে কৃষ্ণসেবায় আকর্ষণ করিয়া থাকে। ঐ শোভার আনুগত্য ব্যতীত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কখনও স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণসেবার জন্য প্রধাবিত হন না, বৃষভানুসুতার পদনখ-সৌন্দর্য্যের প্রতি সেবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভক্তিবিনোদা দয়া দ্বিপ্রহরে প্রকটলীলা সংগোপনপূর্বক স্বীয় চমৎকারিতার এক নূতন অধ্যায় প্রকাশ করিলেন। মাধ্যাহ্নিক কৃষ্ণলীলাস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থিত শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ ঠাকুরের অপ্রাকৃত ভক্তি বা সেবাভবন। এই স্থানেই ঠাকুরের নিত্যলীলায় প্রবেশ।

ঠাকুর, তোমার দয়ার অন্ত নাই। পতিত, পাষণ্ড, গুরু-বৈষ্ণব-সেবাবিমুখ মাদৃশ মূঢ়জনকেও তোমার করুণা স্বীয়পদে আকর্ষণ করিতে সততই সচেষ্ট। তোমার দয়ার কথা চিন্তা করিলে স্বতঃই মনে হয়, “যে যত পতিত হয়, তব কৃপা তত তায়।।” তোমার এই

কৃপার গুণে আকৃষ্ট হইয়া আমার ন্যায় পামর ব্যক্তিও তোমার অপ্রকট-তিথিতে দুই বিন্দু কৃতজ্ঞতাশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। ঠাকুর, আশীর্বাদ কর, তোমার শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইবার জন্য তোমার অভিন্নবিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী গুরুবরের পাদপদ্মসেবায় নিরত থাকিতে পারি।

“যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।

হেন প্রভু কোথা গেলা বিনোদ ঠাকুর॥

পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।

ভকতিবিনোদ প্রভু কোথা গেলে পাব॥”

—দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

মহৎ-কৃপা

রূপানুগ মহাজন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহতের কৃপাই ভজনলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া জানাইয়াছেন,—

মহৎকৃপা বিনা কোন কস্মে ভক্তি নয়।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ সংসার নহে ক্ষয়॥

কোন কস্মদ্বারা ভক্তি লাভ হয় না। দেশভক্তি, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি বা ইতর দেবদেবীর প্রতি ভক্তির কোন কথা নহে, কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তির মহাজনত্বই মহৎকৃপা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কোনও কস্ম বলিতে কেবল উদর-ভরণাদির জন্য অনুষ্ঠিত কস্মসমূহই যে কৃষ্ণভক্তি প্রদানে অসমর্থ তাহা নহে, পরন্তু দান-ধ্যানাदि সংকস্ম, বিপুল জনসমাজ আলোড়নকারী কস্মমার্গীয় বহুয়াসসকল, কিম্বা জনসমাজ-ত্যাগকারীর হিমালয়ের নিজ্জর্ন গুহায় বাস, এমন কি তথাকথিত ভক্ত্যঙ্গসমূহের অনুষ্ঠানও যদি মহতের কৃপামূলে সাধিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত সকল কার্যই কৃষ্ণভক্তি-তাৎপর্যবিহীন বৃথা কস্মে পর্যাবসিত হয়।

মহতের দ্বারে সকলেই প্রার্থী। মহতের কৃপাদৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইতে পারিলে শ্রেয়োলাভের সুবিধা হয়। প্রাকৃত কবি গণমোহন ছন্দোবন্দে মহতের বন্দনা করিয়াছেন,—
“যাজ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা” অর্থাৎ উত্তম বা মহতের নিকট যাজ্ঞা করিয়া বিমুখ হওয়াও বরং ভাল, কিন্তু অধমের নিকট প্রাপ্ত-মনোরথ হইলেও প্রার্থনা করা নিতান্ত অশোভন।

মহতের নিকট প্রার্থনাই সুসঙ্গত। কিন্তু মহৎ কে? যাহাকে মহৎ বলিয়া স্থির করি, তিনি বিমুখ করিবেন, এরূপ অ-মহতের আশঙ্কা করিয়া আবার স্তুতিগান কেন? আমার মনের ছাঁচে গড়া বা গণমতের ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত জনেই কি মহত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে?

অব্যবসায়ি-চিত্ত জাগতিক সুবিধাবাদীর প্রয়োজন বহু—সেই প্রয়োজনসিদ্ধিই তাহাদের শ্রেয়ঃ, তাই প্রার্থনাও তাহাদের বহুমুখী। যেখানে সেই প্রার্থনার পূরণ হয়—
অর্থাৎ অপস্বার্থ দোহন করিবার আশা থাকে, সেইখানে আমরা নির্ব্বিবাদে ‘মহৎ’ শব্দ প্রয়োগ করিয়া বসি। আমার প্রয়োজনের ‘মহৎ’ আমিই সৃষ্টি করি। মহাজনের পথের ত’

দরকার নাই, দরকার আমারই সম আশয়বিশিষ্ট জনগণের মনোনীত তথাকথিত পথের মহাজন। বহু পথের উর্বর ভূমিতে তাই বহু মহাজন গজাইয়া উঠিয়া থাকেন। টাকার মহাজন, ব্যবসায়ের মহাজন, রাজনীতি বা যুদ্ধ-নীতির মহাজন, এমন কি, শৌণ্ডিকালয়ে গমনপথের মহাজন-সংখ্যার ন্যূনতা কিছু দেখা যায় না। প্রয়োজন অনুসারে কখনও অফিসের বড়বাবু, কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, কখনও বা ধন-দুর্মদান ব্যক্তি সকলেই মহৎ আখ্যায় ভূষিত হইতে থাকেন। যখন গণমতের চক্ষু দিয়া দেখিতে চাই, তখন স্বদেশ-কর্ম্মী প্রভৃতি কন্মবীরগণ, হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতির দাতা দানবীরগণ অথবা দরিদ্র-নারায়ণ, দুঃস্থ-নারায়ণ-সেবাকারী ধর্ম্মবীরগণ আমাদের কাছে মহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হন। স্বার্থপোষণ না করিতে পারিলে এই মহত্ত্বের অবসান ঘটে। আজ মনের যে ছাঁচে ফেলিয়া মহৎ গড়াইলাম, কাল যদি মন বদলায়, তবে মহত্ত্বের আকারও বদলাইবে, আর যাহাকে মহৎ গড়াইয়াছিলাম, তাহাকে খারিজ করিতেও তিলমাত্র বিলম্ব হইবে না। অর্থের প্রয়োজন বোধ করিয়া মদ্যপ ইন্দ্রিয়াসক্ত জমিদারের নিকট উপস্থিত হই, যদি কিছু পাইবার আশা থাকে, তখনই তাহাকে ‘মহৎ’ বলিয়া স্তুতি করি, যদি না পাই অথবা পাইবার আর সুযোগ নাই জানিতে পারি, তখন গালাগালি দিই। পরীক্ষক বেশী নম্বর দিলে তাহার প্রশংসা করি, আবার কম নম্বর দিলে তাহারই তীব্র নিন্দা করি। গণমতের ব্যভিচার আরও প্রস্ফুট; আজ এক নেতাকে গাড়ী করিয়া বিরাট শোভাযাত্রাবাহিনীর মধ্যে পুষ্পমালা ভূষিত করা হইতেছে, দেশ-বিদেশ তাহার জয়গানের ঢঙ্কানিনাদে মুখরিত হইতেছে, সংবাদপত্র সব তাহার কীর্ত্তিগানে মাতিয়া উঠিতেছে, আবার অন্যমত প্রবল হইলে সেই দেশবাসীই তাহাকে ফুৎকার করিয়া দেশ হইতে নির্বাসিত করিতেছে। ইতিহাস এরূপ বহু দৃষ্টান্তের সাক্ষী।

অসতের কৃপাকটাক্ষে মহত্ত্বের সৃষ্টি ও প্রলয় জগতে সাধিত হইতেছে, চতুর্দিকে ইহাই দেখিতে পাই। মহত্ত্বের কৃপার বিচার করিবার আর অবকাশ কোথায়? মহত্ত্বের মহত্ত্বের প্রয়োজন আমাদের নাই, আমরা চাই কতটুকু আদায় করিয়া লইতে পারি তাহারই সুযোগ। কিন্তু জগতে বৈশ্যনীতি প্রবল। কড়ি না ফেলিলে তৈল মিলে না এবং কড়িবিহীন তৈল পাওয়া গেলেও তাহা গ্রহণ করিতে যাওয়া যেন জগতের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সৃষ্টি। তাই যেখান হইতে দেহ-মনের খোরাক কিছু আদায় হয়, শুদ্ধস্বরূপে জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে মনের পিচ্ছিলতার জন্যও তাহাকে মহৎ বলিয়া প্রশংসা করি। প্রয়োজনের যোগানদারীরূপ মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতে যদি সে কুণ্ঠিত হয়, তাই আগেই বলিয়া বসি যে, বিমুখ করিলেও তুমি ছাড়া আমার আর কোন গতি নাই অর্থাৎ আমার স্তুতিদ্বারাই তোমাকে ক্রীড়নক পুতুল বানাইয়া তোমার নিকট হইতে মহৎকৃপা (?) নিঙ্ড়াইয়া লইব। কখনও বা অন্যের পাতে দই দিবার প্রস্তাবের ন্যায় নিজের মহৎসজ্জা জাহির করিবার উদ্দেশ্যে অন্য লোককে মহৎ আখ্যা দিয়া থাকি।

নিজের থলি সকলে ভর্ত্তি করিবার জন্য ব্যস্ত, ফলে আমি যাহাকে মহৎ বলি অন্যে তাহাকে বলে না, এক দেশ যাহাকে মহৎ সাজাইয়াছে অপর দেশ তাহা স্বীকার করে না। পরিণামে জগদ্ব্যাপী এই মহা অশান্তির সৃষ্টি।

মহত্ত্বের নিকট প্রার্থী হইতে পারিলে সমস্ত কোলাহল দূর হয়, ইহাই প্রকৃত সত্য। কিন্তু কলি-কোলাহলের ত’ অন্ত নাই। কলি অর্থে বিবাদ। তাই যুগমাহাত্ম্য বর্দ্ধনকল্পে ধর্ম্ম,

কর্ম, দান, ধ্যান, ব্রত, তপ, এমনকি, সাধন-ভজন বা ভগবৎসেবানুষ্ঠান—সকলের ভিতরই আত্মপ্রকাশ করে মৎসর হৃদয়ের কলহরূপ বিষোদগীরণ। আমরা প্রার্থনা করি, প্রার্থনা পূরণদ্বারা তৃপ্ত হইব, কিন্তু জগতে তৃপ্তিরও কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কি ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, বিশ্বে মহদগণ বিচরণ করেন না অথবা তাঁহারা কৃপা বিস্তার করিয়া কামনার শান্তিদ্বারা তৃপ্তিবিধান করেন না বা সেরূপ শক্তি তাঁহাদের নাই।

মহতের নিকট মহত্বই প্রার্থনীয়। আমার বিকারগ্রস্ত মনের অর্থ বা প্রয়োজন-সরবরাহকারী কিছু মহৎ নহেন বা সেই প্রয়োজন দানও মহতের মহত্বের পরিচয় নহে। যাঁহারা মহতের নিকট প্রার্থী, তাঁহারা মহতের নিকট মহীয়ান্ হইতে পারেন না, কিন্তু আমরা প্রকৃত মহাজনের নিকট উপস্থিত হইলেও মস্তক অবনমিত করিতে পারি না। ক্ষুদ্র হইলেও মাপিবার বাসনা প্রবল হইয়া আরাধনা-বৃত্তিকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। আমাকে দান্তিক জানিয়াও তিনি অমায়ায় কৃপা করিতে উদ্যত হইলে সে কৃপা গ্রহণে তখন পরাজুখ হইয়া পড়ি। মহতের নিকট হইতে কৃপা আমার শিরে বর্ষিত হউক,—এ বিচারকেদূরে রাখিয়া আমার দিক্ হইতে যাহা প্রাপ্তব্য বলিয়া মনে করি সেই খেয়ালকে মহতের কৃপা বলিয়া চালাইতে চাই। মহৎ-কৃপা কি এবং মহৎকৃপাতে কি লাভ হয়, তাহা একমাত্র মহদগণই বলিতে পারেন।

আমরা আমাদের নীচতাদ্বারা মহত্বকে মাপিয়া লইবার জন্য মহতের নিকট উপনীত হই বলিয়া আমার ও মহতের মধ্যে ভবাক্রির বিরাট ব্যবধান গড়িয়া উঠে। অমহদগণের পক্ষে মহদগণকে চিনিতে পারা সম্ভব নহে। তবে মহতের করুণায় বা মহত্বের পরিচয় এই যে, তাঁহারা অমায়ায় কৃপাও বিস্তার করিয়া থাকেন এবং “নায়মাত্মা” এই শ্রুতিবচন অনুসরণে একমাত্র সেই অমায়ায় কৃপাদ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়।

নিঃশ্রেয়স দানই মহতের মহত্ব। একমাত্র নিঃশ্রেয়স দানের জন্যই তাঁহাদিগের মর্ত্যাদি সকল স্থান ভ্রমণ। যদি মহতের কৃপাপ্রার্থী হইয়া মহতের শিক্ষাদ্বারা চিত্তবৃত্তি সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বজাতীয়তা লাভ না করা যায়, তাহা হইলে নিঃশ্রেয়স লাভের পরিবর্তে কখনও প্রত্যক্ষ পরিহার, কখনও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি মহতের নিকট হইতে গ্রহণীয় হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শেষলীলায় মহতের সাক্ষাৎ অনুগ্রহ ও নিগ্রহের পরিচয় কিভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়াছেন। রামচন্দ্রপুরী নিজকে গুরুদেবের উপদেষ্টা অভিমান করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিতে গেলে মাধবেন্দ্রপুরীপাদ বলিলেন,—

কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।

মোরে ব্রহ্ম উপদেশে ওই ছার মূর্খে।।

এইরূপে গুরুশ্রয় পরিত্যাগের জন্য তাহার চিত্তমালিন্য উপস্থিত হইল। “এই যে মাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল। সেই অপরাধে ইহার ‘বাসনা’ জন্মিল।।” শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম-কীর্তনমুখে যাবতীয় সেবাকার্য্য করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে মাধবেন্দ্রপুরীপাদ আশীর্ব্বাদ করিলেন,—“তুষ্ট হএগ পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন। বর দিলা,—কৃষ্ণ তোমার হউক প্রেমধন।।” সেই হইতে ঈশ্বরপুরী ‘প্রেমের সাগর’। রামচন্দ্রপুরী হইল সর্ব্বনিন্দাকর।।” মহদনুগ্রহ নিগ্রহের সাক্ষী দুইজনে। এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজনে।। (ক্রমশঃ)

✠	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।	✠
ধর্মঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাসু যঃ।		নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।
✠	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	✠

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫০শ বর্ষ } ৮ শ্রীধর, গর্ভোদশায়ী, ৫১২ শ্রীগৌরান্দ
৩২ আষাঢ়, শুক্রবার, ১৪০৫, ইং ১৭/৭/৯৮ { ৫ম সংখ্যা

সানুবাদঃ

ইন্দ্রকৃত-শ্রীকৃষ্ণস্তুতি

বিশুদ্ধ-সত্ত্বং তব ধাম শান্তং তমোময়ং ধবন্ত-রজস্তমস্কম্।

মায়া-ময়োহয়ং গুণ-সম্প্রবাহো ন বিদ্যতে তেহগ্রহণানুবন্ধঃ ॥ ১ ॥

হে দেব, তোমার স্বরূপ অপরিবর্তনশীল, প্রচুর জ্ঞানময়, রজঃ ও তমোগুণ-সম্পর্কশূন্য, বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। অজ্ঞানানুবন্ধজনিত, মায়াময় এই গুণ-প্রবাহ (অর্থাৎ মায়ামিশ্রিত দেহ বা সংসার) তোমার নাই ॥ ১ ॥

কুতো নু তদ্ব্যক্তব ঈশ তৎকৃতা লোভাদয়ো যেহবুধ-লিঙ্গ-ভাবাঃ।

তথাপি দণ্ডং ভগবান্ বিভর্তি ধর্মস্য গুপ্ত্য খল-নিগ্রহায় ॥ ২ ॥

হে ঈশ, তোমার যখন অজ্ঞান এবং তৎকৃত দেহ-সম্বন্ধ নাই, তখন তোমাতে দেহ-সম্বন্ধ-ভূত ও অন্য দেহোৎপত্তির মূল-কারণস্বরূপ অজ্ঞানীর চিহ্ন লোভাদি দোষেরই বা সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি আপনি ধর্মরক্ষা এবং দুষ্ট-দমনের জন্য দণ্ড-ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

পিতা গুরুস্বং জগতামধীশো দুরত্যয়ঃ কাল উপান্ত-দণ্ডঃ।

হিতায় চেষ্টাতনুভিঃ সমীহসে মানং বিধুস্বন্ জগদীশ-মানিনাম্ ॥ ৩ ॥

জগতের পিতা, উপদেষ্টা, নিয়ন্তা কালরূপী আপনি শাসনভার গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র-ঈশ্বরভিমানিগণের গর্ববিনাশ এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য লীলাবতার-সমূহের প্রকট করেন ॥ ৩ ॥

যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশ-মানিনস্ত্বাং বীক্ষ্য কালেহ ভয়ামাশু তন্মদম্।

হিত্বার্য্য-মার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া ঈহা খলানামপি তেহনুশাসনম্ ॥ ৪ ॥

আমার ন্যায় যে-সকল মূঢ়জন নিজকে ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করে তাহারা ভয়কালেও আপনাকে নির্ভয় দেখিয়া নিজেদের অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক নিরহঙ্কারভাবে ভক্ত্যভাব অবলম্বন করে। অতএব আপনার এই গোবর্দ্ধন-ধারণলীলা খলব্যক্তিদিগের শিক্ষাস্বরূপ ॥ ৪ ॥

স ত্বং মমৈশ্বর্য্যমদপ্লুতস্য কৃতাগসন্তেহবিদুষঃ প্রভাবম্।

ক্ষন্তুং প্রভোহথাহসি মূঢ়চেতসো মৈবং পুনর্ভূমতিরীশ মেহসতী ॥ ৫ ॥

হে প্রভো, আমি আপনার প্রভাব অবগত নহি, সেইজন্যই ঐশ্বর্য্যগর্বে নিমগ্ন হইয়া অপরাধ করিয়াছি। আপনি এই অজ্ঞানের দোষ ক্ষমা করিতে সমর্থ। হে ঈশ! আমার যেন পুনরায় এরূপ দুর্ন্যাসি না হয় ॥ ৫ ॥

তবাবতারোহয়মধোক্ষজেহ ভুবোভরাণামুরুভার-জন্মনাম্।

চমূপতীনামভবায় দেব ভবায় যুত্মাচরণানুবর্তিনাম্ ॥ ৬ ॥

হে দেব! অধোক্ষজ, গুরুভারজনক এবং পৃথিবীর ভারভূত দৈত্যসৈন্যাধিপতিগণের বিনাশ এবং দাসজনের মঙ্গলবিধানের জন্যই এই মর্ত্যধামে আপনার কৃষ্ণরূপে অবতার হইয়াছে। অতএব এই সেবকের অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৬ ॥

নমস্তভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।

বাসুদেব কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ৭ ॥

আপনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বব্যাপক, জগন্নিবাস, বাসুদেব, সাত্বতদিগের অধিপতি, আপনাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধ-জ্ঞান-মূর্ত্তয়ে।

সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ব-বীজায় সর্ব্ব-ভূতাত্মনে নমঃ ॥ ৮ ॥

আপনি আপনার ভক্তদিগের ইচ্ছায় স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তথাপি আপনার শ্রীমূর্ত্তি বিশুদ্ধ-জ্ঞানময়। অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা আপনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া আপনি সর্ব্বরূপ, সকলের মূল কারণ এবং সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠ-নাশায়াসার-বায়ুভিঃ।

চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা ॥ ৯ ॥

হে ভগবন্, আপনি আমার যজ্ঞ নিবারণ করিলে আমি অতিশয় ক্রোধান্বিত ও অহঙ্কৃত হইয়া গোষ্ঠবিনাশের জন্য তীব্র বৃষ্টি ও বায়ুদ্বারা এইরূপ আচরণ করিয়াছিলাম ॥ ৯ ॥

ত্বয়েশানুগৃহীতোহস্মি ধবস্ত-স্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ ।

ঈশ্বরং গুরুমাত্মনং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১০ ॥

হে ঈশ, আমার প্রয়াস ব্যর্থ এবং গর্ব নষ্ট করিয়া আপনি অনুগ্রহই করিয়াছেন । সম্প্রতি আমি ঈশ্বর, গুরু এবং আত্মরূপী আপনার শরণাগত হইলাম ॥ ১০ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৬ পৃষ্ঠার পর]

৬৬। অসদ্গুরু ও অসচ্ছিত্য পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ ত্যাগ না করিলে ভক্তির কি প্রতিকূল্য সাধিত হয় ?

“গুরু-শিষ্যের নিত্য-সম্বন্ধ । পরস্পর যোগ্যতা যতদিন থাকিবে, ততদিন সেই সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না, গুরু দুষ্ট হইলে শিষ্য অগত্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, শিষ্য দুষ্ট হইলে গুরুও সে সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন ; না করিলে উভয়ের পতন সম্ভব ।”

—নামাপরাধ, ‘গুরুবজ্র’ হঃ চিঃ

৬৭। কি কি কারণে দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য ?

“দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটি কারণে তিনি পরিত্যাজ্য হইতে পারেন—
একটি কারণ এই যে, শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কার্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয় । ** দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ-সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদেবী হইয়া যাইতে পারেন—এরূপ গুরুকেও পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।”

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৬৮। ভারবাহিত্য ও কাপট্য কি ? তাহা ভক্তি-প্রতিকূল কেন ?

“যাহারা অধিকার বুঝিতে না পারিয়া দুষ্ট গুরুর উপদেশে উচ্চাধিকারের উপাসনা—
লক্ষণ অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা প্রবঞ্চিত ভারবাহী ; কিন্তু যাহারা স্বীয় অনধিকার অবগত হইয়াও উচ্চ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া সম্মান ও অর্থ-সঞ্চয়কে উদ্দেশ্য করে, তাহারাই কপট । ইহা দূর না করিলে রাগোদয় হয় না । সম্প্রদায়-লিঙ্গ ও উদাসীন-লিঙ্গদ্বারা তাহারা জগৎকে বঞ্চনা করে ।”

—কৃঃ সঃ, ৮। ১৬

৬৯। অপরিপক্বাবস্থায় কৃত্রিমভাবে বিধিমার্গ পরিত্যাগ করিলে কি অসুবিধা হয় ?

“অনেক দুর্বলচিত্ত পুরুষেরা বিধিমার্গ ত্যাগ করত রাগমার্গে প্রবেশ করেন । তাঁহারা অপ্রাকৃত আত্মগত রাগকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিষয়-বিকৃত রাগের অনুশীলনে বৃষভাসুরের ন্যায় আচরণ করিয়া ফেলেন ; তাঁহারা কৃষ্ণতেজে হত হইবেন ।”

—কৃঃ সঃ, ৮। ২১

৭০। মথুরাগত, দ্বারকাগত ও ব্রজগত প্রতিবন্ধকসমূহ ভজনের প্রতিকূল কি?

“যাঁহারা পবিত্র ব্রজভাগত হইয়া কৃষ্ণনন্দ-সেবা করিবেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নপূর্বক অষ্টাদশটি প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। * * * যাঁহারা জ্ঞানাদিকারী, তাঁহারা মাথুর-দোষসকল বর্জন করিবেন; যাঁহারা কৰ্ম্মাদিকারী, তাঁহারা দ্বারকাগত দোষসকল দূর করিবেন। কিন্তু ভক্তগণ ব্রজদূষক প্রতিবন্ধকসকল বর্জন করত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইবেন।”

—কৃঃ সং, ৮।৩০-৩১

৭১। ধ্যানাদি প্রেমোদয়ের অনুকূল না হইলে কি অনর্থ উৎপন্ন হয়?

“ধ্যান, ধারণা ও সমাধিকালে যদি জড়-চিত্তা দূর হইয়া যায়, অথচ প্রেমোদয় না হয়, তাহা হইলে চৈতন্যরূপ জীবের নাস্তিত্ব সাধিত হয়। ‘আমি ব্রহ্ম’—এই বোধটী যদি বিশুদ্ধ প্রেমকে উৎপাদন না করে, তবে তাহা স্বীয় অস্তিত্বের বিনাশক হইয়া পড়ে।”

—প্রঃ প্রঃ, ১ম প্রঃ

৭২। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি কিরূপ বিধি পালনীয়?

“গুরুদেব, বৈষ্ণব ও ভগবানের গৃহের দিকে পাদ-প্রসারণপূর্বক কখনও নিদ্রা যাইবে না।”

—‘শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ’—১৫, সং: তোঃ ৭।৩

৭৩। নাম-মাহাত্ম্যকে যাঁহারা অতিশ্রুতি জ্ঞান করে, তাহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হইবে?

“নামে যে-সকল লোক অর্থবাদ করেন, তাহাদের মুখদর্শন করা উচিত নয়। যদি ঘটনাক্রমে সেরূপ লোকের সহিত সম্ভাষণ ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ সবস্ত্রে জাহ্নবী-স্নান করাই উচিত। যেখানে জাহ্নবী নাই, সেখানে অন্য পবিত্র জলে সচেলে স্নান করিবে। তাহাও যদি না ঘটে, তবে মানস-স্নান করিয়া আত্মশুদ্ধির বিধান করিবে।”

—‘নামে অর্থবাদ’, হঃ চিঃ

৭৪। নামাপরাধিগণের সঙ্কীর্ণনে শুদ্ধবৈষ্ণব কি যোগদান করিবেন?

“যে সঙ্কীর্ণন-মণ্ডলে নামাপরাধিগণ প্রধান হইয়া কীর্ণন করে, তাহাতে বৈষ্ণবগণের যোগ দেওয়া উচিত নয়।”

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৭৫। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকর বাদ্যযন্ত্রাদি সঙ্কীর্ণনে ব্যবহার করা কি ভক্তির অনুকূল?

“খোল-করতালাদি প্রাচীন যন্ত্র ব্যতীত আধুনিক ও বৈদেশিক যন্ত্রসকল কীর্ণনে প্রবেশ করাইলে অনেক রঙ্গ হয় বটে, কিন্তু শ্রীভক্তিদেবীর ক্রমভঙ্গ হইয়া পড়ে। আজকাল আমরা বৈদেশিক ব্যবহারে এত মুগ্ধ যে, ভজন-প্রণালীর মধ্যেও তাহাকে প্রবেশ করাইতে যত্ন করিয়া থাকি।”

—‘কলিকাতায় কীর্ণন’, সং: তোঃ ১১।৩

৭৬। অপক্ক ভেকধারীর সংখ্যা-বৃদ্ধি আশঙ্কাজনক কেন?

“ভেকধারী বৈষ্ণব-সংখ্যা বাড়িলে অবশ্যই আশঙ্কা করিতে হইবে যে, ইহাতে কলির কোনপ্রকার দুষ্টকার্য আছে।”

—‘বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নিম্নলি হওয়া চাই’, সং: তোঃ ৫।১০

৭৭। গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে কি সঞ্চয় কর্তব্য?

“গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়-মাত্রই করিবেন না।”

—‘অত্যাহার’, সং তোঃ ১০।৯

৭৮। গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে কি মঠ, আখড়া প্রভৃতি আরম্ভ ভক্তির অনুকূল?

“গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠ-আখড়া ইত্যাদি করিবেন না, তাহাতে গৃহ-ব্যাপারাদি হইয়া পড়ে।”

—‘সাধুবৃত্তি’, সং তোঃ ১১।১২

৭৯। গৃহত্যাগীর স্থূল ভিক্ষা কি ভক্তির অনুকূল?

“গৃহত্যাগী বিষয়ীর নিকট স্থূল ভিক্ষা করিয়া খাইবেন না এবং অর্থ লইয়া বৈরাগী নিমন্ত্রণ করিবেন না।”

—‘সাধুবৃত্তি’, সং তোঃ ১১।১২

৮০। গৃহত্যাগীর রাজা, বিষয়ী ও স্ত্রীদর্শন কি সেবানুকূল?

“গৃহত্যাগী পুরুষ রাজা প্রভৃতি বিষয়-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শন করিবেন না।”

—‘সাধুবৃত্তি’, সং তোঃ ১১।১২

৮১। গৃহত্যাগীর কি স্বগ্রামে বাস করা উচিত?

“সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহত্যাগী ব্যক্তি কুটুম্বের সহিত নিজ গ্রামে বাস করিবেন না।”

—‘সাধুবৃত্তি’, সং তোঃ ১১।১২

৮২। গৃহত্যাগীর স্ত্রী-সন্তাষণ দূষণীয় কেন?

“গৃহত্যাগী নির্বৈদ-প্রাপ্ত বৈষ্ণবদিগের পক্ষে স্ত্রী-সন্তাষণ—বিপুল পতনের হেতু।”

—গৌঃ মঃ স্তঃ ৬২

৮৩। দুষ্টগুরুর উপদেশে যাহারা অপক্লাবস্থায় রাগমার্গ অবলম্বন করে, তাহাদের গতি কি?

“দুষ্ট গুরুগণ রাগাধিকার বিচার না করিয়া অনেক ভারবাহী জনগণকে মঞ্জুরী-সেবন ও সখীভাব-গ্রহণে উপদেশ দিয়া পরমতত্ত্বের অবহেলারূপ অপরাধ করায় পতিত হইয়াছেন। যাহারা ঐ সকল উপদেশ-মত উপাসনা করেন, তাহারাও পরমার্থ-তত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে পড়িয়া থাকেন। যেহেতু ঐসকল আলোচনায় আর গভীর রাগের লক্ষণ প্রাপ্ত হন না। সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশক্রমে তাহারা পুনরায় উদ্ধার পাইতে পারেন।”

—কৃঃ সং, ৮।১৫

৮৪। সমস্ত পাপের মূল কি?

“পরের উন্নতি সহিতে না পারার নামই—মাৎসর্য। ইহাই সমস্ত পাপের মূল।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৫। স্ত্রী-লাম্পট্যটিকি?

“স্ত্রী-লাম্পট্য একটা বৃহৎ পাপ।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৬। প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্যকে কি বলিয়া জানিতে হইবে?

“প্রতিষ্ঠা-লাম্পটাক্রমে মানবের কার্যসকল নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে। অতএব উক্ত লাম্পট্যকে পাপ বলিয়া দূর করিবে।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৭। জাগতিক শাস্তি বা অশান্তির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া গৃহত্যাগ কি শাস্ত্রানুমোদিত?

“অনেকে গৃহে কষ্টবোধ করিয়া অথবা অন্য কোন উৎপাত-প্রযুক্ত গৃহস্থধর্ম পরিত্যাগ করেন, সে-কার্য্যটি পাপ-কার্য্য।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৮। ‘পাপ’ কি কি নামে পরিচিত?

“গুরুতা ও লঘুতা অনুসারে ‘পাপ’, ‘পাতক’, ‘অতি-পাতক’ ও ‘মহা-পাতক’ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৯। জাড্য ও আলস্য কি শ্লাঘ্য?

“জাড্য ও আলস্য পাপ-মধ্যে পরিগণিত, জাড্যশূন্য হওয়া পুণ্যবানের কর্তব্য।”

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

চিৎ ও অচিৎ জগতের ধর্মের সমতা বাহ্যদর্শনে প্রতীতির বিষয় হয়। কিন্তু একটি বস্তু, অপরটি ছায়া। আয়নার মধ্যে যদি একটি ছায়া পড়ে, আর শিশু যদি তাহা ধরতে যায় তাহলে সে বস্তুটিকে ধরতে পারবে না। আয়নায় হাত ঠেকে যাবে। সংসার is like Tantalus' cup. বস্তুদর্শন না করে বস্তুর প্রতিফলনের দিকে ধাবিত হলে অসুবিধা হইয়া যাবে। সেজন্য আদৌ শ্রুতির শ্রবণ।

“সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তীর্ণোন্ন্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।

লীলাকথানিষেবণমন্তরেণ পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবর্দিতস্য।।”

এই দুস্তর সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে হইলে কৃষ্ণলীলারস পান একমাত্র প্রয়োজন। তাহা পান করিলেই ব্যামোহ কাটিয়া যাইবে। রসই আমাদের আলায়। বেরসিক হইলেই অসুবিধা হ'বে। সংসারটা রসের মত দেখায় বটে কিন্তু উহাতে রস নাই। অবস্থাভেদে রস বিবিধ। সাধন ভক্তিরস, ভাবভক্তিরস এবং প্রেমভক্তিরস। প্রেমই প্রয়োজন।

বেদ বললেই চম্কে উঠবার প্রয়োজন নাই। বেদান্তের সুষ্ঠু তাৎপর্য্য কৃষ্ণলীলারস পান। ডাঁশা লোকেরা বেদান্তের সুদর্শন বুঝে উঠতে পারে না। “সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম” বলিতে জড়জগৎকে ব্রহ্ম মনে করে। কিন্তু ব্রহ্ম চেতন বস্তু। তাহা মায়িক জগতের অন্তর্গত কোন বস্তু নহে।

“এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাশ্বনঃ।

অম্বয়-ব্যতিরেকাত্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা।।”

ইহাতে অম্বয় ও ব্যতিরেক দুইটি শব্দ পাই। তাহা সন্তোগ ও বিপ্রলম্বরূপে অন্য ভাষায় কথিত হয়। জড়াভিনিবেশে অম্বয়বিচারে সন্তোগ। জড়সন্তোগে সর্বনাশ। বিপ্রলম্ব-

বিচারে জড়ত্যাগ ব্যতিরেকভাবে অভিধেয়। অপ্রাকৃত জগতের শ্রেয়োজ্ঞান থাকিলে জড়জগতের প্রয়োজ্ঞান স্থান পায় না। গোলোকের অবস্থান এখানে ব্যতিরেক ভাবে। জড়নিরসন কার্যো উপনিষদ্ ব্যস্ত। জড়ভোগ ও জড়ত্যাগদ্বারা জড়ের উৎপাটন হয় না। চেতনের ধর্ম আবশ্যিক। পুণ্যাদি ও সুখ-সমৃদ্ধির চেষ্টা অনিত্য সংসারে জীবের মোহ জন্মাইয়া সংসৃতি-বহনে গাধা করিয়া তুলে। কৃত্রিম আসক্তি বা বৈরাগ্যদ্বারা উপকার হয় না। অপ্রাকৃত রাজ্যের বৈচিত্রের সহিত জড়জগতের বিচিত্রতার সমতা আছে। এখানে বদ্ধজীবের ভোগতাপর্যাপরতা ও তথায় মুক্তজীবের সেবা-প্রবৃত্তি বর্তমান। সেখানকার প্রকৃত বৃক্ষ-লতাদির প্রতিফলন এখানে। দুর্গাই ছায়া। ছায়াতে প্রতিফলিত বস্তুকে বাস্তব বলিয়া ধারণা করিতে যাওয়া মূঢ়তা। ইহজগতে সমাবর্তন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ—বালস্বভাবে বস্তুবৈচিত্র্যের প্রতিফলনে বঞ্চিত হইয়া যাওয়া। “যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধন্তে সবিশেষমেব।” জড়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি না বুঝিয়া অমঙ্গলকেই বরণ করেন। মিছা-ভক্তেরা শিশ্নোদরপরায়ণ।

“জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়।

শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কথা কর্ণে প্রবিষ্ট না হইলে অবৈধ সংসারী হইয়া যাইতে হয়। “তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্। শাদে পরে চ নিষগতং ব্রহ্মণ্য-পশমাশ্রয়ম্।।” ভোগী বা ত্যাগীর কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে হ'বে না। অসৎ বীজ অস্তিত্ব ধ্বংস করবে। ছায়ার পশ্চাতে দৌড়াইয়া আমাদের নাস্তিকতা হইয়া যাইবে।

“নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবন্তুজনোন্মুখস্য পরং পারং জিগমিষোর্বসাগরস্য।।”

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যাসাধু।।”

ত্রিপাদ বিভূতি গোলোক-বৃন্দাবনাদি চেতন বস্তু। সর্বক্ষণ কৃষ্ণকথাতেই সংসার-নিবৃত্তি। কৃষ্ণকথাও সংসারের কথা বটে, কিন্তু তাহা জড়সংসারের কথা নহে। আমাদের নিত্য বাসস্থান কুণ্ডতীর, যমুনাতীর, ব্রজভূমি। কুণ্ডতীরে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ-কীর্তনে দুর্বুদ্ধি চলিয়া যায়। সম্ভোগবিগ্রহ কৃষ্ণ সমস্ত ভোগ্য পদার্থের একমাত্র মালিক; তাঁহার বিপ্রলম্ববিগ্রহ কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য বিচার ধ্বংস করলে ‘গৌরনাগরী’ হ'য়ে পড়ে। সুতরাং তাঁহাদের উভয়ের পার্থক্য বিশেষভাবে বুঝিয়া রাখা দরকার। শ্রুতির কৃপা যাচনীয়। তজ্জন্ম গোপীর শরণাগতি প্রয়োজনীয়। শ্রুতির অনুসরণের পরিবর্তে শ্রুতির ছায়ার অনুসরণেই অমঙ্গলের আবাহন হইয়া থাকে। বোকা লোকেরা মনে করে যে, মূর্থতাই বৈষ্ণবধর্ম। তাহা হইতে প্রাকৃত সহজিয়ার উৎপত্তি। শ্রুতির একমাত্র লক্ষ্য ও কার্য—গোপীর পদকৈঙ্কর্য; চেতনতার অর্থ—গোপীর পদরেণু লাভ। জড়মন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে হইবে। পার্থিব চিন্তাস্রোত নিরস্ত হইতে পারে, যদি আমরা উপদেশামৃতের “বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগম্” ইত্যাদি শ্লোক স্মরণ রাখিয়া কৃষ্ণসেবাতৎপর হইয়া সর্বদা কৃষ্ণনুশীলনে রত থাকি। ঐরূপ হইলেই গোস্বামী হইবার যোগ্যতা হয়। নতুবা গোদাস হইয়া পড়ি। শ্রুতিকে কখনও উপেক্ষা করিতে হইবে না। বরং শ্রুতিই সর্বদা অনুসরণীয়। ভোগবারি হইতে জীবমীনের উদ্ধারের জন্য মৎস্যাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেইজন্যই তাঁহার বেদোদ্ধার। মৎস্যাবতার বীভৎসরসের জুগুপ্সারতির বিষয়।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়েবা-
 স্বাদ্যো যেনাদ্রুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
 সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
 ভুত্বাবাচ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।

জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতার। তিনি জীবকে নামপ্রেম প্রদান করিয়া তাহাকে উন্নত উজ্জ্বলরস বিতরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজেরও কিছু কার্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ হওয়ায় আশ্রয়-বিগ্রহের প্রীতির মহিমা অনুভব করিতে পারেন নাই। শ্রীরাধার প্রণয়ের মহিমা কীদৃশ, তাহা আশ্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতার। বিষয় ও আশ্রয়ের আনন্দের পার্থক্য আছে। আশ্রয়ের আনন্দের অধিকতর উজ্জ্বল্য। জড়জগতে ভোগি-সম্প্রদায় বিষয়-জাতীয় বিচারে অবস্থিত হন। তাহাদ্বারা তাঁহারা বাস্তব-ভোক্তা না হওয়ায় ভোক্তার অভিমান করিতে গিয়া অমঙ্গলে পতিত হন।

“কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।

মনস্বী নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।”

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের বৈচিত্র্য। মূল শক্তি এক। তাহার বিবিধ কার্য—হ্লাদিনী, সন্धिৎ ও সন্ধিনী। সন্ধিনীশক্তি ভগবদ্ধাম ও তাঁহার পরিকরসমূহ প্রকট করিয়া ভগবানের সেবাকার্যে নিযুক্ত। হ্লাদিনী শক্তি নিত্যই ভগবানের আনন্দ বিধান করিতেছেন। সন্धिৎ বা জ্ঞানবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্। তিনি জ্ঞাতরূপে সকল শক্তির সেবা গ্রহণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছেন। জ্ঞানময় বস্তু জ্ঞেয়ের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যবর্তী স্থান সন্ধিনী। পরস্পরের মধ্যে সন্ধিনীশক্তির প্রকটবিগ্রহ বলদেবপ্রভু ও শ্রীরাধার কনিষ্ঠা ভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী। বলদেব প্রভু সন্ধিনীশক্ত্যধিষ্ঠিত ভগবদ্বিগ্রহ। হ্লাদিনীশক্ত্যধিষ্ঠিত শক্তিবিগ্রহ রাধিকা তদীয় কায়বৃহসহ নিত্য বর্তমান। প্রভু বলদেব বিষয়বিগ্রহ হইলেও ভৃত্যজাতীয়। আশ্রয়ের বিভিন্নাংশ বদ্ধ ও মুক্ত জীবসমূহ। একমাত্র গোপী বলিলে শ্রীরাধিকাকে বুঝায়।

“সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিশেষরত্যন্তবল্লভা।” গোপীগণ বলিলে তদীয় কায়বৃহকে বুঝায়। মঞ্জরীগণ সেবিকা। প্রিয়নন্দসখীগণ তদীয় সমা। তাঁহাদের মধ্যে প্রিয়তার তারতম্যে ভেদ আছে। কৃষ্ণের রসপোষিকা ও বার্ষভানবীর রসপোষিকা বিভিন্ন পর্যায়ে গোপীগণ লীলা-পুষ্টিবিধান করিতেছেন। কতকগুলি গোপী মধুররসাস্বাদনকারী রাগাওয়িকা-বিগ্রহ। তদীয়ানুসরণকারিনীগণ রাগানুগা। নিত্যানন্দাধৈত বিষয়বিগ্রহরূপ কায়বৃহের অন্তর্গত। আশ্রয়জাতীয় বস্তু বিষয়ের ভাবে অবস্থিত শ্রীনন্দমহাশয় ও শ্রীদামাদি সখাগণ। শ্রীনিত্যানন্দই শ্রীবলদেব। তিনি রাধাকৃষ্ণ দেওয়ার মালিক। অভিমন্যু প্রভৃতির বুদ্ধির বিপর্যয়ে যে পতিত্বের অভিমান, তাঁহার বাস্তব-সত্তা চেতন রাজ্যে নাই। তথায় কেবল লীলাপুষ্টির জন্য তাহার ভাবমাত্র বর্তমান। যেমন কাঠের সিংহের কোন বিক্রম নাই, কিন্তু তথাপি সিংহ-ভাবের উদয় করায়, তদ্রূপ। ইহজগতে পারকীয়-ভাব রসের উৎকর্ষ বিধান করিলেও তাহা ঘৃণা জুগুপ্সারতির বিষয় হয়। কিন্তু গোলোকে ভোক্তা একমাত্র ভগবান্ হওয়ায় সেই জুগুপ্সার ভাব তথায় আদৌ নাই। বরং উহাই উন্নত উজ্জ্বলরস। মূঢ় ব্যক্তিগণ রাধাকৃষ্ণবিষয়ের আলোচনাকালে তদীয় লীলা নীতিবিগর্হিত মনে করিয়া রাম-সীতার অর্চনকেই শ্রেষ্ঠ মনে

করেন। তাঁহারা মনে করেন,—“নাভির উদ্ধারদ্বারাই ভগবৎসেবা সম্ভব। নিম্নাঙ্গ কেবল জীবের ভোগের জন্য বর্তমান। ভগবৎসেবায় উহার কোন প্রয়োজন নাই।” কিন্তু তাঁহারা জড়চিত্তাশ্রোতে চালিত হইয়াই ঐপ্রকার বিচার করেন। অঙ্গ বলিতে জীবের চিন্ময় অঙ্গকেই লক্ষ্য করিতেছে। শুদ্ধচেতন নিত্যসেবাপর। তাহার কোন অংশ নিজভোগে চালিত হয় না, এবং তাহা পরম নিৰ্ম্মল। সেই চিন্ময়দেহের সৰ্ব্বাঙ্গদ্বারাই সৰ্ব্বতোভাবে ভগবৎসেবা সম্ভব।

“দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।

সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

সেই দেহ হয় তার চিদানন্দময়।

অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণচরণ ভজয় ॥”

শ্রীবার্হতানবীদেবী পূর্ণ ভগবানের পূর্ণ শক্তি। তিনিই পূর্ণভাবে তাঁহার সেবাবিধানে সমৰ্থ। তাঁহার আনুগত্যে অনঙ্গমঞ্জরী এবং অন্য সখীগণ ভগবৎ-সেবা বিধান করিতেছেন। জীব সেই অনঙ্গমঞ্জরীর শরণাগত হইয়া নিম্নপটে সেবাপর হইলে তাঁহার কৃপালাভ করিয়া সিদ্ধদেহ পাইতে পারেন। তৎপূৰ্বে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার বিচারযোগ্যতা লাভ হয় না, এবং তাহার আলোচনা করিতে গিয়া বদ্ধজীব অধঃপতিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দর সেইজন্য তাহাদিগের উদ্ধারের বিধান করিয়াছেন। তিনি উদার। জীবের দুৰ্বলতা দর্শনে তাহাদিগকে অনর্থ হইতে মুক্তি প্রদানের জন্য আচার্য্যলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশানুযায়ী ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইলে জীবের ক্রমশঃ মঙ্গল হইবে।

মহৎ-কৃপা

[পূৰ্ব্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৬০ পৃষ্ঠার পর]

মহতের নিকট হইতে কৃষ্ণপ্রেম-লাভই মহতের কৃপালাভ। যেখানে এই আশীর্বাদের অভাব, সেইখানেই কৰ্ম্মপর বা জ্ঞানপর আশ্রয়বিদেষরূপ কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিহীন নির্বিশেষবাদ আসিয়া জীবহৃদয় গ্রাস করে। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ প্রথমে ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসনাদি বর্ণন করিয়া পরে বলিতেছেন,—“অনন্তরং পূৰ্ব্ববচ্ছ যদি মহৎকৃপাবিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিভাবতি, তদা বিশেষোপলব্ধিঃ ভবেৎ নচেৎ নির্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মানুভবেন তল্লীনো ভবতি।” রামচন্দ্রপুরীর চরিত্রে দেখা যায়, বিরট ধারণাদি যৌগিক পন্থাসমূহ অবলম্বন না করিলেও তিনি উন্নত উজ্জ্বল রস-প্রচারের মূল পুরুষ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট হইতে কৃষ্ণপ্রেমলাভে বঞ্চিত হইয়া কেবল শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানই সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মহতের কৃপাদৃষ্টি যেখানে নাই, সেখানে ভগবৎপ্রীতির নামে যাহাই করা হউক না কেন—মুখে ‘মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রম্’ আওড়াইয়া কণ্ঠস্বরকে সপ্তগ্রামে তুলিয়া চৈচাইলেও তিনি নিজেও মায়াবাদী ভিন্ন আর কেহ নহেন। ভক্তি-বৈশিষ্ট্য-বিচারের প্রতিকূল হওয়াই মায়াবাদ। সাধনাঙ্গসমূহ সম্পূর্ণরূপে কেবলমাত্র মহতের কৃপাদৃষ্টিক্রমেই সাধিত হয়,—এই বুদ্ধির বিপর্যায়ক্রমে আমার সেবা (?) দ্বারা মহতের বা শ্রীগুরুদেবের তাক্ লাগাইয়া দিব বা

তঁাহার উপর টেকা দিব অথবা মান-সম্মানাদি আদায় করিয়া লইব, এই বিচার যেখানে প্রবল, সেখানে সকল সম্ভার আশ্রয়বিগ্রহের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার বিচার থাকে না। তখন ‘সর্ব্বং গুরবে দদ্যাৎ’ ভুলিয়া ভাগের কড়ি গোছাইবার চেষ্টাই বলবতী হয়। আমার ভাগ বাঁটোয়ারা অনুযায়ী গুরুদেব পাইবেন, ইহাই ত’ নিবির্ভরশেষ চিন্তা।

মহদগ্গণ সর্ব্বদাই কৃষ্ণভক্তি যাজন করেন। সেই ভক্তিয়াজনের অনুকূল সেবা-বরণই ‘কর্ম্মণা মনসা গিরা’ শ্লোকোদ্দিষ্ট ক্রিয়াসকল। মহতের কৃপাকটাক্ষদ্বারা আমাদের স্বতন্ত্রতা বা বদ্ধতা নিয়মিত হইতে পারে। আমাদের ঈহা অর্থাৎ চেষ্টা, কর্ম্ম, মন ও বাক্যকে যদি সর্ব্বক্ষণ অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারীর কৃপাদৃষ্টিতে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, তবেই কৃষ্ণ-কার্য-তোষণপর কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা মহতের মনোহীষ্ট-পূরণের সেবা-সাহায্য হইতে পারে। নতুবা মহতের কৃপাশক্তিদ্বারা মহৎকে সুখী করিবার চিন্তা দূর করিয়া স্বতন্ত্রতা বা মায়াপরতন্ত্রতার বশে “লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ” দশাই জীবের লাভ হয়।

নিখিল জীবাত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন বলিয়া একমাত্র মহদগ্গণই প্রত্যেক জীবের প্রতি অনুকূল স্বভাববিশিষ্ট। মহতের পাষাণদলন, মনোব্যাসঙ্গ ছেদন প্রভৃতি আচার্য্য-লীলা প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রতি পরম অনুকূলতা বা পরম দয়ার পরিচয়। প্রতিকূল-স্বভাব বলিয়া আনুকূল্যকেই আমরা প্রতিকূলরূপেই দেখি। শ্রীহরি বিশ্বাত্মা হইলেও কংসের নিকট কালান্তক যমসদৃশ। মহৎ বা মহাভাগবতগণ প্রতিকূল চিত্তকে সংশোধিত করেন কেবলমাত্র গুরুবুদ্ধিতে তঁাহাকে কীর্ত্তন অভিসারে অনুরজ্যা করাইবার জন্য। তঁাহার দিক্ হইতে সংশোধনের বিচার নাই, তিনি প্রগতির বা ব্রজের অনুকূল রূপচর্য্যায় পারঙ্গতি শিক্ষা দেন; সকল বিরূপ কুরূপ সরাইয়া দিয়া আত্মার নির্ম্মলা বৃত্তি জ্ঞানকর্ম্মাদি অনাবৃত্তা পরমা ভক্তিশোভাই বৃদ্ধি করেন। যেখানে জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতাকে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র মহতের স্বতন্ত্রতার অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত করিতে বা মায়াপরতন্ত্রতার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া প্রকৃষ্ট আত্মগত স্বতন্ত্রতা লাভের পক্ষপাতী হন না, সেখানেই মহতের কৃপা বঞ্চনারূপে প্রকাশ পায়। বঞ্চনাও মহতের অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন। মধ্যম ভাগবতাদিকারী মহদগ্গণের ভগবানে প্রেম ও তদধীনে মৈত্রীর ন্যায় অজ্ঞ ও বিদ্বেশীর প্রতি কৃপোপেক্ষাও কৃষ্ণ ও তদীয় জীবের প্রতি অনুকূল অনুশীলনের পরিচয়।

যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনুকূল্য বরণ করেন, মহদগ্গণ তঁাহারই অনুকূলতার পরিপূষ্টি বিধান করিয়া কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন। মহতের আশ্রয়ে কৃষ্ণানুশীলন করিতে গিয়া যাঁহারা মহতের অনুকূলে স্বীয় চিত্তবৃত্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করেন না বরং আপনার জড় স্বতন্ত্রতার দ্বারা মহতের মহত্ত্বকে নিয়মন করিবার ধৃষ্ট বুদ্ধি পোষণ করেন, তঁাহারা বিষয়-বিগ্রহের অনুকূলে গতিবিশিষ্ট আশ্রয়-বিগ্রহকে বিষয়-বিগ্রহের পরিবর্তে আপনার মতের অনুকূলে চালিত করিতে চান অর্থাৎ আশ্রয়ের আশ্রিত না হইয়া সেবা হইতে চান। ইহা অহংগ্রহোপাসনা। মহদগ্গণ সেই অহংগ্রহোপাসনাকে স্তব্ধ করিবার জন্যই তৎপ্রতিকূল চিন্তাশ্রোতের বহুমানন করেন। ইহাতে একদিকে তিনি যেমন “যে যথা মাম্” এর সঙ্গতি বিধান করেন, অপরদিকে তঁাহার সংসার ক্ষয় না করিয়া পুনঃ পুনঃ এই মায়িক বিশ্বের

ভোক্ত-অভিমানের অবসর প্রদান করেন। মায়ায় লাগি খাইয়া কোন জন্মে তাহার এই অহংগ্রহোপাসনা বা অসৎ মনোরথের ধূর ভাঙ্গিতে পারে। ইহা মহাভাগবতের কৃপারই লক্ষণ। বহিঃসুখতার বহুমাননকে সজ্জনগণ ভুল বোঝেন না, তজ্জন্য শরণাগতি শিক্ষামূলে মনোব্যাসঙ্গ-ছেদনাদি দ্বারা সেই মহদগণই আবার অমায়ায় কৃপা বিস্তার করেন। সেই কৃপাই প্রার্থনীয়—যে কৃপায় অবধিকতা বিরাজমান; সেই কৃপালাভশায় মহতের পদধূলিদ্বারা মস্তক অভিষিক্ত করিতে পারিলেই কৃষ্ণলাভ হয় এবং সংসার ক্ষয় হয়।

পূর্ণ শরণাগতি গ্রহণ করিয়া নিজেকে মহতের পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ জ্ঞান করিতে পারিলেই সকলের সকলপ্রকার সুবিধা হইয়া থাকে। মহদগণ যাহাকে বঞ্চিত করেন, তাহাকে তাঁহার কৃপা হইতে বা কৃষ্ণ হইতে বিমুখ করান না। মহদগণ সর্বদা কৃষ্ণেন্মুখ বলিয়া প্রত্যেক আচরণের মধ্য দিয়া প্রত্যেক জীবকে উন্মুখতা শিক্ষা দেন। যাঁহারা মহতের নিকট গিয়া তাঁহার অনুবর্তিতাকে জীবাত্ম অর্থাৎ ভজনের প্রাণ বলিয়া গ্রহণ করেন না, মহদগণ বঞ্চনাদ্বারা পরীক্ষা করিতে চাহিলে ‘স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে’ বলিতে চান না, তাঁহারা নিজেরাই নিজেকে বঞ্চিত করিবার জন্য দিব্যরত্ন ছাড়িয়া কাচতুল্য আশিষসমূহ গ্রহণ করেন। যাহারা বিমুখ তাহারা চিরকালই বিমুখ, তাহাদের আর পুনরায় বিমুখ হইবার অবকাশ কোথায়? তাঁহার মনে করিতে পারেন, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহতের নিকট থাকি, আমি তাঁহার মনোহীষ্ট-পূরণে ব্রতী, আমি তাঁহার চিন্তের সৌখ্যবিধান করি, তিনি আমার মতের অনুকূল ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা মহতের মহত্ব হইতে লক্ষ্যকোটি যোজন দূরে অবস্থিত; নিজের মনের আবরণের কাছ হইতেই তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, মহতের নিকট যাইতে পারে নাই। রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীপাদের ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য, বাহ্যতঃ তিনি পুরীপাদের নিকট আগমন করিয়া শেষলীলার সময় সঙ্গী হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার চরিত্রে এই দেখা যায় যে, তিনি মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কখনও দর্শন পান নাই। যদি মুহূর্তকালও কাহারও মহতের সঙ্গলাভ হয়, তখন মহতের অনুবর্তিতাই তাঁহার জীবাত্ম হয়। মহতের কৃপায় মহত্ব লাভ হইলে তখনও অনুগামী মহদগণ তাঁহাদের অগ্রণীর অনুব্রজ্যা করিয়া মহতের অনুকূল কৃষ্ণসেবাতেই যত্নপর হন। ইহাই মহৎকৃপা-প্রাপ্তির লক্ষণ। তখন আর মহতের মহত্ব ওজন বা যাচাই করিবার জন্য মানদণ্ড বা তাম্রলিপির প্রয়োজন হয় না। যাঁহারা বঞ্চিত হইতে চান, তাঁহারা নিজেকে মহৎকৃপাপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করিলে বা প্রচার করিতে চাহিলে মহদগণও তাহাতে সায দিয়া থাকেন; কিন্তু তখনই মহতের বাক্যে তাঁহার প্রকৃত কৃপালব্ধকে জানা যায়, যখন তিনি সেবককে কেবল আপনার প্রিয়রূপে নহে, পরন্তু বিষয়-বিগ্রহ অথবা বিষয়-আশ্রয় মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরেরও প্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মহদগণ নিত্যকালই মহান্ বা ভূমা বস্ত। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভরত ও সিন্ধু-সৌবীরাধিপতি রত্নগণের প্রসঙ্গে মহতের পদরজঃ প্রভাবে ইন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত অধোক্ষজ-জ্ঞান লাভ হয়, ইহাই জীবকে জানাইতেছেন (ভাঃ ৫।১২।১১) :—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরবত্বহির্ব্রহ্ম সত্যম্।

প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥

“বিশুদ্ধ পরমার্থভূত এক বাহ্য্যভ্যন্তরশূন্য ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক ও নির্বিবাক্য যে জ্ঞান, তাহাই সত্য এবং তাহাই ভগবচ্ছন্দ-সংজ্ঞ হইয়া থাকে। সুধীগণ এই জ্ঞানকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন।” ইহাই কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান, মহতের কৃপাদ্বারাই ইহা লাভ হইয়া থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ অধোক্ষজ ও কেবল বা অপ্রাকৃত সেবাও যে মহতের বিন্দুমাত্র পদধূলি স্পর্শে লাভ হয়, তাহাই অমায়ায় কৃপাদ্বারা নিখিল জীবকুলকে জানাইয়াছেন,—“আমার গুরুপাদপদ্মের পরাগের একটু কণা ছড়িয়ে দিলে তোমাদের মত কোটি কোটি লোক উদ্ধার লাভ করবে। এমন কোন পাণ্ডিত্য জগতে নাই—এমস কোন সম্বিচার চতুর্দশ ভুবনে নাই—কোন মনুষ্য দেবতায় নাই—যা নাকি আমার গুরুপাদপদ্মের ধূলির একটী কণা হ’তে ভারী হ’তে পারে।” এই পাণ্ডিত্য হ্লাদিনীর আনুগত্যে সম্বেনের বা অপ্রাকৃত সম্বিচ্ছন্তির সেবা-কৌশল ; জাগতিক বিদ্যা বা বুদ্ধিমত্তা নহে। মহতের পদধূলি এত বড় ভারী জিনিষ। যাঁহারা নিজেকে মহতের পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের অপ্রাকৃত নিঃস্বপ্নের দণ্ড প্রাকৃত মাৎস্যর্যোদ্ধৃত দণ্ডকে স্তব্ধ করিয়া মহতের অসমোদ্ধিত হই প্রকাশ করে। ইহাই মহতের প্রকৃষ্ট কৃপারই পরিচয়। এইরূপ অমায়ায় কৃপাপ্রকাশ করিবার জন্য মহত্তম শ্রীগুরুপাদপদ্ম অন্য ভাষাও ব্যবহার করেন, তবে সকল প্রকার ভাষা একই তাৎপর্য্যপূর্ণ। “আমাদের ওই জরদগবতুল্য দেহটাকে আমরা সপার্বদ শ্রীকৃষ্ণচেতন্যের সঙ্কীর্ণ-যজ্ঞে আচ্ছাদিত দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি। আমরা কোনপ্রকার কস্মবীরত্ব বা ধর্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্বস্ব। ভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হ’বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হ’বেন। আপনাদের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতি ব্যক্তি র’য়েছেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই,—

“আদাদনস্তুং দত্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।

শ্রীমদ্রূপপদাভ্যোজ-ধূলিঃ স্যাৎ জন্ম-জন্মনি।।”

‘এ সকল কথা কোনও না কোনদিন আমরা বুঝতে পারব’ যদি সত্যই মহতের অমায়ায় কৃপা পাইবার আশায় মহতের অনুকূল সেবা-ব্রতে কায়, মন ও বাক্য উৎসর্গ করিতে পারি। নতুবা সকলই বিরোধপূর্ণ বিপ্লবময়ী বাণী বলিয়া মনে হইবে।

অন্য ও ব্যতিরেক বিচারে কৃপা ও বঞ্চনা উভয়ই মহতের কৃপাবিস্তার। তবে প্রত্যেক শুশ্রূষ সারগ্রাহী ব্যক্তিমাতেই তিরস্কার, পুরস্কার, আশীর্ব্বাণী, প্রশংসাবাদ, সংশয়-ছেদনকারী আপাত কঠোর বাক্যসমূহের মধ্যে অমায়ায় কৃপা-গ্রহণেই সর্বদা ইচ্ছুক ও উদ্যত থাকেন।

মহতের অনুগত ও স্বজাতীয়তা-প্রাপ্ত সেবকগণের অনেক সময় মহতের বঞ্চনা-কার্য্যে সাহায্য করিতে দেখা যায়। তাঁহারা যে মহতের বঞ্চনালীলা বোঝেন না বা বঞ্চিত জনগণের উপর অকরণ, তাহা নহে। মহতের সেবা পরিপূষ্টির জন্য তাঁহার বঞ্চনা-লীলাতে যোগ দেন, আবার মহতের প্রকৃত কৃপা বা মনোহভীষ্ট-প্রচারলীলায় সে বঞ্চনার স্বরূপ তাঁহারা নিজেরাই প্রকাশ করিয়া অমন্দোদয়া দয়া বিতরণে ব্রতী হন। কেহ বঞ্চিত হউক,

ইহা তাঁহারা চান না। কারণ সেব্যের সেবা-বৈভবের বিস্তৃতিই সেবকের অনুক্ষণ কার্য। শ্রীধ্রুব মহারাজের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই, তিনি স্থানাভিলাষী হইয়া শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাত্মা শ্রীনারদের কৃপা লাভ করিবার পর রাজ্যপ্রাপ্তিকে কৃপা বলিয়া আর মনে করিতে পারেন নাই। ধ্রুব মহারাজ রাজ্যকামনা করিয়াছেন বটে; কিন্তু ভগবানকে বঞ্চিত করিবার অর্থাৎ ভগবানের দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইবার মতলব তাঁহার ছিল না।

শ্রীভগবান্ ধ্রুবের নিৰ্ব্যলীকতা ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-প্রাপ্তি বিষয়ে দৃঢ় নিষ্ঠা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া দেবর্ষি নারদকে তদভিন্ন শ্রীগুরুদেবরূপে ধ্রুবের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহতের কৃপা পাইয়া ধ্রুব রাজ্য ত' আর কামনা করিলেনই না, পরন্তু শ্রীভগবান্ যখন তাঁহাকে উহা দিলেন, তখনও আর তিনি তাহা লইতে স্বীকৃত হইলেন না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে স্কন্দপুরাণোক্ত এক ভক্ত ব্যাধের আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে দেখিতে পাই, শ্রীনারদ প্রথমতঃ তাঁহাকে ব্যবহারিকভাবে বলিলেন যে, তুমি ব্যাধ, তোমার পক্ষে পশুহত্যা অল্প পাপ, তবে তুমি অর্দ্ধমৃত করিয়া কষ্ট দিও না। ব্যাধকে তিনি উপদেশ করেন নাই, কেবলমাত্র সানুনয় অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু পরে যখন ঐ ব্যাধ “শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্” এই বাক্যের অনুসরণ করিলেন, তখন নারদ তাঁহাকে হিংসা-কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিলেন। ব্যাধও তখন গোপ্তৃত্বে বরণরূপ শরণাগতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই, তজ্জন্য দেহাদি নিৰ্ব্বাহ-চিন্তায় তিনি ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম সৰ্ব্বদাই শিষ্যকে হরিসেবায় পূর্ণ সুযোগ দিবার জন্য ব্যস্ত; তিনি বলিলেন যে,—‘তুমি ইহার জন্য চিন্তিত হইও না, তোমার প্রয়োজনীয় বস্তু তুমি পাইবে।’ পরে অন্য একদিন নারদের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে যখন নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি শরীর নিৰ্ব্বাহের উপযুক্ত দ্রব্য পাও ত’?” তখন যে ব্যাধ একদিন বহু পশু মারিয়া জীবনধারণের উপায় সংগ্রহ করিতেন, অল্প পশু হননদ্বারা তুষ্ট হইতে পারিতেন না, তিনি তখন নিৰ্ব্বিরোধে যে-সকল দ্রব্যসম্ভার তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাও গ্রহণে অস্বীকৃত হইতেছেন। তিনি বলিলেন,—“প্রভো! আপনি অত্যধিক দিতেছেন, ইহা আমার প্রয়োজন নাই। লোকে যে-সকল উপহার দিত, তিনি তাহাকে গুরুদেবেরই প্রেরিত এই জ্ঞান করিতেন। তথাপি ‘প্রসাদজ্ঞানে যাহা খুশী তাহা গ্রহণ কর’ এরূপ কপটতামূলক ভক্তিবিরোধী বাক্য বলেন নাই। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর আখ্যানেও তিনি তাঁহার যোগ্য সম্মান গ্রহণকে মহাপ্রভুর কৃপা বলিয়া জানান নাই। অর্থ, দ্রবিণাদি লাভ বা কন্মবীর, ধন্মবীর প্রভৃতি বলিয়া স্তুতিদ্বারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তিই কিছু মহতের কৃপা-প্রাপ্তি নহে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু সবসময়ে মহাপ্রভুর কাছে যাইতেন না বা তাঁহার সহিত কথা বলিতেন না, তজ্জন্য তিনি কিছু মহাপ্রভুর অ-কৃপা-পাত্র ছিলেন না। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় নিত্য সুস্নাত। তিনি স্বয়ংই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাবিগ্রহ। শ্রীরূপ-সনাতনের দেহ মহাপ্রভুর নিজের দ্রব্য, তিনি স্বীয় অনুকূল কার্যে তাহা ব্যবহার করিবেন, ইহাই মহাপ্রভুর প্রকৃত কৃপাসূচক বাক্য। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ জগজ্জীবের নিকট তাহাই বলিয়াছেন। মহদগুণ সৰ্ব্বদা কৃষ্ণকীর্তনে মগ্ন, তাঁহার কীর্তনে দোহার দিবার আদেশপ্রাপ্ত

হওয়াই তাঁহার কৃপালাভ। শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ-রঘুনাথকে মহাপ্রভু তাঁহার এই দোহার কার্য্যে এবং জীবের জন্য মূল গায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার দ্বিতীয় দেহ-স্বরূপ হইলেও শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুর শুদ্ধ চানা চিবাইয়া দিনাতিপাত বা শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভুর সড়া প্রসাদ গ্রহণে কখনও বাধা দেন নাই এবং বল্লভ ভট্টাদির ন্যায় উত্তম প্রসাদদ্বারা তৃপ্ত করেন নাই।

বন্দন

বৈধ ভক্তির ষষ্ঠাঙ্গ হইল ‘বন্দন’। যদিও অর্চনাদ্বন্দ্ব-রূপেও বন্দন অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি কীর্ত্তন ও স্মরণের ন্যায় ইহা স্বতন্ত্ররূপেও অনুষ্ঠেয়। পাদসেবন ও কীর্ত্তনাদির মধ্যে বন্দন অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও তাহা পৃথক্ অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ‘বন্দ’ ধাতুর ভাবে অনট্ প্রত্যয় করিয়া ‘বন্দনা’-শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘বন্দন’ শব্দটি সাধারণতঃ ‘অভিবাদন’, ‘স্তুতি’, ‘স্তুব’, ‘নমস্কার’ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা ভগবানের অনন্ত গুণৈশ্বর্য্য শ্রবণহেতু তদীয় গুণানুসন্ধান, পাদসেবন প্রভৃতিতে দৈন্যভাবাপন্ন হইয়া কেবলমাত্র নমস্কারেই অধ্যবসায়যুক্ত হন, তাঁহাদের জন্য বন্দনের পৃথক্ বিধান হইয়াছে। হরিভক্তিকল্পলতিকা (৯।১) বন্দনের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন,—

তৎপাদপদ্ব্যবগৈঃ কায়মানসভাষিতৈঃ ।

প্রণামো বাসুদেবস্য বন্দনং কথ্যতে বুধৈঃ ॥

“বাসুদেবের পাদপদ্মে অনুরক্তব্যক্তিগণের তদুদ্দেশ্যে কায়, মন, বাক্যদ্বারা যে প্রণাম, তাহাকেই বুধগণ ‘বন্দন’ নামে অভিহিত করিয়াছেন।” যিনি ভক্তিপূর্ব্বক বিরচিত মনোহর স্তুবদ্বারা ভগবানের অপরিমেয় মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণ-দুর্লভ ভগবানের করুণা লাভের অধিকারী হন। মাতা যেরূপ স্তনপানেচ্ছু পদলগ্ন বালককে উত্তোলন করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করেন, তদ্রূপ দয়াময় ভগবান্ যত্নপূর্ব্বক বন্দনাকারী অক্ষম ব্যক্তিকে অভীষ্ট উন্নতি প্রদান করিয়া আশ্রয় দিয়া থাকেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে,—“মধুসূদন বন্দনাদ্বারা যেরূপ প্রীত হন, বহু ধন দান করিলেও তদ্রূপ প্রীত হন না। নিখিল দেবতার আরাধনা করিলে যে পুণ্য হয় এবং সমুদয় বেদ পাঠ করিলে যে ফল হয়, জনার্দনের বন্দনা করিলে তাহার কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে।” বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর হংসগীতায়ও পাওয়া যায়,—“যাঁহার লক্ষ্য অভীষ্ট, এইরূপ স্বয়ং বিরচিত অক্ষরসকলদ্বারা যিনি ভগবানের বন্দনা করেন, তিনি নিখিল কামনা অনায়াসে জয় করিতে পারেন।”

ভগবানের যে চরণকমল ধ্যানযোগ্য, ইন্দ্রিয় ও কুটুস্বাদিজনিত পরাভাববিনাশক, মনোরথপূরক, গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থের আশ্রয়, শিব ও ব্রহ্মার স্তুত, আশ্রয়যোগ্য, ভক্তবৃন্দের দুঃখমোচক এবং সংসার-সাগর পারকারী, সেই চরণযুগলকে ভক্তগণ অহর্নিশ বন্দনা করিয়া থাকেন। বেদোক্ত, পুরাণোক্ত, তন্ত্রোক্ত এবং নব্য কবিগণ-রচিত স্তোত্রসকল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে প্রশস্ত। এই প্রসঙ্গে নৃসিংহপুরাণে পাওয়া যায়,—

স্তোত্রৈর্জপৈশ্চ দেবাগ্রে যঃ স্তোতি মধুসূদনম্ ।

সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥

“যে ব্যক্তি মধুসূদনের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে স্তোত্র ও জপদ্বারা তাঁহার স্তুতি করেন, তিনি সর্বপাপ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।” যাঁহারা স্তব-স্তুতির দ্বারা সকলসময়ে ভগবানের বন্দনা করেন, তাঁহারাও মুনি, সিদ্ধগণ, দেবগণ প্রভৃতির দ্বারা সর্বদাই বন্দ্য। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

শ্রীকৃষ্ণস্তবরত্নৌষেযেষাং জিহ্বা ত্বলঙ্কৃতা।

নমস্যা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাম্।।

“শ্রীকৃষ্ণের স্তবরূপ রত্নসমূহদ্বারা যাঁহাদিগের জিহ্বা অলঙ্কৃতা অর্থাৎ যাঁহারা সর্বদাই উক্ত স্তবসকল পাঠ করেন, তাঁহারা মুনি ও সিদ্ধগণের নমস্যা ও দেবগণ তাঁহাদিগকে বন্দনা করেন।” শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিতে বাসনা করিয়া যে-সকল বাক্য বলিতে ভক্তগণ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সংক্ষিপ্ত বা বিবৃত সেইসকল বাক্যদ্বারা মধুসূদন প্রসন্ন হইয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে,—“বিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্র সতত পঠিত হইলে দেবেশ্বর শতকোটি যুগকাল প্রীত থাকেন।” বন্দনের বিশেষ মাহাত্ম্য রহিয়াছে বলিয়াই ভক্তগণ পাঠ-কীর্তনের প্রারম্ভে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বন্দনা করিয়া থাকেন। যাহারা শ্রীহরির বন্দনা করেন না, তাহাদের জীবনধারণই বৃথা। এতৎপ্রসঙ্গে বিষ্ণুধর্মোত্তর বলিয়াছেন,—“যে জিহ্বা শ্রীহরির বন্দনা করে না, তাহা গলরোগবিশেষ অথবা আলজিহ্বা অথবা অন্যপ্রকার রোগ।”

প্রণাম বা নমস্কারই বন্দন। সেই নমস্কার দ্বিবিধ—‘একাঙ্গ’ নমস্কার ও ‘অষ্টাঙ্গ’ নমস্কার। কৃষ্ণনমস্কারের দ্বারাই ভবদাবাগ্নিতে দগ্ধ মানবসমূহ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিষ্ণুধর্মোত্তরে উল্লেখ রহিয়াছে,—

দুর্গ-সংসার-কান্তারমপারমভিধাবতাম্।

একঃ কৃষ্ণে নমস্কারো মুক্তিতিরস্য দৈশিকঃ।।

“অপার দুর্গম সংসারমহারণ্যে ধাবমান মানবগণের পক্ষে একবার মাত্র অনুষ্ঠিত কৃষ্ণনমস্কারই মুক্তির প্রাপক হইয়া থাকে।” নৃসিংহপুরাণও নমস্কারের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ।

নমস্কারেণ চৈকেন সাষ্টাঙ্গেন হরিং ব্রজেৎ।।

“এই নমস্কাররূপ যজ্ঞ সর্ববিধ যজ্ঞমধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে কথিত হইয়াছে, একমাত্র সাষ্টাঙ্গ নমস্কারদ্বারাই মানব শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।” প্রণামে বা নমস্কারে— একহস্তকৃত নমস্কার, বস্ত্রাবৃত দেহের সহিত নমস্কার, ভগবানের অগ্রে, পৃষ্ঠে, বামভাগে ও গর্ভমন্দিরে নমস্কার অপরাধরূপে শাস্ত্রে গণ্য হইয়াছে।

দেশ-বন্দনা, প্রকৃতি-বন্দনা প্রভৃতির মধ্যে বাস্তবিকপক্ষে ‘বন্দন’ বা ‘বন্দনার’ প্রকৃত তাৎপর্য্য নিহিত হয় নাই। ঐ সকল বন্দনাসমূহে কেবলমাত্র আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির কথাই পরিলক্ষিত হয়। উহাতে ভগবৎপ্রীতি-কথার লেশমাত্র নাই। ‘ভগবৎপ্রীতি’ই বন্দনার প্রকৃত তাৎপর্য্য। তাই ভক্ত ভগবানের বন্দনা করিতে গিয়া বলেন,—

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ

কুস্তীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।।

রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরঞ্জং

ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তুম্।। (মুকুন্দমালাস্তোত্র)

“হে হরে! আমি বিষয়সুখের জন্য অথবা গুরুতর কুস্তীপাক কিংবা অন্য নরক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, কিংবা নন্দনকাননে সুন্দরী সুরকামিনীগণের সুকোমল তনুলতাসমূহে বিহার করিবার জন্যও তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, কিন্তু কেবল ভক্তির প্রতি স্তরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি।” কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ বা যোগমার্গে প্রবেশ করিবার জন্য ভক্তগণ ভগবান্ মুকুন্দের বন্দনা করেন না। ভক্তগণ জানেন,—“যাঁহার শত শতবার অভ্যাসের ফলেও দুরূহ জন্ম নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞান বা প্রসিদ্ধ যোগমার্গ অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নাই। জগতে যাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইলেই জীব কর্মসম্বন্ধ রহিত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে, সেই মুকুন্দের বন্দনা করাই জীবের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত।” যিনি কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা ভগবানের পাদপদ্মের বন্দনা করিয়া থাকেন, তাহাকে আর বদ্ধজীবের ন্যায় কর্মফল ভোগের নিমিত্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। তিনি অমৃতস্বরূপ ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিয়া নিত্যশান্তি লাভ করেন।

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।

হৃদ্যগ্ভবপুর্ভির্বিদধনমস্তে জীবেত সো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।

“জীব কর্মফল ভোগের নিমিত্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা ঐ সকল নিজকৃত কর্মফল ‘ভগবানেরই কৃপা’—এইরূপ বিচার করিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা ভগবানের পাদপদ্মে নমস্কার বিধানপূর্বক জীবনধারণ করেন, তাঁহারাই মুক্তির আশ্রয়স্বরূপ ঐ পাদপদ্ম লাভের অধিকারী।” পৌরাণিক ও আধুনিক বিবিধ স্তুতি পাঠ করিয়া ‘হে ভগবন্! আপনি সমুদ্র হইতে উঠুন’ বলিয়া দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া ভগবানের বন্দনা করিলে জীবমাত্রেরই কল্যাণ হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত বোধায়ন মহারাজ

ব্রজ ও ব্রজেশ্বর

“আনন্দবৃন্দ-পরিভূমিলিমন্দিরায়া আনন্দবৃন্দ-পরিনন্দিত নন্দপুত্রম্।

গোবিন্দসুন্দর-বধূ পরিনন্দিতং তং বৃন্দাবনং মধুর মূর্ত্তং অহং নমামি।।”

ব্রজেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য বিহারস্থল শ্রীব্রজধাম বৃন্দাবন। মায়িকতত্ত্ব ও পরব্যোম—এই দুইয়ের মধ্যে বিরজা। সেই বিরজার পারে পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। পরব্যোমের উপরে গোলোক। সেই গোলোকটি হইতেছে চিন্ময়ধাম। সেই গোলোকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। তন্মধ্যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ প্রকোষ্ঠের নাম “ব্রজ”। সেই গোলোকস্থিত ব্রজ কৃপাপূর্বক ভুলোকে অবতরণ করিয়াছেন—তাহা চিন্ময় অপ্রাকৃত রাজ্য বৃন্দাবনধাম বা ব্রজধাম। সেই ব্রজধামের ঈশ্বর হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—ব্রজেশ্বর। শ্রীনন্দ মহারাজকে বিভিন্নস্থানে ব্রজেশ্বর বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রজেশ্বর বলিতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই বুঝায়। স্যামন্তপঞ্চকে দিশাহারা গোপীগণ কৃষ্ণকে আকুলপ্রাণে বলিয়াছিলেন—“ব্রজে চল ব্রজেশ্বর।”

চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল। তদন্তর্গত দ্বাদশটী বন বিরাজমান। তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনধাম।

যমুনার পশ্চিমতীরে— (১) মধুবন, (২) তালবন, (৩) কুমুদবন, (৪) বহলাবন, (৫) কাম্যবন, (৬) খদিরবন, (৭) বৃন্দাবন ; এবং যমুনার পূর্বতীরে—(৮) ভদ্রবন, (৯) বিশ্ববন, (১০) লৌহবন, (১১) ভাণ্ডীরবন, (১২) গোকুল মহাবন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজের দ্বাদশবন পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

‘ব্রজ’-শব্দ গমনার্থসূচক। এই মায়িক জগতে আমরা বাস করিতেছি। মায়িক জগতে অবস্থানকারী জীবের চিহ্নিভাগে বৈকুণ্ঠতত্ত্বের আবির্ভাবের নাম “ব্রজ”। মায়িক জগতের মায়াত্যাগ করিয়া উদ্ধর্গতি লাভ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এইজন্য বলিয়াছেন,— “ব্রজগোপীভাব, হইবে স্বভাব, আন ভাব না রহিবে।” ব্রজগোপীগণের ভাবপ্রাপ্তগণেরই যোগমায়া অর্থাৎ মায়াশক্তির পরাবিদ্যারূপ অবস্থাতেই ভগবল্লীলাস্থলী ব্রজধামের স্মৃতিপ্রাপ্ত হয়।

“প্ৰীতি প্রাবৃট্ সমারম্ভে গোপ্যা ভাবাত্মিকা সদা।

শ্রীকৃষ্ণস্য গুণগানে তু প্রমত্তাস্তা হরিপ্রিয়া।।

শ্রীকৃষ্ণ বেণুগীতেন ব্যাকুলান্তাঃ সমার্চয়ন্।

যোগমায়া-মহাদেবীং কৃষ্ণলাভেচ্ছয়া ব্রজে।।”

মধুর রসস্থ দ্রবতার আধিক্যপ্রযুক্ত তদ্রূপ প্ৰীতিকে প্রাবৃট্‌কালের সহিত সাম্যবোধে বলা হইল যে—প্ৰীতিবর্ষা উপস্থিত হইলে ভাবাত্মিকা হরিপ্রিয়া গোপীগণ হরিগুণগানে প্রমত্তা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীগীতি শ্রবণে ব্যাকুলা হইয়া গোপীগণ কৃষ্ণলাভের জন্য ব্রজধামে যোগমায়া মহাদেবীর অর্চনা করিলেন। ব্রজ ও ব্রজধামের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

“নিজগণ সখাসঙ্গে,

গোধন চরায় রঙ্গে,

বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।

যাঁ’র বেণুধবনি শুনি’,

স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী,

পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার।।”

বৈকুণ্ঠ হইতেছে চিৎপ্রভাবগত পরাশক্তির সন্ধিনী ভাবময় স্থান। সেই বৈকুণ্ঠকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা—(১) মাধুর্য্যময়, (২) ঐশ্বর্য্যময় এবং (৩) নির্বিশেষ।

নির্বিশেষ বিভাগটি বৈকুণ্ঠের আবরণভূমি। বৈকুণ্ঠের বাহিরের প্রকোষ্ঠের নাম—নারায়ণধাম। উহা ঐশ্বর্য্যময়। আর অন্তঃপুরের নাম গোলোক। নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হন এবং মায়াজনিত শোক হইতে মুক্তিলাভ করিবার প্রচেষ্টা করেন। ঐশ্বর্য্যপর ভক্তগণ নারায়ণধাম প্রাপ্ত হইয়া অভয় লাভ করেন। কিন্তু মাধুর্য্যপর সেবকগণ অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমামৃত লাভ করেন।

“প্রেমামৃত বারিধারা,

সদা পান রত যারা,

কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু পতি।।”

কৃষ্ণের নানা প্রকার লীলা ব্রজে বর্তমান। ব্রজলীলাতে যে-সকল দেশ-নিদর্শন অর্থাৎ বৃন্দাবন, মথুরাদি ; কাল-নিদর্শন অর্থাৎ দ্বাপরাদি এবং ব্যক্তি-নিদর্শন অর্থাৎ যদুবংশ,

গোপবংশজাত ব্যক্তিগণ—সেগুলি ভাবোদ্দীপক এবং রসচমৎকারিতা ও ব্রজেশ্বর কৃষ্ণের সম্পর্কযুক্ত হওয়ার জন্য মায়িকভাব-বিমুক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—“প্রেম রহিতাদ্রব্ধ সুখানুভবং প্রেমসহিতো বৈকুণ্ঠ সুখানুভবঃ শ্রেষ্ঠ, স্ততোহপি প্রেমময়ো গোকুল সুখানুভবঃ শ্রেষ্ঠ ইতি সিদ্ধান্তে জ্ঞাপিতঃ।”

ব্রজেশ্বর কৃষ্ণের জন্ম হইতেই এই ব্রজধাম বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা সমৃদ্ধশালী হইয়াছে। বৈকুণ্ঠে স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীকে সকলে পূজা করে। কিন্তু ব্রজধামে তিনি যত্নপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া ব্রজের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ব্রজের সকলেই সুখী। গো, গোপ, গোপী, বন, যমুনা, বংশী প্রভৃতি যে স্থানের সম্পত্তি সেই স্থানই ব্রজ গোকুল।

যশোমতী-নন্দন, ব্রজবর-নাগর, গোকুল-রঞ্জন কান।

* * * *

আবার “যামুন-তটচর, গোপী-বসনহর, রাস-রসিক কৃপাময়।”

অর্থাৎ ব্রজে মাধুর্য্যের ছড়াছড়ি। সেখানে ঐশ্বর্য্য কি করিবে? সমস্ত মাধুর্য্যের প্রকটভূমি শ্রীবৃন্দাবন—ব্রজধাম। সেখানে ঐশ্বর্য্যের কোন স্থান নাই।

“অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরি।

বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্।।”

কৃষ্ণের পরমপ্রিয় ধাম বৃন্দাবন। বন অর্থে সন্তোজ্জ্বল হৃদয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি মানি।

তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।।”

দ্বাদশ বন দ্বাদশ রসের আশ্রয়। ব্রজেশ্বর কৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। তিনি অখিল রসামৃত মূর্ত্তি। সমস্ত রসের একমাত্র বস্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

“বৃন্দাবনং বিনা নাস্তি শুদ্ধ সম্বন্ধ ভাবকঃ।

ততো বৈ শুদ্ধ জীবানাং রম্যে বৃন্দাবনে রতি।।”

অর্থাৎ বৃন্দাবন বিনা অন্যত্র শুদ্ধ সম্বন্ধভাব নাই। এতন্নিবন্ধন জীবদিগের বৃন্দাবনধামে স্বাভাবিকী রতি হইয়া থাকে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

“ভ্রমিব দ্বাদশবনে, রসকেলি যে যে স্থানে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।

শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া।।”

ব্রজেশ্বর কৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে সর্ব্বতোভাবে জন্মের সময় হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কতিপয় নৈমিত্তিক লীলার সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন করিতেছি।—

কৃষ্ণ যখন কেবলমাত্র শিশু তখন তিনি পুতনা বধ করেন। মাত্র তিন মাস বয়সে তিনি

শকটাসুর বধ করেন। যখন তিনি বলরামের সঙ্গে সখাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া ধেনু চরাইতেছিলেন সেইসময় বকাসুর বধ করেন। গোপগণকে দাবানলমুক্ত করেন। সাত বৎসর বয়সে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করেন। এতদ্ব্যতীত বৎসাসুর, ধেনুকাসুর, অঘাসুর প্রভৃতির হাত হইতে ব্রজবাসিগণকে সর্বদা রক্ষা করিয়াছেন। যদিও এইগুলি কৃষ্ণের নৈমিত্তিক লীলা তথাপি এইভাবে ব্রজেশ্বর কৃষ্ণ আশ্রিতগণকে সর্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন।

“দুস্ত্যজশ্চানুরাগোহস্মিন্ সর্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্।

নন্দ তে তনয়েহস্মাসু তস্যাপৌৎপত্তিকঃ কথম্।।”

ব্রজবাসী গোপীগণ নন্দমহারাজকে বলিলেন,—দেখ নন্দ, কেবল আমাদের কেন—ব্রজের পশুপক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীবেরই অনুরাগ তোমার পুত্রে জন্মিয়াছে এবং আমাদের প্রতিও যে তাঁহার অনুপম স্বাভাবিক প্রীতি আছে তাহাও স্পষ্ট উপলক্ষিত হইতেছে।

ব্রজেশ্বরের ব্রজলীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিটি রস বর্তমান। এই রসগুলির মধ্যে গোপীগণের সহিত ভগবল্লীলা রসই শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রীমতী রাধারানীর প্রেমরস। ব্রজে রক্তক, পত্রক প্রভৃতি কৃষ্ণদাসগণ দাস্যরসের, শ্রীদাম-সুদামাদি সখাগণ সখ্যরসের, নন্দ-যশোদা প্রভৃতি কৃষ্ণের পিতা-মাতা বাৎসল্য রসের এবং শ্রীমতী রাধারানী প্রমুখ গোপীগণ মধুর রসের সেবক-সেবিকা। সখীর অর্থ হইতেছে—ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও বিহারাদির সম্যকরূপে যাঁহারা বিস্তার করিয়া থাকেন, তাঁহারা সখী।

কৃষ্ণের গরুগুলিও ব্রজবাসী। তাঁহারা পূর্ববজন্মে ঋষি ছিলেন। ঋষিগণ কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবানের সেবা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেইসকল ঋষিগণ ধবলী, শ্যামলী প্রভৃতিরূপে ব্রজে আসিয়া দুগ্ধ দিয়া সেবাসুখ লাভ করিয়াছিলেন। গো, বেত্র, বিঘাণ, বেণু, যামুন সৈকত — ইহারা সকলেই ব্রজবাসী। ইহারা ব্রজেশ্বর কৃষ্ণের সেবায় সর্বদা নিযুক্ত আছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গাহিলেন,—

রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জকুটীর।	গোবর্দ্ধন-পর্বত, যামুনতীর।।
কুসুমসরোবর, মানসগঙ্গা।	কলিন্দ-নন্দিনী বিপুলতরঙ্গা।।
বংশীবট, গোকুল, ধীরসমীর।	বৃন্দাবন-তরুলতিকা-বানীর।।
খগমৃগকুল, মলয়-বাতাস।	ময়ূর, ভ্রমর, মুরলী, বিলাস।।
বেণু, শৃঙ্গ, পদচিহ্ন, মেঘমালা।	বসন্ত, শশাঙ্ক, শঙ্খ, করতাল।।
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি।	লীলা-বিলাস-উদ্দীপক মানি।।
এ সব ছোড়ত কঁহি নাই যাঁউ।	এ সব ছোড়ত পরাণ হারাঁউ।।
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান।	তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ।।

কৃষ্ণ ব্রজেশ্বর। কৃষ্ণ ও ব্রজবাসী উভয়েই সহজ রাগাত্মক স্বভাব। “যদ্বা জনো ব্রজবাসী মদীয় স্বজনোহয়ং এতস্মিন্ সম্প্রতি স্বাবতারাদীকৃতে প্রাপঞ্চিকে অবিদ্যামল্লীবশে নান্যানুসন্ধানম্।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই,—

প্রভু কহে,—কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ। স্বমাধুর্য্যে সর্ব চিত্ত করে আকর্ষণ।।
 ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ। তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন।।
 কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বাঁন্ধে। কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কাঁন্ধে।।
 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন। ঈশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন।।
 ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন। সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
 শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হএগ। ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লএগ।।
 বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল। সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক्रीড়া কৈল।।
 বৃন্দাবনের পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা এমন কি প্রতিটি ধূলিকণা পর্য্যন্ত বলিয়া দিতেছে
 ব্রজেশ্বর কৃষ্ণ—“বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।”—এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য
 ব্রজধাম ছাড়িয়া কোথাও যান নাই।

এখনও ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুর সর্বক্ষণই ধ্বনিত হইতেছে, সেই বেণুগীতি
 শ্রবণে ও ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য রসসাগর কৃষ্ণের মোহনরূপ দর্শনে পশু, পক্ষী, বৃক্ষরাজি
 পর্য্যন্ত আনন্দে ও প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠে। প্রেমরসের উদ্ভাসনে গোপীগণ আত্মহারা
 হইয়া পড়িতেন। বেণুধ্বনি শ্রবণে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অচ্ছেদ্য গৃহবন্ধন অনায়াসে ছেদন
 করিয়া কৃষ্ণ অভিमुखেই ধাবিত হইতেন। গোপীগণ বলিতেছেন,—

“ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাস-বীক্ষণার্পিত-মনোভববেগাঃ।

কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ কশ্মলেন কবরং বসনং বা।।”

অর্থাৎ তখন আর আমরা আমাতে থাকি না। তাঁহার সেই বিলাসপূর্ণ দৃষ্টি দর্শনে
 আমাদের মনের গতি উপশমিত হইয়া যায়। তখন স্থাবর যোনি পাদপকুলের ন্যায় অবশদশা
 প্রাপ্তে আমরা আত্মহারা হইয়া পড়ি। আমাদের বসন-ভূষণ বা কবরী বন্ধনের প্রতি কিছুমাত্র
 লক্ষ্য থাকে না। শ্রীমতীর উক্তি,—

“(আমি) যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।

একেলা এসে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে।।

যত বাঁশরী বাজায় তত পথপানে চায়—

পাগল বাঁশি ডাকে উভরায়।

না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মানভরে।।

(আমি) যাই গো ঐ বাজায় বাঁশি প্রাণ কেমন করে।”

ব্রজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গোপীগণ, গোপী শিরোমণি শ্রীমতী রাধারানী ব্রজেশ্বরকে ব্রজে
 প্রেমডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যার ১৪০ পৃষ্ঠায় “গৌর দয়াময় ও নিতাই বন্দনা”
 কবিতা দুইটির লেখক শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী। ভুলবশতঃ উহা শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ
 দাসাধিকারীর নামে হইয়াছে।

অভিমান

নহি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্যও নহি স্বরূপে আমি ।
শোকধর্মপর শূদ্রও নহি—নহি ব্রহ্মচারী, গৃহের স্বামী ॥
আমি বনচারী, কিস্বা সন্ন্যাসী নহি,—এ সকল মোর স্বরূপ নহে ।
বদ্ধভূমিকায় অভিমান-রাজি সঠিক রূপেই আবরি' রহে ॥
আমি সুন্দর, সুন্দরী আমি, আমি ধনবান্ সবার সেরা ।
আমি কুৎসিৎ, ভিখারী অধম,—বিষাদ আঁধারে পরাণ ঘেরা ॥
আমি ব্রাহ্মণ, সবার শ্রেষ্ঠ, আমি যে স্বপচ ঘৃণ্য বড় ।
কভু অভিমান আমি দীন প্রজা, কখনও বা আমি রাজ্যেশ্বর ॥
মানী, গুণী আমি পূজ্য সবার, আমি বিদ্বান, মূর্খ, নীচু ।
কভু উপকারী, দয়ালু প্রধান, কখনও বা ফিরি দাতার পিছু ॥
আমি গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ, যতি, আমি মোক্ষকামী বিষয়ত্যাগী ।
ভোক্তা আমিই, কর্তাও আমি, আমিই যতেক সুখের ভাগী ॥
দ্রষ্টা আমার দৃশ্য জগৎ, হৃদয়গুলির আমিই স্বামী ।
রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-রসের, পান করি পানপাত্র আমি ॥
শব্দ-গন্ধময়ী এই ধরণীর বিচিত্রতাগুলি আমারি তরে ।
ভোক্তা আমার ভোগ উপচার, সাজানো রয়েছে নিখিল ভ'রে ॥
কোটি অভিমানে মত্ত হৃদয়, বহুরূপী সাজ সাজি যে ভাল ।
আঁধারের দেশে বসতি মোদের, সহে না নয়নে রবির আলো ॥
চৌরশী লক্ষ জনম ধরিয়া, নানা অভিমানে বেড়াই ঘুরে ।
সেবা-গীতিকায় জাগে না পরাণ, ঘুমায়ে পড়েছি বিস্মৃতি-পুরে ॥
কবে খোলসের নেশা টুটিবে আমার, স্বরূপের ভাতি উঠিবে ফুটি' ।
'দাস আমি' কবে সেবিব হরষে, আরাধ্যদেবের চরণ দু'টী ॥
গোপীপ্রাণধন মদনমোহন, সে পদকমল ভূষণ যাঁর ।
সে মহাজনের দাস অনুদাসে সাঁপিব বা কবে জীবন ভার ॥
শরণাগতের রক্ষক তুমি, শ্রীগুরুপাদপদ্ম করুণাময় ।
এ ক্ষীণকণ্ঠে গাহিব বা কবে পরাণ ভরিয়া তোমারি জয় ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপদরেণুতে আত্মনিবেদন কবে বা হবে ।
দাস অভিমানে সে রাজা-চরণে, মস্তক আমার লুটায় রবে ॥

—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৭ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র আমাদের জানিয়েছেন,—

অতঃ পুংভির্দির্জশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম-বিভাগশঃ।

স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥ (ভাঃ ১।২।১৩)

বর্ণাশ্রমী মিশ্র-ভক্তগণ নিশ্চিহ্ন বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে হরিতোষণে নিযুক্ত থেকে সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু অনন্য ভক্তগণের ন্যায় পরমা সংসিদ্ধি অর্থাৎ ভগবানের লীলাপরিকরতা প্রাপ্ত হয় না। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলেছেন,—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।

নাপ্রবৃন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতঃ॥ (গীতা ৮।১৫)

“মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় দুঃখের আশ্রয়স্বরূপ অনিত্য জন্ম লাভ করেন না, কারণ তাঁরা কেবলাভক্তির অনুষ্ঠান করায় পরমা সংসিদ্ধি লাভ করে থাকেন।” সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা বর্ণাশ্রমী মিশ্রভক্তগণ নিকৃষ্ট গতি লাভ করে। বর্ণাশ্রম ধর্ম গুণ-কর্ম-বিভাগানুসারে অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ বর্ণাশ্রম ধর্মে সম্ভব হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।

স্বকর্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী—এই চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যারা কৃষ্ণভজন না করে, তাদের নরকে যেতে হবে। বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যারা অন্য দেবতাগণের উপাসনা করে বা অন্যদেব উপাসনাকালে নারায়ণের পূজা করে, সেক্ষেত্রেও কি কৃষ্ণের ভজন বা কৃষ্ণের সন্তোষণ হয়? তদুত্তর এই যে, দেবভক্তগণের নারায়ণ-পূজা শুধুমাত্র কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সম্পাদন হয়, ঐরূপ শ্রদ্ধাতে কৃষ্ণভজন বা কৃষ্ণ-সন্তোষণ হয় না। যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণই একমাত্র কর্তা জেনে সকল যজ্ঞের ফল কৃষ্ণে সমর্পণ করা এবং যজ্ঞভাগী অপর দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদানকালে সেই সকল দেবতাকে পর-দেবতা কৃষ্ণেরই অধীনরূপে জ্ঞান করাই বিধি। দেব-ভক্তের প্রাপ্তি-ফল ও কৃষ্ণ-ভক্তের প্রাপ্তি-ফল সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান্ দেবভক্তগণকে অল্পমেধাবিশিষ্ট হীনবুদ্ধি বলে উল্লেখ করেছেন,—

অস্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ব্যবসায়মেধসাম্।

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্বত্তা যান্তি মামপি॥ (গীতা ৭।২৩)

“(ভগবান্ বলেছেন)—কিন্তু অল্পবুদ্ধি জনগণের সেই ফল নশ্বর। দেবপূজকগণ দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন ; আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। যারা যেকোন বস্তুর পূজক, তারা সেইরূপ বস্তুই লাভ করে—ইহাই বিধি হওয়ায় দেবগণই যখন নশ্বর, তখন দেবভক্তগণ কি অনশ্বর হতে পারে? দেবভক্তগণের ভজনফলও নষ্ট হয়ে যায়। যারা মনে করে দেবগণের উপাসনাদ্বারা কাম্য বিষয় সকল লাভ হয়, তারাও শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম জানে না। দেবতাগণ নিজ নিজ ভক্তগণের কাম্যফল নিজেরাই দিতে পারেন না ; দেবতাগণের

অন্তর্যামী ভগবান্-কর্তৃকই দেবভক্তগণ কাম্য বিষয়সকল লাভ করে থাকে। যথা, শ্রীমদ্ভগবদগীতার বাণী,—

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়েব বিহিতান্ হি তান্ ॥ (গীতা ৭।২২)

“(ভগবান্ বলেছেন,—) সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবমূর্তির আরাধনা করে এবং অন্তর্যামী আমাকর্তৃক বিহিত সেই কামসমূহকে তাহা হতে অবশ্যই লাভ করে থাকে।” সুতরাং দেবভক্তগণের কাম্য বিষয়সকল ভগবান্-কর্তৃক দেবগণের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়। ভগবানের ইচ্ছা ও বিধান ব্যতীত দেবতাগণ নিজ নিজ ভক্তের কাম্যবিষয়সকল প্রদানে সমর্থ হন না। দেবভক্তগণের পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াতরূপ যাতনার অবসান হয় না। তাই বর্ণাশ্রমিগণকে কৃষ্ণভজন করার জন্য শাস্ত্র উপদেশ দিয়েছেন।

মানুষের শরীর, মন, সমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম ধর্মের সাহায্যে পুষ্টিলাভ করে। বর্ণাশ্রম ধর্মে ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবিধ বর্ণ লাভ হওয়ায় ওই ধর্মের অপর নাম আর্থিক বা ত্রৈবর্গিক ধর্ম। ইহা বৈধ ধর্মের অন্তর্গত হলেও নৈতিক ও কর্মপ্রিয় ধর্ম। এই ধর্মে নৈতিক নিষ্ঠা প্রধান হওয়ায় ত্রৈবর্গিক ধর্মরূপে বহু দেবতাপূজা বা ভগবৎপূজা অনুষ্ঠিত হলেও ইহাতে জড় স্বভাবই পুষ্টি হয়ে থাকে। কারণ বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তর্গত প্রবৃত্তিমার্গে বিষয়ভোগ ও নিবৃত্তিমার্গে মোক্ষ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাসনা অজ্ঞানপ্রসূত।

অজ্ঞান তমের নাম कहিয়ে কৈতব।

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দান ॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।

সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম ॥ (টেঃ চঃ আঃ ১।৯০, ৯২, ৯৪)

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ গুণজাত ধর্ম। ভগবান্ শ্রীহরি গুণজাত ধর্মের অধীন নির্গুণ বস্তু। মায়ার গুণজাত বর্ণাশ্রম ধর্মে অবস্থান করে নির্গুণ শ্রীহরিকে লাভ করা সম্ভব নয়। ত্রিগুণ ভূমিকায় অবস্থান করে ত্রিগুণময় বস্তুকেই পাওয়া যায়। একটী ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে অবস্থানকারী যাত্রী তৃতীয় শ্রেণীর সুখ-সুবিধা ভোগ করে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর সুখ-সুবিধা ভোগ করতে সমর্থ হবে না। সকুণ্ঠ ত্রিগুণময় এই প্রাকৃত জগতে গুণজাত বর্ণাশ্রম ধর্মে স্থিত হয়ে গুণাতীত অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ জগতের সুখ আশা করা বৃথা। গুণজাত বর্ণাশ্রম ধর্মে অবস্থান করে গুণজাত বিষয়গুলি কামনার ফলে চিত্ত মলিন হয় এবং সেই মলিন চিত্তে নির্গুণ ভগবানের আবির্ভাব হয় না। বিষয়গুলি বিধি-নিষেধের মধ্যে ভোগ করতে করতে বিষয় হতে চিত্ত যাহাতে নির্লিপ্ত হয়ে বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করে, সেইজন্য বর্ণাশ্রমের বিধান ভগবান্-কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্মানুষ্ঠানে কর্মফলবাসনা না থাকলে চিত্ত নির্মল হয়। সেই নির্মল চিত্তে তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় হয়। দেহ-মন হতে তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় হয় না। আত্মা হতেই তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম-পালনে মনুষ্য জীবনে তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। বর্ণাশ্রম

ধর্মের মধ্য দিয়ে শ্রীহরিকে তোষণ করার ফলে যাঁর তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় হয়, তাঁর আত্মা তখন ক্ষুধার্ত ও সেই ক্ষুধার্ত আত্মার হরিকথা শ্রবণে ঐকান্তিক বাসনা জাগে। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুষ্ঠান করেও যদি শ্রীহরির কথা শ্রবণ-কীর্তনে রুচি না হয়, তবে সেই বর্ণাশ্রম ধর্মানুষ্ঠানের কি প্রয়োজন? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ (ভাঃ ১।২।৮)

“যদি মানবগণের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ স্বধর্ম অনুষ্ঠিত হয়েও তাহা শ্রীভগবান্ ও ভাগবতের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তিরূপা রুচি উৎপাদন না করে, তবে ঐরূপ ধর্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই বৃথা শ্রমমাত্র।” উক্ত শ্লোকে বর্ণাশ্রম-পালনরূপ স্বধর্মের ব্যতিরেকছলে নিরর্থকতা প্রতিপন্ন হয়েছে।

পারমার্থিক বা আপবর্গিক বৈধ ধর্মের অন্বয়ভাবে প্রশংসা শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে,—

ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোহর্থায়োপকল্পতে।

নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ (ভাঃ ১।২।৯)

“বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যে নৈষ্কর্ম্য ধর্ম, তার ফল ত্রৈবর্গিক অর্থ নয়। আপবর্গিক ধর্মের যে অব্যভিচারী অর্থ তার ফলে বিষয়ভোগ বিহিত হয় নাই।”

কামস্য নেন্দ্রিয় প্রীতির্লাভো জীবতে যাবতা।

জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ ॥ (ভাঃ ১।২।১০)

“বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ নয়। যতদিন জীবন থাকে, ততদিন কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা যায়। অতএব ভগবন্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠানদ্বারা এ জগতে যে স্বর্গাদি লাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নহে।”

বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তর্গত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের কথা বলে হরিকথায় রুচি উৎপাদন করা যায় না। জীবের একমাত্র উপজীব্য হরিকথায় রুচি ও হরিকে সুখী করার ইচ্ছা। শ্রীহরিকে সুখ দেওয়ার প্রবৃত্তি মায়িক গুণ হতে উদ্ভূত হয় না; উহা গুণাতীত বা নিগুণ। গুণজাত বর্ণাশ্রম ধর্মানুষ্ঠানে মনুষ্যগণ ভগবানকে সুখ দেওয়ার প্রবৃত্তি পাবে না। স্ব-সুখ কামনার ফলে জীবের এই বদ্ধদশা। বদ্ধদশা প্রাপ্ত জীবের স্বভাবে ভগবানকে সুখ দেওয়ার প্রবৃত্তি নেই। জীবের বিষয়ে অত্যাশক্তি হেতু কর্ম্মাধিকার স্বাভাবিক। জীবকে কতদিন নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করতে হবে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে জানিয়েছেন,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ষ্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।

মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ (ভাঃ ১০।২০।৯)

“যতদিন পর্য্যন্ত সংসার-নির্ব্বেদ বা বিরক্তি না আসে, অথবা ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গফলে ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্তনাদিতে শ্রদ্ধা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করতে হবে।

মানুষ বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধি-নিষেধগুলি যথাযথ পালন করলে ক্রমে নিবৃত্তির পথে আসতে পারে; কিন্তু ভোগের বস্ত্র একবার প্রাপ্ত হলে ভোগ করার ইচ্ছা ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়, তখন মানুষ শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের কথা গ্রাহ্য করে না। কুলধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্মে ভজনীয়

বস্তুর তাত্ত্বিক জ্ঞান জীবের না থাকায় ভগবানকে পাওয়া ত' দূরের কথা, ভগবৎ-কথায় রুচি উৎপাদন হয় না এবং ভগবানের উপাসনা করেও জীবের ভয় বিগত হয় না। সাধন ও অভিধেয় বিচারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও রায়রামানন্দ-সংবাদে জানা যায়,—জীবের স্বাভাবিক বর্ণাশ্রম ধর্ম শ্রীহরিতোষণে প্রযুক্ত হলে কিছু নামে মাত্র ভক্তিলক্ষণ প্রকাশিত হয়। রায়রামানন্দ যখন বিষ্ণু-উপাসনা-পর বর্ণাশ্রম ধর্মানুষ্ঠান হতে শ্রীকৃষ্ণে কন্মার্পণকে অপেক্ষাকৃত উন্নততর সাধনরূপে স্থাপন করলেন, তখনও ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা সাধ্যভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন হতে পারে না বলে জানালেন।

“প্রভু কহে,—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।

রায় কহে,—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।

বিষ্ণুরাধ্যতে পস্থা নান্যন্তোষকারণম্।। (বিষ্ণুপুরাণ)

প্রভু কহে,—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।

রায় কহে,—কৃষ্ণে কন্মার্পণ—সর্বসাধ্যসার।।

যৎ করোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।

যত্নপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।। (গীতা)

প্রভু কহে,—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।

রায় কহে,—স্বধর্ম্মত্যাগ—এই সাধ্য-সার।। (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৫৭-৬১)

কিন্তু রায়ের বক্তব্য ‘স্বধর্ম্ম-ত্যাগকেও’ মহাপ্রভু সাধ্য-সার বললেন না; তিনি তাহাও এহো বাহ্য বলে আরও সিদ্ধান্ত জানাবার আদেশ করলেন। গীতার চরম শ্লোক—“সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য.....মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।”—এমন ভগবদ্বাক্যকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন,—“প্রভু কহে,—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।” (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৬৪)। শ্রীমদ্ভগবদগীতার (১৮।৬৬) চরম শ্লোকে সর্বধর্ম্ম ত্যাগের কথাকেও মহাপ্রভু ‘এহো বাহ্য’ বললেন কেন? কারণ ঐ ত্যাগ স্বতঃ স্ফূর্ত নয়, তাহাতে শোকাদি বিষ্ম থাকায় ও আকাজক্ষাসূচক হওয়ায় তাহা বাহ্য সাধন। ঐ ত্যাগকে কৃষ্ণের সুখচিন্তায় আবিষ্ট হয়ে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের প্রতি অকিঞ্চিৎকর বা তুচ্ছ জ্ঞান করার মত বুদ্ধিজাত ত্যাগ বলা যায় না। উহাতে কর্তব্য না করার জন্য পাপ-ভয়ের চিন্তা আছে। কর্তব্যবুদ্ধির উন্মেষ দেহাভিনিবেশজনিত হয়ে থাকে। কিন্তু গোপীগণের দেহাভিনিবেশের লেশমাত্র নেই। গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানের জন্য স্ব-সুখ-বাঞ্ছা সম্বন্ধরহিত হয়ে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ীভাবে আর্য্যধর্ম্মত্যাগে পাপের ভয় নেই। অর্জুনের কর্তব্য না করার জন্য পাপের ভয় থাকায় ভগবান্ গীতার উক্ত শ্লোকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন,—‘আমি তোমাকে কর্তব্য না করার জন্য সর্বপাপ হতে মুক্ত করব। তোমার মনে পাপ ভয় থাকায় সেই চিন্তায় তুমি শোকাক্ত হয়ো না।’ এইভাবে ভগবানকে বলে কয়ে আশ্বস্ত করে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভক্ত করবার যে চেষ্টা, তাহা কি শুদ্ধ শরণাগতি বা শুদ্ধভক্তি হতে পারে? ভক্তি জীবাত্মার সহজবৃত্তি;—জীবাত্মা স্বভাবতঃ ই ভজন করবে। অর্জুনের ভক্তিতে পাপ-ভয় ও শোকাদি চিহ্ন থাকায় তাহা শুদ্ধভক্তি নয় বলেই শ্রীমন্মহাপ্রভু উহা ‘বাহ্য’ বলে উড়িয়ে দিলেন। গোপীদের শুদ্ধভক্তি ও কৃষ্ণনুরাগ প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বর্ণনা আছে,—

“লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহ-ধর্ম-কর্ম।
 লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ-সুখ, আত্ম-সুখ-মর্ম।।
 দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
 স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভৎসন।।
 সর্বত্যাগ করি’ করে কৃষ্ণের ভজন।
 কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন।।
 ইহাকে कहিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
 স্বচ্ছ ধৌত-বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।।
 অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
 কাম—অন্ধতম, প্রেম—নির্মল ভাস্কর।।
 অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
 কৃষ্ণ-সুখ লাগি’ মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ।।
 * * * * *
 আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
 কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার।।
 কৃষ্ণ লাগি’ আর সব করি’ পরিত্যাগ।
 কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।।

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৭-১৭২, ১৭৪, ১৭৫)

সুতরাং গোপীগণের মাধুর্য্যোজ্জ্বল কৃষ্ণপ্রেমের কাছে অর্জুনের ভক্তি যে কত নূন ও লান তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দের কথিত “সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য” শ্লোকটিকে ‘এহো বাহ্য’ বলার পর তাঁহ নিদর্শে রায় রামানন্দ ‘জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে’ সাধ্যসার বলে জানলেন এবং শ্রীমদ্ভগবদগীতার “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা.....মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্” (গীতা ১৮।৫৪) শ্লোকটি উল্লেখ করলেন। তদুত্তরেও শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন,—‘এহো বাহ্য, আগে কহ আর’ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৬৬)। কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানই গুহ্যজ্ঞান। উক্ত শ্লোকে ‘ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা’—অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি—এরূপ উল্লেখ থাকায় উহা গুহ্যতর পরমাত্মজ্ঞানের পূর্বে গুহ্যজ্ঞানরূপেই নির্ণীত হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞান লঘুকৃত হলে কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িনী পরাভক্তি লাভ হয়ে থাকে। সেবক-ভাব সম্বন্ধ হতেই ভক্তির কার্য্য আরম্ভ হয়। উক্ত শ্লোকে ব্রহ্মভূত হবার পর ভক্তির কথা তথা “মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্” উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হবার পরেও কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান বা পরাভক্তি লাভের প্রয়োজন থাকে। সেই পরাভক্তি-বলে কি জানা যায়? তাহা পরবর্ত্তী ১৮।৫৫ শ্লোকে ভগবান্ ব্যক্ত করেছেন,—“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ”—সেই পরাভক্তির দ্বারা ভগবানের বিভূতি ও স্বরূপের স্বভাব জানা যাবে। তাই ভগবানকে জানার জন্য “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা” শ্লোকটি শেষ কথা নয়। ঐ শ্লোকটি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উদাহরণ মাত্র, উহা অকিঞ্চনা শুদ্ধভক্তির উদাহরণ হতে পারে না। ‘মিশ্রা’-শব্দের অর্থ আবরণ। এস্থলে জ্ঞান ভক্তিকে আবরণ করায় জ্ঞানেরই প্রাধান্য সূচিত হয়। ভক্তি নিরপেক্ষা, জ্ঞানের অপেক্ষায়ুক্ত নয়। উক্ত শ্লোকটিকে স্বরূপসিদ্ধা শুদ্ধভক্তি বলা যেতে পারে না, বরং উহাকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ বিচারে উক্ত ‘ব্রহ্মভূতঃ

প্রসন্নাত্মা' শ্লোকটিও 'এহো বাহ্য' বলে পরিত্যক্ত হল। অতঃ পর রায় রামানন্দের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য.....তৈস্ত্রিলোক্যাম্" (ভাঃ ১০।১৪।৩) বর্ণনা শ্রবণ করে শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন,—“প্রভু কহে,—এহো হয়, আগে কহ আর।” (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৬৮)। এতক্ষণে সাধ্যবস্তু নির্ণয়ে ভক্তির স্তরে উপনীত হওয়া গেল; তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—“এহো হয়”; কিন্তু ইহাতেও সর্বোচ্চ সাধ্যতত্ত্ব নির্ণীত হল না; সেজন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞা—“আগে কহ আর”। তখন রায় বললেন—“প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার।” (ক্রমশঃ)
—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৩ পৃষ্ঠার পর]

বর্তমানে আমরা দামোদরাষ্ট্রকের সপ্তম শ্লোক আলোচনা করছি। যে শ্লোকে স্বয়ং সত্যব্রত মুনি তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তাঁরই আনুগত্যে আমরা এই দামোদরাষ্ট্রক আলোচনা করছি। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রভু তিনি বহুদিন আগে এই দামোদরাষ্ট্রক-নামক স্তোত্র-গ্রন্থ সনাতন গোস্বামীর টীকাসহ প্রকাশ করেছেন। শাস্ত্রে ব্রতপালন সম্বন্ধে যে দামোদরাষ্ট্রক প্রত্যহ কীৰ্ত্তনীয়, প্রত্যহ আলোচ্য, সেই দামোদরাষ্ট্রক সম্বন্ধে সনাতন গোস্বামীর টীকা, ব্যাখ্যা আলোচ্য। গ্রন্থকর্তা যিনি গ্রন্থ লেখেন তিনি যদি ব্যাখ্যা দেন, তাহলে সবচেয়ে ভাল। মূল বিষয়বস্তুর উপর যদি টীকা-টীপনী ব্যাখ্যা থাকে, তাহলে আলোচনা সর্বদ্বন্দ্বসুন্দর হয়। যদি গ্রন্থকর্তা তার সঠিক ব্যাখ্যা না দেন তাহলে অতিমর্ত্য পুরুষ যাঁরা আছেন, নিত্যসিদ্ধ মহাত্মা যাঁরা আছেন, তাঁরা যদি তার ব্যাখ্যা দেন সেটাও সর্বদ্বন্দ্বসুন্দর হয়। তজ্জন্য এই দামোদর মাসে প্রত্যহ কিছু কিছু দামোদর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এবং তদীয় প্রেয়সী শ্রীরাধিকার মহিমা-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা দরকার।

“নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ” দামোদরাষ্ট্রকের শেষে বলা আছে। তাহলে এখানে কোন্ দামোদর? দামোদর ত' অনেক হতে পারে। যাঁর উদরে দামবন্ধন পড়েছে, তিনি হলেন দামোদর। যে নামগুলি সাধারণ মানব সমাজে সন্তানের নামকরণ করা হয়, ঠিক সেইরকম নামকরণ নয়। স্মৃতিশাস্ত্রে যে বিধিবিধান আছে অন্নপ্রাশনাদি, নামকরণাদি সম্বন্ধে সেখানে লেখা আছে ভগবানের নামানুসারে নামকরণ হবে, তদীয় দাস্যসূচক নাম হবে। এখানেও নন্দালয়ে গিয়ে গর্গন্ধ্বি নামকরণ করেছেন। শুধু কৃষ্ণের নামকরণ করেন নি, বলদেবের নামকরণ আগে হয়েছে, তারপরে কৃষ্ণের হয়েছে। কি ব্যাপার! আমাদের সংসারে সন্তানগণের নামকরণ যেমন হয়, নন্দ-যশোমতীর গৃহেও সেইরকম নামকরণ হয়েছে, কিন্তু বিরাটভাবে, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে। গর্গন্ধ্বি যখন নামকরণ করতে যাচ্ছেন তখন কৃষ্ণের কি নাম দেওয়া হবে তা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। যে যে নাম মনে আসছে গর্গন্ধ্বির দেখছেন এ সব নাম ত' ওঁর আছে। এতটুকু বাচ্চার নামকরণ করবার জন্য গর্গন্ধ্বি এসেছেন, কিন্তু যখন তাঁর নামকরণ করবার চেষ্টা করছেন তখন নূতন নাম কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না। যে নাম

তঁার মনে আসছে সে নাম তঁার আছে, তিনি দেখছেন। সেখানে গর্গক্ষাষি বলে ফেললেন, দেখ নন্দমহারাজ, তোমার এই ছেলের নামকরণ করতে গিয়ে আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে, আমি খুব বিপদে পড়েছি। কেন?—ইনি প্রাচীন, ইনি পুরাণপুরুষ। পৃথিবীতে এঁর মত সুপ্রাচীন ব্যক্তি আর কেউ নেই। কেন একথা? জগৎ সৃষ্টির আগে থেকে ইঁনি আছেন, শাস্ত্রে সে কথা বর্ণনা করেছেন। সৃষ্টির আদি থেকে ইঁনি আছেন?—হ্যাঁ, তিনি নিজেই বলেছেন,—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্॥

সৃষ্টির আদিতে আমি ছিলাম, তখন এই চরাচর বিশ্ব ছিল না। বর্তমানেও আমি আছি এবং মহাপ্রলয়ের পরেও আমি থাকব। এরূপ কথা ভগবানের নিজস্ব শ্রীমুখোক্তি আমরা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, ভাগবত, গীতা, রামায়ণ, মহাভারতে সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এই পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কে? নামকরণ করতে গিয়ে গর্গক্ষাষি বলছেন, তোমার এই ছেলেটা অনেকবার এসেছে, বার বার যখনই দরকার হচ্ছে। স্বয়ং অনন্তদেব তিনিও এঁর গুণমহিমা বর্ণন করতে সক্ষম হননি। “অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।” তিনি ভগবানের মহিমার অন্ত না পেয়ে অনন্ত নাম রেখেছেন ভগবানের। তাহলে কে তিনি?—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহুতোহনুযুগং তনুঃ।

শুক্লোরন্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

দেখ নন্দমহারাজ, তোমার এই ছেলেটা অন্যান্য যুগেও এসেছেন। সেই সেই যুগেও যুগানুসারে তিনি স্বীয় দেহ ধারণ করেছেন এবং জগতের কাছে প্রকাশিত হয়েছেন। ইনি সত্যযুগে শুক্লমূর্তিতে এসেছেন, তপস্যামূর্তি, হংসমূর্তি, ব্রহ্মচারীবেশ। সে সময় একবার এসে ধর্মোপদেশ করেছেন। ত্রেতাযুগে রক্তমূর্তিতে এসেছেন। সে সময়ে ইনি যজ্ঞমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। কলিযুগে ইনি পীতমূর্তিতে আসবেন। “ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ”—এই দ্বাপরযুগে ইনি কৃষ্ণরূপতা প্রাপ্ত হয়েছেন। নামও কৃষ্ণ, রূপও কৃষ্ণ।

আমরা সব জায়গায় দেখছি কৃষ্ণ কালো। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সকল মঠে শ্বেত কৃষ্ণ। কি ব্যাপার? আমরা ত’ সব জায়গায় দেখি কৃষ্ণ কালো, আপনাদের ঠাকুর কি তাহলে আলাদা রকমের। ইনি কি শাস্ত্রবহির্ভূত কিছু? প্রশ্ন হয়, বুঝতে চান অনেকে। তত্ত্বদর্শনটা তাঁদের জানা নেই।

রাধাচিন্তানিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা।

শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে রাধালিঙ্গিতবিগ্রহম্॥

অর্থাৎ রাধারানীর চিন্তা করতে করতে কৃষ্ণ তাঁর নিজের রঙ হারিয়েছেন। রাধারানীর কি রঙ? “তপ্ত-কাঞ্চন গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী!”—এই বলে আমরা প্রণাম করি। কাঞ্চনবরণী রাধা। সে রঙটা কে চুরি করলেন?—মহাপ্রভু—গৌরসুন্দর তিনি চুরি করলেন সেই রঙটা। সেইজন্য কৃষ্ণ সাদা হয়ে গেলেন। আর রাধারানী চিন্তা করছেন কৃষ্ণের, তিনিও তাঁর রঙ হারিয়ে ফেললেন। কৃষ্ণ নিজের রঙ হারিয়ে শ্বেত হয়ে গেছেন, আর রাধারানীও তাঁর রঙ হারিয়ে শ্বেত হয়ে গেলেন। রাধারানীর রঙ নিয়ে কৃষ্ণ গৌরসুন্দররূপে

জগতে এসেছেন। সেইখানে বলছেন রঙটা কি করে পান্টেছে। একবার আমাদের গুরুপাদপদ্মের নিকট থেকে ব্যাখ্যা শুনেছিলাম। সে-সময় তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন যে, কৃষ্ণবর্ণ হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ। কিরকম? যতরকম রঙ আছে সেই সব রঙ ভগবানের মধ্যে আছে। কালো রঙ সব রঙকে Absorb করে নেয়। সেজন্য কৃষ্ণবর্ণ শ্রেষ্ঠ।

একসময় একজন পাদ্রী (তিনি হলেন ব্যারিষ্টার বাটলার, এই গৌড়ীয় মঠেরই বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমার দায়িত্ব নিয়ে তিনি ছিলেন।) তাঁকে (গুরুপাদপদ্মকে) প্রশ্ন করেছিলেন, তোমাদের কৃষ্ণ আর কোন রঙ খুঁজে পাননি; কালো রঙ নিলেন তিনি। তখন গুরুদেব উত্তর দিয়ে বললেন,—কালো জগতের আলো। Black has no other hue. কালো রঙটা সব রঙকে Absorb করে, সেজন্য কালো রঙ শ্রেষ্ঠ। এইজন্য কৃষ্ণ কালো। কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা দিয়েছেন,—

রাধাচিন্তানিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা।

শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে রাধালিঙ্গিতবিগ্রহম্॥

রাধালিঙ্গিত বিগ্রহ, রাধাচিহ্নিত বিগ্রহ। সেই অর্থ করেছেন। “সর্বের বর্ণাঃ যত্রাবিষ্টাঃ গৌর-কান্তির্বিকাশতে। সর্ব-বর্ণেন হীনস্ত কৃষ্ণ-বর্ণঃ প্রকাশতে॥” আর একরকম উন্টে ব্যাখ্যা দিলেন, যেখানে সমস্ত রঙের সমাবেশ সেখানে দেখা যাচ্ছে যে গৌরবর্ণ শ্রেষ্ঠ। তাকে বলা হয়েছে পীতগৌর। গর্গাঋষি যে শ্লোকটা উচ্চারণ করছেন,—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহুতোহনুযুগং তনুঃ।

শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

এর ভিতরে পীত গৌরের কথা এসেছে। কলিকালের অবতার কি? পীতগৌরের কথা বলা হচ্ছে। তাঁকে বলা হচ্ছে ছন্দাবতার। প্রচ্ছন্নভাবে তিনি আছেন। রাধাকৃষ্ণ মিলিততনু, তিনি ছন্দাবতার, তিনি জানতে দিচ্ছেন না তিনি অবতার। সেজন্য তাঁর একনাম ছন্দাবতার। কথাটা কোথায় পাওয়া গেল?—ভাগবতে। প্রহ্লাদ মহারাজ যখন নৃসিংহদেবের স্তব করছেন সেখানে তিনি বলছেন,—

ইথং নৃত্যির্গৃষিদেব-ঋষাবতারৈলোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম্ ছনঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহথ স ত্বম্॥

ত্রিযুগ তাঁর নাম। ছন্দাবতার—তিনি নিজেকে নিজে প্রকাশ করছেন না। কেন? আচার্যলীলাভিনয়কারী। জগদ্গুরুরূপে তিনি তাঁর নিজ ভক্তি জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য এসেছেন। পীতগৌর বলা আছে। ব্যাখ্যাগুলো এরকম আছে। এর সূত্র আবার কোথা থেকে এল? ‘রাধাচিন্তানিবেশেন’—এটা কি একটা খেয়ালখুশী ব্যাপার? নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত মহাত্মাগণ, মহাজনগণ তাঁরা যে কথা বলেন সেটা শাস্ত্র, Axiomatic truth, Universal truth, সেকথা শাস্ত্রে বুঝানো আছে। “সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, এ তিনে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা।” সাধু যা বলছেন শাস্ত্রে তা আছে; গুরু যা বলছেন শাস্ত্রে তা আছে, তত্ত্বদর্শন, শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। সাধু শাস্ত্র ছাড়া কোন কিছু বলেন না, বলবেন না। তিনি সাধু নন, যদি শাস্ত্র ছাড়া কোন কথা বলেন। গুরু শাস্ত্র ছাড়া কোন কথা বলবেন না, যেখানে যা কিছু বুঝাতে হবে শাস্ত্রেরই Reference দিয়ে বুঝাতে হবে। অমুক শাস্ত্রে—

গীতা, ভাগবতে, উপনিষদে এখানে এটা আছে। নিজস্ব কথা কিছু নেই। শুকদেব গোস্বামী ভাগবত বর্ণনা করছেন, তিনি বলছেন আমি ত' পড়ে যাচ্ছি। “ব্যাসো নারায়ণ স্বয়ম্”— তিনি ত' এটা প্রকাশ করেছেন। আমি তাঁর বুলিটাই বলে যাচ্ছি। আবার অন্যান্য সাধু-মহাজনগণ যাঁরা বর্ণনা করছেন তাঁরাও বলছেন,—“আমার লিখন যেন শুকের পঠন।” শুকদেবের Reference দিয়ে দিচ্ছেন তিনি। শুকদেব যেমন ভাগবত বর্ণনা করে যাচ্ছেন, বলছেন না না, আমার কিছু জানা নেই, আমি কিছু জানি না, সব আমার গুরুদেব জানেন। শুকদেবের গুরুদেব কে? কাছাকাছি—Nearest গুরুদেব হলেন তাঁর পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। তাঁকে ফিরিয়ে এনেছেন। স্বানুভবানন্দী যিনি, যাঁকে স্তব করছেন শিষ্য সূত গোস্বামী ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের শেষে।—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোহপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।

ব্যতনুত কৃপয়া যস্তদ্ভূদীপং পুরাণং তমখিলবুজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোহস্মি ॥

কেতিনি? স্বসুখনিভৃতচেতা, স্বানুভবানন্দী তিনি। তিনি নিজেই বলছেন, কৃষ্ণলীলায় আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছে। কি করে হয় ওটা? প্রমাণ—

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গত্বা অপ্যরুদ্রমে।

কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিখভূতগুণো হরিঃ ॥

ভগবান্ শ্রীহরির এমনই গুণ একবার শ্রীহরির নাম যে শুনবে তাতেই তার চিত্ত আকৃষ্ট হয়ে যাবে। শুকদেব গোস্বামীর ত' তাই হয়েছে, সেটা তিনি নিজে স্বীকার করেছেন। আমি ত' বনে জঙ্গলে চলে গেছিলাম। কে আমাকে ধরে আনল?—কৃষ্ণনাম। ওই বাচ্চাটাকে ধরে আনবার জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এক Policy adopt করেছিলেন। ভাগবতের কৃষ্ণলীলামহিমা সূচক কিছু কিছু ভাল শ্লোক ব্যাধকে শিখিয়ে দিলেন বেদব্যাস। তারা বনাঞ্চলে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে গান করে ঐগুলো। সেই নামেতে আকৃষ্ট হয়ে এসেছেন শুকদেব। তোমরা এ নাম কোথায় পেলো? তোমরা এ মন্ত্র কোথায় পেলো? এ স্তব কোথায় পেলো? তখন তারা বলল,—আমাদের গুরুদেব শিখিয়েছেন এই মন্ত্র। চল, নিয়ে চল আমাকে তোমাদের গুরুদেবের কাছে। হাজির করেছেন তাঁর বাবা বেদব্যাসের কাছে। যে পিতাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বনে, যার জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কান্নাকাটি করছেন,—

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।

পুত্রোতি তন্ময়তয়া তরবোহভিনেদুস্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোহস্মি ॥

—আমি তাকে নমস্কার করি। কে? কান্নাকাটি করছেন যার জন্য, হা হতাশ করছেন যার জন্য। সবটা বিচারের কথা।

ভগবানের নামের এমন মহিমা যদি কেউ শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করেন তাহলে তিনি আকৃষ্ট হবেন। শ্রদ্ধাপূর্বক মানে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—একসঙ্গে তিনটে হওয়া চাই। শুধু শুনতে হয় শুনলাম এমন ব্যাগার দেওয়া নয়। তাহলে কিভাবে? তার বিশেষণটা কি দেওয়া হবে?—With rapt attention. যে শ্রবণটা মনন, নিদিধ্যাসনের মধ্যে যাবে সেটার ব্যাখ্যা কি হবে? তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এক মহাজন,—“কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।” রাধারাণী বলছেন —“না জানি কতেক মধু শ্যামনামে

আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।” রাধারানীর উক্তি এটা। কিন্তু কে বললেন ‘কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।’ বিদ্যাপতি বললেন, কিন্তু বলছেন রাধারানী, বর্ণনা করছেন বিদ্যাপতি। ব্যাপারটা কি? এ সব তত্ত্বদর্শনগুলো মহাজনের হৃদয়গুহায় থাকে।

যুধিষ্ঠির মহারাজকে প্রশ্ন করছেন বক্রপী ধর্ম। যুধিষ্ঠির মহারাজ উত্তর দিয়েছেন। চারটে প্রশ্নের মধ্যে তৃতীয় প্রশ্ন কি? “কঃ পস্থাঃ”। তার উত্তর দিয়েছেন কি?—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসাবৃষিষ্য মতং ন ভিন্নম্।

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ সঃ পস্থাঃ।।

মহাজনগণ যে পথে যাচ্ছেন সেটা হল সাধন-ভজনের পথ। ভগবান্ কোথায় থাকেন?—মহাজনগণের হৃদয়গুহায় থাকেন। সাধু-মহাজনগণের হৃদয়গুহায় তাঁর অবস্থান।

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।

গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ।।

তাঁদের হৃদয়গুহায় সব আছে। সুতরাং সাধু-মহাজনগণ যেটা বলবেন সেটা শাস্ত্র। শাস্ত্র শব্দের প্রথম ব্যাখ্যা হল—ভগবান্ যা বলছেন তার সেটাই হল শাস্ত্র। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল—মহাজনানুভব। কেন এ কথা? সাধু-মহাজনগণ, প্রেমিকভক্তগণ ভগবান্ ছাড়া কাকেও জানেন না, ভগবান্ তাঁদের একমাত্র চিন্তার বিষয়। “শয়নে স্বপনে জাগরণে, অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে।”—এই জিনিষটা তাঁদের। সংসারে থাকতে পারেন তিনি, কিন্তু সংসারে থেকেও তিনি অসংসারী। সংসারে থেকেও তিনি পাঁকাল মাছ, সংসারে থেকেও তিনি বর্ণচোরা আম। আম যে পেকে গেছে দেখলে বুঝা যাবে না, green colour। সাধুকে দেখে চিনবেন কি? তাঁর অবস্থা দেখে তাঁকে চিনতে হয়। সেখানে লুকিয়ে চুরিয়ে রাখা যায় না। নারদ ঋষি ভাগবতে বর্ণনা করেছেন যেটা,—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিন্ত উচ্যেঃ।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যান্মাদবনুত্যতি লোকবাহ্যঃ।।

পাগলের মত। কে কোথায় আছেন, কি বলছেন, ওসব চিন্তার মধ্যে নেই। স্বাভাবিকভাবে যে slope আসছে সেইটা বুঝবার বিষয়। এটাই তাঁর ধ্যান, এটাই তাঁর জ্ঞান, এটাই তাঁর সবকিছু—জীবাতু। ‘জীবাতুরহিতস্য’ বলছেন। এমন অবস্থা। সুতরাং সাধুর হৃদয়ে আছে সমস্ত তত্ত্বসিদ্ধান্ত। এটা কেন হল, ওটা কেন হল—এ সবার উত্তর তাঁর জীবন—living source হচ্ছেন সাধু-গুরু-বৈষ্ণব। সবটার তিনি ব্যাখ্যা দিতে পারেন।

এই যে কৃষ্ণ, রাধারানী শ্বেতবর্ণ হলে কেন—এর উত্তর সাধু-সন্ত দিতে পারেন, দিয়ে রেখেছেন। এর পূর্বেরকার মহাজন কে? আমরা আমাদের গুরুতত্ত্ব থেকে গুনলাম, জানলাম, বুঝলাম। কিন্তু গুরুতত্ত্ব তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন কোথা থেকে? স্বপ্নবিলাসামৃতম্ নামে এক গ্রন্থ আছে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর। সেই ব্যাখ্যাটা নিয়েছেন অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম। কৃষ্ণের এক নাম শ্বেতকৃষ্ণ। শ্বেতকৃষ্ণ নিশ্চয় তিনি কখনও হয়েছেন, তা না হলে শাস্ত্রে এ কথা আসবে না। তার ইতিহাসও রয়েছে। পূর্ব পূর্ব মহাজনগণ, পূর্ব পূর্ব গোস্বামীবর্গের বিচারের মধ্যে রয়েছে এগুলো। সেইভাবে এসেছে গুরুপরম্পরাক্রমে। গুরুপরম্পরা কাকে বলব?—

আন্নাযঃ শ্রুতয়ঃ সান্ধাদব্রহ্ম বিদ্যোতি বিশ্রুতাঃ ।

গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তা বিশ্বকর্তৃর্হি ব্রহ্মণঃ ॥

ব্রহ্মা থেকে channel টা টেনেছেন । শ্রীকৃষ্ণ সর্ব আদি ।

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সঙ্ককান্ ।

শ্রীমধব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্মহরি-মাধবান্ ॥

সংস্কৃত সবাই পারে না বলে আমরা বাংলা কীর্তন করি,—

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্মুখ, হয় কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ, ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি ।

নারদ হৈতে ব্যাস, মধব কহে ব্যাসদাস, পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ-গতি ॥

একে আন্নায বলা হয়েছে, শ্রুতি বলা হয়েছে। কেন? কানে কানে এসেছে বলে। writing system—লেখপ্রণালী তখন আবিষ্কৃত হয়নি। যেহেতু ঐ জিনিষটা লেখপ্রণালীর ভিতরে আসেনি, কানে কানে এসেছে, সেইজন্য এর নাম শ্রুতি। তাঁরা শুনেছেন, মনে রেখেছেন এবং সেইটা বলেছেন। লেখপ্রণালীর যে ব্যাখ্যা সেটা অদ্ভুত। কি কি? ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, সান্কি ও পুষ্করাসাদি—এই হল চাররকমের লেখপ্রণালী। তার মধ্যে সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা ইত্যাদি বামদিক থেকে ডানদিকে লেখা হয়। এ হল ব্রাহ্মী। তারপর একটা আছে ডানদিক থেকে বামদিকে লেখা হয়। উর্দু, আরবী, পার্সী প্রভৃতি। একটা হল উপর থেকে নীচে। আর একটা নীচের থেকে উপরে—। এই চার রকমের লেখপ্রণালী শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। এই লেখপ্রণালী আবিষ্কার করলেন কে? আপনারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকের নাম বলবেন, কিন্তু শাস্ত্র তা মানেন নি। অ, আ, ক, খ এল কোথা থেকে? আমাদের শ্রীজীবগোস্বামী বলছেন,—“নারায়ণাদুদ্ভূতোহয়ং বর্ণক্রমঃ।” এই যে বর্ণমালা—Alpha-bet ভগবানের থেকে এসেছে। সেজন্য প্রত্যেকটি অক্ষরের যে ব্যাখ্যা আছে সে এক একটা Encyclopaedia ।

অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্বলোকৈক-নায়কঃ ।

উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ ॥

এই তিন অক্ষর নিয়ে একটা শব্দ হয়েছে—ওঁ। এর মধ্যে যে ‘অ’ সেই অ হলেন সর্বলোকৈক নায়ক কৃষ্ণ, আর ‘উ’ হলেন শ্রীমতী রাধারাণী। ‘ম’কার হল জীববাচক অর্থাৎ উপাস্য এবং উপাসক—এই দুটো এর মধ্যে আছে। ব্যাখ্যা রয়েছে শাস্ত্রে। অতএব ভগবান্ থেকে সব এসেছে। স্বরপ্রণালী ভগবান্ থেকে এসেছে। ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিনী সব ভগবান্ থেকে এসেছে। ১, ২, ৩, ৪ থেকে ০ পর্যন্ত সব ভগবান্ থেকে এসেছে। বর্তমানে যে বলা হচ্ছে Arabic numerics, Roman numerics, বাজে কথা ওসব। ভগবান্ থেকে এসেছে এসব। ইতিহাস আছে তার। সব জিনিষ সেখান থেকে এসেছে। যে ভগবান্ বললেন নিজে—আমি পূর্বের ছিলাম সৃষ্টির আদিত, বর্তমানে আছি এবং মহাপ্রলয়ে আমিই থাকব। সেই ভগবান্ই সব করেছে। তাঁর কোন প্রাকৃত জন্ম নেই। কন্মফলবাধ্য জীববিশেষ এ সংসারে এসে জন্মগ্রহণ করে মাতৃকৃষ্ণি থেকে। কিন্তু ভগবান্ কিরকম? তাঁকে যদি সাধারণ শিশু বলা হয় তাহলে ভুল হবে, তাঁকে যদি সাধারণ কন্মফলবাধ্য বলা হয়, তাহলে ভুল হবে। সেই ভুল সাবধান করে দিয়েছেন ভগবান্ নিজেই। শাস্ত্রের মধ্যে সব বুঝানো আছে। গীতার মধ্যেও বুঝানো আছে। (ক্রমশঃ)

পাশ্চাত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি এবং সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ গত ২২।৪।৯৮ তারিখে পঞ্চমবার পাশ্চাত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া বিপুল সফলতার সহিত প্রচার করিয়াছেন। ২২।৪।৯৮ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে রওনা হইয়া ৯ ঘণ্টা বিমান যাত্রার পর Amsterdam এ শ্রীল মহারাজ অবতরণ করিলে পর Holland ব্যতীত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের প্রায় ১২৫/১৩০ জন ভক্ত মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে হরিনাম সংকীৰ্ত্তনের দ্বারা শ্রীল মহারাজকে স্বাগত করেন। বিমানবন্দর হইতে ভক্তগণ Holland স্থিত Meije-63, 2411 PK Bodegraven এ শ্রীল মহারাজকে লইয়া আসেন। কতিপয় ভক্ত হরিকথার মাধ্যমে শ্রীল মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন এবং অবশেষে শ্রীল মহারাজজী ভক্তগণের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ প্রদান করেন।

২৩।৪।৯৮ তারিখে প্রাতঃকালীন প্রবচনে ভাগবত-পরম্পরা, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের জীবন চরিত ও তাঁহার অবদান এবং সাক্ষ্যকালীন প্রবচনে “অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাধ্যনাবৃতম্” শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। ২৪।৪।৯৮ হইতে ২৬।৪।৯৮ পর্য্যন্ত ভক্তগণ North Sea উপকূলে সুন্দর মনোরম Kijkduin Park এ শ্রীল মহারাজের অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। ২৪।৪।৯৮ তারিখে “তৃণাদপি সুনীচ” শ্লোক এবং সরাগ, নীরাগ বক্তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় Holland এর রাজধানী এবং বিশ্ব আদালতের স্থান The Hog (Den Hag) স্থিত হিন্দু মন্দিরে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৫।৪।৯৮ তারিখে মূর্চ্ছিত কষায়, নির্ধূত কষায়, প্রাপ্তপার্ষদ ভাগবত দেহ তিন প্রকার উত্তম ভাগবত সম্বন্ধে এবং সন্ধ্যায় শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের ব্রহ্মশাপের রহস্য, অজামিল চরিত্রদ্বারা শ্রীনাম-মহিমা এবং শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ২৬।৪।৯৮ তারিখে Amsterdam স্থিত Palto School of Phylosophy নামক মহাবিশ্ববিদ্যালয়ে সনাতন ধর্ম এবং প্রহ্লাদ-শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। Holland এ সুষ্ঠু প্রচার ব্যবস্থার জন্য সস্ত্রীক শ্রীহরেশ্বর দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীব্রজনাথ দাসাধিকারী ও গোবিন্দ দাসী শ্রীসমিতির ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

২৭।৪।৯৮ তারিখে Amsterdam এর প্রচার সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণ ফ্রান্সস্থিত Tolouse বিমানবন্দরে অবতরণ করিলে পর উপস্থিত ভক্তগণ বৈদিক রীতি অনুসারে শ্রীল মহারাজকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিমানবন্দর হইতে Domaine De Basplas II তে শ্রীল মহারাজকে আনয়ন করিলে পর ভক্তগণের উদ্দেশ্যে শ্রীল মহারাজ আশীর্বাদ প্রদান করেন। ৩।৫।৯৮ হইতে ৪।৫।৯৮ পর্য্যন্ত France স্থিত Molandier এ অবস্থান করেন। তথায় অবস্থানকালে শ্রীগৌড়ীয় গুরু-পরম্পরা, প্রাকৃত সহজিয়া বাবাজীগণের সিদ্ধান্ত ও রসবিচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। রায় রামানন্দ-সংবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে ‘সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য’ শ্লোক সম্বন্ধে বলেন,—একদিকে দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণ

‘সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য’ বলিতেছেন, অপরদিকে ‘ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে’ বলিতেছেন। এই দুই বিরুদ্ধ ধর্মের সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য নিশ্চয় থাকিবে। কেননা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে ‘বিরুদ্ধ ধর্মাস্তস্মিন্ ন চিত্রম্।’ শ্রীকৃষ্ণ দেহধর্ম, মনোধর্ম, সমাজধর্ম, হনুমানের দাস্যধর্ম, অর্জুনের সখ্যধর্ম, মনঃশিক্ষায় আলোচিত ‘লক্ষ্মীপতিরিতো ব্যোমনয়নীম্’ ধর্ম, দ্বারকা ধ্যান ছাড়িয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। কেননা দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণেরও মূল হলেন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর। আর কোন্ ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আসেন?—আত্মধর্ম সংস্থাপনের জন্য। কোন্ আত্মধর্ম? প্রেমাবতীরী করুণা-বরুণালয় ঔদার্যময় বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথে যাঁহারা আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের জন্য এবং সম্পূর্ণ জগদ্বাসীর জন্য পূর্বোক্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর অবতারের কারণ ‘রসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্’ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। এই দাস্য ধর্মে জীবের অধিকার। এইজন্যই শ্রীদাস গোস্বামী “পাদাজয়ো তব বিনা বর দাস্যমেব” শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। অতএব এই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেই আপাত বিরোধী দুই ধর্মের সুন্দর সামঞ্জস্য হইবে।

অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস। এই তিথিতে শ্রীল মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। ৩০।৪।৯৮ হইতে ৪।৫।৯৮ তারিখ পর্যন্ত হরিকথা শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা, তালবন লীলা-রহস্য, প্রকাশানন্দ উদ্ধার এবং সার্বভৌম উদ্ধারলীলা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। ১।৫।৯৮ তারিখে শ্রোতাগণের প্রশ্নের উত্তর, শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী অপেক্ষা শ্রোতা শুকদেব গোস্বামীর ভাগ্যের প্রশংসা-বিষয়ে আলোচনা করেন। ২।৫।৯৮ হইতে ৪।৫।৯৮ তারিখ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, শ্রীদামবন্ধন-লীলা প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজ বলেন,—দামোদর দুই প্রকার—(১) যশোদা দামোদর ও (২) রাধাদামোদর। কোন অবতारे শ্রীবিষ্ণুকে তাঁহার মাতা-পিতা বন্ধন করেন নাই বা বন্ধন করিতে পারেন নাই, অথবা বন্ধন করিবার প্রয়াস কখনও করেন নাই। একমাত্র মা যশোদাই স্বয়ং ভগবানকে বন্ধন করিয়াছিলেন। এই লীলাদ্বারা অন্যান্য অবতারের মা অপেক্ষা মা যশোদার প্রেমাদিক্য প্রকাশিত হইয়াছে। দামবন্ধনকালে গোপালকে বন্ধন করিবার সময় প্রতিবার দুই অঙ্গুলি দড়ি কেন কম হইত, তাহার রহস্য সবিস্তারে বর্ণনা করেন। যমলাজুর্ন ভঞ্জনলীলা, মধুকর্ষ, স্নিগ্ধকর্ষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। মধুকর্ষ, স্নিগ্ধকর্ষণের বর্ণনাইলী এত সুন্দর ছিল যে ব্রজবাসিগণ মনে করিতেন শ্রীকৃষ্ণের বর্ণিত এই লীলাটি এইমাত্র হইতেছে। লব-কুশের বর্ণনাতে অযোধ্যাবাসিগণ যেমন মত্তমুগ্ধ হইতেন ঠিক তদ্রূপ।

শ্রীজয়ন্তকৃদ্ দাসাধিকারী, শ্রীরামবিজয় দাসাধিকারী, শ্রীসর্বদর্শী দাসাধিকারী এবং শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী শ্রীল মহারাজের ফ্রান্সে সুষ্ঠু প্রচারব্যবস্থা করিয়া সমিতির বিশেষ প্রশংসাই হইয়াছেন।

৫।৫।৯৮ তারিখে Toulouse (France) হইতে England এর Bristol বিমানবন্দরে অবতরণপূর্বক Bath মহানগরীতে গমন করেন। এই মহানগরীতে Roman Bath নামে একটি গরম জলের উৎস আছে। ঐ উৎস হইতে ১২৫ মিলিয়ন

গ্যালন গরম জল নির্গত হইয়া Avon নদীতে পতিত হয়। ইংল্যান্ড প্রথমে রোমানদের দ্বারা শাসিত হইত। রোমানেরা London মহানগরীর নাম Ludon রাখিয়াছিল। পরে London নাম হইয়াছে। রোমানদের ধারণায় Ludon বরাহরূপী দেবতার দ্বারা শাসিত হইত। ৫।৫।৯৮ হইতে ৭।৫।৯৮ পর্য্যন্ত Bath এ থাকাকালীন মনুষ্য কাহাকে বলে, বর্তমান জগতের সমস্যা, সুখী হইবার জন্য আমরা শিশুপাল, হিরণ্যকশিপু, হিটলার, নেপোলিয়নের অনুসরণ করিব, না বৈষ্ণবগণের অনুসরণ করিব? কাহার নিকটে আমরা প্রকৃত সুখ পাইব—ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীল মহারাজ বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ৮।৫।৯৮ তারিখে Bath হইতে Wales মহানগরীতে গমন করেন। Wales এ প্রায় ৩২৫ জন ভক্ত ৪টি মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি লইয়া মহারাজের আগমনের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন। শ্রীল মহারাজকে দর্শন করিবামাত্রই সকলে হরিবোল হরিবোল করিয়া হাত উঠাইয়া কীর্তন করিতে থাকেন। এখানে শ্রীল মহারাজ বর্ণাশ্রম ধর্মের সাধারণ অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তির বিচার সুন্দর সহজ-সরল বোধগম্য ভাষায় পরিবেশন করেন। এখানেই শ্রীল মহারাজের আনুগত্যে ভক্তগণ শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশী-ব্রত পালন করেন। উক্ত দিবসে সারাদিন সপ্তম স্কন্ধ ভাগবত পারায়ণ হয় এবং গোধূলি লগ্নে মহাভিষেক সম্পন্ন হইলে সর্ববিঘ্নবিনাশক, ভববন্ধনাশক, ভক্তিবর্দ্ধনকারী শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীচরণামৃত সেবনান্তে অনুকল্প প্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

শ্রীল মহারাজ ইউরোপ প্রচারের সমাপ্তি ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগরী Birmingham এ করেন। এখানে একটি বিশাল ধর্মসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত সভাতে বৈদিক সংস্কৃতিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া, সুন্দর মনোজ্ঞ তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। সভান্তে জনৈক শ্রোতা সম্ভাব্য বিশ্বযুদ্ধ লইয়া প্রশ্ন করিলে শ্রীল মহারাজ বলেন,—এই বৎসর আমি সর্বত্র বিশ্বযুদ্ধের কথা শুনিতেছি। সকলের মধ্যে যুদ্ধের বিভীষিকা তাগুব নৃত্য করিতেছে। অনেকে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়িয়া, সম্পত্তি ছাড়িয়া দূর দূরান্তে যাইবার মনস্থ করিতেছেন যেখানে বোমের কুপ্রভাবের সম্ভাবনা কম। অনেকে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাইবার মনস্থ করিয়াও কলিকাতা মহানগরী ও দিল্লী মহানগরী নিকটস্থ হওয়ার জন্য তথায় যাইতে ভীত স্বপ্ত হইতেছেন। কোথায় গিয়া আশ্রয় লওয়া যায়? ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাবাসিগণ বোমের ভয়ে মাটির নীচে বিশেষ ধরণের ঘর প্রস্তুত করিয়াছিল। পুনরায় তাহারা বোমের কুপ্রভাব হইতে বাঁচিবার জন্য মাটির নীচে ঘর করিয়া dry fruit ভর্তি করিতেছে—এই সমস্ত সংবাদ আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে চিত্রসহ ছাপা হইতেছে। আমরাদিগকে ভয়ে ভীত হইতে হইবে না। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই বিভিন্ন প্রকার সমস্যা বর্তমান। জগতের সকলে নিরবচ্ছিন্ন সুখ চায়, ইহাই জীবের স্বভাব। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, আমরা নিজেরাই ওই সমস্ত সমস্যাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি। বর্তমান মানব অত্যন্ত স্বার্থী হইয়াছে। তাহারা চায়—আমরা বিনাশকারী বোমা বানাইব, পরীক্ষা করিব, অন্য কেহ বানাইতে পারিবে না, পরীক্ষা করিতে পারিবে না। আমি মিথ্যা বলিব; আর সকলে সত্য বলুক। আমি অত্যাচার করিব; আর সকলে দয়াবান্ এবং সহনশীল হউক। বিজ্ঞান পৃথিবীকে করতলগত করিয়া দিয়াছে। জড়বিজ্ঞানের

আবিষ্কার আশীর্বাদের পরিবর্তে অধিকাংশস্থলেই অভিশাপ হইয়াছে। পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে বিশ্বাস নাই, প্রেম নাই। এক ফ্লাটে মৃত্যুতে কান্নার রোল, অন্য ফ্লাটে বিবাহের সানাই বাজিতেছে, Meat চলিতেছে। Meat মানে কি? Meat মানে Me+eat. To whom I eat today they will eat me tomorrow or any other day, it is sure. বিধবংসকারী অস্ত্রশস্ত্র কাহারো তৈয়ারী করিয়াছে? আজ যাহারা শান্তির কথা আওড়াইতেছে তাহারো বানাইয়াছে। এই প্রকার আচারহীন লোকের কথা জগৎ মানিবে কেন? সমস্যার সমাধান কিরূপে হইবে? আরও বড়িয়া যাইবে। সার্বকালিক, সার্বদেশিক সার্বজনীন সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়—ভগবদ্ভক্তি ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ণন। আপনারা নির্ভয়ে হরিনাম করুন, বোমের কুপ্রভাব আপনাদের প্রতি কার্যকরী হইবে না। আত্মা অজর, অমর, নিত্য; কোনপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারবে না। ইতঃ পূর্বে কতবার প্রলয়ঙ্করী বিশ্বযুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু আত্মার উপর তাহার কোন প্রভাব পড়ে নাই।

আজ বিশ্বে এত গো-বধ হইতেছে, এর কুপ্রভাব কোথায় যাইবে? যাহারা গোবধ করিতেছে, ভক্ষণ করিতেছে, তাহাদের উপর বোমের প্রভাব পড়িবেই পড়িবে। ইংল্যাণ্ডে সুষ্ঠু প্রচার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীভূধর দাসাধিকারী, শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী, শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

ইউরোপ প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ ১৬ই মে আমেরিকার রাজধানী Washington DCতে রওনা হন। বিমানবন্দরে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণের কীর্তনধবনিতে সমগ্র বিমানবন্দর মুখরিত হইয়া উঠে। এক সপ্তাহ যাবৎ অবস্থানকালে শ্রীল মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং প্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তির প্রথম সোপান হইতে শুরু করিয়া উন্নত সোপান পর্যন্ত অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় বর্ণন করেন। শ্রোতৃবৃন্দ ভক্তির সূক্ষ্ম বিচার শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হন। অস্মদীয় পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সন্ন্যাসশিষ্য প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ Tomp Kins Square Park এর যে বৃক্ষের নীচে বসিয়া শ্রীহরিনাম প্রচার শুরু করিয়াছিলেন, শ্রীল মহারাজ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে তথায় হরিনাম সঙ্কীর্তন করেন। Washington DC তে বিশ্বপ্রসিদ্ধ white house এর অতি সন্নিহিত একটা পার্কে ভক্তগণ নগর-সঙ্কীর্তন করেন।

২০শে মে শ্রীল মহারাজ Washington DC হইতে Pensylvenia তে Mobile house দ্বারা যাত্রা করেন। ভক্তগণ এই মোটরভ্যানটি এমন সুন্দরভাবে তৈয়ারী করিয়াছিল যে মনে হয় যেন একটা ঘরকে উঠাইয়া মোটর গাড়ীর চাকার উপরে রাখা হইয়াছে। দ্বিতল বিশিষ্ট এই চলন্ত ঘরটিতে দুইটা শয়নকক্ষ, পাকশালা, স্নানাগার, শৌচালয়, ভোজনকক্ষ বিদ্যমান। এখানে প্রপূজ্যচরণ স্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত গীতানগরীতে শ্রীল মহারাজ সমভিব্যাহারে দর্শন করিতে যাইলে মৃদঙ্গধ্বনি শ্রবণ করা মাত্রই একসাথে ২৫/৩০ টি ময়ূর পেখম তুলিয়া শ্রীল মহারাজের নিকট নৃত্যদ্বারা স্বাগত করে। স্থানীয় ভক্তগণ বলেন, আমরা কখনই ময়ূরের মধ্যে এত আনন্দ ও একসঙ্গে এত ময়ূরকে নৃত্য করিতে

দেখি নাই। এই গীতানগরীতে শ্রীল মহারাজ গীতার গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম, সর্বগুহ্যতম তত্ত্বের বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। Washington এবং Pennsylvania তে সুষ্ঠু প্রচার ব্যবস্থার জন্য শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও শ্রীমাধব দাসাধিকারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২৩শে মে শ্রীল মহারাজ আমেরিকার সর্বাধিক জনবহুল শহর New York এ পৌঁছান। ২৬।৫।৯৮ তারিখ পর্যন্ত অবস্থানকালে সাধুসঙ্গের মহিমা, ব্যাস-নারদ-সংবাদ এবং প্রকাশানন্দ উদ্ধার সম্বন্ধে পাঠ করেন। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান স্বামী, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাসাধিকারী শ্রীল মহারাজের এখানকার প্রচারকার্যের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীসমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

২৭শে মে New York হইতে Houston এ পদার্পণ করেন শ্রীল মহারাজ। বিমানবন্দরে অভ্যর্থনার পর শ্রীল মহারাজকে Mossuri city লইয়া যান। Houston এ স্থানীয় Hindu worship society তে ব্যাস-নারদ-সংবাদ, শ্রীধ্রুব-চরিত্র, শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র, অজামিল-চরিত্র এবং দামবন্ধনলীলা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করেন। এইখানে প্রায় ৫০,০০০ ভারতীয় বাস করেন। তজ্জন্য শ্রীল মহারাজ এখানে বৈদিক সংস্কৃতির উপর বিশেষ ভাষণ প্রদান করেন। পাশ্চাত্ত্যে এই প্রথম ভারতীয় ভাষায় পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা দি হয় এইখানে। শ্রীবিষ্ণু দাসাধিকারী ও শ্রীকৃষ্ণদাস দাসাধিকারী এখানকার প্রচারের যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া শ্রীসমিতির ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

অতঃপর ৩।৬।৯৮ তারিখে শ্রীল মহারাজ আমেরিকার বৃহত্তম মহানগরী Los Angels এ যাত্রা করেন। বিমানবন্দরে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই অপেক্ষমান ভক্তগণের কীর্তনের রোলে বিমানবন্দর কম্পিত হইয়া উঠে। সপ্তাহব্যাপী অবস্থানকালে এ জলের উপর নির্মিত Boy Scouts Boat House নামক জাহাজের আকৃতিবিশিষ্ট বাড়ীতে অনুষ্ঠান হয়। শ্রীল মহারাজ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর চরিত্র, শিক্ষা এবং সাম্প্রদায়িক অবদান-বৈশিষ্ট্য, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিক্ষা এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের কারণ ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল মহারাজের এখানকার প্রচারের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য কুমারী গৌরাঙ্গী দেবীর সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

১০।৬।৯৮ হইতে ১৬।৬।৯৮ তারিখ পর্যন্ত Sanfrancisco এবং Oakland এ প্রচারকালে ভক্তিতত্ত্ববিবেক হইতে গুণীভূতা ভক্তি, প্রধানীভূতা ভক্তি, শুদ্ধাভক্তি প্রভৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে ছায়াভাস, প্রতিবিন্ধাভাস, আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধার বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সায়ংকালীন বক্তৃতায় শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষ বিশেষ উপাখ্যানের মাধ্যমে তত্ত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেন। শ্রীরাধাকান্ত দাসাধিকারী ও শ্রীমতী রতিকলা দেবী এখানকার সুষ্ঠু প্রচার ব্যবস্থার জন্য শ্রীসমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

১৭।৬।৯৮ হইতে ২৫।৬।৯৮ পর্যন্ত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, ফল-ফুল, খরগোস-হরিণ, ময়ূর প্রভৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত ব্রজভাবোদ্দীপক Badger নামক গ্রামে পাঠ-বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রান্ত হইতে ৩৫০ জন ভক্ত উক্ত স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন। Badger এ থাকাকালীন শ্রীমদগোবিন্দকৃষ্ণের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত এবং

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পরিবেশন করেন। অল্পকূট প্রসঙ্গে একদিন ৩৬৫ প্রকারের সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন, মিষ্টান্নাদি শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ভোগ নিবেদন করা হয়। এখানকার বালক-বালিকারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। তন্মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা নাটিকাটি সকলের হৃদয় দ্রবীভূত করে। এখানকার প্রচারের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য সস্ত্রীক শ্রীনিগুণ দাসাধিকারী, শ্রীনন্দগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন দাসাধিকারী ও শ্রীগোপবৃন্দপাল দাসাধিকারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২৬।৮।৯৮ হইতে ২।৭।৯৮ পর্য্যন্ত Hawaii দ্বীপপুঞ্জ এবং ৩।৭।৯৮—৪।৭।৯৮ পর্য্যন্ত Tokyo প্রচার বিবরণ নিম্নরূপ :—

২৬।৬।৯৮ তারিখে Hawaii এর রাজধানী Honolulu বিমানবন্দরে ভক্তগণ শ্রীল মহারাজকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর খ্যাতনামা কবি শ্রীইন্দ্রলল কপূর মহাশয়ের গৃহে অবস্থান। কপূর মহাশয় স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর ব্যক্তিগত সাংবাদিক ছিলেন। এখানে দুইদিন অবস্থানকালে শ্রীল মহারাজ (১) শ্রীগোকুলধাম এবং অন্যান্য ধামের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য, (২) জীব নিজ নিজ কর্মানুসারে উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মলাভ করে, (৩) ভগবান্ নিরাকার নহেন ও (৪) শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তিদ্বারা আলোচনা করেন।

২৭।৬।৯৮ তারিখে Oahu দ্বীপ হইতে Maui রওনা হন। এই দ্বীপটি তিমি মাছের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে পর্য্যটকগণ এখানে তিমি মাছ দেখিবার জন্য উপস্থিত হন। Maui এবং Tokyo তে থাকাকালীন শ্রীল মহারাজ মনুষ্য জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর-প্রণীত ‘মাধুর্য্য কাদম্বিনী’ গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন। এতদঞ্চলে প্রচারের যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া শ্রীইন্দ্রলল কপূর, শ্রীকেশরনাথ দাসাধিকারী, শ্রীনন্দগোপাল দাসাধিকারী ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্র দাসাধিকারী শ্রীসমিতির বিশেষ প্রশংসার্হ হইয়াছেন।

শ্রীল মহারাজের সহিত প্রচারে ইউরোপে শ্রীসুবলসখা ব্রহ্মচারী, আমেরিকায় শ্রীরামচন্দ্র দাসাধিকারী এবং সর্ববক্ষণ প্রচারে সাহায্য করিয়া শ্রীব্রজনাথ দাসাধিকারী (Holland), শ্রীধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী (বিদ্যালঙ্কার), শ্রীপুণ্ডরীক ব্রহ্মচারী, শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী (Computer reporter), শ্রীপ্রেমপ্রয়োজন ব্রহ্মচারী, শ্রীমতী বৃন্দাদেবী ও শ্রীমতী তুঙ্গবিদ্যাদেবী শ্রীসমিতির বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যালঙ্কার

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে

সাদর আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিষ্টার্ড)

☎ ৪০০৬৮



শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ

পোঃ তুরা, পিন-৭৯৪০০১

ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)

☎ ৩২৬৯১

সাদর সন্তোষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিঃসৃতধারায় সমিতির বর্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও উক্ত মঠের সেবকবৃন্দের উদ্যোগে আগামী ১৮ই শ্রাবণ (ইং ৪।৮।৯৮) মঙ্গলবার হইতে ২২শে শ্রাবণ (ইং ৮।৮।৯৮) শনিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৫।৮।৯৮) শনিবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উক্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, ধর্মসভা, নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন, ছায়াচিত্র এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন তথা বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গ-রাধাবিনোদ-বিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ এবং শ্রীশ্রীনন্দোৎসব-দিবসে সর্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠানসূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

৩২শে আষাঢ়, ১৪০৫

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী

২৮শে শ্রাবণ (ইং ১৪।৮।৯৮), শুক্রবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—যথারীতি মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।
পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন।
গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও গীতিকীর্ত্তন।
রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৫।৮।৯৮), শনিবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪ টায়।
নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন—মঙ্গলারতি অন্তে প্রাতঃ হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৮টা পর্য্যন্ত
নগর পরিক্রমা।
পূর্ব্বাহ্নে—৮-৩০ টার পর সম্পূর্ণ দিবস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী হইতে
শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রসঙ্গ পারায়ণ।
সন্ধ্যায়—আরাট্রিক ও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন।
রাত্রি—৮টা হইতে ধর্ম্মসভা, রামমঙ্গল ও ছায়াচিত্রযোগে
শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

৩০শে শ্রাবণ (ইং ১৬।৮।৯৮), রবিবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪টায়।
পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও কীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।
সন্ধ্যায়—আরাট্রিক ও কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভা, পরে ছায়াচিত্রযোগে
শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দো জয়তঃ

✠	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।	✠
ধর্ম্যঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাসু যঃ।		নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।
✠	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	✠

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫০শ বর্ষ }

৯ হৃষীকেশ, সঙ্কর্যণ, ৫১২ শ্রীগৌরান্দ
৩১ শ্রাবণ, সোমবার, ১৪০৫, ইং ১৭/৮/৯৮

{ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-নুতি-সূত্রকম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামী-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-গোস্বামি-বিরচিতম্]

দেব-সিদ্ধ-মুক্ত-যুক্ত-ভক্ত-বৃন্দ-বন্দিতং

পাপ-তাপ-দাব-দাহ-দঙ্ক-দুঃখ-খণ্ডিতম্।

কৃষ্ণ-নাম-সীধু-ধাম-ধন্য-দান-সাগরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১ ॥

দেবগণ, সিদ্ধগণ, মুক্তগণ, যোগিগণ ও ভগবন্তুগণ সর্বদা যাঁহার স্তব করিতেছেন,
(সদোপাস্য.....পরমেষ্টি প্রভৃতিভিঃ) ও যিনি (ঈশ-বৈমুখ্যরূপ) অপকর্ম্ম জাত (ভুক্তি-
মুক্তি-সিদ্ধি কামনা-জনিত) ত্রিতাপ দাবানলে দঙ্ক বিশ্বের দাহজ্বালা খণ্ডনকারী, শ্রীকৃষ্ণনাম-
রূপ সুধা-ভাণ্ডারের স্বনাম-ধন্য দানসাগর-স্বরূপ (সুধাকরের জন্ম ক্ষীরসাগর)——সেই দেবতা
প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরান্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১ ॥

প্রেম-ধাম-দিব্য-দীর্ঘ-দেহ-দেব-নন্দিতং

হেম-কুঞ্জ-পুঞ্জ-নিদি কান্তি-চন্দ্র-বন্দিতম্।

নাম-গান-নৃত্য-নব্য-দিব্য-ভাব-মন্দিরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২ ॥

দেবগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী সুদীর্ঘ দিব্য প্রেমময় যাঁহার শ্রীবিগ্রহ, কোটি কনকপদ্মধিকারী চন্দ-বন্দিত যাঁহার শ্রীঅঙ্গজ্যোতি এবং শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তনে নৃত্যবিলাসজাত নিত্য নব-নবায়মান অপ্রাকৃত সাত্ত্বিকভাব সমূহের যিনি লীলাপীঠ-স্বরূপ—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরান্ধ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২ ॥

স্বর্ণ-কোটি-দর্পনাভ-দেহ-বর্ণ-গৌরবং

পদ্ম-পারিজাত-গন্ধ-বন্দিতাঙ্গ-সৌরভম্ ।

কোটি-কাম-মূর্ছিতাঙ্ঘ্রি-রূপ-রাস-রঙ্গরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩ ॥

কাঞ্চনবর্ণের কোটিগুণ তেজোময়-দর্পণসদৃশ (যাহাতে প্রতিফলন লক্ষিত হয়) যাঁহার শ্রীঅঙ্গ-লাবণ্যের মহিমা, (পার্থিব) পদ্মগন্ধ ও (স্বর্গীয়) পারিজাত-গন্ধ মূর্তিমান্ হইয়া যাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সৌরভের স্তব করিতেছে, এবং কোটি কোটি কন্দর্প যে শ্রীরূপের চরণতলে (বিশ্ববিশ্রুত নিজ রূপাভিमानে নিদারুণ আঘাতে) মূর্ছিত অবস্থায় পতিত—সেই রূপের আবার রাসবিলাস (বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাববিলাসময় বিচিত্র ছন্দের স্পন্দন সৌষ্ঠব) প্রদর্শনীর বিতান-বিগ্রহ যিনি—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরান্ধ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩ ॥

দ্বীপ-নব্য-গাঙ্গ-বঙ্গ-জন্ম-কর্ম-দর্শিতং

শ্রীনিবাস-বাস-জন্য-নাম-রাস-হর্ষিতম্ ।

শ্রী-হরিপ্রিয়েশ-পূজ্যধী-শচী-পুরন্দরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪ ॥

যিনি গৌড়দেশে গঙ্গাতটস্থ শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভাব ও গার্হস্থ্য-লীলাদি প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি শ্রীবাস অঙ্গনকে ধন্য করিয়া সংকীৰ্ত্তন রাস প্রকাশে (সজ্জনের) হর্ষবর্দ্ধন করিয়াছেন এবং যিনি শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণপতি এবং শ্রীশচীমাতা ও শ্রীমিশ্রপুরন্দরে (মাতাপিতার ন্যায়) পূজ্যবুদ্ধি-সম্পন্ন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরান্ধ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪ ॥

শ্রীশচী-দুলাল বাল্য-সঙ্গ-চঞ্চলং

আকুমার-সর্ব-শাস্ত্র-দক্ষ-তর্ক-মঙ্গলম্ ।

ছাত্র-সঙ্গ-রঙ্গ-দিগ্‌জিগীষু দর্প-সংহরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৫ ॥

যে শ্রীশচী-দুলাল (যশোদাদুলালের ন্যায়) শৈশবে বালসঙ্গে বালচাঞ্চল্যপর (ক্রীড়ামোদী) ও কৌমার বয়সেই যিনি সর্বশাস্ত্র-বিশারদ এবং (তাৎকালিক নব্য-ন্যায় নৈপুণ্যগব্বী নবদ্বীপের নাস্তিক্যপ্রায় পাণ্ডিত্যের) তর্কযুক্তির প্রয়োগ কৌশলে মঙ্গলময়

(ভগবদ্ভক্তির) সংস্থাপক এবং যিনি ছাত্রগণসঙ্গে (জাহ্নবী তীরে) অবলীলাক্রমে প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দর্প হরণ করিয়াছেন—আমি সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরান্ধ-সুন্দরেরই স্তব করি ॥ ৫ ॥

স্কন্ধ-বাহি-চৌর-তীর্থ-বিপ্র-চিত্র-খেলনং
ব্রহ্মচারি-দুষ্ক-পায়ি-দেবানন্দ-হেলনম্ ।
লৌল্য-মূল্য-লভ্য-কৃষ্ণ-যুক্তি-কৃচ্ছ-ধিক্করং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৬ ॥

যিনি শৈশবে (গাত্রাভরণ হরণমানসে স্কন্ধে লইয়া পলায়মান) চোরের স্কন্ধে বাহিত হইয়াই প্রত্যাবর্তন-লীলা ও সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ-বিপ্রের অভীষ্ট দেবতারূপে দর্শনদান ও উচ্ছিষ্ট-দানরূপ বিচিত্র লীলা প্রদর্শন করেন এবং যিনি পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী বা পাণ্ডিত্যভিমानी দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া—একমাত্র লৌল্য বা শ্রদ্ধাই কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তির হেতু বলিয়া পাণ্ডিত্য ও কৃচ্ছতাকে ধিক্কার করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরান্ধ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৭ ॥

আর্য্য-ধর্ম্ম-পাল-লক্ষ-দীক্ষ-কৃষ্ণ-কীর্ত্তনং
লক্ষ-লক্ষ-ভক্ত-গীত-বাদ্য-দিব্য-নর্ত্তনম্ ।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নাশ-দস্যু-দুষ্ট-দুষ্কৃতোদ্ধরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৭ ॥

যিনি বৈদিক ধর্ম্মের মর্যাদাকারী ও শ্রীগুরুপদাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রবর্ত্তনকারী এবং যিনি লক্ষ লক্ষ ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তনে নর্ত্তন-বিলাসপরায়ণ ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নাশা জগাই-মাধাই প্রভৃতি দস্যু-দুষ্টদলের পরমোদ্ধারণ—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরান্ধ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৬ ॥

শ্লেচ্ছ-রাজ-নাম-বাধ-ভক্ত-ভীতি-ভঞ্জনং
লক্ষ-লক্ষ-দ্বীপ-নৈশ-কোটি-কণ্ঠ-কীর্ত্তনম্ ।
শ্রীমদঙ্গ-তাল-বাদ্য-নৃত্য-কাজী-নিস্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৮ ॥

শ্লেচ্ছরাজ (প্রতিনিধি চাঁদকাজী) শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে বাধাদান করিলে যিনি ভক্তগণের ভয় ভঞ্নের জন্য নিশাভাগে লক্ষ লক্ষ দ্বীপ-মালা (মাশাল) উদ্ভাসিত কোটি কোটি লোকের (স্বতঃস্ফূর্ত্ত) সংকীর্ত্তন পরিচালন করেন এবং যিনি সুমধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনি সংযোগে করতাল প্রভৃতি বাদ্যসহকারে নৃত্য করিতে করিতে (শাসনকর্ত্তা) কাজীকে (শাসনাভিমান ঘুচাইয়া) আত্মসাৎ করিয়াছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরান্ধ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৮ ॥

লক্ষ-লোচনাশ্র-বর্ষ-হর্ষ-কেশ-কর্ত্তনং
কোটি-কণ্ঠ-কৃষ্ণ-কীর্ত্তনাঢ্য-দণ্ড-ধারণম্ ।

ন্যাসি-বেশে-সর্ব-দেশ হা-হুতাশ-কাতরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৯ ॥

লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর নয়নাশ্রু বর্ষণের মধ্যে যিনি পরমানন্দে (জন-কল্যাণের জন্য) মস্তক মুগ্ধন করিয়াছেন, কোটি কোটি লোকের সম্মিলিত শ্রীহরিসংকীর্তন যাঁহার (সন্ন্যাসের) দণ্ড-ধারণলীলা সমৃদ্ধিমান করিয়াছিল এবং যাঁহার সন্ন্যাস-বেশে সমগ্র দেশ কাতরে হাহাকার করিয়াছিল—সেই দেবতা প্রেমময় মূর্তি শ্রীগৌরানন্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৯ ॥

শ্রীযতীশঃভক্ত-বেশ-রাঢ়-দেশ-চারণং

কৃষ্ণ-চৈতন্যাত্ম-কৃষ্ণ-নাম-জীব-তারণম্ ।

ভাব-বিভ্রমাত্ম-মত্ত-ধাবমান-ভূধরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১০ ॥

যে নব-যতিরাজ—ভক্তবেশ ধারণ করিয়া পাদ-চারণে রাঢ়দেশ পবিত্র করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—এই অভিনব নাম গ্রহণকারী কৃষ্ণনাম দিয়া জীবগণকে তারণ করেন এবং যিনি স্বভজন-বিভজন রসাবেশে দিব্যোন্মাদে হেমগিরির ন্যায় দিগ্বিদিকে ধাবিত হইতে থাকেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরানন্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১০ ॥

প্রশ্নোত্তর

অন্যাভিলাষ

১। জড়-আশার কি সীমা আছে? উহা কি শান্তিদায়িনী?

“আশার ইয়ত্তা নাই, আশাপথ সদা ভাই,
নৈরাশ্য কণ্টকে রুদ্ধ আছে।

বাড়' যত, আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে।।”

—নির্ব্বোধলক্ষণ উপলব্ধি ২, কঃ কঃ

২। কামিজনের অন্তর্পূর্ণা-পূজায় কি বিয়ুঃপ্রীতির উদ্দেশ আছে?

“ভাবিজন্মে প্রচুর অন্তর্পাইবার আশায় যে-সকল স্ত্রীলোক অন্তর্পূর্ণার পূজা করে, তাহাদের ‘বিয়ুঃপ্রীতি-কাম’ বলিয়া সঙ্কল্পটি কেবল বাক্যমাত্র।”

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

৩। অন্যাভিলাষী বহিঃসুখ-জন কয় প্রকার?

“বহিঃসুখ জন ছয় প্রকার, যথা—(১) নীতিরহিত ও ঈশ্বর-বিশ্বাসরহিত ব্যক্তি, (২) নৈতিক অথচ ঈশ্বর-বিশ্বাসরহিত ব্যক্তি; (৩) সেশ্বর নৈতিক—যিনি ঈশ্বরকে নীতির অধীন বলিয়া জানেন; (৪) মিথ্যাচারী বা দান্তিক (বৈড়ালব্রতিক, বকব্রতিক ও তৎকর্তৃক বধি ত; (৫) নিব্বিশেষবাদী ও (৬) বহীশ্বরবাদী।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৪। নীতিহীন নিরীশ্বরের জীবন কিরূপ?

“যাহারা নীতি ও ঈশ্বর মানে না, তাহারা বিকর্ম ও অকর্ম-পরায়ণ। নীতি না থাকিলে যথেষ্টাচার ঘটয়া থাকে।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৫। নিরীশ্বর নৈতিকের চরিত্র কি বিশ্বাসযোগ্য?

“নিরীশ্বর-নৈতিক সুবিধা পাইলে স্বার্থের নিকট নীতিকে যে বলিদান না করিবেন, ইহার নিশ্চয়তা কোথায়? তাহাদের চরিত্র পরীক্ষা করিলেই তাহাদের মতের অকর্মণ্যতা লক্ষিত হইবে।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৬। সেশ্বর-কর্মী কি যথার্থই ঈশ্বরভক্ত?

“তৃতীয় শ্রেণীর বহিস্মুখ লোকেরা ‘সেশ্বর কর্মী’ বলিয়া অভিহিত হন। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহারা নীতির মধ্যে ঈশকৃতজ্ঞতাকে একটি প্রধান কর্তব্য বলেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহারা এক শ্রেণীর। ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়া প্রথমে তাঁহাতে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণিধান করিলে এবং পরে নীতির ফল সচ্চরিত্র উদিত হইলে ঈশ্বর-বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই—ইহা প্রথম শ্রেণীর সেশ্বর কর্মীদিগের মত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সেশ্বর-কর্মীগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরোপাসনারূপ সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য-সকল করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়; চিত্ত শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন আর জীবের কৃত্য থাকে না; এই মতে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধটি পাস্ত-সম্বন্ধ-মাত্র—নিত্য নয়।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৭। মিথ্যাচারী কয় প্রকার?

“মিথ্যাচারীগণ—চতুর্থ প্রকার বহিস্মুখ-মধ্যে পরিগণিত। ইহারা দ্বিবিধ—বৈড়ালব্রতিক ও বঞ্চিত।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৮। বৈড়ালব্রতিকগণের স্বভাব কি এবং তাহাদের অনুগমনকারীর ফল কি?

“বৈড়ালব্রতিকগণ জগৎকে বঞ্চনাপূর্বক অধর্মপথকে পরিষ্কার করিয়া দেয়। অনেক নিবোঁধ লোক বাহিরে তাহাদের দর্শনপূর্বক বঞ্চিত হইয়া সেই পথ অবলম্বন করে। অবশেষে ভগবদ্বহিস্মুখ হইয়া পড়ে। উপরে (বাহিরে) দিব্য-বৈষ্ণব-চিহ্ন, সর্বদা ভগবান্নাম, জগতের প্রতি অনাসক্তি, সময়ে সময়ে ভাল কথা—এ সমস্ত লক্ষণই উহাদের মধ্যে লক্ষিত হয় এবং গোপনে কনক-কামিনী সংগ্রহ চেষ্টা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অত্যাচারই তাহাদের ‘অন্তরঙ্গ’ ভাব।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৯। উচ্চাকাঙ্ক্ষার কি নিবৃত্তি আছে?

“ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই, শিবপদ কিসে পাই,

এই চিন্তা হ’ব অবিরত।

শিবত্ব লভিয়া নর,

ব্রহ্ম-সাম্য তদন্তর,

আশা করে শঙ্করানুগত।।

অতএব আশা-পাশ, যাহে হয় সর্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন-ভাব ল'য়ে, চৈতন্য চরণাশ্রয়ে,
বাস কর সদা শান্তিপুরে।।”

—নির্ব্বদলক্ষণ উপলক্ষি ২, কঃ কঃ

১০। শুদ্ধভক্তিতে অন্যাভিলাষাদির স্থান আছে কি?

“শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণসেবার্থে স্বীয় (পারমার্থিক সিদ্ধি-পথে) উন্নতি-বাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না—কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনরূপ সেব্য-ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি-স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না এবং জ্ঞান ও কর্ম তত্ত্বস্বরূপে থাকিতে পারে না।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১৯।১৬৮

কর্ম

১। কর্ম কাহাকে বলে?

“কর্মিগণ কেবল কৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও বাহিরে কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্য,—যাহাতে কোনপ্রকার প্রাকৃত-সুখ লাভ হয়। স্বার্থপর কর্মকেই ‘কর্ম’ বলে।”

—সঙ্গত্যাগ, সঃ তোঃ ১১।১১

২। বিষ্ণুর উদ্দেশ্য থাকিলেও ইষ্টপূর্তাদিতে কি সাক্ষাৎ চিৎপ্রবৃত্তি আছে?

“বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া ইষ্টপূর্ত প্রভৃতি শুভ কর্ম কৃত হইলেও সেই সেই কর্মে সাক্ষাৎ চিৎপ্রবৃত্তি নাই।”

—‘নামমাহাত্ম্য সূচনা’, হঃ চিঃ

৩। ‘অদৃষ্ট’ কাহাকে বলে?

“সকল জীবই পূর্ব্ব-সংস্কারানুসারে স্বভাব লাভ করিয়া থাকেন; সেই স্বভাবানুসারেই জীবের চেষ্টার উদয় হয়,—ইহাকেই ‘অদৃষ্ট’ বা ‘কর্মফল’ বলে। পূর্ব্বকল্পে তিনি যে-সকল কর্ম করিয়াছিলেন, তদনুসারেই তাঁহার স্বভাব চেষ্টা হয়।”

—ব্রঃ সং ৫।২৩

৪। কর্ম-জ্ঞানের মালিন্য শোধিত হয় কিরূপে?

“কর্মের কাম্যফল নিরসনদ্বারা কেবল ভগবৎপ্রীত্যর্থ উপার্জিত হইলে সেই কর্ম ভক্তিশোধিত হয়। মোক্ষে বিতৃষ্ণা উৎপাদনপূর্ব্বক ভগবৎসেবাদিতে রাগোৎপত্তির দ্বারা বৈরাগ্যের ভক্তিশোধিত অবস্থা হয়। অদ্বৈতাত্মতত্ত্ব-বোধাদি ত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞান যখন ভগবদীয়ত্ব-বুদ্ধি উৎপত্তি করে, তখন জ্ঞান ভক্তিদ্বারা শোধিত হয়।”

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্যানুবাদ

৫। আস্তিকদিগের ভাগ্য কি অবিচারিত?

“নাস্তিকদিগের ঘটনার ন্যায় আস্তিকদিগের ভাগ্য অবিচারিত নয়। জীবের ভাগ্য—জীবেরই কর্মানুসারে বিচারিত ফলবিশেষ।”

—শ্রীমঃ শিঃ ৮ম পঃ

৬। কৰ্মে কাহার কিরূপ কর্তৃত্ব আছে?

“জীব যে কার্য্যটি করেন, তাহাতে তাহার মূল কর্তৃত্ব সর্বকালেই থাকে, প্রকৃতি সেই কার্য্যের যে সাহায্য করেন তাহাতে তাহার গৌণ কর্তৃত্ব এবং ফলদান-বিষয়ে ঈশ্বরের অনুষ্ণ-কর্তৃত্ব। জীব স্বেচ্ছাক্রমে অবিদ্যাভিনিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মূল কর্তৃত্ব কখনও লোপ হয় না। অবিদ্যা-প্রবেশের পর জীব যত কৰ্ম্ম করেন, সে-সকলই ফলোন্মুখ হইলে ‘ভাগ্য’ নামে অভিহিত হয়।”

—শ্রীমঃ শিঃ, ৮ম পঃ

৭। কৰ্ম্ম অনাদি কিরূপে?

“‘কৃষ্ণের দাস আমি’ এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নামই ‘অবিদ্যা’; সেই অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই—তটস্থ সন্ধিস্থলে জীবের সেই কৰ্ম্মমূল উদিত হইয়াছিল। অতএব জড়কালে কৰ্ম্মের আদি পাওয়া যায় না, সুতরাং কৰ্ম্ম—অনাদি।”

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৮। ভক্তি ও ভগবদ্ধিমুখ কৰ্ম্মে পার্থক্য কি?

“কৃষ্ণপ্রসাদ লাভের জন্য যদি কেহ কৰ্ম্ম করেন, তবে সেই কৰ্ম্মের নামেই ভক্তি, আর যে কৰ্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহিস্মুখজ্ঞান দান করে, সেই কৰ্ম্মই ভগবদ্ধিমুখ।”

—সঙ্গত্যাগ, সং তোঃ ১১।১১

৯। কৰ্ম্ম কোন্ অবস্থায় ভক্তিতে পরিণত হয়?

“কৰ্ম্মের স্বরূপ পরিবর্তিত হইবার পূর্বে তিনটি অবস্থা হয়—অর্থাৎ নিষ্কাম অবস্থা, কৰ্ম্মার্পণাবস্থা ও কৰ্ম্মযোগাবস্থা। ঐ তিন অবস্থা অতিক্রম করিলে কৰ্ম্মের স্বরূপ পরিবর্তিত হইয়া পরিচর্য্যারূপ ভক্তি হইয়া পড়ে।”

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

১০। কৰ্ম্ম ও জ্ঞান কি ভক্তিপ্রদা সুকৃতি?

“কৰ্ম্ম ভক্তিরূপে জীবকে বসাইয়া নিরস্ত হয়। বৈরাগ্য ও বিবেক প্রায়ই অভেদব্রহ্ম-জ্ঞানে জীবকে প্রোথিত করিয়া রাখে। ব্রহ্মজ্ঞান প্রায়ই জীবকে ভগবচ্চরণ হইতে বঞ্চিত করে, এইজন্যই ইহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ভক্তিপ্রদা সুকৃতি বলা যায় না।”

—জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

১১। বেদশাস্ত্র কোন্টীকে ভগবল্লাভের নিরাপদ উপায় বলিয়াছেন?

“বেদ ও পুরাণশাস্ত্র অনেক প্রকার উপাদেয়র কথা স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন; তাহাতে কোন দিকে ভীমরুল, বরুলী অর্থাৎ বোল্তারূপ কৰ্ম্মকাণ্ড, কোন দিকে জ্ঞানকাণ্ডস্বরূপ যক্ষ, কোন দিকে কৃষ্ণবর্ণ অজগররূপ যোগগত কৈবল্য, আবার কোন দিকে রক্ষিত-ধনের পাত্র অল্প পরিশ্রমেই হাতে আসে। অতএব বেদশাস্ত্র কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিপথেই যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, ইহা বলিয়াছেন।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ২০।১৩৫

১২। কৰ্ম্মী কি ভগবৎসেবক?

“প্রথম সঙ্গতিতে (স্বসুখপ্রযোজক কৰ্ম্মসঙ্গতিতে) যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা

কর্মকেই প্রধান জানিয়া ভগবান্কেও ‘কর্মাঙ্গ’ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ফলও নিত্য-লক্ষণে লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের সম্ভূতি নির্দোষ নয় ; তাঁহাদের জীবনে ভগবানের সাধন-স্বকৃতি নাই—বিধির অধীনতাই সর্বত্র লক্ষিত হয়। তাঁহাদিগকে ‘কর্মী’ বলে।

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

১৩। কর্মদ্বারা কি কর্মক্ষয় হয়? কর্মের সার্থকতা কোথায়?

“যাহাদ্বারা মানবগণের রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাই রোগ-নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিলে রোগ কখনও ভাল হয় না। কর্মকাণ্ড সমস্তই জীবের সংসার-রোগের হেতু ; তাহা নিষ্কামভাবেই হউক বা ঈশ্বরার্পিত ভাবেই হউক, কখনও সংসারক্ষয়রূপ ফল উৎপন্ন করিবে না। কর্মকে কেবল জীবনযাত্রা-নিব্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া পরে অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপে কলিত করিতে পারিলেই কর্মস্বরূপ-বিনাশের সম্ভাবনা হয়। ভগবৎ-পরিতোষোপযোগী কর্মমাত্র স্বীকার করিলে এবং ভক্তির অধীন সম্বন্ধজ্ঞানকে স্বীকার করিলে সকল কর্মই ভক্তিয়োগ হইয়া পড়ে। সেই ভক্তিয়োগগত কৃষ্ণসংসারান্ত্রিত কর্ম সকল করিয়া ভগবৎশিক্ষাক্রমে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের গুণ-নামাদি স্মরণ ও গান করাই সর্বশাস্ত্রের অভিধেয়।”

—শ্রীমঃ শিঃ, ১০ম পঃ

১৪। কর্মীদিগের কৃষ্ণপূজা ও ভক্তের কৃষ্ণপূজায় পার্থক্য কি?

“বৈষ্ণবের সাধনভক্তি কেবল সিদ্ধভক্তির উদয় করাইবার জন্য। অবৈষ্ণবের সেই সকল অঙ্গসাধনে দুইটি তাৎপর্য আছে, অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। সাধনক্রিয়ার আকার-ভেদ দেখা যায় না, কিন্তু নিষ্ঠা-ভেদ মূল। কর্মীদিগের কৃষ্ণের পূজা করিয়া চিন্তাশোধন ও মুক্তি অথবা রোগশাস্তি ও পার্থিব ফল পাইয়া থাকে। ভক্ত্যঙ্গে সেই পূজার দ্বারা কেবল কৃষ্ণ নামে রতি উৎপত্তি করায়। কর্মীদিগের একাদশী-ব্রতে পাপ নষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তদিগের একাদশী-ব্রতের দ্বারা হরিভক্তির বৃদ্ধি হয়। দেখ, কত ভেদ!”

—জৈঃ ধঃ ৫ম অঃ

১৫। বহির্মুখ সংসার ও বৈষ্ণব সংসারে ভেদ কি?

“বহির্মুখ সংসার ও বৈষ্ণব কেবল মাত্র একটা নিষ্ঠা-ভেদ আছে, আকৃতি-ভেদ নাই। বহির্মুখ ব্যক্তিরও বিবাহ করে, অর্থ সংগ্রহ করে, গৃহ করে, গৃহ নিৰ্মাণ করে, ন্যায়ের নাম করিয়া সমস্ত কার্য করে এবং সন্তানাদি উৎপাদন করে ; কিন্তু তাহাদের নিষ্ঠা এই যে, সেই সমস্ত কার্যদ্বারা তাহারা জগতের সুখ বৃদ্ধি করিবে বা জগদন্তর্গত নিজের সুখ লাভ করিবে। বৈষ্ণবগণ সেই সমস্ত কার্য তাহাদের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াও সেই সব কার্যফল আত্মসাৎ করেন না, ভগবানের দাস্য বলিয়া করিয়া থাকেন। চরমে বৈষ্ণবগণ সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু বহির্মুখগণ উচ্চাভিলাষ বা ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহাজনিত কাম বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শান্তিহীন হইয়া পড়েন।”

—চৈঃ শিঃ ৩।২

১৬। সাধুনিন্দা-নামাপরাধ কখন উদিত হয়?

“কর্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই ভক্ত সাধুদিগের চরণে অপরাধ হয় ; সুতরাং

সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া অভভের হৃদয়ে বাসা করে।”

—সঙ্গত্যাগ, সং তোঃ ১১।১১

১৭। পাপ-পুণ্য কি আত্মার স্বরূপগত ধর্ম?

“পাপ-পুণ্য, উভয়ই সাম্বন্ধিক ; আত্মার স্বরূপগত নয়। যে কর্ম বা বাসনা সাম্বন্ধিকরূপে আত্মার স্বরূপ-প্রাপ্তির সাহায্য করিলেও করিতে পারে, তাহাই পুণ্য এবং যদ্বারা সে-সাহায্যের সম্ভাবনা নাই, তাহাই পাপ।”

—কৃঃ সং ১০।২

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গত্বা অপ্যকৃত্রমে।

কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্তত্বতগুণো হরিঃ।।

আত্মবিদগ্গণের ভজনই একমাত্র সম্বল। আত্মচেষ্টারহিত হইয়া তাঁহারা নিব্বিশিষ্ট নহেন। মুণ্ডক বলেন,—“আত্মক্লীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।” অনাত্মবিচারে যে বিচিত্রতা, তাহা স্তব্ধ হইয়া যাওয়াই যে প্রাপ্য, তাহা নহে। আত্মা ক্রিয়াবান্। ইহজগতের ক্রিয়া স্তব্ধ হইলে আত্মার ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সুতরাং আত্মা জড়ক্রিয়াবান্ না হইলেও চেতনরাজ্যে পূর্ণক্রিয়াবিশিষ্ট। ভগবদ্রতিবিহীনগণের অনাত্মরতি দেখা যায়। ‘যয়া অক্ষরম্ অধিগম্যতে সা পরা।’ পরবস্তুর আলোচনায় জীব শুদ্ধ হয়, তখনই আত্মরতিবিশিষ্ট হইতে পারে। একায়নবিচারে আত্মবস্তু একমাত্র। সাংখ্যবিচারে তাহার বিচিত্রতা আছে। “পরাস্য-শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।।” প্রাকৃত জগতের ব্রহ্মচর্য্য সমাবর্তনে সীমাবদ্ধ হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতের ব্রহ্মচর্য্য (বেদে বিচরণ) নিত্য এবং প্রাকৃত বিচারাস্তর্গত নহে। ব্রহ্মবিদগ্গণ বেদশাস্ত্রে অধীতবিদ্য। তাঁহারা ব্রহ্মে—চেতনরাজ্যে বিচরণশীল—মিশ্ররাজ্যে নহে। তাঁহাদের স্থূল পরিচয়ের কোন আবশ্যকতা নাই। ভক্তিদ্বারাই তাহা লভ্য। “যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্ষবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা পুমান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরং শাম্যমুপৈতি।।” ইহজগতে শোক বলিয়া একটি বস্তু আছে। কিন্তু ব্রহ্মজগতে শোকের কোন অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মানুভূতিতে শোকের অভাব হয়। সেবাবৃত্তি উদিত হইলে চেতনের সেবোন্মুখ ক্রিয়াগুলি নিত্যসেব্যের প্রতি নিযুক্ত হয়। সুতরাং তথায় কোন অভাবের আশঙ্কা নাই। বদ্ধভাবাপন্ন জীবনিচয় অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া প্রতিমুহূর্তে অভাব আশঙ্কা করিয়া ভীত ও শোকগ্রস্ত হয়। নিদ্রাকালে মন বিবশ হইয়া নানাদিকে বিচরণ করে। জাগ্রতাবস্থায় তৎপ্রতি সে-প্রকার আকৃষ্ট হয় না। পূর্ণজাগরণে জড়ের ক্রিয়া হইতে অবসর পাওয়া যায়। প্রভুরহিত হইয়া দাসগণের যে-প্রকার অবস্থা হয়, বদ্ধজীব তদবস্থা প্রাপ্ত। তাহারাই সকল কার্য্যের কর্তা মনে করিয়া পাপপুণ্যফল ভোগ করে। “সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হৃনীশয়া শোচতি মুহমানঃ।” যে মুহূর্তে আমরা জানিতে পারি যে, প্রভুর সেবাই আমাদের কর্তব্য, তদীয় সেবা গ্রহণ আমাদের কর্তব্য নহে, সেই মুহূর্তে আমাদের

মঙ্গল হয়। জড়ভোগের প্রবৃত্তি প্রশমিত না হইলে প্রভুর অধীন হইয়া তাঁহার সেবার জন্য লৌল্য উপস্থিত হয় না। জড়বিশেষরহিত হইবার জন্য অসংযত ব্যক্তিগণের প্রতি ব্রহ্মের উপদেশ। তৎপরে আত্মরতি আত্মকীড় হইবার অবস্থা। স্বাস্থ্যলাভের পরই বাস্তবিক দেহ-পরিচালনার যোগ্যতা উদ্ভিত হয়। স্বাস্থ্যলাভ করিয়া নিষ্ক্রিয় থাকিলে স্বাস্থ্যের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে-সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বারানসীতে প্রকাশানন্দের ও পুরুষোত্তমে সার্বভৌমের সহিত তাঁহার যে শাস্ত্রালোচনা হইয়াছিল, তাহা হইতে পাই। গৃহস্থজ্ঞানী সার্বভৌম এবং ত্যক্তগৃহাভিমানী প্রকাশানন্দ। উভয়েই নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রবেশ-চেষ্টাপর ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, নির্বিশেষ-বিচারক ভগবানের বিশেষ অপ্রীতিভাজন, কারণ তাহাতে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের স্বীকারের অভাব-হেতু তথায় সেবারও অভাব আছে। নির্বোধ লোক ভোক্তার অভিমানে বিশ্বকে দর্শন করিয়া তাহার তিন্ত অভিজ্ঞতাহেতু তাহাকে ত্যাগ করাই প্রয়োজন মনে করে এবং সেই বিচারে চালিত হইয়াই ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব স্থাপন করিতে চায়। জড়গুণ সেবরাজ্যে নাই বটে। কিন্তু তাহা চিদগুণ-সম্পন্ন জড়রাহিত্য ব্রহ্মভাব, জড় ও অজড়ের সাহচর্য্যে পরমাত্মভাব। কেবল চিন্ময়বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণু। মাধুর্য্যের বিচারে সকল রস একীভূত। ঔদার্য্যও ঐগুলি সমস্তই আছে। ঔদার্য্যের অনবগতিতে কুণ্ঠাধর্মে অবস্থিত হইয়া মায়িক বিচার করিলে কৃষ্ণভজনের ছলনা সর্ব্বনাশ-বরণমাত্র। আনন্ড-শব্দের অর্থ বেদ, গুরু-পারম্পর্য্য। শ্রীতপথে ভগবদ্বিষয় অধিগম্য।

আমরা নিত্য ভগবদাস। ক্রমাবনতির ফলে সেবাবিমুখতায় ক্রমে পশু, বৃক্ষ, প্রস্তরাদিতে পরিণত হইয়াছি। প্রত্যাবর্তনের সামর্থ্য আছে। নেমে এসেছি, আবার ইচ্ছা হইলে উঠিতেও পারি। চेतনে দুইপ্রকার ইচ্ছা—উত্থান ও পতন।

“জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ।।

কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদিবহিস্মুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।”

কালসৃষ্টির পূর্বে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সর্ব্বদাই কৃষ্ণদাস্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে কৃষ্ণসেবা ত্যাগ করিয়া বদ্ধ। কার্যলইয়াই কৃষ্ণ। সেবক-বিহীন, আকৃষ্ট-বিহীন কৃষ্ণ নহেন। স্বরূপের নিজবৃত্তি ভুলিবার ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে তখনও ছিল। উৎক্রান্তদশায়—

“অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।

সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্।।”

কৃষ্ণবিস্মৃতিই আমাদের অপরাধ। আবার তাঁহার কথা স্মরণ-পথে আসিলেই আমাদের মঙ্গল। আমি চিন্ময়বস্তুর আমার ক্রিয়ৎপরিমাণে স্বতন্ত্রতা আছে। তাহার সদ্যবহারেই কৃষ্ণধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা। জীব নিত্যকালই বৈষ্ণব—হরিজন ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণবিমুখ হইয়া প্রথমে ব্রহ্মা হইয়া অনন্তর ক্রমশঃ বিভিন্ন কর্ম্মফলে অধঃপতিত হইয়া পৃথিবীতে তির্য্যগ্গোনি, বৃক্ষ, প্রস্তরাদি পর্য্যন্ত গতি লাভ করিয়াছে। এই অবস্থা হইতে আমাদের পুনরায় ফিরিতে হইবে।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।

অন্ধা যথাকৈরুপনীয়মানাস্তেহপীশতন্ত্যামুরুদান্নি বন্ধাঃ ॥

কৃষ্ণকে মানুষে নারায়ণের অবতার বলিয়া মনে করিত । তাঁহাকে অবতারী বলিয়া জানিত না । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জানাইয়া দিলেন যে, নারায়ণ যাহা হইতে প্রকাশিত, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ । নারায়ণ তৃতীয়স্তরে অবস্থিত । স্বয়ংরূপ—শ্রীকৃষ্ণ ; স্বয়ংপ্রকাশ—বলদেব ; নারায়ণ—স্বয়ংরূপের বিলাস । জীবের ক্রমাবনতিক্রমে তাহাদের উপাস্য বিচারও ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর অবস্থা প্রাপ্ত হয় । তাহারা তখন শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া কেহ বা গাছপালার উপাসক (Phytomorphist), কেহ বা Zoomorphistদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন । কিন্তু—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

কৃষ্ণই আদি বস্তু । ভগবদ্ভক্তি পূর্ণবিকসিত হইলেই সর্বোদ্রিয়দ্বারা তাঁহার সেবার যোগ্যতা ; তখনই কৃষ্ণভক্তি । বলদেব-ভক্তিতে চমৎকারিতা কিয়ৎপরিমাণে অল্প । তদপেক্ষা নারায়ণ-ভক্তি নিম্নস্তরের কথা । রসের উৎকর্ষে কৃষ্ণ এবং অপকর্ষে নারায়ণ ।

সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেহপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।

রসোনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ।

মর্যাদা অপেক্ষা বিশ্রান্তের উৎকর্ষ অধিক হইলেও মর্যাদাকে লঙ্ঘন করিয়া ভজনের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব । অনর্থাপগমে স্বাভাবিক রাগাত্মক ভাব উদয়ের পূর্বে মর্যাদা পথই শ্রেয়ঃ । ভগবদ্-ভজন-প্রভাবে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিলে, সাধক বিভিন্নভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন । শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর পঞ্চ মুখ্যভাবে যে ভগবানের সেবার কথা আছে, সেবক যে কোন রসে ভগবৎসেবায় অবস্থিত, তাঁহার নিকট তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট । কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে মধুর রসেই সর্বোৎকর্ষ বর্তমান ।

“যার যেই রস তার সেই সর্বোত্তম ।

তটস্থ হঞ বিচারিলে আছে তর তম ॥”

কিন্তু প্রত্যেকেরই স্মরণীয় যে, ইহা ভজনের উচ্চতম স্তরে চেতনরাজ্যের কথা ; বন্ধাবস্থায় সে-সকল কথায় প্রবেশাধিকার নাই ।

বৈষ্ণবের পদবী জৈবজগতে সর্বোত্তমোত্তম ।

“স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিক্ষিতামেতি ততঃ পরম্ হি মাম্ ।

অব্যাকৃতং ভাগবতোহথ বৈষ্ণবং পদং যথা বিবুধা কলাতয়ে ॥”

বহু-ভাগ্য-ফলেই বৈষ্ণবের দাস হওয়া যায় ।

“ব্রাহ্মণানাং সহশ্রেভ্যঃ সত্রয়াজী বিশিষ্যতে ।

সত্রয়াজি-সহশ্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ ।

সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ।

বৈষ্ণবানাং সহশ্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥”

মুক্ত জীবই বৈষ্ণব । তিনি বদ্ধজীব নহেন । মুক্ত হইবার অভিলাষ হইলে চেতনের অনুশীলনের প্রয়োজন । পূর্ণ চিন্ময়দেহ লাভ হইলেই রাধাগোবিন্দের সেবা সম্ভব ।

“এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম।

অকিঞ্চন হএগ লয় কৃষ্ণের শরণ।।”

অকিঞ্চন না হইলে সুবিধা হইবে না।

“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো

নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।

কিন্তু প্রোদ্যামিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাক্রে-

গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োদাস-দাসানুদাসঃ।।”

মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই প্রকার উপাধিরহিত না হইলে নিষ্কিঞ্চন হওয়া যায় না।
নিষ্কিঞ্চন অসদাচারী বৈষ্ণব নহেন। অহংমম-ভাবাপরাধীর নামগ্রহণে অধিকার নাই।

পাদসেবন

পাদসেবন বা পরিচর্যা ভক্তি চতুর্থ অঙ্গ। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ-সহকারে ভগবানের ‘পদসেবা’ কর্তব্য। পাদসেবা-কার্য্যে নিজের অকিঞ্চনত্ব ও সেবায় অযোগ্যত্ব-বুদ্ধি এবং সেব্যবস্তুর সচ্চিদানন্দঘনত্ব-বুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজন। “সেবাপাদত্বেনৈব প্রাপ্তস্য তস্য পুরুষোত্তমস্য সচ্চিদানন্দত্বমেবাভিপ্রেতম্” অর্থাৎ “সেবাপাদত্বরূপেই প্রাপ্ত পুরুষোত্তমের সচ্চিদানন্দত্বই অভিপ্রেত”—তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দের উক্তি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। পাদসেবা-কার্য্যে শ্রীমূর্তি-দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুব্রজন, ভগবান্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরা-নবদ্বীপাদি তীর্থস্থান দর্শনাদি অন্তর্ভাব্য। শ্রীল রূপগোস্বামী ভক্তির ৬৪ প্রকার অঙ্গ বর্ণন প্রসঙ্গে এই সকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন।

শ্রীতুলসীসেবা ও সাধুসেবা প্রভৃতিও এই অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। গঙ্গাপ্রভৃতি ও তত্রস্থ প্রাণিসমূহ পরমভাগবত বলিয়া পক্ষান্তরে তাঁহাদের সেবা প্রভৃতি পাদসেবাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য গঙ্গাদিও ভক্তির কারণ হইয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ ৭।৫।২৩--২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলা হইয়াছে,—“পাদসেবনে ‘পাদ’ শব্দ ভক্তিদ্বারাই নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন সেবার আদরনীয়তা বিহিত হইয়াছে।” রুচি ও শক্তি থাকিলে স্মরণ পরিত্যাগ না করিয়া ভগবানের পাদসেবাও করিতে হইবে। কেহ কেহ স্মরণ-সিদ্ধির জন্যও এই সেবা করিয়া থাকেন।

সেবা ভগবানের আনন্দবিধান করাই পাদসেবনের প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীহরি সকলের মূল এবং আমরা সকলেই সেই শ্রীহরির সেবক। তাঁহার সেবাই আমাদের ধর্ম, কর্ম বা কর্তব্য। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা ব্যতীত সবই বৃথা, সবই অমঙ্গল। ধর্ম-কামনা, অর্থ-কামনা, কামিনী-কামনা, প্রতিষ্ঠা-কামনা ও মোক্ষ-কামনা—এগুলি ভক্তি নয়। প্রত্যেক কার্য্যে—প্রত্যেক পদবিক্ষেপে—প্রত্যেক চিন্তায় যদি কৃষ্ণসেবা হয়, তবেই আমাদের মঙ্গল। কৃষ্ণসেবা—অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি; ইহা দেহ বা মনের ধর্ম বা কার্য্য নহে। কৃষ্ণসুখার্থ কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণভক্তিই ধর্ম, তাহাতে স্বসুখবাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। স্বসুখকামনাই পশুত্ব বা কামুকত্ব, পক্ষান্তরে কৃষ্ণসুখকামনাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

যাহারা জীবনে কোনদিন কোন শুভকর্মের অনুষ্ঠান করেন নাই, তাহারাও ভগবৎপাদপদ্ম সেবা করিলে পরমগতি লাভ করেন।

ন দানং ন হবির্যেবাং স্বাধ্যায়ো ন সুরাচ্চনম্।

তেহপি পাদোদকং পীত্বা প্রযান্তি পরমাং গতিম্॥

“যাঁহারা দান, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও দেবার্চনরূপ কোন শুভকর্মের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারাও ভগবচ্চরণামৃত আস্বাদন করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হন।” শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫১।৫৫) ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন,—“ন কাময়েহন্যং তব পাদসেবনাদকিঞ্চন-প্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।” অর্থাৎ “হে বিভো! অকিঞ্চনগণের প্রার্থনীয় ভবদীয় পাদসেবন ব্যতীত আমি অন্য কোন বরই প্রার্থনা করি না।” যদ্রূপ কোনও পথিক যখন ধনাদি উপার্জনের ক্লেশ হইতে নিম্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রবাস হইতে নিজগৃহে আগমন করেন, তখন তাঁহার সর্ব আশা নিবৃত্ত হওয়াতে তিনি আর নিজ গৃহশান্তি ছাড়িয়া অন্যত্র যান না; তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণগাথা শ্রবণ-সংস্পর্শে যাঁহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল ত্যাগ করেন না। ভক্ত ভগবানের সন্তুষ্টির নিমিত্ত অনুক্ষণ তাঁহার পাদপদ্মসেবা করিয়া থাকেন। ভক্তরাজ নাভির যজ্ঞে ভক্তবৎসল ভগবান্ নাভির ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া যজ্ঞভূমিতে প্রকটিত হইলে ঋত্বিকগণ তাঁহার স্তবে বলিয়াছিলেন,—“হে পরিপূর্ণস্বরূপ, আপনার নিজজন অনুরাগভরে বাষ্পগদগদ স্তুতিবাক্য, জল, শুদ্ধ পল্লব, তুলসী ও দুর্বারাকুরদ্বারা সুষ্ঠুভাবে আপনার পাদপদ্মের যে পূজা সম্পাদন করেন, আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজাদ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন।” ভগবানের পাদসেবার মাধ্যমেই অতি অনায়াসে কামাদি বিপদসঙ্কুল সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

যৎপাদ-সবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিৎ মলং ধিয়ঃ।

সদ্যঃ ক্ষিণোত্যহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসূতা সরিৎ॥

“শ্রীভগবানের চরণসেবারুচি তদীয় পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসূতা সুরধনীর ন্যায় সম্বন্ধিত হইয়া প্রতিদিন সংসার-তাপদঙ্ক জীবগণের অশেষ জন্মসঞ্চিত কামাদিবাসনাময় চিন্তের মালিন্য তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে।” অবন্তীদেশীয় ভিক্ষুক দুষ্পার ইন্দ্রিয়জ্ঞানজন্য বিচার অতিক্রম করিবার মানসে পূর্ব পূর্ব ভগবদ্ভক্তগণ যে ভক্তিপথে অগ্রসর হইয়া ভগবানের পাদসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার অনুসরণপূর্বক নিত্যমঙ্গল লাভ করিবেন—ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং আনুগত্য ধর্মক্রমে আত্মবৃত্তি কৃষ্ণভক্তিতে অবস্থিত হইলেন। আবৃত্তিক ভিক্ষু বলিয়াছেন,—

এতাং স আস্থায় পরাঅনিষ্ঠা-মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈশ্বর্যহর্ষিভিঃ।

অহং তরিয়ামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিষেবৈবৈব।। (ভাঃ ১১২৩।৫৭)

“আমি প্রাচীন মহর্ষিগণের উপাসিত এই পরাঅনিষ্ঠারূপে ভিক্ষুকশ্রম আশ্রয়পূর্বক কৃষ্ণপাদপদ্মনিবেষণদ্বারা দুরন্ত সংসাররূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব।” আবৃত্তিক ভিক্ষুর বাক্যের সমর্থনে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—সাধু এই ভিক্ষুর বচন।

মুকুন্দ-সেবনব্রত কৈল নির্দারণ॥

পরাত্ননিষ্ঠামাত্র বেষ-ধারণ।

মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ।।

সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবনে গিয়া।

কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভূতে বসিয়া।। (চৈঃ চঃ মঃ ৩।৭-৯)

ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের ন্যায় পূজ্য। পূজা দুই প্রকার—সেবা ভগবানের পূজা ও সেবক ভগবানের পূজা। উভয়েই ভগবদ্ভক্ত। ভক্তি, ভক্ত, ভগবান্—এই তিনটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণপরতন্ত্র, আর কৃষ্ণ ভক্তপরতন্ত্র। ভগবদ্ভক্তগণ কেবল ভগবানের সেবা করেন না, যাঁহারা ভগবানের নিত্য সেবা করেন, ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাদেরও সেবা করেন। ভক্তসেবা বাদ দিয়া ভগবানের সেবা হয় না। যিনি ২৪ ঘণ্টা ভগবানের সেবা করেন, সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ গুরুর সেবা করা একান্ত কর্তব্য। আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ যে মুহূর্তে রহিত হইয়া যায়, সেই মুহূর্তে নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্বত্র প্রয়োজন। গুরুসেবার সঙ্গে গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণবের সেবা করা আবশ্যিক ও মঙ্গলকর। দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিলে মঙ্গল হইবেই হইবে। সকলের মূল প্রয়োজন ভগবান্ ও ভক্তের সেবা। যে ব্যক্তি নিজ সুখস্বাচ্ছন্দ অগ্রাহ্য করিয়া গুরু-কৃষ্ণের সেবায় সর্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার সেবা করিবার জন্য স্বয়ং মহাপ্রভু পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হন। যাঁহারা মহৎ ব্যক্তির সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই কেবলমাত্র ভগবানের পুণ্যচরিত কথায় রুচি হইয়া থাকে।

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্ধাধানস্য বাসুদেবকথাকুচিঃ।

স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ।।

“হে বিপ্রগণ! শ্রবণাভিলাষী শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির মহৎসেবা এবং পুণ্যতীর্থসেবাহেতু ভগবান্ শ্রীহরির কথা-বিষয়ে রুচি জন্মিয়া থাকে।” তুলসীসেবা পাদসেবনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঋন্দপুরাণে উল্লেখ রহিয়াছে,—“দেবদেব জগদীশ্বর শ্রীহরি সর্বদা বিশেষতঃ কলিয়ুগে তুলসীকানন ব্যতীত অন্যত্র অনুরক্ত হন না। যাঁহারা তুলসীকানন দর্শন করিয়াছেন, যথাবিধি ও নিষ্ঠাসহকারে তাঁহার রোপণ ও সেবা করিয়াছেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঋন্দপুরাণের তুলসীস্তবে “তুলসীর নাম শ্রবণেই দর্পহারী শ্রীহরি প্রীত হইয়া থাকেন”—ইহা পাওয়া যায়। পাদসেবনের অন্তর্ভুক্ত মথুরাদি ধামবাসের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আদিবাহু ভগবান্ বলিয়াছেন,—“যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র আসক্তি করে, উক্ত মূঢ় আমার মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারে ভ্রমণশীল হয়।” পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডেও পাওয়া যায়,—“অহো! এই মথুরা অতি ধন্যা এবং বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠস্বরূপা, যেহেতু এই স্থানে একদিন মাত্র বাস করিলেই হরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে।” ভক্ত-পাদসেবনের যে বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে তাহা জগতের লোককে অবগত করাইয়া তাহাদিগের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

চাতুর্মাস্য-ব্রত

“একাদশ্যাস্ত গৃহীয়াৎ সংক্রান্তৌ কৰ্কটস্য ত।

আষাঢ়্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্মাস্যোদিতং ব্রতম্।।”

শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে এই শ্লোকটি দেখা যায়। শয়ন-একাদশী, কৰ্কট-সংক্রান্তি বা আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সমস্ত মানুষের অর্থাৎ চারি বর্ণের—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের এবং চারি আশ্রমের—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী সকলেরই চাতুর্মাস্য-ব্রত পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

শয়ন একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত অথবা আষাঢ়ী-শুক্লা-দ্বাদশী অথবা আষাঢ়ী-পূর্ণিমা হইতে কার্তিক-পূর্ণিমা অথবা আষাঢ়-সংক্রান্তি হইতে কার্তিক-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত চারি মাস চাতুর্মাস্য-ব্রত পালনের সময়।

যো বিনা নিয়মং মর্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।

চাতুর্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবনপি মৃতো হি সঃ।।

অর্থাৎ যে মূর্খ মরণশীল মানব বিনা নিয়ম, ব্রত বা জপ ব্যতীত চাতুর্মাস্য যাপন করেন, তিনি জীবদ্দশাতেই মৃততুল্য হইয়া থাকেন।

লক্ষ্য সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।

তুর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।

জীবন ক্ষণস্থায়ী। সাধুসঙ্গে চাতুর্মাস্য-ব্রতাদি পালনপূর্ব্বক হরিভজন করা প্রত্যেকের বিশেষ কর্তব্য।

সংসার অনলে,

জ্বলিছে হৃদয়,

অনলে বাড়য়ে অনল।

সাধুসঙ্গ করি’,

লয় কৃষ্ণনাম,

অনলে পড়য়ে জল।।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও আমাদেরকে শিক্ষা দিবার জন্য কঠোরভাবে চাতুর্মাস্য-ব্রত পালন করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই,—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।

চাতুর্মাস্য গোঞইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।।

চাতুর্মাস্য মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে।

গোঞইলা নৃত্য, গীত, কৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তনে।।

সুতরাং চাতুর্মাস্য-ব্রত সকলের পক্ষেই পালন করা একান্ত কর্তব্য। চাতুর্মাস্য-ব্রতে কঠোর নিয়ম পালনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায়। কিন্তু আমাদের ন্যায় কনিষ্ঠ অধিকারীর জন্য গুরুবর্গ কৃপাপরবশ হইয়া নিয়ম কিছু সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই চারি মাস সিম, পটল, বেগুন, বরবটী, লাউ, কলমীশাক, পুঁইশাক, মাসকলাই, সরিষার তেল সেবন নিষেধ।

শ্রাবণে বর্জ্জয়েৎ শাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।

দুগ্ধমাম্বযুজে মাসি কার্তিকে চামিষং ত্যজেৎ।।

শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুধ এবং কার্তিক মাসে আমিষ আহার নিষিদ্ধ। এখানে আমিষ বলিতে বরবটী, সিম, মাষকলাই প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

অমেধ্য আহার গ্রহণের কোনও প্রশ্ন থাকিতে পারে না। কারণ বৈষ্ণবগণ ভগবানের প্রসাদ ব্যতীত কোনও বস্তুই গ্রহণ করেন না।

এই ব্রত পালনের উদ্দেশ্য হইতেছে—শ্রীভগবদ্ভজন, কৃষ্ণানুশীলন। অপতিতভাবে সংখ্যানাম গ্রহণ, শ্রীবিগ্রহসেবা, সাধুসঙ্গে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, মহাজন-পদাবলী কীর্তন প্রভৃতির অনুশীলন।

শ্রীনারদ গোস্বামী শ্রীমহাদেবকে অনুরোধ করিলেন—প্রভো! কোন্ ব্রত পালন করিলে জীবের দুর্গতি নাশ হয় তাহা কৃপাপূর্বক আমাকে বলুন। শ্রীনারদঋষির অনুরোধে মহাদেব বলিলেন—চারিমাস শ্রীহরি যোগনিদ্রাগত হন। সেই সময় যিনি ভক্তিপূর্বক চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করিবেন তাঁহার ব্রত পালনের ফল অপরিসীম। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল লাভ হয়, একবার মাত্র চাতুর্মাস্য-ব্রত পালন করিলে সেই ফল পাওয়া যায়। সূর্য যখন মিথুন রাশিগত হয় তখন ভগবান্ শ্রীহরি শয়ন করেন। যখন তুলা রাশিগত হন তখন উত্থান করেন।

উপবাসকালে গুড় বর্জ্জন করিলে বাক্য মধুর হয়। তৈল পরিত্যাগ করিলে বংশ বৃদ্ধি হয়। সুগন্ধি তৈল পরিত্যাগ করিলে অতুল সৌভাগ্য লাভ হয়। কটু তৈল পরিত্যাগ করিলে শত্রুনাশ হয়। ঘৃত পরিত্যাগ করিলে সুন্দর অঙ্গ লাভ হয় এবং শরীর স্নিগ্ধ হয়। পুষ্প ভোগ রহিত হইলে স্বর্গে বিদ্যাধররূপে জন্ম হয়। কটু, অন্ন, ক্ষার, তিক্ত, কষায় রস বর্জ্জন করিলে দৌর্গন্ধ ও বিরূপতা কখনও লাভ হয় না। তাম্বুল ত্যাগ করিলে রক্তকণ্ঠ হয়। পলাশ পাতায় ভোজন করিলে রূপবান্ ও ভোগী হয়। দধি, দুগ্ধ ত্যাগ করিলে গোলোক বাস হয়। মৌনব্রত অবলম্বন করিলে তাহার বাক্যের কখনও স্থলন হয় না। চারিমাস সন্ধ্যায় মৌনী থাকিলে চারি মন্বন্তর বৈকুণ্ঠে পূজিত হন। স্বয়ং পাক করিয়া ভোজন করিলে দশ হাজার বৎসর ইন্দ্রলোকে বাস হয়। চাতুর্মাস্যে যিনি ভোজনের সময় প্রজ্ঞান করেন তাঁহার অন্ন গো-মাংসসম অশুচি হয়। এইরূপ খাদ্য রাক্ষসের প্রিয় হয় এবং তিনি পাপ ভোজন করেন। ব্রতকালে যিনি একাহারী হন, তিনি বিষ্ণুলোকে পূজিত হন। দধি, দুগ্ধ, গুড়, শাক পরিত্যাগ করিলে মুক্তিভাগী হওয়া যায়। চাতুর্মাস্যে কাঁসার বাসনে ভোজন একেবারে নিষেধ। তাম্রপাত্রে ভোজন করিলে নৈমিষক্ষেত্রের ফললাভ হয়। মাটির পাত্রে ভোজন সর্বোৎকৃষ্ট। পলাশ পাতায় ভোজন করিলে রূপবান্ ও ভোগবান্ হয়। পদ্মপাতায় ভোজন করিলে কখনও নরক দর্শন হইবে না। ভূমিতে শয়ন করিলে দশ হাজার বৎসর কোন রোগে আক্রান্ত হইবে না।

সর্বোপরি শ্রীহরিনাম কীর্তন করিলে সর্বপাপ বিনিস্মৃত হয় এবং পরমাগতি লাভ হয়। যথাবিধি নিয়ম পালনপূর্বক শ্রীহরির উত্থান পর্যন্ত চাতুর্মাস্য-ব্রত উদ্যাপন করা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য।

সুতরাং বৈষ্ণব মহাজনের অনুসরণপূর্বক ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া ব্রতের সম্মান করিলে শ্রীভগবান্ অবশ্যই কৃপা করিবেন এবং ত্রিতাপ দূরীভূত হইয়া আমাদের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে—এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুষ্যমাত্রেরই এই ব্রত পালন অবশ্য কর্তব্য।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৭ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমন্মহাপ্রভু তখনও বললেন,—‘এহো হয়, আগে কহ আর।’ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৭১)
তখন রায় ক্রমে ক্রমে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রেমকে ‘সর্বসাধ্যসার’ বলে জানানেন।
শ্রীমন্মহাপ্রভু বাৎসল্য প্রেমের কথা শুনে বললেন—“প্রভুকহে—এহো উত্তম, আগে কহ
আর।” (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৭৯) রায় পুনরায় কান্ত-ভাবকে প্রেম-সাধ্যসার বলে জানানেন।
তৎপরেও ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও জানতে চাইলেন। তখন রায় বললেন,—

“রায় কহে,—ইহার আগে পুছে হেন জনে।

এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে।।

ইহাঁর মধ্যে রাধার প্রেম—‘সাধ্যশিরোমণি’।

যাঁহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি।।” (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৯৬-৯৭)

শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা কেমন? শ্রীরায়ের উত্তর—

“রায় কহে,—তবে শুন প্রেমের মহিমা।

ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের নাহিক উপমা।।

গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।

রাধা চাহি’ বনে ফিরে বিলাপ করিয়া।।

* * * *

শতকোটি গোপী-সঙ্গে রাস-বিলাস।

তার মধ্যে এক-মূর্ত্ত্যে রহে রাধা-পাশ।।

* * * *

সম্যক্-সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা।

রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা।।

তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিন্তে।

মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অষেষিতে।।

* * * *

শতকোটি-গোপীতে নহে কাম-নির্বাপণ।

তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ।।”

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১০৪-১০৫, ১০৯, ১১৩-১১৪, ১১৬)

শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আজ্ঞায় সাধ্যের নির্ণয় শ্লোক ক্রমে ক্রমে বর্ণনা
করত পরিশেষে শ্রীরাধার গুণ-মহিমা ব্যক্ত করলে শ্রীমন্মহাপ্রভু পরিতুষ্ট হলেন। শ্রীরায়
রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত উক্ত কথোপকথনে নিজের অক্ষমতা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর
কৃতিত্ব স্বীকার করত বললেন,—

“রায় কহে,—ইহা আমি কিছুই না জানি।

তুমি যেই কহাও, সেই কহি বাণী।।

তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক-পাঠ।

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট।।

হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী।

কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২০-১২২)

উপরিউক্ত অবস্থায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রেমিক ভক্ত রায় রামানন্দ-সংবাদে কুলধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্মসাধন শুদ্ধভক্তি হতে নিত্য পৃথক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। উক্ত ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা হরিতোষণ-ব্রতাদি কর্মমার্গীয় গৌণভক্তি-পথ বলে নির্ণীত হয়েছে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং কুলধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্মসাধনকে বাহ্য সাধন বলে উপেক্ষা করেছেন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত বর্ণাশ্রম পালনরূপ কর্মকে কেহ কেহ ফল কামনারহিত বলে মনে করলেও তার অভ্যন্তরে ফল কামনার অভিপ্রায় ও আগ্রহ থাকে। দেহের অভিনিবেশ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ জীব স্বরূপতঃ সকাম ও জড় অহঙ্কারযুক্ত হয়। বর্ণাশ্রমাচার পালনে ভগবানের প্রতি যেটুকু উন্মুখতা প্রকাশ পায়, তাহা ‘গৌণ উন্মুখতা’। আর কর্মার্পণ লৌকিক শ্রদ্ধা হতে উদ্ভব হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতোক্ত “যৎ করোষি” শ্লোকটি কর্ম-জ্ঞান-মিশ্রা প্রধানীভূতা ভক্তি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় সখা অর্জুনকে বলেছেন,—‘তুমি কর্ম-জ্ঞানাদি পরিত্যাগ করতে অসমর্থ হলে মধ্যপস্থা নিক্রাম কর্ম-জ্ঞান-মিশ্রা প্রধানীভূতা ভক্তি কর এবং বৈদিক লৌকিক যাবতীয় কর্ম আমাতে অর্পণ কর।’ ভগবানের ঐরূপ উক্তির অর্থ ইহা নয় যে,—‘যাহা ইচ্ছা হয় তাই কর, যাহা ইচ্ছা হয় তাই খাও,—তাতে কোনও দোষ নেই, কেবলমাত্র শেষকালে ভগবানকে সমর্পণ করার ভাণ হলেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হবেন।’ কর্মজড়-স্মার্তগণের মতানুযায়ী “শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণমস্ত্র”—বলে মন্ত্র পড়লেই তাহা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ হয়ে যায় না। যাতে নৈবেদ্যাদি শ্রীভগবানে যথাযথভাবে অর্পিত হয়, তদুদ্দেশ্যে কৃত কর্ম তাঁকে সমর্পণ করতে হবে। কর্মীর ও ভক্তের কর্ম সমর্পণের যথেষ্ট ভেদ আছে। কর্মার্পণ বা আরোপসিদ্ধা ভক্তি সাকৈতবা অর্থাৎ ধর্মার্থাদি কামনামূলক। আবার যদি আরোপসিদ্ধা ভক্তি ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছাশূন্য হয়, তখন তাকে সগুণ ভাগবতধর্ম বলা যেতে পারে। আরোপসিদ্ধা ভক্তি বা কর্মার্পণে স্বার্থপরতা থাকে। আরোপসিদ্ধা ভক্তিতে পূর্বের কর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে পরে অর্পিত হওয়ায় তাহা স্বার্থপরতা-দুষ্ট বিধায় তাকে সাক্ষাৎ ভক্তি বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্ত প্রহ্লাদের বাক্যে জানা যায়,—

ইতি পুংসর্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।

ক্রিয়েত ভগবত্যদ্বা তন্মন্যেহধীতমুত্তমম্ ॥ (ভাঃ ৭।৫।২৪)

যে ব্যক্তি বিষ্ণুতে পূর্বেরই আত্মসমর্পণপূর্বক পরে শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তির সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান করেন, আমার মতে তিনিই উত্তম অধ্যয়ন বা শিক্ষা করেছেন।” কৃষ্ণের সুখের জন্য ভাবিত হয়ে অর্থাৎ পূর্বের অর্পিত হয়ে পরে অনুষ্ঠিত হয় বা কৃত হয়, তবেই তাহা সাক্ষাৎ ভক্তি।

জীবাত্মার একমাত্র প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ; কারণ শ্রীকৃষ্ণের সাথেই জীবের নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে। দেহ-দৈহিক বস্তুর সঙ্গে বা জাগতিক কোন বস্তুর সঙ্গে জীবাত্মার নিত্য সম্বন্ধ নেই। দেহ-দৈহিক বস্তুগুলি কামের বস্তু। কামের বস্তুতে অর্পিত হলে কামের দাসত্বে দুঃখ পেতে হবে। জড়ভগতে পূজিত কালী, দুর্গা, সূর্য্য, গণেশাদি দেবতা মায়াশক্ত্যাত্মক হওয়ায় তাঁদের

সেবা বা দাসত্ব করলে মায়ার দাসত্ব হয়ে যায়। ফলে জন্ম-জন্মান্তর প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়াতে হয়, কোনকালেই মায়া হতে মুক্তিলাভ হয় না এবং কৃষ্ণবহিস্মুখতা-দোষহেতু অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামে যাওয়া সম্ভব হয় না। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বস্তু; তাই তাঁর চরণে সমর্পিত হলে বা তাঁর দাসত্ব করলে মায়া হতে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণধাম প্রাপ্তি ও নিত্য সুখ লাভ হবে। ভগবান্ বা তদনুগত অনন্য ভক্তের দাসত্ব করতে করতেই স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ ছেড়ে চিন্ময়দেহ লাভ হয়। সাধ্যভক্তি নিৰ্গুণ। নিৰ্গুণ সাধুসঙ্গের দ্বারা তা লাভ হয়। আবার নিৰ্গুণ ভগবদ্ভক্তের শিক্ষায় ও অহৈতুকী কৃপায় শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনবৃত্তির দ্বারাও তাহা লাভ হয়। বর্ণাশ্রম ধর্মের দ্বারা জীব কতটুকু ভগবৎপ্রসঙ্গ পায়? নিষ্কাম কর্ম করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হলে বিষয়ে বিরক্তি আসে। অর্জুন যেমন স্বাভাবিক শৌর্যধর্ম ত্যাগরূপ কার্পণ্যদোষে অভিভূত এবং ধর্ম-নিরূপণে সংমূঢ় চিত্ত হয়ে তাঁর নিশ্চিত মঙ্গল কিসে হয়, তা জানবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকার করে বলেছেন,—“শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।” (গীতা ২।৭)। অর্থাৎ আমি আপনার শিষ্য বা অনুগত দাস, আপনাতে শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দিন, সেইরূপ বর্ণাশ্রম ধর্মাচরণকারী ব্যক্তির বিষয়ে বিরক্তি হলে আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে সাধু-গুরুর চরণাশ্রয়ের জন্য ব্যাকুলিত হবে। শাস্ত্র বলেছেন,—

“ভক্তিমূলা সুকৃতি হইতে শ্রদ্ধোদয়।

শ্রদ্ধা হইলে সাধুসঙ্গ অনায়াসে হয় ॥

সাধুসঙ্গ ফলে হয় ভজনের শিক্ষা।

ভজন শিক্ষার সঙ্গে নাম-মন্ত্র-দীক্ষা ॥ (ভঃ রঃ প্রথম যামসাধন)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বাণী এতৎপ্রসঙ্গে স্মরণীয়,—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।

সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে মতি উপজয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৫)

পূর্ব্ব আজ্ঞা—বেদ-ধর্ম, কর্ম, যোগ, জ্ঞান।

সব সাধি' শেষে এই আজ্ঞা—বলবান্ ॥

এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।

সর্ব্ব কর্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫৯-৬০)

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দের উক্তি ;—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সংসমাগমঃ।

সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতো পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

অর্থাৎ “হে অচ্যুত! তোমার করুণায় যখন সংসারী ব্যক্তির ভবমোচন কাল এসে উপস্থিত হয়, তখনই সংসঙ্গ লাভ হয়ে থাকে। সংসঙ্গ হলেই পরমাগতি প্রাপ্তি হয় এবং পরাবরেশ বা সর্ব্বেশ্বর তোমাতে রুচি জন্মে। রতি জন্মিলেই মুক্তি লাভ হয়।” ভগবদ্বিস্মৃতির জন্য এই সংসাররূপ কারাগারে আমরা থাকতে বাধ্য হয়েছি। এই সংসার-দশা হতে মুক্ত হওয়া যাবে কেমন করে? আমরা যখনই সাধুসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হব, তখনই বা তৎক্ষণাৎ

সংসার-ক্ষয় শুরু হবে। সাধুসঙ্গ করলে সংসার ক্ষয় দেরী হবে না, তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত শ্লোকে ধ্বনিত হয়েছে—“যর্হি-তর্হি।” সঙ্গ-অর্থে আশ্রিত। নিগুণ সাধুর আশ্রিত হলে সগুণ বর্ণাশ্রম ধর্মের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম করতে হবে। বর্ণাশ্রম ধর্মটি কর্তব্য পালনরূপ ধর্মের ন্যায় হওয়ায় উহা জীবের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে রূপ স্তর আছে, ধর্মপালনের ক্ষেত্রেও সেরূপ স্তর আছে। মায়িক গুণবিশিষ্ট কুলধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে নিগুণ আত্মার কল্যাণ হবে না। ত্রিগুণজাত কর্মদ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের ব্যক্তিগণ দেহধারণ করে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হয়েছে,—

দৈবাধীনে শরীরেহস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্মনা।

বর্তমানোহবুধস্তত্র কর্তাস্মীতি নিবধ্যতে।। (ভাঃ ১১।১১।১০)

“অজ্ঞ পুরুষ প্রাক্তন কর্মাধীন শরীরে অবস্থিত হয়ে ‘আমি কর্তা’ এইরূপ অহঙ্কার হেতু গুণজাত কর্মদ্বারা দেহাদিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে।”

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণ কর্মমার্গাশ্রিত বলে ভগবানের বহিরঙ্গ প্রকৃতির গুণ-কর্তৃক সৃষ্ট। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জীবাত্মা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট নয়। জীবাত্মা অজ, ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ হেতু নিগুণ বা গুণাতীত। সর্ব্ববাদিসম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন,—

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।

অসত্ত্বং সর্ব্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ।। (গীতা ১৩।১৫)

অর্থাৎ “সেই পরতত্ত্ব বস্তুসকল ইন্দ্রিয় ও গুণের প্রকাশক, কিন্তু স্বয়ং জড়েন্দ্রিয়রহিত, অনাসক্ত, কিন্তু সর্ব্বপালক ; তিনি নিগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণরহিত অথচ অপ্রাকৃত ষড়ৈশ্বর্য গুণের আশ্বাদক বা তদ্ভোক্তা।”

প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণরহিত ভগবানেরই অংশে জীব উদ্ভূত হওয়ায় ভগবান্ স্বয়ং জানিয়েছেন,—“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” (গীতা ১৫।৭) অর্থাৎ “(ভগবান্ বলছেন—) আমারই অংশভূত বিভিন্নাংশ সনাতন জীব।” এস্থলে “মমৈবাংশ” বলতে জীব আমারই অংশ, আর কারও অংশ নয়—ইহাই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং নিগুণ ভগবানের অংশ জীব বা আত্মা যে নিগুণ—ইহাতে সংশয় থাকতে পারে না। অবিদ্যা বা মায়ার দ্বারা বন্ধনের জন্য জীবাত্মার এই সংসারদশা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত “দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে.....ন মুহ্যতি” (গীতা ২।১৩) শ্লোকের মর্ম্মানুসারে দেহী আত্মা পরিণামবিহীন এবং দেহ পরিণামশীল হওয়ায় দেহী ও দেহ পরস্পর পৃথক্। জীবের কর্মবশে প্রাপ্ত স্বীয় উপাধিরূপ স্থূলশরীর বা দেহ গুণানুসারে চারি বর্ণে বিভক্ত হওয়ায় চারিবর্ণ উপাধিভূত ধর্মের পরিণত হয়েছে,—উহা জীবের স্বরূপের ধর্ম বা নিত্যধর্ম হতে পারে না। জীবাত্মা মায়াতীত, আর ব্রাহ্মণাদি বর্ণ মায়াযুক্ত। সাধুর ধর্ম অবলম্বন করলে সাধুত্ব লাভ হয়, আর চোরের ধর্ম অবলম্বন করলে চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা চোররূপে পরিচিত হওয়া যায়। মায়িক ধর্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণের স্ব-স্ব ধর্ম পালনের দ্বারা মায়িক বস্তু লাভ হয়, তদ্ব্যবসায় পালনে মায়াতীত চিন্ময় বস্তু লাভ হয় না। তজ্জন্য ভগবান্ স্বীয় সখা অর্জুনকে বর্ণাশ্রম ধর্মাদির গুণময় ভূমিকা ত্যাগ করে নিগুণ তত্ত্বে প্রবেশ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন ;—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবাজ্জুন।

নির্দম্বো নিত্যসত্ত্ববস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ (গীতা ২।৪৫)

“হে অজ্জুন! তুমি বেদোক্ত ত্রৈগুণ্যবিষয় পরিত্যাগ করে নির্গুণ তত্ত্বে প্রবেশ কর; গুণময় মানাপমানাদি রহিত হও। নিত্যসত্ত্ব আমার ভক্তগণের সঙ্গ কর। মদন্ত বুদ্ধিযোগ লাভ করে যোগ ও ক্ষেমের অনুসন্ধানরহিত হও।” সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণের কন্মই ত্রৈগুণ্য। বেদ পিতৃকোটিবৎসল—গুণপ্রধান মানবের সাধারণ হিতের জন্য সকাম কন্মের কর্তব্য স্থির করলেও পরমহিতের জন্য গুণাতীত বিষয়ের নির্দেশ করেছেন। নিস্ত্রৈগুণ্যের উপদেশ হরিভজনের জন্য। অজ্জুনকে উপলক্ষ্য করে ভগবান্ মানববৃন্দকে জানালেন,—মানবের সাধারণ হিতার্থে অনাত্ম ধর্ম বর্ণাশ্রম ধর্মের সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু মানবের পরমহিতার্থে নির্গুণ আত্মধর্ম বা সনাতন বৈষ্ণবধর্ম বিহিত করেছেন। ভগবানের আদেশ,—তুমি নির্গুণ ভক্তির দ্বারা ত্রৈগুণ্য জয় কর; গুণময় শীত, দুঃখ, মান-অপমানাদির দ্বন্দ্বভাব সহিষ্ণু হও। শীত-উষ্ণাদি-জনিত অসহ্য দুঃখ ও মান-অপমানাদির নিন্দা কি-প্রকারে সহ্য হবে? তদুত্তরে তাঁর আজ্ঞা—তুমি নিত্যসত্ত্বস্থ হও অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হও ও তজ্জন্য শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তগণের সঙ্গ কর এবং যোগ-ক্ষেম ত্যাগ কর। সবকিছু ত্যাগ করে বা সর্বব্যাপী হয়ে কিভাবে বাঁচা যাবে? তদুত্তরে তাঁর নির্দেশ,—তুমি আত্মবান্ হও অর্থাৎ সর্বচিত্তা পরিত্যাগ করে ভগবানের চিন্তায় অনন্যভাবে নিরত হও। এমতাবস্থায় প্রতিপন্ন হয়—নির্গুণ ভক্তিলাভ করাই জীবের মুখ্য প্রয়োজন।

বর্ণাশ্রম ধর্ম জীবের মুখ্য প্রয়োজন হলে ভগবান্ কখনও অজ্জুনকে নির্গুণ ভক্ত হওয়ার জন্য উপদেশ করতেন না। বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ অজ্ঞান-অন্ধকারে জীব নিজের স্বরূপ দেখতে পায় না ও জীবের নিত্যপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পায় না। তাই ভগবান্ কৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতির ব্যবহারও করতে পারে না। বর্ণাশ্রম ধর্মে আত্মা কখনও সুপ্রসন্নতা লাভ করতে পারে না। সমস্ত ধর্ম ফলতঃ ও স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করত তাঁর দাসত্ব-ধর্মে স্থিত হওয়াই জীবের স্বরূপের ধর্ম। যে বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব, তাহাই তার ধর্ম। জীবের স্বভাব জীবের সহিত উদিত হয়েছে। আগুনের স্বভাব বা ধর্ম যেমন তাপ প্রদান করা, তেমনই জীবের স্বভাবও কৃষ্ণের দাসত্ব করা।

জীবের স্বভাব—কৃষ্ণ-‘দাস’-অভিমান।

দেহে আত্ম-জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই ‘জ্ঞান’ ॥

দেহে আত্মবুদ্ধি—এই বিবর্তের স্থান।

দেহে আত্মবুদ্ধি—এই মিথ্যা হয় ॥ (চৈঃ চঃ)

জীবের আত্মা ব্রাহ্মণ বা কোন বর্ণের মধ্যে পরিগণিত হন না। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ নিজের নিত্যস্বরূপ বুঝতে পারে না। দেহ-মনের ধর্ম বর্ণাশ্রম-ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে জীব বিষয়, স্বর্গসুখ বা মোক্ষসুখ পাওয়ার আশা করে। বর্ণাশ্রম-ধর্মে কৃষ্ণ-প্রীতির উদয় হয় না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

গুরুসেবকের কৃত্য

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রবণ করিয়া তাহা হৃদয়ে ধারণপূর্বক সেই বাণী অপরের নিকট সেবোন্মুখ জিহ্বায় কীর্তন করাই গুরুসেবকের সর্বপ্রধান কৃত্য। কিন্তু আমরা যদি নিজেকে কীর্তনকারী বলিয়া অভিমান করি অর্থাৎ গুরু-অভিমানী হই, তবে তাহা নিজের ও অপরের মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই আনয়ন করিবে। শ্রীগুরুদেবের বাণীই গুরুসেবকের সম্পত্তি। কিন্তু আমি যদি নিজেকে কীর্তনকারী বলিয়া অভিমান করি তবে তাহাই প্রতিষ্ঠাসভাররূপে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠা একমাত্র শ্রীগুরুদেবেরই প্রাপ্য। তাহা আর কাহারও আত্মসাৎ করিবার অধিকার নাই। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—“কীর্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠাসভার, তাহার সম্পত্তি কেবল ‘কৈতব’।”

শ্রীগুরুদেবের বাণী কীর্তনকালে আমাদের এইকথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কীর্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম ; আমরা ডাকহরকরার ন্যায় সেবকসূত্রে তাঁহার বাণী অন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার অধিকারী। ইহাতে আনুসঙ্গিকভাবে স্ব-পর-মঙ্গল সাধিত হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী কীর্তনের দ্বারা নিজেকে নিয়মিত করা অর্থাৎ কীর্তন বা প্রচার যাহা হইতেছে, তাহা নিজ জীবনে আচরিত হইতেছে কি না, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আমাদের সকলেরই একান্ত কর্তব্য। নতুবা কেবল পরোপদেশে পাণ্ডিত্যপ্রকাশের ফল অচিরেই ফলিত হইয়া গুরুসেবা হইতে আমাদের অবশ্যই পাতিত করিবে।

সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীদীক্ষাগুরুদেব ও অভিধেয়-প্রদাতা শ্রীশিক্ষাগুরুদেব উভয়েই শিষ্যকে তাঁহাদের অপ্রাকৃত বাণীর দ্বারাই নিয়মিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই শ্রীতবাণীর বা সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্মকে জানিতে হইলে শ্রবণকারীর কোন প্রাকৃত অভিমান বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা থাকিলে সেই শব্দব্রহ্ম শ্রবণকারীর নিকট তাহার স্বরূপ ব্যক্ত করেন না। কারণ সেই বস্তু জড় বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর। সেই সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

নিজেদ্রিয়মনঃকায়চেষ্টারূপাং ন বিদ্ধি তাম্।

নিত্যসত্যঘনানন্দরূপা সা হি গুণাতীতা।।

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি ভক্তি শ্রোত্র, বাক, মন ও দেহের ব্যাপার নহে। ঐ ভক্তি নিত্যা, সত্যস্বরূপা, ঘনানন্দরূপা, গুণাতীতা এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া জানিবে।

আমাদের যাহার যতটা দেহাত্মবুদ্ধি বা প্রাকৃত অভিমান প্রবল থাকিবে, সে ততটাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পদধূলিই আমার বাস্তব সত্তা, এই শুদ্ধ অভিমান প্রবল না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের শ্রবণ সুষ্ঠু হইবে না। সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল না হইলে, কীর্তনকারী গুরুদেব ও শ্রবণকারী শিষ্যের মধ্যে যে সেবা-সেবক সম্বন্ধ, তাহা জাগ্রত না হইলে, লোহার গায়ে ময়লা থাকিলে তাহা যেরূপ চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ জীবেরও শুদ্ধ অহঙ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত জীব শ্রীগুরুকৃষ্ণের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে পারে না।

গুরুপরম্পরাগত শ্রীতবাণী কর্ণে প্রবেশ করিলে এই শুদ্ধ অভিমান বা স্বভাব প্রকাশিত হইবেই। যেখানে স্বভাবের অভাব পরিলক্ষিত হইবে, সেখানে জানিতে হইবে শ্রীতবাণী কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই।

শ্রীভগবৎপাদপদ্মসেবা লাভের উপায়স্বরূপ জগতে বিভিন্ন মত ও পথ আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ‘ধর্মস্ত সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতম্’ শ্লোক হইতে ইহা জানিতে পারা যায় যে, ধর্ম এক বা একটী, তাহা সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত। মহাজনগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পন্থার অনুগমনই শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-সেবালাভের একমাত্র উপায়। মহাজনানুগত পন্থাই শ্রীতপন্থা। এই শ্রীতপন্থাই সেবাপথে পৌছবার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা বা একমাত্র প্রশস্ত সরণি। এতদ্ব্যতীত যত মত ও যত পথ—সবই বিঘ্নবহুল ও অন্ধকারে হাতড়ানোর ন্যায় চেষ্টা-বিশেষ। শ্রীতপন্থের ইহাই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, তাহাতে উপায় ও উপেয় একত্র সমাশ্লিষ্ট। এই শ্রীতবাণী যদি আমরা শুশ্রুষা কর্ণপুটে শ্রবণ করিতে পারি অর্থাৎ সেই বাণীকে যদি আমরা আমাদের প্রভু করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি আমাদের নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীতপন্থাই যে ভক্ত ও ভগবৎসেবা লাভের একমাত্র উপায়, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না—যতক্ষণ না আমাদের কর্ণে শ্রীগুরুদেবের বাণী সুষ্ঠুরূপে প্রবেশ করে। আমাদের মধ্যে বাস্তব সত্য আত্মপ্রকাশ করে নাই বলিয়াই আমরা যেভাবে বা যে পথে ভগবদুপাসনাই করি, আমাদের সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন মত বা পথকে গর্হণ করা বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মঙ্গলময় বাণী কীর্তনের দ্বারা বিপথে বা বিঘ্নবহুল পথে গমনকে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কোন অজ্ঞ বা অন্ধ ব্যক্তি যদি সুপথ ছাড়িয়া বিপথে গমন করিতে উদ্যত হয়, তবে সুজন বা পরোপকারী ব্যক্তি অবশ্যই তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। তাহাতে যদি উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে বাধাপ্রদানকারী ব্যক্তির কটুক্তি শ্রবণ করিতে হয় বা তদ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়, তাহার জন্য কোন গুরুসেবক গুরুপাদপদ্মের বাণী কীর্তন বন্ধ করিয়া পরহিংসা করেন না। অনেকের ধারণা এই যে, প্রেয়ঃপন্থী লোকের নিকট শ্রীগুরুদেবের বাণী কীর্তন করিতে গেলে তাহাদের অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়, অতএব চূপ করিয়া থাকাই ভাল। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া কীর্তন বন্ধ করা অপরের প্রতি হিংসাজনক কার্য্যই এবং আত্মমঙ্গল বা আত্মপরীক্ষার কণ্টকস্বরূপ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী কীর্তনে বা তাহা অপরের নিকট পরিবেশনকার্য্যে আমাদের যথেষ্ট অযোগ্যতা থাকিতে পারে, আমরা ত’ যোগ্য হইয়া তাহার পর শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হই নাই। যাহাতে যোগ্যতা লাভ করিতে পারি, তাহার জন্যই ত’ শ্রীগুরুদেব তাহার বাণী কীর্তন করিবার আদেশ দিয়াছেন। উন্নতিকামী ছাত্র পাঠ প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা দিবার জন্যই ত’ শিক্ষকের নিকট উপনীত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী অন্যের

নিকট কীর্তন করাই শিষ্যের গুরুর নিকট পরীক্ষা দেওয়া। সর্বভূতান্তর্যামী শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বভূতে অবস্থানপূর্বক তাঁহার নিজের কথাই শিষ্য কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে ও তাহা অপরের নিকট বিতরণ করিতেছে, তাহা দেখিতে চান। শিষ্য যদি শ্রীগুরুদেবের বাণী কীর্তন না করেন, তবে দুষ্ট ছাত্রের ন্যায় তাহার পরীক্ষা না দেওয়ার অভিপ্রায়ই প্রমাণিত হয়। উন্নতিকামী ব্যক্তির পরীক্ষা দিতে হইবে ; তবে প্রমোশন পাওয়া না পাওয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ও নিজের ভাগ্য-সাপেক্ষ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী কীর্তনকারী শিষ্যের তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন ও অমানী মানদ হইতে হইবে, নচেৎ শ্রীহরিকীর্তনে অধিকার হইবে না। যাহারা শ্রীগুরুদেবের বাণী শ্রবণে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান প্রদান করিয়া তাঁহাদের নিকট গুরুপাদপদ্মের বাণী কীর্তন করিতে হইবে। কাহারও নিকট হইতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে তাহা নিজে গ্রহণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌছাইয়া দিতে হইবে। মোটকথা আমাদিগকে সর্বতোভাবে সেবোন্মুখ হইতে ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে থাকিতে হইবে। সেবোন্মুখ না হইলে শ্রীতবাণী কর্ণে প্রবেশ করিবে না। শ্রবণ সুষ্ঠু না হইলে কীর্তন হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট অনুগত হইতে পারিলে সেবোন্মুখ-জিহ্বায় তাঁহার বাণী স্বতঃই স্ফূর্তিলাভ করিবে। তখন শ্রীগুরুদেব যন্ত্রী ও আমি একটা যন্ত্র বলিয়া শিষ্যের উপলব্ধি হইবে। শিষ্য নিজেকে তৃণাদপি সুনীচ অর্থাৎ জড় অহঙ্কার ও দম্ভহীন হওয়াকেই গুরুদেবের কৃপা বলিয়া জানিতে পারিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা না হইলে, তৃণাদপি সুনীচ হইতে না পারিলে যে কেহই গুরুদেবের বাণী কীর্তনে অধিকারী হইতে পারে না অর্থাৎ তাঁহার কৃপা না হইলে, তিনি কীর্তন না করাইলে কেহই কীর্তন করিতে পারে না। তাহা অমানিমানদধর্ম-শিক্ষা প্রদানকারী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ডে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

সবার চরণকৃপা—‘গুরু-উপাধ্যায়ী’।

তাঁর বাণী—শিষ্যা, তাঁরে বহুত নাচাই।।

শিষ্যার শ্রম দেখি ‘গুরু’ নাচান রাখিলা।

‘কৃপা’ না নাচায়, বাণী বসিয়া রহিলা।।

আমাদের বিরূপের অহংই দম্ভ, আর স্বরূপের শুদ্ধ অহং—শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদধূলিই আমাদের বাস্তুবসত্তা বলিয়া উপলব্ধি। সুতরাং আমরা যাহাতে দম্ভকে সর্বতোভাবে পরিবর্জন করিয়া শুদ্ধ অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ-কীর্তন-সেবায় উত্তরোত্তর উৎসাহবিশিষ্ট হইতে পারি, ইহাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা।

শ্রীগুরুদেবের চরণে কৃপা-প্রার্থনা

গুরুদেব মম, অপরাধ ক্ষম,
কৃপা কর' অমায়ায় ।

তুমি ছাড়া আর, কে আছে আমার,
শরণ লইনু পায় ॥ ১ ॥

বহুকাল ধরে', আছি ভবে পড়ে',
তব না পাই সন্ধান ।

সাধুর কৃপায়, মিলেছি তোমায়,
দেহ মোরে আত্মজ্ঞান ॥ ২ ॥

ধন আর জন, আত্মীয়-স্বজন,
দেহের সম্বন্ধ মানি' ।

এ আত্মা বিহনে, কেবা করে চিনে,
সেই আত্মা নাহি জানি ॥ ৩ ॥

এসেছি এ' ভবে, কেহ নাহি র'বে,
বুঝিয়াও নাহি বুঝি ।

পারের সম্বল, হরিনাম-বল,
নাহি মম কিছু পুঁজি ॥ ৪ ॥

এমত দুর্জর্ন, স্বকর্ম্মে বন্ধন,
কিরূপে হইবে ক্ষয় ।

তব কৃপা-কণ, নাহি মম ধন,
কৃপা কর দয়াময় ॥ ৫ ॥

তোমার কৃপায়, ঈশ্বরের কৃপা,
তুমি ভব-ভয়হারী ।

যে তোমারে চায়, সে তোমারে পায়,
তুমি তা'র সে তোমারি ॥ ৬ ॥

—শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯২ পৃষ্ঠার পর]

গীতার মধ্যে ও ভগবান্ নিজেই সাবধান করে দিয়েছেন,—

জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ত্যাঙ্গ দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥

তার আগে বলে রেখেছেন—“অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।” আমার যে জন্ম-কৰ্ম্ম তা অলৌকিক, দিব্য, অপ্ৰাকৃত। সাবধান করে দিচ্ছেন। অর্জুন তত্ত্বদর্শন জানেন না?—সব জানেন, কিন্তু আমাদের ন্যায় বোকা হতভাগাদের শিক্ষা দিবার জন্য ভগবান্ তাঁর একান্ত নিজজন অর্জুনকে লক্ষ্য করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। অর্জুন তত্ত্বদর্শী, তাঁকে অতাত্ত্বিক বললে অপরাধ হবে। উদ্ধব তত্ত্বদর্শী। সাধারণ জিজ্ঞাসু নন তাঁরা। সব তত্ত্বদর্শী হয়েও “দার্ট লাগি” পুছে এই সাধুর স্বভাব।” আবার প্রশ্ন করছেন, ওটাকে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁদের প্রশ্ন। আমাদের কেন্দ্র করে সমগ্র জগজ্জীব তত্ত্বসিদ্ধান্ত, তত্ত্বদর্শন জানবে—সেইজন্য তাঁদের প্রশ্ন। এখানে এই তত্ত্বদর্শনগুলো সব শাস্ত্রে আছে। কোথায় কোন্টা আছে সকলের সবটা জানা নেই, কিন্তু যেহেতু সাধু-সন্তদের জানা আছে সেজন্যই তাঁরা ওটা বলেন এবং ওটাকে Pick up করতে হবে, সংগ্রহ করতে হবে। এর নাম সাধনা। Cautiously, Carefully সংগ্রহ করতে হবে। তাহলে আমাদের কল্যাণ।

যাঁর পরিপ্রেক্ষিতে এত আলোচনা তিনিই সর্বশক্তিমান্ ভগবান্। তাঁর কথা আলোচনা করতে গিয়ে এতসব কথা এসেছে। তাঁকে অধোক্ষজ বলা হয় কেন?—“অধঃ কৃতমতিক্রান্তং বদ্ধজীবানাম্ ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজ।” অর্থাৎ যাঁর তত্ত্বকথা আমাদের মাথায় ঢোকে না, Human brain এ ঢোকে না। এ জগতে বহু Fertile brain বসে আছেন, ভগবত্তত্ত্ব তাঁরা বুঝতে পারবেন না। সেখানে তাঁরা Fail। বহু Intellectual giant বসে আছেন, ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন Concrete idea নেই, বাস্তব ধারণা নেই। সেইজন্যই সেখানে দরকার হচ্ছে আশ্রয়।

এখানে যে বিগ্রহ রয়েছে আমাদের সামনে, তিনি হলেন বিষয়-বিগ্রহ। আশ্রয়-বিগ্রহ—যাঁকে আশ্রয় করে আমরা শ্রীবিগ্রহ কি তত্ত্ব জানতে পারি, বুঝতে পারি। ওঁরা যে দাঁড়িয়ে আছেন কথা বলছেন না, তা নয়। কথা যদি বলাতে পারা যায় তাহলে কথা বলবেন, বলেন। ব্যাপারটা এইরকম। আমরা দেখি ইট, কাঠ, পাথর, মকরানা Stone, কিন্তু ভক্ত কি দেখেন?—প্রেমময় মূর্তি। ‘প্রতিমা’-শব্দের যে খারাপ ব্যাখ্যা রয়েছে (জড়বাদ) সেটা এখানে আরোপ করা চলবে না। সেজন্য কথাটা এসেছে—“প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন।” সাক্ষাৎ-কথাটা ব্যবহার হয়েছে। তার মানে তিনি কথা বলেন, তিনি হাসেন, তিনি কাঁদেন, তিনিও ভক্তের মনের ভাব বুঝতে পারেন। তিনি অন্তর্যামী। তাঁর অনেক কর্তব্য-দায়িত্ব আছে। সেজন্য তাঁর নাম ভক্তবৎসল, আশ্রিতজনপালক, বাঞ্ছাকল্পতরু। এইসব বিশেষণ তাঁর আছে। ভক্তের আনুগত্য দরকার। এখানে বলছেন,—

কুবেরাভ্যাজৌ বদ্ধ-মূর্ত্যেব যদ্বৎ

ত্বয়া মোচিতে ভক্তি-ভাজৌ কৃতৌ চ।

তথা প্রেম-ভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ

ন মোক্ষে গ্রহো মেহস্তি দামোদরেহ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ—“হে দামোদর! আপনি যে-প্রকার মাতা যশোদা-কর্তৃক রজ্জুদ্বারা উদূখলে শৃঙ্খলিত থেকেও শ্রীনলকুবর ও মণিগ্রীব-নামক কুবের-পুত্রদ্বয়কে নারদ-শাপহেতু যমলাজ্জুন-বৃক্ষ-জন্ম হতে মুক্তি ও পরম প্রয়োজনরূপ ভক্তিভাজন করেছিলেন, সেই প্রকার আমাকেও আপনার নিজস্ব প্রেমভক্তি প্রচুর পরিমাণে দান করুন—ইহাতে আমার একমাত্র আগ্রহ। অন্য কোনও প্রকার মোক্ষে আগ্রহ নেই।”

এই শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের দিগদশিনি টীকার টীকানুবাদ করেছেন অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রভু। ধনকুবেরের দুই পুত্র যমলাজ্জুনরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নারদঋষির অভিশাপে। সাধুগণের চরিত্র, সজ্জনগণের চরিত্র জনকল্যাণের নিমিত্ত। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় সাধুগণের কিছু বিরূপ মনোভাব। বাহ্যতঃ সাধুগণের ক্রোধ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁদের হৃদয়ে যে অপার্থিব স্নেহ-মমতা রয়েছে, সেই জিনিষটা সাধারণ মানুষ আমরা বুঝে উঠতে পারি না। স্নেহ-মমতা যেখানে আছে, শাসন তার পাশাপাশি আছে। আবার শাসন যেখানে আছে, স্নেহ-মমতাও তার পাশাপাশি আছে। পার্থিব জগতে এটা আমরা দেখতে পাই, অপার্থিব জগতেও সেখানে দেখতে পাই। এ সংসারে যাঁরা মাতা-পিতা, গুরুবর্গ আছেন সন্তান যদি কিছু উন্টোপান্টা করে তাহলে তাকে শাসন করেন। সেই শাসনের পিছনেও স্নেহ-মমতা আছে, কল্যাণচিন্তা আছে। আর পারমার্থিক ক্ষেত্রে গুরু-বৈষ্ণবগণের কাছে যাঁরা অবস্থান করেন, তাঁদের প্রতিও গুরু-বৈষ্ণবগণের যথেষ্ট স্নেহ-মমতা আছে। সে স্নেহ-মমতা ভগবানের সাধন-ভজনকে কেন্দ্র করে। ঈশ্বরোপাসনা এবং ভক্তিলাভার্থে সেই কল্যাণচিন্তা সাধু-মহাজনগণের আছে, থাকে।

পরম দয়ালু, পরম কৃপালু নারদঋষি—যিনি বিবেচনা করেছেন, এ সংসারে আমি সব কাজ বাদ দিয়ে শ্রীভগবানের নামকীর্তন করে বেড়াব—এটাই তাঁর প্রতিজ্ঞা। শ্রীভগবানের নাম জগজ্জীবকে দান করে তাদের কল্যাণচিন্তা করে বেড়াচ্ছেন। এরূপ যে পরমমঙ্গলময় নারদঋষি তাঁরও কোন কারণে ক্রোধোৎপত্তি হয়েছে। তিনি নলকুবর ও মণিগ্রীব—কুবেরের এই দুই সন্তান কিছু উন্টোপান্টা করছিল, তা দেখে তাদের প্রতি সদয় হয়েছেন, তাদের কল্যাণচিন্তা করছেন। নারদঋষি সেখানে বলছেন,—তোমরা ধনকুবেরের পুত্র, সেজন্য কি সব নীতি-আদর্শ ভুলে গেলে, এবং সেখানে তোমরা শুধু জাগতিক ভোগসুখকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করলে! দেবতা তোমরা, মনুষ্যগণকে শিক্ষা দেবে তোমরা নীতি-আদর্শ, আর সেখানে কিনা তোমরা উন্টোপান্টা করছ! তাদের প্রতি পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করছেন নারদঋষি তাদের আত্মকল্যাণ চিন্তা করে। তাই তাদের অভিসম্পাৎ দিয়েছেন—যাও, তোমরা পৃথিবীতে গিয়ে জন্মগ্রহণ কর বৃক্ষরূপে। কোন্ বৃক্ষ?—অজ্জুন বৃক্ষ। দুই ভাই বলে সেখানে যমলাজ্জুন কথাটা এসেছে। নারদঋষি জাগতিক-বিষয়ে সুচিকিৎসক, আবার

পরমার্থ-বিষয়েও সুচিকিৎসক। তাঁর শ্রেষ্ঠ মহৌষধ জানা আছে। সেই শিক্ষা তিনি দিতে চাচ্ছেন, সেই ঔষধ তিনি নলকুবর ও মণিগ্রীবকে খাওয়াতে চাচ্ছেন। সদ্বৈদ্য, সুচিকিৎসক তিনি। সব থেকে বড় চিকিৎসক হলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। শাস্ত্রে লেখা আছে। তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক আর হয় না।

হৃদয় পীড়িত যার, কৃষ্ণ চিকিৎসক তার,
ভবরোগ নাশিতে চতুর।

তাহলে রোগ দূরকম দেখা যাচ্ছে—একটা ইহরোগ, আর একটা ভবরোগ। ইহরোগের চিকিৎসার জন্য অনেক ডাক্তার-বৈদ্য বসে আছেন, ঠিক তেমনই ভবরোগ চিকিৎসার জন্য সদ্বৈদ্য সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণও বসে আছেন। চিকিৎসার একটু পার্থক্য আছে। জড়জগতের যে চিকিৎসক-সম্প্রদায় তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাস খুবই কম। আছে কারও কারও মধ্যে, তবে খুবই কম। তাঁরা নাস্তিক্যবাদ নিয়েই চিকিৎসা করেন। ভগবদ্ভক্ত যাঁরা, নিত্যমুক্ত যাঁরা, তাঁদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁরা ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাঁরাও চিকিৎসা করেন, তাঁরাও ঔষধ দেন, কিন্তু তাঁদের চিকিৎসার প্রণালীটা সম্পূর্ণ উল্টো। কি রকম?—তাঁরা শুধু ভগবানের নামরূপ মহৌষধ দিয়েই চিকিৎসা করেন। খুব পিত্ত বৃদ্ধি হয়েছে, খেতে পারছে না ছেলেটা, যা মুখে দিচ্ছে সব থু থু করে ফেলে দিচ্ছে। কি হল রে? তেতো! সবটাই তেতো? বলছে হ্যাঁ। যা মুখে দিচ্ছি সব তেতো লাগছে। বৈদ্য তখন ব্যবস্থা দিয়েছেন—মিশ্রির টুকরো মুখে রাখ, মিশ্রির জল খাও। তাহলে তোমার ঐ তেতো ভাব কেটে যাবে। যে পিত্তবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত মিষ্টি জিনিষও তোমার তেতো লাগছে তা কেটে যাবে। প্রথমে মিশ্রির ব্যবস্থা দিলেন। পিত্তটা যখন কেটে যাবে তখন মিশ্রিটাও মিষ্টি লাগবে। এ জগতের চিকিৎসকগণ করছেন এটা, আর ভবরোগের চিকিৎসকগণ তাঁরা ভগবানের নাম প্রদান করছেন। এই নামরূপ মহৌষধি তোমাকে দেওয়া হল, এরই সাধন কর। নামভজন তৎপর হও। নামই তোমার একমাত্র মহৌষধরূপে গণ্য হোক—সেটাই বুঝাতে চাচ্ছেন।

পরম দয়ালু নারদঋষি, নিশ্চয় কুবেরের পুত্রদ্বয়ের উপর স্নেহ-মমতা এসেছে। কি করলেন? যাও, তোমরা বৃক্ষজন্ম লাভ কর। বৃক্ষজন্ম লাভ করার কথা কেন বললেন নারদঋষি? নিশ্চয় তার পিছনে কারণ আছে, যুক্তি আছে। তিনি যখন বৈদ্য, চিকিৎসা ভালরূপ জানেন, তখন বৃক্ষজন্ম লাভ করার অভিসম্পাতের পিছনে নিশ্চয় কারণ আছে। মদ-মাতাল যারা, অত্যন্ত নেশাগ্রস্ত যারা, মৃত্যুর পর তারা বৃক্ষজন্ম লাভ করে—শাস্ত্রে এই লেখা আছে। আপনারা পড়ে দেখবেন। নারদঋষির জানা আছে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি তিনি, তাঁর সব জানা আছে। তাই তিনি কি করলেন? বৃক্ষজন্ম লাভ কর বলে ব্যবস্থা দিলেন মাতাল দুই ভাইকে। কেন? চেতনতার যে স্বভাব, চেতনতার যে প্রক্রিয়া, তার অপব্যবহার করেছ তোমরা, সুতরাং তোমাদের উপযুক্ত সাজা হল তোমরা বৃক্ষজন্ম লাভ কর—এই অভিসম্পাত দিলেন। বৃক্ষজন্ম অর্থাৎ আচ্ছাদিত চেতন। চেতনের উন্মেষ হয়েছে মনুষ্যজন্মে। চেতনতার প্রকাশ হচ্ছে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে মনুষ্যগণের এরূপ কল্যাণ হচ্ছে। কিন্তু সেখানে দেখাচ্ছেন কি?—চেহারাটা মানুষের মত হলে হয় না,

কাজটাও মানুষের মত করতে হয়। মনুষ্যজনোচিত যে আচরণ সেটা থাকা চাই, তবে তাকে মানুষ বলা হবে, মানব বলা হবে, মনুষ্য বলা হবে। যার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না সেই আচরণ সেখানে সমালোচনা আসছে। আমরা মহাজন-বাণীতে দেখতে পাই,—

“মানুষ-আকার, হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম।”

অর্থাৎ মানুষের মত চেহারা তোমার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তুমি যে কাজ করছ, সেটা মনুষ্যোচিত নয়। তাহলে আমি মানুষের শরীরটা পেয়েছি বলে আমি মনুষ্যত্বের দাবী করতে পারি না। মানুষ হলে যে আচরণ করা দরকার সেটা আমাকে করতে হবে। মানুষ হলে কি রকম আচরণ করা দরকার?— মানুষের জ্ঞান-গম্মি থাকে, বুদ্ধিবৃত্তি থাকে, বিবেচনা থাকে। সবগুলো ভগবানের দেওয়া। দেখ, এই সম্পদ দিলাম তোমাদের, এর অপব্যবহার করো না। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক সবই দিয়েছি তোমাদের, এটা ঠিক ঠিক প্রয়োগ করে চলবে তোমরা—এই হল ভগবানের আদেশ। সেটা যদি আমরা না করি তাহলে মনুষ্য বলে পরিচয় দেওয়ার উপায় নেই, মানব বলে পরিচয় দেওয়ার কোন উপায় নেই। কে মানব? শাস্ত্রে প্রশ্ন করা আছে, সুন্দরভাবে তার উত্তরও দেওয়া আছে। নীতি-আদর্শপরায়ণ যে ব্যক্তি, তারা হলেন মানব। আর নীতি-আদর্শ যারা মানে না তাদেরকে কি বলা হবে?— তাদেরকে বলা হবে দানব। মানব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হবে না তারা, দানব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হবে তারা। যারা হরিভজন না করবেন, তাদের দানবই হল সংজ্ঞা। শাস্ত্র সেখানে বুঝাচ্ছেন— মনুষ্য-জীবনের সদ্ব্যবহার করতে গেলে নীতি-আদর্শ তোমাকে মানতে হবে এবং সেই নীতি-আদর্শ প্রাথমিক, মধ্যম এবং চরম অবস্থা। প্রাথমিক অবস্থাকে বলা হয় ‘সাধনভক্তি’, মধ্যম অবস্থাকে বলা হয় ‘ভাবভক্তি’ এবং চরম অবস্থাকে বলা হয় ‘প্রেমভক্তি’। এটা যদি আমরা বুঝতে না পারি, এটা যদি আমরা মেনে নিতে না পারি, এটা যদি Practical fieldএ আচরণ করতে না পারি, তাহলে আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় থাকবে না।

‘মানব’-সংজ্ঞা এল কোথা থেকে?—মহর্ষি মনু থেকে আমাদের বিশেষণটা এসেছে মানব। তাহলে মনু হলেন আমাদের উপরওয়াল। যাঁর নীতি-আদর্শ আমরা মনে-প্রাণে মেনে নিলে আমরা মানব বলে সংজ্ঞিত হতে পারব, পরিচিত হতে পারব। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে নাস্তিক্য সমাজ এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে। খবরের কাগজ বড়বেন, বাইরের বিভিন্ন বই পড়বেন, দেখবেন তার ভিতরে মহর্ষি মনুকে নিয়ে অনেক সমালোচনা! তিনি আমাদের কি কল্যাণ করেছেন? তিনি আমাদের ক্ষতিই করেছেন, তিনি আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছেন—এইরূপ বহু কথা চলছে। ব্যাপারটা কি? মনু বলতে কি একজন? আমাদের শাস্ত্রনির্দিষ্ট মনু ১৪ জন। কিন্তু এছাড়া মনুর বংশধর অনেক আছেন, তাঁরাও মনু। এরা কার সমালোচনা করে? যদি বংশধরগণ তাঁরা পূর্বপুরুষ—যাঁদের শুভেচ্ছা, শুভাশীর্ব্বাদে তাঁরা খাচ্ছেন, পরছেন, চলছেন, ফিরছেন, তাঁদেরকে যদি অস্বীকার করেন, তাহলে তাদেরকে ত’ মানব বলা হয় না, তাদের দানব বলা হয়। এই নাস্তিক্য সমাজ কি করছে আজ? এরা উপরওয়ালাদের সমালোচনা করছে—তিনি এই খারাপ করেছেন, তিনি ওই খারাপ করেছেন, তিনি আমাদের স্ত্রী-স্বাধীনতা হরণ করেছেন ইত্যাদি। কিন্তু আদি মনু যিনি, সেই সংহিতার প্রবর্তক যিনি, তাঁকে ত’ ওরা জানল না। তিনি ত’ কোন উন্টোপান্টা কথা বলেন নি। সেই

আদি মনুর গ্রন্থ এরা কেউ পড়েনি, আলোচনা করেনি ; অথচ সমালোচনা করে যাচ্ছে।

একজন খুব বিদ্বজ্জন, খুব দার্শনিক ব্যক্তি। তিনি একখানা বই লিখেছেন। তিনি যদি আবার উন্নততর, উন্নততম স্তরের ব্যক্তি হন, তাহলে উপাদেয়। কিন্তু সেই উপাদেয় গ্রন্থের মধ্যে যদি কেউ কিছু উন্টোপান্টা কথা ঢুকিয়ে দেয়, তাহলে তাকে ত' আমরা বাস্তবসত্য বলে মানব না। মহর্ষি মনুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আজ যারা বাজারের মনুসংহিতা পড়ছেন, এগুলো প্রামাণিক গ্রন্থ নয়। এর ভিতরে বহু উন্টোপান্টা কথা লেখা আছে।

সায়ম্ভুব মনু যে সংহিতা প্রচার করেছেন সে সংহিতা অশ্রান্ত সত্য। তার ভিতরে যদি কোন কঠোর বাক্য থেকেও থাকে, সেটা মেনে নিতে হবে। কেন?—মাতা-পিতা, Guardian যেমন সমালোচনা, তাঁদের যেমন স্নেহশাসন সেইরকম। তাঁরা সমাজকে সাবধান করেছেন। দুট্টু ছেলেমেয়েরা কি বলছে? আমরা ত' এইরকম অন্যায় করিনি। শাস্ত্র বলছেন—তুমি এরকম অন্যায় করনি ঠিক আছে, কিন্তু এইরকম অন্যায় যাতে ভবিষ্যতে করে না ফেল, সেজন্য তোমাদের সাবধানের জন্য একথা বলা হয়েছে। নিষেধ কিছু নয়। গুরুজন যাঁরা তাঁরা আগেভাগে সাবধান করেন সন্তানগণকে উন্টোপান্টা যেন না করে। এখানেও ঠিক সেইরকম হয়েছে। মনুর সমালোচনা হচ্ছে, কিন্তু আদি মনু উন্টোপান্টা কিছু বলেন নি। আমাদের যতটুকু শুনতে ভাল লাগে ততটুকু আমি মানলাম, আর যেটুকু আমার মতবাদের বিরুদ্ধে সেগুলো মানলাম না। যদি এমন কথা হয় তাহলে কিন্তু সুবিধাবাদের কথা আসে। তেমন ব্যক্তি স্বার্থপর, তার কোন প্রশংসা নেই, তাদের কেউ প্রশংসা করবেন না। সেখানে অস্বয়-ব্যতিরেক দুটো একসঙ্গে মেনে নিতে হবে। আমার দিকের কথা যেটুকু লেখা আছে, সেটুকু আমি মানি, আর আমার বিরুদ্ধ মতবাদের কথা যদি কিছু লেখা আছে তাহলে তা মানি না, অস্বীকার করি—এ ত' সুবিধাবাদের কথা। এ ত' দুট্টুমি। সমাজ যদি অস্বয়-ব্যতিরেক দুটোকে পাশাপাশি রেখে না মেনে নেয়, তাহলে তাদের অকল্যাণ। যাঁরা ভূত-ভবিষ্যৎদর্শী ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, তাঁদের সবটা বিচার করতে হবে। শাস্ত্রে এটা বুঝানো আছে। ভাগবত-কথা যখনই আলোচনা করব আমরা তখন অস্বয়-ব্যতিরেক দুটো দিক নিয়ে আলোচনা করতে হবে। একদিক নিয়ে যদি আলোচনা কর তাহলে আলোচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে না। দুটোই পাশাপাশি রেখে আলোচনা করতে হবে—অস্তি, নাস্তি। ভগবান্ আছেন কি না এ সংসারের মধ্যে তা আলোচনা করতে হবে না। যদি কেউ বলেন ভগবান্ নেই, তাহলে ভগবান্ আছেন এটাই প্রমাণ করতে হবে এবং এটাই শিখতে হবে, এটাই বুঝতে হবে শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে। কারও বলা বুলি থেকে নয়। রীতিমতো তার পিছনে যুক্তি আছে, বিচার আছে। শাস্ত্র আলোচনা করতে গেলে আমরা ঐটুকু মাত্র দেখি। শাস্ত্র কি বলছেন?—

কেবলং শাস্ত্রমাস্তিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।

যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।।

কি কথা বললেন শাস্ত্রকাররা? যদি কেউ আমাদের প্রশ্ন করেন, শাস্ত্রের অমুক জায়গায় আছে দেখে নেবেন, তাহলে কি উত্তর হয়ে গেল? না, ওতে উত্তর হল না, আরও কিছু বাকী আছে। “যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।।” যদি সেই বাক্যের পিছনে সদ্যুক্তি

না থাকে তাহলে সেই বাক্য মানব না। শাস্ত্রে প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সেই সদ্যুক্তি আছে। তার পিছনে Logic আছে। শাস্ত্রবাক্যে অসঙ্গতি আছে এটা বললে হবে না। প্রমাণিত সত্য হল শাস্ত্র।

আজ বাজারে বিজ্ঞান নিয়ে খুব ঠেলাঠেলি। বিজ্ঞান ও ধর্ম। বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা আলোচনা করছেন তাঁদের কথা প্রমাণিত নয়। যত যত বিজ্ঞানী একে অপরের মত খণ্ডন করে আসছেন বরাবরই। পরিবর্তনশীল বিজ্ঞানের Theory ; কিন্তু শাস্ত্রের Theory একই। যুগ-যুগান্তর ধরে একই, একটুও পরিবর্তন নেই, পরিবর্তন নেই। সর্বকালে একই। এর নাম হল শাস্ত্রকথা। তার প্রতিটি কথা পারমার্থিক বিজ্ঞানের Theory দিয়ে বুঝানো হয়েছে। একে চিদবিজ্ঞান-রহস্য বলে। এদিক-ওদিক করা যাবে না।

সূর্য্যদেব প্রতিদিন পূর্ব্বদিকে উদিত হন। যদি কেউ বলেন অমুক দিনে সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে উদিত হবেন, মেনে নেওয়া হয় না। ঐরকম সত্য, শাস্ত্রে বুঝানো আছে যুক্তি দিয়ে।

উদয়তি যদি ভানু পশ্চিমে দিগ্বিভাগে
বিকশতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে ॥
প্রচলতি যদি মেরু শীততাং যাতি বহিঃ-
নর্টলতি খলুবাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥

এরূপ যুক্তি দিয়ে বুঝানো আছে। কেউ যদি বলেন অমুক দিনে সূর্য্য পশ্চিম দিকে উঠবেন, বাজে কথা। কেউ বলছেন, পাহাড়ের সবথেকে উচ্চশৃঙ্গ যেটা সেখানে দেখে এলাম অনেক পদ্মফুল ফুটেছে, মেনে নেওয়া যাবে না তা। যেখানে শুধু বরফ আর বরফ, আর কিছু নেই, সেখানে পদ্মফুল হয় না। ‘প্রচলতি যদি মেরু’—কেউ বলছেন, উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুতে ঘুরে গেছে, আর দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুতে ঘুরে গেছে। মানব না ওটা। ‘শীততাং যাতি বহিঃ’—আগুনটা জল হয়ে গেছে, আর জলটা আগুন হয়ে গেছে—মেনে নেওয়া যায় না। এর পিছনে কোন যুক্তি নেই, কোন তত্ত্বসিদ্ধান্ত নেই। শাস্ত্রে এগুলো বুঝিয়েছেন।

পরম দয়ালু, পরম কৃপালু নারদঋষি। ধনকুবেরের ছেলে দুটির প্রতি তাঁর খুব সুনজর, সুদৃষ্টি। এ ছেলে দুটোকে সংশোধন করতে হবে। দেবতার ছেলে, কি উন্টোপান্টা করছে সব। যে কাজ তোমরা করছ এখানে এর শেষ ফল হল বৃক্ষজন্ম। বৃক্ষজন্ম মানে আচ্ছাদিত চেতন। যে জন্মেতে চেতনতা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। মানুষ হয়েছে বাবা, মানুষের মত কাজ কর। তা ত’ তোমরা করছ না। সেজন্য তোমরা বৃক্ষজন্ম লাভ কর। নারদঋষি কবিরাজী চিকিৎসা জানতেন, সেজন্য যমলাজ্জুন বৃক্ষ অর্থাৎ অজ্জুন বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে বললেন। কেন? অজ্জুন গাছে কি-প্রকার উপকার হয় তা আপনারা নিশ্চয় জানেন। কবিরাজী চিকিৎসাতে অজ্জুন গাছের ছাল লাগে। যাদের Heart-এর অসুখ আছে তাদের অজ্জুনের ছালের Extract খেতে দেওয়া হয়। খুব উপকারী অজ্জুন গাছ।

এই দুটো ছেলের জান নষ্ট হয়ে গেছে। মদ খেয়ে খেয়ে এদের কল্জে নষ্ট হয়ে গেছে। সেজন্য সুচিকিৎসক নারদঋষি অজ্জুন গাছের ব্যবস্থা দিয়েছেন। তোমাদের Heart-

Lungs সব শেষ হয়ে গেছে। যদি Heart-Lungs ঠিক করতে চাও, তাহলে যাও অর্জুন বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ কর। অন্য বৃক্ষের কথা বলেন নি, অর্জুন বৃক্ষের কথা বলেছেন। তিনি তাদের কল্যাণচিন্তা করেছেন। ঐ অভিসম্পাৎ অভিসম্পাৎ নয়; আশীর্বাদ নারদঋষির। নারদঋষি যখন অভিসম্পাৎ করেছেন তখন ওদের একটু রাগ হয়েছে। এইরকম ধরণের অভিসম্পাৎ দিলেন! তখন ঠিক মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু মানতেই হবে ঋষিবাক্য। হবেই ওটা। এর কখনও এদিক ওদিক করা যাবে না। শেষকালে কাঁদতে লাগল ছেলে দুটো। বলছে কি? আমাদের এমন অভিসম্পাৎ দিলেন শতবর্ষ যমলাজ্জুন বৃক্ষ হয়ে থাকব আমরা! তা থাকতে হবে। এমনি শতবর্ষ নয়, দৈব-পরিমিত শতবর্ষ। সে-সময়টা কিন্তু আমাদের এখানকার সময় নয়। আমাদের এখানকার যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কাল, দেবতাগণের কাল সে-রকম নয়। সেটা আরও একটু উঁচু ধরণের এবং তার সময়টা বেশী। সেইরকম কাল। তখন দয়ালু নারদঋষি বললেন,—দ্বাপরযুগে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র (মূল মালিক) যখন লীলা করবেন, তখন তোমরা তাঁর পাদস্পর্শে উদ্ধারলাভ করবে। তাই হল।

তখন কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি, ধারণা করতে পারেনি নারদঋষি কত করুণাময়। দ্বাপরযুগে ভগবান্ আবির্ভূত হয়েছেন নন্দ-যশোমতীর পুত্ররূপে। ছেলে দুটুমি করছে বলে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছেন উদুখলের সঙ্গে। আজকালও গৃহস্থ ঘরে দেখা যায়, যে ছেলেগুলো দুটুমি করে তাদেরকেও দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। কৃষ্ণ সেই সময় হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন যখন, তখন ঐ যমলাজ্জুন বৃক্ষের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। কৃষ্ণ সবই জানেন। ঐ বাচ্চা বাচ্চা নয়, সবথেকে প্রাচীন ব্যক্তি। এমন প্রাচীন ব্যক্তি—বৃদ্ধ পৃথিবীতে আর নেই। সব মনে আছে তাঁর। নারদঋষির কথানুসারে ওদের উদ্ধার করছেন। উদুখলের সঙ্গে বাঁধা ছিল। উদুখল পড়ে গেছে, টানতে টানতে দুটো গাছের মাঝখানে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। ঝড়-ঝঞ্ঝা কিছুই নেই, অথচ গাছ দুটো পড়ে গেল। উনি একটু হাঁ করে আছেন, বাচ্চা ছেলে ত'। তার থেকে দিব্যদেহধারী দুইজন মানুষ বেরিয়ে এল ভগবানের স্পর্শে। হাতজোড় করে স্তব-স্তুতি করছেন দুজনে। এমন সুন্দর স্তব কোথা থেকে করছেন ওরা? ভগবানের পাদস্পর্শে পূর্বের সব কিছু মনে আসছে ওদের। ওরা যে অন্যায় করেছে, যার জন্য নারদঋষি তাদের সাজা দিয়েছেন সে-সব কথাগুলো বলে যাচ্ছে এবং ঐ বাচ্চা শিশুর কাছে প্রার্থনা করছে।—

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কন্মসু মনস্তব পাদয়োঃ।

স্বত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেহস্ত ভবন্তুনাম্।।

এই যে শরীরটা দিয়েছেন অতঃ পর এই শরীরটা তোমার সেবাতে নিয়োজিত করছি। চোখ দিয়েছ তোমার শ্রীমূর্তি দর্শন করব, তোমার রূপমাধুরী দর্শন করব; কান দিয়েছ তোমারই গুণ-লীলাকথা শ্রবণ করব; মুখ দিয়েছ তোমারই লীলাকথা বর্ণনা করব, তোমারই নাম কীর্তন করব; মাথা দিয়েছ তোমারই শ্রীমূর্তির সামনে দণ্ডবৎ-প্রণাম করব, তোমারই ভক্ত যাঁরা আছেন তাঁদের দণ্ডবৎ-প্রণাম করব—এইগুলো সব বলে যাচ্ছেন দুই ভাই। কৃষ্ণ হাসছেন, সেখানে আর কেউ নেই তখন। তোমাদের কথা বুঝলাম। নারদঋষি যেভাবে তোমাদের উদ্ধার করতে বলেছেন, আমি সেইভাবে উদ্ধার করলাম—বালকরূপী কৃষ্ণ

তিনি বলছেন নলকুবর ও মণিগ্রীবকে । এরপরে আর তোমাদের কোন অসুবিধা নেই । তোমরা উত্তরদিকে যাও ।

ভগবানের দর্শন পেয়েছে অনেকে । ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পেলেও, বহু ক্ষেত্রে ভাগবতে উল্লেখ আছে, তার পরেও তার অনেক কৰ্ম বাকী । আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ভগবান বলে দিচ্ছেন—তুমি উত্তরদিকে যাও । ‘উত্তরস্যাং দিশি’—তোমরা উত্তরদিকে যাও । যখন ঐ কথা শুনেছেন তখন প্রদক্ষিণ করছেন সেই উদ্যানে বন্ধনদশাগ্রস্ত কৃষ্ণকে । তারপরে উত্তরদিকে যাচ্ছেন । কি ব্যাপার ? উত্তরদিকে যেতে বলছেন কেন ? দক্ষিণদিকে যেতে বলতে পারতেন ত’ । দক্ষিণ দিক হল ধূম্রযান—নরকের পথ, মৃত্যুপথ ; আর উত্তরদিক হল দেবযান—বৈকুণ্ঠের পথ । একদিকে গেলে অসদগতি হয় ; আর একদিকে গেলে সদগতি হয় । ঐ পথ দিয়ে পঞ্চপাণ্ডবরা গেছেন । উত্তরাখণ্ড—বদ্রীনারায়ণ, বদ্রীনাথ—সেই পথে পঞ্চপাণ্ডবেরা গেছেন । বৈকুণ্ঠের পথ ওটা । সেই পথে পাড়ি দিচ্ছেন ।

বর্তমানে উত্তরাখণ্ড নিয়ে খুব রাজনীতি চলছে । সেখানকার লোক ভারত সরকারের কাছে দাবী করছে—আমাদের এটাকে পৃথক্ রাজ্য করে দাও । কিন্তু তারা বলছে ত’ অন্য ভাবে । তারা এখানকার মৌরসীপাটা নিয়ে রাজনীতি করতে চায় । সেইজন্য তারা ভারত সরকারকে ভাগ করে দিতে বলছে ।

ভগবানের দিকে যাওয়ার যে রাস্তা সেটা ঐদিকে । নারদঋষির কৰুণা এখানে উপলব্ধি করেছে নলকুবর ও মণিগ্রীব । কৃষ্ণকে আবার বলছেন তারা—নারদঋষি যে এত দয়ালু তা আমাদের জানা ছিল না । যখন তিনি অভিসম্পাত দিয়েছিলেন তখন আমাদের খুব রাগ হয়েছিল । সাধুদের আবার এত রাগ !—আজকালকার লোকগুলো বলছে সমাজে । সাধুরা রাগ করবে না ত’ কে রাগ করবে ? যাঁরা সৎভাবে চলেন, যাঁরা নীতি-আদর্শ মেনে চলেন, শ্রেষ্ঠ নীতি নিয়ে চলেন, তাঁরা ত’ অন্যায় দেখবেন না , অন্যায় সহ্য করবেন না । কথাটা এই । যেখানেই অন্যায় দেখবেন, তাঁরা বলবেন—এটা ভাল নয়, ওটা করো না, এইভাবে চল । বলতে হবেই এটা । জেনে শুনে যদি কেউ না বলেন, তাহলে ত’ আর Guardian-ship থাকে না । সাধুর যে কর্তব্য সে কর্তব্য থাকল না তাহলে । Guardian-এর যে কর্তব্য সেটা ত’ রাখতে হবে Guardianকে । সন্তান ত’ উন্টোপাণ্টা করবে, করেই, করে থাকে ; কিন্তু Guardian ত’ সবসময় সাবধান করেই থাকেন । এটাই হল অভিভাবকের অভিভাবকত্ব । শাস্ত্রে সেটা বুঝানো আছে ।

সাধুসন্তগণ সবসময় বিপথগামী সমাজকে সাবধান করবেন—এটাই সাধুগণের সাধুত্ব । তাঁরা অন্যায় দেখে সহ্য করতে পারবেন না । অন্যায়ের প্রতিরোধের চেষ্টা করবেন । উপদেশ দিয়ে বা যে কোন ভাবে তাদের সৎপথে পরিচালিত করবেন ।

কুবেরের পুত্রদ্বয়কে নারদঋষি কৃপা করলেন, যে কৃপা সাধারণভাবে হয় না । ভগবৎকৃপা সম্ভব হয় ভক্তকৃপার দ্বারা । ভক্ত যদি এগিয়ে আসেন কারও জন্য, তাহলে ভগবান তাড়াতাড়ি কৃপা করেন তাকে ।

“বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় ।

এ হেন পামর প্রতি হ’বৈন সদয় ।।”

কথাটা ত' এই। ভগবান্ দেখেন আমার অত্যন্ত নিজজন, প্রিয়জন যখন এই লোকটার জন্য এত ব্যবস্থা নিয়েছে, তাহলে নিশ্চয় আমাকে দেখতে হবে। বিচারটা হচ্ছে এই—Recommendation। সেই Recommendation সাধুদের দ্বারাই হয়। নারদঋষি ঐ Recommendation করেছেন। ভগবান্ সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আর যখনই আমরা সোজাসুজি যেতে চাই তখনই উন্টোপান্টা হয়ে যায়। তখন ভগবান্ অস্বীকার করেন—Ignore করেন। এ ত' খুব অহঙ্কারী, সবজাস্তা। তা নয়, যেমন Process, Procedure আছে, আইনকানুন আছে, সেই আইনকানুন মেনে আমাদের চলতে হবে। আমরা যারা এখানে বসে আছি সবাই ত' খুব বিশেষ আইনে বিধিবদ্ধ নয়। সাধারণ আইন ত' আমাদের মানতে হবে। ভাল ছেলেমেয়ে দুই চারজন এই পৃথিবীতে নেই তা নয়, আছে। বলুন আপনারা Double, triple promotion কজন পাচ্ছে? কিন্তু আমরা যারা সাধারণ সাধক-সাধিকা এ সংসারে, আমাদের ত' সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হবে। যাদের খুব Special brain, তাদের Promotion খুব তাড়াতাড়ি আছে। কিন্তু আমরা ত' সাধারণ Meritএর লোক, আমাদের সাধারণ নীতি-আদর্শ মেনে চলতে হবে। সাধারণ নীতি-আদর্শ বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছেন?—বৈধীভক্তি। বৈধীভক্তি মেনে চলতে হচ্ছে। রাগমার্গ অনেক বড় কথা, অনেক পরের কথা। সেইজন্য বলছিলাম,—

“বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা রত্নদানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ।”

আমরা আগে বিধিমার্গে চলি। তারপর যখন অধিকার আসবে তখন কি আর কেউ সেই অধিকার ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? কারও সাধ্য আছে? এই পৃথিবীর কোন শক্তির, কোন মনুষ্যের? পারবে না। ভগবৎকৃপা সর্বোপরি ক্রিয়াশীল। সেইকথা শাস্ত্রে বলছেন।

যখন ভক্তের মহিমা কীর্তন করছেন, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের মহিমাও এসে যাচ্ছে। ‘দামোদরাষ্টকম্’ উপরওয়ালা মালিকের, তাঁরই মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্তন। কিন্তু তিনি ত' ভক্তকে বাদ দিয়ে নন। মা-বাপ যদি কথা আছে তাহলে তার সঙ্গেই লেগে আছে সন্তান। সন্তানকে বাদ দিয়ে মা-বাপ আবার কি; মা-বাপকে বাদ দিয়েই বা সন্তান আবার কি? তার মানে Guardianকে বাদ দিয়ে স্নেহার্থী আবার কি, স্নেহার্থীর পরিচয় কোথায়? আবার স্নেহার্থী সন্তানকে বাদ দিয়ে মা-বাপের বা কি পরিচয়? এ দুটোই প্যাঁপাশি আছে। ভক্ত-ভগবানের সম্পর্কটা ঐরকম। এটা বুঝতে হবে। (ক্রমশঃ)

জন্মাষ্টমী

এদেশের মানুষ, স্বর্গের দেবতা, এমন কি ভগবানের সব অবতারের জন্ম ও আবির্ভাব-তিথির পরিচয় দিতে হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু ‘জন্মাষ্টমী’ বা ‘জয়ন্তী’ বললেই কৃষ্ণের জন্মতিথি বলে বুঝতে পারা যায়। ‘জন্মাষ্টমী’ বা ‘জয়ন্তী’ কৃষ্ণের জন্মতিথি ছাড়া আর কোন তিথিকেই বুঝায় না। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে রোহিণী-নক্ষত্রের যোগ হলে তাকে ‘জয়ন্তী’ বলে। এই তিথির সেবায় সংসার জয় ও পুণ্য লাভ হয় বলে পণ্ডিতেরা জন্মাষ্টমীকে ‘জয়ন্তী’ তিথি বলেন।

অষ্টমী কৃষ্ণপক্ষস্য রোহিণী-ঋক্ষসংযুতা ।

ভবেৎ প্রৌষ্ঠপদে মাসি জয়ন্তী নাম সা স্মৃতা ॥

* * * *

জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তীং তেন তাং বিদুঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৬৫-১৬৬)

আজকাল সাধারণ সাহিত্যে মানুষের জন্মতিথির সঙ্গেও ‘জয়ন্তী’ শব্দের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। উহা কৃষ্ণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জন্ম-তিথিরই অনুকরণ মাত্র।

পরমেশ্বকে আমরা ‘অজ’—জন্মরহিত বলেই জানি। নারায়ণের মাতা-পিতা বা জন্ম নেই; কিন্তু কৃষ্ণ এমন বস্তু যে, তিনি জন্মরহিত পরব্রহ্ম হয়েও নিজের ইচ্ছায় নিত্যজন্মলীলা প্রকাশ করেন। গীতাতেও (৪।৬) আমরা শুনতে পাই।—

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন,—আমার জন্মের সঙ্গে অন্যান্য সকলের জন্মের বিশেষ ভেদ আছে। আমি সকল প্রাণীর ঈশ্বর, জন্মরহিত ও ক্ষয়রহিত, আমি নিজের ইচ্ছায় জগতে আসি, আর জীব আমার মায়ায় বাধ্য হয়ে জগতে জন্মগ্রহণ করে; আমি মায়াধীশ, তাঁরা মায়াধীন।

জন্মরহিত বস্তু জন্ম, কালাতীত বস্তুর কালের মধ্যে আবির্ভাব, দেশাতীত বস্তুর কোন দেশে উদয়—এটা ববড়ই অভিনব ও বিপ্লবের কথা। কিন্তু এর সামঞ্জস্য একমাত্র কৃষ্ণেই হতে পারে। মানবের, দেবতার বা যে কোন প্রাণীর যা চিন্তার অতীত, সেই অচিন্ত্য ব্যাপারও সর্বশক্তিমানের সম্ভব হতে পারে। এটা সর্বশক্তিমানের অচিন্ত্যশক্তি। ‘ভগবানের শক্তিসামর্থ্য অতটুকু, এর বেশী নয়, মানুষের পক্ষে যখন এগুলি অসম্ভব, সর্বশক্তিমানের পক্ষেও তখন ঐগুলি অসম্ভব’—এরূপ গণ্ডী সর্বশক্তিমানের উপর এনে ফেললে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা অর্থাৎ তিনি যে ভগবান, তা অস্বীকার করা হল। উহা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। তাই গীতায় (৪।৯) কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন,—

জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তত্কা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥

হে অর্জুন, আমার জন্ম ও কৰ্ম্মকে যে ব্যক্তি দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত বলে জানেন, আমি যে আমার অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা জন্মলীলা প্রকাশ করি, যিনি ইহা বুঝতে পারেন, তাঁর আর দেহত্যাগ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

কি সুন্দর কথা! কৃষ্ণের জন্মের অপ্রাকৃতত্ব জানতে পারলে জীব জন্মরহিত হয়ে যায়। স্বতন্ত্র-লীলাময় কৃষ্ণকে জন্মরহিত করবার কোন আবশ্যকতা নেই। কেন না, তাঁর জন্ম কৰ্ম্মফলভোগের জন্ম নয়। তিনি যেমন অনাদি ও নিত্য, তাঁর জন্ম-লীলাও তেমনই অনাদি ও নিত্য। তিনি সমস্তকালের নিয়ামক হয়েও কোন ঐতিহাসিক কালের মধ্যে জগতে আসেন বটে, কিন্তু তিনি কালের অধীন হন না। কাল, মহাকাল তাঁরই নিত্য অধীন। তিনি যখন এ জগতে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিত্যধামও এ জগতে আবির্ভূত হন। কাজেই এ জগতের কোন ছায়াও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সাধারণ লোক মনে করে,

কৃষ্ণ এ জড় জগতেই এসেছেন, খণ্ডকালেই জন্মেছেন, কিন্তু মানব তাদের সঙ্গীর্ণ প্রতিভা ও ক্ষণভঙ্গুর মনীষাদ্বারা পরব্রহ্মের কথা মেপে নিতে পারে না ; তাই জগতের বড় বড় লোক এমন কি, স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত কৃষ্ণচরিত বুঝতে ভুল করে থাকেন। তাঁরা পুনরায় কৃষ্ণের শরণাগত হলে নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি উপলব্ধি করতে পারেন।

অগ্নিমহ্ন করবার কাঠ ও চকমকি পাথরে সবসময় গুপ্তভাবে আগুন থাকলেও সেই কাঠ ও পাথরকে মহ্ন ও আঘাত করলে তাতে যেমন অগ্নির প্রকাশ হয়, তেমনি কৃষ্ণও কোন একটা কারণ উপলক্ষ্য করে কোন বিশেষ সময়ে স্বেচ্ছায় জন্মলীলা প্রকাশ করেন। পৃথিবীতে যে-সকল প্রেমিক ভক্ত এ জগতে তাঁর দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হন, তাঁদের জন্য স্বয়ং ভগবান্ এ জগতে এসে উপস্থিত হন। শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তগণকে দর্শনদান, বাসুদেবাদি প্রিয়জনের প্রতি দয়া বিতরণ—এ সকলই কৃষ্ণজন্মের প্রধান কারণ।

কৃষ্ণ—পূর্ণপুরুষ। গীতায় যে সাধুদের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে ভগবানের অবতারের কথা শুনতে পাওয়া যায়, সে কথা পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণের জন্য নয়। কৃষ্ণের অংশের অংশ যে-সকল অবতার আছেন, যেমন অনিরুদ্ধ, বিষ্ণু, রাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন প্রভৃতি, তাঁরাই এ জগৎ পালন বা এ জগতের ভারহরণ কার্য্য করতে পারেন। অধিক কি, সময় সময় বিষ্ণুর শক্তিতে আবিষ্ট অনেক জীবও এইসকল কার্য্য করতে পারেন। চোর, ডাকাত ধরবার জন্য বা কোন প্রদেশের শান্তিরক্ষার জন্য যেমন সম্রাটকে সে কার্য্য করতে হয় না, তাঁর যে কোন একটা কর্ম্মচারী—পুলিশ, দফাদার বা চৌকিদার—এরাই সে কাজ করে থাকেন, তেমনি পৃথিবীর অশান্তি দূর করবার জন্য পৃথিবীতে স্বয়ং কৃষ্ণকে আসবার দরকার পড়ে না। তিনি কেবল তাঁর প্রেমিকভক্তগণের প্রেমে বশীভূত হয়ে জগতে তাঁর প্রেমময়ী লীলা কৃপা করে প্রকাশের জন্য—বহুলোককে সেই প্রেম-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট করবার জন্য—প্রেমিক ভক্তগণকে আনন্দদানের জন্য অজ হয়েও জন্মলীলা আবিষ্কার করেন।

সার্বভৌম সম্রাট যখন দিগ্বিজয়ে যান, তখন যেমন তাঁর অধীনস্থ সামন্তরাজগণও তাঁর অনুগমন করেন, তেমনি যখন পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণ জগতে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গেও বৈকুণ্ঠের নারায়ণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, মৎস্য, কূর্ম্ম, রাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন প্রভৃতি অংশাবতার, যুগাবতার, মহন্তরাবতার সকলেই জগতে আসেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় ও তার পরে বৃন্দাবনে সেই সকল অবতারের অনেক লীলা দেখতে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনে ব্রহ্মাকে যে অদ্ভুত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখান হয়েছিল, তা নারায়ণেরই লীলা। মথুরায় শ্রীদামা গরুড়রূপ ধারণ করলে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ হয়েছিলেন। দ্বাদশ আদিত্য এসে প্রণাম করলে শ্রীকৃষ্ণ দশভুজ ধারণ করেছিলেন। কৃষ্ণলীলায় অসুর-বধাদি যে-সকল কার্য্য হয়েছিল, তা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের কার্য্য নয় ; পূর্ণ কৃষ্ণের মধ্যে যে-সকল অংশ-অবতার ছিলেন, তাঁরাই সেই কার্য্য করেছেন।

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।

বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৩)

এই সিদ্ধান্তটী বুঝতে পারলে আমরা গীতার কথাটিও বুঝতে পারব। গীতায় যে

কৃষ্ণ বলেছিলেন,—তিনি সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টির দমন ও ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আসেন, সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশাংশ অবতারগণের কথা বলেছেন। যেমন কোন মহা অগ্নিকুণ্ড থেকে শত শত বিস্মুলিঙ্গ বেরিয়ে আবার তাতে প্রবেশ করে, তেমনি পূর্ণ কৃষ্ণের অংশরূপ অন্যান্য অবতারগণও পুনরায় কৃষ্ণের সহিতই এক হয়ে থাকেন। একটা প্রদীপ ও অগ্নিপুঞ্জ—এদের মধ্যে যে কোনও একটিই কোন গ্রাম বা নগর পুড়িয়ে দিতে পারে সত্য, কিন্তু অগ্নিপুঞ্জ হতে যে রূপ শীতের কষ্ট দূর হয় ও সুখবোধ হয়, সেইরূপ বিষ্ণুর অবতারসমূহের দ্বারা জগতের ভারহরণ-কার্য্য হলেও কৃষ্ণ ছাড়া অন্যের দ্বারা পরম প্রেমিক ভক্তগণের প্রেমানন্দ বৃদ্ধি হয় না।

কোন ছোট ছেলে যদি আজকে ভোরের বেলা পূর্বদিক হতে সূর্য্যকে উঠতে দেখে বলে যে, ১৯৯৮ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখ বেলা ৬টার সময় পূর্বদিক থেকে সূর্য্যের জন্ম হল, তাহলে যেমন প্রবীণ ব্যক্তিগণ সেই ছোট ছেলেকে বুঝিয়ে দেন যে, ১৫ই আগষ্টই সূর্য্যের প্রথম আবির্ভাব হয়নি, অনাদিকাল থেকে প্রত্যহ ভোরের বেলায় এরূপ সূর্য্যের জন্ম ও সন্ধ্যায় তাঁর প্রয়াণ চলে আসছে। সেরূপ শ্রীকৃষ্ণও কোন একটা ঐতিহাসিক কালের মধ্যে অর্থাৎ প্রতি অষ্টাবিংশচতুর্য়ুগে দ্বাপরের শেষে এই জগতে আবির্ভাব এবং একটা নির্দিষ্ট কালে এ জগতে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন।

যদি কোন বালক একটা গবাক্ষের মধ্য দিয়ে ঘোড়দৌড় দেখতে বসে, আর তার গবাক্ষের সম্মুখ দিয়ে একটা ঘোড়া দৌড়ে চলে যায়, তখন হয়ত বালক মনে করতে পারে যে, সেই ঘোড়াটা তখনই লাফাতে বা দৌড়াতে আরম্ভ করল। বস্তুতঃ ঘোড়া যেমন গবাক্ষের সামনে আসবার পূর্ব্ব হতে দৌড়াচ্ছে এবং গবাক্ষ অতিক্রম করেও দৌড়াতেই থাকবে, সেরূপ পরমার্থসম্বন্ধে যারা শিশু অর্থাৎ অজ্ঞ, তারা মনে করে,—তাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে যখন ভগবানের লীলা এসে উপস্থিত হয় বা তাদের দৃষ্টির অন্তরালে যখন চলে যায়, তখনই বুঝি ভগবানের লীলার আরম্ভ বা উপসংহার হল! বস্তুতঃ তা নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্যধাম গোলোকে যে নিত্যলীলা করেন, সেই নিত্যলীলাই তিনি এ জগতের প্রেমিক ভক্তগণের জন্য এ জগতে অবতীর্ণ করান। মানুষের জন্ম ও মৃত্যু আছে, জীবের দেহের বিনাশ আছে; কিন্তু ভগবানের জন্ম-মৃত্যু নেই, ভগবানের দেহ এবং দেহী দুটো আলাদা নয়, তাঁদের বিনাশও নেই।

ভগবানের গুণ সম্পূর্ণভাবে বলা যায় না বলে যেমন তাঁকে ‘অনামা’ বলা হয়, তাঁর রূপ প্রাকৃত নয় বলে যেমন তাঁকে ‘অরূপ’ বলা হয়, তেমনি জীবের ন্যায় তাঁর জন্ম নয় বলে তাঁকে ‘অজ’ বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেও এই জগতের জীব যে রূপভাবে পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে উৎপন্ন ও জাত হয়, কৃষ্ণ সেরূপভাবে জন্মগ্রহণ করেন নি। ‘বসুদেব’ শব্দের অর্থ—বিশুদ্ধসত্ত্ব—“সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতম্।” সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণ বসুদেব-দেবকীর অপ্রাকৃত মনে আবিষ্ট হয়েছিলেন। পূর্ব্বদিক যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে দেবকীদেবীও সেইরূপ বসুদেবের প্রাণ হতে সমাহিত জগন্মঙ্গল শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাভাগবতগণেরও হৃদয়ে প্রথমে ভগবান প্রকাশিত হয়ে পরে তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপুর সভার একটা স্তম্ভ হতে

নৃসিংহদেব এবং ব্রহ্মার নাসিকা হতে বরাহদেব প্রকাশিত হয়েছিলেন, তাই বলে ঐ সভাস্তম্ভকে বা ব্রহ্মার নাসিকাকে বিষ্ণুর মাতা-পিতা বলা যায় না। আবার শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিতের রক্ষার জন্য উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন বলে উত্তরাকেও কৃষ্ণের মা বলা হয় না। গর্ভে প্রবেশ না করেও শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদার আত্মজ (পুত্র) বলে প্রসিদ্ধ রয়েছেন। প্রাকৃত শিশু উলঙ্গ হয়েই মাতৃকুক্ষি হতে ভূমিষ্ঠ হয়; কিন্তু যখন কৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন তখন তাঁর পরিধানে ছিল—পীতবসন, মাথায়—মুকুট, তাঁর গায়ে ছিল—কিরীট-কুণ্ডল প্রভৃতি নানাপ্রকার অলঙ্কার। আর মাতা-পিতা বালককৃষ্ণকে দেখলেন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।

প্রাচীন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ের গ্রহ-নক্ষত্র হতে যে গণনা করেছেন, তাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল পাঁচহাজার বছরের কিছু পূর্বের স্থির করা যায়। বর্তমান কলিযুগের আরম্ভে ও গত দ্বাপর যুগের শেষভাগে অর্থাৎ এই কলি ও দ্বাপরের সন্ধিকালে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মের তৃতীয় পূর্বজন্মে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে বসুদেব ও দেবকী-অংশে জীব-বিশেষে আবিষ্ট হয়ে সূতপা ও পৃষ্ণিরূপে তপস্যা করেছিলেন। দ্বিতীয়জন্মে সূতপা ও পৃষ্ণি কশ্যপ ও অদিতি নামে জন্মগ্রহণ করেন, তখন বিষ্ণু উপেন্দ্র ও বামন নামে বিখ্যাত হন। তৃতীয় জন্মে তাঁরা বসুদেব দেবকীরূপে প্রকাশিত হন। এঁরা সাধকজীবন—নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। বসুদেব ও দেবকীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত বাৎসল্যরস ছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য চতুর্ভুজরূপ দেখিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য মাতা-পিতা ব্রজরাজ নন্দ ও ব্রজেশ্বরী যশোদা বসুদেব-দেবকীর ন্যায়ই অংশে জীববিশেষে আবিষ্ট হয়ে দ্রোণ-ধরারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নন্দ-যশোদার বাৎসল্যপ্রেমে ঐশ্বর্য্যের গন্ধ ছিল না, তাই দেবকী-বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের যে উদার বাল্যলীলা আশ্বাদন করতে পারেন নি, যশোদা ও নন্দ সেই লীলা পূর্ণভাবে আশ্বাদন করেছিলেন।

উগ্রসেন যাদবদিগের রাজা ছিলেন। কংস ছিলেন উগ্রসেনের পুত্র। কংসের ভগিনী—দেবকী। কংস অতি দুরাচার ছিল। সে নিজের পিতা উগ্রসেনকে পদচ্যুত করে নিজেই রাজ্য অধিকার করেছিল।

বসুদেব মথুরায় দেবকীকে বিবাহ করে যখন রথে করে গৃহে চলছিলেন তখন কংস ভগ্নীর মনস্তৃষ্টির জন্য সেই রথের সারথী হয়েছিলেন। এমন সময় এক দৈববাণী হল যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র কংসকে বধ করবে। ফলপ্রকাশের পূর্বে মূল উৎপাটিত করবার জন্য কংস দেবকীকে বধ করতে উদ্যত হল। বসুদেব তখন কংসকে বহুভাবে সান্ধনা করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, তাঁদের যতগুলি সন্তান হবে তিনি স্বয়ং সবগুলোকে কংসের হাতে সমর্পণ করবেন। এতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা হল বটে, কিন্তু কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করলেন এবং একে একে তাঁদের প্রথম ছয়টি সন্তান বধ করলেন। বসুদেবের অন্য পত্নী তখন মথুরার অদূরে ঘোষ-পল্লী গোকুলে বসুদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু নন্দগোপের গৃহে বাস করছিলেন। দেবকীর সপ্তম গর্ভ প্রকাশিত হলে যোগমায়া সেই গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করলেন। এই রোহিণীর পুত্র বলদেব। গর্ভ আকর্ষণে আবির্ভাব হয়েছিল বলে তাঁর আর এক নাম হল—‘সন্ধর্ষণ’। গোকুলবাসিগণকে আনন্দদান

করেছিলেন বলে আর এক নাম হল—‘রাম’। আর তিনি কৃষ্ণের সেবায় হৃদয়ে বলপ্রদান করেন বলে তাঁর আর এক নাম—‘বলদেব’। এদিকে দেবকীর সপ্তম-গর্ভ রোহিণীতে সংস্থাপন হওয়ার পর পুরবাসিগণ মনে করলেন,—দেবকীর সেই গর্ভ নষ্ট হয়ে গেল।

দেবকী অষ্টমগর্ভে স্বয়ং ভগবানকে ধারণ করেছিলেন বলে সেই ছটায় দেবকীর কারাগৃহ আলোকিত হল। এদিকে কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভস্থ হরিকে সর্ব্বকার্যে শত্রুভাবে চিন্তা করতে করতে জগৎকে তন্ময় দেখতে লাগল। ব্রহ্মা, শিব, নারদাদি মুনিগণ, দেবতাগণ সকলেই দেবকীর নিকট এসে গর্ভস্তুতি আরম্ভ করলেন। এদিকে ভাদ্রমাসে, কৃষ্ণাষ্টমী-তিথিতে, বুধবারে, রোহিণী-নক্ষত্রে সমস্ত দিগ্ যখন সুপ্রসন্ন হয়ে উঠল, দেবতা ও মুনিগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন, সেই অন্ধকারময় নিশাকালে কংস-কারাগারে সূতিকা-গৃহে দেবকীর শয়্যায় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন। বসুদেব দেখলেন—এক অদ্ভুত বালক, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস-চিহ্ন, গলায় কৌস্তভমণি, পরিধানে পীতবস্ত্র, মস্তকে বৈদুর্য্যমণি-শোভিত মুকুট এবং সমস্ত অঙ্গ নানা অলঙ্কারে সুশোভিত। বালকের বর্ণ নিবিড় জলধরের ন্যায়, চক্ষু দুটি পদ্মপত্রের ন্যায়। বসুদেব আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মনে মনে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণগণকে দশহাজার গাভী দান করলেন এবং কৃষ্ণকে স্তব করতে করতে তাঁর সেই চতুর্ভুজরূপের পরিবর্তে দ্বিভুজ পুত্ররূপ প্রকাশ করতে বললেন। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবকে তাঁদের পূর্ব্বজন্মের কথা সব স্মরণ করে দিয়ে তাঁকে নিয়ে অবিলম্বে নন্দ-গোকুলে যাওয়ার জন্য বললেন। যে রাত্রিতে দেবকীর নিকট বাসুদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই রাত্রিতে নন্দ-গোকুলে যশোদার গৃহেও যোগমায়া আবির্ভূত হয়েছিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে কংসের নিযুক্ত প্রহরীগণ ও নাগরিকগণ সকলেই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলেন। বসুদেব নিকটে আসিবামাত্রই কারাগারের সমস্ত কপাট আপনাই খুলে গেল।

এদিকে মেঘ মন্দ মন্দ গজ্জন করে অল্প অল্প বর্ষণ করিতেছিল ; তাই অনন্তনাগ ছাতার মত ফণা বিস্তার করে বাসুদেবকে বৃষ্টি হতে রক্ষা করে সঙ্গে সঙ্গে চললেন। সমুদ্র যেমন রামচন্দ্রকে পথ প্রদান করেছিল, যমুনাও সেইরূপ বসুদেবের পথ প্রদান করলেন। বসুদেব নন্দ-গোকুলে এসে গোপগণকে যোগনিদ্রার প্রভাবে নিদ্রিত দেখলেন এবং শিশুরূপী কৃষ্ণকে যশোদার শয়্যায় স্থাপন করে যোগমায়াকে গ্রহণ করে কংস-কারাগারে ফিরে আসলেন। সেই কন্যাকে দেবকীর শয়্যায় রেখে পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কারাগারে থাকলেন। কংস-পুরীর সকল দ্বারও তখন পূর্ব্বের ন্যায় আবদ্ধ হয়ে গেল। এদিকে দেবকীর শয়্যা হতে সেই যোগমায়া সময় বুঝে কান্না আরম্ভ করিবামাত্রই প্রহরীগণ সব জেগে গেল এবং কংসকে দেবকীর প্রসব-বার্তা জ্ঞাপন করল। দেবকীর অষ্টম গর্ভে সন্তান হয়েছে শুনেই কংস ভীমবেগে দেবকীর সূতিকাগৃহে উপস্থিত হল। দেবকীর অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও কংস ভগ্নীর হাত হতে কন্যাটিকে নিয়ে পাথরের উপর খুব জোরে আঘাত করল। কন্যাটি কংসের হস্তচ্যুত হয়ে শূন্যে চলে গিয়ে অষ্টভুজা মূর্ত্তি প্রকাশ করলেন এবং কংসকে বললেন যে, কংসের ঘাতক নিশ্চয়ই কোন না কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেছে, সুতরাং তাঁকে বা অন্য শিশুকে বধ করে কংসের কোন লাভই হবে না। দেবীর ঐ কথা শুনে কংস দেবকী ও বসুদেবকে মুক্ত করে দিল এবং মন্ত্রীগণের সঙ্গে পরামর্শ করে যেখানে যত দশদিনের কম বা তার বেশী বয়সের শিশু আছে, সকলকে মেরে ফেলবার আজ্ঞা প্রচার করল।

হিরণ্যকশিপু যেমন তার নানাপ্রকার রাজনৈতিক বুদ্ধি প্রয়োগ করে—কঠোর তপস্যা-প্রভাবে ব্রহ্মার নিকট হতে বর লাভ করে—নিজের ছেলের উপর নানাপ্রকার উৎপীড়ন করেও কোথায় তার মৃত্যু লুকিয়ে রয়েছে বুঝতে পারেনি, কংসও সেইরূপ তার মৃত্যুর পক্ষে সম্ভব যতপ্রকার শত্রু আছে, সেগুলিকে উৎপাটিত করবার চেষ্টা করেও তার প্রকৃত বিনাশক অক্ষতভাবে কোথায় রয়েছেন তা ধারণাই করতে পারেনি।

কৃষ্ণের জন্মলীলা হতে আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে। প্রেমিকভক্ত যখন কৃষ্ণের সেবা করতে প্রস্তুত হন, তখন তাঁকে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি ও উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। কৃষ্ণের আবির্ভাবের সম্ভাবনা হলেই হিংসা ও পাষাণতার বিনাশ হবে—আশঙ্কা করে হিংসার প্রতীক কংস গর্ভাবস্থায়ই অর্থাৎ ঈষৎ ভগবদুন্মুখতার সময়েই জীবের ভগবদ্ভক্তিকে বিনাশ করবার চেষ্টা করে। যদি তাতেও কারও উন্মুখতা বিনষ্ট না হয়, তখন নাস্তিকতারূপী কংস তার মন্ত্রীগণের সঙ্গে পরামর্শ করে ভক্তির সহায়ক যেখানে যত বস্তু আছে, সকলকেই বিনাশ করতে প্রস্তুত হয়। নাস্তিকতারূপী কংস ভগবদ্ভক্তকে কারাগারে নিক্ষেপ করে আপনাকে চিরজীবী রাখবার ইচ্ছা করে, কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাই তার অজ্ঞাতসারে ব্যর্থ হয়ে যায়। কৃষ্ণের আবির্ভাব জাগতিক দৈহিক স্বাধীনতা বা অধীনতার উপর নির্ভর করে না। নাস্তিকতারূপ কংস আপনাকে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র মনে করে ভগবদ্ভক্ত দেবকী ও বসুদেবকে নাস্তিকতার কারাগারের কয়েদী করবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু জাগতিক স্বাধীনতারূপ ভোগপিপাসা ও নাস্তিকতাকে বঞ্চিত করে তাদের বিনাশের জন্য জাগতিক দৃষ্টিতে পরাধীন ভক্তের নিকট ভগবানের আবির্ভাব হল। ভগবানকে কেউ নাস্তিকতার কারাগারের আসামী করতে পারে না। তিনি ভক্তের গৃহে লালিত-পালিত হন; এজন্য শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী দেবকীর নিকট ভগবানের আবির্ভাব হওয়ামাত্রই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বসুদেব বালকৃষ্ণকে নন্দ-গোকুলে নিয়ে রাখলেন। যখন প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃত পারিপার্শ্বিকতা নৈরাশ্যের মহানিশার অন্ধকারে আবৃত, যখন বিঘ্ন-প্রবাহরূপ বর্ষার ঘনঘটাৎ চতুর্দিক ব্যাপ্ত, যখন নাস্তিকতার নানাপ্রকার উৎপীড়ন, তখনও একান্ত প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয়। জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণের জন্ম না হলে জীবের জীবনই বৃথা। কৃষ্ণের জন্ম-লীলা নিত্য, তাই প্রতি বৎসর ভক্তগণ শ্রীহরির শয়নকালে কৃষ্ণকে তাঁদের শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান-ভূমিকা হৃদয়-মথুরায় নাস্তিকতার বহুরূপ উৎপীড়নের মধ্যেও আবির্ভূত দেখতে পান। প্রতি বৎসর কেন, একান্ত ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের জন্মলীলা প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত হয়ে থাকে। আমাদের এই কথাগুলিকে কেউ যেন রূপক বা কবির কল্পনা মনে না করেন। কৃষ্ণের জন্ম-জিনিসটা রূপক নয়, তথাকথিত আধ্যাত্মিকবাদও নয়, বা জাগতিক ঐতিহাসিকতার অধীনও কোন ব্যাপার নয়, ইহা পরমপাবনী ভুবনমঙ্গলময়ী অপ্রাকৃত নিত্যলীলা। ইহার সেবা করতে হয়, তাই জন্মাষ্টমীতে অহোরাত্র উপবাস করে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনের ব্যবস্থা আছে। ৮ বৎসরের শিশু হতে অতি বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলকে উপবাসব্রত পালন করতে হবে—সকলকেই সাধু মুখে কৃষ্ণের জন্মলীলা শুনতে হবে। শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহে শ্রীআচার্য্যদেবের আদেশে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ করে জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করা হয়। কেন না, শ্রীচৈতন্যের উদার-লীলায় প্রবেশ হলে শ্রীকৃষ্ণের মধুর-লীলা বুঝতে পারা যায়।

✠	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।	✠
ধর্মঃ সনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাসু যঃ।		নোৎপাদয়েদযদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।
✠	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	✠

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫০শ বর্ষ }

১১ পদ্মনাভ, কারণোদশায়ী, ৫১২ শ্রীগৌরান্দ
৩১ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৪০৫, ইং ১৭/৯/৯৮

{ ৭ম সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-নুতি-সূত্রকল্প

[ত্রিদণ্ডিস্বামী-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগদাধরাদি-নিত্যানন্দ-সঙ্গ-বর্দ্ধনং

অদ্বয়াখ্য-ভক্ত-মুখ্য-বাঞ্ছিতার্থ-সাধনম্।

ক্ষেত্রবাস-সাভিলাষ-মাতৃতোষ-তৎপরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীগদাধর, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি যাঁর সঙ্গ সমৃদ্ধ করিতেছেন, যিনি ভাগবত-প্রধান শ্রীঅদ্বৈতের বাঞ্ছাপূরণে ভূতলে অবতীর্ণ, এবং যিনি মাতৃ-সন্তোষের নিমিত্ত (সন্ন্যাসের পর) শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থান অঙ্গীকার করিয়াছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরান্দ-সুন্দরেরই আমি স্তুব করি ॥ ১১ ॥

ন্যাসিরাজ-নীল-শৈল-বাস-সার্বভৌমপং

দাক্ষিণাত্য-তীর্থ-জাত-ভক্ত-কল্প-পাদপম্।

রাম-মেঘ-রাগ-ভক্তি-বৃষ্টি-শক্তি-সঞ্চরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১২ ॥

ন্যাসিরাজ শ্রীচৈতন্য নীলাচলে সমুপস্থিত হইয়া প্রথমেই (তাৎকালিক নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অসাধারণ প্রতিভাধর) শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমকে (শ্রীশঙ্করের বিবর্তবাদ গর্ত হইতে) উদ্ধার করেন ও পরে (বিভিন্ন মতবাদ-সঙ্কুল) দাক্ষিণাত্য তীর্থসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া তত্ত্বদেশস্থিত ভক্তগণের বাঞ্ছাকল্পতরুরূপে তাঁদের অভীষ্ট পূরণ করেন এবং (বিশেষ করিয়া গোদাবরী তীরে) শ্রীরামানন্দ-নামক ভক্তমেঘে ব্রজরাগ-ভক্তির রসবৃষ্টি-শক্তির সঞ্চার করেন (ও স্বয়ং প্রশ্ন-ভঙ্গি-ক্রমে তাঁর উপদেশ প্রকাশ করেন)—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১২ ॥

গৌতমীয়-গাঙ্গ-তীর-রামানন্দ-সংবাদং

জ্ঞান-কর্ম-মুক্ত-মর্ম-রাগ-ভক্তি-সম্পদম্ ।

পারকীয়-কান্ত-কৃষ্ণ-ভাব-সেবনাকরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১৩ ॥

গৌতমীগঙ্গা (গোদাবরী) তীরে যাঁর রামানন্দ-সংবাদ-নামক (শ্রীচরিতামৃতে) সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম-সংলাপ—যাহাতে কর্ম-জ্ঞানের মালিন্য-মুক্ত হৃদয়ের অনুরাগময় সেবাকেই পরমসম্পদ বলা হইয়াছে এবং পারকীয় মধুর রসের ভাবসেবার আকর বিষয়বস্তুরূপে একমাত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই নিরূপিত হইয়াছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১৩ ॥

দাস্য-সখ্য-বাৎস্য-কান্ত-সেবনোত্তরোত্তরং

শ্রেষ্ঠ-পারকীয়-রাধিকাঙ্ক্ষ-ভক্তি-সুন্দরম্ ।

শ্রীব্রজ-স্বসিদ্ধ-দিব্য-কাম-কৃষ্ণ-তৎপরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১৪ ॥

দাস্য হইতে আরম্ভ করিয়া সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের সেবা—পর পর শ্রেষ্ঠ পারকীয় মধুররসে শ্রীরাধাকৈঙ্কর্য্যই (সর্বোত্তম) সেবাসৌন্দর্য্য এবং শ্রীব্রজধামে স্বতঃসিদ্ধ অপ্রাকৃত কাম একমাত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনেই তাৎপর্য্যবিশিষ্ট—এইরূপই যাঁহার প্রেরণা—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১৪ ॥

শান্ত-মুক্ত-ভৃত্য-তৃপ্ত-মিত্র-মন্ত-দর্শিতং

স্নিগ্ধ-মুগ্ধ-শিষ্ট-মিষ্ট-সুষ্ঠু-কুষ্ঠ-হর্ষিতম্ ।

তত্ত্ব-মুক্ত-কাম্য-রাগ-সর্ব-সেবনোত্তরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১৫ ॥

যিনি—শান্তরসে (ক্রেশ) মুক্তি-সুখ, দাস্যরসে (সেবা) তৃপ্তি-সুখ ও সখ্যরসে (প্রশয় সেবা) প্রমত্ত-সুখের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং বাৎসল্যে স্নেহাতিশয়ো জ্ঞানশূন্য

গাঢ় আনন্দানুভূতি ও মধুররসে পূর্ণ সৌষ্ঠব-বিশিষ্ট সৌখ্যানুভব শাস্ত্র-শাসিত (স্বকীয়) হইলে সঙ্কুচিতভাবে আত্মাদিত হয় বলিয়া জানাইয়াছেন ; কিন্তু শাস্ত্র-তত্ত্বাতীত ব্রজরাগ-সেবা মধুররসে—বিশেষতঃ বাম্যভাব সংযুক্ত হইলে—সর্বোত্তম সেবাসুখ প্রদান করে—এইরূপ অনুজ্ঞা করিয়াছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১৫ ॥

আত্ম-নব্য-তত্ত্ব-দিব্য-রায়-ভাগ্য-দর্শিতং

শ্যাম-গোপ-রাধিকাপ্তকোক্ত-গুপ্ত-চেষ্টিতম্ ।

মূর্ছিতাঙ্ঘ্রি-রামরায় বোধিতাত্ম-কিঙ্করং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১৬ ॥

যিনি—শ্রীরায়ে অতিমর্ত্য ভাগ্যে স্থায় নবদ্বীপ-লীলার অভিনব অবতারিত্বের বিষয় প্রকাশ করেন এবং শ্রীরাধাভাব-দ্যুতিসমন্বিত নিজ শ্যাম-গোপ স্বরূপের প্রেম-রহস্যময় শ্রীমূর্তি প্রদর্শন ও লীলাকথা ব্যক্ত করেন এবং রামানন্দ সেই অভূতপূর্ব অপরূপ রূপ দর্শনে তাঁর শ্রীচরণতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলে—সেই নিত্য কিঙ্করের চৈতন্য সম্পাদন করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১৬ ॥

ত্যাগ-বাহ্য-ভোগ-বুদ্ধি-তীব্র-দণ্ড-নিন্দনং

রায়-শুদ্ধ-কৃষ্ণ-কাম-সেবনাভি-নন্দনম্ ।

রায়-রাগ-সেবনোক্ত-ভাগ্য-কোটি-দুষ্করং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১৭ ॥

যিনি—বাহিরে ত্যাগি-বেশধারী ও গোপনে ভোগবাঞ্ছা চরিতার্থকারীকে (মর্কট বৈরাগীকে) তীব্রভাবে গর্হণ করেন, অথচ রায় রামানন্দের ন্যায় উচ্চাধিকারী বৈষ্ণবের রাগমার্গের গুঢ় সেবাচেষ্টা প্রদর্শনকে (শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে নাট্যাভিনয় শিক্ষার জন্য দেবদাসীগণের সঙ্গে অসঙ্কোচ ব্যবহারকে) অভিনন্দিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামরায়ের রাগসেবার অধিকারকে কোটি কোটি জন্মের সুদুর্লভ ভাগ্যলব্ধ সম্পদ বলিয়া ঘোষণা করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১৭ ॥

কূর্ম্ম-নষ্ট-কুষ্ঠ-বিপ্র-শুদ্ধভক্তি-তোষণং

রামদাস-বিপ্র-মোহ-মুক্ত-ভক্তি-পোষণম্ ।

কাল-কৃষ্ণ-দাস-মুক্ত-ভট্টথারি-পিঞ্জরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১৮ ॥

যিনি—শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে কুষ্ঠ রোগী বাসুদেব-নামক ভক্ত ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গনদ্বারা রোগমুক্ত ও রূপময় করিয়া প্রসন্নতা দান করেন এবং রামদাস-নামক কোন দাক্ষিণাত্য দ্বিজ-ভক্তকে (শ্রীসীতাদেবীর মূর্তি রাক্ষস-স্পৃষ্ট হইল এইরূপ অসম্ভব) কুভাবনা হইতে মুক্ত করিয়া (‘অপ্রাকৃত বস্ত্র নহে প্রাকৃত গোচর’-তত্ত্ব বুঝাইয়া ও কূর্ম্মপুরাণের প্রমাণ দেখাইয়া) শুদ্ধভক্তিদ্বারা পালন করেন এবং যিনি কালাকৃষ্ণ দাস-নামক নিজ সঙ্গী অরোধ

বিপ্রকে মালাবর দেশের ভট্টথারী-নামক দুষ্ট সম্প্রদায়ের কবল হইতে উদ্ধার করেন—
সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরানন্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১৮ ॥

রঙ্গনাথ-ভট্ট-ভক্তি-তুষ্ট-ভঙ্গি-ভাষণং

লক্ষ্মীগম্য-কৃষ্ণ-রাস-গোপিকৈক-পোষণম্।

লক্ষ্মীভীষ্ট-কৃষ্ণ-শীর্ষ-সাধ্য-সাধনাকরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে (কাবেরী তীরে শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রধান পীঠস্থানে—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ-সাধ্য বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস) শ্রীবেঙ্কটভট্ট (শ্রীগোপালভট্টের পিতা) পরিবারের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া যিনি পরিহাসছলে উপদেশ করিয়াছেন—যে লক্ষ্মীদেবী (সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াও) শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় প্রবেশ পান নাই—যেহেতু একমাত্র গোপিকাগণই ঐ রাসলীলার পোষণকর্ত্রী, অতএব (শ্রীনারায়ণের অঙ্কশায়িনী) লক্ষ্মীদেবীরও চিত্তাকর্ষণকারী—(মূল-নারায়ণ) গোপকুমার শ্রীকৃষ্ণই সর্বোত্তম সাধনের মূল উদ্দিষ্ট-তত্ত্ব—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরানন্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৯ পৃষ্ঠার পর]

১৮। বিবাহবিধি কাহাদের পক্ষে পুণ্যকার্য ?

“অত্যন্ত পশুভাবাপন্ন পুরুষের পক্ষে বিবাহবিধি দ্বারা স্ত্রী-সংসর্গ স্বীকার করাই পুণ্য।”

—কৃঃ সংঃ ১০।৩

১৯। তীর্থযাত্রার অবান্তর ফল কি ?

“তীর্থযাত্রার দ্বারা মানবগণ অনেকটা পাবিত্র্য লাভ করেন। যদি সাধুসঙ্গ তীর্থযাত্রার চরম উদ্দেশ্য, তথাপি তীর্থগত সকল লোকই আপনাদের চিন্তে আপনাদিগকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন ; যেহেতু তদ্বারা পূর্ব পাপবৃত্তি অনেকটা তিরোহিত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ২।২

২০। স্বরূপগত ও সম্বন্ধগত পুণ্য কাহাকে বলে ?

“ন্যায়, দয়া, সত্য, পবিত্রতা, আর্জব ও প্রীতি—ইহারা স্বরূপগত পুণ্য। ইহাদিগকে স্বরূপগত পুণ্য এইজন্য বলি, যেহেতু ঐ সকল পুণ্য জীবের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া সর্বকালে তাহার অলঙ্কারস্বরূপে থাকে। বদ্ধাবস্থায় কিয়ৎপরিমাণে স্থূল হইয়া ‘পুণ্য’ নাম প্রাপ্ত হয়—এইমাত্র। আর সমস্ত পুণ্যই সম্বন্ধগত, যেহেতু তাহারা জীবের জড় সম্বন্ধবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে ; সিদ্ধাবস্থায় তাহাদের প্রয়োজন নাই।”

—চৈঃ শিঃ ২।২৩

২১। কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে পাপ-পুণ্যের বাসনা থাকে কি ?

“কৃষ্ণভক্তি যখন আত্মার স্বরূপ ও স্বধর্মালোচনারূপ কার্যবিশেষ হইয়াছে, তখন যে আধারে তাহা লক্ষিত হয়, সে আধারে সমস্ত পাপ-পুণ্যরূপ সাম্বন্ধিক অবস্থার মূল-স্বরূপ অবিদ্যা ক্রমশঃ ভূষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ লোপ পাইতেছে; মাঝে মাঝে যদিও ভূষ্ট ‘কই মৎস্যে’র ন্যায় হঠাৎ পাপবাসনা বা পাপ উদ্ভূত হয়, তাহা সহসা ক্রিয়াবতী ভক্তির দ্বারা প্রশমিত হইয়া পড়ে।”

—কৃঃ সং ১০।২

২২। প্রায়শ্চিত্ত কয়প্রকার ও কি কি? কোন্ প্রায়শ্চিত্তের কি ফল?

“প্রায়শ্চিত্ত তিনপ্রকার—অর্থাৎ কৰ্ম-প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তি-প্রায়শ্চিত্ত। কৃষ্ণানুস্মরণ-কার্যই ভক্তি-প্রায়শ্চিত্ত; অতএব ভক্তিই ভক্তি-প্রায়শ্চিত্ত। ভক্তদিগের প্রায়শ্চিত্ত-প্রয়াসে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অনুতাপ-কার্যদ্বারা জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত হয়। জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত-ক্রমে পাপ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনার নাশ হয়, কিন্তু ভক্তি ব্যতীত অবিদ্যার নাশ হয় না। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কৰ্ম-প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপ প্রশমিত হয়, কিন্তু পাপবীজ বাসনা, পাপ ও তদ্বাসনার মূল অবিদ্যা পূর্ববৎ থাকে। অতিসূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা এই প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।”

—কৃঃ সং ১০।২

২৩। বর্ণাশ্রমধর্মত্যাগী স্বেচ্ছাচারিগণ প্রায়শ্চিত্তার্থ কেন?

“কিছুদিন স্বেচ্ছ সংসর্গ করিয়া যাহারা পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগ করত স্বেচ্ছদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা বিজ্ঞানসিদ্ধ সদাচারের বিরুদ্ধাচরণ করত পতিত হইয়া পড়ে; তাহারাও প্রায়শ্চিত্তার্থ।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

২৪। দুর্জাতিত্ব-দোষ কিরূপে যায়?

“দুর্জাতিত্ব-দোষ—প্রারব্ধকর্ম, তাহা ভগবন্নামোচ্চারণে দূর হয়।”

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

২৫। কি উপায়ে পাপবীজ দূর হয়?

“চিত্তশুদ্ধির যে-সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুস্মরণই প্রধান। পাপচিত্তকে শোধন করিবার জন্যই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। তন্মধ্যে চান্দ্রায়ণাদি-কর্মরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপকর্ম পাপীকে পরিত্যাগ করে, কিন্তু পাপের মূল যে পাপবাসনা তাহা যায় না। অনুতাপরূপ জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপবাসনা দূর হয়; কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বরবৈমুখ্য, তাহা কেবল হরিস্মৃতিদ্বারাই দূরীভূত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ২।২

২৬। অপবিত্রতা কয় প্রকার ও তাহাদের ভেদ কি?

“অপাবিত্র্য—শারীরিক ও মানসিক-ভেদে দ্বিবিধ। শারীরিক হউক বা মানসিক হউক, অপাবিত্র্য তিন প্রকার—দেশগত অপাবিত্র্য, কালগত অপাবিত্র্য ও পাত্রগত অপাবিত্র্য। অপবিত্র্য দেশে গমন করিলে দেশগত অপাবিত্র্য ঘটে—সেই দেশবাসীদিগের অশুদ্ভাচরণ-বশতঃ ই সেই-সেই দেশের অপাবিত্র্য ঘটিয়া থাকে। এইজন্য ধর্মশাস্ত্রে অকারণ স্বেচ্ছদেশে

গমন বা বাস করিলে দেশগত অপাবিত্র্য হয়, এরূপ বিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশজ্ঞান-লাভ, অন্য দেশের মঙ্গলবিধানের জন্য দৃষ্ট লোকের হস্ত হইতে সেই দেশকে যুদ্ধ বা কৌশলদ্বারা উদ্ধার বা ধর্মপ্রচার—এই প্রকার কার্য্যানুরোধে শ্লেচ্ছদেশ-গমনে কোন নিষেধ নাই। শ্লেচ্ছদেশের ক্ষুদ্র বিদ্যার ব্যবহার বা ধর্মশিক্ষা করিবার জন্য অথবা সেইদেশীয় লোকের সহিত সহবাস করিবার অভিপ্রায়ে শ্লেচ্ছদেশে গমন করিলে আর্য্যজাতির অবনতি হয়। সেই দোষ যাঁহাকে স্পর্শ করে, তিনি প্রায়শ্চিত্তার্থ হইয়া পড়েন।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

২৭। চিত্তের অপাবিত্র্য কিরূপ?

“ভ্রম ও মাৎস্যর্য্যদ্বারা চিত্তের অপাবিত্র্য হয় ; তাহা দূর করা কর্তব্য।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

জ্ঞান

১। জ্ঞানের স্বরূপ কি?

“জ্ঞানও সাত্ত্বিক কন্মবিশেষ।”

—গীঃ রঃ ভাঃ ৩।২

২। কিরূপ জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির স্বীকারযোগ্য?

“জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গের মধ্যে পরিগণিত নয় ; যেহেতু তাহারা চিত্তের কাঠিন্য উৎপত্তি করে ; কিন্তু ভক্তি সুকুমার-স্বভাবা, অতএব ভক্তি হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাই স্বীকৃত।”

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৩। জিজ্ঞাসা থাকা পর্য্যন্ত শুদ্ধজ্ঞান হয় কি?

“সমস্ত ভৌতিক জ্ঞান একত্রিত করিলে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাকে ‘প্রাকৃত’ জ্ঞান বলা যায়। সেই প্রাকৃত-জ্ঞানের অবিকৃত মূল জ্ঞানকে ‘অপ্রাকৃত-জ্ঞান’ বলা যায়। বিকৃত অবস্থায় অপ্রাকৃত-জ্ঞানই ‘প্রাকৃত-জ্ঞান’। সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—সমস্তই প্রাকৃত। সেই জ্ঞান সমাধিযোগে লুপ্ত হইয়া অবিকৃত-জ্ঞানকে উদয় করায় ; তজ্জ্ঞানের নামই—‘বিজ্ঞান’। যতক্ষণ জিজ্ঞাসা আছে, ততক্ষণ অবিদ্যার খেলা। অবিদ্যা-নিবৃত্তির সহিত বিজ্ঞানরূপ চিজ্জ্ঞানের উদয়। এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়া আশ্বাদনকালে ভক্তির উদয় হয়। অতএব যেই জ্ঞান, সেই ভক্তি।”

—সমালোচনা, সঃ তোঃ ১১।১০

৪। বৈষ্ণবগণ কিরূপ জ্ঞানকে নিন্দা করেন?

“বৈষ্ণব-মহাত্মগণ স্থানে স্থানে যে জ্ঞানকে নিন্দা করেন, তাহা শুদ্ধজ্ঞান নহে। যে-স্থলে জড়ীয় জ্ঞানের দ্বারা অচিন্ত্য পরমার্থের বিচার করা যায়, সেই স্থানেই জ্ঞানের নিন্দা। একজন চোরকে লক্ষ্য করিয়া যদি বলা যায় যে, মানুষ কি ‘পাজি’, তখন মনুষ্য-মাত্রকেই পাজি বলা হয় না, কেবল চোরকেই ‘পাজি’ বলা যায়।”

—সমালোচনা, সঃ তোঃ ১১।১০

৫। ভক্তিশাস্ত্রে কিরূপ জ্ঞানের নিন্দা আছে ?

“ভাবভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানের ঐক্য-বিবেচনাতেই অশুদ্ধ জ্ঞানসকলকে ‘জ্ঞান’ বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে ‘জ্ঞানে’র নিন্দা শুনা যায়। শুদ্ধজ্ঞানকে ‘জ্ঞানকাণ্ড’ বলে না।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৬। প্রত্যক্ ও পরাক্ চৈতন্য কাহাকে বলে?

“চৈতন্য দ্বিবিধ—প্রত্যক্ চৈতন্য ও পরাক্ চৈতন্য। যখন বৈষ্ণবের প্রেমাবেশ হয়, সে-সময় যাহা উদিত হয়, তাহাই প্রত্যক্ চৈতন্য অর্থাৎ অন্তরস্থ জ্ঞান; যে-সময় পুনরায় প্রেমাবেশ ভঙ্গ হয়, তখন জড়জগতে দৃষ্টি পড়ে এবং পরাক্ চৈতন্যের উদয় হয়। পরাক্ চৈতন্যকে চিৎ বলি না, কিন্তু চিদাভাস’ বলি।”

—প্রঃ প্রঃ, ৯ম প্রঃ

৭। ভগবল্লীলা কি মনুষ্য-জ্ঞানে পরিমেয়া?

“মানবের জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র। সেইজ্ঞানে পরমেশ্বরের শক্তি ও লীলা পরিমাণ করিতে গেলে নিতান্ত ভ্রমে পড়িতে হয়।”

—সমালোচনা, সসঙ্গিনী সং তোঃ ৮।৪

৮। ব্রহ্ম ও ঈশ্বরজ্ঞানের প্রভেদ কি?

“ব্রহ্মজ্ঞানটি ঈশ্বরজ্ঞানেরই একটি উপশাখা-মাত্র।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৯। কৈবল্য ও ব্রহ্মনির্বাক-মুক্তির অবস্থিতি কোথায়?

“‘কৈবল্য’ ও ‘ব্রহ্মালয়’—মায়িক জগৎ ও চিজ্জগতের মধ্য-সীমা।”

—ব্রঃ সং ৫।৩৪

১০। জ্ঞানকাণ্ডীর গতি কিরূপ?

“দ্বিতীয় সঙ্গতিতে (স্বার্থবিনাশরূপ নির্বিশেষ জ্ঞানসঙ্গতিতে) যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা আত্মনাশকে উদ্দেশ্য করিয়া ফলুবৈরাগ্য আচরণ করেন। তাঁহাদের না এ জগতে প্রতিষ্ঠা হইল, না পরে কোন সিদ্ধতত্ত্ব লাভ হইল; পরন্তু কতকগুলি ব্যতিরেক চিন্তা লইয়াই তাঁহাদের জীবনটা বৃথা অপব্যয়িত হইল। ইহাদিগকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে।”

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

১১। জ্ঞান-যোগমার্গে গোলোকে গমন-চেষ্টায় কি বিপদ আছে?

“কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত যাঁহারা কেবল চিন্তার দ্বারা গোলোকে গমনাদি চেষ্টা করেন, তাঁহাদের নিবারক দশদিকে দশটি নৈরাশ্যরূপ শূল রহিয়াছে। যোগমার্গে বা জ্ঞানমার্গে আসিতে গেলে সেই দশটি শূলে বিদ্ধ হইয়া দান্তিক লোকগণ পরাহত হন।”

—ব্রঃ সং ৫।৫

১২। সুর ও অসুর কাহারা? তাহাদের উপায় ও উপেয়েতে পার্থক্য আছে কি?

“ভগবদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিদ্বেষীগণই অসুর। সাধুত্বে ও অসুরত্বে যেরূপ সর্বদা বৈপরীত্য-ধর্ম আছে, তাহাদের সাধ্য ও সাধন-বিষয়েও হেরূপ বৈপরীত্য-ভাব থাকা আবশ্যিক। অসুরদের সাধু-বিদ্বেষ ও গো-বিপ্র-হননই—সাধন এবং মোক্ষই—সাধ্য। ভক্তদিগের ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই সাধ্য। যাঁহারা সেই মোক্ষের প্রয়াসী, তাঁহারা সুতরাং অসাধুদিগের ন্যায় কেবল জ্ঞান-চেষ্টারূপ অসাধু সাধনকে আশ্রয় করেন।”

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্যানুবাদ

যোগ ও ব্রতাদি

১। যোগ কি একটি অথবা সোপান নহে?

“যোগ ‘এক’ বই দুই নয়। ‘যোগ’—একটি সোপানময় মার্গবিশেষ, * * নিষ্কাম কর্মযোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ ‘জ্ঞানযোগ’ হয়; তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া ‘অষ্টাঙ্গ-যোগ’রূপ তৃতীয় ক্রম হয়; তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে ‘ভক্তিযোগ’রূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐ সমস্ত ক্রম-সংযুক্ত হইয়া যে মহৎ সোপান, তাহারই নাম—‘যোগ’।”

—গীঃ রঃ ভঃ ৬।৪৭

২। কর্ম-জ্ঞান-যোগ কখন গৌণ-ফলদানে সমর্থ?

“কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও তত্ত্বপন্থার অবান্তর প্রকার-সমূহের ভক্তি উদ্দেশ্য না থাকিলে কোনপ্রকার ফল দিবারই শক্তি-মাত্র নাই। চরমে কৃষ্ণভক্তির উদ্দেশ্য থাকিলেই তাহারা কথঞ্চিৎ গৌণ-ফল প্রদান করে।”

—চৈঃ শিঃ ১।৬

৩। কোন্ কোন্ শাস্ত্রে হঠযোগ বর্ণিত আছে?

“শান্ত ও শৈব-তন্ত্রসকলে এবং ঐ সকল তন্ত্র হইতে হঠযোগদীপিকা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি যে-সকল গ্রন্থ হইয়াছে, ঐ সমস্ত গ্রন্থে হঠযোগ বর্ণিত আছে।”

—প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

৪। রাজযোগ ও হঠযোগের প্রভেদ কি?

“দার্শনিক ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা যে যোগ অভ্যাস করেন, তাহার নাম—‘রাজযোগ’ এবং তান্ত্রিক-পণ্ডিতেরা যে-যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার নাম—‘হঠযোগ’।”

—প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

৫। যোগমার্গে ভয় ও ভক্তিমার্গে অভয় কেন?

“যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগ। ইহা অভ্যাস করিলে আত্মা শান্তি লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল প্রক্রিয়া-ক্রমে কোন কোন অবস্থায় সাধক কাম ও লোভের বশীভূত হইয়া চরম ফল শান্তি পর্যন্ত না গিয়া অবান্তর ফল বিভূতি ভোগ করিতে করিতে পতিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণসেবাক্রমে কোন অবান্তর ফলের আশঙ্কা না থাকায় কৃষ্ণ-সেবকের পক্ষে শান্তি নিশ্চিতরূপে লব্ধ হয়।”

—প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

৬। হঠযোগে বিপত্তি কোথায়?

“এবম্বিধ হঠযোগের সাধনা করিলে মনুষ্য অনেক আশ্চর্যজনক কার্য্য করিতে পারে; তাহা ফল-দর্শনে বিশ্বাস করা যায়। * * মুদ্রা-সাধনে এত প্রকার শক্তির উদয় হয় যে, সাধক আর অগ্রসর হইতে পারেন না।”

—প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

৭। জীবন হইতে বৈকুণ্ঠরাগ-চেষ্টাকে পৃথক করিলে সাধকের কি দশা হয়?

“ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা প্রভৃতি চিন্তা ও কার্য্যসকল যদিও রাগোদয় ফলের উদ্দেশ্যে

উপদিষ্ট হইয়াছে এবং বহুজনকর্তৃক সাধিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট রাগের আলোচনা নাই। তজ্জন্যই যোগীরা প্রায়ই বিভূতিপ্রিয় হইয়া চরমে রাগ লাভ করেন না। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব-সাধনই উৎকৃষ্ট। দেখুন, সাধন-মাত্রই কৰ্ম্মবিশেষ। মনুষ্য-জীবনে যে-সকল কৰ্ম্ম আবশ্যিক, তাহাতে রাগের কার্য্য হউক এবং পরমার্থের জন্য কার্য্য-সকলে কেবল চিন্তা ও পরিশ্রম হউক,—যাঁহাদের এরূপ চেষ্টা, তাঁহারা কি বৈকুণ্ঠ-রাগের উদয় করিতে শীঘ্র সমর্থ হইতে পারেন? জীবন হইতে বৈকুণ্ঠ-রাগের চেষ্টাসকলকে পৃথক রাখিতে গেলে সাধককে একদিকে বিষয়-রাগে টানিবে এবং অন্যদিকে বৈকুণ্ঠ-চিন্তা লইয়া যাইতে থাকিবে।”

—প্রঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

৮। রাজযোগের অঙ্গ কি কি?

“সমাধিই রাজযোগের মূল-অঙ্গ। সমাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রথমে যম, পরে নিয়ম, পরে আসন, পরে প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার, পরে ধ্যান ও ধারণা;—এই কয়েক অঙ্গের সাধনা করিতে হয়।”

—প্রঃ প্রঃ ৫য় প্রঃ

৯। রাজযোগে সমাধি-অবস্থা কিরূপ?

“রাজযোগে সমাধি-অবস্থায় প্রকৃতির অতীত তত্ত্বের উপলব্ধি হয় সেই অবস্থায় বিশুদ্ধ প্রেমের আনন্দন আছে। সেই বিষয়টি বাক্যের দ্বারা বলা যায় না।”

—প্রঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

১০। তাপসদিগের প্রক্রিয়া কিরূপ? কত প্রকার যোগ প্রচলিত আছে?

“তাপসেরা অনেক কষ্ট করিয়া কৰ্ম্মগ্রন্থি শিথিল করিতে চাহে। বৈদিক-পঞ্চাঙ্গি-বিদ্যা, নিদিধ্যাসন ও বৈদিক যোগাদি—তাপসদিগের প্রক্রিয়া। অষ্টাঙ্গযোগ, ষড়ঙ্গযোগ, দত্তাত্রেয়ী যোগ ও গোরক্ষনাথী যোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তত্ত্বোক্ত হঠযোগ ও পাতঞ্জলোক্ত রাজযোগ জগতে অনেকটা আদৃত হইয়াছে।”

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

১১। যোগ ও ভক্তিমার্গে প্রভেদ কি?

“যোগ ও ভক্তিমার্গের প্রভেদ এই যে, যোগমার্গে কষায় অর্থাৎ আত্মার উপাধির নিবৃত্তিপূর্বক সমাধিকালে আত্মার স্বধৰ্ম্ম অর্থাৎ প্রেমকে উদ্দীপ্ত করায়। তাহাতে আশঙ্কা এই যে উপাধি-নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে করিতে অনেক কাল যায় এবং স্থল-বিশেষে চরম ফল হইবার পূর্ব্বেই কোন না কোন ক্ষুদ্র ফলে আবদ্ধ হইয়া সাধক ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ভক্তিমার্গে প্রেমেরই সাক্ষাৎ আলোচনা আছে। ভক্তি—প্রেমতত্ত্বের অনুশীলন মাত্র, যে-স্থলে সকল কার্য্যই চরম-ফলের অনুশীলন, সে-স্থলে অবাস্তব ক্ষুদ্র ফলের আশঙ্কা নাই। সাধনই—ফল এবং ফলই—সাধন।”

—প্রঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

১২। যোগ-বিভূতি-লাভে কি ফল হয়?

“যোগমার্গে যে ভৌতিক জগতের উপর আধিপত্য ঘটে, সেও ঔপাধিক ফল-মাত্র,

তাহাতে চরম ফলের সাধকতা দূরে থাকুক, কখনও কখনও বাধকতা লক্ষিত হয়। যোগমার্গে পদে-পদে ব্যাঘাত আছে। আদৌ যম-নিয়মের সাধনকালে ধার্মিকতারূপ ফলের উদয় হয়, তাহাতে এবং তাহার ক্ষুদ্রফলে অবস্থিত হইয়া অনেকেই ধার্মিকবলিয়া পরিচিত হন, আর প্রেমরূপ-ফল-সাধনে প্রবৃত্ত হন না।”

—প্রঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

১৩। কখন ইন্দ্রিয়-চেষ্টা খর্ব হয়?

“পরতত্ত্বে প্রেমের আলোচনাই ভক্তিমার্গ; তাহাতে অনুরাগ যত গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয়-চেষ্টা স্বভাবতঃ ততই খর্ব হইয়া পড়ে।”

—প্রঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

১৪। ব্রতোপবাসাদির তাৎপর্য কি?

“প্রাতঃ স্নান, পরিষ্কম, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রভৃতি ব্যায়াম-সম্বন্ধীয় শারীরিক ব্রত। কোন কোন ধাতু প্রকুপিত হইলে শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হয়; তন্নিবারণার্থ দর্শ, পৌর্ণমাসী, সোমবার প্রভৃতি ব্রতের ব্যবস্থা আছে। সেই সেই নির্দিষ্ট দিবসে আহার-ব্যবহারের পরিবর্তন ও উপবাস ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক ঈশ্বরচিন্তা করাই শ্রেয়োরূপে নির্দিষ্ট।”

—চৈঃ শিঃ ২।২

১৫। মাসব্রতের মূল উদ্দেশ্য কি?

“চব্বিশটি একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ছয়টি জয়ন্তীব্রতই মাসব্রত; কেবল পরমার্থ-চেষ্টাই ঐ সকল ব্রতের মূল উদ্দেশ্য।”

—চৈঃ শিঃ ২।২

১৬। বৈরাগ্যোৎপাদনের ক্রম কি?

“চাতুর্মাস্য, দর্শ, পৌর্ণমাসী প্রভৃতি শারীরিক ব্রত পালন করিতে করিতে বৈরাগ্যের অভ্যাস হয়। আদৌ শয়ন-ভোজনাদি সম্বন্ধে সুখাভিলাষ ক্রমশঃ ত্যাগ করত শেষে সমস্ত সুখাভিলাষ ছাড়িয়া কেবল জীবনধারণমাত্র বিষয় স্বীকার করার অভ্যাস যখন পূর্ণ হয়, তখন বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ২।২

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যাভিলাষ, কৰ্ম বা জ্ঞান-যোগাদির কথা জগতে শিক্ষা দিতে আসেন নাই। কেবল অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন। অনুশীলন ‘ধন’জাতীয়, তদ্ব্যতীত অন্যকার্যগুলি ‘ঋণ’জাতীয়। অনুকূল অনুশীলনের ফলে উপাধিদ্বারা প্রাপ্য ফলগুলি জীবের অধিগত হয় না। অথবা তিনি জীব-ব্রহ্মৈকবাদ স্থাপন করেন নাই। জ্ঞানের আবরণে আবৃত প্রকাশানন্দ সরস্বতী মায়াবাদপ্রচারক ভগবদ্বিদ্বেষী ছিলেন। মুখে ভগবানের নাম গ্রহণের ছলনা করিলেও নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্যাদির নিত্যতা স্বীকার করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বারাণসীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—তথায় তার্কিক, আধ্যাত্মিক, জড়ভোগত্যাগীর আদর রহিয়াছে, ভগবদ্ভক্তি পসরার ক্রেতা তথায় নাই। সুতরাং তিনি ঐ শ্রেণীর লোকের সহিত মিলিতে ব্যস্ত হন নাই। চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র নামে দুই ব্যক্তি তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। অপরে ভাবুকতা প্রভৃতি মনে করিয়া হরিকীর্তন-পদ্ধতির উপর আক্রমণ করিতেন। তাঁহাদের স্তাবক অনেক ছিল। মহাপ্রভুকে তাঁহারা অত্যন্ত বিদ্বান্ ও সামান্য বুদ্ধিযুক্ত বাজে লোকের মধ্যেই গণনা করিতেন। তাঁহাদিগকেও তিনি নিজবদ্যানলীলার পাত্র করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অগতিগণের একমাত্র গতি, অল্প প্রয়োজনে অধিক ফলদাতা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সকল প্রভুর প্রভু। তাঁহার সেবকের অমঙ্গল থাকে না। শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি ও স্বয়ং—এই পঞ্চতত্ত্ব। ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণচৈতন্যের কায়বুহ। রসভেদ ছিল; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের আশ্বাদনে ইঁহাদের সহিত কীর্তনবিলাস করিয়াছেন।

“সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।

তদ্ভাবলিপুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥”

যাঁরা ব্রজলোকের আনুগত্যে সেবা না করেন তাঁদের প্রাকৃত সাহজিক বিচার।

“পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপং স্বরূপকম্।

ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥”

একলা কৃষ্ণ বিপ্রলভুরসের আশ্বাদনহেতু পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ। ভক্তরূপ—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ—শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার—শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তাখ্য—শ্রীবাস ও ভক্তশক্তি—শ্রীগদাধর। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ একেলা ঈশ্বর—অদ্বিতীয় নন্দনন্দন, রসিকবর্য্য, রাসবিলাসী-ব্রজরামাগণের পারকীয় নাগর। মধুররসাস্রিত গোপীগণের সহিত সন্তোগবিগ্রহ শ্যামসুন্দরের রাস। শ্রীগৌরসুন্দরের রাস নাই। গৌরসুন্দর একাকীই অনেক নহেন। বিপ্রলভভাবে সেবকলীলার অভিনয় করিয়াছেন। অসৎ-সম্পদায় তাঁহার উপর পঞ্চরসে সন্তোগের আরোপ করিয়া গৌরভোগী হইয়াছেন অনুশীলনকারী সেবক। যাঁহার অনুশীলন করা যায়, তিনি সেব্য। অদ্বিতীয় কৃষ্ণমাধুর্য্য পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। আপনার মাধুর্য্য আশ্বাদনহেতু তাঁহার ভক্ত্যভাব অঙ্গীকার। ভজনীয় বস্তু ভক্ত্যভাব জানিতেন না। ভক্তগণ কি-প্রকারে ভজন করেন, তাঁহাদের প্রণালীর উপলব্ধির জন্য তিনি স্বয়ং ভক্ত্যভাব অঙ্গীকার করিলেন। ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ দশ দেহে তাঁহার সেবা করেন। নিজের রূপমাধুরী,

নামমাধুরী, গুণমাধুরী, লীলামাধুরী ও পরিকরবৈশিষ্ট্যের মাধুরীর চমৎকারিতা দেখিয়া লোভবশতঃ ‘ভক্তের প্রণালীতে আমি ভোগ করিব।’—এই বলিয়া তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিলেন। ভজনীয়ের ভাব স্বীকার করেন নাই। স্বয়ং-প্রকাশ তত্ত্বের রূপ সঙ্কর্ষণ—তঁাহা হইতে অবতার ; তিনি ভক্ত। নিত্যানন্দের ভক্তভাবের ব্যাঘাত হয় নাই। চৈতন্যদেব ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত সেবকদ্বয়। এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য—ভক্তজাতীয় ; আরাধকের সহিত এক নহেন। ভক্ততত্ত্ব শ্রীবাস। অন্তরঙ্গ ভক্তশক্তি গদাধর।

হরিনাম প্রচারের আধিক্যে প্রেমের উদয়। গৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলায় রাজস, তামস বা সাত্ত্বিক সর্ব্বশ্রেণীর লোককে নিজপ্রেম দান করিয়াছেন। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে কেহই বাদ পড়ে নাই। মূর্থ, অসজ্জন, জড়, অন্ধ প্রভৃতিকেও প্রেমবন্যায় ডুবাইলেন। সকলেই প্রেমবন্যার বেড়ার মধ্যে পড়িয়া গেল। তাহাদের বীজ, কূট, প্রারব্ধ, অপারব্ধ সমস্ত কর্ম্মের ফল বিনষ্ট হইল। যাহার তঁাহার প্রতি যেরূপ প্রীতির ক্রম, তদনুসারে তাহার প্রেমলাভ ঘটিল। কিন্তু মায়াবাদীরা নিজের জড় অপটু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে মাপিতে গিয়া ভগবানের লীলা স্বীকার করিতে না পারায় এই প্রেমের প্লাবন হইতে দূরীভূত থাকিল। কর্ম্মনিষ্ঠগণ স্বয়ং কর্তৃত্বাভিমानी। প্রকৃতির কার্য্যগুলি নিজেতে আরোপ করিয়া ‘আমি কর্ত্তা’ এইরূপ অভিমান করে। তাহারা কুতর্কিক। কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—

“নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।

ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবনপি মৃতো হি সঃ।।”

কর্ম্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যাদি ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে কৃত না হইলে জীবমাত্রেরই জীবন্মৃত, অচেতন অবস্থা। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

“কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড।”

মায়াবাদী আধ্যাত্মিক—মুমুক্ষুপরায়ণ। ভবদেব, অনিরুদ্ধ, ভীমভট্ট, উদায়নাচার্য্যাদি কর্ম্মনিষ্ঠ। মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসক নির্ব্বিশেষবাদী। পাষণ্ডিগণও প্রেমের বন্যার এক কণাও ছুঁইতে পারিল না।

“যস্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরূপাদিদৈবতৈঃ।

সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্বন্দ্বম্।।”

যাহারা তঁাহার কৃষ্ণকীর্ত্তন-লীলায় যোগদান করিল না, সেই সন্ন্যাসী, তর্কিক, পাষণ্ডী, পড়ুয়াসকলকে স্বয়ং সন্ন্যাসলীলায় আকর্ষণ করিলেন। পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচারী অবস্থায় তঁাহার সহিত জুটিলেন। তাহাদের কর্ম্মাবরণ, জ্ঞানাবরণ, যোগাবরণের মুক্তির জন্য সমস্ত অপরাধ বিদূরিত করিলেন।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব

(পদ্মপুরাণাবলম্বনে লিখিত)

অম্বরীষ মহারাজ একদা বিষ্ণুধর্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন করত তথায় চিরবাসী জিতেন্দ্রিয় ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—“হে প্রভো ! আপনি আমাকে অপার সংসার হইতে পরিত্রাণ করুন । যিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ পরব্রহ্ম এবং মুনিগণ যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন, সেই চিন্ময়তত্ত্বে আমার মন কিরূপে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা বলুন ।”

বেদব্যাস বলিলেন,—“হে হরিপ্রিয় মহারাজ অম্বরীষ ! তুমি যে অতি নিগূঢ় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা আমি পূর্বে কাহাকেও বলি নাই, তোমাকে বলিতেছি । এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূর্বে যে রূপে যে অবস্থায় অবিনাশী অবিকৃত হইয়া অবস্থিত ছিল, ভগবদিচ্ছায় প্রকটিত সেই বিশ্বের কথা সর্ব্বাঙ্গে বর্ণনা করিতেছি ।—

“আমি পূর্বে ফল-মূল, জল ও বায়ুমাত্র আহার করিয়া বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া শ্রীহরির দর্শনলাভ করিয়াছিলাম । জগদীশ্বর আমাকে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘হে মহামতে ! তুমি কি অভিপ্রায়ে এইরূপ করিতেছ ? তত্ত্বজ্ঞানের কামনায় কি ? তাহা বল, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি । আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর । তোমায় সত্য বলিতেছি, আমার দর্শন পাইলে জীবের আর সংসার ক্লেশ ঘটে না ।’

“তখন আমি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে বলিলাম,—‘মধুসূদন ! যিনি সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এবং যিনি জগৎপতি ও জগতের প্রকাশস্বরূপ, সেই আপনাকে আমি সাক্ষাৎ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি ।’

“তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন,—‘পূর্বে আমি ব্রহ্মাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত ও প্রার্থিত হইয়া তাহাকে যে রূপে বলিয়াছি, এক্ষণে তোমাকেও তাহাই বলিতেছি ।—কতকলোকে আমাকে ‘প্রকৃতি’ বলিয়া নির্দেশ করে, কেহ বা পরমপুরুষ ‘ঈশ্বর’ বলিয়া থাকে, কেহ বা আমাকে ‘ধর্ম’ বলে, কেহ বা নশ্বর ধনকেই ঈশ্বর বলে, কাহারও মতে ভুক্তিই ঈশ্বর ; কতকলোকে শূন্যকে, কেহ বা সত্তাকে এবং কেহ বা মঙ্গলময় সদাশিবকে ‘পরমেশ্বর’ বলেন । আবার অন্যলোকে বেদের শীর্ষদেশে অবস্থিত একমাত্র ‘সনাতন পুরুষ’ বলিয়া আমায় নির্দেশ করেন । হে মহাভাগ ! আজি আমি তোমাকে সেই নির্বিবকার বেদগোপিত চিদানন্দময় সৎস্বরূপ অপরূপ রূপ প্রদর্শন করিতেছি ।’

মহর্ষি বেদব্যাস বলিলেন,—“হে বৈষ্ণবচূড়ামণি মহারাজ ! ভগবানের এইপ্রকার বাক্যাবসানে আমি দেখিলাম,—সেই আমার নবজলদ-কান্তি প্রভু গোপবালকবেশে পীত বসন পরিধান করত গোপ-কন্যাগণে পরিবৃত হইয়া কদম্ব-তরুমূলে বসিয়া গোপ-শিশু-দিগের সহিত বালসুলভ হাস্য করিতেছেন । আরও দেখিলাম,—সন্মুখে সেই নবপল্লব-শোভিত, ভ্রমর-কোকিল-রবে গুঞ্জিত কাম-মনোমোহন বৃন্দাবন ; তথায় মেঘের ন্যায় শ্যামলা যমুনা প্রবাহিতা হইতেছে এবং দেবরাজের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-হস্তোদ্ধৃত সেই গোপ ও গোবৃন্দের সুসম্পদ গোবর্দ্ধন-গিরিরাজকে দেখিলাম । আমি সর্ব্বভূষণেরও ভূষণভূত সেই বেণুবাদনকারী, গোপালবেশী ভগবানকে দেখিয়া সমধিক আনন্দিত হইলাম ।

“বৃন্দাবনবিহারী ভগবান্ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—‘বৎস ! তুমি যে আমার এই শান্ত সচ্চিদানন্দময় পদ্মপলাশলোচন দ্বিভূজ-মুরলীধর শ্যামসুন্দর সনাতন দিব্যরূপ

দেখিতেছ, ইহার পর আর অবশিষ্ট কিছুই নাই। বেদ-চতুষ্টয় ওই রূপকেই সর্বকারণ-কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাই সত্য পরমানন্দ-স্বরূপ, চিদঘন ও নিত্য-মঙ্গলময়। হে বৎস! এই মথুরাপুরী, যমুনা নদী, গোপ-রমণীগণ ও গোপ-বালকগণ—এ সমুদয় আমার নিত্য সহচর-সহচরী জানিও এবং অবতারী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণরূপে আমার লীলা ও ‘পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ’ রূপও নিত্য—ইহাতে সংশয় করিল না। রাধিকা আমার সর্বদা প্রিয়তমা এবং আমাকে সর্বজ্ঞ, পরাংপর, সর্বেশ্বরেশ্বর, সর্বানন্দময়, সর্বকামস্বরূপ মদনমোহন বলিয়া জানিও; এই বিশ্ব-সংসার আমারই মায়াবশে প্রকাশমান হইলেও আমাতেই অবস্থিত আছে জানিবে।’

“অনন্তর লীলাময় পুরুষোত্তম ভগবানকে আমি বলিলাম,—‘হে জগতের কারণেরও কারণস্বরূপ প্রভো! এই গোপকন্যাগণ ও গোপবালকগণ কে? এই কদম্বতরু বা কে? বনই বা কে? কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমেরাই বা কে? আর যমুনা ও গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনই বা কে? আর ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীধ্বনি বা কি?—তাহা আমাকে বলুন।’

“ভগবান্ প্রীত হইয়া প্রসন্নবদনে আমাকে বলিলেন,—‘বৎস! গোপিকারা শ্রুতি ভিন্ন কিছুই নহে, আর শ্রুতি-মন্ত্রসমূহই গোপকন্যাকা এবং তপস্যানিরত বৈকুণ্ঠবাসী মুক্ত মুনিগণই গোপবালক; কল্পবৃক্ষই পরমানন্দাস্পদ কদম্ব-বৃক্ষ হইয়াছে ও আমার গোলোকের নিত্য-বিহারস্থলীকেই বৃন্দাবনরূপে দেখিতেছ; সিদ্ধ-সাধ্য ও গন্ধর্ব্বগণই কোকিলাদির মূর্ত্তি স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। নিখিলশাস্ত্র এই যমুনাকে আনন্দময়েরই মূর্ত্ত্যন্তর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং শান্তহৃদয় তপস্বী সত্যনিষ্ঠ ‘বেদব্রত’ নামে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই বেণুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে মহাভাগ বেদব্যাস! ইহাতে কিছু সংশয় করিও না। আমি তোমার নিকট যাহা প্রকাশ করিলাম, ইহা সমস্ত বেদেরও অতি নিগূঢ়-রহস্য বলিয়া জানিবে।’

উক্ত উপাখ্যানের শিক্ষা

অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই যে সর্বোত্তম এবং ব্রজদেবীগণ যে মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন, তাহাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ—ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত আখ্যায়িকা হইতে প্রতিপাদিত ও প্রমাণিত হইবে। সর্ববেদান্ত সার পারমহংস-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত ‘অনুগ্রহায় ভক্তানাং’, বিব্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ” প্রভৃতি শ্লোকদৃষ্টে অনেকে মনে করিতে পারেন—ভগবান্ যে গোলোকগত অপ্রাকৃত রাসাদিক নিগূঢ় লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই বোধ হয় অধিকার নির্বিচারে সকলেরই আলোচ্য ও শ্রবণ-কীর্ত্তনীয়। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ পরদুঃখদুঃখী মঙ্গলময় শ্রীবেদব্যাস পূর্ব্বই ইহা আশঙ্কা করিয়া রাস-পঞ্চাধ্যায়-শেষে “নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু” শ্লোকের দ্বারা অনধিকারীর পক্ষে শ্রীভগবানের মধুর-রসাত্মক লীলাদি আচরণ করা দূরের কথা, মনে মনেও চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। টীকাকারগণ ও বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ সকলেই উক্ত বাক্যের সমর্থন করিয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এঁচড়েপাকা প্রাকৃত সহজিয়াশ্রেণী হাটে-ঘাটে-মাঠে উল্লতোজ্জ্বল-রসতত্ত্ব আলোচনামুখে নৃত্য-কীর্ত্তনাদিদ্বারা অনধিকারী নিজদিগকে ও জনসাধারণকে অধঃপাতিত করিয়া নিরয়গামী হইতেছেন। ভগবান্ তাহাদিগকে সদ্ভুদ্ধি প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা করি।

—ত্রিদিগুস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

শ্রীনন্দোৎসব

অখিলরসাম্যতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবোপলক্ষে যাঁহারা আনন্দপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি সেই বৎসলরসরসিক কৃষ্ণপালকই শ্রীনন্দ। নন্দলাল শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-বৃন্দাবনে পঞ্চরসের বিষয়-বিগ্রহরূপে সেবিত হন। যখন তিনি শান্তরসের বিষয়, তখন তাঁহার আশ্রয়—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু। যখন তিনি দাস্য ও সখ্যরসের বিষয়, তখন তাঁহার আশ্রয় যথাক্রমে রক্তক, পত্রক, চিত্রক এবং শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি; আর এই তিন রসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বৎসলরসে পুত্ররূপে যিনি ভগবান্ কৃষ্ণকে লালনপালন করেন—সেবা করেন সেই কৃষ্ণজনক শ্রীনন্দের ভবনে আজ মহামহোৎসব। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ শ্রীনন্দের হৃদয়ে সর্বদা বিশ্রাম করিতেছেন বলিয়া কৃষ্ণসেবোন্মত্ত শ্রীনন্দ আজ আনন্দে আত্মহারা এবং নন্দানুগগণ সকলেই আজ নন্দানুগতো কৃষ্ণমহোৎসবে কৃষ্ণসেবায় উন্মত্ত ও পরমোন্মাদে বিহ্বল।

পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মসনাতন কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইয়া যে নন্দের ভাগ্যের আর সীমা নাই সেই কৃষ্ণগতপ্রাণ নন্দের বিষয় সাধুমুখে অবগত হইয়া তাঁহার কৃপালাভের জন্য—তাঁহার গৃহে কৃষ্ণেৎসবে যোগদানের জন্য ইচ্ছা আমরা কেহ কেহ করি বটে কিন্তু আমাদের ঐ সদিচ্ছা নিষ্কপট আর্তিমূলা না হওয়ায় আমরা প্রায় শতকরা শতজনই তাহা হইতে বঞ্চিত হই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনাদরই এই পরম সৌভাগ্যলাভের অন্তরায়-স্বরূপ। যিনি নন্দ ব্যতীত আর কেহ নহেন সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা গুরুগৃহের প্রতি ওদাসীনা্য আসিলে দোষ কাহার? তাই হতভাগ্য আমি আজ নন্দগৃহে—গুরুগৃহে বাসের ও তৎসঙ্গ লাভের অভিনয় করিয়াও নন্দোৎসবে যোগদানের অধিকার পাইতেছি না এবং ইহা পাইয়াও দুর্বুদ্ধিবশতঃ তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইতেছি না। এমনই আমার দুর্দেব!

নন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম যখন কৃপাপূর্বক জগতে আসিয়া এখানে নন্দোৎসব প্রকট করিয়াছেন তখন আর আমাদের নিজ্জনে বসিয়া তচ্ছিত্তায় ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা কি? অতএব যাঁহারা সেই শ্রীগুরুনন্দের কৃপা উপলব্ধি করিয়া তন্নির্দেশক্রমে শ্রীনন্দোৎসবের আয়োজন করিতেছেন—কৃষ্ণসেবার কথা জগতে প্রচার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের আনুগত্যই আজ আমাদের অবলম্বনীয় হউক। আমরা নন্দ হইতে চাহি না—গুরু হইতে চাহি না। এই নন্দোৎসব-বাসরে নন্দানুগগণের—শ্রীগুরুদাসগণের দাস্যই আমাদের প্রার্থনীয় হউক। জগতের লোক যে যাহা করে করুক তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, তবে আমরা তাহাদিগকে এই গুরুনন্দের আনুগত্যে শ্রীনন্দোৎসবে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া জগতের সব ছাড়িয়া যাহাতে কৃষ্ণপ্রদাতা শ্রীগুরুনন্দ ও তদনুগগণের কৃপা লাভ করিতে পারি তজ্জন্য গৌরচরণে কৃপাভিক্ষা করিতেছি এবং যিনি জগৎকে কৃষ্ণ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে হৃদয়দেবতা ও একমাত্র পূজ্য বলিয়া জানিবার ও তৎপাদপদ্মে সর্বাত্মসমর্পণ করিবার বল প্রার্থনামুখে মহাজনানুগত্যে শ্রীগুরুনন্দের পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি। বৈষ্ণবগণ কৃপা করুন।

“শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।

অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম।।”

—দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নন্দ-বন্দনা

ঘন ঘন অতি গভীর নিনাদে,
দুন্দুভি ভেরি বাজিছে।
মাগধ গায়ক সুতগণ মিলি,
বিজয়গীতি গাহিছে।।
শোভি' চিত্রধ্বজ পতাকা তোরণে,
গোকুলপুর রাজিছে।
শারদ ভূষণে সুশোভিতা দিবা,
দিগ্ধধূগণ হাসিছে।।
গোলোকের নাথ গোকুলে আজিগো,
যশোদা-কোলে শোভিছে।
শুনি সে ভারতী নন্দ মহামতি,
হর্ষে ধন বিলাইছে।।
ধেনু বৎস বৃষে পরম হরিষে,
মাল্য চন্দনে বরিছে।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে আহুনি' যতনে,
জাতকর্ম সমাপিছে।।
অজের জনম জানি' গোপগণ,
গোপেন্দ্রপুরে ধাইছে।
পরম আনন্দে দিয়া উপহার,
নন্দকুমারে ভেটিছে।।
হরষিতা যত ব্রজ নিতম্বিনী,
বিবিধ সাজে সাজিছে।
মকর কুণ্ডল কর্ণে ঝলমল,
নেত্রে কজ্জল লেপিছে।।
নবীন কুঙ্কুম কেশরে রঞ্জিত,
মুখপঙ্কজ শোভিছে।
মণিময় হারে খচিত পদক,
বক্ষ আবরি' দুলিছে।।

বসন-ভূষণে ঢাকি' দেহলতা,
 মস্তকে বেণী রচিছে।
 বেণী যেন কাল-নাগিনীর মত,
 পুষ্প-স্তবকে ঢুকিছে।।
 উপহার পরে সাজায়ে যতনে,
 কাঞ্চন থালে ভরিছে।
 দিয়া উলুধ্বনি হ'য়ে সারি সারি,
 নন্দভবনে চলিছে।।
 যশোদা-কক্ষেতে উতরিয়া ত্বরা,
 বালগোপালে হেরিছে।।
 আশীষ বচনে সুমঙ্গল গীতে,
 শিশু-কল্যাণ কামিছে।
 রাণী যশোমতী ভাণ্ডার উজাড়ি',
 হর্ষে সবারে তোষিছে।।
 ধন, ধান্য, গাভী, ভোজ্য, বস্ত্র, ভূমি,
 ব্রাহ্মণ সজ্জনে দানিছে।
 ব্রজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা,
 নব বিলাসে মাতিছে।।
 দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তক্র, নবনীত,
 উৎস আবাসে বহিছে।
 দেব-দেবী, সিদ্ধ, মুনীন্দ্র মিলিয়া,
 নন্দমহিমা গাহিছে।।
 জয় জয় জয় নন্দ-যশোমতী,
 বলিয়া পুষ্প বর্ষিছে।
 অহো! কিবা ভাগ্য, যাঁদের অলিন্দে,
 পরম-ব্রহ্ম লুটিছে।।
 এ অধম আজি তাঁদের চরণে,
 নমিয়া কৃপা চাহিছে।।

—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

আত্মনিবেদন

আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন নবধিবা ভক্তির শেষাঙ্গ বা নবমঙ্গ। আত্মনিবেদনের অর্থ হইতেছে, ভগবানের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করা। পূর্ণ শরণাগতির অপর নামই ‘আত্মনিবেদন’। আপনার বিষয় বিনীতভাবে জ্ঞাপন, আত্মোৎসর্গ, স্বার্থবিসর্জন, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি অর্থেও ‘আত্মনিবেদন’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ‘আত্ম’-শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রহিয়াছে। ‘আত্ম’ বলিতে কখনও কখনও আত্মাকে বুঝায়, আবার কখনও কখনও মন বা দেহকে বুঝায়। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ‘অহং’ শব্দবাচ্য দেহীকে এবং কেহ কেহ ‘মম’ শব্দবাচ্য দেহ বা মনকে আত্মা বলিয়া থাকেন। তাই পূর্ণ আত্মনিবেদন বলিতে কেবল আত্মাকে নিবেদনই বুঝায় না, ভগবানের সেবায় মন ও দেহকেও নিবেদন বুঝায়। মোটকথা, দেহাদি শুদ্ধাত্ম-পর্য্যন্ত কৃষ্ণে অর্পণ করার নাম ‘আত্মনিবেদন’। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্য হইয়া কৃষ্ণের জন্য চেষ্টাময় হওয়া আত্মনিবেদনের লক্ষণ। বিক্রীত গো যেরূপ স্বীয় পালনের চেষ্টা ইচ্ছাকে তদধীন করাও তল্লক্ষণ। শাস্ত্রে ‘আত্মনিবেদনে’র সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

কৃষ্ণগাপিতদেহস্য নিম্নমস্যাপহঙ্কতেঃ।

মনসন্তং স্বরূপত্বং স্মৃতমাত্মনিবেদনম্॥

(শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ১২।১)

“শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অর্থাৎ তাঁহার ইন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছায় যিনি দেহ উৎসর্গ করিয়াছেন, যিনি তদিতর বিষয়ে মমতাশূন্য এবং নিরহঙ্কার, সেই কৃষ্ণগতচিত্ত-জনের মনে যে ভগবৎস্বরূপতা, তাহাই শাস্ত্রে আত্মনিবেদন বলিয়া অভিহিত হয়।” শ্রীহরিভক্তিবিনাসে আত্মনিবেদন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—“হে ভগবান্! যে মানুষ নিজেকে তোমার চরণে নিবেদন করিয়াছেন, যাহার সুদৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে যে তিনি তোমারই এবং এই মনোভাব লইয়া যিনি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করেন, তিনি অবশ্যই দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন।”

আত্মনিবেদনই ভজনের মূল। মূলকে ছেদন করিয়া ভগবদ্ভজনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। আত্মনিবেদন-কার্য্যে নিবেদনকারীর নিজ-প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টার অভাব, স্বীয় সাধন ও সাধ্য উভয়ই ভগবানে নিবেদন এবং একমাত্র তাঁহারই উদ্দেশ্যে যাবতীয় চেষ্টাপরতা, এই তিনটি ভাবযুক্ত। ভগবানে কেবল আত্মনিবেদনে বলি মহারাজ, ভাবমিশ্র-দাস্যসহ আত্মনিবেদনে মহারাজ অম্বরীষ এবং প্রেমসীভাবে আত্মনিবেদনে রুক্মিণীদেবীই উদাহরণ। বলি মহারাজ আপনাকে নিখিল ভূমি, সৎকর্মান্বিজিত যাবতীয় লোক, এমনকি, অকাতর চিত্তে আত্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন। অম্বরীষ মহারাজ চিত্ত কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলে, বাক্য শ্রীহরিগুণানুবর্ণনে, হস্তযুগল শ্রীহরির মন্দির-মার্জ্জনাদিতে, কর্ণ অচ্যুতবিষয়ক সৎকথা শ্রবণে, নেত্রযুগল মুকুন্দের শ্রীমূর্ত্তি ও আলয় দর্শনে, অঙ্গসঙ্গম তদীয় ভূত্যাগাত্র স্পর্শে, ঘ্রাণ তৎপাদ সরোজ-সৌরভযুক্ত তুলসীর আঘ্রাণে, রসনা তদার্পিত বস্তুতে, পদযুগল শ্রীহরির ক্ষেত্রভ্রমণে, মস্তক শ্রীহরিপাদপদ্ম-বন্দনে এবং কাম তদীয় দাস্যে

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আত্মসুখকামনা-শূন্য হইবার ফলে ইহাতে অস্বরীষ মহারাজের উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিবিশিষ্ট গাঢ় রতি উৎপন্ন হইয়াছিল। শৃগাল যেরূপ কখনও সিংহের আহাৰ্য্য গ্রহণ করিতে পারে না, তদ্রূপ শিশুপালের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যা রুক্মিণীকে স্পর্শ করা সম্ভবপর নহে—ইহা জানিয়া এবং লোকের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া রুক্মিণীদেবী কৃষ্ণকে পতিরূপে বরণপূর্বক আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ভগবানের সেবা আরম্ভ হইবার পূর্বে আত্মনিবেদন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীল শ্রীধর-স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,— “সা চার্পিতা সতী যদি ক্রিয়েত” অর্থাৎ “যাঁহার সেবা করিতে হইবে, সেই ভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিতে না পারিলে সেবা হইতে পারে না।” এই সমর্পণ আবার দুই প্রকার—দেহের সমর্পণ ও দেহীর সমর্পণ। ভগবানে দেহাৰ্পণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

চিন্তাং কুর্য্যন্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।

তথাৰ্পয়ন্ হরৌ দেহং রিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥ (হরিভক্তিবিবেক)

“যেরূপ বিক্রীত পশুর নিজেকে রক্ষার জন্য চিন্তা করিতে হয় না, তদ্রূপ ভগবানে দেহ অর্পণ করিয়া উহার রক্ষণচিন্তা হইতে বিরত হওয়া কর্তব্য।” গরু বা পশু বিক্রীত হইবার পর বিক্রীত গরুর বা পশুর রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে বিক্রেতার যেরূপ কোন চিন্তা করিতে হয় না, ক্রেতাই তাহার যাবতীয় মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত থাকেন এবং সেই গরুটী বা পশুটী যেরূপ ক্রেতার কৰ্মসাধন করে, বিক্রেতার কোন কার্য্য করে না—আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণ-কার্য্যটিও তদ্রূপ।

আত্মনিবেদনকারী নিজেকে ভগবানের পাল্য কুকুর বলিয়া অভিমান করেন এবং ভগবানের বিষয়ের প্রহরীরূপে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

“সর্বস্ব তোমার, চরণে সাঁপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে।

তুমি ত’ ঠাকুর, তোমার কুকুর, বলিয়া জানহ মোরে।।”

“ভাল-মন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।

তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী।।

তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।

শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-বাসনা।।”

“তুমি গৃহস্বামী, আমি সেবক তোমার।

তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার।।”

“মানস, দেহ, গেহ যো কিছু মোর।

অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর।।

সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে।

দায় মম গেল তুয়া ও-পদ বরণে।।

মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা।

নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকার।। (শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

একান্ত শ্রদ্ধার বশে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়াই গীতার প্রধান শিক্ষা।

ইহাই আত্মসমর্পণ। শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণই একমাত্র শোক-মোহ-ভয়নাশিনী।
আত্মনিবেদন করিলে জীব নিম্নোহ, নির্ভয় ও অশোক হন।

অশোক অভয়, অমৃত আধার, তোমার চরণদ্বয়।

তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া, ছাড়িঁনু ভবের ভয় ॥ (শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

ভক্ত ভগবানে আত্মনিবেদন করিয়া সর্বদাই আনন্দলাভ করেন, কখনও দুঃখ অনুভব করেন না।

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি', হইনু পরম সুখী।

দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥

* * * *

তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ।

সেবা সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ ॥

পূর্ব- ইতিহাস, ভুলিঁনু সকল, সেবাসুখ পেয়ে মনে।

আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

আত্মনিবেদনকারী শরণাগতকে রক্ষা করাই কৃষ্ণের কর্তব্য। তিনি শরণাগত পালক।
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবান্মীতি যাচতে।

অভয়ং সর্বদা তস্যৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥

“যাহারা আমার পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়াছেন, পালন-ব্যাপারে তাহাদিগকে আমি অভয়প্রদান করি। ইহাই আমার ব্রত।”

শরণাগত ভক্ত নিজের পোষণের জন্য কোন চেষ্টাই করেন না।

“আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।

তুমি নিব্বাহিবে প্রভো সংসার তোমার ॥

তুমি ত' পালিবে মোরে নিজদাস জানি।

তোমার সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি ॥”

“আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।

নাহি করলুঁ নিজ-রক্ষা বিধান ॥

তুয়া ধন জানি' তুই রাখবি নাথ।

পাল্য গোধন জ্ঞান করি' তুয়া সাথ ॥”

“দৈন-আত্মনিবেদন গোপ্তে বরণ।

অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস-পালন ॥” (শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

‘দেহী’ আত্মনিবেদন সম্বন্ধে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—

বপুরাদিষু যোহপি কোহপি বা গুণতোহসানি যথা তথাবিধঃ।

তদয়ং তব পাদপদ্ময়োঃ হমদৈব ময়া সমর্পিতঃ ॥

(শ্রীযামুনাচার্যকৃত স্তোত্ররত্ন ৫২)

“এই শরীরাদির অভ্যন্তরে যে-কোন স্বরূপে আমি অবস্থান করি না কেন, আমি আমার সেই স্বরূপভূত আত্মাকেও অদ্য আপনার পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম।” বৈষ্ণব ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

“অহং” ‘মম’—শব্দ অর্থে যাহা কিছু হয়।

অর্পিলুঁ তোমার পদে ওহে দয়াময়।।

সর্বতোভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলেই মনুষ্য ভক্তিমান্ হয়। আত্মনিবেদন-প্রভাবে জীবের অন্য কোন কৃত্য অবশিষ্ট থাকে না। অনাত্মচেষ্টাগুলি ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিত হইলে জীবের কর্তৃত্বাভিমান দূর হয়। সাধনভক্তি পর্যায়ে যাবতীয় লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্য, হরিগুণানুবর্নন, ভগবানে সমস্ত কর্ম্মার্পণ, ভগবৎপ্রীতির জন্য তাঁহার অপ্রীতিকর কর্ম্ম পরিত্যাগ অর্থাৎ ভোগের উদ্দেশ্যে ধাবিত না হইয়া ভগবৎপ্রীতির জন্য জীবের ভোগসুখ-পরিত্যাগ, ভগবদুদ্দেশ্যে যজ্ঞ, ব্রত, তপঃ, জপ, হোম, দান প্রভৃতি কার্য্যসমূহ সম্পাদিত হইলেই ক্রমশঃ জীবের আত্মবৃত্তি কেবলাভক্তি উদয় হয়। যাঁহারা ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি হেতু কোন অভাব থাকে না। তাঁহারা বৈকুণ্ঠ বস্তুর সেবায় বৈকুণ্ঠ লাভ করেন এবং কুণ্ঠাধর্মে বা মায়িকভোগে আর তাঁহাদিগকে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে যে আত্মনিবেদন তাহাই যথার্থ সত্য, ত্রিবর্গ-বিশিষ্ট জগতের সবকিছুই নশ্বর ও মিথ্যা। তাই ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ অসুর বালকগণকে বলিয়াছেন,—“ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই তিনটি ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত। তন্মধ্যে আত্মবিদ্যা, কর্ম্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি ও কৃষি প্রভৃতি বিবিধ জীবিকা, এই সমস্তই ত্রৈগুণ্যবিষয় বেদের প্রতিপাদ্য, সুতরাং ইহাদিগকে আমি নশ্বর বলিয়া মনে করি, পক্ষান্তরে পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে যে আত্মনিবেদন, উহাকেই আমি যথার্থ সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি।” ভগবানে আত্মসমর্পণকারী ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদের কর্ম্মবাদে আসক্ত থাকেন না। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে (৪।২৯।৪৬) পাওয়া যায়,—

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ ।

স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠতাম্ ।।

“যখন ভগবান্ কোন জীবাত্মার আত্মসমর্পণ দর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মবৃত্তির দ্বারা সেবিত হইয়া তাহার প্রতি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদের কর্ম্মাসক্তি মত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।” ভগবানে আত্মনিবেদন যাহাতে কর্ম্ম বা জ্ঞানিগণের ন্যায় ক্ষণিক না হয়, তজ্জন্য ভক্ত প্রার্থনা করিয়া বলেন,—

আত্মনিবেদন-ভাব হৃদে দৃঢ় রয় ।

হস্তিগ্নান-সম যেন ক্ষণিক না হয় ।।

অন্যাভিলাষিগণের কোনদিন আত্মসমর্পণের ভাব দেখা যায় না, যেহেতু তাহারা ‘গাছেরও খাব তলারও কুড়াব’ নীতির পূর্ণ পক্ষপাতী। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের যে ক্ষণিক মিছা আত্মসমর্পণের ভাব দেখা যায়, তাহার কোন মূল্য নাই। কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির উপাধি হইতে মুক্ত আত্মনিবেদনকারী ভক্তই কেবলমাত্র মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন।

শ্রীভাগবতে (১১।২৯।৩৪) স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মৰ্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকৰ্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীৰ্ষিতো মে।

তদামৃতত্বং প্রতিপাদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।।

“মনুষ্য যখন ন্যিত্য-নৈমিত্তিক, ঐহিক, পারলৌকিক—সমস্ত কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাতে অথবা মৎস্বরূপভূত গুরুদেবে আত্ম-দেহাদি সমস্ত নিবেদন করে, তখন আমি তাকে কৰ্ম্মী, জ্ঞানী আদির উপাধি হইতে বিলক্ষণ মুক্ত করিতে ইচ্ছা করায় সে মৃত্যু পরম্পরা অতিক্রম করত আমার সান্নিধ্য লাভ করে।”

আত্মসমর্পণকারী ভক্তের দেহ চিদানন্দময় এবং সেই অপ্রাকৃত দেহেই তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ন্যিত্য সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীগৌরহরি সপার্ষদ শ্রীসনাতনের দেহে কুণ্ডুরসা জন্মাইয়া সাধারণ লোক যাহাতে ঐ দেহকে প্রাকৃত বুদ্ধি না করে, সেইজন্য স্বয়ং উহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

প্রভু কহে,—বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।

অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়।।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।

সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।

অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজন।। (চৈঃ চঃ)

এই প্রসঙ্গে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—“দীক্ষাকালে ভক্ত সর্বকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাকৃতানুভূতিসমূহ ভগবৎ-স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃত সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হন। অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অপ্রাকৃত স্বরূপে কৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত হন। তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময় স্বকীয় স্বরূপে ন্যিত্য সেবক-বিগ্রহত্ব উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃত দেহে সেবাধিকার প্রাপ্ত হন।”

সর্বস্ব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে, হরিসেবার নাম করিয়া কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা বা কুটিনাটির আশ্রয় লইলে কোনকালে মঙ্গললাভ হইবে না। ঐরূপ চেষ্টা হরিবিমুখতা ছাড়া আর কিছুই নহে। হরিসেবোন্মুখ জীবন্মুক্ত জীব যথাসর্বস্ব দিয়া হরিসেবা করিয়া থাকেন। যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা তিনিই মুক্ত। আপনার কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ-পূর্বক ভগবদ্ভোগ্য-জ্ঞানে ভগবানের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করা প্রত্যেক জীবমাত্রেরই কর্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমুক্তিবাদান্ত বোধায়ন মহারাজ

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২১ পৃষ্ঠার পর]

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র—এবম্বিধ উচ্চ-নীচ ভেদ, পরস্পর অহংবোধ, মমত্ববোধ প্রভৃতি অহমিকার সৃষ্টি করে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে ব্রাহ্মণ সর্বোচ্চ বর্ণ,—তাহলে ব্রাহ্মণই কি একমাত্র পরাগতি লাভ করতে সমর্থ হবে? ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ বা অত্যজগণ কি পরাগতি লাভে সমর্থ হবে না? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ সকল বর্ণের এবং অন্ত্যজগণেরও পরাগতি লাভ করার অধিকার আছে বলে জানিয়েছেন,—

“মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্॥ (গীতা ৯।৩২)

অর্থাৎ—“(ভগবান্ বলেছেন—) হে পার্থ! যারা অন্ত্যজ কুলাদিতেও জন্মগ্রহণ করেছে, স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ, তারাও আমাকেই আশ্রয় করে নিশ্চয় পরাগতি অর্থাৎ যোগি-দুর্লভ মৎপ্রাপ্তি লাভ করে থাকে।” এস্থলে জাতি-কর্ম্ম-দোষে পতিত ব্যক্তিগণ ভগবান্ অচ্যুত কৃষ্ণকে বিশেষরূপে আশ্রয় করলে নিশ্চয়ই তারা জাতিদোষ হতে শুদ্ধতা লাভ করে পরাগতি লাভে সমর্থ হবে— ইহাই ভগবদাজ্ঞা। ভগবানে ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি-বর্ণাদি সম্বন্ধীয় কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকতা নেই। সুতরাং যে কোন জাতিতে বা যে কোন কুলে বা অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ গৃহে জন্ম হোক না কেন শ্রীকৃষ্ণভজনে সকলেরই সমান অধিকার আছে ও সকলেই শুদ্ধতা লাভ করে কৃষ্ণ-পাদপদ্মলাভে সমর্থ হবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৯।৩৩ শ্লোকে ভগবান্ আরও বলেছেন,—

“কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥

“সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ পরাগতি লাভ করবে,—ইহাতে আর বক্তব্য কি? অতএব, হে পার্থ, তুমি অনিত্য ক্লেশপূর্ণ এই মনুষ্যালোক লাভ করে আমার ভজনা কর।” আলোচ্য শ্লোকে “পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ” কথিত হওয়ায় পবিত্রতা বা সদাচার-পরায়ণতা ব্রাহ্মণগণের ভূষণস্বরূপ হ'লেও তাঁরা অনন্য ভক্ত হয়ে অর্থাৎ ভগবানের ঐকান্তিকভাবে ভজন করে তবেই পরাগতি লাভ করবেন—ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত। অনন্যভক্ত না হলে চারি বর্ণাশ্রমীর কেহই ভগবানকে লাভ করতে পারবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি বর্ণী হরিভজন না করলে সকলেই চামার—এ কথা তুলসীদাসজী বলেছেন, যথা,—

“ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সব কোই করত বিচার।

তুলসী কহে,—হরি না ভজে তো চারো ‘চামার’॥

হরি ভজে তো চারো জাত মিল কর এক বরণ হো জায়।

অষ্টধাতু মে পরশ লাগাওয়ে এক মূলসে বিকায়॥”

অতএব, হরিভজন করলে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতিই আবার এক জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা

লাভ করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বর্ণ চতুষ্টয় ও তাদের কর্মের কথা ঘোষণা করেও তদ্বারা অর্থাৎ ত্রিগুণজাত ধর্মের দ্বারা নিগুণতাকে লাভ করা সম্ভব হবে না ও জীব সুপ্রসন্নতা লাভ করতে পারবে না বলে কৃপার্দ্র হয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকদ্বয়ে সকল বর্ণাশ্রমীকেই এবং এমনকি দুর্জাতিগণকেও অনন্যভক্তির আশ্রয়ে তাঁর নিত্যানন্দ স্বরূপেরই ভজন করতে উপদেশ করেছেন।

“ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রম জাতিভিঃ।

সজ্জতেহস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ।। (ভাঃ ১১।২।৫)

“যিনি নিজ ব্রাহ্মণাদি জন্ম-গৌরব, দান-প্রতিগ্রহাদি কর্ম-গৌরব, বর্ণাশ্রম ও জাতি-গৌরব প্রভৃতি দ্বারা আসক্ত না হন এবং জড় দেহে চর্ম্মময় কোষের অহংভাব বর্জিত হন, তবেই তিনি হরির প্রিয় পাত্র হয়ে থাকেন।।”

আসক্তি হয় গুণাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হবেন, নচেৎ অসৎ বিষয়ে তথা মায়িক বিষয়ে হবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম মায়াজাত ধর্ম হওয়ায় তাতে অবস্থান করে মায়াতীত নিগুণ ভগবানের উপাসনা করে তাঁর প্রিয়পাত্র বা শুদ্ধভক্ত হওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে কথিত হয়েছে—

“জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।

প্রেমধন আর্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে।।” (চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৯৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলেছেন,—

“নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।

সৎ কুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।

যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন, ছার।

কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।।

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।

কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান।।” (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৬-৬৮)

প্রাকৃত সদসৎ কর্মফলে বদ্ধ জীব উচ্চাচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও তাতে জীবের কর্মফল ভোগ হয়ে থাকে। পরমার্থ-বিচারে প্রাকৃত বংশমর্যাদা বা জাতি-কুলের কোন মূল্যই নেই,—ইহা বিশ্ববাসীকে জানাবার জন্যই ভগবদিচ্ছায় শ্রীহরিদাস ঠাকুর যবনকূলে আবির্ভূত হয়েছিলেন।—

“জাতি কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।

জন্মিলেন নীচ কূলে প্রভুর আজ্ঞাতে।।

অধম কূলেতে যদি বিযুক্তভক্ত হয়।

তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।

উত্তম কূলেতে জন্মি’ শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।

কূলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে।।

এই সব বেদ-বাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।

জন্মিলেন হরিদাস অধম কূলেতে।।

প্রহ্লাদ যে হন দৈত্য, কপি হনুমান।
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম।।”

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।২৩৭-২৪১)

শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছিলেন,—“দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন।” (চৈঃ চঃ মঃ ১১।৯১)। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-পাত্র ভোজন করিয়ে বলেছিলেন,—“তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।” (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১২০)। পরমভাগবত শ্রীহরিদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আলিঙ্গন দান করেন,—

“হরিদাস কৈলা প্রভুর চরণ-বন্দন।

হরিদাসে কৈলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন”।। (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৪৬)

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বলেছিলেন,—

“সনাতন কহে,—তোমা-সম কেবা আছে আন?

মহাপ্রভুর গণে তুমি—মহাভাগ্যবান্!!

অবতার কার্য্য প্রভুর—নাম-প্রচারে।

সেই নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমা-দ্বারে।।

প্রত্যহ কর তিনলক্ষ নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন।

সবার আগে কর নামের মহিমা কথন।।

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।

প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার।।

আচার, প্রচার—নামের করহ দুই কার্য্য।

তুমি—সর্ব্ব-গুরু, তুমি—জগতের আৰ্য্য।।”

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৯৯-১০৩)

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বলরাম আচার্য্যের গুরু ছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধ করায় এক বিপ্রাধমের কুষ্ঠরোগে নাসিকা খসে পড়েছিল।—

“সে বিপ্রাধমের কত দিবস থাকিয়া।

বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া।” (চৈঃ চঃ আঃ ১৬।৩০৬)

শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীহরিদাসের ভুবন-পাবনত্ব কীৰ্ত্তন করে বলেছেন,—

“হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।

গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন।।” (চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১০৯)

শ্রীহরিদাসের নির্যাণের পরে তাঁর দেহকে পরম পবিত্রতার আদর্শস্বরূপ জানাবার জন্য ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা কোলে করে নৃত্য করেছিলেন এবং হরিদাস ঠাকুরের পদ-দ্ব্যত জল শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিদ্যমানে সমস্ত ভক্তগণ পান করেছিলেন ;—

“হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইল।

প্রভু কহে,—সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইল।।

হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।

হরিদাসের সঙ্গে দিলা প্রসাদ-চন্দন।।” (চৈঃ চঃ অঃ ১১।৬৪-৬৫)

অতএব, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর স্নেচ্ছকুলে আবির্ভূত হলেও তিনি স্নেচ্ছ নন, পরন্তু তিনি পরম পবিত্র ও সর্বোত্তম—ইহাতে সন্দেহ নেই। দুর্ব্বাসা মুনি পরমভাগবত রাজা অম্বরীষকে ক্ষত্রিয়-বৈষ্ণব জ্ঞান করায় বহু দুর্দশা ভোগ করেছিলেন। মহাভাগবত ‘হরিদাস ঠাকুরকে’ যাঁরা স্নেচ্ছ জাতি জ্ঞান করে ‘ভক্ত যবন হরিদাস’ বলে থাকেন, তাঁরাও ‘দুর্ব্বাসার’ ন্যায় ভগবদ্ বিচারে নিশ্চয়ই শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে ১৬ শ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়,—এক কপট প্রাকৃত সহজিয়া ‘চন্দ্র বিপ্র’ স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধিবশে ‘হরিদাস ঠাকুরের’ অপ্রাকৃত ভাবমুদ্রা ও কৃষ্ণপ্রেমাবেশ আধ্যাত্মিক জ্ঞানে কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করে নিজে ভক্ত সেজে ‘হরিদাস’ অপেক্ষা অধিক সম্মান লাভের আশা করেছিলেন। কিন্তু তার কপটতা ও কৃত্রিম ভাবভাস দেখে ‘ডঙ্কর’ দেহে অধিষ্ঠিত ‘অনন্তদেব’ তাকে ‘ডঙ্কর’ দ্বারা ভীষণ নিশ্চরমভাবে বেত্রাঘাত করে আনুকরণিক কপট প্রাকৃত সহজিয়া বিপ্রেস দণ্ড বিধান করেন। ভক্ত হরিদাসের প্রভাব ব্যক্ত করে ডঙ্ক বলেছিলেন,—

“হরিদাস-সঙ্গে স্পর্ধা মিথ্যা করি করে।

অতএব শাস্তি বহু করিলুঁ উহারে।” (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২২৭)

নিষ্কপট অপ্রাকৃত সহজ প্রেমিক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যে সমস্ত কপট ভণ্ড প্রাকৃত সহজিয়া কৃত্রিমভাবে ভাব-ক্রিয়া দেখিয়ে জড়-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করে, তারা ‘চন্দ্র বিপ্রেস’ ন্যায় দণ্ডযোগ্য।

ব্রাহ্মণ-কুলশিরোমণি পরমবৈষ্ণব শুদ্ধভক্তের শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহ-দ্বারে গোপাল-চাপাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তামসিক পূজার কতকগুলি দ্রব্য রাখায় শ্রীবাস ঠাকুর হাড়িকে দিয়ে তাহা অপসারণ করিয়ে জল-গোময় দিয়ে সেই স্থান পরিষ্কার করিয়েছিলেন। গোপাল-চাপালের সেই অপরাধে তিন দিন পরে ভীষণ কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। অবশেষে কৃপাময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে ও ইচ্ছায় শ্রীবাস ঠাকুর গোপাল-চাপালকে ক্ষমা করলে সে পাপ-মুক্ত হয়ে নীরোগ হয়েছিল।—

তবে বিপ্র আসি’ কৈল শ্রীবাসের শরণ।

তঁহার কৃপায় হৈল পাপ বিমোচন।। (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৫৮)

কর্ন-জড়-স্মার্ত্ত অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গোপাল-চাপাল পারমার্থিক ব্রাহ্মণ শ্রীবাস ঠাকুরের কৃপায় কুষ্ঠরোগ-মুক্ত হওয়ায় পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠতা পবিলক্ষিত হয়। উচ্চকুলে আবির্ভূত কালিদাস মোহান্ত ভুঁইমালি নীচকুলে আবির্ভূত ঝড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যক্ত আমের আঁটি আস্তাকুঁড় হতে সংগ্রহ করে চুষেছিলেন এবং কৌশলে ঝড়ু ঠাকুরের পদরজঃ সর্ব্বাঙ্গে মেখে প্রেমে আপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভাগবতগণকে জাতিসামান্যে বিচার অন্যায় ও অবৈধ; বরং তাঁরা জাতি-কুলের উর্দ্ধে অচ্যুত গোত্রীয় ও পার্থিব বিচারের উর্দ্ধে নিগুণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নিগুণ সেবক। শ্রীমন্মহাপ্রভু অবৈষ্ণব মায়াবাদী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিগণকে সমাদর করেন নি ও তাঁদের সঙ্গে ভোজন করেন নি; যথা,—

তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নিব্বাহন।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্ৰণ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৫৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণে অবৈষণ্ণ ব্রাহ্মণব্রহ্মবৈষ্ণবের প্রতি সমাদর প্রকাশ পায় নি, পরন্তু বৈষণ্ণ-ব্রাহ্মণকে সমাদর করেছেন। পারমার্থিক শুদ্ধভক্ত বৈষণ্ণকে জাতিবুদ্ধি করা অপরাধ। “বৈষণ্ণে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সং।” শ্রীচৈতন্যভাগবত বাণী,—

যে পাপীষ্ঠ বৈষণ্ণের জাতিবুদ্ধি করে।

জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি’ মরে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১০২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ও সনাতনকে বলেছিলেন,—

প্রভু কহে,—বৈষণ্ণ-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।

অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।

সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।

অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৯১-১৯৩)

সাত্ত্বত শাস্ত্রে ‘দৈব’ ও ‘অদৈব’—এই দুই প্রকার বর্ণাশ্রম ধর্মের ভেদ আছে। ‘অদৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম’ পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণুসেবা কেবলমাত্র পার্থিব সুখ-সুবিধা আদায়ের জন্য প্রদর্শিত হওয়ায় তাহা ছলনামাত্র। ‘দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম’ পরমার্থরাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষারূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করেছেন ও তাহা বেদশাস্ত্রেরও বক্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ‘দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম’ প্রাকৃত কর্ম-জড়-স্মার্তগণের সুবিধাবাদমূলক ধর্ম নয়। দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম বৈষণ্ণে জাতিবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পরন্তু প্রাথমিকভাবে পরমার্থলিঙ্গুগণের জন্য মহাপ্রভু-কর্তৃক উপদিষ্ট। দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনও সর্ব প্রাথমিক বাহ্য সাধনরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের জানিয়েছেন।

অসৎসঙ্গী প্রধানতঃ দুইপ্রকার, যথা,—স্ট্রীলোকে আসক্ত ব্যক্তি এবং কৃষ্ণে অভক্ত ব্যক্তি। শুদ্ধভক্তকে উক্ত দুইপ্রকার অসৎসঙ্গ এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করে নিষ্কিঞ্চন হয়ে অর্থাৎ সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত হয়ে নির্মল চিত্তে হরি-গুরু-বৈষণ্ণের শরণাগত হবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা প্রদান করেছেন।

এত সব ছাড়ি’ আর বর্ণাশ্রম ধর্ম।

অকিঞ্চন হঞ লয় কৃষ্ণের শরণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯০)

জড় উপাধিক বর্ণাশ্রম ধর্মের জাতিভেদের নিন্দা-বন্দনা মহাপ্রভু করেন নি। বর্ণাশ্রম ধর্মের বিচার-প্রণালীর দ্বারা কৃষ্ণেক্ষরণতা লাভ হয় না। বর্ণাশ্রমের মধ্যে উচ্চ-নীচ দেহাভিমান থাকায় তাহা শুদ্ধভক্তিলাভের পক্ষে অন্তরায়। জীবাত্মার কোনও বর্ণ নেই এবং কোনও আশ্রম নেই ; জীবাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস।

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি’ গেল।

এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪)

জীব যদি তার স্বরূপ নিত্য কৃষ্ণদাসত্ব ভুলে না যেত, তাহলে জীব সর্বদা ভগবৎসেবায়

আত্মনিয়োগ করে থাকত। কিন্তু জীবের স্বরূপভ্রমবশতঃ তাকে এই মায়িক কারাগার-রূপ ব্রহ্মাণ্ডে বন্দীদশা যাপন করতে হচ্ছে। জীব ভগবদাস্য ভুলে মায়ার দাস্য স্বীকার করত মায়িক জাতি-কুলের ধর্মকে স্বধর্ম বলে মনে করেছে। বস্তুতঃ মায়াবদ্ধ দশা ও অনিত্য জড়দেহকে নিমিত্ত করে বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচলিত হওয়ায় উক্ত ধর্ম নৈমিত্তিক ধর্ম ও অনিত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বলেছেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যম্মিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাক্ষে-
গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োদাসদাসানুদাসঃ।।

(পদ্যাবলী ৮৩ শ্লোকধৃত চৈঃ চঃ মঃ ১৩।৮০)

অর্থাৎ—“আমি শুদ্ধ জীবাত্মা—স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নই; অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী নই। পরন্তু আমি নিত্য উদীয়মান নিখিল পরমানন্দ-পূর্ণামৃতসাগর-স্বরূপ গোপীজনবল্লভের শ্রীচরণকমলের দাসানুদাসের দাস-স্বরূপ।” সুতরাং দেহ ও দৈহিক সম্পর্কযুক্ত প্রাকৃত বর্ণাশ্রম ধর্মে অধিষ্ঠিত থেকে কন্মমার্গে অধঃপতিত হওয়া অপেক্ষা বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম পরিত্যাগ করে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর ভজন করাই শ্রেয়স্কর।

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৪ পৃষ্ঠার পর]

যিনি এই দামোদরাষ্টকমের স্তব-স্তোত্র লিখেছেন, তিনি কে? তিনি হলেন সত্যব্রত মুনি। সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি কেমন ভক্তিমান্ সেটাই এখানে প্রকাশ হচ্ছে। কি বলছেন তিনি?—আমি মুক্তি চাই না। সে কি! যে মুক্তি পাওয়ার জন্য দুনিয়া ব্যস্ত, যার জন্য মুনি-ঋষিগণ কত কষ্ট করছেন। শুধু মুনি-ঋষিগণ কেন, আরও অনেকে কষ্ট করছেন, ভাগবতে বর্ণনা আছে।—

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তম্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
বেদৈঃ সান্দ্রপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যাত্তং ন বিদুঃ সুরাসুরাগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, মরুদগণ সবাই দেবেন্দ্র-মুনিভ্র-বন্দিত যে ভগবান্ তাঁকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন কোটি কোটি কল্প ধরে, এক আধ দিন নয়। গুরুদেবের কাছে এলেই সামান্য আমরা উপদেশ পাচ্ছি—কাঁদতে কাঁদতে হরিনাম কর তোমরা, দশবিধ নামাপরাধ বর্জন করে হরিনাম কর তোমরা। তাতে আমরা অনেকে ধৈর্য্যহারা হয়ে বলছি,—কই, কই অনেকদিন ধরে ত’ নাম করলাম, জপ করে করে মালা কালো করে ফেলেছি, তথাপি

হরি, কৃষ্ণ, বিষ্ণু কোথায় ! লক্ষ বৎসর ধরে সাধনা করে কেউ ভগবান্ পাচ্ছেন না বলে ত' তাঁরা কখনও পিছপা হচ্ছেন না। সেই কথা বলছেন।

অনেকে মুক্তি কামনা করছেন। সাধারণ মানুষের কোন ধারণা নেই কাকে বলে মুক্তি। এই সংসারে যে কষ্ট পাচ্ছি আমরা—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিতাপ জ্বালায় যে জজ্জরিত হচ্ছি, এই কষ্ট থেকে মুক্তি পেলে আমরা মনে করলাম বেঁচে গেলাম। শাস্ত্র বলছেন, সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ বলছেন—একে মুক্তি বলে না। সংসার-মুক্তি মানে কি এখানে আমরা যে ত্রিতাপ জ্বালায় জজ্জরিত হচ্ছি এর হাত থেকে রেহাই পেলে কি হয়ে গেল? একে মুক্তি বলে না। তাহলে কাকে মুক্তি বলে?—

“দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।”

আগেকারদিনে যারা চুরি-ডাকাতি করত রাজা তাদের শাসন করত। পেয়াদা দিয়ে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে নদীতে চুবিয়ে ধরত। গেলাম, গেলাম ; মরলাম, মরলাম ; চুলের মুটি ধরে একটু তুলে ধরল, তখন আবার নিশ্বাস নিয়ে আঃ ! বাঁচলাম। আমাদের অবস্থাটা ঠিক এইরকম। আমরা কাকে সুখ-শান্তি বলছি? শাস্ত্রে উদাহরণ দিয়েছেন, বার বার করে জলে চেপে ধরে আর তোলে—একেই আমরা সুখ-শান্তি বলছি। সবসময় দুঃখ চলছে, সেই দুঃখ-কষ্টের যখন ক্ষণিক লাঘব হল, তখন আমরা বলি মুক্তি। মুক্তি তা নয়। “আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিহি মুক্তি”—এটা মুক্তি নয়। মুক্তি মানে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা লাভ। শাস্ত্রে মুক্তির এই ব্যাখ্যা করেছেন। ভগবানের সাক্ষাৎ সেবালাভ কতরকমে হয়? পাঁচ রকমের মুক্তি আছে, কিন্তু এক রকমের মুক্তি বাদ যাচ্ছে এর থেকে। এটা ঠিক বাস্তবে রূপায়িত নয়। সালোক্য—ভগবানের সমান লোক লাভ করা, সামীপ্য—ভগবানের কাছে থেকে তাঁর সেবা করতে হয়—এটা লাভ হয় সাধক-সাধিকার। সারূপ্য—ভগবানের সমান রূপ লাভ—ভগবানের সেবা করতে গেলে ভগবানের মত রূপ হয়। অদ্ভুত কথা ! ভগবানের মত রূপ হয়? হ্যাঁ। কেন? শাস্ত্রে বলছেন, যিনি ভগবানের সেবা করবেন তিনি যদি তজ্জাতীয় না হন, তাহলে সেবা করতে পারবেন না, অধিকার নেই। বিচার—পূজা-অর্চন যিনি করছেন ঠাকুরের, একটা নিয়ম আছে স্মৃতিগ্রন্থে—যাকে বলে ভূতশুদ্ধি। ভূতশুদ্ধি মানে কি? ভূতশুদ্ধি মানে হল—আমাকে চিন্তা করতে হবে—ভগবান্ যে জাতীয় বস্তু আমিও সেই জাতীয় বস্তু। ভগবান্ নিত্য, শুদ্ধ, সনাতন বস্তু ; আমি জীবাত্মাও নিত্য, শুদ্ধ, সনাতন বস্তু। এটা যদি আমি চিন্তা না করতে পারি তাহলে আমি ভগবানের সেবা করতে পারি না, ভগবান্ আমার সেবা নেবেন না। কে খাওয়াবে ঠাকুরকে? আমি নিবেদন করলাম মস্ত্র পড়ে, ঠাকুর খাচ্ছেন, কি না খাচ্ছেন। যদি আমি অহঙ্কারী হই তাহলে তিনি আমার হাতে কখনও গ্রহণ করবেন না। আমি যদি বলি, ঠাকুর তুমি খাও, আমি ত' তোমাকে খাওয়াতে পারি না ; গুরুদেব তুমি খাওয়াও, আমি জানি না। সেখানে ঠাকুর খেতে পারেন, কিন্তু Guarantee নেই। অহঙ্কার কিসের? যেখানে অহঙ্কার আছে তার থেকে শতযোজন দূরে আছেন ভগবান্। যেখানে দর্প, দম্ব, অহঙ্কার আছে, সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে আছেন ভগবান্। কেন?—ভগবানের এক নাম দর্পহারী মধুসূদন। সেখানে জাগতিক কোন

অহঙ্কার চলবে না। যদি দেখেন ভিতরে কোন অহঙ্কার আছে, তাহলে ভগবান্ দূরে সরে দাঁড়াবেন।

পরমভক্ত, অধিকারী ভক্ত, প্রতিষ্ঠিত ভক্ত একজন, ভগবান্ দাঁড়িয়েছেন তাঁর পাশে, তিনি হাত ধরে ফেলেছেন কৃষ্ণের। কৃষ্ণের গায়ে একটু জোর বেশী আছে, তিনি হাত ছাড়িয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন। সেই ভক্ত তখন বলছেন,—তোমার গায়ে অনেক জোর আছে বুঝলাম; কিন্তু আমি ত' বুড়া লোক, আমি তোমাকে ধরে রাখতে পারছি না। যে বৃদ্ধ ব্যক্তি কৃষ্ণকে ধরেছেন তাঁর বয়স তখন ৭০০ বছর। আমাদের এখানে ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, দিদিমা ইত্যাদি যাঁরা আছেন তাঁদের কারও বয়স ১০০ বছর হয়নি। ৭০০ বছরের বৃদ্ধ তিনি ভগবান্ কৃষ্ণকে ধরে ফেলেছেন, আর তিনি তাঁর হাত ছাড়িয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই ভক্ত কৃষ্ণের সঙ্গে Bet রাখছেন। কৃষ্ণের সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে ঝগড়া করা সহজ কথা নয়, বাহাদুরি আছে। তাই তিনি বলছেন,—

হস্তমুৎক্ষিপ্যাযাতোহসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।

হৃদয়াদযদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।।

তোমার গায়ে অনেক জোর আছে তা আমি বুঝলাম, তুমি হাতছাড়িয়ে দূরে দাঁড়ালে। কিন্তু আমি তোমাকে আমার হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছি, এখান থেকে যদি তুমি নিয়ে যেতে পার ছাড়িয়ে, তাহলে বুঝব তোমার বাহাদুরি। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এমন লড়াই হয়, কিন্তু তেমন ভক্ত ত' হতে হবে, তবে এ কথা বলতে পারি। ভগবানের সঙ্গে ঝগড়া করে কে?—অধিকারী ব্যক্তি। সাধারণ মানুষ ঝগড়া করতে পারবে না। সে ত' সবসময় হাতজোড় করে আছে। একজন অত্যন্ত উন্নতাদিকারী ব্যক্তি তিনি হাতজোড় করে আছেন, আবার একজন সাধারণ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি তিনিও হাতজোড় করে আছে ভগবানের কাছে কৃপাপ্রার্থী হয়ে। মুক্তি ত' এইরকম।

ভগবানের সেবা করতে গেলে ভগবানের মত মূর্তি লাভ হয়ে যাচ্ছে ভক্তের। ভগবানের ঐশ্বর্য্য যেমন, ভক্তেরও তেমন ঐশ্বর্য্য হয়ে যাচ্ছে। একটা জিনিস হচ্ছে না—ভগবান্ হতে পারছেন না। আসলে ভক্ত ভগবান্ হতে চান না। কেন? তিনি সেবা করে ধন্য হতে চান। যারা 'সোহং'বাদী, তারা সব অহঙ্কারী। যে বলছে, আমি ভগবান্ সে ত' অহঙ্কারী, তার কাছ থেকে ভগবান্ বহু যোজন দূরে আছেন। যে বলছে আমি ভগবানের ভূত্যানুভূত্য, দাসানুদাস, ভগবান্ তাকে ধরা দেবেন। অতএব এমন অহঙ্কার থাকলে ত' হবে না।

যে মুক্তি সাধারণ মানুষ চাচ্ছেন, যোগি-ঋষিগণ চাচ্ছেন, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, চন্দ্র, বায়ু, শিবাদি দেবতাগণ চাচ্ছেন, সেই মুক্তি ভক্ত চাচ্ছেন না। তাহলে তিনি কি চান? ভক্তের একটা ভয় আছে। মুক্তি চাইতে গেলে যদি ভগবান্ তোমাকে হারিয়ে ফেলি! বাচ্চা ছেলেমেয়েরা জানে মা-বাপ আমার Guardian, মা-বাপকে হারিয়ে ফেললে আমার মুশ্কিল্। সেজন্য সবসময় বিপদ-আপদ হলে মা, মা; বাবা, বাবা বলে চিৎকার করে। ভক্ত কি করেন? তাঁর কি কেউ আছেন? তাঁর সবই ত' ভগবান্। তিনি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন ভগবানের নাম করে। এটা ভক্তের স্বভাব।

“তুমি মাতা চ পিতা তুমি, তুমি বন্ধু সখা তুমি।

তুমি বিদ্যা দ্রবিশং তুমি, তুমি সর্বং মম দেবদেবঃ॥”

“হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈকবন্ধো!

হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈকসিন্ধো!

হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম!

হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥”

কাঁদছেন ভক্ত। ভগবান্ সেখানে তাঁকে ধরা দেবেন। যাঁর আকুলতা-ব্যাকুলতা আছে, আকুল ক্রন্দন তত্ত্ববস্তুকে পাওয়ার জন্য, ভগবান্ তাঁকে ধরা দেবেন। কেন পাবেন তিনি? ভগবান্কে সেবা করার উদ্দেশ্যে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। তাঁকে খাটিয়ে নেবেন না। ভগবান্কে যদি আমরা খাটিয়ে নিতে চাই, তাহলে সাধন-ভজন হল না। এ সংসারে সব থেকে বড় চাকর হলেন বাবা, আর সবথেকে বড় চাকরাণী হলেন মা। ভগবান্কে যদি আমরা মা-বাপ বলে সেখান থেকে কিছু আদায় করে নিতে চাই, তাহলে সেবা হল না, উপাসনা হল না। ওটা বলতে হবে না। বলতে হবে তোমার সেবা করব, তোমার সেবা করে ধন্য হব। আমরা তোমাকে খাটিয়ে নেব না—ভক্তের এই ভাব থাকবে।

কুবেরাভ্যাজৌ বদ্ধ-মূর্তৌব যদ্বৎ

ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তি-ভাজৌ কৃতৌ চ।

তথা প্রেম-ভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ

ন মোক্ষে গ্রহো মেহস্তি দামোদরেহ॥ ৭॥

এই শ্লোক আলোচনা চলছে। এই শ্লোকের অনুবাদে আমরা দেখছি,—“হে দামোদর! আপনি যে-প্রকার মাতা যশোদা-কর্তৃক রজ্জুদ্বারা উদ্বৃথলে শৃঙ্খলিত থেকেও শ্রীনলকুবর ও মণিগ্রীব-নামক কুবের-পুত্রদ্বয়কে নারদ-শাপহেতু যমলাজ্জ্বল-বৃক্ষ-জন্ম হতে মুক্তি ও পরম প্রয়োজনরূপ ভক্তিভাজন করেছিলেন, সেই প্রকার আমাকেও আপনার নিজস্ব প্রেমভক্তি প্রচুর পরিমাণে দান করুন—ইহাতে আমার একমাত্র আগ্রহ। অন্য কোনও প্রকার মোক্ষে আগ্রহ নেই।”—এই আবেদন-নিবেদন জানাচ্ছেন সত্যব্রত মুনি।

সাধারণভাবে দামোদর-কৃষ্ণের কথা বললে আমাদের গোপালমূর্তির কথা মনে আসে। কিন্তু সেই গোপালমূর্তির সঙ্গে রাধারানীর সংযোগটা অনেকেই তত্ত্বদর্শনের মধ্যে বুঝে উঠতে পারেন না। গোপাল-শব্দটা বললেই তাঁরা মনে করেন বাৎসল্যভাবে পরিসেবিত মূর্তি। সে গোপাল আবার প্রেমভক্তি দেবেন কি করে? কিন্তু এখানে স্তোত্রের নাম হল ‘শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর-স্তোত্রম্’। রাধারানীকে বাদ দিয়ে দামোদর-কৃষ্ণ, দামোদর-গোপাল অগ্রসর হতে চাচ্ছেন না। রাধারানীকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চাচ্ছেন তিনি। আর এই দামোদর-কৃষ্ণ যিনি রচনা করেছেন সেই ঋষি দামোদর-কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করছেন—আপনি ধনকুবেরের দুই পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীবকে যেভাবে নারদঋষির অভিসম্পাৎ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদের মুক্তি দিয়েছেন, আমাকে মুক্তি দেন—এটা আমি চাই না, কিন্তু আমি আপনার কাছে প্রেমভক্তি প্রার্থনা করছি। সাধারণভাবে এ জগতের লোক সবাই মুক্তিপ্রার্থী। কিন্তু ভক্তিময় জীবনযাত্রা নির্বাহকালে ভক্ত দেখাচ্ছেন মুক্তি আমার

প্রাপ্তব্য বিষয় নয়। কেন? মুক্তি ত' ভগবান্ দিতে পারেন, দিয়ে থাকেন, তিনি মুক্তিদাতা; কিন্তু মুক্তি নিতে গিয়ে শেষকালে যদি আমি ভগবানকে হারিয়ে ফেলি—এই ভয় হচ্ছে ভক্তের সবসময়। সেজন্য ভগবান্ মুক্তি দিতে চাইলেও ভক্ত মুক্তি প্রার্থনা করছেন না।

“দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনা।”

আমি মুক্তি দিতে চাইলেও আমার ভক্ত মুক্তি নিতে চাচ্ছেন না—ভগবান্ বলছেন। পার্থিব জগতের কোন বিষয়বস্তু ভক্তের প্রার্থিত বিষয় নয়। সেইজন্যই ভগবান্ মুক্তি দিতে চাইলেও ভক্তের ভয় হচ্ছে। এখানে সত্যব্রত মুনি সেই ভয় করছেন। তুমি কুবের পুত্রদ্বয়কে নারদঋষির অভিসম্পাত হতে রক্ষা করেছে, আবার তোমার দর্শন যে পায় তার ত' মুক্তি করতলগত, সে ত' মুক্তি পেয়েই যাচ্ছে। আমাকে মুক্তি দিও না, আমি মুক্তি চাই না, কিন্তু আমি প্রেমভক্তি প্রার্থনা করি তোমার কাছে। যেহেতু প্রেমভক্তি পাওয়া সেখানে কোন অসুবিধা নেই, ভগবানের সেবা ছাড়তে হবে না, ভগবানকে ভুলে যেতে হবে না। তিনি ওখানে যে প্রার্থনা করছেন, সে প্রার্থনা অধিকারোচিত। অনধিকারী ব্যক্তি অধিকার প্রার্থনা করেন ভগবানের কাছে, গুরু-বৈষ্ণবের কাছে। অধিকার লাভ করে অধিকার প্রার্থনা করা সেটা একরকম, আবার অনধিকারী আমি, আমি কি করে পাব, এজন্য অধিকার প্রার্থনা করা আর একরকম জিনিষ।

প্রেমভক্তি কি জিনিষ সে সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা আছে সত্যব্রত মুনির। পাঁচরকমভাবে যে ভগবানের আরাধনা হয় তার প্রথমভাব—শান্তরস খুব কার্যকরী নয় বলে একে বাদ দেওয়া হয়েছে। দাস্যরস থেকে কার্যকরী হয়েছে জিনিষটা। তাই সেখানে প্রেম-শব্দ লাগানো আছে। দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্য প্রেম, মধুরপ্রেম—মধুররতি বলা আছে। এখন সেই অধিকারটা সত্যব্রত মুনি নিশ্চয়ই জানেন। তাই তাঁর প্রার্থনা—আমাকে প্রেমভক্তি দান করুন। আমার গুরুদেব এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন Suggestive question। প্রার্থনাটা কার?—Suggestive, তিনি নিজে ঠিক করে নিয়েছেন শাস্ত্র পড়ে, মহাজনগণের কাছ থেকে জেনে যে এটাই শ্রেষ্ঠ জিনিষ। সেইজন্য প্রার্থনাটা তাঁর ঐরকম। যিনি চাইতে জানেন না, তিনি পাবেন কি করে? যার বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা নেই, তিনি ভগবানের কাছে কি চাইবেন? আবোল-তাবোল বলবেন, সংসারের ধ্বংসশীল, নশ্বর, ক্ষয়িষ্ণু বস্তু চাইবেন ভগবানের কাছে। মহারাজাধিরাজ, রাজেশ্বর যিনি তাঁর কাছে কেউ একমুষ্টি ভিক্ষা প্রার্থনা করছেন। এ ত' বোকামি। যিনি সব দিতে পারেন, ইচ্ছামাত্র সবকিছু করতে পারেন—যার অধিকার নেই তাকে অধিকার দিতে পারেন, যার শক্তি-সামর্থ্য নেই তাকে শক্তি-সামর্থ্য, ক্ষমতা দিতে পারেন। “কাকেরে গরুড় করে এঁছে দয়াময়।” তাঁর কাছে ঠিক ঠিক জিনিষ প্রার্থনা করতে হবে। উণ্টোপাণ্টা জিনিষ প্রার্থনা করাটা ঠিক নয়, বুদ্ধিমত্তা নয়। তাই সত্যব্রত মুনি এখানে বলছেন,—আমার মুক্তির প্রয়োজন নেই। ‘ন মোক্ষে গ্রহো মেহস্তি দামোদরেহ’—হে দামোদর! মোক্ষেতে—মুক্তিতে আমার আগ্রহ নেই, আমি আপনার কাছে প্রেমভক্তি প্রার্থনা করছি।

এই শ্লোকের উপর সনাতন গোস্বামীর টীকা আছে। মদীয় গুরুপাদপদ্ম সেই টীকার বঙ্গানুবাদ করেছেন। “প্রেম-বিশেষের দ্বারা পরমোৎকর্ষিত হয়ে সাক্ষাৎ-দর্শনের প্রার্থনা

জানাচ্ছেন ঋষি।” আমরা অনেকেই সেই ভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শনের প্রয়াসী। সাধন-ভজন ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধক-সাধিকার মধ্যে তাঁরা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শনের প্রয়াসী। সাক্ষাৎ-দর্শনে আপত্তি নেই, কিন্তু সেই প্রেমময় ভগবানকে দর্শন করার অধিকার যদি আমি পেয়ে থাকি এবং সেই প্রেমময় ভগবানের শুভেচ্ছা, শুভাশীর্বাদ যদি আমার উপর থাকে তাহলে অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি আমি ভুল বুঝে ফেলি তাহলে মুস্কিল। আমি যাতে তত্ত্বদর্শনে ভুল করে না ফেলি, সে আশীর্বাদটাও চাইতে হবে—যে কথা প্রায়ই আলোচনা হচ্ছে গৌড়ীয়-দর্শনে।

সাক্ষাৎ-দর্শন করবে কে?—যাঁর সঙ্গে ভগবানের কোনভাবেই ভুল বুঝাবুঝি নেই তিনি। সাক্ষাদভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক যিনি সৎকে সৎ বলেন, অসৎকে অসৎ বলেন—এমন ব্যাপার। ভগবান্ যে সচ্চিদানন্দ বস্তু—এ বিশ্বাস এবং এ সম্বন্ধে যে বাস্তব ধারণা ভক্তের আছে। কিভাবে হচ্ছে? ভগবানের কৃপাপ্রভাবে। রাত্রিবেলা চেপ্টা করলেও যেমন আমরা সূর্য্য দর্শন করতে পারছি না, সকালে সূর্য্যদেবের উদয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তাঁর আলোয় আলোকিত হয়ে তাঁকে দর্শন করা যায়, তাঁর তত্ত্ব অনুভব করা যায়। বিচারটা হচ্ছে এই, সেটা বুঝাচ্ছেন এখানে।

আমরা সাক্ষাৎ-দর্শন পেতে চাই সবাই, কিন্তু সাক্ষাৎ-দর্শন পেতে গিয়ে যদি সেই ভগবানকে উণ্টোপাণ্টা বলে ফেলি, তত্ত্ব গণ্ডগোল করে ফেলি, সেজন্য যাতে না ফেলি সেরকম প্রার্থনাও রাখতে হবে। তাঁর কৃপাপ্রভাবে তাঁর তত্ত্বদর্শন উপলব্ধি—এই কথাই শাস্ত্রে বুঝানো আছে। আমার যে চক্ষু এটা জড়চক্ষু, জড়ইন্দ্রিয়, সে কি করে অপ্রাকৃত, অতিন্দ্রিয় যে ভগবান্, অবাঙ্মনসগোচর যে ভগবান্, তাঁকে কি করে দেখবে, কি করে বুঝবে, কি করে জানবে?—এ সম্বন্ধেও কৃপা প্রার্থনা করতে হবে। আমি যে ভগবদর্শন চাচ্ছি তার আগে আমার দর্শনটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। গুরু-বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন দর্শন সম্বন্ধে (শ্রীবিগ্রহ-দর্শন) সেখানে দর্শন-শব্দের অর্থ লিখছেন,—আমি ঠাকুরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি, তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতে পারি, কিন্তু তিনি যে বস্তু সে বস্তু তাঁর কৃপা ছাড়া বুঝা যায় না। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন গীতায়,—

“দদামি বুদ্ধিযোগং ত্বং যেন মামুপযান্তি তে।”

অর্জুন, আমাকে জানবে, বুঝবে, তাহলে আমার দেওয়া বুদ্ধি নাও, আমার দেওয়া জ্ঞান নাও, আমার দেওয়া উপদেশ নাও। তবে আমাকে ঠিক ঠিক জানতে পারবে, বুঝতে পারবে, চিনতে পারবে। সেখানে ভগবৎকৃপা ছাড়া ত’ আর কোন সম্ভল নেই। সেইজন্য প্রত্যক্ষ দর্শন ভক্ত প্রার্থনা করলেও তিনি আগেভাগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন—আমি যেন তোমাকে ভুল বুঝে না ফেলি। তুমি যে তত্ত্ববস্তু, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, আমি তাঁকে যেন মাটিয়া বুদ্ধি না করি, আমি যেন তাঁকে ইট, কাঠ, পাথর বলে মনে না করি—এ চিন্তাটাও আছে। কিন্তু ভগবৎকৃপাপ্রভাবে ভক্তের এ সকল অধিকার আপনা থেকেই এসে যায় এবং ভুল বুঝাবুঝির ব্যাপার সবই নষ্ট হয়।

সেজন্য বলছিলাম—অধিকার দুরকমের। একজন অধিকারী হয়ে সেবাধিকার, দর্শনাধিকার প্রার্থনা করছেন; আর একজন অধিকারী নন বিবেচনা করে ঠাকুর তথাপি

তুমি আমাকে অধিকার দাও বলে প্রার্থনা করছেন। সেখানে বলার ভঙ্গিটা কি?—

যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাই পাই, তোমার করুণা সার।

করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর।।

হাজার বার বলা যায় মুখে ‘করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর।।’

কিন্তু অন্তরটা যদি কাঁদে তবেই ত’ হল। সেই বিষয়বস্তুটা প্রয়োজন আমার হৃদয়ে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তিনি পূর্ব পূর্ব গুরুবর্গ চলে (অপ্রকট) গেছেন বলে বিরহ-সূচক একটা গীতি লিখেছেন। আমাদের সেটা গান করা হয় কোন বিশেষ বিশেষ গুরুবর্গের বিরহ-তিথিতে। তার শেষের দিকে আছে,—

পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।

গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা’ গেলে পাব।।

সে-সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।

সে-সঙ্গ না পাঞ কান্দে নরোত্তমদাস।।

এখন এই গানটা যিনি গেয়েছেন, তাঁর মনের ভাব, তাঁর চিন্তের যে অবস্থা, আমিও সেই গানটা গাইছি, কিন্তু যদি সেই ভাব না আসে তাহলে বৃথাই পণ্ডশ্রম হল। গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে আমরা কীর্তনগুলো করব। কীর্তন তিনি করেছেন, তাঁরা করেছেন, তাঁরা অধিকারী। তাঁরা যে ভাব নিয়ে করেছেন আমরা যদি সেই ভাব অন্তরে খুঁজে না পাই, সেটা যদি না আসে, তাহলে শুধু গাওয়াই সার হল। “পাষাণে কুটিব মাথা”—এই কথা শুনে একজন মহাজন বলেছেন,—‘তুমি ত’ শুধু গেয়ে গেলে, যার মাথা ফাটল তার ফাটল! ইনি হৃদয়ের আবেগ নিয়ে বিরহ-ব্যথা অনুভব করছেন হৃদয়ে—তাঁর পূর্ব পূর্ব গুরুবর্গের অভাব অনুভব করছেন। তুমি সেই ভাবটা যদি না পাও তাহলে সেই ভাবটা প্রার্থনা করে তুমি ওটা গাও। তাহলে তোমার কল্যাণ।

কে কীর্তন করবেন? শাস্ত্রে বললেন,—কীর্তন করবেন তিনি যাঁর অমানী মানদধর্ম্মে দীক্ষা হয়েছে, যিনি অমানী মানদধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছেন, তিনিই কীর্তন করার অধিকারী। পদকর্তা বলছেন,—“অমানী মানদ, হইলে কীর্তনে, অধিকার দিবে তুমি।” আমি যদি অমানী মানদ হতে পারি, তাহলে আমার কীর্তনে অধিকার আছে, আমার যোগ্যতা স্বীকৃত। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলেছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

তুমি কীর্তন করবে, ‘কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ’—সবসময় কীর্তন করতে হবে তোমাকে, কিন্তু তার আগে এই যোগ্যতা থাকা দরকার তোমার।—

দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জন।

চারি গুণে গুণী হই’, করহ কীর্তন।।

আগে তুমি এই চারটে গুণ লাভ কর, তারপরে তুমি কীর্তনের অধিকারী। আর যদি এই চারটে গুণ তোমার না থাকে, তাহলে তোমার কীর্তন করবার অধিকার নেই। কীর্তন করবে তুমি, কাকে শুনাবে? প্রথমমুখে তুমি তোমার মনকে শুনাবে। তারপরে কাকে শুনাবে?

ঠাকুরের সামনে ঠাকুরকে শুনাবেন, গুরু-বৈষ্ণবকে শুনাবেন। ঠাকুর সবসময় কথা বলবেন না, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবগণ সামনে থাকেন, তাঁরা কথা বলবেন। তাঁরা যদি দেখেন আমার ভিতরে অহঙ্কার আছে, আমি অহঙ্কার নিয়ে কীর্তন করছি—ভাল সুর, তাল, লয়, মান আমার আছে—এটা যদি বোঝেন গুরু-বৈষ্ণবগণ, তাহলে বলবেন আমার কীর্তনে কোন অধিকার নেই। তুমি অনধিকারী হয়ে কীর্তন করছ, অধিকার লাভের জন্য কীর্তন করছ না। বিচারগুলো ত' এই। কীর্তন অন্যকে শুনাব না আমি, ভজন-কীর্তন আমি গাইব আমার নিজের মনকে শুনাব। আমি ত' অহঙ্কারী, দান্তিক ; আমি বৈষ্ণব—এই ভেবে সবসময় অহঙ্কারী। “দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব।” দুষ্ট মনকে শাসন করা হচ্ছে, তাকে শুনান হচ্ছে। তুমি এই এই করছ, এগুলো করা উচিত নয়। ভগবানের কাছে আমি আমার দৈন্য-আর্তি নিয়ে কীর্তন করব, গুরু-বৈষ্ণবগণের কাছে করব, শ্রীবিগ্রহের সামনে করব। অন্যকে শুনাবার জন্য নয়। প্রথমে আমারই দরকার, আমার মনকে আমি বুঝাব, তারপরে পড়া দেব ঠাকুরের কাছে, গুরু-বৈষ্ণবের কাছে। গুরু-বৈষ্ণব যদি ধরে ফেলেন যে তোমার অন্তরে ফাঁকি আছে, তাহলে তাঁরা বলে দেবেন—তোমার আর্তি আসা চাই, তোমার দৈন্য আসা চাই, তোমার অহঙ্কার ত্যাগ করা চাই। সুতরাং ভজন-কীর্তন শুনতে হবে ঠাকুরকে, গুরু-বৈষ্ণবের কাছে পড়া দিতে হবে—সেইকথা শাস্ত্রে বলা আছে সব জায়গায়।

এখানে সত্যব্রত মুনি প্রার্থনা করছেন সাক্ষাৎ-দর্শন। সাক্ষাৎ-দর্শনের অধিকার হলে ভাল, আর সাক্ষাৎ-দর্শন করতে গিয়ে অনধিকারী আমি ভগবানকে ভুল না বুঝে ফেলি, গুরু-বৈষ্ণবকে ভুল না বুঝে ফেলি, সে-সম্বন্ধে সাবধানতা দরকার। শাস্ত্র সেইজন্য বলছেন,—গুরু-বৈষ্ণবকে দর্শন করার আগে গুরু-বৈষ্ণবের মহিমা-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। তাঁদের উপদেশ-নির্দেশ পালন করবার চেষ্টা কর। তার দ্বারাই গুরু-বৈষ্ণবের সম্যক দর্শন হবে। গুরু-বৈষ্ণবকে চিনতে পারা যাবে, জানতে পারা যাবে তাঁদের উপদেশ-নির্দেশ, তাঁদের দিব্যজীবনী থেকে। ভক্তকে চিনিয়ে দেবেন ভগবান, আবার ভগবানকে চিনিয়ে দেবেন ভক্ত, গুরু-বৈষ্ণব—এ দুটো কথা পাশাপাশি আছে। প্রার্থনা দুরকম আছে,—

“বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি।” শেষের দিকে বলা হচ্ছে “কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে। আমি ত' কাঙ্গাল, ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি’, ধাই তব পাছে পাছে।।” গুরু-বৈষ্ণবকে বলা হচ্ছে, কৃষ্ণ সে তোমার নিজের লোক, তাঁকে একটু বলে দেবেন, তোমার কৃষ্ণ আমাকে একটু দয়া করবেন—এই প্রার্থনা রাখতে হচ্ছে গুরু-বৈষ্ণবের কাছে। আবার কৃষ্ণের কাছে যখন প্রার্থনা রাখছি আমি, তখন বলছি,—“তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার, আমারে করুন দয়া। তবে মোর গতি, হবে তব প্রতি, পাব তব পদছায়া।।”—ওই দুরকম প্রার্থনা আছে। ভগবানের কাছে—গুরু-বৈষ্ণব যেন আমাকে কৃপা করেন জানাতে হয়, আবার গুরু-বৈষ্ণবগণের কাছে জানাতে হয়—তোমার ঠাকুর, তিনি যেন আমাকে দেখেন, আমাকে কৃপা করেন।

প্রেমভক্তির (প্রেমানুরাগের) উদয় হয় ভগবানের দর্শন-প্রার্থনাদ্বারা। যেন তাহলে অহঙ্কার না আসে আমার, কাউকে ভুল বুঝে না ফেলি। যেমনভাবে দর্শন করলে ঠাকুরের

কৃপা পাব, তেমনভাবে দর্শন করতে হবে। অর্থাৎ আমি আমার চোখ দিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করে নিতে পারি না, তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করে নিতে পারি না। শ্রীবিগ্রহ যদি আমার উপর শুভদৃষ্টিপাত করেন, কৃপাদৃষ্টিপাত করেন, তজ্জন্যই আমরা ঠাকুরের সামনে গিয়ে দাঁড়াব—এটাই নিয়ম। আমি দেখে নেব তা হবে না। আগে জেনে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে শ্রীবিগ্রহ কি তত্ত্ব। তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে তাঁর শুভদৃষ্টিপাতের জন্য। আমি দেখে নিতে পারব না কোনদিনও, ক্ষমতা নেই আমার। (ক্রমশঃ)

নন্দের গৃহে আনন্দ

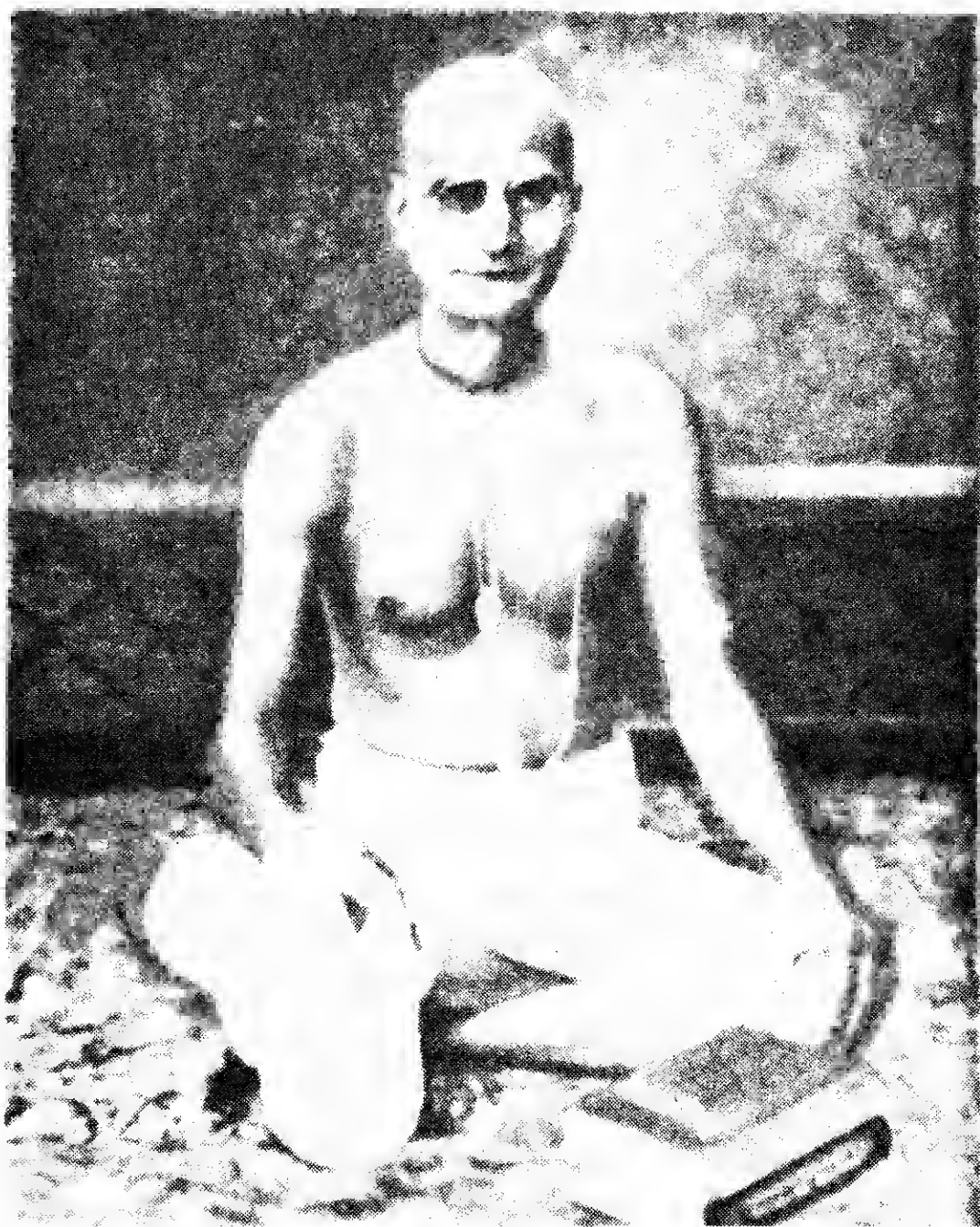
বিশ্বময় চতুর্দিকে শুনি হাহাকার,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেদিকে নেহারি।
জীবের নয়নে সদা বহে অশ্রুধার,
আন্তর্নাদে কাঁদে সবে ফুকারি ফুকারি।।
পশুপক্ষী আদি করি স্থাবর-জঙ্গম,
কাঁদিছে ত্রিতাপানলে দহিয়া দহিয়া।
কহিছে আকুল প্রাণে কে তুমি নিস্ময়,
দিতেছ যন্ত্রণা এত পিষিয়া দলিয়া।।
কাঁদে মাতা—কোথা গেলি হৃদয়রতন,
কাঁদে পত্নী পতিহারা পড়িয়া ধূলায়।
কাঁদে পিতা—কোথা বাপ অন্ধের নয়ন,
কাঁদে পতি পত্নীশোকে করি' হায় হায়।।
কাঁদে শিশু উচ্চৈঃস্বরে 'মা মা মা' ব'লে,
কাঁদে বৃদ্ধ কোথা ওরে অন্তিম সম্বল।
যুবার হৃদয় দহে সদা তুষানলে,
যুবতীনয়নে ঝরে গঙ্গা অবিরল।।
আশার তরলী ঐ বারিধির তলে,
অকূলেতে চিরতরে হ'ল নিমজ্জিত।
সুখ ব্যোমযান ওই পড়িয়া ভূতলে,
চূর্ণ হ'য়ে মিশে গেল ধূলির সহিত।।
পালঙ্ক উপরে নিদ্রা যায় নরনারী,
আচম্বিতে কোথা হ'তে ভীম ভূকম্পন।

মুহূর্তে লইয়া গেল মহা অন্ধপুরী,
 কোটিকণ্ঠে চতুর্দিকে উঠিল ক্রন্দন ॥
 সুখ লাগি' গিরিশৃঙ্গে রচিনু ভবন,
 অকস্মাৎ হ'ল তথা অগ্নির উত্থান।
 উঠিল করাল শিখা প্রলয় পবন,
 কোটি সৌধপুরী হ'ল মুহূর্তে শ্মশান ॥
 কোটি কোটি মস্তিষ্কের গবেষণা-ফল,
 ক্ষণমাত্রে কোথা গেল সে অক্ষজ জ্ঞান।
 শত চেষ্টা শত যুক্তি হইল বিফল,
 জড়ের বিজ্ঞান হ'ল ক্ষণেকে অজ্ঞান ॥
 কাঁদে জীব নিরানন্দ পাথারে পড়িয়া,
 নিপীড়িত শত শত সমস্যা বন্ধনে।
 হায় হায় শব্দ উঠে ধরিত্রী ব্যাপিয়া,
 না পায় আনন্দ কেহ কালের তুফানে ॥
 যদি কেহ কিছুক্ষণ রয়েছে মজিয়া,
 জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর অভিমান-মদে।
 প্রবল তরঙ্গে ঘাত প্রতিঘাত দিয়া
 ক্ষণে দিগন্তরে লয় সে জড় সম্পদে ॥
 বিশ্বমাঝে আজি এই জীবের দুর্দিনে,
 গোকুলেতে কেন শুনি আনন্দের রোল।
 ভারে ভার উপচার লয়ে জনে জনে,
 মহানন্দে নাচে কেন হইয়া বিভোল ॥
 ক্ষণে ক্ষণে নন্দগৃহে কেন জয়ধ্বনি,
 কেন বাজিছে শঙ্খ ঘণ্টা করতাল।
 লও লও, খাও খাও কেন তথা শুনি,
 মহানন্দে মগ্ন কেন তথা সর্বকাল ॥
 তথা বাল বৃদ্ধ যুবা হাসিয়া গাহিয়া,
 আহ্বানিছে জনে জনে মধুর বচনে।
 এস ওগো বিশ্বজীব দেখহ আসিয়া,
 কি আনন্দ উঠে আজি নন্দের ভবনে ॥

কোথা যাও ওগো জীব মরীচিকা পাছে,
 ছুটে এস নন্দালয়ে আনন্দকান্দাল।
 গুরুনন্দ-গৃহে চির সর্বশান্তি আছে,
 লভিবে পরমানন্দ ঘুচিবে জঞ্জাল।।
 অবতীর্ণ অধোক্ষজ মহাযোগপীঠে,
 নাশিতে জীবের সর্ব অক্ষজ কুঞ্জান।
 রাখিয়া মস্তক গুরুনন্দ-পাদপীঠে,
 কৃষ্ণ-জন্ম-মহোৎসবে কর যোগদান।।
 নাশি হিংসাদ্বেষ হেথা জড় অহঙ্কার,
 নিমজ্জিত হেথা জীব আনন্দসাগরে।
 নাই শোক নাই ভয় মোহের বিকার,
 প্রেমে মত্ত সবে লয়ে রসিকশেখরে।।
 জীবিত-শবের মুখ করিয়া চুম্বন,
 পাবে না অমৃত কভু ওগো মূর্খ নর।
 ত্বরা করি' ছুটে এস নন্দের ভবন,
 অমৃতত্ব লভ হরি ধরি' হৃদি-পর।।
 যথা নাই কৃষ্ণ-জন্ম-মহামহোৎসব,
 তথা নিত্য নিরানন্দ শুধু হাহাকার।
 তথা নিত্য পাষাণীর বিকট তাণ্ডব,
 তথা শুধু চিরকাল দুঃখের আগার।।
 যথানন্দ তথা নাই জড়-কোলাহল,
 যথানন্দ তথা চির কৃষ্ণ-জন্মোৎসব।
 গুরুনন্দ-সেবা বিনা জনম বিফল,
 নন্দকৃপা হ'লে পায় নিত্যানন্দ সব।।
 ওগো সর্ববিশ্ববাসি করি নিবেদন,
 শ্রুতি-স্মৃতি-ভারতাদি কি ফল পঠনে।
 গুরুনন্দপদে কর আত্মসমর্পণ,
 আনন্দবিগ্রহ বাঁধা যাঁহার অঙ্গনে।।

—শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দো জয়তঃ
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
৩০শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিনে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে।।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাদেৱ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

☎ ৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

১১ পদ্মনাভ, ৫১২ শ্রীগৌরানন্দ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্দতিপূর্ব্বকেষম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বকেষম্—

আগামী ২৯শে পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ১৪০৫ (ইং ৫/১০/৯৮)
সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী গৌড়ীয় মঠ-
সমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ৩০শ বার্ষিক বিরহ-
মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি
সবান্নবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ
করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ক্রটি মাজ্জনীয়। ইতি—
৩১শে ভাদ্র, ১৪০৪

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

সেবা-সূচী

১৮ই আশ্বিন (ইং ৫/১০/৯৮), সোমবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের

অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে “সাধারণ-সম্পাদক”—এঁর
নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঃ)—এই ঠিকানায়
প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দো জয়তঃ

✽	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।	✽
ধর্ম্যঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিযুক্তসেন-কথাসু যঃ ।		নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
✽	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	✽

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫০শ বর্ষ } ১৩ দামোদর, বাসুদেব, ৫১২ শ্রীগৌরান্দ
৩১ আশ্বিন, রবিবার, ১৪০৫, ইং ১৮/১০/৯৮ { ৮ম সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-নুতি-সূত্রকম্

[ত্রিদিগুস্বামী-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-গোস্বামি-বিরচিতম্]

ব্রহ্ম-সংহিতাখ্য-কৃষ্ণ-ভক্তি-শাস্ত্র-দায়কং
কৃষ্ণ-কর্ণ-সীধু-নাম-কৃষ্ণ-কাব্য-গায়কম্ ।
শ্রীপ্রতাপরুদ্র-রাজ-শীর্ষ-সেব্য-মন্দিরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২০ ॥

শ্রীব্রহ্মসংহিতা-নামক প্রসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত গ্রন্থ যিনি (দক্ষিণ দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া) নিজ ভক্তগণকে প্রদান করিয়াছেন ও দাক্ষিণাত্য কবি শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল-রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-নামক গ্রন্থের শ্রীব্রজলীলাময় শ্লোকগুলি যিনি প্রেমভরে আবৃত্তি করিতেন এবং মহারাজ প্রতাপরুদ্র যাঁহার শ্রীচরণযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া পূজা করিতেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরান্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২০ ॥

শ্রীরথাগ্র-ভক্ত-গীত-দিব্য-নর্তনাদ্রুতং
যাত্রি-পাত্র-মিত্র-রুদ্ররাজ-হৃচ্চমৎকৃতম্ ।

গুণ্ডিচাগমাদি-তত্ত্ব-রূপ-কাব্য-সঞ্চরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীরথগ্রে সঙ্কীর্ণনে ভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়া যাঁহার অদ্ভুত অপ্রাকৃত নটরাজমূর্তির প্রকাশ,—যাহা সমবেত যাত্রীগণ ও পাত্র-মিত্রসহ মহারাজ প্রতাপরুদ্রের হৃদয় চমৎকৃত করিয়াছে, এবং যিনি শ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণপূর্বক গুণ্ডিচা গমনাদি লীলার প্রকৃত তাৎপর্য—শ্রীরূপের কবিতায় (প্রিয়ঃ সোহং.....বিপিনায় স্পৃহয়তি) সঞ্চারিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরানন্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২১ ॥

ন্যাস-পঞ্চ-বর্ষ-পূর্ণ-জন্ম-ভূমি-দর্শনং

কোটি-কোটি-লোক-লুপ্ত-মুগ্ধ-দৃষ্টি-কর্ষণম্ ।

কোটি-কণ্ঠ-কৃষ্ণনাম-ঘোষ ভেদিতাম্বরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২২ ॥

সন্ন্যাস গ্রহণের পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে যিনি জন্মভূমি শ্রীনবদ্বীপে একবার আগমন করেন—যখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—কোটি কোটি দেশবাসী—আকুল নয়নে, গুণ-বিহুল-দৃষ্টিতে অন্তরাত্মার আকর্ষণকারীর দিকে চাহিয়াছে, এবং যাঁহার উদ্দীপনায় সমবেত জনতা-কণ্ঠের মুহূর্মুহুঃ শ্রীহরিধবনির উচ্চরব গগন-পবন ভেদ করিয়া দিগ্দিগন্তে ধাবিত হইয়াছে—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরানন্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২২ ॥

আর্ত-ভক্ত-শোক-শান্তি-তাপি-পাপি-পাবনং

লক্ষ-কোটি-লোক-সঙ্গ-কৃষ্ণ-ধাম-ধাবনম্ ।

রাম-কেলি-সাগ্র-জাত-রূপ-কর্ষণাদরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২৩ ॥

বিরহ-কাতর নিজ ভক্তজনের বিরহব্যথা অপনোদন করিয়া এবং (চাপাল-গোপালাদি) অপরাধ প্রতপ্ত-জনের অপরাধ ও বেদনা শান্তির বিধান করিয়া—যিনি (গঙ্গাতীর) পথে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন এবং লক্ষ-কোটি লোক (জন-সমুদ্র) যাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, কিন্তু (তাৎকালিক বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়ের নিকট) রামকেলি পর্য্যন্ত গমন করিয়া যে প্রভু (রাজমন্ত্রীদ্বয়—পার্ষদভক্ত) শ্রীরূপ ও তদগ্রজ শ্রীসনাতনের আকর্ষণেই আদর প্রদর্শন করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরানন্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২৩ ॥

ব্যাঘ্র-বারণৈন-বন্য জন্তু-কৃষ্ণ-গায়কং

প্রেম-নিত্য-ভাব-মত্ত-ঝাড়খণ্ড-নায়কম্ ।

দুর্গ-বন্য-মার্গ-ভট্ট-মাত্র-সঙ্গ-সৌকরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২৪ ॥

(রামকেলি হইতে গৌড়ের পথে পুরীধামে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহাপ্রভু ঝাড়খণ্ডের

পথে শ্রীবৃন্দাবন চলিলেন ।) ব্যাঘ্র, হস্তী ও মৃগাদি বন্য জন্তুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রেমযোগে মধুর নৃত্যসহকারে পরম ভাবোন্মত্তবেশে ঝাড়খণ্ডের পথযাত্রার যে নায়ক চলিতেছেন ও যিনি সেই ঘোর দুর্গম অরণ্যপথে মাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গী করিয়া নিজ্জন ভজনের পক্ষ মুখ অনুভব করিতেছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২৪ ॥

গাঙ্গ-যামুনা-বিন্দু-মাধবা-মাননং

প্রেম-ধাম-দৃষ্ট-কাম-পূর্ব-কুঞ্জ-কাননম্ ।

গোকুলাদি-গোষ্ঠ-গোপ-গোপিকা-প্রিয়ঙ্করং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২৫ ॥

যিনি গঙ্গাতীরে (কাশীতে) ও যমুনাগঙ্গা সঙ্গমে (প্রয়াগে) শ্রীবিন্দুমাধবা-বিগ্রহগণের মর্যাদা দান করিতেছেন এবং তৎপরে যিনি প্রেমলীলা-পীঠস্থান শ্রীব্রজধামে সমুপস্থিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া পূর্বলীলাস্থলের কুঞ্জ ও কাননসমূহ দর্শন করিতেছেন এবং গোকুলাদি দ্বাদশবনে গোষ্ঠস্থিত গোপ-গোপিকাসঙ্গে—যাঁহার নানা প্রকারপরস্পর প্রিয়াচরণ প্রকট হইতেছে—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২৫ ॥

প্রেম-গুঞ্জ-নালি-পুঞ্জ-পুষ্প-পুঞ্জ-রঞ্জিতং

গীত-নৃত্য-দক্ষ-পক্ষি-বৃক্ষ-লক্ষ-বন্দিতম্ ।

গো-বৃষাদি-নাদ-দীপ্ত-পূর্ব-মেদ-মেদুরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণকালে—যিনি প্রেম-সংলাপময় অক্ষুট-রব ভ্রমর-নিকর-ব্রাজিত কুসুম স্তবকদ্বারা অভিনন্দিত হইতেছেন ও শ্রীবৃন্দাবনের লক্ষ লক্ষ পাদপরাজি ব্রাজিত—নৃত্য-গীতকুশল বিচিত্রপক্ষি দ্বিজগণকর্তৃক অভিসংস্কৃত হইতেছেন এবং গোষ্ঠসমূহস্থিত গো, বৎস ও বৃষভগণের সম্মুখে আহ্বানে যাঁহার পূর্বলীলার আনন্দোচ্ছ্বাস উদ্দীপিত হইয়া চিত্তকে একান্ত স্নেহাপ্লুত ও অভিভূত করিতেছে—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২৬ ॥

আন্ধ্র-বিপ্র-ভক্ত-ভট্ট-বল্লভাদরার্চনং

দত্ত-মুক্ত-ভট্ট-দত্ত-পুষ্টি-মার্গ-সেবনম্ ॥

শ্রীগদাধরপি তাধিকার-মন্ত্র-মাধুরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২৭ ॥

যিনি—শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রয়াগের নিকটবর্তী গ্রাম (গঙ্গার পরপারে) আড়াইলে আন্ধ্র ব্রাহ্মণ শ্রীবল্লভাচার্য্য-কর্তৃক পরমাদরে অর্চিত হন এবং পরবর্তিকালে ভট্টকে দত্তমুক্ত করিয়া কিশোরকৃষ্ণের রাগভজনের শ্রেষ্ঠতা উপদেশ করেন ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর সমীপে তাঁর অনুরূপ মন্ত্র দীক্ষার ব্যবস্থা করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২৭ ॥

শ্রীপ্রয়াগ-ধাম-রূপ-রাগ-ভক্তি-সঞ্চরং

শ্রীসনাতনাদি-কাশি-ভক্তিশিক্ষনাদরম্।

বৈষ্ণবানুরোধ-ভেদ-নিবির্বশেষ-পঞ্জরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২৮ ॥

যিনি—শ্রীপ্রয়াগধামে (দশাশ্বমেধ ঘাটে) শ্রীরূপকে ব্রজরস—সাধ্য-সাধনক্রমে উপদেশ করিয়া রসবিজ্ঞারের শক্তিসঞ্চার করেন ও তৎপর কাশীধামে শ্রীসনাতনকে শুদ্ধভক্তি বখা—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন বিচারে বিস্তৃতভাবে শিক্ষাদান করেন এবং মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র ও তপন মিশ্রাদির বিশেষ প্রার্থনায় বারাণসীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাক্ষাতে বিচারসভায় নিবির্বশেষ ব্রহ্মবাদের সন্ধীর্ণ ও মৎসরতাপূর্ণ অহংগ্রহোপাসনার অন্ধ-ধারণা বিধবস্ত করিয়া পরব্রহ্মের আরাধনায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২৮ ॥

প্রশ্নোত্তর

মর্কট-বৈরাগ্য

১। মর্কট-বৈরাগ্যের দ্বারা সাধকের কি অনিষ্ট হয়? উহা পরিত্যাগেই বা কি ইষ্ট হয়?

“মর্কট-বৈরাগ্য একটা প্রধান হৃদয়-দৌর্বল্য। এইটিকে যত্নপূর্বক দূর করিলে ভজনে শক্তির উদয় হয়; তখন জীবের কাপট্য, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বন্ধমূল শত্রুগণ পরাজিত হয় এবং শুদ্ধভক্তি উদিত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করে।”

—‘মর্কটবৈরাগী’, সং তোঃ ৮।১০

২। বৈরাগীর কি যাত্রাভিনয়াদি দর্শন করা উচিত?

“যে বৈরাগী নাট্যশালায় স্ত্রীলোক দর্শন করেন এবং তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখেন, তিনিও মর্কট বৈরাগ্য আচরণ করেন, সন্দেহ নাই। যাত্রা শুনিতে বা থিয়েটার দেখিতে যে বৈরাগী প্রবৃত্ত হন, তিনি দোষী।”

—‘মর্কটবৈরাগী’, সং তোঃ ৮।১০

৩। ভাবোদয় না হইলে ভেক গ্রহণ করা উচিত কি?

“‘বিরক্ত’ বলিয়া পরিচয় দিলেই যে বিরক্ত হয়,—এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ।”

—চৈঃ শিঃ ৫।২

৪। স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা অন্তরে থাকিলে অপক্লাবস্থায় বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্তব্য কি?

“যদি স্ত্রীসন্তোষণ-প্রবৃত্তি হৃদয়ের কোনদেশে অবস্থিতি করিতে থাকে, তবে যেন ভেক গ্রহণ না করেন। গৃহে থাকিয়া মর্কট-বৈরাগ্য দূর করত সর্বদা কৃষ্ণজ্ঞানানন্দে আত্মার উন্নতি সাধন করুন,—ব্যস্ত হইয়া অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।”

—‘মর্কটবৈরাগী’, সং তোঃ ৮।১০

৫। কাহার বৈরাগ্যাভিনয় মর্কট-বৈরাগ্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা?

“ভক্তিজনিত স্বাভাবিক বৈরাগ্য পূর্ণবলে উদিত হইবার পূর্বে যে গৃহস্থ গৃহস্থধর্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই মর্কটবৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা।”

—‘মর্কটবৈরাগী’, সং তোঃ ৮।১০

৬। মর্কটবৈরাগীর লক্ষণ কি?

“হৃদয়ে বিষয়চিন্তা, গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, বাহিরে কৌপীন, বহির্কাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্ন,—এই সকলই মর্কটবৈরাগীর লক্ষণ।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ১৬।২৩৮

৭। মর্কটবৈরাগী কে?

“বৈরাগী হইয়া যিনি স্ত্রী-সম্ভাষণ করেন, তিনিই মর্কট-বৈরাগী।”

—‘নামবলে পাপবুদ্ধি’, হঃ চিঃ

৮। কেবল কি অগৃহিগণই মর্কটবৈরাগী হয়? গৃহিগণের মর্কট-বৈরাগ্য কিরূপ?

“মর্কটবৈরাগী দুই প্রকার—অর্থাৎ গৃহী মর্কটবৈরাগী ও অগৃহী মর্কটবৈরাগী। গৃহীদিগের মধ্যে যাঁহারা অযথা গৃহত্যাগের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা অত্যাচারী।”

—‘মর্কটবৈরাগী’, সং তোঃ ৮।১০

৯। বৈরাগ্য-বেষণহণেই কি নির্বিষয়ী ভক্ত হওয়া যায়?

“বৈরাগ্য-বেষাদি ধারণ করিলেই যে বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়,—এরূপ নয়; কেন না, অনেকস্থলে বৈরাগীগণ বিষয় অর্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ীপ্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত ভজন করেন।”

—‘জনসঙ্গ’, সং তোঃ ১০।১১

১০। মুমুক্শবশে ক্রম-পথ-ত্যাগে কি অনিষ্ট হয়?

“মুমুক্শু হইয়া ক্রম ত্যাগ করিলে মর্কটবৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্যা করিয়া ফেলে।”

—চৈঃ শিঃ ১।৭

১১। অস্থির বৈরাগী কাহার?

“কলহ, ক্রেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটন-বশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তদ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারাই অস্থির বৈরাগী; তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, তাহারা অতি শীঘ্র কপট-বৈরাগী হইয়া পড়ে।”

—চৈঃ শিঃ ৫।২

১২। ‘ঔপাধিক বৈরাগী’ কাহার?

“যাহারা মাদকদ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারের অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে একপ্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অভ্যস্ত রতির দ্বারা ভক্তি-লক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধন-চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণপূর্বক ঔপাধিক বৈরাগী হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৫।২

১৩। জগতের উৎপত্তি ও বৈষ্ণবধর্মের কলঙ্ক কে বা কাহার?

“ভাগবতী রতিজনিত বিরক্তি না হইতে হইতেই যিনি বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই জগতের উৎপাত ও বৈষম্যবর্ধনের কলঙ্ক-স্বরূপ।”

—‘ভেকধারণ’, সং তোঃ ২।৭

১৪। সমস্ত নিঃসঙ্গ সাধুর প্রতি লোকের অবিশ্বাস ঘটিবার জন্য দায়ী কাহারো?

“নিঃসঙ্গ বাবাজীদিগের স্ত্রীলোভ, অর্থলোভ, খাদ্যলোভ ও সুখলোভ অত্যন্ত বর্জ্যনীয়। কোন কোন নিঃসঙ্গ-লিঙ্গধারী বৈরাগীর সেই সকল দৌরাভ্য থাকায় সমস্ত নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতি বৈষম্য-জগতের অবিশ্বাস হইয়া পড়ে।”

—ভেকধারণ, সং তোঃ ২।৭

১৫। আখড়াধারীদের সেবাদাসী রাখিবার প্রথা কি বৈষম্যবর্মানুমোদিত কার্য্য?

“আখড়াধারী বাবাজীদিগের আখড়ায় স্ত্রীলোক-সেবিকা রাখাও একটি ভয়ঙ্কর অমঙ্গলজনক প্রথা। কোন কোন আখড়ায় বাবাজীর পূর্বাশ্রমের বর্ণিত সেবিকারূপে অবস্থিতি করেন। যে-আখড়ায় স্ত্রীলোক না হইলে চলে না, সে আখড়ায় যথার্থ বিরক্ত পুরুষ থাকেন না। দেবসেবা ও সাধুসেবার ছল করিয়া স্ত্রীসঙ্গ করাই ঐ সকল কার্য্যের মূলীভূত তত্ত্ব।”

—‘ভেকধারণ’, সং তোঃ ২।৭

১৬। কেবল বিষয়রাগ দমন করিলেই কি সুফল পাওয়া যায়?

“বিষয়রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠরাগ হয়, তাহা নহে। অনেক লোক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবল বিষয়রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-রাগের সম্বন্ধনের চেষ্টা করেন না; তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে।”

—প্রঃ প্রঃ ৪র্থ প্রঃ

১৭। পরমার্থের উদ্দেশ্য না থাকিলে বৈরাগ্যের কোন সার্থকতা আছে কি?

“প্রত্যাহারক্রমে ইন্দ্রিয়সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকেও শুদ্ধ ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি; যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ, উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল জীবকে পাষণবৎ করিয়া ফেলে।”

—প্রঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

১৮। কখন গৃহত্যাগের অধিকার হয়?

“প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা।”

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

যোষিৎসঙ্গ

১। ‘যোষিৎসঙ্গ’ কাহাকে বলে?

“স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি, তাহারই নাম ‘যোষিৎসঙ্গ’। সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ লোক শুদ্ধ কৃষ্ণানামের আলোচনায় পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন।”

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

২। যোষিৎসঙ্গ কি ভক্তিবিরোধী?

“যে-স্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন দুষ্টবুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই যৌষিৎসঙ্গ ; তাহা পাপময় ও ভক্তিবিরোধী।”

—“জনসঙ্গ”, সং. তোঃ ১০।১১

৩। শুদ্ধভক্তিনাভেচ্ছুর বর্জ্যনীয় কি?

“যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্তসঙ্গ ও যৌষিৎসঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় একেবারেই বর্জ্যনীয়।”

—সঙ্গত্যাগ, সং. তোঃ ১১।১১

৪। বিবাহবিধির উদ্দেশ্য কি? কাহারো পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত? অপ্রাকৃত-রতিযুক্ত ব্যক্তিগণের চিত্তবৃত্তি কিরূপ?

“রক্ত-মাংস-গঠিত শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ একপ্রকার নিসর্গজনিত ধর্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সদ্ধুচিত করিবার জন্য বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে যাঁহারা সংসঙ্গজনিত ভজনবলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত-বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ।”

—“ধৈর্য্য”, সং. তোঃ ১১।৫

৫। কাহারো ধার্মিক-পরিচয়ে স্ত্রীসঙ্গী?

“স্ত্রীসঙ্গে যাহাদের প্রীতি, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী। কনক-কামিনী-মুগ্ধ সংসারী জীব, তথা ললনা-লোলুপ সহজিয়া, বাউল, সাঁই প্রভৃতি ছলধর্মিগণ এবং বামাচারী তান্ত্রিকগণ—ইহারা সকলেই স্ত্রীসঙ্গীর উদাহরণ-স্থল। মূল কথা, যে-সমস্ত পুরুষ স্ত্রীতে প্রীতি করে এবং যে-সমস্ত স্ত্রী পুরুষে আসক্ত, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবজন সর্বপ্রযত্নে তাদৃশ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন,—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা।”

—“অসংসঙ্গ”, সং. তোঃ ১১।৬

৬। বৈষ্ণব-গৃহস্থ কি স্ত্রৈণ বা যৌষিৎসঙ্গী?

“গৃহীই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, বৈষ্ণব চিৎসুখের অভিলাষী। গৃহস্থ বৈষ্ণব সর্বদা চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সঙ্গে একযোগে সকল কার্য করেন। সকল কার্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হন না। এইরূপ জীবনে তাঁহার যৌষিৎসংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ স্ত্রী-সম্ভাষণ এবং বৈধ-স্ত্রীসঙ্গে অপারমার্শিক স্ত্রৈণভাব তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন।”

—“সঙ্গত্যাগ”, সং. তোঃ ১১।১১

৭। স্ত্রৈণ হওয়া কি ভাল?

“কেহ যেন স্ত্রৈণ না হন ; স্ত্রৈণ হইলে সর্বনাশ হয়।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮। গৃহস্থের পক্ষে পত্নীর সঙ্গ কি ভজনের অঙ্গ?

“গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গ কোন ভজনের অঙ্গ নয়। অতএব কেবল সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য তাহা নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকৃত হয়।”

—সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব, সং. তোঃ ৪।৬

৯। স্ত্রীভক্তগণের পক্ষে দুঃসঙ্গ কিরূপে বর্জ্যনীয়?

“স্ত্রীভক্তগণের পক্ষে বহিস্মুখ পতিসঙ্গ পরিবর্জ্যনীয়। বহিস্মুখ পুরুষকে পতি মনে করাই কষ্ট; কেন না, স্ত্রীসঙ্গক্রমে স্ত্রীত্ব লাভ হয়; তাহা বিত্ত-অপত্য-গৃহপ্রদ। সেই মায়া-পুরুষই বৃষভের ন্যায় আচরণ করত পতিত্ব অভিমান করিতেছে।”

—‘ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচার’, শ্রীভাঃ মঃ ১৪।৩৬, বঙ্গানুবাদ

১০। হরিভজনে জড়ভাব বিন্দুমাত্র প্রবেশ করিলে কি কুফল হয়?

“শুদ্ধবৈষ্ণবমতে পুরুষ সাধকগণ স্ত্রী-সাধক হইতে পৃথক্-মণ্ডলী হইয়া ভজন করিবেন এবং স্ত্রী-সাধকগণ কোন পুরুষকে তাহাদের ভজন-মণ্ডলীতে আসিতে দিবেন না। ভজন সম্পূর্ণ চিন্ময় কার্য্য, একটু জড়ভাব প্রবেশ করিলেই নষ্ট হয়।”

—‘সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব’, সং তোঃ ৪।৬

১১। কাহাদের সঙ্গ নিতান্ত ভক্তিবাদক?

“যাহারা যোষিৎসঙ্গী, তাহাদের সঙ্গ নিতান্ত ভক্তিবাদক।”

—সাধুনিন্দা, হঃ চিঃ

১২। ইচ্ছাপূর্বক স্ত্রীলোক দর্শনকারী বৈরাগীর প্রায়শ্চিত্ত কি?

“ভেকধারী বৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জন্মে নির্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ২।১৬৫

প্রতিষ্ঠাশা

১। কাপট্যের সহিত অশ্রু-পুলকাদি ভাবাধিকার-প্রদর্শনের মূল উদ্দেশ্য কি?

“অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লক্ষ্ম-বাম্প অকস্মাৎ,
মূর্ছাপ্রায় থাকহ পড়িয়া।

এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া।।”

—কঃ কঃ ‘উপদেশ’ ১৮

২। সর্বত্যাগ করিয়াও কি ত্যাগ করা যায় না?

“সর্বত্যাগ করিলেও ছাড়া সুকঠিন।

প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগে যত্ন পাইবে প্রবীণ।।”

—ভঃ রঃ ‘২য় যামসাধন’

৩। শঠগণ যে মহতের স্বভাব অনুকরণ করে, উহার উদ্দেশ্য কি? আনুকরণিক চেষ্টা কি স্থায়ী হয়?

“যাহারা শঠ, তাহারা নিজ-স্বভাবকে গোপন করিয়া মহতের স্বভাব অনুকরণ করত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেরূপ অনুকরণ স্থায়ী হয় না, দুই চারি দিবসের মধ্যে তাহাদের নিজ স্বভাবের পরিচয় দিতে অবশ্যই বাধ্য হয়।”

—‘বৈষ্ণব-স্বভাব’, সং তোঃ ৪।১১

৪। মৌখিক দৈন্যই কি প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগের প্রমাণ?

“যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন ‘বৈষ্ণব হইয়াছি’—এরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি,—‘আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই’, কিন্তু মনে মনে করি ‘শ্রোতৃগণ এই কথা শুনিয়া আমাকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা দান করিবেন!’ হায় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না!”

—‘প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জন’, সসঙ্গিনী সং তোঃ ৮।৩

৫। শান্তিকামী ব্যক্তিগণ সংসার ত্যাগ করিয়া কোন্ অনর্থে পতিত হয়?

“প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থলোকের অধিক হইবে বলিয়া শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করে; কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা বলবতী হইয়া উঠে!”

—‘প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জন’, সসঙ্গিনী সং তোঃ ৮।৩

৬। প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস সর্বাপেক্ষা হয় কেন?

“প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হয়। হয় হইলেও অনেকের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়ে।”

—‘প্রয়াস’, সং তোঃ ১০।৯

৭। কপট লোক প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করে?

“আচার্য্যের প্রিয়তা ও সাধুমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং কালনেমির ন্যায় কার্যোদ্ধারের আশায় ও মহোৎসবে সম্মান পাইবার জন্য অনেকেই কাপট্য স্বীকার করত ভাগবতী রতির অনুকরণে নৃত্য, স্বেদ, পুলকাক্র, গড়াগড়ি, কম্প এবং কখনও কখনও ভাব পর্য্যন্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে সাত্ত্বিক বিকার নাই।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৪

৮। নিজেকে ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া অভিমান করা দুষণীয় কেন?

“‘আমি ত’ বৈষ্ণব’,
অমানী না হব আমি।
এ বুদ্ধি হইলে,
প্রতিষ্ঠাশা আসি’,
হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥”

—কঃ কঃ ‘প্রার্থনা’, (লালসাময়ী) ৮

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো যাইতেছে যে, পত্রিকা-কার্যালয়ে কোনরূপ চিঠিপত্রাদি লিখিলে বা M.O. পাঠাইলে অবশ্যই গ্রাহক সংখ্যা (নম্বর) উল্লেখ করিবেন।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলেন,—পূর্বগুরু হইতে তিনি বেদান্ত বা বেদ-প্রতিপাদ্য-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছেন।

“আম্নায় প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাক্তিং,
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরে সাধনং শুদ্ধভক্তিং,
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্র স্বয়ং সং।।”
শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষুং পরতমমখিলান্নায়বেদ্যং চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষাস্তরিতমাঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষুং ভিষ্মলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ক্ষেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ।।”

শ্রীমন্নহাপ্রভুর বিচারে শ্রীহরিই পরতমতত্ত্ব, নিখিল আম্নায় হইতে বেদ্য। তিনি নিরাকার, নির্বিকার, জড়বৈশিষ্ট্যহীনমাত্র নহেন। তিনি পুরুষোত্তম বস্তু। ভগবদ্বস্তু এক—অদ্বিতীয়-অখণ্ড বিষু। তিনি আধিকারিক দেবতা নহেন। বহীশ্বরবাদী বিষুের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। শ্রীকৃষ্ণ, পরিমললেখক, অল্পর দীক্ষিত প্রভৃতি বিষুের সহিত তুলনায় শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিচার আনয়ন করিয়াছেন। মাণিক্যভাস্কর শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক। মানুষ জড়জগতে থাকাকালে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বিষুের পারতম্য স্থির করিতে পারে না। গুরুপাদপদে অবস্থানকালে তদীয় উপদেশবলে জড়ানুভূতির পরিবর্তে চিদানুভূতি উপস্থিত হইলে ক্রমে ঐ তত্ত্ব তাহার চিদিন্দ্রিয়ে স্ফুরিত হয়। শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে গুরু বা আচার্য্য হন। অক্ষজ অভিজ্ঞান পরিবর্তনযোগ্য। ভোগ্যের দর্শনে স্থৈর্য্যের অভাবহেতু পরিবর্তনশীলতা। সকল বেদের পূর্ণ তাৎপর্য্য একমাত্র শ্রীহরিতেই বর্তমান। অভাবগ্রস্ত মানুষের মেপে নেওয়া বুদ্ধিতে অগম্যই থাকে। কেবলবেদবেদ্য বা গুরোপদেশগম্য না হইলে প্রত্যহ নানা অবতারের আগমন অবশ্যসম্ভাবী হয়। দৃশ্য জগৎ মিথ্যা হইলে জাগতিক বস্তুসকলও মিথ্যা হয়—মন্ত্রগুলি ও বেদ মিথ্যা হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত বেদ বা মন্ত্র কদাপি মিথ্যা নহে। জগৎ নশ্বর হইলেও সত্য। ঈশ্বর অচেতন বা চেতন বস্তুর অন্তর্গত হইলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিমাণযোগ্য অক্ষজ হন, তদীয় অধোক্ষজ-ধর্ম্মের ব্যতিক্রম হয়; তাহাতে নাস্তিকতার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয়। জড়সম্ভোগবাদে চার্ব্বাক-মতাবলম্বী হইয়া আসুরবুদ্ধির প্রসারে বিশেষ সুযোগ ঘটে।

কস্মিণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।

বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।

ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুর পরিণাম আছে, এইগুলি তাৎকালিক। জীবের ঈশ্বর হইতে ভেদ আছে। কদাপি অভেদ নহে। জীব স্বাংশ নহে। বিভিন্নাংশ বলিয়া তটস্থা শক্তির পরিণামে জীবত্ব। বদ্ধজীব অচেতনের ভোক্তাভিমাত্রী। অচেতনমিশ্র চেতনকে নিজভোগ্য জ্ঞান করে। “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ-শ্রোতব্য নিদিধ্যাসিতব্যঃ।” পরমাত্মজ্ঞানই জীবকে মুক্তাবস্থায় স্থাপিত করে। মুক্তাবস্থায় মানব আত্মক্লীড় আত্মরতি ও ক্রিয়াবান্ হয়। তৃতীয় মুণ্ডকে বলেন,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদন্ত্যনশ্বন্নন্যোহভিচাক্ষীতি ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যামীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥

এইগুলিই জীবের ঈশ্বরের সহিত ভেদের প্রমাণ। ভগবানের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া মানুষ আপনাকে কর্তৃত্বে স্থাপনপূর্বক বদ্ধ ও পতিত হইয়াছে। ভেদ জগতের সহিত পৃথক্ হইবার ক্ষমতাই স্বাতন্ত্র্যের সদ্যবহার। জড়ের সহিত মিশিবার চেষ্টাই মায়াবাদ। জীবে ঈশ্বরবোধ (Pantheism)। ভেদ পাঁচপ্রকার—ঈশ্বরে জড়ে, জীবে জীবে; জীবে জড়ে; জড়ে জড়ে ও ঈশ্বরে জড়ে ভেদ। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বদ্ধভাব বা বিচ্ছিন্নভাব। মুক্ত হইলে ভোক্তার অভিমান নাশ পায়।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চামি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদন্তরাহ্মা ॥

জড়াভিমান ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর সেবাপরতায় জড়িত হওয়াই জীবের স্বভাব। মায়ার সহিত জড়িত হইয়া আমরা ভোগী হইয়া যাই। মায়া বহুৰূপিণী, একত্বনাশিনী, ভেদকারিণী। বস্তুবিকারবাদ ও পরিণামবাদ পৃথক্ বস্তু। শ্রীজীবগোস্বামী এই তত্ত্বের বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তটস্থা, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গর মধ্যবর্তিনী।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং নরৈঃ কৰ্ম্ম শুভাশুভম্ ।

সমস্ত জীবকে নিজ নিজ কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। কেহই কৰ্ম্মফল এড়াইতে সমর্থ নহে। কিন্তু একমাত্র গোবিন্দ-ভক্তিতেই সমস্ত কৰ্ম্মফলের অবসান। কোন জীবকে আর কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন,—

যস্ত্বিদ্রগোপমথবেদ্রমহো স্বকৰ্ম্মবন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি ।

কৰ্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মানুভূতি অনুপযোগী, নিত্যধর্মের বিরোধী। কিন্তু বিশ্বকে মিথ্যা বলা যায় না। সূর্য্য না থাকিলে কিরণ থাকে না। সূর্য্যশক্তির কিরণ দান। ঈশ্বরশক্তিই জীবতত্ত্ব। কিরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়; সূর্য্য বাধা পায় না। সূর্য্যের অপেক্ষা সমস্ত বস্তু ক্ষুদ্র বলিয়া সূর্য্য বিঘ্নপ্রাপ্ত নহে। আমাদের চক্ষুর অন্তরাল হইতে পারে। কৃষ্ণের শক্তিজাতীয় জীব জগৎ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব। তাহাদের তটস্থা শক্তিতে ভেদাভেদবিচার। “আন্নাযঃ প্রাহ” ইত্যাদি। “হরিচরণজুষঃ”—জীবমাট্রেই হরিভক্ত। কিন্তু সেবা-তারতম্যে তাহাদের তারতম্য।

“সুখের আশায়, এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।”

“আশা হি পরমং দুখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্ ॥”

জগতে ভোগের আশা অত্যন্ত দুখময়। অসুবিধার খবরতাকে আমরা সুখ মনে করি। তাহা ক্ষণিক। মুক্ত না হইলে একান্তভাবে অসুবিধা যায় না। জড়জগতের ভূমিকায় থাকিয়া অতন্নিসনবাদের বিবর্তোপ জগতের মায়াবাদ-বিচারকে সুবিধা মনে করি। ইহা ভ্রান্তিমাত্র। মায়ার প্রভুত্বাভিমাণে ভোগী হইয়া যাই। জড়বিদ্যার উন্নতি-বিষয়ে দুর্বুদ্ধি জন্মিয়া মানুষকে গাধা করিয়া দেয়।

জড়বিদ্যা যত,

মায়ার বৈভব,

শ্রীহরিভজনে বাধা।

মোহ জনমিয়া,

অনিত্য সংসারে,

জীবকে করয়ে গাধা।।

হরির পত্নী, পিতা, মাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, দাস, দাসী এই অবিরোধী নিত্যচেতন
বস্তুগুলির সেবাই হরিচরণসেবা।

ঈশ্বরের আদেশেই শঙ্কর ব্রাহ্মণবেশে মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন,—

অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।

মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।।

আবার পদ্মপুরাণেও শ্রীমহাদেব নিজবাক্যে বলিয়াছেন,—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।

মইয়ৈব কল্লিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা।।

ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নিগুণং বক্ষ্যতে ময়া।

সর্বস্বং জগতোহপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে।।

বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকম্।

মইয়ৈব বক্ষ্যতে দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ।।

শিবপুরাণে ভগবদ্বাক্যে আলোচ্য,—

দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু।

স্বাগমৈঃ কল্লিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।।

কেবল অক্ষজ উত্তানপথে শঙ্করের মায়াবাদ-আশ্রয়ে কতকগুলি মানুষ নিজেদের
সর্বনাশ করিতে দৌড়াইতেছে। অসুর-মোহনের নিমিত্ত কল্লিত ব্যাখ্যা হইতে জগতে
পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি ছলনাপূর্ণ পন্থার প্রচার হইয়াছে।

নেহ যৎ কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।

ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্মপি মৃতো হি সঃ।।

জীবন্মৃত অবস্থায় অনেকেই আছেন। চেতনমাত্রেই হরিভক্ত। জীবন না থাকিলেই
ভোগী। চিৎ—সেবোন্মুখতায়ুক্ত শক্তিবিশেষ। সেবাবিমুখ ভোগী বা ত্যাগী অচিৎপর্য্যায়
গণনীয়। প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক, নিন্দুক, পাষণ্ডী, কস্মিনিষ্ঠগণ ‘শব’ পদবাচ্য। কস্মী ধর্ম্মের জন্য
কার্য্য না করিলে শব। ধার্ম্মিক যদি বিরাগী না হয় তবে মৃত। বৈরাগ্য যদি ভগবৎসেবার
জন্য সম্পাদিত না হয় তবে তদনুষ্ঠানকারী মৃত, অতএব ‘শব’-শব্দে অভিধেয়। ভক্তিসাহিত্যে
চিৎ-শব্দের অর্থ সেবোন্মুখতায়ুক্ত শক্তি। শ্রুতি কেবল মুকুন্দ-সেবাই স্বীকার করেন। হরিচরণ
প্রাকৃত বা মাতৃকুক্ষিজাত নহে।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।

বিষ্ণু নিন্দা নাহি আর ইহার উপর।।

মায়াবাদীদের মত,—“সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।” কাল্পনিক অনিত্য
রূপের কল্লিত উপাসনায় অন্ধতামস লাভ ব্যতীত শ্রেয়োলাভের আশা কোথায়? হরিহর-

বিরিঞ্চির জননী প্রকৃতি ; ইহাই মায়াবাদ । ইহজগতে থাকিয়া হরিসেবার অযোগ্যতা হয়, অতএব উহা ত্যাজ্য, এরূপ বিচারও অযৌক্তিক ।

“প্রাপঞ্চিকতয়াবুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তনঃ ।

মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফলু কথ্যতে ॥”

মায়াবাদী তুলসীপত্র দিয়া ঈশ্বরে নিবেদন করেন না । কিন্তু কণ্ঠে তুলসীমাল্য ধারণ, ভগবন্নিবেদ্যপাকে তুলসীকাষ্ঠের ব্যবহার, তুলসীপত্রে ভোগের নিবেদন কার্য্যই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জনক । তদীয়াশ্রয় ব্যতীত ভগবৎসেবা হয় না । তুলসী বৃক্ষ নহেন—সখীর দাস্যে অবস্থিত । তাঁহাকে গাছ বা পাতা মনে করিবার দুর্ব্বুদ্ধি মায়াবাদ । তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্ম মনে করিয়া ভগবানে দণ্ডবৎ-প্রণতি করেন না । শাস্ত্রে বলেন,—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।

যন্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচ্চিচ্ছনৈষু ভিজ্জেষু স এব গোখরঃ ॥

এরা সব গো-গর্দভ—মূর্খ ভারবাহী নারকীমাত্র । ‘রহুগণৈতত্তপসান জাতি ন চেজ্যয়া নিৰ্ব্বাপণাদ্গৃহায়া । ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যে বিনা মহৎপাদরজোহভিষেকম্ ॥’ অবধূত ভরত মহাশয় রহুগণকে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন,—বাসুদেবতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব, অপ্রাকৃত, ইহা পাইতে হইলে বাণপ্রস্থ, বৈদিকদেবার্চনাদিকৰ্ম্ম, সন্ন্যাস, গৃহমেধযজ্ঞ, বেদভ্যাস বা জল-অগ্নি-সূর্য্যাদির উপাসনা একান্ত নিরর্থক । কেবল মহাজনের পাদরজে অভিষিক্ত হইতে পারিলেই মুকুন্দসেবার অধিকার হয় । ব্রজধামের তৃণ, গুল্ম, কীটাদি যাবতীয় বস্তুই নিত্য চিদানন্দময় এবং লীলার অনুকূল । ব্রজ মাটি নহেন । মাটিয়া-বুদ্ধিতে সৰ্ব্বনাশ । নামাশ্রয়ে অনর্থনিবৃত্তিক্রমে উৎক্রান্ত দশায় সাধনভক্তি-প্রভাবে মেটে-বিচারের হাত হইতে মুক্তি ঘটে । তখন এই সমস্তকে চিন্ময় জ্ঞান হইবে । ভাবভক্তির উদয়কাল পর্য্যন্ত বৈধীভক্তির সুষ্ঠু যাজন আবশ্যিক । সাধনভক্তির প্রাবল্য চিরদিনই রক্ষা করিতে হইবে ।

যেহন্যেহ রবিন্দাঙ্ক বিমুক্তমানিনস্ত্রয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং তত পতন্ত্যধোহনাদৃতযুতদগুণয় ॥

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বন্ধসৌহৃদাঃ ।

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূৰ্দ্ধসু প্রভো ॥

মুক্তাভিমানীর অধঃপতন এবং ভক্তিপথে বিচরণে অভিলাষী জনের ভগবদ্রক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ উচ্চতর সোপানে আরোহণ অবশ্যস্তাবী । সাধনভক্তি আরম্ভ করিয়া ভক্তাভিমান ‘আমি ত’ বৈষ্ণব’ এইরূপ বুদ্ধি হইলে নিপতিত হইতে হইবে । বৈষ্ণবের কদাপি শিষ্য থাকে না । তাঁহার সর্বত্রই গুরু । গুরু না থাকিলে দাস্যের শিক্ষা থাকিবে না । বৈষ্ণব কখনও গুরুর কার্য্য করেন না । সর্বদা তাঁহাদের হৃদয়ে শিষ্যাভিমানই প্রবল থাকে । গুরুর পরিচয় শিষ্যাভিমানীর শিষ্যত্বাভিমান । গুরুদেবের অপ্রকটলীলায় হরিনামের জন্য গুরুশিষ্য অনুবন্ধ । ‘মন্ত্রাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদগুরুঃ শ্রীজগদগুরুঃ ।’

গোস্বামী জগতের কর্তা । গোদাসগণ লোকের নিন্দাভয়ে আপনাদিগকে গোস্বামী পরিচয় দেন । হরিচরণ কি ? ইহা কেবল রূপক নহে । হরির প্রাকৃত চরণ নাই, হরিবিমুখের নিকট প্রাকৃত চরণ—অপ্রাকৃত চরণ আবৃত থাকে । ‘রূপচিত্তামণি’ গ্রন্থে হরিচরণের পরিচয়

আছে। সেই চরণ হইতে গঙ্গাদির ক্ষিতিপাবন ধারা প্রবাহিত। গঙ্গাস্নানে গঙ্গাদ্বারা সেবা করাইয়া লওয়া ভোগীর বিচার। ‘মায়া’-শব্দের অর্থও গঙ্গা হয়।

অপ্রাকৃতির অনুভূতির জন্য বত্ন করিতে হইবে। হরিজন নিষ্কিঞ্চন। মানুষ তাঁহাদিগকে কিরূপে দয়া করিবে? তাঁহারা ত’ কাহারও দয়ার প্রার্থী নহেন। তাঁহাদিগকে দয়াপাত্র জ্ঞান করা বৈষম্য-বিদ্বেষ।

অনর্থ

যাহা অর্থ নহে, তাহাই অনর্থ; অর্থাৎ অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দই ‘অনর্থ’। যেক্ষেত্রে অর্থ পরমার্থকে লক্ষ্য করে না, সেইক্ষেত্রে অর্থ অনর্থের মূল। অর্থ বা পরমার্থ হইল বাস্তববস্তু ভগবান্ শ্রীহরি, আর মায়া হইল অনর্থ। অনর্থ বস্তুপ্রতিম হইলেও অবস্তু এবং অর্থ লাভের প্রধান বাধক। অন্যাভিলাষ, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, স্বসুখবাঞ্ছা প্রভৃতি সবই অনর্থ। জীবের নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহাই ভগবৎসেবার প্রধান অন্তরায় এবং সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক অনর্থ। ইহাতে নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎস্মৃতি প্রতিহত হয় এবং অন্য চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইয়া কৃষ্ণের ভোগ্য মায়িক বস্তুরই পশ্চাদনুধাবন প্রবৃত্তি ঘটায়। অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গ, কুটীনাটী, বহিস্মুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়, তাহাতে বিশুদ্ধ ভজনের সম্ভাবনা নাই। অসৎসঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা হয়, তাহাতে অসদ্বিষয়ে আসক্তি প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ ভজনের ব্যাঘাত ঘটায়। যদি ভগবৎপ্রেম-সম্বন্ধ না তাকে, তবে দীর্ঘায়ু ও রোগশূন্যতা কেবল অনর্থের মূল হয়। অনর্থই ভগবানের সঙ্গে আমাদের বিরাট ব্যবধান রচনা করিয়াছে।

ভগবানের ইন্দ্রিয়তোষণ ছাড়িয়া নিজের ইন্দ্রিয়তোষণচেষ্টায় কেবল জড়সুখ ও নিরানন্দ মাত্রই হয়। ভোগ ও মোক্ষের ইচ্ছা হইলে ভগবানকে বঞ্চনা করা হয় মাত্র, তৎফলে নিজেই বঞ্চিত হইয়া যায়। ভগবদ্ভক্তির উদয় না হইলে হয় ভোগ নতুবা ত্যাগ হয়। যাহারা ভুক্তি-মুক্তি চাহেন, তাহারা কোনপ্রকারেই ভগবানের কথা বুঝিতে পারে না। লোক সুখ আশা করে, কিন্তু পরিবর্তে সর্বদা দুঃখ পাইয়া থাকে। ভোগবাসনা লইয়া মরিলে ভোগীর ঘরে জন্ম হইবে। অহো, কৃষ্ণভোগে জীবসকল কতই না বাধা দিতেছেন। সংসারের অধিকাংশ লোক অপস্বার্থে—ইতর কার্যে নিযুক্ত—বালক খেলায়, যুবক সংসার-ধর্ম্মে এবং বৃদ্ধ সম্পত্তি ও দেহরক্ষার জন্য অনুক্ষণ যত্ন করেন, তাহাতে নিত্যস্বার্থে উদাসীনতা দেখা যায়। জগতের লোক জাগতিক স্বার্থ সংগ্রহের নিমিত্ত নিত্যস্বার্থে উদাসীন—ইহা কি দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয়!

বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে—তিনি তাঁহার অমূল্য জীবন নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যয় করেন। ভগবদ্ভুক্ত সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। তিনি ক্ষণকালও নষ্ট না করিয়া ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সকলপ্রকার চেষ্টা করেন। অনর্থমুক্ত ব্যক্তিগণই শুদ্ধভক্ত। অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণসেবার আবরণে ভক্তির ছলনায় যে দৌরাভ্য প্রকাশ করেন, তাহা তাহাদের ভগবানকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টামাত্র; উহাকে কখনও ভক্তি বলা যাইতে পারে না। সেই অপরাধিগণের

সঙ্গপ্রভাব সেবারত চিন্তে যাহাতে বিক্রম প্রকাশ করিতে না পারে তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন অবশ্যই প্রয়োজন। এই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত ভজনের অনুকূল বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্ত উপদেশ-বাক্যদ্বারা আমাদের ভোগানর্থ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেন।

স্বরূপভ্রান্ত মানব জড়জগতে ভোগি-সূত্রে যাহা প্রয়োজন বোধ করেন, সে-সকলই দুঃখপ্রদ। তজ্জন্য জাগতিক-বিচারে যেগুলি প্রয়োজন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঐগুলিকে অপয়োজনীয়-জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। মানবগণের অর্থের (পরমার্থ নহে) উপার্জন ও বর্ধন-বিষয়ে মহাপ্রয়াস, ব্যয়ে ত্রাস, রক্ষণ ও উপভোগে চিন্তা এবং বিনাশে ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে প্রয়োজনবোধক যে-সকল দ্রব্য ‘অর্থ’ বলিয়া নির্ণীত হয়, তাহা ভাগবতে (১১।২৩।১৮-১৯) উক্ত হইয়াছে,—

স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্বঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ।

ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্কো ব্যসনানি চ॥

এতে পঞ্চদশানর্থ্য হ্যর্থামূল্যমতা নৃণাম্।

তস্মাদনর্থমর্থ্যখ্যাং শ্রেয়োহর্থী দূরতন্ত্যজেৎ॥

“চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যাবাক্য, দম্ব, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, গর্ব, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্ক, স্ত্রী-বিষয়ক ব্যসন, দ্যুত-বিষয়ক ব্যসন ও মদ্য-বিষয়ক ব্যসন—মানবগণের অর্থহেতু এই পঞ্চদশ প্রকার অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। কল্যাণকামী মানবসমূহ দূর হইতে অর্থ-নামক এইসকল অনর্থকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।” আয়াস, চিন্তা, ত্রাস ও ভ্রম—এই চারিটি লইয়া মোট ঊনবিংশতি অনর্থের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। যে অর্থ কেবলমাত্র অনর্থের সৃষ্টি করে, সেই অর্থকে শাস্ত্র বিচার দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

ধনানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে।

দানে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ॥

“ধনের অর্জ্জনে ও রক্ষণে ক্লেশ এবং দানে ও ব্যয়ে দুঃখ, অতএব ক্লেশের উৎপত্তিকারী অর্থকে ধিক্।”

সংসারী লোকদিগের মায়াভোগরূপ পৌরুষই তাহাদের অনর্থ। আশ্রয়-সূত্রে দুর্দৈব বা আরোপিত অনর্থ চারিপ্রকার পাওয়া যায়। যথা,—

মায়ামুগ্ধস্য জীবস্য জ্ঞেয়োহনর্থচতুর্বিধঃ।

হৃদৌর্বল্যঞ্চাপরাধোহসত্ত্বশ্চ তত্ত্ববিভ্রমঃ॥

মায়াবদ্ধ জীবের জ্ঞাতব্য অনর্থ চতুর্বিধ,—(১) স্বরূপভ্রম বা তত্ত্ববিভ্রম, (২) অসত্ত্বশ্চ, (৩) অপরাধ ও (৪) হৃদয়দৌর্বল্য।

মায়ামুগ্ধ জীবের অনর্থ চতুষ্টয়।

অসত্ত্বশ্চ, হৃদয়দৌর্বল্য বিষময়।।

অপরাধ, স্বরূপবিভ্রম—এই চারি।

যাহাতে সংসার বন্ধ বিপত্তি বিস্তারী।। (ভজনরহস্য)

‘আমি শুদ্ধ, চিত্তকণ, কৃষ্ণদাস’—ইহা ভুলিয়া স্ব-স্বরূপ হইতে বদ্ধজীব দূরে অবস্থান করিলে সেই স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তিই জীবের প্রথম অনর্থ, যাহাকে স্বরূপভ্রম বা তত্ত্ববিভ্রমরূপে

চিহ্নিত করা হয়। মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব সত্ত্বরজস্তুম এই ত্রিগুণাত্মক জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ, মন ও বুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্তৃত্বাদিমূলে সংসার-ব্যসন লাভ করে। পরমেশ্বর হইতে চ্যুত হইয়া জীবের স্মৃতি বিপর্যায় ঘটিয়াছে। চ্যুত হইয়া মায়াগুণরূপ দ্বিতীয় বিষয়ে অভিনিবেশবশতঃ দেহাত্মাভিমানজনিত ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। স্বরূপভ্রম বা তত্ত্ববিভ্রম চারিপ্রকার,—

স্বতত্ত্বে পরতত্ত্বে চ সাধ্যসাধনতত্ত্বয়োঃ।

বিরোধি-বিষয়ে চৈবতত্ত্বভ্রমশ্চতুর্বিধঃ।। (আত্মায়-সূত্র)

তত্ত্বভ্রম চতুর্বিধ—স্বতত্ত্বে ভ্রম, পরতত্ত্বে ভ্রম, সাধ্য-সাধন-তত্ত্বে ভ্রম ও ভজনের বিরোধি-বিষয়ে ভ্রম।

জড়বস্তুতে অহং মমাদি বুদ্ধি করিয়া অসৎ বিষয়-সুখাদির তৃষ্ণাকে অসত্তৃষ্ণা বলে। মনুষ্যাগণ জন্ম হইতেই স্বভাবতঃ স্বীয় অনর্থকর পশ্বাদি কাম্যবিষয়, আয়ু, ইন্দ্রিয়, বল, বীর্যাদি এবং পুত্রাদি বিষয়ে আসক্তচিত্ত হইয়া থাকেন। স্বপ্নে যেরূপ সর্পদংশনাদি মিথ্যা বিষয়ের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ বস্তুতঃ বিষয়ের সত্তা না থাকিলেও বিষয়চিন্তানিবন্ধন পুরুষের মিথ্যা সংসার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল বলদেব প্রভু শ্রীকৃষ্ণিণী দেবীকে লক্ষ্য করিয়া জীবকুলকে বলিয়াছেন,—

যথা শয়ান আত্মানাং বিষয়ান্ ফলমেব চ।

অনুভুক্তৈহপ্যসত্যর্থৈ তথাপ্নোত্যবুধো ভবম্। (ভাঃ ১০।৫৪।৪৮)

“স্বপ্নপদার্থ অসত্য হইলেও নিদ্রিত ব্যক্তি যেরূপ তন্মধ্যে উহাদিগকে ভোগ্যবিষয়, নিজকে ভোক্তা এবং ভোগজন্য সুঃখদুঃখাদি ফল অনুভব করেন, সেইরূপ আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিও সংসার দশা প্রাপ্ত হন।” স্বপ্নদৃষ্ট সর্পাদি অসত্য হইলেও জাগরণ ব্যতীত উহা যেমন দুঃখদই হইয়া থাকে, তদ্রূপ অবিদ্যা বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি ব্যতীত অবিদ্যার কার্য্য— দুঃখপ্রদ বিষয় বা অনর্থের নিবৃত্তি হয় না। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা—এই তিনপ্রকার অসত্তৃষ্ণার কথা পাওয়া যায়। আত্মায়-সূত্রানুসারে অসত্তৃষ্ণা চতুর্বিধ।

ঐহিকেষুেষণা পারত্রিকেষু চৈষণাহশুভা।

ভূতিবাঞ্ছা মুমুক্ষা চ হ্যসত্তৃষ্ণাশ্চতুর্বিধাঃ।।

“ঐহিক বিষয়ে এষণা অর্থাৎ ইচ্ছা বা অন্বেষণ, পারত্রিক বিষয়ে অশুভা এষণা, যোগ-বিভূতি বাঞ্ছা ও মোক্ষ কামনা—এই চতুর্বিধ অসত্তৃষ্ণা।”

অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ না করিলে নামের ফল লাভ করা সম্ভবপর নহে। হরিনাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং রোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয় না, বুঝিতে হইবে তাহার হৃদয় পাষণসদৃশ কঠিন অর্থাৎ কঠিন নামাপরাধদ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে, নামে গলিত হয় না। নিরপরাধে নাম লইলে তবেই দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ হয়। নামাপরাধ দশবিধ। বত্রিশপ্রকার সেবাপরাধ কৃষ্ণস্বরূপে অপরাধের মধ্যে গণ্য। আত্মায়-সূত্রে চতুর্বিধ অপরাধের কথা পাওয়া যায়,—

কৃষ্ণনামস্বরূপেষু তদীয় চিৎকণেষু চ।

জ্ঞেয়া বুধগণৈর্নিত্যমপরাধাশ্চতুর্বিধাঃ।।

“কৃষ্ণজ্ঞানমে অপরাধ অর্থাৎ নামাপরাধ, কৃষ্ণস্বরূপে অপরাধ অর্থাৎ সেবাপরাধ, তদীয় অর্থাৎ ভক্তের চরণে অপরাধ ও ভক্ত ব্যতীত অন্য চিৎকণ জীবে অপরাধ—এই চতুর্বিধ অপরাধ।”

হৃদয়দৌর্বল্য হইতে শোকাদির উদ্ভব। হৃদয়দৌর্বল্যবশতঃ অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। অসৎকার্য্যে বা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে, তাহাতে বিশুদ্ধ ভজন হয় না। সংসারে থাকিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক হরিভজন করিবার ছলনায় দেহের আরামপ্রিয়তা ও স্ত্রী-পুত্রাদিতে অত্যন্ত আসক্তি হৃদয়দৌর্বল্যতার পরিচায়ক। হৃদয়দৌর্বল্যবশতঃ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বাণপ্রস্থী হরিভজনের ছলনায় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির আশায় মুগ্ধ বা প্রভুত্ব কামনায় অভিভূত হইয়া থাকেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন বা বিদ্যাভ্যাস করিবার ছলনায় মানবের জড়বিদ্যার মোহে মুগ্ধ হওয়া প্রভৃতি হৃদয়দৌর্বল্যতা হইতে জাত। হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করত ভজনে উৎসাহপ্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই বিশুদ্ধ ভজনের সহায়ক। নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিলে অমিশ্রা শুদ্ধাভক্তি জীবের হৃদয়ে কখনও উদ্ভিত হইবে না। হৃদয়দৌর্বল্য চারিপ্রকার,—

তুচ্ছাসক্তিঃ কুটীনাটী মাৎস্যং স্বপ্রতিষ্ঠতা।

হৃদৌর্বল্যং বুধৈঃ শ্বশ্বজ্জ্যেয়ং কিল চতুর্বিধম্ ॥

“তুচ্ছ অর্থাৎ কৃষ্ণের বিষয়ে আসক্তি, কুটীনাটী অর্থাৎ কপটতা, মাৎস্য অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা ও প্রতিষ্ঠাশা—পণ্ডিতগণ-কর্তৃক সর্বদা জ্যেয় চতুর্বিধ হৃদৌর্বল্যের কথা পাওয়া যায়।”

চারিপ্রকার অনর্থ—অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের নৈসর্গিক ফল। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা ঐ সকল অনর্থ দূরীভূত হয়। যাঁহাকে স্বয়ং ভয়ও ভয় করে, সেই শ্রীহরির নাম ঘোর সংসৃতিতে বিপন্ন হইয়া বিবশতার সহিত যিনি উচ্চারণ করেন, তিনি সদ্য সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। বদ্ধজীবের অনর্থগুলি মেঘের ন্যায় নামসূর্য্যকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক অন্ধকার করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু নামসূর্য্য অত্যন্ত বৃহদ্বস্ত, অতএব তাঁহাকে আচ্ছাদন করা যায় না, বস্তুতঃ বদ্ধজীবের চক্ষুই অনর্থদ্বারা আচ্ছাদিত হয়। কৃষ্ণানুশীলন যে পরিমাণে হইতে থাকে, সাধনভক্তিতে সেই পরিমাণই অনর্থসকল নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যতদিন জীবের সংসার-সুখের আশা ক্ষয়োনুখ না হইয়া পড়ে, ততদিন কোনক্রমেই তাহাদের ভগবদুন্মুখতার উদয় হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত তত্ত্বে শুদ্ধরতির উদয় হয় না, ততদিন বিষয়তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না, সুযোগ পাইলেই বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গুলি ধাবিত হয়।

যোগাদি অন্যান্য পন্থায় প্রত্যাহার, যম, নিয়ম, বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয়ের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা উদ্ব্বেগরহিত উপায় নয়, তাহাতে পতনের আশঙ্কা রহিয়াছে এবং তদ্বারা চরমে শুভলাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই উদ্ব্বেগরহিত উপায়। অনর্থগুলি যতই দূরীভূত হয়, মায়িক দশা ততই তিরোহিত হয়। মায়িক দশা যে পরিমাণে তিরোহিত

হয়, জীবের স্বরূপ সেই পরিমাণে উদিত হইতে থাকে। অক্ষজের সেবা ছাড়িয়া অধোক্ষজের সেবায় নিয়োজিত হইলেই অনর্থের উপশান্তি হয়। হরিভজন না করিলে জীব কন্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হইয়া পড়ে। যথাসাধ্য সংখ্যা নিব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম কীর্তন করিলে অনর্থনিবৃত্তি হয়; জাড্য, আলস্য প্রভৃতি দূরীভূত হয়। নিরপরাধে শ্রীহরিনাম গৃহীত হইলে সকল অভীষ্টই করতলগত হয়।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

কৃষ্ণ-দয়াময়

কৃষ্ণ-দয়াময়, প্রপঞ্চ উদয়,
জীব উদ্ধারিতে হন।
চিত্ত স্থির করি', ভজহ শ্রীহরি,
হ'য়ে ভাই একমন।।
ভক্তজন তরে, সব পরিহরে,
এমত কেহ না হয়।
ভাগবত কণ, ভক্ত প্রাণধন,
ভক্তপাশে সদা রয়।।
কাকুতি করিয়া, পরাণ ভরিয়া,
কৃষ্ণ বলি' যদি ডাকে।
সেইকালে হরি, আসি ত্বরা করি',
উদ্ধারেন তা'রে বিপাকে।।
অসময়ে হায়, কেহ নাহি রয়,
ভাই বন্ধু আছে যত।
এক হরি বিনা, আর ত' দেখি না,
রক্ষা করেন অবিরত।।
হরিদাস কয়, কেন যে বৃথায়,
কাটানু জীবন হায়।
শ্রীকৃষ্ণচরণ, ভজ অনুক্ষণ,
ভবভয় দূরে যায়।।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

দুর্গা

দুর্গা-শব্দের অর্থ বহুপ্রকার দৃষ্ট হয়। দ+উ+ র+গ+ আ=দুর্গা। দৈত্যনাশার্থ বাচক বলিয়া ‘দ’কার, বিঘ্ননাশার্থে ‘উ’কার, রোগঘ্ন বাচক ‘রেফ্’, পাপঘ্নবাচক ‘গ’কার, ভয়শত্রুবিনাশবাচক ‘আ’কারের প্রয়োগ। আবার অন্যত্র—“দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা পরিকীর্তিতা। বিপত্তিবাচকো দুর্গাশ্চাকারো নাশবাচকঃ।।” পুনরায় চণ্ডীতে দেবস্তুতি,—দুর্গাসি দুর্গভবসাগর নৌরসঙ্গা।।”—অর্থাৎ তোমার নাম দুর্গা, কারণ তুমি দুর্গন ভবসাগরে অদ্বিতীয় নৌকাস্বরূপা। পুনরায়—‘দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ’—দুর্গ অথাৎ সঙ্কট হইতে যিনি ত্রাণ করেন। পুনরায় চণ্ডীতে দেবীবাচ্য,—

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।

দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।।

‘দুর্গ’ নামক অসুরকে বধ করিব বলিয়া আমি ‘দুর্গা’-নামে বিখ্যাত হইব।

আবার অন্যত্র দেখা যায় ‘দুর্গ’-শব্দের অর্থ কারা বা জীবের সংশোধনক্ষেত্র। তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা নামে অভিহিতা।

চণ্ডী পাঠে জানা যায় যে, দেবতাবৃন্দের স্থানচ্যুতি বিজ্ঞাপিত হইলে মধুসূদন ও শঙ্কু কুপিত হইলেন; তখন তাঁহাদের বদন হইতে একটি তেজঃ নির্গত হইল, অন্যান্য দেবতাগণের শরীরের তেজঃপুঞ্জ একত্রে মিলিত হইয়া সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা আবির্ভূতা হইলেন। বিষ্ণুর তেজে দেবীর বাহুযুগল এবং শঙ্কুর বদননিঃসৃত তেজে দেবীর মুখমণ্ডল হইল। সেই দুর্গাদেবী দেবীধামে (চৌদ্দভুবনাত্মক জড়জগতে) দশকৰ্ম্মরূপ দশভুজা। ধীরপ্রতাপে অবস্থিতিরূপ সিংহবাহিনী। পাপ দমনরূপ মহিষাসুরমর্দিনী। শোভা ও সিদ্ধিরূপ কার্ত্তিক ও পুত্রযুগলসমষ্টি গণেশ জননী। জড়ৈশ্বর্য ও জড়বিদ্যা সঙ্গিনীরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতী-সহ বিরাজিতা। পাপনিবারণে বিংশতি ধৰ্ম্মশাস্ত্ররূপ বিংশতি অস্ত্রধারিণী। সিদ্ধান্তগ্রন্থ শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা দুর্গাদেবীর স্বরূপ বিচারে বলেন,—

“সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।

ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।”

ভগবানের স্বরূপশক্তি একটীই। তাহাকে উপনিষদে পরাশক্তি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেই স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপ প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধিকা মায়াশক্তিই ভুবনরক্ষয়িত্রী দুর্গা। সেই দুর্গাদেবী যে আদিপুরুষ গোবিন্দের ইচ্ছাবিধায়িনী, সেই মূলপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশসমুদ্ভূত রাজ্যভ্রষ্ট সুরথরাজা ও স্বজনপরিত্যক্ত সমাধি নামক বৈশ্যের সময় হইতে ইঁহার পূজা ধরাধামে প্রচলিত হইয়াছে। রাজা দেবীর আরাধনায় পুনরায় রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং দেবী নির্বিঘ্নচিত্ত বৈশ্যকে জ্ঞান লাভ হইবে বলিয়া বর প্রদান করিলেন। সৌরাশ্বিন মাসে অকালে রামচন্দ্র রাবণবধার্থে ব্রহ্মা দ্বারা দেবীর বোধন করাইয়া দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া যে পূজার প্রথা জগতে প্রচলিত আছে, তাহা মহামুনি বাস্মীকি-কৃত মূল রামায়ণের কোনও কাণ্ডে পাওয়া যায় না। কথকতা শুনিয়া

কবি কৃতিবাস যে বাঙ্গলা পয়ার ছন্দে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন তাহাতেই ঐ বিষয় দৃষ্ট হয়। কৃতিবাসের স্থান বাঙ্গলা সাহিত্যিক জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহার পুরাণ কল্পিত সিদ্ধান্ত দেখিয়া সারগ্রাহিগণ পরমার্থ জগতে তাঁহাকে উচ্চস্থান দিতে পারেন না। তিনি তাঁহার রামায়ণে বিষুণের অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় সাজাইয়াছেন। ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দেবসেবিত বিষুণ, বিষুণমায়া তাঁহার আঞ্জাবাহিকা। দ্বিতীয়তঃ জড়মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া, তাহার কার্য্য প্রাকৃত বিমুখ জীবের উপর সম্ভব। অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামে ভগবল্লীলার পোষকতাকল্পে যোগমায়ারই কার্য্য। তটস্থশক্তিপ্রসূত অণুচিৎ বিভিন্নাংশ জীবগণ অনাদিবহির্মুখতা-প্রযুক্ত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে যে প্রাপঞ্চিক জগতে পতিত কারারুদ্ধ হন, তাহাই দেবীধাম বা দুর্গাদেবীর দুর্গ। পতিত অপরাধী জীবকে কারারক্ষয়িত্রী দুর্গাদেবী কয়েদীর পোষাকের ন্যায় দুইটি আবরণে আবৃত করিয়া থাকেন। একটি মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মশরীর, লিঙ্গদেহ বা বাসনাময় কোষ, অপরটি বাসনাময় দেহের সহায়কস্বরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ। এই দুইটি পোষাকে পরিহিত হইলে জীবের শুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপ সুপ্ত হইয়া পড়ে। তখন চিদাভাস মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহে নানাপ্রকার অভিমান উপস্থিত হয়। কখনও মনুষ্য, কখনও পশুপক্ষী প্রভৃতি বলিয়া অভিমান, কখনও পুরুষ, নারী, রাজা, প্রজা, পিতা, পুত্র, সুখী, দুঃখী —এইরূপ নানাপ্রকার অভিমান উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপে বিরূপজ্ঞানের বশবর্তী হইয়া মায়াভিনিবিষ্ট জীব নিজকে শোকে-মোহে আচ্ছন্ন এবং অভাবগ্রস্ত মনে করে। তখনই ঐ কারাকর্ত্রীর নিকট ধন, জন, পুত্র, পৌত্র, রূপবতী ভার্যা, যুদ্ধে জয়লাভ ইত্যাদি কামনা করিয়া থাকে। কখনও সুখ-দুঃখবোধের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অচিৎ হইয়া যাইতে চায়, কখনও বা জড়ীয় সুখ-দুঃখকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে জড়-ব্যতিরেক সুখলাভের আশায় ভগবানের আসন নিতে অগ্রসর হয়। দুর্গাদেবীও তাহাদিগের কামনা অনুযায়ী ধনজনাদি প্রদান করিয়া কস্মৎচক্রে নিষ্ক্ষেপ করেন, কখনও বা তাহাদের আত্মবিনাশরূপ ভগবদৈমুখ্যের দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা সুকৃতিবান্, তাহারা এসকল ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাকে মহামায়ার কপট কৃপা জানিয়া বিষুণমায়ার সৎস্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করেন, লিঙ্গ এবং স্থূলদেহের বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইয়া নিত্য ভাগবতী তনু লাভ করেন ও স্বরূপদেহে চিচ্ছক্তি হ্লাদিনীর সেবার পোষকতা করিয়া থাকেন।

স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপ দুর্গাদেবীর কার্য্যই বিমুখ-মোহন। সুতরাং কস্মৎফলভোগী ও কস্মৎফলত্যাগী বহির্মুখজনগণ-কর্তৃক জগতে যে দুর্গাদেবীর আবাহন হয় তাহা ভগবানের চিন্ময়ধামে বিরাজিতা চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী যোগমায়া দুর্গার ছায়ামাত্র। ভগবানের পীঠাবরণ-পূজায় যে দুর্গা-গণেশ প্রভৃতি দেবতা আছেন তাহারা নিত্য বৈকুণ্ঠ-সেবক। তাহারা ভগবানের স্বরূপভূত শক্তি, কিন্তু জড়জগতে পূজিত দুর্গা-গণেশাদি দেবতা মায়াশক্ত্যাশ্রক। ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠ-সেবিকা যোগমায়াই ভগবৎ-সেবা-প্রার্থিনী ব্রজরাজকুমারীগণ-কর্তৃক পূজিতা। সেই পূজায় কেবল ভগবৎপ্রীতি-কামনা। নিজের ফলভোগ বা ফলত্যাগ-কামনা নাই। যে-সকল অতাত্ত্বিক অসারগ্রাহী ব্যক্তি ব্রজকুমারীগণের কাত্যায়নী-অর্চন-ব্রতের দোহাই দিয়া নিজ নিজ ভুক্তি-মুক্তি-কামনামূলক ছায়াশক্তির কল্পিত মূর্তির পূজাকে সমর্থন করিতে প্রয়াসী,

তঁাহারা কাত্যায়নীর চরণে, ব্রজকুমারীগণের চরণে এবং শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ করিয়া থাকেন। ব্রজকুমারীগণ কি প্রাকৃত বদ্ধজীব? তঁাহারা কি প্রাকৃত জড়দেশবাসী? তঁাহাদের দেহ কি জড়দেহ? তঁাহাদের কামনা কি বদ্ধজীবের কামনার তুল্য? কিছুতেই নহে। তঁাহারা ভগবানের স্বরূপশক্তি হলাদিনীর কায়বুহ, তঁাহাদের ধাম চিন্ময়, দেহ চিন্ময়, কৃষ্ণপ্ৰীতি-কামনাই তঁাহাদের কামনা। তঁাহাদের প্রেমের আদর্শ এইরূপ।—

লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম কর্ম।

লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ—আত্মসুখ-মর্ম।।

দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।

স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভৎসন।।

সর্বব্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।

কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম সেবন।।

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।

স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।।

আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।

কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার।।

নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।

সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ)

যাঁহারা এইরূপ সেবকের আদর্শ তঁাহারা ভগবানের সেবাপ্রাপ্তির জন্য কি না করিতে পারেন? এই জড়জগৎ চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন। চিহ্নিলাসের নানা বৈচিত্র্যের ছায়া এই জড়জগতেও বর্তমান। সুতরাং অপ্রাকৃত চিন্ময়ের প্রেমচেষ্টার সহিত প্রাকৃত জগতের কামচেষ্টা এক হইতে পারে না। ইহজগতে দেখা যায়, প্রণয়িনী প্রেমিকের জন্য, পত্নী স্বামিসেবালাভের জন্য ছায়াশক্তি মহামায়ার আরাধনা করে, তদ্বারা পত্নী বা প্রণয়িনীর স্বামী ও প্রেমিকের প্রতি ভালবাসারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহ জড়জগৎ হেয়তা ও অবরতাপূর্ণ; এখানে বদ্ধজীবের যত চেষ্টা কেবল নিজভোগমূলা। অপ্রাকৃত জগতে সেরূপ হেয়তা বা অবরতা নাই। সেখানে সকলেরই স্বরূপে অবস্থান, সুতরাং সকলেই একমাত্র ভগবৎপ্ৰীতিই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব স্বরূপশক্তির কায়বুহ ব্রজকুমারীগণের কৃষ্ণপ্ৰীতির চরম উৎকর্ষেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দেহাভিমानी জীব কি ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া বলিতে পারেন যে, তাহাদের দুর্গা আরাধনা সেইরূপ? ছায়াশক্তির কার্য্য বিমুখমোহন। সুতরাং তঁাহার নিকট প্রার্থনা করিলেও তিনি ভগবৎপ্রেম দান করিতে পারেন না। যাহার কাছে ধন নাই তাহারা কাছে ধন ভিক্ষা চাহিলে প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়। অতএব জগতের দুর্গা আরাধনা ছায়াশক্তির আরাধনামাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২২ অধ্যায়ে—

“কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যাধীশ্বরী।

নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—ইয়ং তাভিরূপাসিতা চিহ্নজিবৃন্তিঃ স্বরূপভূতা যোগমায়ৈব, নতু বহিরঙ্গা মায়া। অতঃ “সর্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু দুর্গাধিষ্ঠাতৃ দেবতা” ইত্যাগমে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চিহ্নজিবৃন্তিঃ কৃষ্ণা ভগিন্যোকাংশাভিধানা

যোগমায়ৈব মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী। সৈব খল্বাভিরূপাসিতা দুর্গা-মহামায়েত্যাদি-নামাদিসাম্যেন লোকানাং ভ্রমো ভবতীতি।” অর্থাৎ কুমারীগণ যে কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়াছিলেন তাহা স্বরূপাংশভূতা যোগমায়া, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি নহে। ‘সর্ব কৃষ্ণমস্ত্রে দুর্গাই অধিষ্ঠাতৃ দেবতা’ এই যে আগমবাক্য, ইহা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ভগবানের চিহ্নভিবৃদ্ধি স্বরূপাংশ-শক্তি যোগমায়াই মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতা বুঝিতে হইবে। তিনিই ব্রজকুমারীগণ-কর্তৃক উপাসিতা। মহামায়া ইত্যাদি নামসাম্যে ভারবাহী লোকগণের ভ্রম হইয়া থাকে। তোষণীতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলেন,—“কাত্যায়নী পরমবৈষ্ণবী শ্রীশিবপ্রিয়া পার্বতী”। ব্রহ্মসংহিতা ৩য় শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন যে, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় যে গৌতমীয় কল্পবচন—যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।’ তাহা কৃষ্ণ-স্বরূপশক্তির কথা বলা হইয়াছে। তাহা মায়াংশভূতা দেবীধামের দুর্গা নহে; কারণ গৌতমীয় কল্পেই লিখিত আছে,—বহিরঙ্গা দুর্গার আরাধনা বহুপ্রয়াসে সাধিত হয়, কিন্তু স্বরূপশক্তির আরাধনায় প্রয়াস নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১।২৫ শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন,—

“বিষ্ণেগমায়া ভগবতী যয়া সন্মোহিতং জগৎ।

আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্যার্থং সম্ভবিষ্যতি।।”

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর টীকায় লিখিয়াছেন,—বিমুখমোহনং মায়ায়া, উন্মুখমোহনং যোগমায়য়েতি ব্যবস্থিতিঃ। দেবকী-কন্যারূপেণ কংসবধনং তন্মায়ায়া এব কার্য্যং, নতু যোগমায়ায়াস্তাদৃশদুষ্টলোকেষু তস্যা অনুপযোগাদেব। ধৃষ্ট-যাদবমোহনং মায়ৈব, নতু যোগমায়ায়া। দেবকী-সপ্তমগর্ভাকর্ষণ-যশোদাস্বাপনাদি তদ্ধি যোগমায়ায়া এব কার্য্যং, নতু মায়ায়াঃ। তাদৃশ-সিদ্ধভক্তেষু মায়ায়াঃ প্রভবিতুম-শক্যত্বাচ্চ। যত্ন বাৎসল্যাди-মহাপ্রেমবতাং শ্রীযশোদাদীনাং বিশ্বরূপ-বরুণলোকাди দর্শনান্তে বাৎসল্যাди-ভাবাধিক্য-ত্বেনৈশ্বর্য্য-জ্ঞানেহ্যসম্ভ্রমাদেবৈশ্বর্য্যানুসন্ধানলক্ষণং মোহনং তৎ ন যোগমায়ায়া, নাপি মায়ায়া, কিন্তু প্রেম এব স স্বভাবঃ।” অর্থাৎ বিমুখমোহন মায়ার কার্য্য, —যেমন দেবকী, কন্যারূপে কংস-বধন বা ধৃষ্ট যাদব-মোহন। এতাদৃশ দুষ্ট লোকে যোগমায়া স্পর্শ করেন না। দেবকীর সপ্তম গর্ভাকর্ষণপূর্বক রোহিণীর গর্ভে স্থাপন, গোকুলে নন্দপত্নী যশোদাকে জড় নিদ্রাভিভূতা করা যোগমায়ার কার্য্য, কারণ তাদৃশ সিদ্ধভক্তে জড়মায়া প্রভাব ক্রিয়া করিতে পারে না। অতএব উন্মুখমোহন যোগমায়ার কার্য্য। আর চিন্ময় ধামের বাৎসল্যাди রসের পরম রসিকগণের (যথা নন্দ-যশোদার) বরুণলোক বা বিশ্বরূপ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শনান্তেও বাৎসল্যাди ভাবাধিক্যপ্রযুক্ত যে সম্ভ্রমজ্ঞান আচ্ছাদিত হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা যোগমায়া বা জড়া মায়া কর্তৃক মোহন-ক্রিয়া নহে; উহা প্রেমেরই স্বভাব বা রসপুষ্টির জন্য ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা। নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিদ্যা-সংবাদে দুষ্ট হয়,—

জানাত্যেকা পরা কাস্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।

যা পরা পরমাশক্তির্মহাবিশুৎস্বরূপিণী।।

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।

মুহূর্তাদেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা।।

একেয়ং প্রেমসর্বস্বস্বভাবা-গোকুলেশ্বরী।

অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোহখিলেশ্বরঃ ॥

অস্যা আবরিকাশক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী।

যয়া মুঞ্চং জগৎ সর্বং সর্বো দেহাভিমানিনঃ ॥

সেই পরমপুরুষ ভগবানের একটি পরা শক্তি আছে, তাহাই স্বরূপাত্মিকা দুর্গা। এই মহাবিশ্বস্বরূপিণী পরাশক্তির বিজ্ঞানমাত্রেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রেমসর্বস্ব-স্বভাবা হ্লাদিনী শক্তি। ইহার আশ্রয়ে আদিদেব অখিলেশ্বর সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু মহামায়া নামে একটি আবরিকা শক্তি ইহার আছে, তাহা দ্বারা নিখিল জগৎ ও সমস্ত দেহাভিমানিগণ মুঞ্চ হইতেছে। সুতরাং দেহাভিমानी কন্মিগণ ও যাহারা দেহে বদ্ধ মনে করিয়া মুক্তিকামী, উভয়ে প্রাকৃত সম্বন্ধযুক্ত থাকায় তাহাদের দ্বারা পরাশক্তির আবরিকা ছায়া-রূপা দুর্গারই আরাধনা হইয়া থাকে। রাবণ যে-প্রকার মায়াসীতা হরণ করিয়া চিন্ময়ী বিষ্ণুশক্তি সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছি মনে করিয়াছিল, তদ্রূপ জগতের বদ্ধ জীবসকল ছায়াশক্তির আরাধনা করিয়া প্রাকৃত দুর্গার আরাধনা করিয়াছি মনে করিলেও, তাহা দ্বারা প্রেমফল লাভ করে না।—অধিকন্তু মহামায়ার দ্বারা আরও মোহিত হয়। মহামায়া এইরূপ জীবকে মোহিত করিয়া ব্যতিরেকভাবে ভগবানের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত। যে-সকল বহির্মুখ অপরাধী জীব সর্বকারণ কারণ পরম ঈশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের সেবাবিমুখ, যাহারা গোবিন্দভজনপরায়ণ সাধু, সদগুরু বা সৎশাস্ত্রে আস্ত্রবান্ নহেন, সেইসকল পাষণ্ড জীবকে মহামায়া সংসার-দুর্গের কন্মচক্রে পেবণ করিতে করিতে ভগবদুম্মুখ করিবার প্রয়াস পান। সুতরাং মহামায়ার ঐ চেষ্টা সাক্ষাৎ উন্মুখ করিবার চেষ্টা নহে, ব্যতিরেক চেষ্টামাত্র। সেইজন্য মহামায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জাবোধ করেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (২।৫।১০) বলিতেছেন,—

“বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেহমুয়া।

বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥”

তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ —‘অত্র বিলজ্জমানয়া ইত্যনেনেদমায়াতি, তস্যা জীবমোহনং কন্ম শ্রীভগবতে ন রোচতে ইতি যদ্যপি সা স্বয়ং জানাতি, তথাপি—“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য” ইতি দিশা জীবানামনাদিভগবদজ্ঞানময়বৈমুখ্যম-সহমানা স্বরূপাবরণমস্বরূপাবেশঞ্চ কৰোতি।’

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত টীকায়াং—‘অসহমানেতি দাস্যা উচিতমেতৎ কন্ম, যৎ স্বামিবিমুখান্ দুঃখান্ করোতীতি। ঈশবৈমুখ্যেন পিহিতং জীবং মায়া পিধন্তে, ঘটেনাবৃতং দীপং যথা তম আবৃণোতি।’

অর্থাৎ যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জাবোধ করেন, দৃষ্টি জীব সেই মায়াকর্তৃক বিমোহিত হইয়া আমি আমার এইরূপ শ্লাঘা করে। এখানে বিলজ্জমানা এই শব্দের দ্বারা এইরূপ বোধ হয় যে, মায়ার জীব-সম্মোহনকার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে; (কারণ, ভগবান্ কৃষ্ণ সর্বদাই জীবগণকে সাধুগণের দ্বারা সাক্ষাৎ সেবাদানে আকর্ষণ করিয়া আনন্দ প্রদান করিতে ইচ্ছুক, ইহা যদিও মায়া অবগত আছে তথাপি জীব সেই স্বতন্ত্রতার

অপব্যবহারফলে ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হয়, তখন মায়া জীবের এই আনাদি বহিস্মুখতা সহ্য করিতে না পারিয়া জীবকে কপট কৃপা করেন অর্থাৎ জীবের স্বরূপের আবরণ ও অস্বরূপের আবেশ করিয়া থাকে। প্রজ্জ্বলিত জীবকে কোনও পাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া দিলে যেমন অন্ধকার আবার দ্বিতীয় আবরণস্বরূপ হয়, তদ্রূপ ভগবদ্বহিস্মুখতায় স্বাবৃত জীবকে আমি আমার বুদ্ধি, স্ত্রী-পুত্রাদি, ধন-জন প্রদান করিয়া আরও অস্বরূপের আবেশে বিপন্ন করিয়া থাকে। এইজন্য মায়া লজ্জিত হইয়া ভগবানের দৃষ্টিপথে আসিতে পারে না। কিন্তু ইহা দ্বারা মায়া কর্তৃক ভগবানের প্রতি ব্যতিরেক সেবা হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এই দুর্গাধিষ্ঠাত্রী যে দুর্গাদেবী, ভগবানের দৃষ্টিপথে যাইতে লজ্জা পায় তাহার আরাধনাদ্বারা পরমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেম লাভ হয় না, ধর্ম-অর্থাৎ অপবর্গদ্বারা মোহিত হওয়া যায়।

“শ্রীভগবাংশচানাদিত এব ভক্তায়াং প্রাপঞ্চিকাধিকারিণ্যাং তস্যাং দাক্ষিণ্যং লঙ্ঘিতুং ন শক্নোতি। তথা তদ্বয়েনাপি জীবানাং স্বসাম্মুখ্যং বাঙ্ক্ষয়ন্নুপদিশতি—

দৈবা হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীতা ৭।১৪)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবত্নানি শ্রদ্ধা রতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৬)

অর্থাৎ ভগবান্ মায়ার কোনও কার্যে হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু পরমকারুরিক ভগবান্ জীবগণকে মায়ার কবলে পেঁষিত হইতে দেখিয়া মায়ার আশ্রয় করিলে তাহাদের ভয় অপগত হইবে না, ইহা জানিয়া তিনি জীবগণকে আপনার সম্মুখীন করিবার জন্য শাস্ত্ররূপে উপদেশ দিয়া থাকেন,—“আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া দুষ্পারা, কেবল যাহারা একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ করে, তাহারাই ঐ মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পায়।” “সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গে সাধুমুখগলিত, মায়াবিনাশ করিতে শক্তিশালী হৃদয় ও কর্ণ পরিতৃপ্তিকারী আমার কথা সেবা করিতে করিতে শ্রবণ করিলে শীঘ্রই আমার সেবায় শ্রদ্ধারতি ও ভক্তির ক্রমশঃ উদয় হইয়া থাকে।

অতএব যাহারা সাধু ও সাধুগুরুর আশ্রয়ে একমাত্র সর্বৈশ্বর ভগবানে শরণাপন্ন হন, তাহারাই চরম মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

শ্রীহরিকীর্তনের আবশ্যকতা

কলেদৌর্বনিধে রাজনস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৪৩)

শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছিলেন,—হে রাজন্, কলিযুগকে দোষের আকর বলিয়া স্বীকার করিলেও, এমন একটা প্রধান গুণ তাহার আছে, যাহার জন্য অন্যান্য যুগের অপেক্ষা উহাকে উৎকৃষ্ট বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। কারণ কলিযুগে ভগবান্ বাসুদেবের গুণ কীর্তন করিলেই জীব সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরম পদে গমন করে, সন্দেহ নাই।

কৃতে যদ্ব্যয়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৪৪)

অহো ! সত্যযুগে প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে ভগবানকে ধ্যান করিয়া যে ফল লাভ হইত, ত্রেতাযুগে ভূরি আয়োজনে বহুকাল ও আয়াসসাধ্য জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের সম্পাদনে যে ফল লাভ হইত এবং দ্বাপরে বিবিধ আয়োজনে অর্চনের দ্বারা যে সিদ্ধি লাভ করা যাইত, কলিযুগে কেবল শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তনেই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই।

তাই শচীনন্দন গৌরহরি আমাদের ন্যায় ঘোর বিষয়াসক্ত, মায়ামুগ্ধ ও ত্রিতাপদগ্ধ জীবকুলের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া এবং আমাদিগের আয়ু কম দেখিয়া আমাদের চরম কল্যাণ সাধনমানসে, শাস্ত্রসমুদ্র মস্থন করত উহাদের নির্যাসস্বরূপ নিম্নলিখিত উপদেশটি শ্লোকদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

“চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্

শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।

আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং

সর্ব্বাত্মস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ॥”

চিত্তরূপ দরপণ, করিয়া যাহ মার্জ্জন,

নষ্ট করে যত দুর্ব্বাসনা ।

সংসার দাবাণ্ডন,

করি যাহা নির্বাপণ,

দূর করে ত্রিতাপ যাতনা ॥

কল্যাণরূপ কৌমুদী,

প্রকাশিতে নিরবধি,

জ্যোৎস্নাপ্রদাতা বিধু যাহা ।

দূরে যায় অমঙ্গল,

ঘটে অতি সুমঙ্গল,

শ্রেয়োমধ্যে সার হয় তাহা ॥

বিদ্যাবধূর জীবন,

রূপে যাহা সর্ব্বক্ষণ,

তত্ত্বজ্ঞান করে বিতরণ ।

বিদ্যামধ্যে সার যাহা,

প্রদান করয়ে তাহা,

কৃষ্ণভক্তি জীবের জীবন ॥

আনন্দের পারাবার,

বৃদ্ধি করে অনিবার,

যাহা ভক্তে সুখেতে ভাসায় ।

নিরানন্দ দূরে যায়,

প্রেমসিন্ধু উথলায়,

ভক্ত সুখে জীবন কাটায় ॥

প্রতি পদে পদে যার,

ঝরে অমৃত শতধার,

ষড়্‌রস কিবা তার আগে ।

সর্ব্ব রস আস্বাদন,

সদা করয়ে পূরণ,

যাহা ছাড়ি অন্য নাহি মাগে ॥

ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর, যার চেয়ে নাহি পর,
সেই যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন।
নিত্যকাল অবিরত, হয় যেন জয়যুক্ত,
মোর এ প্রার্থনা অনুক্ষণ॥

মন্ত্রের অতি লঘু উচ্চারণকে জপ কহে ; অর্থাৎ এরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় তাহা কেবল আপনার গোচরমাত্র হয়, অন্যে শুনিতে পায় না। যথা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে—

“মন্ত্রস্য সুলঘুচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে।”

নাম-রূপ ও গুণাদির উচ্চরূপে উচ্চারণ করাকে কীর্তন বলে। যথা—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে,—

“নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্।”

জপের দ্বারা জপকর্তা কেবল প্রয়োজন সিদ্ধি লাভ করেন ; কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলে কীর্তন জপের অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক হইয়া যায়। কীর্তন হইলে আবার শ্রবণকারীরও শ্রেয়োলাভ ঘটে। সঙ্কীর্তন-শব্দে সর্বতোভাবে কীর্তন, অর্থাৎ যাহা কীর্তিত হইলে অন্যপ্রকার সাধনাস্থের আবশ্যক হয় না, তাহাই বুঝায়।

যখন অনেকগুলি ভক্ত একত্র মিলিত হইয়া মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি লইয়া শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করেন, তখন ঐ উচ্চ কীর্তনকে সাধুগণ সঙ্কীর্তন আখ্যা দিয়া থাকেন। এইরূপ উচ্চ সঙ্কীর্তনে শ্রবণকারী প্রত্যেক মনুষ্যের, কেবল মনুষ্যের কেন, প্রত্যেক পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর জীবেরও চরম কল্যাণ সাধিত হয়। যিনি ‘কৃষ্ণ’ এই পরম মঙ্গলপ্রদ নাম উচ্চারণ করেন তাহার কোটি মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া যায়। যথা—বিষ্ণুধর্মো—

কৃষ্ণতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ততে।

ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র! মহাপাতককোটয়ঃ॥

একমাত্র শ্রীনামকীর্তনের দ্বারাই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় তাহা কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ।

মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন।

সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়, এই পাঁচের অঙ্গ সঙ্গ॥

উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্তনের দ্বারা মনুষ্য ব্যতিরেকে ইতর জীবেরও যে চরম কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা আমাদের উপদেশ দিবার ছলে শ্রীমন্মহাপ্রভু নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইতর জীবগণের কি উপায়ে মুক্তিলাভ হইবে? তদুত্তরে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত পয়ারদ্বারা জানা যায়। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর-জঙ্গম।

ইহা সবার কি-প্রকার হইবে মোচন॥

হরিদাস কহে প্রভু, সে কৃপা তোমার ।
 স্থাবর-জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥
 তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীৰ্তন ।
 স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয়ত' শ্রবণ ॥
 শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয় ।
 স্থাবরের শব্দযোগে প্রতিধ্বনি হয় ॥
 প্রতিধ্বনি নহে, সেই করয়ে কীর্তন ।
 তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন ॥
 সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীৰ্তন ।

শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩য়)

অতএব যদি কাহারও জগতের ইতর প্রাণী সকলের যথার্থ উপকার করিতে বাসনা থাকে তবে তাহার পক্ষে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীৰ্তন করা একান্ত বিধেয় । নতুবা বহু রত্নাদির দ্বারা তাহাদের (ইতর প্রাণীসমুদয়ের) যথার্থ উপকার অর্থাৎ চরম কল্যাণ সাধন করা সম্ভবপর নহে । ধনী ব্যক্তি ধনদ্বারা ক্ষুধার্তগণকে আহার প্রদান করিয়া তাহাদের ক্ষুধা কিছু সময়ের জন্য নিবারণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাদের চিরক্ষুধা দূর করিতে পারেন না, অর্থাৎ ক্ষুধার্তগণ যে কন্মবশতঃ চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করত ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত ও ক্ষুধা পিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়া থাকে, সেই দুঃখ হইতে কখনই তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন না । তবে তাহাদিগকে এই দুঃখ হইতে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় তাহাদিগকে ভগবৎপ্রসাদ প্রদান করা এবং শ্রীহরির নাম উচ্চৈঃস্বরে শ্রবণ করান । ইহা ব্যতীত ইতর প্রাণীর উদ্ধারের আর অন্য কোন উপায় নাই । একমাত্র উচ্চ সঙ্কীৰ্তন শ্রবণদ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীই উদ্ধার হইয়া যাইবে—ইহাই আমাদের পরম দয়াল ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত ধর্মের গুঢ় রহস্য ও প্রধান উপকারিতা । ভক্তগণ যখন শ্রীভগবানের নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে করিতে নৃত্য করেন তখন উহা শ্রবণ করিয়া আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল হয় ; বিষয়াসক্ত মন বিষয় ভুলিয়া ভগবানের দিকে ধাবিত হয় ; স্ত্রী-পুত্রাদির বিরোগজনিত দুঃখসমূহ একেবারে ভুলিয়া যাই এবং আনন্দভরে ভক্তগণের সহিত আমরা নৃত্য করিতে থাকি । আমরা যে মায়াবদ্ধ জীব তাহা তখন আর মনে হয় না—আমরা যে নিত্য কৃষ্ণদাস সেটী তখন বেশ বুঝিতে পারি ।

শুদ্ধ সঙ্কীৰ্তন-সম্প্রদায়সকলের মধ্যে কোনও সম্প্রদায়ে ভক্তগণ সাধারণ মনুষ্যগণকে উপদেশ দিবার ছলে নিম্নলিখিত গানটী কীর্তন করিয়া থাকেন, যথা—

রাধা কৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই ।

(এই) শিক্ষা দিয়া, সব নদীয়া,
 ফিরছে নেচে গৌর-নিতাই ॥

(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,
 খাচ্ছ হাবুড়ু ভাই ॥

(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
 করলে ত' আর দুঃখ নাই ॥

কখনও বা নিম্নলিখিত গীতিটী গাইয়া আমাদিগের ন্যায় মায়াবদ্ধ জীবকুলকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, যথা—

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীবমীন ।
নাহি জান বদ্ধ হয়ে রবে তুমি চিরদিন ॥
অতি তুচ্ছ ভোগ আশে, বন্দী হয়ে মায়াপাশে ।
রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড যথা পরাধীন ॥
এখন ভকতিবলে, কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুজলে ।
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণধীন ॥

আবার কোন শুদ্ধ সম্প্রদায়ে ভক্তগণ সাধারণ জীবগণকে কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড প্রভৃতির কোনও প্রয়োজন নাই, কেবল নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেম হৃদয়ে আশ্রয় দেওয়াই জীবের একমাত্র কর্তব্য—এই উপদেশছলে নিম্নলিখিত গানটী কীর্তন করিবেন,—

কৃষ্ণভক্তি বিনা কভু নাহি ফলোদয় ।
মিছে সব ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবের উপাধিময় ॥
যোগ, যাগ, তপোধ্যান, সন্ন্যাসাদি ব্রহ্মজ্ঞান ।
নানা কাণ্ডরূপে হয় জীবের বন্ধন-কারণ ॥
সেবকের বাক্য ধর, নানা কাণ্ড ত্যাগ কর ।
নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয়ে দেহ আশ্রয় ॥

ভগবদ্ভক্তগণের মুখে উক্ত গীতগুলি শ্রবণ করিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে আমরা নিত্য কৃষ্ণদাস, ভগবানকে ভুলিয়া নিজে ভোক্তা সাজিয়া মায়ার সেবা করায় আমাদের এই বিষম দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। যদি সাধু, শাস্ত্র ও শ্রীগুরুর উপদেশ শুনিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকি, তবে আমাদিগকে আর বিষম জ্বালা সহ্য করিতে হইবে না। নিত্যকাল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারিব।

শুধু ভক্তগণ কেন, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলিও আমাদিগকে শ্রীভগবানেরই সেবা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। মৃদঙ্গ আমাদিগকে উপদেশদানে বলিয়া থাকেন, যথা—

যেযাং শ্রীমদ্-যশোদাসুতপদকমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাম্
যেযামাভীরকন্যা-প্রিয়গুণকথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা ।
যেযাং শ্রীকৃষ্ণলীলা-ললিত গুণকথা-সাদরৌ নৈব করৌ
ধিক্তান্ধিক্তান্ধিগেতান্ধিক্তথয়তিনিতিরং কীর্তনস্থোমৃদঙ্গঃ ॥

শ্রীমান্ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে যে-সকল ব্যক্তির ভক্তি নাই, “ধিক্তান্”—তাহাদিগকে ধিক্। গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনে যাহাদের জিহ্বা আসক্ত নহে, “ধিক্তান্”—তাহাদিগকে ধিক্। যাহাদের কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণে অনুরক্ত নহে, “ধিক্তান্”—তাহাদিগকে ধিক্। কীর্তনকালে মৃদঙ্গ এই কথাই বলিতে থাকেন।

মৃদঙ্গের এই বোল শুনিয়া, এই ধিক্কার বুঝিয়া, অপরে হরিকীর্তনে যোগ দিতে পারেন। মৃদঙ্গদ্বারা এই উপকার পাওয়া যায়।

করতাল বাদ্যছলে যাহা বলিয়া থাকেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা,—

মৃত্যুং জয়েয়ং শমনং জয়েয়ং তৎ কিস্করাংশ্চাপি সুখং জয়েয়ম্ ।

শ্রুত্বৈতি দূরাৎ করতালশব্দং সঙ্কীর্তনং তে খলু নোপয়ন্তি ॥

“মৃত্যুকে জয় করিব, শমনকে জয় করিব, এবং তাঁহার কিস্করগণকে জয় করিব।”
করতালের এই শব্দ দূর হইতে শুনিয়া তাহারা (অর্থাৎ মৃত্যু, শমন ও শমনকিস্করগণ)
সংকীর্তনকারীর নিকট আসিতে পারে না। অতএব করতালদ্বারা মহোপকার সাধিত হয়।
এইরূপে বিষাণ, করতালী, নৃত্য ও শিরোলুষ্ঠন প্রভৃতির দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার
সাধিত হইয়া থাকে।

বিদেহপতি (নিমিরাজ) করভাজনকে বলিয়াছিলেন,—হে ভগবন্! জগদীশ্বর কোন্
সময়ে কি কি বিগ্রহ, বর্ণ ও নামগ্রহণে আবির্ভূত হন এবং কিরূপ বিধানেই বা জগতে
আরাধিত হন, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্তন করুন। যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে,—

কস্মিন্‌কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ ।

নান্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।১৮)

তদুত্তরে করভাজন বলিয়াছিলেন,—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ে
ভগবান্ ক্রমান্বয়ে নানা প্রকার বর্ণ, নাম ও আকার ধারণে আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং
বিবিধ প্রকারে পূজিত হন। পরে ক্রমান্বয়ে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের উক্ত বিষয়সমূহ
অর্থাৎ চারি যুগের ভগবানের বর্ণ, নাম ও আকার ধারণের বিষয় বর্ণনা করিয়া অবশেষে
এই কলিযুগের বিষয় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, যাঁহার মুখে সর্বদা
কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্শদ পরিবেষ্টিত
মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্তন যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে
কৃষ্ণবর্ণ ত্রিষাকৃষ্ণঃ সান্ধোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।২৯)

এই শ্লোক একমাত্র অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেবকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে।
কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া ব্যাখ্যা
করিয়াছেন, যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে ।

অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে ॥

কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুই ত' প্রকার ।

কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আর ॥

কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণবর্ণ ।

আর বিশেষণে তার করে নিবারণ ॥

দেহকান্তে হয় তিঁহো অকৃষ্ণ বর্ণ ।

অকৃষ্ণ বর্ণে কহে পীতবর্ণ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পরিচ্ছেদ)

এই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতारे শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অঙ্গ, শ্রীবাসাদি প্রভুর
উপাঙ্গ, গদাধরাদি প্রভুর পার্শদ, এবং হরিনামই অস্ত্র। অতএব সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের
সঙ্কীর্তনদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভজনা করাই একমাত্র কর্তব্য। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

সঙ্কীৰ্ত্তনপ্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।

সঙ্কীৰ্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥

সেই ত' সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার ।

সর্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পরিচ্ছেদ)

গৌড়ীয়ের পাঠকবর্গের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনারা শ্রীগৌরানন্দ-দেবের ন্যায় পরমদয়াল আর পাইবেন না। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ন্যায় বদ্ধ জীবের দশা মলিন দেখিয়া করুণাবশতঃ নবদ্বীপধামে প্রকট হইয়া নিজে আচরণ করিয়া দেখাইলেন যে, একমাত্র শ্রীহরিসঙ্কীৰ্ত্তনদ্বারাই তাঁহাকে (শ্রীগৌরানন্দদেবকে) পাওয়া যায়। অতএব এই দয়াল ঠাকুরের বাক্য আমরা যদি না শ্রবণ করি তবে আমাদের কোনও কালে চরম মঙ্গল সাধিত হইবে না। পুনরায় চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে হইবে।

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৬৮ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হতে জানা যায়, সনাতন শিক্ষারম্ভে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন,— “জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।” (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮) আবার উক্ত মহাপ্রভুই মধ্যলীলায় ১৩শ পরিচ্ছেদে লোকশিক্ষার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বমুখোক্তি,— ‘আমি শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাস-দাসানুদাস।’ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবস্থিধ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। যাঁরা সর্বদা কৃষ্ণের অনন্যভাবে সেবা করেন, তাঁরা কৃষ্ণের নিত্য সেবক বা দাস। সেই শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়ে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর প্রচেষ্টার কোন অবকাশ না থাকায় তাঁরা কৃষ্ণের সকল অপ্রাকৃত গুণেরই দায়ভাক। এইরূপ অপ্রাকৃত গুণ কখনও নষ্ট হয় না। “কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে।” (চৈঃ চঃ) কৃষ্ণের অনন্য ভক্তগণ কৃষ্ণের ন্যায়ই নিৰ্গুণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিৰ্গুণ বা গুণাতীত হওয়ায় তাঁর দাস হতে গেলে দাসকেও নিৰ্গুণ হতে হবে অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণাবলীতে ভূষিত হতে হবে। নিৰ্গুণ না হলে কৃষ্ণ তাঁকে দাস করবেন কেন? প্রাকৃত জগতে দেখা যায়, একটা চোর কি কোন সাধুকে তার সেবক বা দাসরূপে নিযুক্ত করে? সাধুব্যক্তি কোন চোরের দাস হলে চোরের চৌর্য্যবৃত্তির সন্ধান পুলিশকে জানাতে পারে—এই আশঙ্কায় চোর কোনও সাধুকে দাস বা সেবকরূপে রাখে না। তাই চোরের দাস বা সেবক চোরই হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কোন সাধুও তার সেবকরূপে কোন চোরকে নিযুক্ত করতে চায় না। কারণ সাধুর লোটা-কম্বলটাও সেবকরূপী চোর চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। যার যেমন স্বভাব, সে সেইরূপ স্বভাবের সেবক বা দাস নিযুক্ত করে বা কামনা করে থাকে। ভগবান্ও চাহেন তাঁর সেবক বা দাস নিৰ্গুণ হবে। “যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়া়র অধিকার।” (চৈঃ চঃ)—এই শাস্ত্রবাণী অনুসারে যেস্থানে কৃষ্ণ বিরাজ করেন, সেইস্থানে মায়া না থাকায় সেব্যকৃষ্ণ-সমীপে অবস্থিত তাঁর সেবকও অবশ্যই মায়ামুক্ত হবেন অর্থাৎ তাঁর সেবকের মায়িক সত্ত্বাদি গুণ থাকবে না। আবার কৃষ্ণ নিৰ্গুণ হওয়ায় তাঁর সেবক যদি ত্রিগুণান্তর্গত হন, তাহলে ত্রিগুণান্তর্গত সেবক

নিজ স্বার্থ সিদ্ধি ও নিজ সুখ-সুবিধার জন্য কৃষ্ণের সেবা-পূজা করবে, তাতে কৃষ্ণের সুখ হবে না। কৃষ্ণের সেবক ত্রিগুণাতীত বা নির্গুণ হলে সেই নির্গুণ সেবক নিজ আত্মেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা ত্যাগ করে কৃষ্ণের সুখানুসন্ধানে সর্বদা ব্যাপ্ত থাকবে। মায়াসক্ত অশুদ্ধচিত্তে মায়াতীত অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয় না।

আমরা স্বরূপতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাস হলেও কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখ-বাঞ্ছা ত্যাগ করে আত্মেন্দ্রিয় সুখ-কামনা চরিতার্থ করতে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি ও সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ—এই ত্রিগুণে মোহিত হয়ে বিবেকহীন হয়ে ভগবানকে ভুলে গেছি। শুদ্ধভক্তের বা পরম বৈষ্ণবের সঙ্গক্রমেই আবার আমরা কৃষ্ণ-দাসত্বে স্থিত হতে পারব। নতুবা বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম পালনে শুদ্ধভক্তের সাক্ষাৎ সঙ্গের অভাবে আমাদের স্বরূপজ্ঞান কখনও হবে না। কৃষ্ণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত প্রেমিক ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণের সাথে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে না। যার সাথে কৃষ্ণের সম্বন্ধ নেই, কৃষ্ণের সাথে যার চেনা-জানা নেই, কৃষ্ণের সাথে যার যোগাযোগ নেই—তার সাহায্যে বা তার কৃপায় কি কৃষ্ণের সম্বন্ধ স্থাপন হতে পারে? শুদ্ধ ভক্তগণের দাস অথবা শুদ্ধভক্তগণের দাসের দাস হতে পারলে শুদ্ধভক্তের কৃপায় কৃষ্ণপাদপদ্মসেবার অধিকার পাওয়া যাবে। ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তির দ্বারাই বশীভূত। ভক্তি কোথায় পাওয়া যাবে? ভক্তসঙ্গেই ভক্তি লাভ হয়। যদি কোন ভাগ্যে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হয়, তাহলে ভক্তি লাভ অবশ্যই হবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব—‘আমি কৃষ্ণের দাসের দাসানুদাস’—এরূপ বাক্য বলার অর্থই কৃষ্ণের দাস-দাসানুদাস হলেই কৃষ্ণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে কৃষ্ণের প্রিয় হওয়া সম্ভব হবে। আমি কৃষ্ণের নিত্য সেবক বা আমি কৃষ্ণের নিত্য দাস—এই অভিমান করলেই আমি তাঁর দাস হয়ে যাব না। কোন মালিকের অধীনে সেই মালিকের আজ্ঞামত কার্য্য না করলে কি তাঁর দাস হওয়া যায়? কৃষ্ণের অধীনে থেকে কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করতে হবে, তবেই তাঁর দাস হওয়া যাবে। কৃষ্ণ ত’ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে আছেন, সুতরাং তাঁকে পাব কোথায়? কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে তাঁর প্রেষ্ঠের কাছে, তাঁর অনন্য ভক্তের কাছে। পরমহংসমুকুটমণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়,—

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শক্তি আছে।

আমি ত’ কান্দাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি’,
ধাই তব পাছে পাছে।।

অতএব শুদ্ধভক্তের চরণে প্রণত হয়ে সম্পূর্ণ শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করলে তাঁর অহৈতুকী কৃপায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে বা কৃষ্ণদাস্য লাভ হবে। কৃষ্ণ-দাস্য প্রাপ্তির জন্য অবশ্যই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবোত্তম সদগুরুদেবের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে। তবে সাবধান! অবৈষ্ণবকে গুরু-পদে বরণ করলে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হবে না। শাস্ত্র বলেছেন,—

মহা-কূল-প্রসূতোহপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।

সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥ (শ্রীহরিভক্তিবিনোদ ১।৪০)

অর্থাৎ—“মহাকুলপ্রসূত, সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্রশাখাধারী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হলে গুরুপদে অভিষিক্ত হতে পারেন না।”

কলিকালে বর্ণাশ্রম ধর্ম লুপ্তপ্রায়। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে হরিকথায় রুচি উৎপাদন অসম্ভব। তাই গৌর-নিত্যানন্দ প্রভু বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা না বলে সাক্ষাৎভাবে ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের সঙ্গ করার আদেশ করেছেন। কৃষ্ণপ্রেম যখন জীবের প্রয়োজন, তখন জীবকে বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তর্গত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের কথা না বলে ভক্তসঙ্গে ও হরিকথা প্রসঙ্গ দিয়ে ভগবানুখী করতে পারলেই আত্যন্তিক মঙ্গল হবে। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের স্বার্থ, কেননা জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণকে যিনি প্রীতি করেন, তিনি কৃষ্ণের শক্ত্যাংশ কোনও জীবকে হিংসা করতে পারেন না এবং কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যাবতীয় বস্তু বা ব্যক্তিতে তাঁর প্রীতি অবশ্য থাকা স্বাভাবিক। হিংসা অর্থে অপরের অনিষ্ট সাধন। বেদও হিংসা করতে নিষেধ করেছেন,—“মা হিংসাৎ সর্বাণি ভূতানি” অর্থাৎ কোনও প্রাণীকে হিংসা করো না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেছেন,—“অদ্বৈষ্টা সর্বভূতানাম্” (গীতা ১২।১৩) অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর প্রতি হিংসা-বর্জিত হও। ভক্তের প্রতিটি ইন্দ্রিয় ভগবানের সুখের উদ্দেশ্যে চালিত হয়। কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যেই ভক্তের গমনাগমন হয়ে থাকে। ভক্তের পদতলে পিপীলিকা, পোকা প্রভৃতি মারা গেলে অথবা তাঁর নিশ্বাসের মধ্য দিয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী বিনষ্ট হলেও সেগুলি কৃষ্ণের সেবায়জ্ঞে লেগে যায়। ভক্তভর্তৃক ভগবান্ কৃষ্ণের সেবার জন্য শস্য, লতা, ফল, মূল প্রভৃতি সংগৃহীত হলে তাতে জীব হিংসা হয় না। কারণ—উক্ত আচ্ছাদিত চেতন জীবগুলি কোনদিনই নিজেদের ভগবৎসেবায় লাগাতে পারবে না; তাই তাদের ভগবৎসেবায় লাগিয়ে হিংসা করা ত’ হয়ই না, পরন্তু তাদের উপকার করা হয়। ভক্ত উক্ত দ্রব্যগুলি ভগবৎসেবায় লাগিয়ে সেই নিবেদিত প্রসাদ-সেবাদ্বারা প্রাণ রক্ষা করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদ্বাণী, যথা—

যজ্ঞাবশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচ্যন্ত্যত্মকারণাৎ॥ (গীতা ৩।১৩)

“যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনকারী সাধুগণ সর্বপ্রকার পাপ হতে মুক্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু যারা নিজেদের জন্য অন্ন পাক করে, সেই দুরাচারগণ কেবল পাপই ভক্ষণ করে।” ‘যজ্ঞ’ অর্থে “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ”—শ্রুতে—অর্থাৎ যজ্ঞই বিষ্ণু। শ্রীভগবান্ও বলেছেন,—“যজ্ঞোহহং ভগবন্তমঃ”—(ভাঃ ১১।১৯।৩৯) অর্থাৎ “আমি বসুদেবনন্দনই যজ্ঞ।” সাধু কে?—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায় লিখেছেন—“সন্তো ভগবদ্ভক্তা এব, ন তু কস্ম-জ্ঞানাদি-পরা”—অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তই সাধু; কস্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি কেহই সাধুপদবাচ্য নন। ভগবদ্ভক্তগণ আমিশ খাদ্য বা নিরামিশ খাদ্য—কোনটিই ভক্ষণ না করে ভগবানের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সেবন করেন বলে তাঁদের জীবহিংসাজনিত কোন পাপই হয় না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৬ পৃষ্ঠার পর]

সাক্ষাৎ-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?—তত্ত্বদর্শন যেখানে ঠিক আছে। তত্ত্বদর্শন যদি ঠিক না থাকে, অধিকার যদি ঠিক না থাকে, তাহলে উল্টো বুঝি রাম। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে নিয়ে গেছেন বৈষ্ণব দর্শন করাতে গাইয়ে মুকুন্দ। নীলাচল—পুরীধামের ঘটনা। তিনি গিয়ে দেখলেন কি ঐশ্বর্য! এত মহাভোগী লোক! গদাধর পণ্ডিত মনে মনে করছেন এ কি বৈষ্ণব! এত ঐশ্বর্য, এত সব ভোগের জিনিষ! বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব দর্শন হয়নি তাঁর। মনে মনে চিন্তা করছেন এ আবার কি রকম বৈষ্ণব দেখতে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরে গেছেন মুকুন্দ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভাগবতের—

“অহং বকী যং স্তনকালকূটং জিহ্বাংসয়াপায়দপ্যসাধরী।

লেভে গতিং ধাত্র্যচিটাং ততোহন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।।”

এই শ্লোক বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। তখন কোথায় পড়ে রইল সেইসকল ঐশ্বর্য। গদাধর পণ্ডিত তখন বলছেন, আমি ত’ বাইরে দেখছিলাম খুব ভোগী, বিষয়ী ব্যক্তি। কিন্তু ভাগবতের একটা শ্লোক শুনবার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন! তখন পণ্ডিত গদাধর বলছেন মুকুন্দ প্রভুকে, আমি ত’ বৈষ্ণব অপরাধ করে ফেললাম। আমাকে বৈষ্ণব দর্শন করাবার জন্য নিয়ে এলেন আপনি, আর আমি এসে বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ করে ফেললাম, ভুল বুঝে ফেললাম! এখন উপায় কি? আচ্ছা ঘরে চল, সেখানে গিয়ে মূল মালিককে—শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কথাটা বলেছেন গদাধর পণ্ডিত। মহাপ্রভু তখন ব্যবস্থা দিয়েছেন,—দেখ, যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়, তাঁর কাছে যদি তুমি দীক্ষা নাও তাহলে ঐ অপরাধ খণ্ডন হয়ে যায়। যিনি উপদেশ দিচ্ছেন তিনি কিন্তু গদাধর পণ্ডিতের Guardian। সেই অনুসারে তিনি দীক্ষা নিলেন। কার কাছ থেকে?—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাছ থেকে। যিনি কৃষ্ণলীলায় বৃষভানু রাজা। বাপের কাছ থেকে দীক্ষা নিচ্ছেন কন্যা। গদাধর পণ্ডিতের তত্ত্বদর্শন ভুল হয়েছে—এটা ত’ আমরা মেনে নেব না, কিন্তু ভগবান্ তাঁর ভক্তকে দিয়ে জগৎকে কেমন শিক্ষা দিচ্ছেন। দেখ, কেমনভাবে বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে যায়। তাঁর বাইরের সাজপোশাক দেখে তাঁকে বৈষ্ণব বলে মনে হয় না; কিন্তু ভাগবতের শ্লোক শুনে যখন মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন, তখন ভাবছেন, আরে বাবা! আমি ত’ বুঝতে পারিনি। সব জিনিষের মধ্যে শিক্ষা আছে।

“প্রেমভক্তিই সেই দর্শন লাভ করবার একমাত্র উপায়স্বরূপ স্থির করে তাহারই প্রার্থনা করছেন।” প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব তিনি জেনে নিয়েছেন, বুঝে নিয়েছেন। যদি আমার কিছু জানা না থাকে তাহলে আমি কিছু প্রশ্ন করতে পারব না। আমাকে কিছু জানতে হয়, বুঝতে হয়। সেই অনুসারে আমি আরও কিছু জানবার, বুঝবার চেষ্টা নিতে পারি। আমি প্রশ্ন করতে পারব না যদি আমার কিছু জানা না থাকে, বুঝা না থাকে।

বিদেহরাজ নিমির যজ্ঞভূমিতে হাজির হয়েছিলেন নবযোগেন্দ্র ঋষি। তাঁদিগকে দর্শন করে পরমসন্তুষ্টচিত্তে যথোচিত সেবাপূজা করে নিমিরাজ আত্যন্তিক মঙ্গলবিষয়ক প্রশ্ন করেছিলেন নবযোগেন্দ্র ঋষির কাছে। যে ধর্মের অনুষ্ঠান-নিবন্ধন ভগবান্ শ্রীহরি

শরণাগতজনকে নিজ স্বরূপ পর্যন্ত প্রদান করে থাকেন, সেই ভাগবত ধর্ম যদি আমাদের শ্রবণযোগ্য মনে করেন, তাহলে তা বর্ণন করুন। তাঁর ভুল সংশোধন করে নিলেন। আবার বলছেন—আমার কিন্তু শুনবার লোভ আছে, কেন না, আমি পূর্ব পূর্ব মহাজনগণের কাছে শুনেছি যে এই সনাতন ধর্ম, ভাগবত ধর্ম যদি কেউ আলোচনা করেন, যদি কেউ অনুশীলন করেন, তাহলে ভগবান্ তাঁর প্রতি খুব খুশী হন। “যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাগ্নানমপ্যজঃ।” অজ ভগবান্ তিনি তাঁর প্রতি খুব খুশী হন যদি কেউ সনাতন ধর্ম, ভাগবত ধর্ম অনুশীলন করেন, শ্রবণ-কীর্তন করেন—এটাও শোনা আছে। আবার সেই প্রেমময় ভগবান্ তিনি বশীভূত হয়ে যান ভক্তের—এটাও শুনেছি আমি। সেটা কিরকম? ভক্তের ভক্তিতে, প্রেমে বশীভূত হয়ে যান সেই প্রেমময় ভগবান্। তাহলে আমার অধিকার আছে কিনা দয়া করে সেই অনুসারে ব্যবস্থা নেন। ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন আগে। প্রশ্ন করবার আদব-কায়দা এসব। প্রকাশ না পায় আমার কোন অহঙ্কার আছে, আমি সবজান্তা ব্যক্তি। আমি শুধু জানতে চাই, বুঝতে চাই। আমি ত’ মূর্থ, কিছু জানি না, কিছু শিখি না, কিছু বুঝি না। ঠাকুর, আমাকে জানিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও, শিখিয়ে দাও—সেই ভাবটা রাখতে হবে সবসময়। সে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হোক, আর পরোক্ষ জ্ঞান হোক, ভাবটা ভিতরে এইরকম থাকবে।

প্রেমভক্তি লাভ যে শ্রেষ্ঠ ব্যাপার এটা জেনে নিয়েছেন ঋষি, তাই জিজ্ঞাসা করছেন। “তাঁর একবার মাত্র দর্শনে মনের অতৃপ্তি এবং পরক্ষণেই অদর্শন-জন্য বিরহ-দুঃখ উপস্থিত হয়।” শ্রীবিগ্রহের দর্শন একবার ভগবান্ দিয়ে দিলেন, তারপর আবার অদর্শন। দর্শন পেয়ে ভক্ত কান্নাকাটি করতে লাগলেন। এখন এক্ষেত্রে ভগবান্ কি করবেন? দর্শন পেলেও যদি ভক্ত কান্নাকাটি করেন, আবার দর্শনের অভাবে বিরহেও যদি কান্নাকাটি করেন, তাহলে ভগবান্ কি করতে পারেন? এ ত’ হয়ই। জগতে আমাদের যে ব্যাপারটা হয়—এখানকার মিলন এবং বিচ্ছেদ—এ দুটো জিনিষ যেমন, ভক্তের ক্ষেত্রে এবং ভগবানের ক্ষেত্রে কি ঐরকম? নিশ্চয়ই নয়, সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ভাষায় বলা হয় বিরহ-মহোৎসব। বিরহ মানে দুঃখ-কষ্ট, কিন্তু সেখানেও মহোৎসব। ব্যাপারটা কি? সেখানে প্রাকৃত জগতের শোক-মোহ নেই। প্রাকৃত জগতের মিলন এবং বিচ্ছেদের মধ্যে সুখ-দুঃখ দুটো আছে। কিন্তু অপ্রাকৃত ভাববিভাবিত যে ভক্ত ভগবানের বিরহে কাতর, সেখানে ঐ জিনিষটা নেই। এ জগতের প্রাকৃত মায়া-মোহ নিয়ে যারা কান্নাকাটি করেন কোন ব্যক্তি-বিশেষের অভাবে, তাদের অপগতি—নরকগতি হয়, ভাগবতে পরিষ্কার বুঝানো আছে। একজন ব্যক্তি মারা যাচ্ছেন, আর একজন কান্নাকাটি করছেন,—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।

অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ।।

এবং গৃহাশ্রয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।

অতৃপ্তজ্ঞাননুধ্যায়ন্ মৃতোহঙ্কং বিশতে তমঃ।।

প্রাকৃত বিয়োগজনিত দুঃখে, প্রাকৃত শোকে অন্ধতম নরকে গতি হয়। তাদের সদৃগতি হয় না। কিন্তু ভক্ত যে কান্নাকাটি করছেন—ভগবানের দর্শন করে কান্নাকাটি করছেন, আবার ভগবানের অদর্শনেও তিনি কান্নাকাটি করছেন—এ দুটোই অতিদ্রিয় বস্তু। এ দুটো তাকে ভগবানের রাজ্যে পৌঁছে দিচ্ছে। দুটো ক্ষেত্র একই তাঁব।

“এই আশঙ্কা করত সর্বদা তাঁকে বশীভূত করে রাখবার একমাত্র উপায় যে প্রেমভক্তি, তা জেনেও সেই দুর্লভ প্রেমভক্তিই বা কিরূপে পরম অপরাধী আমার পক্ষে লাভ করা সম্ভব হবে?” প্রেমভক্তি দুর্লভ কেন? প্রেমভক্তি ভগবানকে এমন বশীভূত করে রাখে যে ভগবান্ ভক্তকে আর ছাড়তে পারেন না। যে ভক্তের জন্য ভগবানের হৃদয় সবসময় কাঁদছে, ভগবান্ ছাড়া তিনি কিছু জানেন না, বোঝেন না—“তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে। আর রক্ষাকর্তা নাই এ ভব সংসারে।।” তাঁর ত’ সবই আছে আত্মীয়-স্বজন এখানে। তাহলে আবার কান্নাকাটি কেন? যে ভক্তের হৃদয় এইরকম, তাঁকে ভগবান্ কখনও পরিত্যাগ করেন না, করতে পারবেন না, ক্ষমতা নেই। ভগবানেরও ক্ষমতা নেই সেই ভক্তকে ছেড়ে দেবেন।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎকারিবশাভিহিতোহপ্যঘৌঘনাশঃ।

প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ব্যঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ।।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে, প্রেমিক ভক্ত কে? এর উত্তরে বলছেন—যাঁর হৃদয় কখনও ভগবানকে পরিত্যাগ করেন না, যিনি ভগবানকে চিরস্থায়ীভাবে ঠাঁই দিয়েছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাঁকে ত’ ভগবান্ কখনও ছাড়তে পারেন না। তাঁর জন্য ভগবান্ প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন। অর্জুনকে বলছেন—অর্জুন, তুমি যদি আমার পরে সম্পূর্ণ নির্ভর কর, তাহলে আমার কি উপায় আছে আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি? পারি না।

অনন্যাশ্চিন্ত্যস্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।

অনন্যাশ্চিন্ত্য যে ভক্ত আমাকে ছাড়া আর কাকেও জানে না, চেনে না, বোঝে না, সম্পূর্ণভাবে আমার উপর নির্ভরশীল, সে ভক্তকে ত’ আমি কখনও ছাড়তে পারি না। তার সব দেখাশুনা করতে হয়। তার কিছু নেই, তাকে দিয়ে দেই; আবার দিয়ে দিলেও যেহেতু তিনি প্রেমিক ভক্ত, সেহেতু ও জিনিষ রক্ষা করার চেষ্টা তার নেই, সুতরাং ওটা আমাকে রক্ষাও করতে হয়। ভক্তকে সব দিয়ে দিলাম, দিয়েও রেহাই নেই, তার ওটা আবার আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, সে দায়িত্ব আমাকেই নিতে হয়। ভক্ত যেমন ভগবানকে ছাড়তে পারেন না, ভগবান্ও তেমন ভক্তকে ছাড়তে পারেন না। মুস্কিল ত’ উভয়ক্ষেত্রে।

প্রেমভক্তির দ্বারা ভগবান্ বশীভূত হন। সেজন্য প্রেমভক্তি প্রার্থনা করছেন—ঠাকুর, তুমি আমাকে প্রেমভক্তি দাও। অন্য মুক্তি আমি চাই না। ‘তথা প্রেমভক্তিং সকাং মে প্রযচ্ছ।’—আমাকে প্রেমভক্তি দান কর। শ্রেষ্ঠবস্ত্র তিনি জেনে নিয়েছেন, বুঝে নিয়েছেন, তিনি আবার তুচ্ছ বস্ত্র প্রার্থনা করবেন কেন? সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত্র প্রার্থনা করেন তিনি। আমি পরম অপরাধী, আমার পক্ষে কি সেই দুর্লভ প্রেমভক্তি লাভ করা সম্ভব—এটা নিজস্ব বিচার, এটা ভক্তের দৈন্য। সর্বকম ক্ষমতা পেলেও তিনি নিজকে অমানী মানদ বলে ভাবছেন। আমার কোন যোগ্যতা নেই, আমার কোন ক্ষমতা নেই—এ ভাবটা ভক্তের থাকবে, থাকে। এ জগতের লোক কি বলছে?—“শির উঁচা রহে হামারা।” কিন্তু ভক্ত তা বলছেন না, ভক্ত সবসময় চিরপ্রণত। কেমন?—“ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।” ফলবান্ বৃক্ষ যেমন ফলভারে অবনত হয়, গুণবন্ত জন, অধিকারী ব্যক্তিও তেমনই। জানতে দেন না কাকেও, বুঝতে দেন না কাকেও। প্রচুর ধন-রত্নের মালিক যিনি তিনি কি কখনও অহঙ্কার

করবেন—আমার এত ধন আছে ? লুকিয়ে ছিপিয়ে রাখবার জিনিষ। বললে চলবে না, ও ধন গুপ্ত রাখতে হবে। প্রেমধন যিনি লাভ করেছেন তিনি কি সকলকে বলে বলে বেড়াবেন ? তিনি বলছেন,—“প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। দাস করি’ বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।।” স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলছেন একথা। তিনি বলছেন, তোমরা আমাকে সন্ন্যাসী দেখেছ। “কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন।” সন্ন্যাসের আমার দরকার কি ? আমি প্রেমের কান্দাল। ভগবান্ নিজেই এটা শিক্ষা দিচ্ছেন। অখিল লোকশিক্ষক, ত্রিলোকগুরু ভগবান্ জগজ্জীব আমাদিগকে শিক্ষা দিচ্ছেন। সাধন-ভজন হল এটাই। আকুল ক্রন্দন, আকুলতা-ব্যাকুলতা—এই নিয়ে চল। সাধন-ভজন অন্য কিছু নয়।

আমি কি করে প্রেমভক্তি লাভ করব ? ঠাকুর, তোমার কাছে ত’ চেয়ে ফেললাম প্রেমভক্তি আমায় দাও, কিন্তু প্রেমভক্তি পাওয়ার অধিকারী কি আমি ? আমি ত’ সর্ব দোষের আকর, কোন যোগ্যতা নেই আমার, সর্বভাবে অযোগ্য আমি। অযোগ্যকেও যিনি যোগ্যতা দেন তাঁর বদান্যতা বেশী। যোগ্যকে যোগ্যতা দেওয়াতে খুব বাহাদুরি নেই, কিন্তু যিনি অযোগ্যকেও যোগ্যতা প্রদান করেন, তাঁর কৃপা, দয়া সবথেকে বেশী। যার যোগ্যতা আছে তাকে ত’ যোগ্যতা দেওয়াই আছে, কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তিকে যিনি যোগ্য করে তোলেন, তাকে সেই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি মহাবদান্য, পরম দয়ালু, পরম কৃপালু। ভগবান্ ভক্তবাৎসল্য, আশ্রিতজনপালক, বাঞ্ছাকল্পতরু। জীবের কোন যোগ্যতা না থাকলেও তিনি তাকে যোগ্যতা দিয়ে থাকেন—এটা হল তাঁর ভক্তবাৎসল্য। তাই এখানে বলছেন—ভগবানের ভক্তবাৎসল্য সমস্ত অসম্ভবকেও সম্ভব করে। যেটা আশা করা যায় না তেমনটাও হয়ে যায়, ভগবানের কৃপা এমন। যোগ্যতা না থাকলেও তিনি যোগ্যতা দিয়েছেন—এমন কৃপা তাঁর—এটাই ভগবানের ভগবত্ত্ব, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। ঈশ্বর কাকে বলব ? কে ঈশ্বর ? “কাকে গুরু করে ঐছে দয়াময়।” “কর্তৃমকর্তৃমন্যথাকর্তৃম্ ইতি ঈশ্বরঃ।” সাধারণ মানুষ যা পারে তা তিনি অনায়াসে পারেন। অকর্তৃম্—ওকে উল্টে দিতে পারেন। আবার সব ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা, অধিকার, কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করতে পারেন। সেই তত্ত্ববস্তু হলেন ঈশ্বর। এই ঈশ্বর কিন্তু আধিকারিক দেবদেবী নন। এই ঈশ্বর মানে ভগবান্, এই ঈশ্বর পরমেশ্বর, এই ঈশ্বর বিশ্বেশ্বর। শিবঠাকুরকেও বিশ্বেশ্বর বলা হয়। কিন্তু ভগবান্ হলেন শিবঠাকুরেরও উপরওয়ালা। ‘পরমং মহেশ্বরম্’ উপনিষদে বলছেন।

ত্বমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদ্যাম দেবং ভুবনেশমীড়াম্।।

হে ভুবনপূজ্য ভগবান্! তোমাকে প্রণাম করি। কে তুমি ? ‘ত্বমীশ্বরানাং পরমম্’—জগতে যদি ঈশ্বর-ঈশ্বরী শব্দটা দেব-দেবীকে লক্ষ্য করে, তাহলে তুমি তার উপরওয়ালা। ‘পরমং মহেশ্বরম্’—মহেশ্বর যদি শিবঠাকুরকে লক্ষ্য করে তাহলে তুমি মহেশ্বরেরও উপরওয়ালা। ‘তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্’—তুমি সমস্ত দেবতাদের উপরওয়ালা, তাই তোমাকে পরদেবতা বলা হয়েছে ঋগ্বেদে, উপনিষদে। ‘পতিং পতীনাম্’—এ জগতে, এ সংসারে পতি-পত্নী সম্পর্ক আছে, কিন্তু হে ভগবান্, তুমি বিশ্বপতি, জগৎপতি। ‘পরমং পরস্তাৎ’—তুমি Superlative এরও Superlative degree। ভয়ঙ্কর ব্যাপার। গৌড়ীয়

পরিভাষায় মধ্যে এটার ব্যবহার আছে। আরাধ্যতম বলা হল, আবার পরমারাধ্যতম বলা হল। তাহলে Superlative এর Superlative হয়ে গেল। ব্যাকরণেও এর ব্যবহার আছে। সংস্কৃতে, ইংরেজীতেও ব্যবহার আছে। Most unkindest। Unkindest বললেই হয়ে যায়, তার পরে আবার Most লাগানো হয়েছে একটা। সেক্সপীয়রের গ্রামারেও ব্যবহার আছে, শাস্ত্রেও ব্যবহার আছে এইরকম। ভগবানের বিশেষণটা কিরকম? ‘পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ’—এ জগতে যেটা পর, শ্রেষ্ঠ, Superlative degree, তারও উপরওয়ালা তুমি। ‘বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্’—হে দেব, পরমপূজ্য, তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নেই, তুমি সর্বারাধ্য তত্ত্ব।

“প্রেম-ভক্তিতে সংসার (পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ) নাশ যদি হয়, তবে হোক! আর যদি তা না হয়, তবে নাই হোক। সে বিষয়ে আমার কোনও অপেক্ষা (চেষ্টা বা আগ্রহ) নেই—ঋষি বলছেন। যদি চিন্তামণি করতলগত হয়, তাহলে সমস্তই আপনা থেকেই সিদ্ধ হয়; অতএব সেই মুক্তিরূপ একমাত্র তুচ্ছদ্রব্য গ্রহণের প্রয়োজন কি?” যদি প্রেমভক্তি লাভ হয় আমার তাহলে মুক্তির কি প্রয়োজন আছে? মুক্তি অতি তুচ্ছ বস্তু। “হে দামোদর! আপনার স্বকীয় প্রেমভক্তি আমাকে বিশেষভাবে দান করুন। যে ভগবানের উদর রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ, তাঁর কাছে প্রেমভক্তি প্রার্থনায় নিত্যই উদরে পাশ-বন্ধনের আগ্রহটীও সম্ভাবিত হতে পারে; এই আশঙ্কা করে বলছেন,—‘ন মোক্ষে গ্রহঃ’—মুক্তিতে আমার আগ্রহ নেই। শ্রীভগবান্ স্বয়ং এবং তাঁর সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুই অপ্রাকৃত। তাই এখানে বলছেন, যাঁর প্রেমভক্তি লাভ হয়েছে তাঁর আবার পৃথক্ করে মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন কি? পাশবন্ধন হইতে আপনার মোচন-বিষয়ে আমার কি আগ্রহ নেই? অর্থাৎ নিশ্চয় আছে। বন্ধনাবস্থাতেই আমার বাঞ্ছিত সেই সাধারণ-প্রেমভক্তিটি প্রদান করুন।” ভগবান্ যখন যে আছেন অবস্থায় সেটাই তাঁর লীলাবিলাসের সহায়ক অবস্থা। তাঁর নাম হয়েছে দামোদর। যাঁর উদরে দামবন্ধন পড়েছে তিনি হচ্ছেন দামোদর। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর মধ্যে, আবার যাঁর থেকে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তৃণ, গুল্ম, লতা, দৈত্য, দানব, মনুষ্য প্রভৃতি সবকিছু আসছে, সেই তত্ত্ববস্তু হলেন ভগবান্। “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিঞ্জাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।” পরব্রহ্ম ভগবান্ কে? তাঁর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন বেদে, উপনিষদে। ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে’—যে তত্ত্ববস্তু থেকে এই চরাচর বিশ্ব, নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, ‘যেন জাতানি জীবন্তি’—তারা সৃষ্ট হয়ে যাতে সুবিন্যস্ত উপায়ে অবস্থিত, ‘যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি’—যাঁর থেকে জাত হল এবং যাঁতে পুনরায় মহাপ্রলয়ে প্রবেশ করছে, সেই তত্ত্ববস্তু হলেন পরব্রহ্ম। তিনি নিঃশক্তিক নন, তিনি নিরাকার নন, তিনি নির্গুণ নন—সেই কথা শাস্ত্রে বুঝাচ্ছেন। সর্বক্ষমতাসম্পন্ন যে বস্তু তিনি হলেন অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলছেন,—

“অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।”

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। তাঁর সমান কেউ নেই, তাঁর উপরেও কেউ নেই। অসমোর্দ্ব তত্ত্ব। ব্যাখ্যা করছেন উপনিষদে,—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যাতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রদ্যতে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।

তাঁর সমান কেউ নেই, তাঁর অধিকও কেউ নেই, সেই তত্ত্ববস্তু হলেন পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সেই যে তত্ত্ববস্তু তিনি সর্বশক্তিমান্, তিনি স্বয়ং এবং তাঁর লীলাবিলাসের সবকিছু ভগবানের লীলার সহায়ক। ভগবান্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি দিয়েছেন। সেই ইন্দ্রিয় যদি ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করি, তাকে বলে ভক্তি। ভক্তি মানে কি? ‘ভক্তিরস্যা ভজনম্।’ সেই পরতত্ত্ব সর্বশক্তিমান্ প্রেমময় ভগবানের ভজনই হল ভক্তি। সেই ভগবান্ তিনি আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়বৃত্তি দিয়েছেন। সেই বৃত্তিগুলো আমরা যদি তাঁরই সেবায় নিযুক্ত করি, তাহলে আমাদের সাধন-ভজন হয়। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিভিন্ন রকমের কাজ করে। ভগবান্ চোখ দিয়েছেন, আমরা সেই চোখ দিয়ে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করি, ভক্তের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করি। কান দিয়েছেন তিনি, ভগবৎকথা শ্রবণ করি, গুরু-বৈষ্ণবের মহিমা-মাহাত্ম্য শ্রবণ করি। মুখ দিয়েছেন তিনি, তাঁর (ভগবানের) মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্তন করি। এ সব ইন্দ্রিয়গুলো এক একটা বিষয়ে উপযোগী। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ যে ইন্দ্রিয়বান্ তাঁর যে ইন্দ্রিয় তার একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে—যে বৈশিষ্ট্য শাস্ত্রে বিশেষভাবে কীর্তন করেছেন। একটা অসম্ভব ব্যাপার, অথচ সেটা সম্ভব হয়েছে ভগবানের ক্ষেত্রে। ভগবান্ চোখ দিয়ে শুনতে পারেন; কান দিয়ে দেখতে পারেন, যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে যে কোন ইন্দ্রিয়ের Purpose serve করতে পারেন। এই হল ভগবানের চিদিন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্য।

এইরূপ অসম্ভব ক্ষমতা, অস্বাভাবিক ক্ষমতা সেই প্রেমময় ভগবান্ জন্তু, জানোয়ারের মধ্যেও কিছু দিয়ে দিয়েছেন। কচ্ছপ দৃষ্টিশক্তির দ্বারা তার বাচ্চাগুলোকে সংরক্ষণ করে। সাপেরও একটা বিশেষ অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। সাপের আর এক নাম চক্ষুশ্রবা। সাপ চোখ দিয়ে শোনে। ভগবান্ যে এক ইন্দ্রিয়ের কাজ অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত করতে পারেন, এর উদাহরণ তিনি নিজেই রেখেছেন। এ জড়জগতে কোন বিশেষ বিশেষ প্রাণীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন, যে ক্ষমতার অধিকারী মানুষ হয় না। কখন ভূমিকম্প হবে জন্তু-জানোয়ারগুলো বুঝতে পারে, আমরা ত’ অনেক পরে বুঝতে পারি খবরের কাগজ পড়ে। আবহাওয়া দপ্তরের Report পেলে তবে আমাদের বুঝবার ক্ষমতা হয়। Sysmograph মেশিনে ভূমিকম্প কখন হবে ধরা পড়ছে, সেই হিসাবে Announce-ment, সেই হিসাবে আমরা কিছু বুঝি। কিন্তু সেটা বুঝবার ক্ষমতা রাখে কিছু প্রাণী। যখন আরম্ভ হবে ভূমিকম্প তার আগেই পাহাড়-পর্বত থেকে হিংস্র প্রাণী—সর্পকুল ইত্যাদি সব নেমে আসে। আবার ভূমিকম্প শেষ হয়ে গেলে তারা ফিরে যায় বাসস্থানে। ভগবান্ এই অলৌকিক ক্ষমতা তাঁর সৃষ্ট প্রাণীগুলোর মধ্যেও দিয়ে রেখেছেন। মানুষ সে ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না।

সেই যে অতীন্দ্রিয় ভগবান্ ইচ্ছামাত্র তাঁর সব কার্য সম্পন্ন হয়। সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ ইচ্ছা করলেই হল, তাঁর সব কাজ হয়ে যাবে, পৃথক্ প্রচেষ্টার কোন প্রয়োজন হয় না। সেই ভগবানের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপ্ৰাকৃত, চিদ্ভাববিভাবিত। তাঁর যে কোন অঙ্গের দ্বারা যে কোন অঙ্গের কাজ করতে পারেন। শুনলে আশ্চর্য্য মনে হবে, কিন্তু শাস্ত্রে এ সব ব্যাখ্যা করা আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাস্তৌ জয়তঃ

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

এবং

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

১৪০-৯৪৫৩

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিষ্টার্ড)

১৪০০৬৮

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ

কংসটীলা, মথুরা (উঃ প্রঃ)

১লা আশ্বিন, ১৪০৫ (ইং ১৮।৯।৯৮)

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্বাদে ও সমিতির বর্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে আগামী ১৮ই আশ্বিন, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ (ইং ৫।১০।৯৮) সোমবার শারদীয়া-পূর্ণিমা হইতে ১৭ই কার্তিক (ইং ৪।১১।৯৮) বুধবার রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত একমাসব্যাপী কার্তিকব্রত, উর্জ্জব্রত, নিয়মসেবা উপলক্ষে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা হইবে এবং পরিক্রমাস্তে ২২শে কার্তিক, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ (ইং ৯।১১।৯৮) সোমবার শ্রীদুর্ব্বাসাঋষি গৌড়ীয় আশ্রম, ঈশাপুর, মথুরায় নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাস্ত-রাধাবিনোদবিহারীজীউ, শ্রীযমুনাজী ও মহর্ষি শ্রীদুর্ব্বাসাঋষির শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে ২১শে কার্তিক, ১৪০৫ (ইং ৮।১১।৯৮) রবিবার হইতে ২৩শে কার্তিক (ইং ১০।১১।৯৮) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দ্বিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধর্ম্মসভা ও নগর-সঙ্কীর্ণনাদি সমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীসমিতির ও বিভিন্ন মঠের বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্বাদি সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্কব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যগণ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। ইতি—১লা আশ্বিন, ১৪০৫

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে জানিতে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ-এর নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

অনুষ্ঠান-সূচী

২১শে কার্তিক (ইং ৮।১১।৯৮), রবিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্তন।

প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন।

বৈকাল—৩ ঘটিকায় শ্রীনগর-সঙ্কীৰ্তন।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস-কীর্তন,
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

২২শে কার্তিক (ইং ৯।১১।৯৮), সোমবার—

ব্রাহ্মমুহূর্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্তন।

সকাল—৬টা হইতে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহগণের
অভিষেক, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-হোমাদি এবং
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্মসভা—‘শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব’ ও ‘সনাতন
ধর্ম’ সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

২৩শে কার্তিক (ইং ১০।১১।৯৮), মঙ্গলবার—

ব্রাহ্মমুহূর্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্তন।

প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন।

মধ্যাহ্নে—ভোগরাগ ও আরতি কীর্তন।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্মসভা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্তন স্বীকার্য।

✽	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।	✽
ধর্মঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিযুক্তসেন-কথাসু যঃ ।		নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
✽	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	✽

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম্ ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫০শ বর্ষ }	১৩ কেশব, প্রদ্যুম্ন, ৫১২ শ্রীগৌরান্দ ৩০ কার্তিক, মঙ্গলবার, ১৪০৫, ইং ১৭/১১/৯৮	{ ৯ম সংখ্যা
------------	---	-------------

সানুবাদঃ

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-নুতি-সূত্রকম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামী-শ্রীমন্তুভিরক্ষক-শ্রীধর-গোস্বামি-বিরচিতম্]

ন্যাসি-লক্ষ-নায়ক-প্রকাশানন্দ-তারকং

ন্যাসি-রাশি-কাশি-বাসি-কৃষ্ণ-নাম-পারকম্ ।

ব্যাস-নারদাদি-দত্ত-বেদধী-ধুরন্ধরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২৯ ॥

(শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীপুরুষোত্তম প্রত্যাবর্তনের পথে প্রয়াগে শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা সমাপন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলেন)—কাশীধামে লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসীর অধিনায়ক (শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রতীম) শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে (শাস্ত্র বিচার ও নিজ স্বচ্ছ-প্রেমময় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে) যিনি বিবর্তবাদের কুতর্ক গর্ত হইতে উদ্ধার করেন ও সন্ন্যাসী বহুল সমস্ত কাশীবাসিকে শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ণনে প্রমত্ত করিয়া সংসার-সিন্ধু হইতে পরিব্রাজ দান করেন এবং শ্রীনারদ-ব্যাস পরম্পরা প্রদত্ত শ্রৌত-সিদ্ধান্ত সুধাবাহী শ্রীরথের যিনি দিব্য ধুরন্ধরস্বরূপ—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরান্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য-কৃষ্ণ-নারদোপদেশকং

শ্লোক-তুর্য্য-ভাষণান্ত-কৃষ্ণ-সম্প্রকাশকম্।

শব্দ-বর্তনান্ত-হেতু-নাম-জীব-নিস্তরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩০ ॥

(কাশী সন্ন্যাসী সভায় বিচারধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয়) যিনি ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি পরম্পরা-প্রাপ্ত বা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন নারদের উপদেশে যাহা প্রণয়ন করেন—সেই বেদান্তভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারই উপদেশ করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকী ব্যাখ্যায় (অহমেবাসমেবাগ্রে.....) যিনি চরাচর বিশ্বের মূল আকরতত্ত্বরূপে অদ্বয়জ্ঞান স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই সম্প্রকাশ করেন এবং “অনাবৃতিঃ শব্দাৎ অনাবৃতিঃ শব্দাৎ” সূত্রের অর্থ প্রকাশে যিনি শব্দব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণনামকেই জীবের আবর্তন নিবারক নিঃশ্রেয়স-রূপে প্রতিপাদন করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩০ ॥

আত্ম-রাম-বাচনাди-নির্বির্শেষ-খণ্ডনং

শ্রীত-বাক্য-সার্থকৈক-চিদ্বিলাস-মণ্ডনম্।

দিব্য-কৃষ্ণ-বিগ্রহাদি-গৌণ-বুদ্ধি-ধিক্করং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ “আত্মারামশ্চ” শ্লোকের (দ্বিষষ্টি-প্রকার) ব্যাখ্যা দ্বারা যিনি শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রবর্তিত নির্বির্শেষ ব্রহ্মবাদ খণ্ডন করেন ও “অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ” প্রভৃতি বহু ঋতিবাক্যসমূহের দ্বারা অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবানের চিন্ময়-লীলা মাধুর্য্যের শোভা প্রকাশ করেন এবং যিনি অপ্রাকৃত অর্চ্যবিগ্রহাদিকে (শ্রীভগবান্নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতিকে) মায়িক (মায়া-কল্পিত) সত্ত্বগুণের বিকারমাত্র—মায়াবাদের এই ঘৃণিত ধারণাকে অত্যন্ত ধিক্কার দেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্ম-পারমাত্ম-লক্ষণাদ্বৈক-বাচনং

শ্রীব্রজ-স্বসিদ্ধ-নন্দলীল-নন্দ-নন্দনম্।

শ্রীরস-স্বরূপ-রাস-লীল-গোপ-সুন্দরম্

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩২ ॥

জ্ঞানী ও যোগিগণের ব্রহ্ম-পরমাত্মা-রূপ মূল-প্রতীম তত্ত্বদ্বয়কে যিনি (শ্রীভাগবতের “ব্রহ্মোতি পরমাত্মোতি ভগবানিতি শব্দতে” বচনদ্বারা) ক্রোড়ীভূত করিয়া অদ্বয়জ্ঞানের স্বরূপ—পরম মৌল সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং শ্রীভগবানের স্বতঃসিদ্ধ আনন্দময়তার নিগূঢ় লীলা উদ্ঘাটন প্রসঙ্গে যিনি বৈকুণ্ঠোপরি (বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী) নিত্যব্রজে বাৎসল্যরস প্রয়োজনে বিশুদ্ধ সেবায় অদ্বয়তত্ত্বের নন্দনন্দনত্ব সিদ্ধির দিগ্দর্শন দেন এবং পরিশেষে রসতত্ত্বের স্বরূপ-বিচারে সর্বরসের সমাহার আদ্য

ও মুখ্য রসাত্ময়ে অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীগোপীজনবল্লভেরই স্বয়ং ভগবত্তার স্বরূপতা-নির্ণয় ও সর্ব্বাচিত্ত্য পরাৎপর ধামে স্বরূপ-শক্তির চিল্লীলারস-রঙ্গ-বিলাসময় (সত্যং শিবং সুন্দরম্) শ্রীগোপসুন্দরের রাসবিলাসই (প্রিয়-রস-প্লাবন) জীবের সর্ব্বোত্তম লক্ষ্যস্থল বলিয়া যিনি ইঙ্গিত করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরানন্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩২ ॥

রাধিকা-বিনোদ-মাত্র-তত্ত্ব-লক্ষণাশ্রয়ং

সাধুসঙ্গ-কৃষ্ণ-নাম-সাধনৈক-নিশ্চয়ম্ ।

প্রেম-সেবনৈক-মাত্র-সাধ্য-কৃষ্ণ-তৎপরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩৩ ॥

এইরূপে যিনি সমস্ত শ্রীত-সিদ্ধান্তের পরম সারাৎসার স্বরূপে শ্রীরাধাবিনোদকেই একমাত্র মূল সম্বন্ধ-তত্ত্ব ও সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তনকেই একমাত্র অভিধেয় এবং গোপীজনবল্লভ শ্রীরাধাকান্তের প্রেম সেবাকেই একমাত্র প্রয়োজনরূপে—সুধীজন-সভায় সর্ব্বোত্তম সিদ্ধান্ত প্রদান করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরানন্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীসনাতনাসু-রূপ-জীব-সম্প্রদায়কং

লুপ্ত-তীর্থ-শুদ্ধ-ভক্তি-শাস্ত্র-সুপ্রচারকম্ ।

নীল-শৈল-নাথ-ভক্ত-সঙ্গ-রাধনাদরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীসনাতন ও তদনুগ শ্রীরূপ এবং শ্রীজীবাদি গোস্বামিবর্গকে অনুপ্রাণিত করিয়া যিনি নিজ সম্প্রদায় প্রকাশ করেন এবং লুপ্ততীর্থ ও শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র (বিধি, রাগ ও বিচার-সমন্বিত) সুষ্ঠুভাবে প্রচার করেন, এবং নীলাচলনাথ শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণের সন্নিকটেই স্থায়ী আরাধনা-স্বরূপ প্রকাশে আদর প্রদর্শন করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরানন্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীস্বরূপ-রায়-সঙ্গ-গাঙ্গিরাস্ত্য-লীলনং

দ্বাদশাব্দ-বহ্নি-গর্ভ-বিপ্রলম্ব-শীলনম্ ।

রাধিকাদিরূঢ়-ভাব-কান্তি-কৃষ্ণ-কুঞ্জরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩৫ ॥

অতি অন্তরঙ্গ সঙ্গী শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দের সঙ্গে যাঁর সেই জনমন্মভেদী গঙ্গীরা লীলার প্রকাশ পরাকাষ্ঠা ও সেই সুদীর্ঘ দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী নিদারুণ ও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাগ্নি উদগীরণময় যাঁর দিব্যোন্মাদ সংলাপ (বাহিরে বিষজ্বালা হয়, অন্তরে আনন্দময়) এবং যিনি শ্রীরাধার প্রগাঢ়ভাবে সর্ব্বাত্ম প্রভাবিত ও শ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গজ্যোতিঃ সুশোভিত সেই মদমত্ত গজরাজ-সদৃশ স্বয়ং গোবিন্দ—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরানন্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীস্বরূপ-কণ্ঠ-লগ্ন-মাথুর-প্রলাপকং
রাধিকানু-বেদনার্ত-তীর-বিপ্রলম্বকম্।

স্বপ্ন-বৎ-সমাধি-দৃষ্ট-দিব্য-বর্ণনাতুরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীস্বরূপ-দামোদরের কণ্ঠ ধারণ করিয়া যিনি—শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর শ্রীমতীর বিরহ-প্রলাপসমূহ সখেদে আবৃত্তি করিতে থাকেন ও শ্রীরাধারাগীর বেদনা-কাতর নিদারুণ বিরহানল-প্রদীপ্ত ভাবসমূহের অনুভবমুখে আশ্বাদন করিতে থাকেন এবং যিনি সমাধিবিলাসে প্রত্যক্ষীভূত—ইতরজনের স্বপ্নসদৃশ তথ্যসমূহ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বর্ণনা করিতে থাকেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরানন্দ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩৬ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৯ পৃষ্ঠার পর]

কুটীনাটী

১। ‘কুটীনাটী’ কাহাকে বলে এবং তাহার ফল কি?

“‘কুটীনাটী’-শব্দে—‘কু-টী’ ও ‘না-টী’ এই দুইটি কথা আছে। শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সকল বিষয়েই ‘কু-টী’ দৃষ্টি করেন অর্থাৎ একটি জলাশয়ে স্নান করিলেন, কিন্তু তন্নিকটে কোন মল-ক্ষেত্র থাকায় সেই জলাশয়ের ‘কু-টী’ মনে করিয়া সমস্ত দিন সেই আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, কোন ভাল বিষয় আলোচনা করিতে পান না। ‘শুচিবায়ু’ একপ্রকার কুটীনাটীর স্থল। যাঁহাদের ঐ প্রকার বায়ু আছে তাঁহারা পৃথিবীর কোন স্থলকেই পবিত্র মনে করিতে পারেন না, কোন সময়কেই শুদ্ধ মনে করিতে পারেন না এবং কোন ব্যক্তিকেই শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তের স্মার্তবিরুদ্ধ কোন আচার দেখিলে তাঁহারা আর বৈষ্ণব মনে করিয়া সঙ্গ করেন না। এইস্থলে ‘কু’-টীর উপর ‘না’-টী উপস্থিত হইল। নীচবর্ণের সাধুলোকের প্রতিষ্ঠিত ভগবন্মূর্তির প্রসাদ না পাওয়া একটি কুটীনাটী। কুটীনাটী প্রবল থাকিলে কোন খাদ্যদ্রব্যে সুখলাভ হয় না। কুটীনাটী একপ্রকার মানসিক পীড়া; সেই পীড়া থাকিলে কৃষ্ণভক্তি হওয়া সুকঠিন। বৈষ্ণব-সেবা ও বৈষ্ণবসঙ্গ কুটীনাটীগ্রস্তের পক্ষে বড়ই কঠিন।”

—‘কুটীনাটী’, সং তোঃ ৬।৩

২। শ্রীমহাপ্রভু কোন্ কোন্ ভক্তিপ্রতিবন্ধককে কুটীনাটীর মধ্যে ধরিয়াছেন?

“শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে যে কুটীনাটী পরিত্যাগের বিশেষ পরামর্শ আছে, তাহাতে কোনস্থলে নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি ভক্তিবাধক বস্তুর মধ্যেই কুটীনাটীকে ধরিয়াছেন।”

—‘কুটীনাটী’, সং তোঃ ৬।৩

৩। “মহাপ্রভু ‘কুটীনাটী’ শব্দের কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন?

“‘কুটীনাটী’ শব্দের অর্থ মহাপ্রভু ‘এই ভাল এই মন্দ’ শব্দের দ্বারা করিয়াদিয়াছেন।”
—‘কুটীনাটী’, সং তোঃ ৬।৩

৪। ‘কুটীনাটী’-গ্রন্থ ব্যক্তি কিরূপে নামাপরাধী ও বৈষ্ণবাপরাধী হয়?

“কুটীনাটীগ্রন্থ ব্যক্তির বর্ণাভিমান ও সৌন্দর্য্যভিমান প্রযুক্ত মহামহাপ্রসাদে, ভক্তপদধূলিতে ও ভক্তপদজলে দৃঢ়বিশ্বাস হয় না। তিনি সর্বদা বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধে দোষী; অতএব তাঁহার মুখে হরিনাম হওয়া কঠিন। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের পীড়ার সময়ে ঘৃণা প্রকাশ করেন; কিন্তু মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—হে সনাতন! তোমার দেহে যে কণুরসা হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবের ঘৃণা হয় না।”

—‘কুটীনাটী’, সং তোঃ ৬।৩

৫। কিরূপে ‘তাপ’কে ভণ্ডামি বলা যায়?

“যে-স্থলে তাপের কেবলমাত্র শরীরাত্মক-লক্ষণ, সে-স্থলে ভণ্ডতাই ধর্ম্ম।”

—‘পঞ্চসংস্কার’, সং তোঃ ২।১

৬। কপটীদিগের দেবদেবীপূজায় আগ্রহ কেন?

“নৈবেদ্য খাদ্যসামগ্রী, বিশেষতঃ ছাগ-মাংসাদি পাইবার আশায় কল্লিত দেবদেবীর নিকট বহুতর ধূর্তলোক রতিলক্ষণ প্রকাশ করিয়া কপটরতির উদাহরণস্থল হইয়া উঠে।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৪

৭। শাস্ত্রের ভারবাহিগণ কি কুটিল নহে?

“পরমার্থবিচারেহস্মিন্ বাহ্যদোষবিচারতঃ।

ন কদাচিদ্ব্যতশ্রদ্ধঃ সারগ্রাহিজনো ভবেৎ॥

এই গ্রন্থে (কৃষ্ণসংহিতা) পরমার্থেরই বিচার হইয়াছে, ইহার ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি-সম্বন্ধে দোষ-সমুদায় গ্রাহ্য নয়। তাহা লইয়া সারগ্রাহী জনেরা বৃথালোচনা করেন না। এই গ্রন্থের আলোচনা-সময়ে যাহারা ঐ বাহ্য দোষ-সকলকে বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া এই গ্রন্থের পরমার্থসার-সংগ্রহরূপ প্রধান উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করিবেন, তাঁহারা ইহার অধিকারী নহেন। বালবিদ্যাগত তর্কসমুদায় গম্ভীর বিষয়ে নিতান্ত হেয়।”

—কৃঃ সং, ১০।১৯, অনুবাদ

৮। কপট প্রেমের অভিনয় কিরূপ?

“নাটকাভিনয় প্রায়,

সকপট প্রেম ভায়,

তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ।

ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার,

সদা কর পরিহার,

ছাড় ভাই অপরাধ-দোষ॥”

—কঃ কঃ ‘উপদেশ’, ১৯

৯। ভক্তিতে শিথিলতা-দোষ কখন আসে?

“ধন-শিষ্যাদির উদ্দেশ্যে যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা শুদ্ধভক্তি হইতে সুদূরবর্তী, অতএব তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে।”

—জৈঃ ধঃ ২০ শ অঃ

জীবহিংসা

১। পশুহিংসাদি দুঃপ্রবৃত্তি দূরীকরণের উপায় কি?

“মা হিংসাং সর্বানি ভূতানি”—এই বেদ-বাক্যের দ্বারা পশুহিংসার নিষেধ হইতেছে।

*** যে পর্য্যন্ত মানবগণ সাত্ত্বিক হইয়া পশুবধ, স্ত্রীসঙ্গ-লালসা ও আসব-সেবা পরিত্যাগ না করে, ততদিন তাহারা সেই সেই প্রবৃত্তি খর্ব করিবার উপায়-স্বরূপ বিবাহের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে পশু হনন এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে সুরা পান করুক। ঐ ঐ উপায়দ্বারা প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইলে ক্রমশঃ এসকল ক্রিয়া হইতে তাহাদের নিবৃত্তি ঘটিবে,—বেদের এইমাত্র তাৎপর্য্য। পশুবধ করা বেদের আদেশ নয়।”

—জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

২। হিংসা-বৃত্তিটি কি? কি কি হিংসা একান্তই পরিত্যাজ্য?

“পাপাসক্ত ব্যক্তি তদ্বিপরীত আচরণ করত অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও হিংসা করিয়া থাকে। হিংসা একটা বৃহৎ পাপ। সকলেরই উচিত—হিংসা পরিত্যাগ করা। নরহিংসা অত্যন্ত গুরুতর পাপ। যে নরের প্রতি হিংসা করা যায়, সেই নরের মাহাত্ম্যের তারতম্যদ্বারা হিংসার গুরুতা ও লঘুতা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-হিংসা, জ্ঞাতি-হিংসা, স্ত্রী-হিংসা, বৈষ্ণব-হিংসা, গুরু-হিংসা—এইসকল হিংসা অধিক পরিমাণে পাপযুক্ত। পশু-হিংসাও সামান্য পাপ নয়। উদরপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বার্থবশতঃ যে পশু-হিংসার বিধান করে, তাহা কেবল মানবের অপকৃষ্ট পাশব-প্রবৃত্তির পরিচালন-মাত্র। পশু-হিংসা হইতে বিরত না হইলে নর-স্বভাব উজ্জ্বল হয় না।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৩। জীব-হিংসা ভক্তির প্রতিকূল কেন?

“জীব-মাংস ভোজন করিতে হইলে অবশ্য পরহিংসা করিতে হয়, সুতরাং যে কার্য্যে জীবহিংসা আছে, তাহা ভক্তির প্রতিকূল।”

—‘পরহিংসা ও দয়া’, সঃ তোঃ ৯।৯

৪। হরিভক্তের কি পরহিংসা থাকা উচিত?

“পরহিংসা সর্ব-পাপের মূল, সুতরাং পাপ অপেক্ষা অধিক গুরুতর। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ পরহিংসা-প্রবৃত্তি থাকে না।”

—‘পরহিংসা ও দয়া’, সঃ তোঃ ৯।৮

৫। কোন্ কৰ্ম ভক্তির অনুকূল ও কোন্ কৰ্ম ভক্তির প্রতিকূল?

“যাহাতে পরোপকার আছে, সেই কৰ্ম ভক্তিসম্মত এবং যে-কৰ্মে পরহিংসা আছে, তাহাই ভক্তিবিরুদ্ধ।”

—‘পরহিংসা ও দয়া’, সঃ তোঃ ৯।৮

৬। হিংসা কত প্রকার? রাগ-দ্বেষের ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত?

“হিংসা তিন প্রকার, যথা—নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবহিংসা। দ্বেষ হইতে হিংসার উৎপত্তি হয়। কোন ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি করার নামই—রাগ এবং কোন বিষয়ে বিরক্তি করার নামই—দ্বেষ। উচিত রাগ পুণ্য-মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অনুচিত রাগকে লাম্পট্য বলে। দ্বেষ—রাগের বিপরীত ধর্ম্ম। উচিত দ্বেষও পুণ্য-মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু অনুচিত দ্বেষই হিংসা ও ঈর্ষার মূল।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৭। পশুহিংসা কি মানবধর্ম?

“বেদাদি-শাস্ত্রে যে পশুযাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে কেবল উক্ত পাশব-প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া তাহার নিবৃত্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ফলতঃ পশুহিংসা পশুরই ধর্ম, নরধর্ম নয়।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৮। নিষ্ঠুরতা কয় প্রকার ও তাহার ফল কি?

“নৈষ্ঠুর্য বা নিষ্ঠুরতা দুইপ্রকার অর্থাৎ নর-প্রতি ও পশু-প্রতি নিষ্ঠুরতা। নর-নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে জগতে বিষম উৎপাত উপস্থিত হয়, দয়া জগৎ পরিত্যাগ করে এবং নির্দয়তা-রূপ অধর্ম জগতে প্রবেশ করে।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৯। পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা কি বর্জনীয় নহে?

“আধুনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মো পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অযশঃ কীর্তন করিতেছে। সামান্য বিষয়-লোলুপ লোকেরা গাড়ীর গরু বা ঘোড়াকে যে-প্রকার কষ্ট দেয়, তাহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই সমস্ত পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিবে।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

অপরাধ

১। অজ্ঞাতসারে অসৎসঙ্গ করা কি অপরাধ নহে?

“আপনারা না জানিয়াও অসাধুসঙ্গ করিলে ভক্তির নিকট অপরাধী হইতেছেন।”

—‘বৈষ্ণব-নিন্দা’, সং তোঃ ৫।৫

২। অপরাধের সর্বাধিক গুরুত্ব কেন?

“বৈষ্ণব-জীবের অনাদর ও অসন্মান করিলে অপরাধ হয়। পাপসমূহ সামান্য প্রায়শ্চিত্তেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। পাপ—স্থূল ও লিঙ্গশরীরনিষ্ঠ। আর অপরাধ—জীবের আত্মনিষ্ঠ পতন-বিশেষ। অতএব যাঁহারা ভগবদ্ভজন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অপরাধ হইতে বিশেষ আশঙ্কা থাকা আবশ্যিক।”

—‘বৈষ্ণব-নিন্দা’, সং তোঃ ৫।২

৩। অপরাধ কাহাকে বলে?

“সাধু ও ঈশ্বরের প্রতি (পাপ, পাতক, মহাপাতকাদি) কৃত হইলে তাহাদিগকে ‘অপরাধ’ বলে। অপরাধ—সর্বাপেক্ষা কঠিন ও বর্জনীয়।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৪। অপরাধ থাকিতে কি কৃষ্ণপ্রেম হয়?

“বহু জন্ম কৃষ্ণ ভজি ‘প্রেম’ নাহি হয়।

অপরাধ-পুঞ্জ তার আছয়ে নিশ্চয়।।

অপরাধশূন্য হ’য়ে লয় কৃষ্ণনাম।

তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম।।”

—নঃ মাঃ ১ম অঃ

৫। ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী কাহারো ?

“ঈর্ষা, দ্বেষ, দন্ত অথবা প্রতিষ্ঠাশাদি ভক্তিবাদক প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে-সকল লোক পরের কথা আলোচনা করেন, তাঁহার ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী।”

—‘প্রজ্ঞান’, সং তোঃ ১০।১০

৬। মধ্যমাধিকারীর কিরূপে বৈষ্ণবাপরাধ হয় ?

“মধ্যম-বৈষ্ণব হইতেই শুদ্ধ বৈষ্ণবের গণনা। তিনিই বৈষ্ণববৈষ্ণব-বিচারের অধিকারী; কেন না, শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবাই তাঁহার প্রয়োজন। বৈষ্ণববৈষ্ণব বিচার পরিত্যাগ করিলে মধ্যম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাপরাধ হয়।”

—‘সাধুনিন্দা’, হঃ চিঃ

৭। ‘বৈষ্ণবাপরাধ’ অপেক্ষা অধিক অপরাধ আছে কি ?

“বৈষ্ণব-অবমাননা অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না।”

—‘সমালোচনা’, সং তোঃ ২।৬

৮। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারিগণের পরীক্ষা কোথায় ?

“যিনি জাতিবুদ্ধি করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের অধরামৃত সেবনে পরাঙ্মুখ হন, তিনি সমবুদ্ধিরহিত কপট ব্যক্তি ; তাঁহাকে ‘বৈষ্ণব’ মধ্যে গণনা করা যায় না। যে-সকল লোক জাত্যভিমান করে, মহোৎসবের অধরামৃতই তাহাদের পরীক্ষার স্থল।”

—প্রঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

৯। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করা অনুচিত কেন ?

“যদি আত্মবঞ্চনাকে ভয় করেন, তবে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবেন না।”

—‘বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি’, সং তোঃ ৯।৯

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থ লীলাকালে ‘গোপী’ ‘গোপী’ জপের সময় অন্য ব্রাহ্মণের আক্রমণের যোগ্য হইয়াছিলেন। তখন প্রভুর প্রতি দোষারোপ করা হেতু দান্তিক পড়ুয়াগণের বুদ্ধিনাশ ঘটায় পূর্বপঠিত বিদ্যাবুদ্ধি স্মৃতিপথে না থাকায় তাহাদের চৈতন্য সম্পাদিত হয় নাই। তাহারা আরও শতমুখে প্রভুর নিন্দা করিতে থাকিলে সর্বজ্ঞ প্রভু ঘরে বসিয়া তাহাদের অব্যাহতির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন,—

“যত অধ্যাপক আর তার শিষ্যগণ।

ধর্ম্মী, কন্মী, তপোনিষ্ঠ নিন্দক দুর্জ্ঞন॥

এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে।

আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে॥

নিস্তারিতে আইলাম, হৈল বিপরীত।

এসব দুর্জ্ঞনের কৈছে হইবেক হিত॥

আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়।
 তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয়।।
 মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার।
 এসব জীবেরে অবশ্য করিব উদ্ধার।।
 অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
 সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব।।
 প্রণতি হইতে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
 নিৰ্মল হৃদয়ে ভক্তি করাইব উদয়।।”

এখন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া সেই প্রেমবন্যার প্লাবনে পলায়িত পড়ুয়া, পাষণ্ডী, তार्কিক প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিলেন। সন্ন্যাসী সকল আশ্রমের গুরু—এই জ্ঞানে তাহারা প্রভুপদে প্রণত হইতে থাকিল। এই কৌশলে তাহাদের পূর্বকৃত অপরাধ নষ্ট হইল এবং তাহারা প্রেমজলে ডুবিল। তখন ভোগী মৎস্যগণ ধরা পড়িয়া গেল। পরমবদ্যান্যশিরোমণি প্রভু আপামরনিন্দক পাষণ্ডীকে নিস্তার করিতে অপার চাতুরী বিস্তার করিতে লাগিলেন। অবিবেচকদিগকে প্রকারান্তরে সুবিচারের স্থানে স্থাপিত করিলেন। তাহারা মঙ্গলময় জ্ঞান পাইলে তাহাদের অমঙ্গলময় জীবন নাশপ্রাপ্ত হইল। তিনি শ্লেচ্ছ প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত ভক্ত করিলেন। কেবল কাশীর মায়াবাদী বাকী থাকিয়া গেল। কাশীতে বিখ্যাত পণ্ডিতগণ নিজেরা ব্রহ্ম হইবার অভিলাষে মায়াবাদ-পাণ্ডিত্য প্রসার করিতেছিলেন। তাহারা অত্যন্ত অভিমানে স্ফীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে হীন সন্ন্যাসী মনে করিলেন। তিনি বৃন্দাবনের পথে কাশীতে আসিলে তাহারা উঁহাকে ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন।

শাস্ত্রের আদেশে তৌর্য্যত্রিক (গীত, বাদ্য ও নৃত্য) ব্যসনমধ্যে গণ্য।

“মৃগয়াক্ষঃ দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্থিয়ো মদঃ।

তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।।”

সাধারণ নীতিশাস্ত্রের বিচারে এইগুলি নিতান্ত হেয় কার্য্য। গীত, বাদ্য, নর্ত্তনাদি এইজন্য ছোটজাতির মধ্যে তাহাদের জীবিকার উপায়রূপে দেখা যায়। নট বা নর্ত্তকাদি, হাড়ী, ডোম, চণ্ডালাদির ঐ কৰ্ম্মগুলি থাকে। আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণ, আবার সমস্ত আশ্রমের শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসাশ্রমে এইগুলি দেখিলেই অবশ্য ঘৃণা আসা স্বাভাবিক। যাহারা ঐ তৌর্য্যত্রিক লইয়া থাকে, তাহারা অনার্য্য বা অজলাচরণীয় পাপজীবিমধ্যে গণ্য হয়। সুতরাং মায়াবাদীরা মহাপ্রভুকে তাহাদের সমশ্রেণীস্থ মনে করিয়া অবজ্ঞা করিলেন। কিন্তু পারমার্থিক জীবনযাপনের জন্য চিত্তাপিতোন্মাদ শ্রীহরির লীলামাধুরীর আশ্বাদনরূপ নৃত্যগীতবাদ্য কদাপি হেয় তৌর্য্যত্রিকের মধ্যে গণ্য বা দোষাবহ নহে। এই সমস্ত তত্ত্ব মায়াবাদীর বোধের অতীত। যে বৈরাগ্য কৃষ্ণভক্তির বিদ্বেষী, তাহা মৰ্কটবৈরাগ্য।

“প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তনঃ।

মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্লু কথ্যতে।।”

আধ্যক্ষিক দর্শনে মহাপ্রভুকে সাধারণ মানবের অবৈধ আচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহারা নিন্দা করিল। শ্রেষ্ঠাভিমानी দণ্ডী নারায়ণম্ভ্য পণ্ডিতাভিমानी কাশীবাসী সন্ন্যাসীরা ভাবিল,

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকূলে জাত হইয়া চতুর্থাশ্রম স্বীকার করিয়াও জড়াভিনিবেশ ব্যতীতও নৃত্যগীত-বাদ্যাদি করিলে নিন্দার্ক হইবে না ত' কি? কিন্তু দুর্বুদ্ধিগণ বুঝে নাই যে, 'ভগবদুদ্দেশ্যে কৃত নৃত্য-গীতাদি প্রাপঞ্চিকবিচারে গ্রহণীয় নহে।' তাহারা জানে—সন্ন্যাসীদের নিরন্তর বেদান্তবিদ্যার আবশ্যক। তাহাতে অনাত্মপ্রতীতি ক্ষুদ্রাভিজ্ঞতার মন্দতা বিনষ্ট করে। বেদান্ত মানুষের মঙ্গলবিধান করেন।

“পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানামনুশাসনম্।”

বেদান্তশাস্ত্র মুক্তি দান করেন। বেদান্ত শ্রবণের পর অধ্যাপনার প্রয়োজনীয়তা। তাহাতে মুক্তির অধিকার আসিবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নিম্নাধিকারীর পুরাণ-বর্ণিত হরিনাম করেন। এমত অবস্থায় তাঁহার গার্হস্থ্যাশ্রমই উপযুক্ত ছিল। তামসিক-প্রবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তি লোককে বিপথগামী করে। সুতরাং মহাপ্রভুও সন্ন্যাসীর সাজ লইয়া লোকগুলিকে বিপথে প্রেরণ করিতেছেন। নির্বোধগণ জানে না যে—

“এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।

যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেন্‌মানুকীর্তনম্।।

নিবৃত্ততর্কৈরুপগীয়মানাদ্ ভবৌষধাচ্ছোত্র-মনোহভিরামাৎ।

ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুয়াৎ।।

কর্মা বলস্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানাবলস্বকাঃ।

বয়ং তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলস্বকাঃ।।”

এই সমস্ত পারমার্থিক পঞ্চমপুরুষার্থীয় বিচার তাঁহাদের মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই। ভগবদ্ভজনের জন্য নৃত্য-গীত-বাদ্য একটি প্রধান ভক্ত্যঙ্গ ব্যাপার, উন্নত জীবনের লক্ষণ। কৃষ্ণসেবা যে বেদান্তাধ্যয়ন অপেক্ষা কত বড় তাহা সন্ন্যাসিগণের অবোধ্য ছিল।

“যঃ এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টা পতন্ত্যধঃ।।”

ঈশ্বরই পোষক ও স্বামী, তাঁহার অভক্তেরা কৃতঘ্ন। বর্ণাশ্রমিগণ তাঁহার ভজন ব্যতীত অধঃপাতে যায়। মায়াবাদিগণ এই সমস্ত বিচারে প্রবেশ করিতে পারেন না। সুতরাং মহাপ্রভুকে নিন্দা করায় 'বালিশে উপেক্ষা' ন্যায়ে ঐ দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রতি হাস্যরূপ উপেক্ষা ব্যতীত আর কি ব্যবহার হইতে পারে? তিনি ভাবিলেন, তাহারা বালচাপল্যদ্বারা আপনাদিগকেই দন্ধ করিবে। তাহাদের বৈরাগ্য ফল্গু বা মর্কট। এজন্য তাহারা উপেক্ষণীয়। মথুরা পরাজ্ঞান-ভূমিকা।

“অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি হবত্ৰিকা।

পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ।।”

এইগুলির মধ্যে মথুরা সর্বশ্রেষ্ঠা। ভগবদ্ভক্তগণ মথুরায় বাস করেন। কাশী আধ্যাত্মিকজ্ঞানের—অপরা বিদ্যার ভূমি। মথুরা সর্বরসাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-ক্ষেত্র। সুতরাং মহাপ্রভু মায়াবাদিগণকে উপেক্ষা করিয়া মথুরা গমন করিলেন। মথুরা দেখিয়া পুনরায় তাহাদিগকে উদ্ধারমানসে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মহাপ্রভু কাহারও অধীন নহেন। তিনি স্বতন্ত্র, পরমেশ্বর। মথুরা হইতে আসিয়া কাশীতে

শূদ্রকুলোদ্ভূত চন্দ্রশেখর সেনের বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর লেখনবৃত্তিতে জীবিকা-নির্বাহ করিতেন। তিনি শৌক্যবৈদ্য ছিলেন। তৎকালে শৌক্য-ব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত সকলকেই শূদ্র-সংজ্ঞায় আখ্যাত করা হইত। সন্ন্যাসীদিগের পাকক্রিয়া নাই। শূদ্রাদি পাপজীবীগণের অন্নগ্রহণে শারীর ও মানস দোষের আক্রমণ হয়। সুতরাং তাৎকালিক রীতি অনুসারে সদাচারী ব্রাহ্মণের সৃষ্ট অন্নগ্রহণ নির্দোষ। তপনমিশ্র কেবল বিষুগ্নের নিৰ্ম্মাল্য সংগ্রহ করিতেন। তিনি পঞ্চোপাসক ছিলেন না। এই কারণে শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষক হইয়া তপনমিশ্রের অন্নগ্রহণ ভিক্ষা করিতেন। পঞ্চোপাসকেরা বিষুগ্নকে অন্যদেবতার সমান বা ছোট মনে করিয়া পাষণ্ডী হয় বলিয়া পঞ্চোপাসকের স্পৃষ্ট বস্তু গ্রহণ নিষিদ্ধ। বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া মহাপ্রভু সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ-বাটীতেও অন্নগ্রহণ করিয়াছেন। “বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোহপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।” তামসিক বিচারে মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ-চিন্তা। আসুর প্রকৃতির মানবকুলের বুদ্ধি-মোহনের জন্য ভগবৎপ্রেরিত আচার্য্য শঙ্কর পৃথি বীতে ভক্তিপথ—সহজ রাস্তা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন।

“অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।

মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।।”

ভগবদিচ্ছায় শঙ্কর মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। শঙ্কর পার্বতীকে বলিলেন,—

“মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে।

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা।।”

এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদকে বহুমানন করিয়া মায়াবাদ ও পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি আসুর প্রণালীর সৃষ্টি।

সনাতন গোস্বামী কাশীতে আসিয়া তপনমিশ্রের গৃহে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। তিনি তপনপ্রদত্ত বস্ত্রে কৌপীন ও বহির্বাস করিয়া পরমহংস আশ্রমীর বেষ ধারণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে বেষধারী বা ভেকাশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁহারই অনুকরণে আপনাদিগকে সেইরূপ পণ্ডিতাভিমानी মনে করেন। সনাতন সম্বন্ধজ্ঞানের আচার্য্য। গৌরসুন্দর তাঁহাকে দুই মাস ব্যাপিয়া সমগ্র বেদরহস্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্যসমূহ শিক্ষা দিলেন। সনাতন সেই শিক্ষায় বৃহদ্ভাগবতামৃত দশমটিপ্লনী, হরিভক্তিবিলাসের মূলাদি গ্রন্থরচনা ও ব্রজমণ্ডলে লুপ্ততীর্থসমূহের পুনঃপ্রকাশকার্য্য করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষায় সম্বন্ধজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের রসের উৎকর্ষসমূহ শিক্ষা দিয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র প্রভুর নিন্দা শ্রবণে দুঃখের সহিত জীবনত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পাষণ্ডিগণ বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে তচ্ছবণে জীবন ত্যাগই কর্তব্য। হরিভজনকারী কদাপি বাহিরের খোসা লইয়া ব্যস্ত হন না। গৃহস্থজীবনেও যে হরিভজন সম্ভব হয়, তাহা প্রদর্শন করিতে রামানন্দ রায় প্রভৃতির লীলা। কিন্তু সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে যে নীলকণ্ঠ না হইয়া হলাহলপানে মৃত্যুই অবশ্যজ্ঞাবী। ভক্ত গোলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া যে কোন আকারে থাকিতে পারেন। বিলাতী লোকের চেহারা লইয়া, নিগ্রো বা কামাস্কাট্কার অধিবাসীদের আকারে আসিলেও হরিসেবা করিলে অনেক লোকের উপকার করা যায়। তাহাতেই জীবসেবা হয়। হরিভজনকারীর কদাচিৎ অধঃপতন হয়ই না। তথাপি

প্রমাদবশতঃ অপক-অবস্থায় পতন সম্ভাবনা ঘটিলেও অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। শ্রীনারদ বলিতেছেন,—

“ত্যাগ স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন-পক্কেহথ পতেত্ততো যদি।

যত্র ক বা ভদ্রমভূদমুখ্য কিং কো ব্যর্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্মতঃ ॥”

(ভাঃ ১।৫।১৭)

স্বধর্ম ত্যাগপূর্বক হরিভজন করিতে করিতে অপক অবস্থায় যদি ভজন হইতে ভ্রষ্ট হয় অথবা মৃত্যু লাভ করে, তাহা হইলে তাহার কর্মে অনধিকারহেতু অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। যদিই বা নীচযোনি আদি সেই ভক্তরসিক স্বীকার করেন, তথাপি তাঁহার কদাপি অমঙ্গল হইতে পারে না। কারণ তাঁহার ভক্তিবাসনার সম্ভাব বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বরের ভজনহীন ব্যক্তিগণ কেবল স্বধর্ম আচরণ হইতে কি লাভ করিতে পারে?

সন্ন্যাসীরা প্রভুর নিন্দা করে শুনিয়া তপন ও চন্দ্রশেখর হৃদয়বিদারক দুঃখ করায় মহাপ্রভু তাহাদের উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিয়া এক ব্রাহ্মণের হৃদয়ে প্রেরণা দান করিলেন। তিনি প্রভুপায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া নিবেদন করিলেন,—প্রভো ! আপনি কোনপ্রকার সন্ন্যাসীদের গোষ্ঠীতে যান না, ইহা জানি। তথাপি আপনি আমার গৃহে না আসিলে আমার সমস্ত কামনা ব্যর্থ হয়। একাকী আপনি আসিলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। অতএব কৃপাপূর্বক আজ সন্ন্যাসীদিগের ভিক্ষা-প্রদানকার্য্যে আপনিও আমার সংগ্রহ আবেদন করুন। মহাপ্রভু কেবল কাশীর সন্ন্যাসিগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শনার্থই তদীয় হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া তাহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

ত্রিদিগ্‌-সন্ন্যাসীকে কেন মহারাজ সম্বোধন?

শাস্ত্রে যাঁহাকে ‘ত্রিদিগ্‌ভিক্ষু’ বলিয়াছেন, ‘মাধুকরী ভিক্ষা’ যাঁহার উপজীবিকা, সেই সন্ন্যাসীকে কেন ‘মহারাজ’ সম্বোধন করা হয়—ইহা বোধগম্য হওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সাধারণের বিচারে “যিনি ‘মহারাজ’ তিনি অবশ্যই কোন না কোন রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন এবং প্রজাবৃন্দের সুখ-শান্তি বিধানের নিমিত্ত রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করিবেন।” এই বিষয়টি বিজ্ঞতভাবে আলোচনা করিলে ‘মহারাজ’ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদের নিকট সুপরিষ্কৃত হইবে। ‘মহারাজ’ বলিতে সাধারণতঃ রাজশ্রেষ্ঠ, সম্রাট প্রভৃতিকে বুঝায়। আবার সন্ন্যাসীও মহারাজ উপাধি পাওয়ার যোগ্য। ‘মহারাজ’ অর্থে শান্তির প্রতীক।

রাজতন্ত্রে প্রায়শই দেখা যায়, যাঁহাকে মহারাজের আসনে বসান হইয়াছে, তিনি শাসনের নামে প্রজাগণকে শোষণ করিয়াছেন। সাধারণের দৃষ্টিতে মহারাজের পরিচিতি লাভ করিলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে শোষক ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। ‘শাসন’ ও ‘শোষণ’—এই দুইটী সম্পূর্ণরূপে পৃথক বস্তু। শাসনের মধ্যে রহিয়াছে প্রজাগণের চিত্তসংশোধন এবং তাহাদের মধ্যে সুখ-শান্তি আনয়নের প্রবল চেষ্টা; আর শোষণের মধ্যে রহিয়াছে প্রজাশাসনের নামে নিজ স্বার্থসিদ্ধির ভীষণ পিপাসা। কোন এক রাজ্যের রাজা রাজ্যের পরিসীমা বৃদ্ধি করিতে গিয়া অপর রাজ্য আক্রমণ করিলে সেই রাজ্যের প্রজাগণের সুখ-শান্তির ব্যাঘাত

ঘটে এবং একইসঙ্গে সেই রাজ্যের রাজাও চিরশত্রু হইয়া যায়। পার্শ্ববর্তী রাজার আক্রমণে নিজ প্রজাগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। মোট কথা, জাগতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহারাজগণ জগতে শান্তিস্থাপন ও শান্তিরক্ষা করিতে সম্পূর্ণরূপে অপরাগ।

রাজতন্ত্রের ন্যায় প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্রেও শাসনের মূল উদ্দেশ্য জনগণকে সুখে-শান্তিতে রাখা। কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে দারিদ্র্য অপসারণপূর্বক দেশে শান্তিস্থাপন করাইবার যে প্রচেষ্টা, তাহা ‘ভস্মে ঘি ঢালিবার’ ন্যায় নিরর্থক। অর্থের প্রাচুর্য্য হইলে যদি সুখ ও শান্তি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বর্তমান সময়ে ধনীদিগকেও কেন নানা চিন্তায় জর্জরিত হইয়া অশান্তির অনলে তাপদগ্ধ হইতে দেখা যায়? বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ, কিন্তু তথায় জনসাধারণের অশান্তির চিত্র যে অতীব ভয়াবহ, তাহা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রাপ্ত হইয়া ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিতে হয়। বাস্তবিকপক্ষে কি রাজা, কি প্রজা, কি শাসক, কি শাসিত, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সকলেই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক—এই ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত। জাগতিক উন্নতিবিধান হউক অথবা প্রাকৃত চেষ্টাতে যাহা কিছু হউক না কেন, তাহাতে কখনই অশান্তির মূল উৎপাটিত হইবে না; কারণ মায়ার ত্রিগুণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাজা, শাসক প্রমুখ অপরের কি-প্রকারে তমোগুণ ও রজোগুণে অশান্তির বীজ ধ্বংস করিবেন? স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ ভগবৎসেবা ব্যতীত মায়াবদ্ধ জীবের মঙ্গলের অন্য কোন রাস্তা নাই। সাধারণের দৃষ্টিতে যিনি মহারাজের পরিচয়ে পরিচিত তিনি আসলে প্রকৃতির কবলে কবলিত জড় ‘অহং’ বুদ্ধিসম্পন্ন এক জীববিশেষ।

ত্রিদিগ্গি-সন্ন্যাসীর ভগবৎসেবক ব্যতীত অন্য কোন অভিমান নাই,

তাঁহার শাসনে পৃথিবীতে শান্তির স্রোত প্রবাহিত হয় বলিয়া

তিনিই প্রকৃতপক্ষে ‘মহারাজ’ পদবাচ্য

ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে জানাইয়াছেন,—“যিনি বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ—এই ছয়বেগ দমনে সমর্থ এবং যিনি কামক্রোধাদি ষড়্রিপুকে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত গোস্বামী ও সমগ্র পৃথিবী শাসনে সমর্থ।” প্রকৃত গোস্বামীই ‘মহারাজ’ উপাধি লাভের যোগ্য। জগতের লোকের কল্যাণবিধানের জন্য সিদ্ধ মহাপুরুষগণ তাহাদের প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা অর্থাৎ সংসিদ্ধান্তের কঠোর বাক্যবাণে তাহাদের অবিদ্যা-বন্ধন ছেদন করিয়া তাহাদিগকে প্রেমের রাজ্যে উন্নীত করেন। শাসনের মাধ্যমে চিত্ত সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রজাপালন-কার্য্যটি সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে ত্রিদিগ্গি-সন্ন্যাসিগণের শাসন তুলনারহিত, সুতরাং তাঁহারাই প্রকৃত ‘মহারাজ’।

ত্রিদিগ্গি-সন্ন্যাসিগণ হইতে কৃপালাভ করিয়া পৃথিবীর মানুষ নীরবে পরাজয় স্বীকার-পূর্বক ইঁহাদের নিকট নিজ জীবনকে উৎসর্গ করেন, যন্ত্রণাময় সংসার হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হন ও স্ব-স্বরূপে উদ্ধৃত হন। পাপযুক্ত পৃথিবীর মুক্তি ও বিশুদ্ধপ্রেম দান করিবার জন্য মহদব্যক্তিগণ জগতে আগমন করেন; লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, যুদ্ধ-বিগ্রহের অন্ধ কষিবার

জন্য ইহারা জগতে আসেন না। যাহারা সমাজচ্যুত, অবহেলিত, ঘৃণিত, সমাজের দৃষ্টিতে পতিত, মানবের স্নেহ-মমতা হইতে বঞ্চিত তাহাদের প্রতি ইহাদের করুণার বারি সর্বদাই বর্ষিত হয়। কুসংস্কার ও কুপ্রথারূপ ব্যাধি সমাজে মহামারী আকারে অতীবমাত্রায় প্রাদুর্ভূত হইলে সিদ্ধ মহাপুরুষগণ সুচিকিৎসকরূপে তাহার সমূলে বিনাশ করেন। শাস্ত্ররূপ হস্তদ্বারা সংসার-পতিত জনগণকে পরিত্রাণ করিতে ইহারা বিশেষভাবে দক্ষ। জাগতিক কোন বস্তু সন্ন্যাসীকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। সন্ন্যাসী জানেন, সুখ-দুঃখরূপ ফলপ্রাপ্তি ভগবানের ইচ্ছাক্রমে যথাকালে প্রাপ্য হয়। “দৈবাধীনং জগৎ সর্বং জন্মকর্ম-শুভাশুভম্।” (ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ)। ইহজগতে বা পরজগতে এমন কোন লোভের বস্তু নাই, যাহা কৃষ্ণপদনখাগ্রের শোভা হইতে অধিকতর লোভনীয় হইতে পারে। তজ্জন্য সন্ন্যাসীর ইহ জগতের কোন জিনিসের প্রতি কণামাত্রও লোভ নাই। ‘যেদিকে বাতাস বয় সেইদিকে গা ভাসাইয়া দাও’ নীতিই হইল ইহজগতের চিরস্মরণীয় মন্ত্র। এই বাতাসের অনুকূলে সব ভাব-ভাষা, চলা-ফেরা—ইহজগতের স্বাভাবিক ধর্ম। সন্ন্যাসী ‘যেদিকে বাতাস বয়’—এই নীতির প্রচারক নহেন। তাঁহারা জগতে কিছু ভাসিতে বা কিছু গড়িয়া তুলিতে আসেন না। গড়া-ভাঙ্গা—সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়। তাঁহারা আসেন ভগবৎকেন্দ্রিক সুন্দর ও শান্তির সমাজ স্থাপন করিতে। তাঁহাদের কথা, ভাব ও ভাষা, আচার-প্রচার বিকৃত মানবজ্ঞানে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হয়। সন্ন্যাসী প্রকৃতপক্ষে পরমপবিত্র সর্বাপেক্ষা সুনৈতিক বৈষ্ণব। পরমশুদ্ধতা অর্থাৎ পরমনির্মলতা তাঁহার বিশেষ অলঙ্কার।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, সহজিয়া, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি লোকবঞ্চক

ব্যক্তিগণ কখনই ‘মহারাজ’ পদবাচ্য হইতে পারেন না

মেয়েলি মনোধর্মের কথাতে বিশ্বাসী কৃষ্ণবহিস্মুখগণ মনোরঞ্জনকারীকে যে ‘মহারাজের’ অসমোদ্ধ পদবী দান করেন, তাহা আমাদের দুর্বুদ্ধিতার পরিচয়কে বহন করে। সাধু ও নির্মৎসরগণের পরমধর্ম ভাগবত বেদ্য। তাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র লইয়া ব্যস্ত থাকেন না। যাহারা জগতে মানবহিতার্থিকরূপে পরিচিত, তাহারা মনুষ্য জাতির ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার লইয়া আবদ্ধ; তাহাতে প্রাকৃত বিশ্বহিতের কোন সম্পর্ক নাই। জগতে তথাকথিত পরোপকারী ব্যক্তির কার্য্য কখনও প্রশংসনীয় নহে। তাহাদের দয়া ‘গরু মেরে জুতো দান’ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ‘গরু মেরে জুতো দান’ এর নামে যে পরোপকার তন্মধ্যে মৎসরতা বিদ্যমান। জাগতিক ব্যক্তির মধ্যে যে চিন্তাস্রোত—পরের উপকার করা, তা ‘দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা’র ন্যায়।

জাগতিক উপকারের প্রস্তাব বা ছলনা উপকারের নামে মহা অপকার, আর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর অনুগত সন্ন্যাসিগণের উপকার সত্যসত্যই নিত্য পরম উপকার। তাহা দু-দশ দিনের উপকার নহে—যে উপকারের প্রস্তাব কিছুক্ষণ পরে অপকার প্রসব করিবে—যে উপকারের দ্বারা আর এক পক্ষের অপকার হইবে, যেমন—আমাদের তাৎকালিক সুখে আর একজনের দুঃখ, আবার অপরের সুখে আমার ভোগের অভাব, আমি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া উপকৃত হইলে ঘোড়াগুলির অসুবিধা অনিবার্য্য—এইরূপ উপকারের কথা বলিয়া মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগতগণ লোকবঞ্চনা করেন নাই। যে উপকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের

পক্ষে সর্বকালে সর্বাবস্থায় পরম উপকার, যাহা কোন অবস্থাতেই সন্ধীর্ণ নহে, সেই উপকারের কথাই মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহারা কখনও সন্ধীর্ণ সাম্প্রদায়িক উপকারের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন না। জগতের অনন্তকোটি রোগীকুলের রুচি বা প্রেয়ের মতে মত দিয়া যাহারা চলিয়াছেন, তাহারা শুভানুধ্যায়ী নহেন— প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। সহজিয়ারা অবৈষম্য হইয়াও অর্থ, পাণ্ডিত্য ও জড়যুক্তি দ্বারা নিজদিগকে ধনী-বৈষম্য, কুলীন-বৈষম্য, ভাবুক-বৈষম্য মনে করেন; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বৈষম্যের সেবক সন্ন্যাসিগণই যথার্থ ধনী, তাঁহারা 'মহারাজ' উপাধিলাভের উপযুক্ত পাত্র।

কেবলমাত্র প্রকৃত সন্ন্যাসীই 'মহারাজ' উপাধি লাভের অধিকারী,

সাজা সন্ন্যাসী 'মহারাজ' উপাধিলাভে অনধিকারী

সন্ন্যাসী সাজা ও প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া এক নয়। যিনি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবাকে জীবন ও সার করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া ব্যাপারটি মহাজনের অনুসরণ ও পরাঅনিষ্ঠা, আর সন্ন্যাসী সাজা জিনিষটা অনুকরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী এবং চন্মনির্ম্মিত মৃগ যদ্রপ—ভক্তিবহীন সন্ন্যাসীও তদ্রপ। ইহারা তিনজনেই কেবল নামমাত্র ধারণ করে। সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক কায়, মন, বাক্য, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিষয় প্রভৃতি দিয়া প্রীতির সহিত কৃষ্ণের সেবা করিলেই সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয় ও ভক্ত হওয়া যায়। সন্দ্বেদ্য যেমন রোগীর মনোমত কথা বলিতে পারেন না, প্রকৃত সন্ন্যাসীও তদ্রপ বদ্ধজীবের মনযোগান কথা বলিতে অসমর্থ। তাঁহারা শ্রীতপস্বী, ভক্তিনীতিই তাঁহাদের আদর্শ ও লক্ষ্যের বিষয়। যাহারা সাংসারিক সুখ-শান্তি লাভের জন্য পিতৃমাতৃভক্তি প্রদর্শন করেন এবং বাহ্যে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন, সেই সাজা সন্ন্যাসীদিগের কোনকালে মঙ্গললাভ হয় না। প্রকৃত সন্ন্যাসীর প্রতিটি কার্য্য, প্রতিটি বিচার, প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি কথা, প্রতিটি গমন, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুক্ষণ অকৈতব কৃষ্ণনুশীলন প্রকটকারী। ফল্গুবৈরাগ্য নিরাসপূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনকারী প্রকৃত সন্ন্যাসী প্রেমভক্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া জীবকুলকে শুদ্ধভজনমার্গ প্রদর্শনদ্বারা তাহাদিগকে শাস্ত্রী শান্তি ও নিত্যানন্দের অধিকারী করিতে সমর্থ। সুতরাং তিনি 'মহারাজ' শব্দে সম্বোধিত হইবার উপযুক্ত পাত্র।

তাক্তগৃহ সন্ন্যাসিগণ সর্বক্ষণ নামসন্ধীর্ভন, নাম-প্রেম প্রচার ও মাধুকরী

ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবেন—ইহাই সকল শাস্ত্রের বিধি

কোন অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুকবিশেষ বা তজ্জাতীয় বহু কর্ম্মফলবাধ্য ভিক্ষুক যে দান গ্রহণ করেন ও দাতা যে দান করেন, তদ্বারা ভিক্ষুক ও দাতার কোনও নিত্য মঙ্গল বা উপকার হয় না। একজনকে উপকার করিতে গেলে অপরকে বঞ্চিত হইতে হয়। নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ তথা সন্ন্যাসিগণ নাম-প্রেম প্রচার ও সদগ্রন্থাদি প্রচারোদ্দেশ্যে জগন্মঙ্গল কার্য্যার্থে যে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহা সকলই মাধুকরী ভিক্ষা। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে কায়মনোবাক্যে হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা 'মাধুকরী ভিক্ষা' গ্রহণের অধিকারী। অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের তাহাতে অধিকার নাই। ভারবাহী কন্মী-জ্ঞানী-সম্প্রদায়ও 'মাধুকরী ভিক্ষা' গ্রহণের অধিকারী নহে। সারগ্রাহী ভিক্ষুক তথা সন্ন্যাসী বহুস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া

বহু লোকের প্রদত্ত দ্রব্য ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া বহুলোকের কল্যাণ বিধান করেন। বহু লোক মিলিয়া যেরূপ হরিকীর্তন সাধিত হয়, তদ্রূপ বহু লোকের উপায়নদ্বারাও ভগবৎসেবা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিকীর্তনকারীকে মাধুকরী ভিক্ষা আহরণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। ‘মাধুকরী ভিক্ষা’ ও ‘নামসঙ্কীর্তন’—একই তাৎপর্য্যাপর। মাধুকরী ভিক্ষার মাধ্যমে যদ্রূপ একাধারে বিষ্ণুর সেবা হয়, তদ্রূপ অপরদিকে ভগবানের সেবার দুর্ভিক্ষ অপনোদনে নিয়োজিত হইয়া তদ্বারা সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপকার তথা মঙ্গল সাধিত হয়। ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর মাধুকরী ভিক্ষা প্রকৃত পরার্থিতার জন্য উদ্দিষ্ট হয় বলিয়া তিনিই ‘মহারাজ’ সম্বোধনের একমাত্র দাবীদার।

ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর আনুগত্যে কৃষ্ণানুশীলন করা সর্ব্বাশ্রমীর কর্তব্য

নির্ম্মৎসর ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ পরমধর্ম্মে অবস্থিত। তাঁহারা পরশ্রীকাতর নহেন, সকলেই ভগবৎসেবা-পরায়ণ। ভগবৎস্মৃতি-রহিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই পরশ্রীকাতরতা ধর্ম্ম অবস্থিত। কামাদি অমঙ্গলকর ভৃত্যধর্ম্মে নিযুক্ত হইলেই পরশ্রীকাতরতা আসে। দুরন্ত কলিকাল! কৃষ্ণবহিস্মৃখতার তাণ্ডব, শাস্ত্রের একায়ন পদ্ধতিতে অবিশ্বাস, সন্দেহ, কুতর্কস্পৃহা সৃষ্টি করাইবার জন্য তথাকথিত সমন্বয়ের ধূয়া গান গাহিয়া একশ্রেণীর কলির চর জগতে বিচরণ করিতেছে। এই বিপদের কালে যাহাদের চতুর্বর্গাভিলাষ নাই, যাঁহারা ভগবৎপ্রেমের ভিখারী, সেই ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের সঙ্গেই পরম মঙ্গললাভ হয়। অনায়াসলভ্য বস্তুর জন্য যত্ন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়, চতুর্দশ-ভুবনাतीত, কালাতীত পরম বস্তুই প্রয়োজনীয় হউক।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীশুকদেব

“যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিণে।

সংসার সর্পদষ্টং যো বিষ্ণুরাতম্ অমুমুবৎ।।”

যিনি সংসাররূপ কাল সর্পদষ্ট রাজা পরীক্ষিতকে মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মরূপী যোগীন্দ্র শুকদেবকে প্রণাম করিতেছি।

শ্রীসূত গোস্বামী ব্রহ্মরূপী যোগীন্দ্র শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব সমদৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী, নিर्व্বিকল্প অর্থাৎ ভেদজ্ঞানশূন্য, একান্তমতি অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে বিহুলচিত্ত, মায়াশয়ন হইতে উদ্ধৃত ও মহাযোগী ছিলেন। শ্রীযমরাজও তাঁহার দূতগণের নিকট যে দ্বাদশজনমাত্র ভাগবতধর্ম্ম-তত্ত্ববেতার কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীশুকদেবও অন্যতম। শ্রীশুকদেবের পিতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং তাঁহার মাতার নাম বিটীকা।

একসময়ে কৈলাসে শ্রীমহাদেব এক বটবৃক্ষের তলায় দেবীর সঙ্গে বসিয়া আছেন। দেবী তাঁহাকে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে মহাদেব তাঁহাকে ভগবানের লীলাবিষয়ক কথা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবী শুনিতে লাগিলেন এবং হুঁ হুঁ শব্দ করিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে দেবীর ধূম আসিয়া গেল। আবিষ্টচিত্তে মহাদেব ভগবানের গুণকীর্তন

করিয়া যাইতেছেন এবং হুঁ হুঁ শব্দ শুনিতেছেন। হঠাৎ তিনি দেখিলেন দেবী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ভাবিলেন—দেবী ত' ঘুমাইতেছেন, তবে হুঁ হুঁ শব্দ কে করিতেছে। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিলেন—ঐ বটবৃক্ষের উপরে একটা শুকপাখী বসিয়া আছে এবং সেই পাখীটি হুঁ হুঁ শব্দ করিতেছে। মহাদেব দেখিলেন যে,—শুক একটা তামসিক পাখী, সে এই পরম গোপনীয় ভগবন্তত্ত্বের কথা শুনিবার যোগ্য নয়। অযোগ্য হইয়া গোপনীয় ভগবানের লীলাকথা শুনিয়া ফেলিল! তখন তিনি সেই পাখীটিকে বধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং পাখীটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়ে শ্রীব্যাসদেবের পত্নী বিটীকাদেবী নদীতে স্নান সমাপনান্তে নদীর তীরে উদ্ধর্মুখ করিয়া চুল ঝাড়িতেছিলেন। শুকপক্ষীটি মহাদেব-কর্তৃক তাড়িত হইয়া বিটীকার মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই শুকপক্ষীটি সাধারণ পক্ষী ছিলেন না। ইনি মহাযোগী। ইনি গোলোকের শুকপক্ষী। ইনি বিটীকার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া দীর্ঘ ষোল বৎসর রহিলেন। ভূমিষ্ট হইতেছেন না দেখিয়া ব্যাসদেব অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন,—“প্রভো! আপনি কে আমার পত্নীর গর্ভে অবস্থান করিতেছেন? আপনি কোন সাধারণ জীব নহেন তাহা বুঝা যাইতেছে। আপনার মা খুবই কষ্ট পাইতেছেন, আপনি কৃপাপূর্বক ভূমিষ্ট হউন।” ব্যাসদেব এইরূপ অনুরোধ করিতে থাকিলে গর্ভ হইতে শিশু বলিলেন,—“আমি কোনমতেই ভূমিষ্ট হইব না। ভূমিষ্ট হইলেই আমাকে মায়া স্পর্শ করিবে।” তখন ব্যাসদেব বলিলেন,—“আমি ব্যাসদেব বলিতেছি, আপনি ভূমিষ্ট হউন। মায়া আপনাকে কোনমতেই স্পর্শ করিতে পারিবে না।” গর্ভ হইতে শিশু উত্তর করিলেন,—“আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না। কেন না, আপনার মধ্যে এখনও ‘আমি-আমার’, ‘তুমি-তোমার’ বুদ্ধি বর্তমান রহিয়াছে। তবে আমার একমাত্র নির্ভর পরম কারুণিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর রহিয়াছে। মায়া কৃষ্ণেরই। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র মায়াধীশ। যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন—আমি মাতৃকুক্ষি হইতে জন্মগ্রহণ করিলে আমাকে মায়া স্পর্শ করিবে না, কেবলমাত্র তখনই আমি ভূমিষ্ট হইব।” শ্রীব্যাসদেবের গুরুদেব হইতেছেন শ্রীনারদ গোস্বামী। নারদ তখন দ্বারকায় গমন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আনুপূর্বিক সমূহ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছাতে শুকদেব ভূমিষ্ট হইলেন এবং ভূমিষ্ট হইবামাত্র উলঙ্গ অবস্থায় বনে গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্যাসদেবও ধাবিত হইলেন। সেই সময়ে পথের ধারে সরোবরে অঙ্গরাগণ জলকেলি করিতেছিলেন। শুকদেবকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিয়াও তাঁহারা কিঞ্চিৎমাত্রও লজ্জিত হন নাই, এবং বস্ত্রাদিও পরিধান করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পিতা ব্যাসদেব বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় থাকিলেও তাঁহাকে দেখিয়া অঙ্গরাগণ অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া আস্তে-বাস্তে নিজ নিজ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া বেদব্যাস বিস্মিত হইয়া অঙ্গরাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের এইরূপ অসঙ্গত আচরণের কারণ কি? আমার পুত্র ষোড়শবর্ষীয় যুবা অথচ উলঙ্গ। তাহাকে দেখিয়া তোমরা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলে না। কিন্তু আমি বৃদ্ধ এবং বস্ত্র পরিধান করিয়া আছি, আমাকে দেখিয়া তোমাদের এত লজ্জা কেন? অঙ্গরাগণ বলিলেন,—“আপনার পুত্র বিবিভক্তদৃষ্টি অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টি পবিত্র। তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই, কিন্তু আপনার তাহা আছে। এইজন্যই আমরা আপনাকে দেখিয়া সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইয়াছি।

যাহা হউক, শ্রীব্যাসদেব শুকদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেও তাঁহাকে আর গৃহে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না। শুকদেব বনে গমন করিয়া নির্বিকল্প সমাধি অবলম্বন

করিলেন। তিনি নিবৃত্তিনিষ্ঠ ও আত্মাতেই রমণশীল ছিলেন। সর্ববিষয়ে তাঁহার উপেক্ষা দেখা যাইত। তিনি ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীবেদব্যাসের প্রবল ইচ্ছা যে শ্রীশুকদেব ফিরিয়া আসুন এবং ভাগবত অধ্যয়ন করুন। সেই সময় কাঠুরিয়াগণ প্রায়ই বনে কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য যাইতেন। ব্যাসদেব কাঠুরিয়াগণকে ভগবল্লীলাবিষয়ক ভাগবতীয় কথা শ্লোক শিক্ষা করাইলেন। কাঠুরিয়াগণ বনে গিয়া সেই শ্লোক কীর্তন করিতে লাগিলেন,—

“অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাক্ষী।

লেভে গতিং ধাত্রুচিতাং ততোহন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥”

যে পূতনা কৃষ্ণকে মারিবার জন্য স্তনে কালকূট বিষ মিশাইয়া তাঁহাকে পান করাইয়াছিলেন, সেই পরম দয়াল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত আর কাহারই বা শরণ গ্রহণ করিব।

“বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং

বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।

রজ্ঞান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-

বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদগীতকীর্তিঃ ॥”

শ্রীকৃষ্ণ কটিতে পীতবসন, গলদেশে পঞ্চবর্ণের পুষ্পমালা, কর্ণদ্বয়ে অপূর্ব কর্ণাভরণ ও শিরোদেশে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করত মনোমোহন উৎকৃষ্ট মূর্তি প্রকাশে এবং অধরসুধার দ্বারা বেণুর রক্তদেশ পূরণ করত যশোগানকারী গোপবৃন্দ পরিবৃত্ত হইয়া বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

“শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।

বিন্যস্ত হস্তমিতরেণ ধুনানমজ্জং কর্ণোৎপলালককপোলমুখাজ্জহাসম্ ॥”

নবীননীরদ শ্যাম হৃষীকেশ কটিতে পীতাম্বর বস্ত্র, গলদেশে বনমালা এবং ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও নবীন কিশলয় শিরে ধারণ করত অভিনব নটবর বেশে দণ্ডায়মান হইয়া পার্শ্বস্থিত সখার স্কন্ধে বামহস্ত বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ করে লীলাকমল ঘূর্ণন করিতেছিলেন। কর্ণদ্বয়ে উৎপল ও কুঞ্চিত কেশজালে সেই হাস্যবদনের কি অপূর্ব শোভাই হইয়াছিল।

এই শ্লোকে তৎকালোচিত ব্রাহ্মণবনিতাগণের হৃদয়গ্রাহী ভগবদ্ভূতের বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র বসন-ভূষণাদি সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া অভিনব নটবরবেশে ব্রাহ্মণীগণের চিত্ত বিনোদনপূর্বক লীলাকমল ঘূর্ণন করত দেখাইয়াছেন যে—তাঁহাদের হৃদয়কমল তাঁহারই হস্তগত এবং তাঁহাদের ন্যায় পরম ভক্তের আনুকূল্য করিবার জন্য ভগবানের হৃদয়কমলও নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইতেছে।

শ্রীশুকদেব কাঠুরিয়াগণের মুখে এইপ্রকার হরিগুণানুকীর্ণন শ্রবণ করিলে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয় এবং সেই ব্রহ্মানন্দ অনুভব তাঁহার আক্ষেপের বিষয় হইয়াছিল। তিনি বুঝিলেন ইহার প্রকাশক একমাত্র তাঁহার পিতা শ্রীব্যাসদেব ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীবেদব্যাস লোকসকলের নিমিত্ত ভগবল্লীলাময় সর্বশাস্তিনিকেতন, সর্বপুরুষার্থসাধক সর্ববেদতুল্য সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ নিবৃত্তিমার্গনিরত নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন। তিনি আবার উহা গঙ্গাতীরে প্রায়োপবিষ্ট ও পরমর্ষিগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

—শ্রীহরিনাস বায়, ভক্তিশাস্ত্রী

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর]

আরও জানা যায়,—“ভগবদীক্ষা-প্রভাবে শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব।”
অর্থাৎ “ভগবদীক্ষা-প্রভাবে শূদ্রাদি কুলোদ্ভূত ব্যক্তিরও বিপ্রসাম্য নিশ্চিতই সিদ্ধ হয়। (‘এব’ শব্দ নিশ্চিতার্থে ব্যবহৃত)।”

ভারত-প্রমাণ—

“এতৈঃ কৰ্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতি-কুলোদ্ভবঃ।

শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।।”

(মহাভারত, অনুশাসন পর্ব ১৪৩।৪৬)

“হে দেবি! নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও এই সকল কৰ্ম্মফলদ্বারা আগমসম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক-বিধান-অনুসারে দীক্ষিত হয়ে দ্বিজত্ব সংস্কার লাভ করেন।” শূদ্রেরও পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-প্রভাবে শূদ্রত্ব অপগত হয়ে ব্রাহ্মণত্ব বা বৈষ্ণবত্ব লাভ হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে—শূদ্র যদি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে ভগবৎসেবার বা শালগ্রাম-সেবার অধিকার পায়, তাহলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে ভগবান্ “চাতুৰ্বর্ণং ময়া সৃষ্টম্”—একথা বলেছেন কেন? বর্ণীগণের অধিকার প্রসঙ্গে জানা যায়, চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ এবং ব্রাহ্মণেরই শালগ্রাম-সেবাপূজায় একমাত্র অধিকার বর্ত্তেছে; কিন্তু শূদ্র সর্ব নিকৃষ্ট বর্ণবিধায় ব্রাহ্মণাদি অপর তিন বর্ণের সেবার অধিকার পেয়েছে। শূদ্রকে ব্রাহ্মণের পদমর্য্যাদা দিলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ণ-বিভাগের মর্য্যাদা থাকে কি? তদুত্তরে বলা যায়,—চারি বর্ণ ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম উপাধিভূত ধৰ্ম্ম; তাহা জীবাত্মার ধৰ্ম্ম নয়। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের ও অন্ত্যজগণের জীবাত্মাসকলের ধৰ্ম্ম একই প্রকার। প্রত্যেক জীবাত্মা ভগবানের থেকে এসেছে, তাই ভগবানকে লাভ করাই জীবাত্মার ধৰ্ম্ম। কেবল ব্রাহ্মণই ভগবানের সেবা-পূজা করবে ও ভগবানকে লাভ করতে পারবে, আর শূদ্র সারাজীবন শূদ্রই থাকবে, ভগবানের সেবা-পূজায় অধিকার পাবে না ও ভগবানকে পেতে পারবে না,—তা হতে পারে না। যে পর্য্যন্ত মানুষের জড় স্থূল বা সূক্ষ্ম ঔপাধিক বিচার থাকে, যোষিৎসঙ্গ জাত জন্মগত উচ্চাচ বিচার থাকে এবং মানুষ পার্থিব কৰ্ম্মমার্গে আকৃষ্ট হয়ে বাস্তব সত্যের সেবায় উদাসীন থাকে, তৎকালাবধি বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম পরিহার করে কৃষৈকেশরগতা লাভ করতে পারে না। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ মায়িক দেহাভিমানী কৰ্ম্মজড়গণের জন্য বর্ণবিভাগের ব্যবস্থাদি নিরূপণ করলেও শূদ্র-অন্ত্যজ প্রভৃতিরও যে তাঁহাকে নিশ্চিতভাবে লাভ করতে সমর্থ হবে—এমন ভরসাও গীতার ৯ম অধ্যায়ে “মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য.....” শ্লোকে ব্যক্ত করেছেন। শ্রীভগবান্ তদীয় সখা অৰ্জুনকে বলেছেন,—

মম্ননাভব মদ্বক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।।” (গীতা)

অর্থাৎ “তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার সেবাপরায়ণ হও, মৎ যজনশীল হও এবং আমাতে নমস্কারপরায়ণ হও—এইভাবে মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে মন নিয়োগ করলে

আমাকেই প্রাপ্ত হবে। ইহা তোমার নিকট সত্যই-প্রতিজ্ঞা করছি, যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।” উক্ত শ্লোকে ভগবান্ স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন যে,—প্রথমতঃ—তাঁর শরণাপন্ন দাসানুদাস হয়ে ভক্তিসহকারে তাঁকে প্রণাম করা, দ্বিতীয়তঃ—অন্য কার্য্য না করে তাঁর যজনরূপ কার্য্য করা, তৃতীয়তঃ—তাঁর নাম-গুণাদির শ্রবণ-কীর্তনে সর্বদা নিরত হয়ে তাঁর সেবা করা, চতুর্থতঃ—তাঁর ভক্ত হয়ে সর্বদা তাঁর সুখচিন্তায় বিভোর হয়ে তদগত-চিত্ত হওয়া,—এইরূপভাবে তাঁকে আশ্রয় করলে তবেই তাঁকে পাওয়া যাবে।

ভগবান্ এস্থলে অর্জুনকে ‘তুমি আমার প্রিয়জন’ বলে সম্বোধন করায় ইহাই প্রতীতি হয় যে, তিনি প্রিয়জন ব্যতীত এবশ্বিধ জ্ঞান সাধারণ জীবকে প্রদান করেন না। সুতরাং ঐ শুদ্ধ বিজ্ঞান-সমন্বিত তত্ত্বজ্ঞান তাঁর প্রিয়জনের কৃপায় পাওয়া যাবে। জ্ঞানি-যোগিগণ ভগবানের প্রিয় নন, কেননা তাঁরা নিজ নিজ সুখসাধনের জন্য তথা মুক্তিলাভের জন্য কামনা নিয়ে ধ্যান-যজনাदि করে থাকেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে শ্রীভগবানের প্রীতিমূলেই উহা সম্পন্ন করেন। ভগবানের প্রিয়জন কাঁহার? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১২শ অধ্যায়ে ২০শ শ্লোকে জানিয়েছেন,—“শ্রদ্ধাধনা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ”—অর্থাৎ যে-সকল ব্যক্তি প্রথমতঃ আমাতে প্রকৃত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত তথা সাধুসঙ্গক্রমে মৎবিষয়িণী শ্রদ্ধাযুক্ত হন, দ্বিতীয়তঃ শ্রদ্ধার পুষ্টির পর মৎপরায়ণ অর্থাৎ আমাতে (আমার শ্যামসুন্দর রূপে) ঐকান্তিকী নিষ্ঠাযুক্ত হন এবং তৃতীয়তঃ তৎপরে নিষ্ঠার পরিপক্বতায় আমার প্রীতিযুক্ত বিশুদ্ধ প্রকৃত পূর্ণ সেবকভাব উদিত হয়,—এইরূপ শুদ্ধভক্তগণই আমার অত্যন্ত প্রিয় হন। অতএব, শ্রীভগবানের প্রিয় হতে গেলে ভক্তির উক্ত তিনটি অবস্থা অতিক্রম করতে হয়। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ৯।৪।৬৩) উল্লিখিত ভগবদ্ভাক্য, যথা,—“সাধুভির্গুস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ” অর্থাৎ “পরমভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করে আছেন। আমি ভক্তজনেরই প্রিয়।” নিত্য সম্বন্ধের বস্তু পরমপ্রিয় ভগবানকে সেবা করতে পারলেই ভক্তগণ সুখী হন,—“প্রিয়স্য সেবা সুখ রূপৈব” (ভক্তিসন্দর্ভ)। ভগবানের প্রিয়জন হওয়ার জন্য উচ্চকূলে বা উচ্চবর্ণে জন্মের কোন প্রয়োজন নেই ; যথা ভগবদ্ভাক্য—“ন মেহভক্তশ্চতুর্বেদী মদুক্তঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ।” (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১০ম বিলাসে ৯১ শ্লোকধৃত বচন)। অর্থাৎ—“চতুর্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হলেই যে ভক্ত হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডালকূলে অবতীর্ণ হলেও আমার প্রিয়।” ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু কন্মের কথা, জ্ঞানের কথা, ফল্লু-বৈরাগ্যের কথা ও অষ্টাঙ্গ যোগের কথা প্রচার করেন নি ; তিনি শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করেছেন। শুদ্ধভক্ত সাধুগণ ভগবানকে জেনেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর সঙ্গে প্রীতির ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। শুদ্ধভক্তগণ প্রিয়শ্রবা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর বৈশিষ্ট্য, ধাম প্রভৃতির কথা কীর্তন করে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করত আমাদের ভগবানুখী করে দেন। এইভাবে শুদ্ধভক্ত সাধুগণের কৃপায় ভক্তির আশ্রয় ভগবানের প্রতি মমতাধিক্য আসে। তাই ভগবৎপ্রিয় সাধুসঙ্গই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ভগবৎপ্রিয় সাধুই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ও গুরু হওয়ার যোগ্য। শ্রীগুরুদেব প্রাকৃত জাতিকূলের অন্তর্গত মর্ত্য জীব নন। যথা,—

বিপ্রক্ষত্রিয় বৈশ্যশচ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।

শূদ্রাশচ গুরবন্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

“বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতি শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের গুরু হতে পারেন,—ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু ভগবৎপ্রিয় অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শূদ্রকুলে অবতীর্ণ হলেও উক্ত ত্রিবিধ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলোদ্ভূত ব্যক্তির ‘শ্রীগুরুদেব’।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে,—বিপ্রই হউন বা শূদ্রই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, তিনিই গুরু।

“কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয় ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭)

শ্রীগৌর-পার্বদপ্রবর শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত ‘শ্রীপ্রেমবিবর্ত’ গ্রন্থে উক্ত হয়,—

কিবা বর্ণী, কিবা শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রমহীন।

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য্য প্রবীণ ॥

আসল কথা ছেড়ে ভাই! বর্ণে যে করে আদর।

অসদ্গুরু করি’ তা’র বিনষ্ট পূর্বাপর ॥”

শাস্ত্র আরও বলেন,—

“ষট্‌কৰ্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্ৰতত্ত্ববিশারদঃ।

অবৈষ্ণবো গুরুৰ্ন স্যাৎবৈষ্ণবঃ স্বপচো গুরুঃ ॥” (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত পাদ্মবচন)

“যজ্ঞ, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কৰ্ম্মনিপুণ এবং মন্ত্ৰ-তত্ত্ববিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও গুরু হতে পারেন না, কিন্তু চণ্ডালকুলে প্রকটিত বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণবই গুরু হবার যোগ্য।”

অতএব, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার “মন্যনা ভব মদ্বক্তো.....” শ্লোকটী শ্রীভগবানের সর্বগুহ্যতম অন্তরঙ্গ উপদেশ হওয়ায় উক্ত উপদেশানুসারে জাতি-কুল-ধৰ্ম্ম-নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিরই ভগবৎ-সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা ভগবৎপ্রিয় সদ্‌গুরুদেবের চরণাশ্রয়পূর্বক ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করা একান্ত কর্তব্য এবং ইহাই ভগবানের সাক্ষাৎ নির্দেশ।

মৎকৰ্ম্মকৃন্মাৎ পরমো মদ্বক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্বেরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ (গীতা)

অর্থাৎ—“হে পাণ্ডব! যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন অর্থাৎ মৎসম্বন্ধীয় মন্দির-নিৰ্ম্মাণ, মার্জ্জন, আমার পুষ্পবাটী, তুলসীকানন সংস্কার এবং তৎসেচনাদি কৰ্ম্ম করেন; যিনি মৎপরায়ণ অর্থাৎ আমাকেই একমাত্র পুরুষার্থ জানেন; যিনি মদ্বক্ত অর্থাৎ মচ্ছবণাদি নববিধ ভক্তিরস নিরত; যিনি সঙ্গবর্জিত অর্থাৎ ফলাসক্তিরহিত এবং মদ্বিমুখ-সংসর্গ-অসহিষ্ণু, যিনি সর্বভূতে দ্বেষরহিত অর্থাৎ নিজ পূর্বকৰ্ম্মই স্বক্ৰেশের কারণ বিচারপূর্বক নিজ বৈরাচরণকারীর প্রতিও শত্রুভাবশূন্য, পরন্তু সদয় ভাবযুক্ত—তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লাভ করেন, অন্য আমাকে লাভ করতে পারে না।”

উক্ত শ্লোকে “যঃ স মামেতি” অর্থে যিনি এইরূপ মদ্বক্ত, তিনি যে কোন জাতি, কুলের বা যে কোন আশ্রমের অন্তর্গত হোন না কেন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন—

ইহাই প্রতিপদ্য : । সুতরাং ভগবানের প্রিয়জনের আনুগত্যে নিগুণ ভূমিকায় স্থিত হয়ে ভগবৎসেবা-পূজা, অধিকার সকল মানুষই প্রাপ্ত হতে পারেন।

ব্রহ্মসংহিতায় ৫।৬১ শ্লোকে ভগবান্ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে বলেছেন—“ধর্মান্যান্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্”—অর্থাৎ অন্য সকল ধর্ম তথা অজ্ঞানপ্রসূত চতুর্বর্গাত্মক ধর্মসমূহকে পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমাতেই অনন্য শ্রদ্ধামূলক বিশ্বাসসহকারে আমাকে ভজন কর।

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, “শুদ্ধভক্তি-লক্ষণ ধর্মই প্রকৃত জৈবধর্ম অর্থাৎ জীবের নিত্যধর্ম। অন্য যতপ্রকার ধর্ম সকলই ঔপাধিক ধর্ম। নির্বাক-লক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞান ধর্ম, কৈবল্য-লক্ষিত অষ্টাঙ্গাদি যোগধর্ম, জড় সুখ-লক্ষিত বহিস্মুখ কর্মকাণ্ডরূপ ধর্ম, কর্ম-জ্ঞানের সম্বন্ধ সংযোগরূপ জ্ঞানযোগ ধর্ম, শুদ্ধবৈরাগ্য যোগধর্ম, কুলধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম—এইপ্রকার বহুবিধ ঔপাধিক ধর্ম দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত পরিত্যাগপূর্বক শ্রদ্ধামূলক ভক্তিধর্ম অবলম্বন করে আমাকে ভজন কর।”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় “সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য” শ্লোকেও কুলধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্মাদি পরিত্যাগ করে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করার কথা ব্যক্ত হয়েছে। অতএব কুলধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম প্রভৃতি ঔপাধিক ধর্ম পালন করে তন্মধ্যে অধিষ্ঠিত থেকে তথা মায়িক ভূমিকায় অবস্থান করে কুল-বর্ণাদির অতীত অচ্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করলে তাঁর পাদপদ্ম লাভ হবে না, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

কর্ম-জ্ঞানের প্রাকৃত সুবিধামূলক বর্ণাশ্রম ধর্মে বিষ্ণু উপাসনা বৈষ্ণবতার ভাগ মাত্র। জাতি-কুলাদি অভিমান ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত অচ্যুত অধোক্ষজ বিষ্ণুর উপাসনা হয় না। বর্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচারধারার ভগীরথ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ‘বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম’ নিবন্ধে বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমের অতীত বলে জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,— “বর্ণ-ধর্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় বৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকলেও তাঁরা সমাজকে পোষণ করা বা তার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা’—উদ্দেশ্য বলে মনে করেন না। তাঁদের ক্রিয়াদ্বারা ‘সমাজ পুষ্ট হোক বা সমাজের সর্বনাশ হোক’—এ চিন্তা হৃদয়াকাশকে পূর্ণ করে না। বৈষ্ণব বর্ণ-চতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়ের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করার জন্য ব্যস্ত নন। তাঁর ক্রিয়া ‘বর্ণবিধি অতিক্রম করল বা আশ্রম নিষেধ মানল না’—এজন্য তিনি কারও নিকট সঙ্কোচিত নন ; যেহেতু ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁর ক্রিয়াসমূহ ন্যস্ত। বৈষ্ণব ‘ব্রাহ্মণ হউন বা শূদ্র-চণ্ডাল হউন’—একই কথা ; ‘গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন’ তাঁর গৌরব বা অগৌরব নেই। ভগবদ্ভক্তির জন্য বৈষ্ণব নরক লাভ করুন বা স্বর্গলাভ করুন’—একই কথা। ভগবৎ-প্রাপ্তিতেও তাঁর যে প্রেম, ভগবদ্-বিরহেও সে প্রেমের খর্ব্বতা নেই। বৈষ্ণব কিছু আশা করেন না ; তাঁর কিছুই অভাব নেই। ব্রহ্মকামীর অভাববশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের ঔৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হলেই তাঁর চিরবাঞ্ছিত ব্রহ্মরূপ-চমৎকারিতা হেয়ত্ব লাভ করে। ব্রহ্মকামী মায়িক নিগড়ে নিতান্ত অস্থির। বৈষ্ণবের তাতে ধৈর্য্যচ্যুতি নেই। বৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই মায়িক কামফলপ্রসূ ক্রিয়াকারীদিগের মত হলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক।

তিনি আরও লিখেছেন,—“মায়াবদ্ধ জীবের কৃত্রিম কৃষ্ণদাসত্ব—প্রেমভক্তি সাধনের পরিপন্থী। বৈষ্ণবের সর্বদা একটি স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তিনি শ্রীগোপীবল্লভ-দাসানুদাস পরতন্ত্র, স্বাধীন নন। (জড়) স্বাধীনতা তাঁহাতে সম্ভবপর নয়, যেহেতু তাঁর তদীয় স্বরূপ স্বাতন্ত্র্যধর্ম বিক্রয়দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস্য লাভ করেছেন। একথা যদি বৈষ্ণবাখ্য জীবের স্মৃতিপথে জাগরুক থেকে পূর্বোক্ত বিতর্কসকল হৃদয়ে স্থান পায়, তাহলে তার কেবল কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্যধর্ম কপটাবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিক্রীত হয়েছে। বস্তুতঃ তদীয়ত্ব ধর্ম-মায়ার নিকট বিক্রয় করে মায়া-দাস হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যস্ত। কৃত্রিম কৃষ্ণদাস, শ্রীবৈষ্ণব হতে বহুদূরে অবস্থিত। তিনি প্রেমভক্তি সাধনের পরিবর্তে কামের সাধনে অনিত্য দুঃখ-নিবৃত্তি করছেন মাত্র। এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই সামাজিকগণ বিধি-নিষেধসকল ব্যবস্থা করেছেন।” (সং তোঃ ১১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ২৬ পৃষ্ঠা)

ভগবান্ বিষ্ণু জাতি-কুলের উর্দ্ধে ত্রিগুণাতীত পুরুষোত্তম। বর্ণাশ্রম-ধর্মীদের মধ্যে মিশ্র সত্ত্বগুণযুক্ত সর্ববেদান্তবিদ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভগবান্ বিষ্ণুর ঐকান্তিক সেবক তথা নিগুণ শুদ্ধ বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করে জানিয়েছেন,—

“ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।

সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ।।

সর্ববেদান্তবিংকোটিা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।

বৈষ্ণবাণাং সহস্রেভ্য একান্তেকো বিশিষ্যতে।।”

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যা-ধৃত গারুড়-বাক্য)

অর্থাৎ—“সহস্র ব্রাহ্মণ হতে একজন সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যান্ত্রিক শ্রেষ্ঠ, সহস্র যান্ত্রিক অপেক্ষা একজন সর্ব-বেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব-বেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন ঐকান্তিক বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ (!)

এই অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত যত অপরাধ আছে, তার মধ্যে বৈষ্ণবাপরাধকেই ভয়ঙ্করতম বলে জানা যায়। বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব, কৃষ্ণ এবং কাষ্ণ, বিষয় ও আশ্রয়, ভগবান্ ও ভক্ত পরস্পর এক অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বে আবদ্ধ—একজনের আনন্দে অপরজন আনন্দিত হন—একজনের দুঃখে অপরজন দুঃখিত হন—একজনের গুণস্মরণে অপরজন বিকল হন—একজন অপরজনের অন্তর্যামিস্বরূপ—একজন অপরজনকে ছাড়া আর কিছুই জানেন না, জানতে চান না। ঠিক এই বিচারটি শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের নিকট সদ্য অপরাধ করে আসা শ্রীদুর্কাসা ঋষিকে ভগবান্ স্বয়ংই বুঝিয়েছিলেন,—

“সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।

মদন্যন্তে না জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।” (ভাঃ ৯।৪।৬৮)

“হরিহর আত্মা” বলে যে একটি কথা আছে, তা এই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব নামক বিচারটীরই এক অবশ্যগ্ভাবী ফল। কেবল শ্রীহরি এবং হরের মধ্যেই সেই বিচারটি আবদ্ধ নয়—ভগবান্ এবং ভগবৎপার্ষদ মাত্রই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে পরস্পর এইপ্রকার নিগূঢ় সম্পর্কে সম্পর্কিত। সুতরাং এই অবস্থায় ভক্তের প্রতি সংঘটিত যে কোন অপরাধই যে ভগবানের কাছে অসহনীয়—তা একেবারেই সহজবোধ্য। প্রিয়জনের প্রতি কোন্ দ্রোহাচরণ কে-ই বা সহনে সমর্থ হয়? স্বয়ং বিষ্ণুও এক্ষেত্রে অসমর্থ—তাই বৈষ্ণবাপরাধ এত মারাত্মক। “আরাধনাং অপগতঃ”—এটি অপরাধ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। বৈষ্ণবাপরাধের ফলে একেবারে বিষ্ণুর আরাধনা থেকেই অপসারিত হতে হয়—বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব পরস্পর এতই অবিচ্ছিন্ন তত্ত্ব।

আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গ—‘শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ’। শচীনন্দন ভগবান্ শ্রীগৌরহরি বৈষ্ণবাপরাধের ভয়াবহতা বুঝাতে গিয়ে নিজের মায়ের সম্বন্ধেই এক অতি অদ্ভুত লীলা সংঘটন করেছিলেন। একদিন শ্রীবাস-মন্দিরে বিষ্ণুখট্টায় আরুঢ় হয়ে শ্রীগৌরসুন্দর নিজাভিন্ন শালগ্রামসকল কোলে স্থাপন করে নিজতত্ত্ব নিজমুখে বর্ণন করতে লাগলেন। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর এই মহাপ্রকাশ দর্শন করে তৎক্ষণাৎ তাঁর মস্তকে ছত্র ধারণ করলেন, গদাধর প্রভু মহাপ্রভুর বামদিকে স্থিত হয়ে তাঁকে তাম্বুল পরিবেশন করতে লাগলেন, শ্রীবাসাদি ভক্তগণ সানন্দে তাঁকে চামর ঢুলাতে লাগলেন। ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীমন্নহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণের সমক্ষে দানছত্র খুললেন—“তোমাদের যার যে বাঞ্ছা, তা আমার কাছে প্রকাশ কর।” কৃষ্ণপ্রেমাকাঙ্ক্ষী সেই ভক্তগণ তখন পরমানন্দে তাঁদের মনোভিলাষ জ্ঞাপন করতে লাগলেন—কেউ তাঁর ভগবদ্ভিমুখ পিতার জন্য, কেউ পুত্রের জন্য, কেউ বা পত্নীর জন্য কৃষ্ণে মতি প্রার্থনা করলেন। আর বিশ্ব-ভর্তা শ্রীবিশ্বন্তর হাসতে হাসতে সকলকে তাঁদের বাঞ্ছিত প্রেমভক্তি প্রদান করতে লাগলেন। এদিকে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর নিকট স্বয়ং শচীমাতার জন্যই প্রেমভক্তি প্রার্থনা করলেন। মহাপ্রভু তদুত্তরে বললেন,—

* * —“ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস।

তাঁরে নাহি দিমু প্রেমভক্তির বিলাস।।

বৈষ্ণবের ঠাঁঞি তা'ন আছে অপরাধ।

অতএব তা'ন হৈল প্রেমভক্তি-বাধ।।”

সে কি! শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ! শ্রীবাস প্রভু আকাশ থেকে পড়লেন। এ কথা শ্রবণও যে দেহত্যাগের সমান! স্বয়ং ভগবান্ যাঁর গর্ভে পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই জগজ্জননী শচীমাতার প্রেমভক্তিতে অধিকার নেই! শ্রীবাস পণ্ডিত কিছুতেই তা মেনে নিতে পারলেন না। এখন প্রশ্ন—শ্রীবাস প্রভু কি তাহলে শচীমাতাকে প্রেমভক্তিশূন্য বলে ভেবেছিলেন, যার জন্য তাঁকে মহাপ্রভুর সেই প্রেমভক্তি-বিতরণ-ছত্রে শচীমাতার জন্য প্রার্থনা করতে হয়েছিল? শচীমাতা বাৎসল্য প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি—সেই প্রেমগর্ভসিন্ধু মাঝে প্রেমবশ্য গৌরেন্দু উদিত হয়েছিলেন। তিনি যেমন কোন কস্মফলবাধ্য কোন মহিলার গর্ভে আবির্ভূত হননি, তেমনই শচীমাতাও কেবল কোন সুকৃতি বা সৌভাগ্যবশে গৌরহরিকে পুত্ররূপে লাভ করেন নি। যখন যখনই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের কোন নরলীলার প্রসঙ্গ উদয়

হয়েছে, তখন তখনই ভগবান্ এই শচীমাতার মাধ্যমেই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছেন। স্বয়ং শ্রীহরিই শচীমাতার এই তত্ত্ব আমাদেরকে জ্ঞাপন করেছেন।—

প্রভু বলে,—“মাতা, তুমি স্থির কর মন।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন।।
চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণ-গ্রাম।
কোন কালে আছিল তোমার ‘পৃশ্ণি’-নাম।।
তথায় আছিল তুমি আমার জননী।
তবে তুমি স্বর্গে হৈলে ‘অদिति’ আপনি।।
তবে আমি হইলুঁ বামন অবতার।
তথাও আছিল তুমি জননী আমার।।
তবে তুমি ‘দেবহুতি’ হৈলা আর বার।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার।।
তবে ত’ ‘কৌশল্যা’ হৈলা আর বার তুমি।
তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি।।
তবে তুমি মথুরায় ‘দেবকী’ হইলা।
কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিল।।
তথাও আমার তুমি আছিল জননী।
তুমি সেই দেবকী, তোমার পুত্র আমি।।
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মন্মে।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭শ অধ্যায়)

কেবল তাই নয়, এই কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ণনাত্মক কলিয়ুগে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর আরও দুইটি অবতারত্বের বিচার স্বয়ংই ঘোষণা করেছেন—সেই দুই অবতারের ক্ষেত্রেও এই শচীমাতা জননীর ভূমিকায় স্থিত। প্রথমটি শ্রীগৌরচন্দ্রে অর্চ্যাবতার—সেক্ষেত্রে শচীমাতা ধরণীস্বরূপা এবং দ্বিতীয়টি তাঁর নামাবতার—সেস্থলে শচীমাতা জিহ্বাস্বরূপা।

“আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ণনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।।
মোর অর্চা মূর্তি মাতা তুমি সে ধরণী।
জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী।।”

সুতরাং শচীমাতার অস্তিত্ব ভিন্ন ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। প্রেমময় শ্রীভগবানের নাম ও রূপের যিনি জননী এবং যিনি তাঁর প্রেমাতুর পরিকরগণের নিকট সর্বজননীরূপে পরম আদৃত, সেই শচীমাতাকে কখনই প্রেমভক্তিশূন্য বলে ভাবা যায় না। তথাপি যে পরম মণ্ডিত শ্রীবাসপ্রভু শচীমাতার জন্য ঐপ্রকার প্রার্থনা করেছিলেন, তা অন্তর্যামী মহাপ্রভুর প্রেরণাবশেই—যে প্রেরণাবশতঃ চতুঃসন ষড়্রিপুর অতীত হয়েও বৈকুণ্ঠের দ্বাররক্ষক জয়-বিজয়ের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন—কৃষ্ণসেবা অজ্ঞান

সর্বতত্ত্ববিৎ হয়েও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপ্রাঙ্গনে পরিবার-পরিজনের জন্য শোকাকুল হয়েছিলেন। শ্রীবাস প্রভুর আবেদনে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবশেষে শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধের স্থলটি ব্যক্ত করলেন,—“নাড়ার স্থানেতে আছে তা'ন অপরাধ। নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ।।” অর্থাৎ গৌর-আনা-ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর কাছে শচীমায়ের ঘটনাক্রমে একটি অপরাধ সম্ভূত হয়েছে। সুতরাং একমাত্র শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট শচীমাতা ক্ষমাভিক্ষা করলেই তিনি প্রেমভক্তির অধিকারিণী হবেন।

অদ্বৈতপ্রভুর স্থানে শচীমায়ের অপরাধ! অবিশ্বাস্য। মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ প্রভু হরিভক্তির কথাশূন্য সেই উত্তপ্ত উষর মরুভূমিতে তখন কেবলমাত্র শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যরূপ বিশাল বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়াতেই কৃষ্ণকথার মন্দাকিনী-প্রবাহে অবগাহন করে তিনি প্রাণ জুড়াতেন। অদ্বৈতপ্রভুর সেই কৃপাসান্নিধ্যে ক্রমে ক্রমে শ্রীবিশ্বরূপ এই নশ্বর বিশ্ব সংসারের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়লেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি অনন্তপথের যাত্রী হলেন। নিত্যানন্দাভিন্ন সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের সেবা হতে বঞ্চিত হয়ে শচীমা শোকে মুহমান্ হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নিমাইয়ের নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমুখ দর্শন করেই তাঁর তাপিত হৃদয় শান্ত হয়েছিল। কিছুদিনে সেই নিমাইও যখন লক্ষ্মীদেবীর অঞ্চলাবদ্ধ না থেকে তাঁর অগ্রজেরই পথ অনুসরণ করে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কৃষ্ণকথা-বিলাস-গোষ্ঠকে নিত্য অলঙ্কৃত করতে লাগলেন, তখন ভাবী বিরহাশঙ্কায় শচীমাতার হৃদয় কেঁপে উঠেছিল। পুত্রসঙ্গ হতে বঞ্চিত হওয়ার খেদ অদ্বৈতপ্রভুর প্রতি সঞ্চিত হতে হতে একসময় তা তাঁর বক্ষ ভেদ করে প্রকাশিত হয়ে পড়ল—

“কে বলে ‘অদ্বৈত’—‘দ্বৈত’ এ বড় গোসাঞি।।

চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির।

এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির।।

অনাথিনী—মোরে ত’ কাহারো নাহি দয়া।

জগতে ‘অদ্বৈত’, মোহে সে ‘দ্বৈত’-মায়া।।”

বস্তুতঃ এটি কোন জড়ীয় ক্ষোভ নয়—ভগবদ্বিরহাশঙ্কায় উন্মাদিনী মাতার বাৎসল্য প্রেমভক্তির এক উদ্গীরণ বিশেষ—ব্যাজস্ততির ছলে এটি অদ্বৈতপ্রভুরই এক মহিমা প্রকাশ। শচীমাতার খেদোক্তি মূলতঃ এইপ্রকার—“অদ্বৈত, তুমি যখন জগতের সমস্ত জীবকেই ভগবানের সাথে যোগযুক্ত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছ, তখন আমার প্রতি কেন তোমার এইরূপ নিষ্ঠুরতা? আমি কি জগতের বাইরে? আমার পুত্র ত’ আর যে সে পুত্র নয়—স্বয়ং ভগবান্। আমার যে বড় পুত্র ‘বিশ্বরূপ’—তিনি স্বয়ং ভগবানেরই এক অংশ। তুমি আমাকে তাঁর সেবা থেকে বঞ্চিত করেছ। সেই শোক আমার অপনোদন হয়েছিল অংশী ভগবানের (নিমাইয়ের) সাক্ষাৎ সেবার প্রভাবে। কিন্তু দেখছি, এই পুত্রের সাথেও আমার সেই সেবাযোগ তুমি ছিন্ন করতে চলেছ। আমি ‘অনাথিনী’ (অর্থাৎ নিমাইয়ের পিতা এখন বর্তমান নেই)—তিনি থাকলে নিশ্চয়ই তুমি তাঁর অপ্রতিহত, অবিচ্ছেদ্য ভগবদ্ভাবের প্রভাবে নিমাইকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারতে না। আমি অবলা, আমার ভগবদ্ভক্তি দুর্বলা, তাই তুমি আমার প্রতি নির্দয় হয়েছ। কিন্তু তুমি ত’ ‘অদ্বৈত’—তোমার কত দয়া,

তাদেরকে ভগবদ্ধিমুখ সংসারেই আবদ্ধ রাখতে যত্নশীল হবে। এইটাই যথেষ্ট নয়, তারা শচীমায়ের অনুকরণে সেই পতিতপাবন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রতি সমালোচনামুখর হয়ে সেই ভয়ঙ্করতম বৈষ্ণোপরাধকে অতি সহজেই আবাহন করবে। তাতে সেই ‘বৈষ্ণোপরাধ’ নামক জগদ্দল পাথরে তাদের নিজেদের এবং সন্তানগণের নিত্যমঙ্গলের পথ চিরকালের জন্যই অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে। অজ্ঞ জীবের এই ভীষণ পরিণতির আশঙ্কায় পরমকারুণিক শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি নিজের মাকে বৈষ্ণোপরাধিনী বলে সাব্যস্ত করলেন এবং কিভাবে সেই ভীষণতম বৈষ্ণোপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রেমভক্তির অধিকারী হওয়া যায়, তারও উপায় তিনি ঘোষণা করে দিলেন। ভগবান্ এবং তাঁর পার্শ্বদগণের মধ্যে অথবা পার্শ্বদগণের পরস্পরের মধ্যে সামান্যতমও ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই। কিন্তু পরম-ভজনীয় বস্তু শ্রীভগবান্ সাধকজীবগণকে ভজন-প্রতিকূল-বিষয় সম্বন্ধে সতর্ক করাতেই নিজ পার্শ্বদগণের মধ্যেই আপাত দোষ-ত্রুটি-মোহ-অজ্ঞানতা প্রভৃতি সৃষ্টি করেন—এ যে তাঁর কি-প্রকার দয়া, তা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কল্পনা করা যায় না।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর এই বিশেষ লীলার পিছনে তাঁর অন্য এক অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তত্ত্বতঃ মহাবিষ্ণুর অবতার, আবার কোথাও বা শঙ্কুর আশ্রয়ত্ব হেতু তাঁকে শঙ্কু-স্বরূপ বলেও ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। যেমন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ংই তা প্রকাশ করেছেন,—“বুঝিলাঙ, আচার্য্য মহেশ অবতার। এই মত হাসি প্রভু বলে বার বার।।” (চৈঃ ভাঃ ৩।৪।৪৭২)। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর মূখ স্তাবকগোষ্ঠী এইসকল তত্ত্ববিচারের মধ্যে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করবে—এই আশঙ্কায় মহাপ্রভু এই বিশেষ লীলাটি আবিষ্কার করেছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের লেখনীতে তা এইভাবে বর্ণিত হয়েছে,—

“ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জানেন,—সেবিবে অদ্বৈতেরে দুষ্টগণ।।
অদ্বৈতেরে গাইবেক শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া।
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিন্দিয়া।।
যে বলিবে অদ্বৈতেরে পরম বৈষ্ণব।
তাহারে বেড়িয়া লঙ্ঘিবে পাপী সব।।
সে-সব গণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে।
এত বড় শক্তি নাহি—এ দণ্ড দেখিতে।।
সকল সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি বিশ্বন্তর।
জানেন বিলম্বে হইবেক বহুতর।।
অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে।
সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবেরে।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।১২২-১২৭)

জগদগুরু পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁর “শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্যে” আমাদের জানিয়েছেন,—“শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কতিপয় দুষ্ট স্তাবক তাঁকে পাছে ‘শ্রীকৃষ্ণ’

বলিয়া স্থির করে এবং শ্রীগৌরসুন্দরকে ও শ্রীনিত্যানন্দকে তাঁহার অনুগত ব্যক্তি বলিয়া মনে করে—সেই অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই অদ্বৈতপ্রভুকে বৈষ্ণবত্বে স্থাপনোদ্দেশ্যেই জননীর অপরাধ ক্ষমাপন করাইলেন।” অর্থাৎ শম্ভুতত্ত্বকে বিষ্ণু হতে অভিন্ন-জ্ঞানবশে পাছে তাঁকে স্বয়ং বিষ্ণুরূপে নির্ধারণ করে জীব বঞ্চিত হয়, সেজন্যই শম্ভুকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলে জ্ঞাপন ও প্রচার করাই শ্রীগৌরহরির উদ্দেশ্য। শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রীশম্ভু পরস্পর অভিন্ন বলতে তাঁদের পরস্পর অবিচ্ছেদ্যত্বই বুঝায়—কারণ, বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব যথার্থই পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। শ্রীশম্ভু কেবল বৈষ্ণব নন—বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, জগদগুরু এবং শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু প্রকৃতপক্ষে সেই শম্ভুতত্ত্বেরও আকর শ্রীমহাবিষ্ণুর অবতার। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ নন বা কৃষ্ণের আদিকায়ব্যূহ সাক্ষাৎ শ্রীবলরামও নন—তাঁরই এক প্রকাশবিগ্রহ-স্বরূপ-বিশেষ। অদ্বৈতাচার্য্য—‘পরতত্ত্ব’, কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্র এবং শ্রীনিত্যানন্দ—‘পরাংপরতত্ত্ব’। জগজ্জীবকে এত কিছু শিক্ষা দিতেই মহাপ্রভুর নিজ মায়ের সম্বন্ধেই এই বৈষ্ণবাপরাধের ছলনা। “এক কার্য্য করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।”

মহাপ্রভু যখন শচীমাতার অপরাধ-স্থালনের উপায়রূপে শচীমা-কর্তৃক শ্রীঅদ্বৈত-পদধূলি মস্তকে ধারণের কথা ঘোষণা করলেন, তখন শ্রীবাসাদি সকল ভক্তবৃন্দ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কাছে গিয়ে তা সব ব্যক্ত করলেন। ‘অসম্ভব!’—প্রবল বিস্ময়ে অদ্বৈতপ্রভু ‘বিষ্ণু’ ‘বিষ্ণু’ স্মরণ করতে লাগলেন এবং সখেদে তাঁদেরকে বলতে লাগলেন,—

“তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন।।

যাঁর গর্ভে মোহার প্রভুর অবতার।

সে মোর জননী, মুণ্ডি পুত্র সে তাঁহার।।

যে আইর চরণ-ধূলির আশ্রি পাত্র।

সে আইর প্রভাব না জানি তিলমাত্র।।

বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী আই জগন্মাতা।

তোমরা বা মুখে কেনে আন হেন কথা।।

প্রাকৃত-শব্দেও যেবা বলিবেক ‘আই’।

‘আই’-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই।।

যেই গঙ্গা, সেই আই, কিছু ভেদ নাই।

দেবকী-যশোদা যেই, সেই বস্তু ‘আই’।।”

কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্য-গোসাঞি।

পড়িলা আবিষ্ট হইয়া বাহ্যে কিছু নাই।।

আমাদের শচীমাতা এমনই বৈষ্ণবাপরাধিনী যে, যাঁর নিকট তাঁর অপরাধ, সেই অদ্বৈতাচার্য্য পর্য্যন্ত সেই অপরাধিনীর নাম শ্রবণেই বিগলিত হয়ে যান, তাঁর তত্ত্ব বর্ণন করতে তিনি পঞ্চমুখ হন এবং সেই বর্ণনপ্রভাবে নানাপ্রকার সাত্ত্বিকভাবে আবিষ্ট হতে হতে তিনি বাহ্যহারা হয়ে পড়েন। যে শচীমাতার অপরাধ স্থালন না হলে প্রেমভক্তিতে অধিকার হবে না বলে পুত্রের ঘোষণা—সেই অপরাধিনীর তত্ত্ব বর্ণন করতে গিয়ে স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যই প্রেমভক্তিতে আত্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছেন—এইটাই আমাদের বিশেষ লক্ষণীয়। সুতরাং ‘বিষ্ণুভক্তি-

স্বরূপিণী আই জগন্মাতা”—শ্রীআচার্য্যের এই মুখোক্তিটী সর্বতোভাবেই প্রমাণিত। সেক্ষেত্রে শচীমাতার প্রেমভক্তিতে অধিকার লাভের যে অপেক্ষা নেই, তা সহজেই বোধগম্য। তথাপি শ্রীশচীদেবী প্রেমভক্তির মহিমা প্রকাশেই বিশেষ তৎপর হলেন—বাহ্য সংজ্ঞাহীন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পদধূলি তিনি মস্তকে ধারণ করলেন। স্বয়ং বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী শচীমা যে ‘তৃণাদপি সুনীচত্ব’ ও ‘অমানী মানদ’ ধর্ম্মেরও প্রতিমূর্ত্তি। তাই প্রেমভক্তি লাভের জন্য যে নিজমানে স্পৃহাহীন হয়ে বৈষ্ণবাচার্য্যের চরণধূলিতে অভিষিক্ত হতে হয়—সেই দৃষ্টান্ত তিনি স্বয়ং স্থাপন না করলে আর কে করবেন?

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিঃ স্পৃশত্যাথাপগমো যদর্থঃ।

মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদধূলিতে, যে পর্য্যন্ত অভিসিঞ্চিত না হতে পারা যায়, সে পর্য্যন্ত জীবের মতি কখনও সর্ব-অনর্থনাশক এবং সর্ব-অর্থপ্রাপক সেই কৃষ্ণপাদপদ্মকে স্পর্শ করতে পারে না। আত্মমঙ্গলেচ্ছু জীবের পক্ষে যে প্রেমভক্তি কি-প্রকার বাঞ্ছনীয়, তা স্বয়ং ভক্তিস্বরূপিণী শচীমাতা নিজ আচরণদ্বারা প্রদর্শন করলেন।

ভগবৎপার্ষদগণ ভগবানের সাথে মাতা, পিতা, পত্নী, সখা, পুত্র, দাস প্রভৃতিভাবে সম্পর্কিত হয়ে সেই ভগবানের প্রীতিবিধানেই তৎপর থাকেন। সেই প্রীতিবিধানের জন্য কখনও তাঁরা ভগবানকে শাসন করেন, ভর্ৎসনা করেন, আবার কখনও সেই তাঁরাই ভগবানের আদেশ পালনে সচেতন হন! ভগবানের ঐকান্তিক ইচ্ছাটী বুঝে নিতে এবং সেই অনুযায়ী সেই সেই ভাবে প্রবৃত্ত হতে তাঁদের কখনও ভুল হয় না। কারণ উভয়ে উভয়ের অন্তর্য্যামিস্বরূপ। তাই নন্দবাবা প্রভৃতি যত বয়োজ্যেষ্ঠ গোপবৃন্দ, সকলেই বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের এক কথাতেই সম্মত হয়ে সেই বৈশ্যকুলের বাৎসরিক ইন্দ্রপূজা পরিত্যাগ করে গিরিরাজজীর পূজাতেই রত হলেন। শ্রীশচীমা তাঁর পরম আদরের পুতলিকা, নিত্য শাসনযোগ্য নিমাইয়ের এক কথাতেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরণধূলি সংগ্রহে প্রবৃত্তা হলেন—এতে তাঁদের কোনরকম কিস্ত নেই।

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

“যাঁহারা চাতুর্ম্মাশ্য-ব্রত পালন না করিয়া, কেবলমাত্র ‘উর্জাদর’ করিয়া থাকেন, তাঁহারা চাতুর্ম্মাশ্যের ভক্তিফল সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা চাতুর্ম্মাশ্যের প্রতি অনাদরই প্রকাশ পায়।”

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

পরিতাপ ও প্রার্থনা

হায়! হায়! বৃথা মোর গেল এ জীবন।
না লভিয়া এ জীবনে কৃষ্ণপ্রেমধন।।
শৈশব, কৈশোর আর বিগত যৌবন।
প্রৌঢ়কাল গতপ্রায় না লভি সে-ধন।।
সে-সময়ে ছিল বল, উৎসাহ নবীন।
কাটানু সে কাল হায়, আনন্দে মলিন।।
অকার্য্যে, কুকার্য্যে আর ধনের অর্জ্জনে।
বৃথা ক্ষয় করিয়াছি অমূল্য জীবনে।।
তখন কেন না হ'ল গুরুর সন্ধান।
যাহা হ'তে পরাশান্তি লভিত পরাণ।।
শকতি করিয়া ব্যয় অকাজে অযথা।
সময় হারায়ে তাই চিন্তে পাই ব্যথা।।
অদৃষ্টের দোষ মোর আর কিছু নয়।
অনুতাপ দিবা-নিশি এবে সার হয়।।
গৌড়ীয়ে অভ্যুদয়ে লভিলে সুযোগ।
সহসারে জড়িত হ'য়ে হ'ত না এ ভোগ।।
যে আশ্রয়সন্ধান আমি লভিয়াছি এবে।
সময়ে সংবাদ যদি পাইতাম, তবে।।
কভু নাহি ডুবিতাম সংসার-কূপেতে।
গুরুপদে আত্ম সঁপি শান্তি হ'ত চিতে।।
সে-কালের গুরুভায়ের সৌভাগ্য দেখিয়া।
পরিতাপে, দুঃখানলে দহে মোর হিয়া।।
যথাকালে গুরুপদ করিয়া আশ্রয়।
বিচরিছে তাঁরা এবে হইয়া নির্ভয়।।
(আমি) আশাপাশে বদ্ধ হ'য়ে রহিনু পড়িয়া।
বিষ্ঠার শূকর সম, বিষয়ে মজিয়া।।
অপৌগণ্ড শিশুদের কি হ'বে উপায়।
এই কথা চিন্তি' মোর বৃথা দিন যায়।।

তা'দের লাগিয়া অর্থ করি সংরক্ষণ।
 গুরুসেবায় অর্থ দিতে নাহি হয় মন॥
 তাদের ছাড়িয়া আমি ধামে যাব যবে।
 রক্ষণ-পোষণ তাদের কিরূপে বা হ'বে॥
 তাদের শিক্ষার আর রক্ষার চিন্তায়।
 দুর্লভ জীবন মোর বৃথা কেটে যায়॥
 সেবা ছাড়ি' যাব, থাকে এই ভাব চিতে।
 তাহার দুর্দশা লিখা আছে ভাগবতে॥
 এ সব চিন্তায় যারা থাকে ভরপুর।
 জীবনান্তে তারা যায় ধ্রুব যমপুর॥
 যদ্যপিহ জানা আছে এই তত্ত্ব সার।
 মায়াতে জিনিতে নারে এ অধম ছার॥
 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।
 —যদিও এই বাক্য আছে গীতাতে॥
 প্রপত্তির চেষ্টা মোর কিছু মাত্র নাই।
 গুরুকৃপা বিনা কিছু উপায় না পাই॥
 ওহে গুরো, দয়াময় অনাথ শরণ।
 কৃপা ক'রে উদ্ধারহ এ অধম জন॥
 যত ইচ্ছা গালি দেহ কপট বলিয়া।
 ত্যজিতে নারিবে প্রভো এই অভাগিয়া॥
 গৃহকূপ হ'তে একে অবশ্য তুলিবে।
 অচিন্ত্য শক্তি তব জানে লোক সবে॥
 সে আশা হৃদয়ে ধরি' আসিয়াছি হেথা।
 উদ্ধার করিবে তুমি অবশ্য সর্বথা॥

—শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৮ পৃষ্ঠার পর]

যে দাম—রজ্জু দিয়ে ভগবানকে বাঁধা হয়েছে তাকে প্রণাম করছেন সত্যব্রত মুনি। কি রকম? বলছেন—ঐ যে রজ্জু ওটা সাধারণ রজ্জু নয়, প্রেমরজ্জু—বাৎসল্যপ্রেমের রজ্জু। তাই দিয়ে বাঁধা পড়েছেন ভগবান। কি ব্যাপার! মা যশোদা তাঁর নিজের ছেলে মনে করে তিনি কৃষ্ণকে বাঁধতে চাইলেন। দুষ্টুমি করছে ছেলে, তাকে শাসন করছেন। তাঁকে প্রথমে মারতে গেছেন, হাতে লাঠি ছিল। বাচ্চা কান্নাকাটি করছে, লাঠিটা ফেলে দিলেন। কাঁদতে হবে না, কাঁদিস্ না। তারপর তাঁকে বাঁধবার চেষ্টা করছেন। বহু চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কিছুতেই ভগবান ধরা দিচ্ছেন না। মাতার অত্যন্ত পরিশ্রম দেখে—মাতা ঘর্মাক্ত কলেবরা, খুব কষ্ট হচ্ছে তাঁর, তা দেখে কৃষ্ণ নিজেই ধরা দিয়েছেন—এই কথা ভাগবতে বর্ণনা আছে। ‘কৃপয়াসীৎ সবন্ধনে’—তিনি নিজেই ইচ্ছা করে বন্ধনদশা স্বীকার করলেন। কেন করলেন? প্রেমবশ্য তিনি। তিনি যদি ধরা না দেন, তাঁকে কেউ ধরতে পারে না; তিনি যদি নিজে বন্ধনদশা স্বীকার না করেন, তাহলে তাঁকে কেউ বাঁধতে পারে না। বাঁধা পড়েছেন কিসে? প্রেমরজ্জুর দ্বারা বাঁধা পড়েছেন। সেটা ত’ সাধারণ বস্তু নয়, প্রাকৃত কোন বস্তু নয়। ভগবান্ ভক্তির বশ। “কেবল ভক্তির বশ চেতন্য গোসাঞিঃ।”—লেখা আছে শাস্ত্রে। শাস্ত্রের যেখানেই আমরা পড়ি না কেন সেখানেই দেখি ভগবান্ ভক্তিরই বশ। “ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়মাধবঃ”, “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য”—সব জায়গায় দেখছি ভক্তিরই বশ ভগবান্। ভক্তিডোরে, প্রেমডোরে তাঁকে বাঁধা যায়। তিনি সেই ডোরে মা যশোদার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছেন। সেই ডোরকে বলছেন অনন্তরূপী ডোর। জগৎ সংসারে যে অনন্তদেব রয়েছেন, তিনি ভগবানের গুণগান করে শেষ করতে পারছেন না। আবার ভগবানের গুণপনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অসামর্থ্যতাই প্রকাশ করছেন। তাঁর নামও অনন্ত।—“অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।” শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেই পরতত্ত্ব ভগবান্ এমনই বস্তু। কে তাঁকে জানবে, কে তাঁকে বুঝবে? যদি সেই প্রেমময় ভগবান্ কাকেও চেনান, কাকেও জানান, কাকেও বুঝান তবে এটা সম্ভব। এখানে সেইকথা বলছেন।

ভগবানের যে বন্ধনরজ্জু—ডোর এটা সাধারণ ব্যাপার নয়, প্রেমরজ্জু। পদকর্ত্তা সেজন্য ঐ প্রেমরজ্জুকে প্রণাম করছেন। আবার যে উদরে বন্ধন পড়েছে, যে উদর অনন্ত বিশ্বের আধার, তাঁকেও প্রণাম করছেন। ভগবান্ কৃষ্ণের উদরকে প্রণাম করছেন, আবার তাঁর বন্ধনরজ্জুকেও প্রণাম করছেন। তাঁর মহিমার শেষ নেই। পাঁচটা কথা বলতে গেলে দশটা কথা এসে যাবে, এক মুখে বলা যাবে না। ভক্তের প্রার্থনা সেইজন্য—কোটি কোটি বদন দাও, তোমার গুণগান করব, তোমার নাম গান করব। কোটি কর্ণ প্রদান কর, তোমার কথা শ্রবণ করব। কোটি নয়ন দাও, তোমার শ্রীরূপমাধুরী দর্শন করব। গোপীগণ ভগবানকে দর্শন করছেন নির্নিমেষ নেত্রে, অনিমেষ নেত্রে। কিন্তু দর্শনে অতৃপ্ত হয়ে তাঁরা বিধিকে দোষারোপ করছেন—বিধি, তুমি চোখ সৃষ্টি করেছ ভাল, কিন্তু তাতে পলক সৃষ্টি করলে কেন? তোমাকে নির্নিমেষ নেত্রে, অনিমেষ নেত্রে দর্শনে ব্যাঘাত হচ্ছে আমাদের। তুমি বোকা, পলক সৃষ্টি করেছ। বর্ণনা রয়েছে ভাগবতে,—

“ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ।”

‘নিমেষ হইল যুগের সমান।’ ভগবানকে দর্শন করতে গিয়ে পলক পড়ছে, তার জন্য বিধির সমালোচনা করছেন—জান না তুমি ঠিক চোখ তৈরী করতে। প্রত্যেক জিনিষটা তাঁর তাই আমাদের দর্শনের বিষয়ীভূত নয়। জ্ঞানাতীত, লোকাতীত, ত্রিগুণাতীত সেই তত্ত্ববস্তু ভগবান্। নিগুণ বলা হয়েছে ভগবানকে কেন? প্রাকৃত গুণরহিত তিনি, পরন্তু অপ্রাকৃত গুণবান্, অপ্রাকৃত রূপবান্, অপ্রাকৃত শক্তিমান্, অপ্রাকৃত লীলাপরায়ণ—কথাগুলো বলা হয়েছে। জগতের কোন বিশেষণ সেই ভগবানে ঠিক ঠিক প্রযুক্ত হতে পারে না। জগতের কথা জগতেই থাকবে। অপ্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃতভাবেই অধিষ্ঠিত নিত্যকাল।

“ইহ”—বৃন্দাবনে, প্রেমভক্তি প্রদান করুন—এরূপ অর্থ করছেন।” বৃন্দাবনে করতে বলছেন, অন্য জায়গায় হবে না ঠিক। বৃন্দাবনের মহিমা-মাহাত্ম্য অধিক। এইখানে যদি আমাকে প্রেমভক্তি দান করেন, তাহলে আমার পক্ষে ভাল হয়—ভক্তের প্রার্থনা। ভগবান্ যেখানে আছেন সেখানেই বৃন্দাবন। সেই বৃন্দাবনে প্রেমভক্তি দান করবার জন্য ভক্ত অনুরোধ করছেন দামোদর কৃষ্ণকে। তিনি ত’ যে কোন ভাবে যে কোন জায়গায় দান করতে পারেন, কিন্তু বৃন্দাবনে বলছেন কেন? সর্বাসুসুন্দর হবে, সেজন্য বৃন্দাবনের কথা উল্লেখ করেছেন। স্থানের মহিমা, শ্রীধামের মহিমা, ভগবানের আবির্ভাব-ভূমি, লীলাভূমির মহিমা এখানে প্রযোজিত হচ্ছে। সেখানে হলে খুব ভাল হয়। বৃন্দাবনের মহিমা-মাহাত্ম্য এখানে প্রকাশ করছেন। সেজন্য বৃন্দাবনেই দর্শন চাচ্ছেন। কি মূর্তি?—তোমার এই দামোদর মূর্তি। তাহলে ওটা কোন প্রাকৃত মূর্তি নয়। দামবন্ধন-লীলা অপ্রাকৃত লীলা ভগবানের। বন্ধনরজ্জু কোমরে লাগানো আছে—ঐ মূর্তি দর্শন করতে চাচ্ছেন। কেন?—বাৎসল্য স্নেহ আছে ওর মধ্যে, বাৎসল্য প্রেমের উদ্বগম হবে ঐ মূর্তি দর্শন করলে, সেজন্য ঐ মূর্তি দর্শন করতে চাচ্ছেন। অন্য কোন মূর্তি আমি দর্শন করতে চাই না।

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি—দর্শন করতে চাওয়া সেটা অধিকারের ব্যাপার। অধিকার নিয়ে আমরা অধিকার চাচ্ছি, সেটা একরকম; আর অনধিকারী আমি, ভগবানের অহৈতুকী করুণাসিদ্ধ অধিকার নিয়ে চলতে চাচ্ছি আমি—এটা আর এক রকমের। যে কোন ভাবেই হোক ভক্ত ভগবানের কাছে সবসময় প্রার্থনা রাখতে পারেন—যদি তিনি নিষ্কাম হন। নিষ্কাম কথাটা খুব একটা ভাল কথা নয়। এর উপরে আরও তত্ত্বদর্শন আছে। যেখানে ভক্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর করছেন, আমার ভাল-মন্দের সমস্ত বিচার তোমার পরে দিলাম, এ সম্বন্ধে আমার কোন বাহাদুরি নেই—আমি কিছু জানি না, অজ্ঞ। আমার মত মূর্খ, অজ্ঞ, অবর্ষাচীন দুনিয়ায় আর কেউ নেই। আমার কোন শক্তিসামর্থ্য নেই, কোন অধিকার নেই। আমার যে গুণ দেখে তুমি আমাকে দয়া করবে, কৃপা করবে—এমন কোন গুণ আমার নেই। আমার কোন গুণ না থাকলেও তুমি তোমার স্বীয় গুণে আমাকে দয়া কর—এমন প্রার্থনা ভক্তের। যে ভক্ত সম্পূর্ণ নির্ভর করছেন ভগবানের পরে তেমন ভক্তের ত’ আর কেউ নেই জগতে। ভগবান্ চিন্তাশ্রিত, তিনি বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করছেন, করেন। ঐরকম ভক্তের প্রার্থনা—এই বৃন্দাবনেই আমি ঐ দামোদর মূর্তি দর্শনের প্রয়াসী, আকাঙ্ক্ষিত।

“বৃন্দাবনেই প্রেমভক্তির সুখ-বিশেষের আবির্ভাব-হেতু এবং তথায় তার প্রাদুর্ভাব-বিশেষ থাকায় তদাকারে (দাম-বন্ধনাবস্থায়) আমি আপনার সাক্ষাৎ-দর্শন প্রার্থনা করছি।” ভগবানের কোনটাই অশুভজনক নয়, সবটাই শুভজনক। ভগবানের স্নেহ-মমতা শুভজনক, ভগবান্ যদি কাকেও গালাগালি দেন, শাসন করেন, সেটাও শুভজনক। ঠিক একই কথা গুরু-বৈষ্ণবের ক্ষেত্রে। সবটাই আমাদের মঙ্গলজনক। যদি ভাল কিছু দেখেন Guardian তাহলে প্রশংসা করেন, যদি কিছু অন্যায় করেন তাহলে স্নেহশাসন করেন। সবটাই মঙ্গলের জন্য। কিন্তু দুটু ছেলে আমি, কি করে বুঝব? সেই অপার্থিব স্নেহ-মমতা আমার উপলব্ধির বিষয় হচ্ছে কখন? শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করতে করতে এক জায়গায় দেখছি লেখা আছে—হরিকথা শুনলে সন্দেহ আসে। কি ব্যাপার! পাঠক পাঠ করছেন, বক্তা বক্তৃতা করছেন, কিন্তু শ্রোতাগণের মধ্যে কিছু কিছু শ্রোতা তারা ভাবছেন এটা বোধ হয় আমাকেই লক্ষ্য করেই তাঁরা বলছেন। মহা মুস্থিলের কথা। তিনি ত’ শাস্ত্রের কথা ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু এর ভিতরে সন্দেহের কারণ ঘটছে কেন? আমার অন্তরটা সন্দিষ্ট, সেইজন্য ঐ ঘটনা আসছে। সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে যায় সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের অপ্ৰাকৃত তত্ত্বদর্শন, তত্ত্বসিদ্ধান্ত শ্রবণ করলে, ভগবৎকথা, হরিকথা শ্রবণ করলে। সেই কথাই ত’ ভাগবতে লেখা আছে,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রহিষ্টিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেহখিলাত্মনি ॥

আমাদের যতরকম ধরনের সংশয়, সন্দেহ, তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞতা সবটাই কেটে যায় শাস্ত্রকথা শ্রবণে। সমস্ত সংশয়ের অবসান হয় যে কথা শ্রবণ করলে সেটা কি কথা?—

“সতাং প্রসঙ্গান্মমবীৰ্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।”

হৃৎকর্ণরসায়ন ভগবানের কথা। শুনতে ভাল লাগে, কর্ণরসায়ন, কিন্তু সেটা যদি আমি ঠিক ঠিকভাবে শ্রবণ করি, অর্থাৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন যদি আমার একসঙ্গে হয়, তাহলেই আমার কল্যাণ। শাস্ত্র বলছেন,—“কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মন প্রাণ।”—এইরকম অবস্থা। শুনতে হয় শুনছি এরকম কথা নয়, হৃদয়কে স্পর্শ করবে সে-কথা, চিত্তকে স্পর্শ করবে সে-কথা এবং তদনুসারে কাজটা হবে।

ভাগবতের পারায়ণ হচ্ছিল, শ্রোতা ছিলেন বহু। তার ভিতরে মুনি-ঋষিরা ছিলেন, রাজা-মহারাজারা ছিলেন, সাধারণ গৃহস্থও ছিলেন। আবার প্রধান শ্রোতা প্রেতরূপী ধুকুকারী সেও ত’ সেখানে ছিল। কিন্তু ভাগবত-পারায়ণ যে করলেন গোকর্ণ, বৈকুণ্ঠ থেকে বিমান পাঠিয়েছেন ভগবান্ একজনের জন্য। কি ব্যাপার! আর সবাইয়ের শ্রবণ তেমন হয়নি। আমরা সবাই শুনলাম, আমাদের তেমন শ্রবণ হয়নি?—না। কি ব্যাপার? সেই কথা ব্যাখ্যা করছেন মহাপ্রভু,—

“অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,

‘মনে’ ‘বনে’ এক করি’ জানি।

তঁাহা তোমার পদদ্বয়; করাহ যদি উদয়,

তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥”

‘অন্যের হৃদয় মন’—সাধারণ মানুষের যে মন তা বিষয়াসক্ত মন, বিষয়-কলুষিত মন ; ‘মোর মন বৃন্দাবন’—আমার যে মন সেটা বৃন্দাবন। সেই যে মন সেই মন আর বৃন্দাবনকে আমি একই বলে ভাবছি—চিন্তাটা আমার এই। সেই মনে যদি তোমাকে উদয় করাও, তোমাকে প্রকাশ করাও, প্রকাশিত হও যদি তুমি, তাহলে জানব আমার প্রতি তোমার স্নেহ-মমতা আছে, দয়া-দাক্ষিণ্য আছে। সকলের মনটা এক হচ্ছে না, সকলের শ্রবণ-কীর্তন এক হচ্ছে না। যদি হত তাহলে নিশ্চয় ব্যবস্থা সেই অনুসারে হত। কিন্তু তা হয়নি। ভাগবত পারায়ণ শেষ পর্যন্ত সকলেই শ্রবণ করেছেন, কিন্তু একজনের জন্য গোলোক-বৈকুণ্ঠ থেকে বিমান এসেছে।

আবার সেই অধিকার অনেকে পেতে পারেন, তারও প্রমাণ পাশাপাশি আছে। যখন তিনি বুঝিয়ে দিলেন আপনাদের শ্রবণ হয়নি, এই প্রেতের শ্রবণ হয়েছে, তাই এর জন্য ভগবান্ বিমান পাঠিয়েছেন। আপনারা যদি ঐভাবে শ্রবণ করেন, তাহলে আপনাদের জন্যও ব্যবস্থা হবে। তখন পুনরায় দ্বিতীয়বার ভাগবত-পারায়ণ হল। তখন অসংখ্য বিমান এসেছে। তাহলে এ বিষয়ে ভগবানের একচোখামি আছে, Partiality আছে—একথা বলা যাবে না। শ্রবণের তারতম্যে এখানে ব্যবস্থার ভেদ এসেছে। আবার যখন শ্রবণ সকলেরই সমান হচ্ছে তখন বহু বিমান এসেছে বহু ভক্তকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সেখানে একটা প্রশ্ন আছে,—যদি ভগবান্ আমাদের ডাকেন, হাতছানি দেন, তবে আমরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি কি না? যদি ভগবানের ডাক পড়ে Clarion call, তাহলে আমরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি কি না—এটা হল সবথেকে বড় প্রশ্ন। আমরা অনেকেই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। আরে দাঁড়ান মশায়, সংসার আছে আমার, কত কাজ আছে, কি বলেন! যদি যমরাজ স্বয়ং এসে হাজির হন, তাহলেও একথা বলতে শোনা যাবে—দাঁড়ান কাজটা সেরে নেই, সময় দেন আমাকে। বর্ণনা আছে শাস্ত্রে।

এক গরীব, দুঃখী বুড়িমা বনাঞ্চলে গিয়ে শুকনো কাঠ আহরণ করে, বাজারে বিক্রী করে কোনরকমে তার সংসার চালাতেন। তার আর কেউ ছিল না। একদিন অনেক শুকনো কাঠ পেয়েছেন, বোঝা খুব বড় হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই বোঝাটা তুলে দেওয়ার। সেই বড় বোঝা বার বার করে তুলবার চেষ্টা করছেন, মাথায়, তুলতে পারছেন না, পড়ে যাচ্ছে বার বার। তখন তিনি খুব দুঃখে, খেদে বললেন,—যম, তুমি এত লোককে দেখতে পাও, আমাকে দেখতে পাও না। দুই তিনবার বলবার পর স্বয়ং যমরাজ এসে হাজির হয়েছেন। কি বুড়ি মা, আমাকে ত’ কেউ ডাকে না, আমাকে কেউ ভালবাসে না, কেউ আমাকে দেখতে পারে না, কিন্তু তুমি যে আমাকে তিন তিনবার ডাকলে সেজন্য আমি এসেছি। চল। কোথায় যাব? যাওয়ার জন্য ডাকিনি তোমায়, এই বোঝাটা তুলে দাও আমার মাথায়—যমরাজকে বলছেন বুড়িমা। যমরাজ বললেন,—বুড়িমা তোমার এখনও অনেক পরমায়ু আছে। তুমি আমায় ডেকেছ বলে এলাম। আমি তোমার বোঝা তুলে দিয়ে গেলাম। তোমার এখনও অনেক পরমায়ু আছে, ভগবানের নাম কর। ঠিক ঐরকম ধরণের ডাক যদি আমাদের পড়ে—গোলোক-বৃন্দাবন থেকে যদি আমাদের ডাক পড়ে—এস হে, তোমার সময় হয়ে গেছে, আর সময় নষ্ট করবার দরকার নেই, চলে এস, তাহলে কয়জন যাওয়ার

জন্য প্রস্তুত আছি আমরা। প্রায় সকলেই বলে ফেলব—অনেক কাজ আছে, থামুন, থামুন, কাজগুলো সেরে ফেলি। ভাগবতে খুব সুন্দরভাবে বুঝানো আছে আমরা যেভাবে সংসারে আবিষ্ট-নিবিষ্ট!

সংসার কার জন্য করব?—ভগবানের জন্য করব। ভগবান্ তুমি খুশী হও, তোমারই সংসারে ত' আছি আমি, তোমারই সেবা করব। যদি তোমার সেবা না হয়, তাহলে আমার থাকার দরকার নেই। তোমার সেবাকে লক্ষ্য করে এখানে আছি। যিনি এরূপ কথা বলছেন তিনি বা তাঁরা ত' প্রস্তুত আছেন। কিন্তু যিনি বলছেন, আমার এখনও অনেক কাজ বাকী, যমরাজ তুমি এসেছ, যমদূত তুমি এসেছ, দুরাস্ত কৃতান্ত কি শুনবে ওটা? শুনবে না ওটা। আর ভগবানের যদি ডাক আসে, তাও ত' যেতে চাইছি না। মনে করছি—এখানকার মৌরসীপাট্টা নিয়ে এখানেই চিরকাল থাকব। চিন্তা-ভাবনাটা সেইরকম। শাস্ত্র আমাদের তা শেখান নি। সাধন-ভজন মানে হৃদয়কে প্রস্তুত করা। আমি ভগবানের কাছে পরীক্ষা দিচ্ছি, দিয়েছি, দেব। সেজন্য বসে থাকা। পরীক্ষায় ফেল করব না—এ প্রতিজ্ঞা আমার। ঠাকুর, তুমি আশীর্ব্বাদ কর—যেন আমি পরীক্ষায় পাশ করতে পারি। ফেল করব কেন? জীবন-সংগ্রামে আমি পরাজিত হব না, পরাস্ত হব না—সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে আমাদের। এই ত' ভক্তভাব। সংসারে থেকে এই ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যটুকু অর্জন করতে হবে আমাদের। আর পারি না সহ্য করতে—অসহ্য! কিন্তু অসহ্য হলেও সহ্য করতে হবে—সেই কথাই শাস্ত্রের উপদেশ। “কেন পাশ্চ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ।” ধৈর্য্য রাখতে হবে, উৎসাহ রাখতে হবে, সহ্যগুণ রাখতে হবে, তা না হলে কোন কিছু ত' আমার জন্য নেই এ সংসারে। আমি যদি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলি, অধৈর্য্য হয়ে যাই, তবে হবে না কিছু।

তাই এখানে সত্যব্রত মুনি ভগবানের কাছে বলছেন,—ঠাকুর, তোমার এই বৃন্দাবন ধামে তোমার এই বালগোপাল মূর্তি, তোমার এই দামোদর মূর্তি আমার দর্শনের সুযোগ হোক। সাক্ষাৎ-দর্শনই প্রার্থনা করছেন। তিনি যোগ্যতম অধিকারী সেজন্য ঐরকম প্রার্থনা করছেন। “বৃন্দাবনে বৃন্দাবন-বিহারীরূপে তদর্শনের ইচ্ছা-বিশেষ-প্রকাশহেতু সেই বৃন্দাবনে সর্ব্বদা নিজের নিবাসও প্রার্থনা করছেন।” থাকতে যদি হয়, বাস যদি করতে হয় এই দুনিয়ায়, তাহলে আমি যেন বৃন্দাবনেই বাস পাই।

“দীনের এই অভিলাষ, মায়াপুরে / নবদ্বীপে দিও বাস।” আমি যদি মায়াপুরের আনুগত্য বাদ দিই, নবদ্বীপের আনুগত্য বাদ দিই, তাহলে বৃন্দাবন-বাসের অধিকার আমার নেই। ভারী সুন্দর কথা। গৌড়ীয় ভজন-প্রণালীর মধ্যে এটা আছে। আমি যদি নবদ্বীপকে বাদ দিয়ে চলবার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু অসুবিধা, Process, Procedure সব ভুল হয়ে যাবে। অঙ্ক মিলবে না, গৌজামিল দেওয়া হয়ে যাবে। সেইজন্য আগে এসেছে গৌরধামের প্রার্থনা, গৌরধামের কৃপা-প্রার্থনা, গৌরধামের আনুগত্য।—

“আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে নারাধিতং নববনং ব্রজ এব দূরে।

আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরন্তে নারাধিতো দ্বিজসুতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ ॥”

“আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে”—‘নববন’ অর্থে নবদ্বীপধাম। রাধাবন এর নাম। যদি তুমি নবদ্বীপধামের আরাধনা কর, “ব্রজকাননং তে”— তাহলে তোমার জন্য ব্রজবাসের

অধিকার আছে। “নারাধিতং নববনং ব্রজ এব দূরে”—আর নববন—রাধাবন যদি তোমার আরাধনার বিষয় না হয়, তাহলে ব্রজ তোমার থেকে অনেক দূরে, অনেক দূরে। “আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরস্তে”—দ্বিজসুত—রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত তিনি হলেন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর। তিনি যদি তোমার আরাধনার বিষয়বস্তু হন, তাহলে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ তোমার অতি নিকটে। “নারাধিতো দ্বিজসুতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ”—আর যদি সেই দ্বিজসুতকে—রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত সেই গৌরহরিকে যদি তুমি না চাও, তাহলে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ তোমার থেকে বহুদূরে। এ সব কথাগুলো ত’ শুনতে হবে। নবদ্বীপধামের কৃপা যদি না থাকে তাহলে ব্রজধামের কৃপা আমি লাভ করতে পারি না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ধামবাস-প্রার্থনার মধ্যে আছে এগুলো। তিনি বলছেন, আমার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই এই পৃথিবীতে। যারা আমাকে নবদ্বীপধাম বাসের অধিকার দিচ্ছেন না বা আমাকে সেই পথে পরিচলিত করছেন না, আমি তাদের কোন কথা শুনতে পারব না, মানতে পারব না।

“সা মে ন মাতা স চ মে পিতা ন

স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন।

স মে ন মিত্রং স চ মে গুরুর্ন-

যো মে ন রাধাবন-বাসমিচ্ছেৎ।।”

যিনি আমাকে রাধাবন—নবদ্বীপধাম-বাসের প্রেরণা যোগাচ্ছেন না, সেই পরামর্শ দিচ্ছেন না, ‘সা মে ন মাতা’—তিনি আমার মাতা নন; ‘স চ মে পিতা ন’—তিনি আমার পিতা নন; ‘স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন’—তিনি আমার বন্ধু নন, তিনি আমার সখা নন; ‘স মে ন মিত্রং’—তিনি আমার মিত্র নন; ‘স চ মে গুরুর্ন’—তিনি আমার গুরু নন; ‘যো মে ন রাধাবন-বাসমিচ্ছেৎ’—যিনি আমাকে রাধাবন—নবদ্বীপ-বাসের শিক্ষা দিচ্ছেন না।

আমরা আলোচনা করেছি—সাধন-ভজন হল আনুগত্যের ধর্ম। আনুগত্য যদি রাখি তাহলে সব ঠিক আছে, আর যখনই আনুগত্য ছেড়ে দিই তখনই আমি Bewildered—পথভ্রান্ত, দিশাহারা। সাধন-ভজনক্ষেত্রে কথাগুলো ত’ এইভাবে শিক্ষা দেওয়া আছে।

“ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।”

“হরি-গুরু-বৈষ্ণব—তিনের স্মরণ।

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।।”

এই তিনজনকে বাদ দিয়ে আমি চলতে পারব কি আমার জীবনপথে? সম্ভাবনা নেই। একটা বাচ্চা ছেলে-মেয়ে যেমন মা-বাবাকে ছেড়ে চলতে পারে না, ঠিক একই কথা। শাস্ত্রের বিচারগুলো ঠিক এইভাবে দেখানো হয়েছে।

হরিনাম করব সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে। আনুগত্য ছাড়লে আমার সবটাই গেল, আর কোন অধিকার নেই। “আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।” তত্ত্বদর্শন আমাকে বুঝতে হবে। যেখানে থাকি না কেন, আমি নবদ্বীপধামের আনুগত্যে ভজন-প্রয়াসী।

“ভগবদর্শনের ইচ্ছাবিশেষ-প্রকাশহেতু বৃন্দাবনে সর্বদা নিজের নিবাসও প্রার্থনা করছেন ঋষি।” ওখানে যেন আমার বাস হয়, অন্য জায়গায় আমার বাস দিও না। “দীনের

এই অভিলাষ, বৃন্দাবনে দিও বাস।” বলা চলবে, কিন্তু তার আগে নবদ্বীপধামের আনুগত্য চাই। নবদ্বীপধামের আনুগত্য না হলে ব্রজবাসের অধিকার লাভ হবে না। কত সুন্দরভাবে বুঝানো আছে।

গুরুতত্ত্ব যদি কৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি হন, তাহলে তাঁর আনুগত্য দরকার। বৈষ্ণব ছাড়া গুরু নন, গুরু ছাড়া বৈষ্ণব নন। গুরুই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব; বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ গুরু—একথা যেমন আছে তদ্রূপ তত্ত্বদর্শনও আছে। গুরুতত্ত্ব যেমন আছে, বৈষ্ণবতত্ত্বও তেমন আছে। কেউ কাকেও ছাড়াছাড়ি নন। গুরু যদি বৈষ্ণবানুগত্য শিক্ষা না দেন, তাহলে তিনি বৈষ্ণব নন; আবার বৈষ্ণব যদি গুরুানুগত্য শিক্ষা না দেন, তাহলে তিনি বৈষ্ণব নন। এমন সুন্দর তত্ত্বদর্শন। ভক্ত ছাড়া ভগবান্ নন, ভগবান্ ছাড়া ভক্ত নন। তত্ত্বদর্শন কাকে ছেড়ে কেউ নন। আমি যদি কেবল ভগবানকে মানি, ভক্তকে না মানি, তাহলে তত্ত্বদর্শন ঠিক হল না। আবার কেবল ভগবানকে মানি ভক্তকে যদি না মানি, তাহলে ভগবান্ আমার থেকে অনেক দূরে। ভগবান্ নিজমুখে বলছেন,—“সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।”—সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়। “মদন্যন্তে না জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।”—আমার সেই পরমপ্রিয় ভক্ত আমাকে ছাড়া আর কাকেও জানে না। ভক্ত সেই প্রেমময় ভগবান্ ছাড়া অন্য কাকেও জানে না, বোঝে না। এই ত’ পরম্পরের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক ভুললে হবে না। এ সংসারে যত আত্মীয়স্বজন, যত সম্মানার্থ ব্যক্তি—সকলের মধ্যে যখন এই বিচার থাকবে তখন সকলেই যথার্থ বৈষ্ণব—এই বিচার নিয়ে যদি চলতে পারে জগৎ।

Guardian কে হবেন? যিনি ভগবানের উপর নির্ভরশীল, তিনি Guardian। যিনি ভগবান্—কৃষ্ণ, বিষ্ণু কিছুই মানেন না, ধর্ম-কর্ম কিছুই মানেন না, সাধন-ভজন কিছুই মানেন না, নীতি-আদর্শ কিছুই মানেন না, তিনি বা তাঁরা Guardian হবেন কি করে? অধিকার কোথায়? যে Guardian শিক্ষা দেবেন আমাকে ভগবান্ বলে কিছু নেই, মাতাপিতার সেবা কর, তিনি Guardian এর প্রমাণ কোথায়? বরং যে Guardian বলবেন, আমাদের সেবা করতে হবে না, ভগবানকে মান, আত্মধর্ম মান, ভক্তিমান্ হও, সদাচার পালন কর, সাধন-ভজন কর—তাঁরাই হলেন যথার্থ পিতামাতা, Guardian। এটাই ত’ শিক্ষা আমাদের। এ শিক্ষা ভুলে যাচ্ছি কেন আমরা?

শ্রীমদ্ভাগবতে বলছেন,—ভগবান্ থেকে আমরা সবাই এসেছি, একথা সত্য। তার কর্তব্য সেখানে নির্ণীত হয়েছে।—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহুতোহনুযুগং তনুঃ।

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।

যেমন বর্ণনা আছে ভগবানের আবির্ভাবের কথা, তেমনই ভগবান্ থেকে যে অনন্ত জীবাত্মা সৃষ্টি হয়েছে, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে মনুষ্যাগোষ্ঠী তাদের কর্তব্যও নির্ণয় করা আছে।—

মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।

চত্বারো জজিগ্রে বর্ণা গুণৈর্বিপ্ৰাদয়ঃ পৃথক্।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরম্।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।

ভগবান্ থেকে যে আমরা এসেছি, মূল মালিক তিনি, আমাদের কর্তব্য ত' রয়েছে। সেই কর্তব্য সম্পাদন করতে যদি না পারছি তাহলে বলছে 'স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ'। কে কে?—চারি বর্ণী—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং চারি আশ্রমী—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ভাগবতের এই পয়ারের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন।—

“চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।

স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে।।”

“সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।

কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায়।।”

মা, বাপ ত' সব জীবনেই পাওয়া যাচ্ছে—মনুষ্যজীবনে পাওয়া যাচ্ছে, ইतरজন্মে মনুষ্যেতর কুলেও পাওয়া যাচ্ছে। 'কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায়।।' তাহলে কে মা, বাপ?—

সেই সে পরমবন্ধু, সেই পিতামাতা।

শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা।।

শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তিদাতা যে পিতামাতা—আমাকে যাঁরা হরিভজনে এগিয়ে দিচ্ছেন, সাধন-ভজনে প্রণোদিত করছেন, তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ পিতামাতা আর পাচ্ছি না খুঁজে। 'জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।' কে তিনি? সকল বাপের বাপ, জগতের পিতা কৃষ্ণ। 'পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ।।' সেই পরমপিতা যে ভগবান্ তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা জীবনপথে আদৌ অগ্রসর হতে পারি না, সেই পরমপিতার সেবা করা আমাদের সর্বোপরি ধর্ম্ম। শাস্ত্রে সেটা লেখা আছে, বুঝানো আছে।

কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।

মিছা-মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষসম হৈনু।।

দশবার ত' বলছি মুখে, কিন্তু সেই চিন্তাটা আমার ভিতরে সাক্ষাৎভাবে জাগরুক হচ্ছে কি করে? মনে-প্রাণে যদি সেই কথাটি আমি বুঝি, তাহলে ত' ঈশ্বর-ভজন, হরিভজন ছাড়তে পারি না। এটাকে নিয়ে আমাকে চলতে হবে।

এ সংসারে এসেছি, আমার পরে অনেক কর্তব্য-দায়িত্ব এসেছে, ভাল কথা। আমি সব কর্তব্য-দায়িত্ব পালন করব, কিন্তু মূলকে বাদ দিয়ে কি? মূল নীতি-আদর্শকে বাদ দিয়ে করব কি? শরীর একটা আছে—দন্ধোদর, উদরপূর্তির জন্য আমাকে কিছু খেতে হবে। মনটা আছে, তাকে কিছু খাবার দিতে হবে; লজ্জা নিবারণের জন্য একচেঁলি বস্ত্র দরকার; মাথা গুঁজবার জন্য একখানা কুঁড়ে ঘর দরকার—সবাই ত' বুঝি আমরা এটা। কিন্তু নীতি-আদর্শ মানার বেলায় এত অনীহা কেন? এটা মানতে চাচ্ছি না কেন? আমার স্বার্থ, সুবিধা সব বুঝি আমি, কিন্তু মূল যে নীতি-আদর্শ সেটাকে অস্বীকার করছি কেন? মানুষ নীতি-আদর্শ মেনেই সংসারে চলবে। এটাকে যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে তাকে ত' মানুষ বলা হবে না, তাকে ত' মানব বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ঠিক ঠিক মানুষ একজন কে? যারা মূল নীতি-আদর্শ পালন করে সংসারে কর্তব্যকর্ম্ম করে যাচ্ছে, তাদেরকে মানুষ বলা হবে। (ক্রমশঃ)

✠	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।	✠
ধর্মঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাসু যঃ ।		নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
✠	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যরাত্মা সুপ্রসীদতি ॥	✠

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূচুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫০শ বর্ষ } ১৩ নারায়ণ, অনিরুদ্ধ, ৫১২ শ্রীগৌরাদ
২৯ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪০৫, ইং ১৬/১২/৯৮ { ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-নুতি-সূত্রকম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামী-শ্রীমন্তুক্তিরক্ষক-শ্রীধর-গোস্বামি-বিরচিতম্]

সাত্ত্বিকাদি-ভাব-চিহ্ন-দেহ-দিব্য-সৌষ্ঠবং
কূর্মধর্ম-ভিন্ন-সন্ধি-গাত্র-পুষ্প-পেলবম্ ।
হুস্ব-দীর্ঘ-পদ্য-গন্ধ-রক্ত-পীত-পাণ্ডুরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টসাত্ত্বিক ভাবরূপ প্রেমচিহ্নসমূহ যাঁর শ্রীঅঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে—যিনি কখনও শ্রীকূর্ম-রূপ—হুস্বমূর্তি, কখনও ভিন্ন-সন্ধি-সুদীর্ঘ-বিগ্রহ, কুসুম-কোমল, পদ্মগন্ধ, যিনি কখনও রক্তবর্ণ, কখনও পীতবর্ণ, কখনও বা মল্লিকা পুষ্পসম শুভ্রবর্ণ সুশোভিতরূপে প্রকাশিত হইতেছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরান্দ-সুন্দরেরই আমি জ্ঞব করি ॥ ৩৭ ॥

তীর-বিপ্রলম্ব-মুগ্ধ-মন্দিরাগ্র-ধাবিতং
কূর্ম-রূপ-দিব্য-গন্ধ-লুপ্ত-ধেনু-বেষ্টিতম্ ।

বর্ণিতালি-কূল-কৃষ্ণ-কেলি-শৈল-কন্দরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩৮ ॥

যিনি—নিদারুণ বিরহে মোহিত ও কাতর হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের অভিমুখে ধাবিত হন ও পরক্ষণে অতি বিরহে সঙ্কুচিতরূপ পরিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তিতে তথায় পতিত থাকেন এবং শ্রীমন্দিরের তেলাঙ্গী গাভীগণ যাঁর সেই শ্রীঅঙ্গ হইতে নিঃসৃত এক অভূতপূর্ব দিব্যগন্ধের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া সেই শ্রীঅঙ্গকে বেষ্টন করিয়া থাকেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩৮ ॥

ইন্দু-সিন্ধু-নৃত্য-দীপ্ত-কৃষ্ণ-কেলি-মোহিতং

উন্মি-শীর্ষ-সুপ্ত-দেহ-বাত-রঙ্গ-বাহিতম্ ।

যামুনালি-কৃষ্ণ-কেলি-মগ্ন-সৌখ্য-সাগরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩৯ ॥

যিনি—(কোন এক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে ভক্তসঙ্গে সমুদ্রতীরে শ্রীকৃষ্ণলীলা-রস আশ্বাদনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ স্ফূর্ত) উদ্বেলিত সিন্ধু-তরঙ্গে প্রতিবিস্তিত চন্দ্রমূর্তির নৃত্য-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের যমুনা-বিহার লীলার উদ্দীপনায় অতর্কিতে অভিভূত হইয়া মূর্ছিত হন ও পরক্ষণে অন্যের অগোচরে যাঁর সুপ্তবৎ শ্রীবিগ্রহ (সমাধি-লঘু-কাষ্ঠখণ্ডবৎ) সমুদ্র-তরঙ্গের শিরোভাগে শয়ন করিয়া পবনদেব-কর্তৃক লীলায়িত-হৃদে বাহিত হন এবং যিনি তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের সখীগণসহ শ্রীকালিন্দী-জলকেলি-দর্শনের সুগভীর সুখানুভূতি-সাগরে নিমগ্ন থাকেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩৯ ॥

রাত্রি-শেষ-সৌম্য-বেশ-শায়িতাদ্র-সৈকতং

ভিন্ন-সন্ধি-দীর্ঘ-দেহ-কোমলাতি-দৈবতম্ ।

শ্রান্ত-ভক্ত-চক্রতীর্থ-হৃষ্ট-দৃষ্টি-গোচরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪০ ॥

সারারাত্রি অন্বেষণ করিতে করিতে ভক্তগণ পরিশ্রান্ত হইয়া নিশাশেষে চক্রতীর্থ সন্নিকটে আর্দ্র বালুকার উপর যাঁহার—শ্লথ-গতি, সুদীর্ঘ, দেবতানু হইতেও সুকুমার, সৌম্যমূর্তি—শায়িত অবস্থায় হর্ষোৎফুল্ল নয়নে দর্শন করিলেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪০ ॥

আর্দ্র-ভক্ত-কণ্ঠ-কৃষ্ণ-নাম-কর্ণ-হৃদগতং

লগ্ন-সন্ধি-সুষ্ঠু-দেহ-সর্ব-পূর্ব-সম্মতম্ ॥

অর্দ্ধবাহ্য-ভাব-কৃষ্ণ-কেলি-বর্ণনাতুরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪১ ॥

ভক্তগণের সকাতর কণ্ঠের উচ্চ কৃষ্ণকীর্তনধ্বনি কর্ণকূহরে ও মর্মস্থলে স্পর্শ করিবামাত্র অষ্টসন্ধিসমূহ যথায়থ সংলগ্ন হইলে পূর্ববৎ স্বভাবসুন্দর বিগ্রহ লাভ করিয়া যিনি—অর্দ্ধবাহ্য

অবস্থায় বিরহ-ভারাক্রান্ত চিত্তে সমাধি-দৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণলীলাসমূহ বর্ণনা করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪১ ॥

যামুনাসু-কৃষ্ণ-রাধিকালি-কেলি-মণ্ডলং

ব্যক্ত-গুপ্ত-দৃপ্ত-তৃপ্ত-ভঙ্গি-মাদনাকুলম্।

গূঢ়-দিব্য-মৰ্ম-মোদ-মূৰ্ছনা-চমৎকরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪২ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাজলে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সখীগণসঙ্গে বিবিধ বিচিত্র ছন্দে জলবিহার—যাহা কখনও ব্যক্ত, কখনও গুপ্ত, কখনও দৃপ্ত, কখনও বা পরিতৃপ্ত ভঙ্গি পরিগ্রহ করিয়া নানা সন্তোগময় প্রযত্নে প্রাণ-মন আকুলকারী—সেই অপ্রাকৃত গূঢ় আনন্দময় কোষের বিশ্ব-বিস্মাপন মৰ্ম-সুর মূৰ্ছনা—যিনি বিতানিত করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪২ ॥

আস্য-ঘর্ষণাদি-চাটকাচলাদি-লীলনং

ভক্ত-মৰ্ম-ভেদি-তীব্র-দুঃখ-সৌখ্য-খেলনম্।

অত্যচিন্ত্য-দিব্য-বৈভবান্ধিতৈক-শঙ্করং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪৩ ॥

যিনি—চটক পর্বত দর্শনে উদ্দীপিত বিচিত্র ভজন-বিলাস ও অসহনীয় বিরহে শ্রীমুখ-সংঘর্ষণাদিময় দিব্য প্রেমোন্মাদের লক্ষণসমূহ প্রদর্শন করিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম মহাসাগরের সুখ-দুঃখের উত্তাল তরঙ্গের সীমাহীন গভীরতার দিগদর্শন-লীলা ভক্তহৃদয়ে সঞ্চার করেন এবং যাহা একমাত্র তাঁর একান্ত আশ্রিতগণেরই অচিন্ত্যমঙ্গল প্রদান করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪৩ ॥

ক্রন্দনার্ত-নাদ-তীব্র-বিপ্রলম্ব-বেদনং

নৈব কাম্যমেতদেব যাবদোচ্চ-শংসনম্।

বাহ্য-দুঃখমেব তাবদিষ্ট-সৌখ্যমন্তরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪৪ ॥

রোদন, উৎক্রোশন প্রভৃতি বিরহ-বেদনাময় ভাবসমূহ যতই উচ্চ প্রশংসিত হউক না কেন—উহা কখনও কাহারও কাম্য হইতে পারে না—এইরূপ পূর্বপক্ষের সুস্পষ্ট উত্তর এই যে, শ্রীচরিতামৃতের উল্লিখিত “বাহিরে বিষ-জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত”—এইরূপ অনির্বচনীয় সম্পদ আবিষ্কারকারী সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪৪ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৯ পৃষ্ঠার পর]

১০। কোন্ কোন্ দোষ ধরিয়া নিন্দা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দা হয়?

“যিনি বৈষ্ণবের জাতিদোষ, কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ, নষ্টপ্রায়-দোষ ও শরণাগতির পূর্বাচরিত দোষ ধরিয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণব-নিন্দক ; তাহার কখনও নামে রুচি হইবে না। যিনি শুদ্ধভক্তির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব। পূর্বোক্ত চারিপ্রকার দোষ কথঞ্চিৎ তাঁহাতে লক্ষিত হইতে পারে ; তাঁহার অন্য কোন দোষের সম্ভাবনা নাই।”

—সাধুনিন্দা’, হঃ চিঃ

১১। ভক্তিলাভের সহজ উপায় কি?

“বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুর পদধূলি দেহে ভক্তিপূর্বক মৃক্ষণ করিবে।”

—‘অন্য শুভকর্মে নামের সহিত তুল্যজ্ঞান’, হঃ চিঃ

১২। বিষ্ণুমন্দিরে কাহাকে প্রণাম করিলে সেবাপরাধ হয়?

“দেব (বিষ্ণু)-মন্দিরে বিষ্ণু-দেবতা ভিন্ন অন্য কাহাকেও অভিবাদন করিবেন না, কেবল স্বীয় গুরুদেবকে অবশ্য করিবেন।”

—‘সেবাপরাধ’, হঃ চিঃ

১৩। কৃষ্ণসংসারটি কিরূপ?

“কৃষ্ণসংসারে কোনপ্রকার শাঠ্য নাই, সম্পূর্ণ সরলতা বর্তমান, সেখানে অপরাধ নাই।”

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

১৪। সদগৃহস্থের কিরূপ ব্যক্তিকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া কর্তব্য?

“তাদৃশ অবৈধ ভিক্ষাব্যবসায়ীকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া গৃহস্থগণ অপরাধ করিতেছেন, তদ্বারা তাহাদের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। এখন সমাজ-সংস্কারের সময় এই কুপ্রথাটি রহিত হওয়া চাই। তাহা হইলে সদগৃহস্থের অবস্থা ভাল হইবে, উপযুক্ত ভিক্ষকের দুঃখ নাশ হইবে এবং সংসারের সাধারণ উন্নতি হইবে। ‘অপাত্রে দীয়তে দানং তদানং তামসং বিদুঃ’—এই ভগবদ্ভাক্য অবলম্বনপূর্বক সকলেই সুপাত্রে দান করুন।”

—‘মুষ্টিভিক্ষা’, সং তোঃ ৬।৩

১৫। সর্বসাধারণের নিকট রস-গান শ্রবণ ও কীর্তন করা কি অপরাধ নহে?

“শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গার-লীলার গীত কীর্তন ও শ্রবণ, উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্য-ভজন। এই ভজন-লীলা সর্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। ‘আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা-তথা’—এই আচার্য্যবাক্য বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রস-গান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে।”

—‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাতাস’, সং তোঃ ৬।২

১৬। কদাচিৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ দুরাচার দেখিয়া বৈষ্ণবের নিন্দা করা কি নামাপরাধ নহে?

“বৈষ্ণব-শরীরে কৰ্ম্মগতিকে যে কিছু অভদ্র দেখা যায়, তাহাকে ‘অভদ্র’ মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। বৈষ্ণবের স্মৃতি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কোন বিশেষ দুরাচার দেখিলেও তাহাকে ‘সাধু’ বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা নামাপরাধ হইবে।”

—‘কুটীনাটী’, সং: তোঃ ৬।৭

১৭। সেবাপরাধের ভাগী কে কে?

“সেবাপরাধগুলি শ্রীবিগ্রহসেবা সম্বন্ধেই ঘটয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি-সেবা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ; যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ; যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ এবং সকলের পক্ষে কতকগুলি অপরাধ নির্দিষ্ট আছে; তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।”

—‘সেবাপরাধ’, হং: চিঃ

১৮। বত্রিশটি সেবাপরাধ কি কি?

“পাদুকা সহিত যায় ঈশ্বর-মন্দিরে।
যানে চড়ি’ যান তথা স্বচ্ছন্দ-শরীরে।।
উৎসবে না সেবে, আর প্রণতি না করে।
উচ্ছিষ্ট অশৌচ-দেহে বন্দন-আচরে।।
এক হস্তে প্রণাম, সম্মুখে প্রদক্ষিণ।
দেবাগ্রে প্রসরে’ পদ, হয় বীরাসীন।।
দেবাগ্রে শয়ন, আর ভক্ষণ করয়।
মিথ্যা কথা, উচ্চভাষা-জল্পনা-চয়।।
নিগ্রহানুগ্রহ, যুদ্ধ, অভক্তি, রোদন।
ক্রুরভাষা, পরনিন্দা, কামলাবরণ।।
পরজ্ঞতি, অশ্লীলতা, বায়ুবিমোক্ষণ।
শক্তিসত্ত্বে গৌণ উপচারের যোজন।।
দেবানিবেদিত দ্রব্য-ভক্ষণ-স্বীকার।
কালোদিত ফলাদির অনর্পণ আর।।
অন্যভুক্ত অবশিষ্ট খাদ্য-নিবেদন।
দেবপ্রতি পৃষ্ঠ করি’ সম্মুখে আসন।।
দেবাগ্রে অন্যের অভিবাদন, পূজন।
গুরু-প্রতি মৌন, নিজ-স্তোত্র-আলোচন।।
দেবতা-নিন্দন—এই দ্বাত্রিংশ প্রকার।
সেবা-অপরাধ মহাপুরাণে প্রচার।।”—‘সেবাপরাধ’, হং: চিঃ

১৯। অপরাধ কি কি ও তাহাদের লক্ষণ কি?

“অপরাধ বহু হইলেও প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়,—বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধ, যথা স্কান্দে,—

হস্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষণ্ণান্নাভিনন্দতি ।

ক্রুদ্ধতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি যট্ ।।

বৈষণ্ণবের হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষণ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষণ্ণ-দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টি অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজন-প্রয়াসীর যেন এই অপরাধ না হয়। সেবা-অপরাধ শ্রীমূর্তি-সেবা-সম্বন্ধেই বিচার্য। নামাপরাধ দশবিধ।”

—‘বিশুদ্ধ ভজন’, সং: তো: ১১।৭

২০। ভাগবত-ব্যবসায়টী পরিত্যাজ্য কেন?

“এ ব্যবসায়টী (ভাগবত-পাঠ) সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি রস-পিপাসু; রসের নিকট আর অপরাধ করিবে না। ‘রসো বৈ সং’ (তে: আ: ২।৭)—এই বেদবাক্যে রসই কৃষ্ণ-স্বরূপ। শরীর নির্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই তুমি অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত-পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি রসিক শ্রোতা পাও, তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে।”

—জৈ: ধ: ২৮শ অ:

২১। হরিনাম-বিক্রয়ী কি অপরাধী নহে?

“জীবিকা-নির্বাহের অন্যান্য অনেক উপায় আছে; তাহাই অবলম্বন করিয়া সে-কার্য্য নির্বাহ করা কর্তব্য। * * * হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসার নির্বাহের বৃত্তি-স্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নামদাতা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রেমফল লাভের সম্ভাবনা থাকে না, প্রত্যুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। পয়সা হরিনামের মূল্য নয়। একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য, অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত।”

—‘টহল’, সসঙ্গিনী সং: তো: ৮।৮

২২। ধামাপরাধিগণের চেষ্টা, পরিচয় ও পরিণাম কিরূপ?

“কতকগুলি লোক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে এবং দীর্ঘাবশতঃ শ্রীমায়াপুরের উন্নতি-সাধনের নানাপ্রকার ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতেছিলেন। তাঁহারা সেই ধামের উন্নতি দেখিয়া সম্প্রতি হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। দুই একজন নিতান্ত দীর্ঘা-পরবশ হইয়া এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকায় দুই এক কথা বলিতেছেন। মহাপ্রভুও তাঁহাদিগকেও অতি শীঘ্র দমন করিবেন, সন্দেহ নাই। * * * আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহুদিন হইতে শ্রীমায়াপুরের যাত্রার্থী গোপন করিয়া কতকগুলি লোক কনক-কামিনী সঞ্চয়ে যত্নবান্ ছিল। যে-মুহূর্ত্তে শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেই মুহূর্ত্তেই ঐসকল কলির চেলা নানা আকারে এবং নানা কৌশলে ধামের মাহাত্ম্য গোপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পরমেশ্বর ও তাঁহার সত্য—অজেয়, এই দুই বৎসরের মধ্যে কলির চেলাদিগের মুখে কালিচূর্ণ পড়িয়াছে; ভক্তজগৎ আর তাহাদিগের কথা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং নিজে নিজেই তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছে। কলির কি খেলা! অমাবস্যাগকে পূর্ণিমা বলিয়া প্রকাশ করিয়া, তাহাতে তাহাদের ক্রিয়া আরম্ভ করিল! কিন্তু লোকে সহসা তাহাদিগের কার্য্য চিনিতে পারিয়া চতুর্দিকে

তাহাদের প্রতি হাস্য করিতেছে। এখন সর্বলোকেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, শ্রীধাম মায়াপুরই শ্রীনবদ্বীপের চূড়ামণি পীঠ।”

—‘নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা’, সং তোঃ ৮।১

বৈষ্ণব-নিন্দা

১। শুদ্ধবৈষ্ণব-নিন্দা কর্ণে আসিলে কি কর্তব্য? বৈষ্ণব-নিন্দক গুরুব্রুবের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?

“বৈধভক্তগণ ভগবন্নিদা ও ভাগবত-নিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা করিবেন না। যদি কোন সভায় সেইরূপ নিন্দা হইতে থাকে, তবে যোগ্যতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। যেখানে প্রতিবাদের ফল হইবে না, সেখানে বধিরের ন্যায় থাকিবেন, তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। যোগ্যতা না থাকিলে, তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করিবেন। যদি গুরুদেবের মুখেও ঐরকম নিন্দা শুনা যায়, তাঁহাকেও বিনীতভাবে তজ্জন্য সতর্ক করিবেন। যদি তিনি নিতান্তপক্ষে বৈষ্ণববিদ্বেষী হন, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক অন্য উপযুক্ত পাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিবেন।”—চৈঃ শিঃ ৩।৪

২। বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণে কি অসুবিধা হয়?

“সাধক বৈষ্ণবনিন্দা ও কৃষ্ণনিন্দা কর্ণে শুনিবেন না। যেখানে সেরূপ নিন্দা হয়, সেখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। যাহাদের হৃদয় দুর্বল, তাহারা লোকাপেক্ষায় কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চ্যুত হন।”

—‘তত্তৎকর্মপ্রবর্তন’, সং তোঃ ১১।৬

৩। সাধুনিন্দা সর্বাধম অপরাধ কেন?

“যে-সকল সাধু একমাত্র নামের আশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৃহৎ অপরাধ হয়; কেন না, যাহারা নামের যথার্থ মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের নিন্দা হরিনাম সহিতে পারেন না। নামপরাণ সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাদিগকেই ‘সর্বোত্তম সাধু’ বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নাম-কীর্তন করিলে নামের শীঘ্র কৃপা হয়।”

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৪। সাধুনিন্দার ফলে কি হয়?

“সিদ্ধান্ত করিয়া সাধু-বৈষ্ণবের সম্মান ও অসাধুর সঙ্গত্যাগ অবশ্য অবশ্য করিবেন। সাধু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে হৃদয়ে কখনও নামতত্ত্বের উদয় হইবে না।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা’, সং তোঃ ৫।৫

৫। ছয়প্রকার বৈষ্ণবাপরাধ কি কি ও তদনুষ্ঠাতার ফল কি?

“যে মুঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে তাহার পিতৃলোকের সহিত মহারৌরব-নামক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, নিন্দা করে, বিদ্বেষ করে, বৈষ্ণবকে দেখিয়া অভিনন্দন করে না, ক্রোধ করে বা বিমর্ষ হয়, তাহা পক্ষে এই ছয়টি গর্হিত আচার তাহার পতনের কারণ হয়।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা’, সং তোঃ ৫।২

৬। বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণে কি ফল হয়?

“যে-স্থলে ভগবানের বা বৈষ্ণবের নিন্দা হইতেছে, যিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া না যান, তিনি সমস্ত সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা’, সং তোঃ ৫।২

৭। শুদ্ধবৈষ্ণবের কোন নিন্দা হইতে পারে কি?

“যদি পাপের আদর দেখা যায়, তবে তাহাকে বৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরও পাপ ও পুণ্যে রুচি থাকে না। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহার দোষ নাই; অতএব নিন্দাও নাই। যিনি তাঁহার নিন্দা করিবেন, তিনি বৈষ্ণবের প্রতি মিথ্যা অপবাদই আরোপ করিবেন।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা’, সং তোঃ ৫।২

৮। দুষ্টলোকগণ বৈষ্ণবের কি কি কথা লইয়া বিদ্বেষের সহিত নিন্দা করিয়া থাকে?

“বৈষ্ণবের তিনপ্রকার কথা লইয়া দুষ্ট লোকে বিদ্বেষপূর্বক আলোচনা করিতে পারে। শুদ্ধভক্তির উদয় হইবার পূর্বে সেই ব্যক্তির যে-সকল দোষ ছিল, তাহা দুষ্ট লোকের এক প্রকারে আলোচ্য হয়। ভক্তির উদয় হইলে দোষসমূহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইতে হইতে যে-কিছু কাল অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার অবশিষ্ট দোষের বিষয়ে দুষ্ট লোকে দ্বিতীয় প্রকারে আলোচনা করিয়া থাকে। দুষ্ট লোকের তৃতীয় প্রকারে আলোচ্য বিষয় এই যে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষে স্পৃহা না থাকিলেও কখনও দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়। সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনই স্থায়ী হয় না। তথাপি দুষ্ট লোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া ভীষণ বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা’, সং তোঃ ৫।২

৯। বৈষ্ণবের চরিত্র আলোচনায় কিরূপ সতর্কতা অবলম্বনীয়?

“বৈষ্ণবের ভক্তি-উদয়ের পূর্বে যে-সমস্ত দোষ ছিল, তাহা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কখনই আলোচনা করিবেন না। পূর্ব-দোষের ক্ষয়াবশিষ্ট দোষ লইয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন না।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা’, সং তোঃ ৫।৩

১০। সদুদ্দেশ্য ব্যতীত বৈষ্ণবের পূর্বতন; কাদাচিৎক ও নষ্টপ্রায়-দোষ আলোচ্য কি?

“নিসর্গপ্রায় যে-সকল সুদুরাচার ভক্তি জন্মিবার পূর্ব হইতে আসিতেছে, তাহা দিন-দিন ভক্তিবলে খর্ব হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাহা লইয়া সদুদ্দেশ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণবনিন্দার অপরাধ হয়। দৈবাৎ অপতিত যে দোষ, তাহা দেখিয়াও বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবে না।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা’, সং তোঃ ৫।৫

১১। বৈষ্ণবের কোন্ কোন্ দোষ সমালোচনা করিলে বৈষ্ণবোপরাধ হইয়া থাকে?

“দৈবোৎপন্ন দোষের সদুদ্দেশ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দার অপরাধ হয়। মূল-কথা এই যে, বৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ ও পূর্বোক্ত তিনপ্রকার (প্রাণোৎপন্ন, ক্ষয়াবশিষ্ট

ও দৈবোৎপন্ন) দোষ লইয়া আলোচনা করিলে নামাপরাধ হয়, তাহাতে নাম-স্মৃতি হয় না। নাম-স্মৃতি না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা’, সঃ তোঃ ৫।৫

১২। সদুদ্দেশ্য ব্যতীত পরচর্চা কি বাঞ্ছনীয়?

“সদুদ্দেশ্যের সহিত যে পরদোষের আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সদুদ্দেশ্য তিন প্রকার ; যে ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনা শুভ। জগতের মঙ্গলসাধনের জন্য যদি পাপীর পাপ আলোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভকার্যের মধ্যে গণিত।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা’, সঃ তোঃ ৫।৫

১৩। সাধু-মহিম-জ্ঞাপনার্থ অসাধুর চরিত্র আলোচনা করিলে কি বৈষ্ণবনিন্দা হয়?

“শিষ্য গুরুদেবকে বৈষ্ণব নির্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে গুরুদেব শিষ্যের ও জগতের মঙ্গল-কামনায় অসদাচারীদিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া সাধু-বৈষ্ণবের নির্দেশ করিয়া থাকেন। সাধু-বৈষ্ণবের পদ আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে অসৎ ধর্মধ্বজী লোককে পরিত্যাগ করাতে সাধুনিন্দা বা বৈষ্ণবাপরাধ হয় না।”

—‘বৈষ্ণবনিন্দা’, সঃ তোঃ ৫।৫

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

“বৃহদন্ত ব্রহ্ম কহি—‘শ্রীভগবান্’।

ষড়্বিধৈশ্বর্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম ॥

স্বরূপ-ঐশ্বর্যে তার নাহি মায়াগন্ধ।

সকল বেদের হয় ভগবান্ সে ‘সম্বন্ধ’ ॥”

অনেকে বিচার করেন, ধর্মার্থকামই প্রয়োজন ; তাঁরা বুড়ুক্ষু। আর মুমুক্শুগণ মোক্ষাভিলাষী। কিন্তু ভগবানে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বিচার—ভজনীয়-বস্তুর সেবা করা—ভজনীয়-বস্তুর বুড়ুক্ষার সেবা। ভগবান্ আমাদের সেবাপ্রবৃত্তিরাহিত্য দেখে যখন ছেড়ে দেন, তখন আমরা ভোগচেষ্টা করি। ভোগে বিরক্ত হলে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করি। ঐ দুটো আমাদের ব্যস্ত করলে সেবা ছেড়ে দেই। ভগবানের বাসনানলের ইন্ধন হলে তাঁর বুড়ুক্ষার তৃপ্তি হয়, আর আমরা তাঁকে বঞ্চনা করলে তিনি আমাদের ছেড়ে দেন। তাঁর কথা আলোচনা না করে সম্বন্ধরহিত অবস্থাই নির্বিশেষ। সম্বন্ধ ভোক্তা ও ভোগের মধ্যবর্তী অবস্থা। প্রত্যেকটী বাদরায়ণ-সূত্র ও সকল মন্ত্রের সঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধ। তাঁকে নির্বিশেষ চিহ্ন-রহিত বললে নিঃশক্তিক বিচার প্রবল হয়। নির্বিশেষবিচার গ্রহণ করে চিৎ-সবিশেষ ত্যাগ করলে অর্ধ স্বীকার করা হল। ‘চিদ্বিশেষরহিত’ বললে অপরাধ করা হয়। তাঁর বিশেষ না মানলে

‘অভাবযুক্ত’ বিচার করতে হয়। নির্বিশেষ-বিচারে অচিদ্বিশেষ-রহিত বলা হচ্ছে কিন্তু চিৎবিশেষ স্বীকার না করলে অর্দ্ধ স্বীকার করা হল মাত্র। নির্বিশেষদ্বী বিশুদ্ধ রাখতে হলে তাকে চিৎসবিশেষের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

যা যা শ্রুতির্জন্মতি নির্বিশেষং সা সাভিধন্তে সবিশেষমেব।

বিচারযোগে সতি হন্তু তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।

কৃষ্ণের তটস্থশক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ।

কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি-বহিস্মুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।

ত্রিবিধ দুঃখ উপাধিদ্বারা ভোগ হয়। শঙ্কর-সম্প্রদায় বলেন,—উপাধি কিছুই নয়, তা মিথ্যা ; জগৎ মিথ্যা ; জীবপ্রতীতিও সত্য নয় ; জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার অভেদ। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। জীব ভগবৎপ্রকাশ-তত্ত্ব—শ্রীবলদেব বা বৈভবাবতারবৎ নহে, তাহারা বিভিন্নাংশ। ভেদাংশে শক্তিগত অংশ। আর অবতারসকল স্বরূপগত অংশ। চিচ্ছক্তি প্রকাশগত ভেদ ও অচিচ্ছক্তি-প্রকাশগত ভেদ এক নহে। স্বাংশ সহ বিভিন্নাংশের সমত্ব প্রয়াস মূঢ়তা মাত্র। জীবে ভগবানের শক্তি-প্রকাশ-ভেদ। এজন্য শ্রীমধ্ব পঞ্চপ্রকার ভেদ বর্ণনা করেছেন।

“শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়।”

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের প্রাপ্তির জন্য যত্ন করলে শ্রবণাদি ভক্তি মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। তাহা অন্যাত্মিলাষ কৰ্ম্মাদিজ্ঞানরহিত হওয়া প্রয়োজন। শরণাগত হয়ে চৈতন-কর্ণে শ্রবণ করতে হবে। প্রাকৃত বিচার থাকলে অসুবিধা। বহিঃপ্রজ্ঞা ত্যাগ করে অন্তঃপ্রজ্ঞ হয়ে পূর্ণপ্রজ্ঞের শ্রীচরণাশ্রয় করলে বুঝবে—“আদৌ অপিত্য পশ্চাৎ ক্রিয়েত” প্রাকৃত জগতে বাস্তব-বস্তুর অধিষ্ঠান না থাকায়—কোন জাড্য, ভোগপ্রবৃত্তিতে বিষ্ণু না থাকায় নির্বিশেষবাদী তাঁকে হস্ত-পদাদি-রহিত বিচার করেন। শরণাগত না হলে, “সর্ব্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য” শ্লোকে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট না হলে বিষ্ণুপ্রতীতি হয় না। কৃষ্ণপ্রাপ্তি-জন্য শ্রবণ দরকার। ভেদাংশ জীব বুভুক্ষা ও মুমুক্ষায় ব্যস্ত। তা থেকে পরিত্রাণ দরকার হলে শরণাগত হওয়া প্রয়োজন। তখন “সর্ব্ব মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ” বিচার বুঝতে পারা যাবে। মনোধৰ্ম্ম থেমে যাবে। বিশ্ব তখন নিজভোগ্যরূপে দর্শন-রহিত হয়ে বিশ্বেশ্বরের ভোগ্যরূপে দৃষ্টি হবে।

ভগবান্ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশ্বদর্শন করলে ভগবদদর্শনের অভাব হয়। দুরাশা হলে জড়ভোগী। সদাশা হলে চৈতন-বস্তুর সেবক। চিন্ময়-অভেদ-বিচারে সুখ, জড়-ভেদ-বিচারে দুঃখ।

ঈহা যস্য হরেদাস্যে কৰ্ম্মণা মনসা গিরা।

নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবনুক্তঃ স উচ্যতে।।

জগতে থাকতে থাকতে মুক্ত হওয়া দরকার। কাল্পনিক মুক্তিতে বস্তুসিদ্ধি হয় না। স্বরূপসিদ্ধির পর বস্তুসিদ্ধি। কুণ্ঠাধৰ্ম্মে থাকলে দেহপতনান্তে পুনরায় পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য বা দেবমাতার কৃষ্ণিতে বাস করতে হবে। বৈকুণ্ঠবাস না হলে, কৰ্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাত্মিলাষ থাকলে সুবিধা হবে না। রাজস বা তামস ভক্তি করতে হবে না।

শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়। স্বাধ্যায়নিরত হয়ে নিজে বেদ পড়ে নিলে তাঁকে জানা যাবে না।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

জড়মেধার দ্বারা বা অহঙ্কারযুক্ত হয়ে ভক্তিরহিতাবস্থায় শ্রবণ করলে হবে না। অনেকে বলেন,—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষেগঃ শ্রদ্ধাঘিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

আমরা শ্রদ্ধাঘিত হয়ে শুনছি। কিন্তু কিসে শ্রদ্ধা? ভোগে না ত্যাগে, না জড়ে? নিজে বিচারের মালিক হয়ে শুনলে হবে না। শুনে নিজের শোধন করে যেতে হবে।

চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করতে হবে। যদি শোধিত না হয়ে কামত্রোধাদি বুদ্ধিলাভ করে, আর জড়ভোগ প্রবল হয়ে বুভুক্ষা-মুমুক্ষারতি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ভক্তবিচার-রহিত ভক্তি হয়, তবে হবে না। ভেদাংশবিচারে ভজন করতে হবে। অহংগ্রহোপাসক মুঢ়গণ বলেন,—“আমি বার্ষভানবী”। তাতে প্রাকৃত সহজিয়াধর্ম্য বুদ্ধি হয়ে অমঙ্গল বরণ করবে। নির্মল অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট হলে বাস্তববস্তুর অনুসন্ধান হবে। ‘পাকা বোষ্টম্’ হলে সুবিধা হবে না। কতক ভোগী কতক ত্যাগী হয়ে মনে করছে—ভক্ত হয়েছি। সেব্যের সেবা করতে হবে। সেব্যকে অচিৎ-পিণ্ড মনে করতে হবে না। তিনি যদি দেখা দেন, সেবাগ্রহণ করেন, তবে পাব। লণ্ডাঘাতে দূরস্ত করে তাঁকে ভোগ করতে পারব না। বৈষ্ণব হতে হবে। ভজনশীল ব্যক্তি লোভের বশবর্তী হয়ে তাঁর ভজন করেন। নচেৎ জড়বিচারে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে—আনুগত্যের ভার করে কপটতা করে দিন কাটালে হবে না।

মুক্তাবস্থা ভাল, কিন্তু বন্ধাবস্থা থাকাকালে—ইতরবাসনা থাকতে থাকতে মুক্তাভিমান ঠিক নয়। বৃন্দাবনে এসে খুকুমণির জন্য খেলনা কিনব বিচার হলে বৃন্দাবনে এলাম কি? অহর্নিশ হরিভজন হওয়া দরকার।

অভিধেয়-বিচারে প্রথমে সাধ্য, মধ্যে ভাব, পরে প্রেম। অনর্থনিবৃত্ত অবস্থায় অত্যাৎকর্ষ ভাব। সেখানে ‘রঞ্জনাত্’ রতির উদয়। কৃষ্ণের রঞ্জনর্থ রতি। নিজের রঞ্জন হলে যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকব। অনাত্ম-স্বভাবকে আত্মস্বভাব ভ্রম হলে অসুবিধা।

ভাবাকুর হলে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব প্রভৃতি নববিধ অনুভাব দেখতে পাওয়া যাবে। তখন জগতের বিক্রমে ওদাসীন্য আসবে।

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে

নব-নব রসধামন্যদ্যতং রন্তুমাসীৎ।

তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে

ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ ॥ (ভঃ রঃ সঃ)

কামুক সর্বদা নারীচিন্তায় ব্যস্ত। কৌমার হতে বৃদ্ধ, মুমূর্ষু পর্য্যন্ত নারীচিন্তায় মত্ত। কিন্তু যখন কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় জাগবে তখন নারীসঙ্গ স্মরণ হলে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করতে ইচ্ছা হবে। বিরংসারত ব্যক্তির বিচারপ্রণালী অকস্মণ্য। নব নব রসধাম কৃষ্ণপাদপদ্মে

আমাদের চিত্তবৃত্তি অগ্রসর হলে নারীসঙ্গমে জুগুপ্সারতির উদয় হবে। যেমন রতিমঞ্জরী বলেছেন,—

পাদাজয়ো স্তব বিনা বরদাস্যমেব।

নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।।

মঞ্চরীর আনুগত্য—গুরুানুগত্য যেকাল পর্যন্ত না হবে ততদিন সমস্তই পণ্ড। কাল্পনিক গুরুর আশ্রয় করলে আমার সেবক তিনি হবেন। অসৎ লৌকিক ব্যবহারিক গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করে পারমার্থিক সঙ্গ প্রয়োজনীয়।

সাধনভক্তিকে অগ্রাহ্য করলে হবে না। ঘিনি বাজাতে বাজাতে নড়ে উঠলে প্রেমিক বা ভাবুক হওয়া যাবে না।

বিশ্রুতসহকারে গুরুবৈষম্যসেবায় অনর্থ-নিবৃত্তি। গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করব—আত্মভক্তিক ইচ্ছা হলে অবাস্তব-বস্তু সবজাতাগিরি ছেড়ে যাবে, তখন শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) স্থাপন হবে। তিনি যা বলেন শুনতে হবে। আর আমি বলব, তাঁর অভাব আছে (যেমন দামোদরের হয়েছিল, মহাপ্রভু তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন) তাতে গুরুর উপর গুরুগিরি হয়ে যায়। খোদার উপর খোদগিরি করতে গেলে অসুবিধা।

জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুতশ্রী, সুর, মান, লয় প্রভৃতিদ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয় না। বহির্জগতের চিন্তা প্রবল থাকলে সংসারের দুর্বুদ্ধি হয়।

“জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব শ্রীহরিভজনে বাধা।”

দেশী ঘিনি বাজাতে শিখলে সর্বনাশ। ইন্দ্রিয়-সৌখ্য-সুবিধা চাইলেও সর্বনাশ। অধোক্ষজবিমুখ যারা, তাদের জন্য সংসার। বার্ষভানবী অধোক্ষজ-সেবাপরায়ণা। তিনি ভজনে বাধা বুঝতে দিচ্ছেন না ; যারা জড়বিদ্যা চায় তারা জাগতিক উপাধিলাভের জন্য দৌড়াচ্ছেন। গান শিখে Dr. of music হতে যাচ্ছেন। উপনিষৎ পড়ে নির্বিশেষ জ্ঞানী হয়ে পড়ছেন। তাতে কোনদিন সুবিধা নাই।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি

ব্যবসার Merits, Demerits অর্থাৎ লাভ-লোকসানের কথা না বিচার-বিবেচনা করিয়া ব্যবসা করিতে গেলে লাভ ত’ দূরের কথা, মূলধনসমূহও নষ্ট করিয়া ‘আক্কেল সেলামি’ দিতে হয়। লভ্যাংশ প্রত্যেক জীবের লক্ষ্যবস্তু হইলেও “ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির” অভাবে “ভূতের বেগার” খাটিয়াও তাঁহারা লোকসানের অঙ্কটাকে কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম হন না। লোকসান ত’ জীবের জীবনে আত্মহত্যার সামিল। “কড়ি দিয়ে হেঁটে নদী পার হওয়ার” ন্যায় লভ্যাংশবিহীন কর্মের নিমিত্ত বৃথা পরিশ্রম করিয়া জীবনের ক্ষতিসাধন করিবার মধ্যে কি সার্থকতা রহিয়াছে? প্রত্যেককে লাভের জন্য ব্যবসা করিতে হইবে, তাহা না হইলে যে কোন মুহূর্তে মূলধন নষ্ট হইয়া গেলে তাঁহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইবে। পথের কোথায় কি আছে তাহা না জানিয়া পথ চলিতে গেলে যেকোন প্রতি মুহূর্তে আছাড় খাইয়া হাত-পা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তদ্রূপ প্রকৃত লাভের তথ্য অবগত না

হইয়া ব্যবসা করিতে গেলে জীবনযুদ্ধের প্রতি পদক্ষেপে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অন্তিমে নিরয় গমন করিতে হইবে।

গুণাগুণ বিচার করিয়া খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিতে হয়, অন্যথায় অখাদ্য গ্রহণ করিয়া উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হইলে জীবন সংশয়াপন্ন হইতে পারে। কথায় বলে,— “কুভোজেন দিনং নষ্টম্” অর্থাৎ কুখাদ্য ভোজন করিলে তজ্জন্য সেই দিনটাই নানা অসুখে নষ্ট হইয়া যায়। “ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি” অবলম্বনে যাঁহারা ব্যবসা করেন, তাঁহারা প্রকৃত ব্যবসায়ী; অন্যান্য সকলে ব্যবসায়ীর পরিচয়ে অব্যবসায়ী মাত্র। প্রকৃত ব্যবসায়িগণ কখনও ‘ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ’ করেন না, তাঁহারা বেদের পুষ্টিত বাক্যসমূহদ্বারা চালিত হইয়া শ্রীহরিভজনে রত থাকিয়া জীবন সার্থক করেন। প্রবাদবাক্যে পাওয়া যায়,— “কঃ প্রাজ্ঞো বাঞ্ছতি স্নেহং বেশ্যাসু সিকতাসু চ” অর্থাৎ “কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বেশ্যাতে বা বালুকাতে স্নেহ পাইতে ইচ্ছা করে? যেহেতু বেশ্যাতে ও বালুকাতে স্নেহ-রস বিন্দুমাত্র নাই।” অথচ অব্যবসায়িগণ বেশ্যাতে ও বালুকাতে স্নেহ-রস পাইবার ন্যায় ‘ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি’ অবলম্বনপূর্বক লাভের অঙ্কটাকে বাড়াইতে গিয়া মূলধন অর্থাৎ পরমার্থধন হারা হইয়া চরম সর্বনাশ আনয়ন করিয়া থাকে।

যে-কাল পর্য্যন্ত অণুচিৎ জীব স্বীয় আচরণকারী রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের হেয়তা উপলব্ধি না করেন, স্বীয় চিদানন্দময় স্বরূপের পরিচয় না পান, তৎকালাবধি তাঁহার ক্লেশপ্রাপ্তি। সংসারে নানা বস্তুর ভোগবাঞ্ছার নিমিত্ত বদ্ধজীবের নানা বিচার উপস্থিত হয়। অত্যধিক ভোগবাসনা জীবকে উত্তরোত্তর দ্বিতীয় অভিনিবেশের মধ্যে পতিত করিয়া অব্যবসায়ী করিয়া তোলে। মূর্থ ব্যবসায়ী যেরূপ মূলধন লইয়া ব্যবসা করিতে গিয়া শেষ পর্য্যন্ত মূলধন নষ্ট করিয়া বসে, তদ্রূপ হরিসেবাবিমুখ ব্যক্তিগণ জড়ভোগসমূহে আসক্তি প্রকাশ করিয়া নিজ নিত্যধন লাভে বঞ্চিত হয়। ক্ষণস্থায়ী সুখভোগের কথা শ্রবণ করা স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় অপ্রয়োজনীয়। নিজ দন্তকর্তৃক জিহ্বা আঘাতপ্রাপ্ত হইলে দন্তোৎপাটনদ্বারা নিজের ক্ষতিসাধন করা যেরূপ যুক্তিযুক্ত নহে, তদ্রূপ বহির্বস্তুর দ্বারা গঠিত দেহধারী ব্যক্তির আত্মার অমঙ্গল সাধন করা উচিত নহে।

প্রেয়োমার্গের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা নহে, তাহা

বহুবিষয়িনী ও অমঙ্গলজনক

অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনে অবিনশ্বর-সত্য নিত্যই বিরাজমান। দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগবশতঃ মায়াবদ্ধ জীবের নিজের মঙ্গল বা অমঙ্গল নির্ণয় প্রভৃতি সকলই সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের ধর্ম্ম। স্ব-স্বরূপ ও কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া জীবের ভোক্তা-অভিমাণে অক্ষজ-জ্ঞানে ভাল-মন্দের বিচারচেষ্টা নানাপ্রকার ভ্রম উৎপাদন করে। তখন বুদ্ধি বিচার করিয়া কোন্টা গ্রাহ্য বা কর্তব্য তাহা নির্ণয় করিয়া দেয়। এই হেতু মনকে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক এবং বুদ্ধিকে ব্যবসায়াত্মিকা ইন্দ্রিয় বলে। সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় করাকেই ‘ব্যবসায়’ বলে। ‘বুদ্ধি’ কিছু স্থির নিশ্চয় করিয়া দিলে মন আবার সেইদিকে ধাবিত হয়। সাধারণভাবে ‘বোধ’, ‘জ্ঞান’ অর্থে বুদ্ধি-শব্দের প্রয়োগ হয়। দার্শনিক পরিভাষায় বুদ্ধিকে বলে ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে যেই বুদ্ধি ভগবদ্ভজনের

নিশ্চয়তা বাদ দিয়া অন্য ইতর বস্তুর নিশ্চয়তা প্রকাশ করিয়া মনকে সেই দিকে প্রধাবিত করে, তাহা অবশ্যই অব্যবসায়িত্বিকা ও জড়। জড়বুদ্ধি কখনও জীবের কল্যাণ সাধন করিতে পারে না।

ভক্তিবিহিন্মুখগণের বুদ্ধি যে অনন্ত ও বহুশাখাযুক্ত, তাহা গীতার (২।৪১) “ব্যবসায়িত্বিকা বুদ্ধিরেকহ” শ্লোকে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রেয়োমার্গে বুদ্ধি কেবলমাত্র আত্মতত্ত্বকে নিশ্চয় করে না বলিয়া তাহা বহু-বিষয়িণী। ভক্তিরহিত ঈশ্বরারাধনা-বিমুখ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি কাম্যকর্ম-বিষয়িণী, তাহা স্ত্রী, পুত্রাদি অনেক বিষয়-নিষ্ঠ বলিয়া বহুশাখাময়ী ও অনন্তকামনা-লক্ষিণী। সেই বুদ্ধিদ্বারা কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তিগণ আত্মযাথাত্ম্য লাভ করিতে পারে না। ভগবদ্ভক্তিতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অভাবেই তাঁহাদের অশুভ কাম্যকর্মে প্রবৃত্তি দেখা যায়। যে-স্থলে অব্যবসায়ী ব্যক্তির বহু উদ্দেশ্য, সেখানে তাঁহার মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা মনে করেন,—“ধর্ম, অর্থ ও কাম তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন রুচির প্রয়োজনীয় বিষয়”, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা অতি মূর্খ। যশোলাভ, কল্পিত সত্যে অবস্থান এবং জড়মোগপ্রমত্ত না হওয়াই শান্তির কারণ। ঐশ্বর্য লাভ, ঐশ্বর্য পরিত্যাগ, আহাৰ্য্য সংগ্রহ প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় বিষয়রূপ বহু অনর্থ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়। ভোগপ্রবৃত্তিতে সকলপ্রকার অসুবিধা বর্তমান। ভোগপ্রবৃত্তির নিমিত্তই নিরন্তর লৌকিক ও বৈদিক নানাবিধ কর্মকাণ্ড-বিষয়ক বাদানুবাদ শ্রবণে ও আলোচনায় লোকের বুদ্ধি বহুপথগামিনী ও নানাবিধ সংশয়াবৃত হইয়া কলুষিত হয়।

আত্মানাত্ম-বিবেকরহিত ব্যক্তিগণ আত্মানাত্মবিবেকযুক্ত বুদ্ধিমানের সহিত সমজাতীয় নহে। অসতী ভার্য্যার ভর্তা হইলে পুরুষের যেরূপ স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ জড়বুদ্ধির সংসর্গে জীবের সমস্ত শান্তি অন্তর্হিত হয়। ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুতে যদ্রূপ সর্পভ্রম হয় এবং (স্বপ্নে) পুরুষের (জীবের) যেরূপ আপনাতে সুখ-দুঃখাদি জ্ঞান অবিবেকবশতঃই হইয়া থাকে, তদ্রূপ সুখ-দুঃখাদিতে যে গুণ-দোষ বিচার তাহাও অবিবেকবশতঃই হইয়া থাকে। অব্যবসায়িত্বিকা বুদ্ধিতেই বহুায়ন পন্থার উদ্ভব হয়। বিষয়কামনাপরবশ রজোবেগমোহিত অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কর্মসমূহের পরিণামে দুঃখরূপ ফল দর্শন করিয়াও তাহা আচরণ করিয়া থাকেন। ভগবদ্বিস্মৃতিক্রমে রজোস্তমোগুণজাত বস্তুর বদ্ধজীবের রুচি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। রজস্তমোরহিত বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্নাভের জন্য তাঁহাদের স্বাভাবিকী চেষ্টা নাই। রজস্তমো গুণ হইতেই ক্লেশের উৎপত্তি। গুণমিশ্রসত্তায় অল্পকালের জন্য দুঃখাভাব থাকিলেও অনন্তসুখলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বদ্ধজীব পরিচ্ছিন্ন পরিণামশীল লোভনীয় বস্তুর দিকে ধাবমান হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুর দানলাভের জন্য ব্যগ্র হয়—উহাই তাঁহার দুঃখের কারণ।

শ্রীকৃষ্ণভজনে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিমিত্তই কৃষ্ণভক্তের

প্রকৃত ব্যবসায়ীর পরিচয়

শ্রেয়োমার্গে বুদ্ধি কেবলমাত্র ভক্তিপথকেই নিশ্চয় করে বলিয়া সে একা অর্থাৎ একবিষয়িণী। ভক্তিপথেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। ইতরবস্তুর প্রয়াসই অন্যাভিলাষ। ভগবদাজ্ঞা পালনই ভক্তি। যাঁহার এইরূপ নিশ্চয়তা জন্মিয়াছে, তাঁহার বুদ্ধিই ব্যবসায়িত্বিকা। বাঁধিবার

ব্যবসায়িকাবুদ্ধি বা নিশ্চয়িকাবুদ্ধি যে একা বা একায়নপন্থী, তাহা ‘ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যম্’, ‘ভক্ত্যা ত্বন্যয়া শক্যোহহমমেবম্বিধোহজ্জুন’, ‘ভক্ত্যা মামভিজানাতি’, ‘ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়। গীতার সর্বগুহ্যতম বাক্যও ভক্তিকেই চরম সত্য বলা হইয়াছে। ভক্তিপথ ত্যাগ করিয়া নানা পথের উদ্ভাবনাদ্বারা জীবকে ভ্রান্তপথে চালিত করিয়া আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণের মহানর্থ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার মধ্যে কি জীবহিতচেষ্টা থাকিতে পারে?

ভগবানের পরিচয় লাভ করিলেই বন্ধজীবের হৃদয়গ্রন্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া সর্বপ্রকার সন্দেহ নিরাকৃত হয়। জড় ভোগবাসনা ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইলে মনের মধ্যে কোন কুতর্ক বাসা বাঁধিবার অবকাশ পায় না। জীব তখন ভোগচেষ্টারহিত হইয়া ভগবৎসেবাসুখের অনুসন্ধানের রত থাকেন। প্রকৃতপক্ষে জড়বস্তুর সান্নিধ্যে তাহাতে অভিভূত না হইয়া সারগ্রহণেই বুদ্ধিবৃত্তির সুষ্ঠুতা। সর্বতোভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়কে নিযুক্ত করিয়া যথাযোগ্য বিষয়গ্রহণে কোন দোষ বা অপরাধ উৎপন্ন হয় না। সেবাবৃত্তির অভাব হইতেই জড়ভোগের উৎপত্তি এবং তাহাই ক্রেশের মূল। সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণত্রয় অবলম্বন করিবার পরিবর্তে যিনি কেবল ভক্তিধর্ম অবলম্বন করেন, তিনিই প্রকৃত ব্যবসায়ী, তিনিই পরমগতি লাভে সমর্থ হন। ভগবদ্ভুক্ত ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বাসনায় আবদ্ধ হন না। তাঁহাকে ব্রহ্মার পদবী, ইন্দ্রত্ব, সমগ্র জগতের আধিপত্য, রসাধিপত্য, রূপ ভোগ, জৈবশক্তির অতীত অষ্টাদশ সিদ্ধি অথবা জন্মান্তর রাহিত্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা গ্রাস করিতে পারে না।

লব্ধ সাধুসঙ্গ পুরুষের যে যে আনুকূল্য আশ্রয় করিতে হইবে, তৎপ্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে (১০।২০।২৭-২৮) বলিয়াছেন,—“প্রথমেই অনাসক্তভাবে বিষয়াঙ্গীকার। আমার কথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিসকল কর্মফলনির্ব্বিগ্ন হইয়া জীবনযাত্রা নিব্বাহ করিবেন। কাম পরিত্যাগে অশক্ত, তথাপি কামকে চরমে দুঃখাত্মক জানিয়া তাহাকে ক্রমশঃ সঙ্কোচ করিবেন। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমার ভজন করিতে থাকিবেন। দুঃখই কামের চরম ফল, এইরূপ জানিয়া সেই কামকে নিন্দা করিতে করিতে স্বীকার করিবেন। এই কার্য নিষ্কপট হইলে আমি কৃপা করি।” ভাগবতের (১০।২০।২৭-২৮) “জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু” শ্লোকে “দৃঢ়নিশ্চয়” যে শব্দ রহিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—“গৃহাদিতে আমার আসক্তি নাশ বা বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় হউক, ভজনেও আমার কোটি বিঘ্ন হউক বা নষ্ট হউক, অপরাধে যদি নরক হয় হউক, কামও যদি অঙ্গীকার করি, তথাপি ভক্তি ত্যাগ করিব না, জ্ঞান-কর্মাঙ্গাদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিব না, যদি স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়াও বলেন—এইপ্রকার যাঁহার নিশ্চয়তা দৃঢ়।”

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ গীতার (২।৪১) “ব্যবসায়িকাবুদ্ধিরেকহ” শ্লোকের টীকায়ও লিখিয়াছেন,—সমস্ত বুদ্ধি অপেক্ষা ভক্তিযোগ-বিষয়িণী বুদ্ধি উৎকৃষ্ট। এই ভক্তিযোগে ব্যবসায়িকাবুদ্ধি—আমার শ্রীগুরুর উপদিষ্ট—ভগবৎ-কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্যা ইত্যাদিই আমার সাধন, ইহাই আমার সাধ্য ও জীবাভূত। সাধন সাধ্য দশাঙ্গয় ত্যাগ করিতে অসমর্থ, ইহাই আমার কামনা ও কার্য, ইহা বিনা আমার কার্য নাই, অভিলষণীয় স্বপ্নেও নহে। ইহাতে সুখই হউক বা দুঃখই হউক, সংসার নাশপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, তাহাতে

আমার কোন ক্ষতি নাই—এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অকৈতব ভক্তিতে সম্ভবপর।”

অতএব মনুষ্যের নিজ নিত্য হিতচিন্তা ব্যতীত আর কোন কৃত্য নাই এবং সকলপ্রকার কর্তব্যের তারতম্য বিচারে নিজ নিত্য হিতচিন্তাকেই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যিক। মানবের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কালক্ষেপ ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হওয়া আবশ্যিক।

—ত্রিদিগ্গিম্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

বিষ্ণুমায়া

দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরতয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গীতা)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—হে সখে! আমার এই মায়া দৈবী, অলৌকিকী এবং দুস্তরা অর্থাৎ মনুষ্যাদি অন্যান্য জীবজন্তু ত’ দূরের কথা, এমন কি, দেবতা ও ঋষির পর্য্যন্ত এই মায়ার মোহিনী শক্তি হইতে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এক স্থানে বলিয়াছেন,—

মায়াতে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।

সাধুকুপা বিনা আর নাহিক উপায় ॥

বাস্তবিক এই সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী ত্রিগুণাত্মিকা বিষ্ণুমায়াতে তাঁহার ভক্ত ব্যতীত আর কেহই জয় করিতে সমর্থ হন নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—একান্তভাবে যাঁহার আমার শরণাপন্ন হয়, আমি তাঁহাদিগকে এই ভীষণ মায়ার কবল হইতে রক্ষা করিয়া থাকি।

সমুদ্র মন্থন সময়ে, যখন দেবাসুর মিলিয়া, সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিয়া দিলেন তখন সমুদ্র হইতে উথিত অমৃত বটন-জন্য দেবাসুরে মিলিয়া তুমুল কোলাহলে চতুর্দিক কম্পিত করিয়া তুলিলেন। দেব এবং অসুরবৃন্দ সকলেই অগ্রে অমৃত পান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া, পরিশেষে সৃষ্টিশক্তি সংহারিণী কালাগ্নিসদৃশ প্রবল সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যগণকে মোহিত করিবার জন্য সৃষ্টিরক্ষার্থ মায়াজাল বিস্তার করত মোহিনী মূর্তি ধারণ করিলেন। কি অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী রমণীমূর্তি! মরি! কি কটাক্ষ, কি মধুর হাসি! যেন ত্রিভুবনকে মোহিত করিবার জন্যই এই ললনা-ললাম আবির্ভূত হইয়াছেন। মোহিনীর কর্ণে মণিময় কুণ্ডল জ্বলিতেছে, হস্তে বলয়, গলদেশে পারিজাত-পুষ্পের হার, দশন মুক্তাপাঁতি সদৃশ, উজ্জ্বল বিন্ধাধারে মধুর হাসি! সৌন্দর্য্যে কোটি কন্দর্পের দর্পকে পরাজিত করিয়া বীণা-বিনিদিতস্বরে দেব এবং অসুরবৃন্দকে মধুর সন্তোষণে আপ্যায়িত করিয়া মোহিনী বলিতে লাগিলেন, হে দেবতাবৃন্দ এবং অসুরগণ, তোমরা সামান্য অমৃতের জন্য কেন এই ভীষণ সমরানলের আয়োজন করিয়াছ? আমি মধ্যবর্তিনী হইয়া উভয়পক্ষের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতেছি।

যাঁহার মায়ায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত, স্বয়ং লোকপিতামহ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যাঁহার মায়ার অন্ত পান নাই, ভগবানের মায়াপ্রভাবে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, আর অতি ক্ষুদ্র অন্য

জীবজন্তুদের ত' কথাই নাই! তাহারা ত' মুগ্ধ হইবেই। সুতরাং সকলেই মোহিনীর সুমিষ্ট বাক্যে সুমোহিত হইয়া তাঁহার বাক্যে সন্মত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! মোহিনী বিষ্ণুমায়ায় প্রভাব! শুধু দেব এবং অসুর কেন, এই সংসারে পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, বৃক্ষ, লতা হইতে আরম্ভ করিয়া যোগী, ঋষি, কস্মী, জ্ঞানী, ধ্যানী, যক্ষ, রক্ষ, নর, নারী, পল্লগ, কিন্নর, কিন্নরী আব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্ত সকলেই বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া এই দেহকেই আত্মবুদ্ধি করিয়া, ভগবানকে ভুলিয়া অনিত্য স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বন্ধু, ধন, রত্নকে জীবনের একমাত্র বন্ধু বিবেচনা করিয়া, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হইয়া থাকেন। গীতায় একস্থানে ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন,—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যদেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যজ্ঞারূঢ়ানি মায়য়া ॥

ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থিত হইয়া এক ভক্ত ব্যতীত অন্যান্য জীববৃন্দকে মায়ায় অভিভূত করাইয়া যজ্ঞের ন্যায় ভ্রমণ করাইতেছেন। যাঁহারা সদগুরুতে প্রপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই এই দৈবী বিষ্ণুমায়া হইতে বিমুক্ত হন, অন্যে নহেন। সদগুরু বলিতে আমরা কি বুঝি? যেমন এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখাইতে পারেন না, দেখাইলে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই গর্তে পতিত হইয়া মারা পড়েন, তদ্রূপ; এজন্য সদগুরুর লক্ষণাঙ্কিত গুরুতে যাঁহারা শরণাপন্ন হইবেন তাঁহাদেরই মুক্ত হইবার সম্ভাবনা, অন্যথায় বন্ধ হইবার বেশী সম্ভাবনা। শাস্ত্রে লেখা আছে,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ ॥

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।

শাব্দে পরে চ নিষগতং ব্রহ্মণ্যপশমাশ্রয়ম্ ॥

বস্তুতঃ এই মায়িক সংসারে কোন সুখই প্রাকৃত সুখ বলিয়া বোধ হয় না, কেন না, সকল সুখই নশ্বর ক্ষণস্থায়ী, জলবিশ্বের মত, মরুভূমিতে মরীচিকার মত, দেখিতে দেখিতে বিলয় প্রাপ্ত হয়। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহতির ন্যায় এক বাসনা চরিতার্থ হইতে না হইতে শত সহস্র বাসনা প্রদীপ্ত হইয়া মানবের হৃদয়-কানন দগ্ধ করিয়া থাকে। অতুল ঐশ্বর্যাধিপতি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলেও কামরূপ বৃশ্চিকের দংশনে সতত অস্থির হন, সুতরাং বুঝিয়াও কেহ বুঝেন না। এজন্য যে ব্যক্তি এই দুস্তুরা বিষ্ণুমায়া হইতে উদ্ধার পাইতে চান তিনি অবশ্যই সদগুরুতে প্রপন্ন হইবেন। নতুবা মায়াদ্বারা হতজ্ঞান হইয়া কখন পুণ্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গে গমন, কখনও বা পাপকার্য্যদ্বারা নরকে গমন করিয়া অনাদি কর্ম্মবাসনায় বদ্ধ হইয়া চক্রগতির ন্যায় পুনঃ পুনঃ কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করত অশান্তি-অনলে দগ্ধীভূত হইয়া দিবানিশি জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিবেন। সদগুরুর লক্ষণ কি? যিনি শব্দরূপ বেদের ন্যায়ানুগত ব্যাখ্যাদ্বারা তত্ত্ব-স্থিরীকরণে নিপুণ এবং ভজন-পরিপাকনিবন্ধন প্রত্যক্ষাতীত অনুভবদ্বারা পরব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারই উপদেশদানে যথার্থ অধিকার আছে। অতএব যিনি উপরিউক্ত লক্ষণাঙ্কিত গুরুদেবে শরণাপন্ন হইবেন, তিনি

এই দুর্জয় বিষুমায়া জয় করিতে সমর্থ হইবেন, অন্ততঃ তাঁহার সংভাবনা আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, শরণাগতির লক্ষণ কি? গীতায় আছে যথা,—

“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।”

শ্রীগুরুদেবকে প্রণিপাত করিতে হইবে। পরিপ্রশ্ন করিতে হইবে যে, হে গুরুদেব, আমি গ্রাম্যবিষয়ে পণ্ডিত বটে, কিন্তু আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মূর্খ। আমি কে? আমার স্বরূপ কি? আমি কোথায় ছিলাম? এখানে (পৃথিবীতে) কি জন্য আসিয়াছি এবং পরেই বা কোথায় যাইব?—এ বিষয়ে আমি অতি ক্ষুদ্র, কিছুই জানি না, আপনি দয়া করিয়া আমাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করুন—যাহাতে এই ভবসমুদ্র পার হইয়া নিৰ্ব্বিয়ে অপর কূলে উত্তীর্ণ হইতে পারি।

শ্রীগুরুদেব বিনীত শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করিলে তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত কথামৃত পান করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া সেবা করিতে পারিলেই এই অলৌকিক বিষুমায়া হইতে মানব পরিত্রাণ পাইতে পারেন, অন্য উপায়ে কখনই নহে।

এই বিষুমায়ায় মোহিতচিত্ত অসুরবৃন্দের এই মোহিনী মূর্তি-দর্শনে অন্তঃকরণে কামের উদ্রেক হইল। এই বিষুমায়াকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর প্রতিমূর্তি অবলোকন করিয়া দেবগণের ভক্তির উদয় হইল। যেমন স্বভাবদুষ্ট জলৌকা মাতৃস্তন্যে ক্ষীরের পরিবর্তে রক্ত শোষণ করে, কিন্তু বালক রক্তের পরিবর্তে অমৃতময়ী দুগ্ধের আশ্বাদন অনুভব করে, তদ্রূপ দুষ্ট অসুরপ্রকৃতি খলস্বভাবসম্পন্ন কামুক লম্পটের দল অসুরবৃন্দ বিষুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া মোহিনীকে নিজেদের বিলাসের অর্থাৎ ভোগের উপকরণ মনে করত কপট দৈত্যগণ আড় নয়নে মৃদু মধুর হাস্যে মোহিনীর সলজ্জ নয়নকোণে বক্ষিম কটাক্ষপাত করিয়া বলিতে লাগিল,—“অয়ি, কস্মুকণা আয়তলোচন সুন্দরি! এস এস নিকটে এস, আমরা তোমারই দাস, তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি, তুমি সানন্দচিত্তে যাহা আদেশ করিবে, আমরা অনুগত ভৃত্যের ন্যায় অবনত-মস্তকে অবশ্যই তাহা পালন করিব।”

দেবগণ কিন্তু এই মায়াকে সরল শিশুর ন্যায় মাতৃভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন। পরিণামে এই হইল যে, পূর্বোক্ত জলৌকার ন্যায় নিষ্ঠুরপ্রকৃতির দানববৃন্দ বিষুর ছলনায় মোহিত হইয়া দুর্লভ অমৃত হইতে বঞ্চিত হইল, আর দেবগণ শিশুর ন্যায় অমৃত পানে প্রভূতশক্তিসম্পন্ন হইয়া আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই সংসার বিষুমায়ায় গঠিত। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য, তল, অতল, বিতল, সুতল, পাতাল, তলাতল, রসাতল—এই চতুর্দশ দেবীধাম সমস্তই বিষুমায়ায় আচ্ছাদিত। এই সংসার কারাগার-সদৃশ, সমস্ত জীববৃন্দ এই মায়ার জেলখানার কয়েদী। কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ভৃত্য, কেহ বা কুলী মজুর ইত্যাদি মায়িক সজ্জায় সাজিয়াছেন।

থিয়েটারে যেমন রামা বাগ্‌দী মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সাজিয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজার অভিনয় করিলেন, তদ্রূপ শ্যামা ডোম শৈব্যারাণীর ভূমিকায় সর্পদষ্ট পুত্রের জন্য কত কপট ক্রন্দন করিয়া দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে যুগপৎ বিষাদ এবং হর্ষের সঞ্চারণ করত পর মুহূর্ত্তেই যবনিকার অন্তরালে রাজারাণীর পরিবর্তে আসল রামা শ্যামা হইয়া বসিলেন।

সে রূপ এই সংসাররূপ মায়া-রঙ্গভূমিতে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া কেহ কখন দেব, দানব, পশু, পক্ষী, কীট, সরীসৃপাদি, বৃক্ষ, পর্বত, প্রস্তরাদিতে পরিণত হইয়া আবদ্ধ হইয়াছেন। নলকুবর অঙ্গরাগণসহ জলকেলি আরম্ভ করিলে, পরম বৈষ্ণব নারদঋষির অভিশাপে তাঁহারা যমলাজ্জ্বল বৃক্ষরূপে বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়াছিলেন। অহল্যাদেবী ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতমের অভিশাপে প্রস্তররূপে পরিণত হইয়াছিলেন। মায়ামুগ্ধ জীব চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া কখনও উর্দ্ধে, কখনও বা নিম্নদেশে গমন করিয়া কৰ্মফল ভোগ করিতে থাকে।
এইরূপ—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়।

তাঁর উপদেশ মস্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায় ॥

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।

মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

এই বিষ্ণুমায়া আবার পরা এবং অপরা ভেদে দুইপ্রকার—বিদ্যামায়া এবং অবিদ্যা-মায়া—অন্তরঙ্গা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি। অবিদ্যা-মায়া জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। বিদ্যা-মায়া সেই সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া বিষ্ণুভক্তি প্রদান করেন।

‘বিদ্যা’ বলিতে আমরা কি বুঝি? এই অপরা বিদ্যা বা অক্ষজবিদ্যা লাভে আমরা কিছুদিন সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারি বটে, কিন্তু সকলই নিশার স্বপনসদৃশ অস্থায়ী। অধুনা পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত অর্থকরী-বিদ্যায় দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ছন্দ, জ্যোতিষ, ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিচিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত হইলেও বা ধন-রত্নে সম্পন্ন হইলেও এ আনন্দ ঐন্দ্রজালিকের ছায়াবাজীর ন্যায়—চপলা সৌদামিনীর ন্যায়, দেখিতে দেখিতে কালের অতল গর্ভে নিমিষমাত্রে অন্তর্দান করে। পরিণামে সকলই হাহাকার, অতৃপ্তিকরী অশান্তি। “সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া”—সেই বিদ্যাই বিদ্যা—যে বিদ্যাদ্বারা কৃষ্ণে মতি উৎপন্ন হয়, তাহার অপরা নাম ব্রহ্মবিদ্যা বা পরা বিদ্যা। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ্জ্বলকে বলিয়াছেন,—

ভূমিরাপহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকৃতি আমার অপরা শক্তি। ইহা ভিন্ন আর একটি উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে; যথা—

অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

এই অপরা প্রকৃতি ভিন্ন আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি আছে যাহা সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। তাহাই পরা, শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ উৎকৃষ্টা জীবপ্রকৃতি।

এই মায়িক সংসারে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া জীব কতপ্রকারেই না রঙ্গ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। “কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়”—যেমন কোন সুনিপুণ যাদুকর তাহার অঙ্গুলী-সঞ্চালনে, হস্তস্থিত পুতলিকাগুলিকে নানাভাবে, দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনার্থে

নৃত্য করাইয়া থাকেন, দর্শকগণ যেমন অন্তরালস্থিত যাদুকে কোনমতে দর্শন করিতে সমর্থ হন না, সেইরূপ ভগবান্ বিষ্ণুও তাঁহার সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী মায়াদ্বারা ত্রিভুবনকে মোহিত করায় এই জগতস্থ জীববৃন্দ উন্মত্তের ন্যায় কেহ হাসিতেছে, কেহ নাচিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে।

সুতরাং যে কেহ এই মায়ার সংসারে সং না সাজিয়া সার আশ্রয় অর্থাৎ হরিসেবা বা হরিভজন করিতেছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমানের পদবী লাভ করিয়াছেন। নতুবা বিকারী রোগের মত সকলেই প্রলাপ বকিতেছে। বিষয়তৃষ্ণা জলের জালা, তাহার জন্য হট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতেছে। ‘আমি এক জালা জল খাব রে—আমি পুকুরের জল চুমুক দিয়া খাব রে’ প্রলাপ বকিতেছে। ভবরোগীর এই উন্মাদের ন্যায় বাক্য শুনিয়া গুরুরূপী বৈদ্য কাঁদিতেছেন আর কীৰ্ত্তন করিয়া নিকটে আহ্বান করিতেছেন।

তাই বলি, মায়ার কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি, মায়াপ্রভাবে কেহই নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না! এক বিষ্ণুভক্ত ব্যতীত সকলেই এই বিষ্ণুমায়ায় মোহিত। (ক্রমশঃ)

ভগবান্ ও স্বয়ং ভগবান্

ভগবান্ শব্দের ব্যাখ্যা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে,—

“ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।

জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষষ্ণাং ভগ ইতীক্ষ্ণা।।”

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টি গুণ যাঁহার মধ্যে রহিয়াছে—তিনি ভগবান্।

ভগবৎ-শব্দের প্রথমার একবচনে ভগবান্। ‘ভ’ অর্থাৎ ভর্তা এবং সংভর্তা অর্থাৎ যিনি সকলের ভরণপোষণ করেন, প্রতিপালন করেন অর্থাৎ যিনি সকলের অভিভাবক। ‘গ’ অর্থাৎ নেতা, পথপ্রদর্শক, পরিচালক বা অষ্টা। ‘ব’ অর্থাৎ যিনি সকলের মধ্যে বিরাজ করেন অথবা সর্ব্বভূতই যাঁহার মধ্যে বিরাজ করে তিনি ভগবান্।

যাঁহার মধ্যে কোনও হেয় গুণ নাই, যিনি মূলতঃ অহেতু কিন্তু সংসারের জন্ম, স্থিতি প্রভৃতির হেতু, যিনি সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও প্রকৃতির ও জীবের প্রবর্তক সৃষ্টিকর্তা—তিনিই ভগবান্।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের তিনটি প্রতীতির কথা বলিয়াছেন,—

“বদন্তি তৎ তদ্বিদস্তদ্বৎ যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মোতি পরমাত্মোতি ভগবান্নিতি শব্দতে।।

তদ্বিদ্গণ অদ্বয়জ্ঞানকে তদ্ব বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞান “ব্রহ্ম” শব্দদ্বারা, “পরমাত্মা” শব্দদ্বারা এবং “ভগবান্” শব্দদ্বারা কথিত হন। সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি—ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি—পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি—ভগবান্। ব্রহ্ম হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা—শ্রীকৃষ্ণের অংশ বিভূতি এবং ভগবান্ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-

প্রকাশ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ। ব্রহ্ম-শব্দে বৃহত্ত্ব, পরমাত্ম-শব্দে অণুত্ব এবং ভগবান্-শব্দে সর্বৈশ্বর্য্যময়ত্ব।

“প্রকাশ-বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্।।”

“অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ।।”

জ্ঞানিগণ ব্রহ্মরূপে, যোগিগণ পরমাত্মরূপে এবং ভক্তগণ ভগবান্‌রূপে অনুভব করেন।

“পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্।।”

এই ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্যের মধ্যে সমগ্র “শ্রী”র নাম মাধুর্য্য। এই মাধুর্য্যই সকলের সার। নারায়ণাদি মূর্তিতে ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভগবত্তা, কিন্তু নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে মাধুর্য্যপ্রধান ভগবত্তা।

“স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণঃ সর্ব্বাশ্রয়।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণঃ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।”

স্বয়ং ভগবান্ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তত্ত্বসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—“যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্চিদিপি নিগমে যাতি চিন্মাত্র সত্তাপ্যংশো যস্যাত্মশকৈঃ স্বের্বিভতি বশয়েনৈব মায়াং পুমাংশ্চ। এবং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং স কৃষ্ণে বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্।”

ব্রহ্মসংহিতায় দেখা যায়,—

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্

নানাবতারমকরোদ্ধুবনেষু কিস্ত।

কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

অর্থাৎ—যে পরমপুরুষ আংশ কলাদি নিয়মে রামাদি মূর্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।

ইন্দ্রাব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।

এই কথিত অবতারসকলের মধ্যে কেহ বা ভগবানের অংশ, কেহ বা তাঁহার কলা। কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। ইন্দ্রশত্রু অসুরগণকর্তৃক লোকসকল বিদ্রাবিত হইলে ভগবান্ যুগে যুগে এইরূপে অবতরণপূর্ব্বক তাহাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া থাকেন।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ঐ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—“অবতারশ্চ প্রাকৃত বৈভবেহবতরণমিতি কৃষ্ণঃ সাহচর্য্যেন রামস্যাপি পুরুষাংশত্বাত্যয়ো জ্ঞেয়ঃ। অত্র তু শব্দোহশ

কলাভাঃ পুংসশ্চ সকাশাৎ ভগবতো বৈলক্ষণ্যং বোধয়তি । যদ্বা অনেন তু শব্দেন সাবধারণা
শ্রুতিরিয়ং প্রতীয়তে । ততশ্চ সাবধারণা শ্রুতিবর্লবতীতি ন্যায়েন শ্রুতৈব শ্রুতমপ্যন্যোষাং
মহা নারায়ণাদিনাং স্বয়ং ভগবত্তং গুণীভূতমাপদ্যতে.....।”

তামিল দেশের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীবেঙ্কটভট্টের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু চাতুর্ন্যাস্য
যাপন করিয়াছিলেন । শ্রীবেঙ্কটভট্টের মনে অভিমান হইল যে, পরব্যোমস্থ নারায়ণই স্বয়ং
ভগবান্ । কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার বিচার খণ্ডন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

“প্রভু কহে,—ভট্ট, তুমি না করিহ সংশয় ।

‘স্বয়ং ভগবান্’ কৃষ্ণ—এই ত’ নিশ্চয় ।।”

শ্রীনারায়ণের ষাটটি গুণ । সেই ষাটটি গুণের উপর আরও চারিটি অসাধারণ গুণ
শ্রীকৃষ্ণের আছে । যথা,—

১ । সর্ব্বাঙ্কুতচমৎকারলীলাসমুদ্র-বিশিষ্টতা,

২ । অতুল্যমধুর-প্রেম-পরিশোভিত-প্রিয়মণ্ডলযুক্ততা,

৩ । ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীগীতপরায়ণতা,

৪ । চরাচরবিস্ময়কারি- সমোদ্ধারহিতরূপ-শ্রীযুক্ততা । (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)

ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতেই অন্যান্য ভগবত্তা । সৌশীল্য, মৃদুতা,
বদান্যতা—নন্দনন্দন কৃষ্ণ বিনা অন্য কোথাও নাই । স্বয়ং ভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাহা
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিভিন্নস্থানে পরিষ্কারভাবে বর্ণন করিয়াছেন । তন্মধ্যে কতিপয় প্রমাণ
নিম্নে উদ্ধার করা হইল,—

“অবতার সব—পুরুষের কলা, অংশ ।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস ।।”

“যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা ।

‘স্বয়ং ভগবান্’-শব্দের তাহাতেই সত্তা ।।

দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন ।

মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ।।

তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ।

আর এক শ্লোক শুন, কুব্যাখ্যা-খণ্ডন ।।”

“কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্ব্বধাম ।

কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম ।।”

“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ।।”

“পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার ।

গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ।।”

“যুগধর্ম্ম-প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে ।

আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ।।”

“স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ ।

স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন ।।

কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
 ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল।।
 পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
 আর সব অবতার তাঁ'তে আসি' মিলে।।
 নারায়ণ, চতুর্ভূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
 যুগ-মন্তরবতার, যত আছে আর।।
 সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
 ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ।।
 অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
 বিযুগ্মারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে।।”

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

“তোকেন জীবহরণং যদলুকি কার্যত্বেমাসিকস্য চ পদা শকটোহপবৃত্তঃ।
 যদিঙ্গতান্তর গতেন দিবিস্পৃশয়োবর্ষা-উন্মূলনন্তিতরযাজ্জুনয়োর্ন ভাব্যম্।।”

ক্ষুদ্র বালকরূপেই বিস্তৃত শরীর পূতনার প্রাণবধ, তিনমাসের শিশুর অতি সুকোমল পদাঘাতেই শকটভঞ্জন, হামাগুড়ি দিয়া গমন করিয়াই গগনস্পর্শী অতি উচ্চ অর্জুনবৃক্ষ যুগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত তাহাদের উন্মূলন—এই সকল কার্য কি ঈশ্বর ভিন্ন অপরে সম্ভব?

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর টীকায় বলিয়াছেন,—“শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যময় ভগবান্—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ তিনি নিজের বাল্য মহামাধুর্য্যদ্বারা স্বমহৈশ্বর্য্য আবৃত করিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি অতি বিকটাকারা বিস্তৃত শরীর অতি বলিষ্ঠা পূতনার বধোপযোগী তাদৃশ ঐশ্বর্য্যময়ী বামন অবতারের ত্রিবিক্রম মূর্তির ন্যায় কোনও মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পূতনাকে বধ করেন নাই, ক্ষুদ্র বালকরূপেই বধ করিয়াছিলেন। অথবা হিরণ্যকশিপুকে বিদরণার্থ যে-প্রকার নৃসিংহ-মূর্তি ধারণ করিয়া বিকট কঠোরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শকটভঞ্জনের জন্য তদ্রূপ কোনও ভাব পরিগ্রহ করেন নাই। ত্রৈমাসিক শিশুরূপী হইয়া সুকোমল পদাঘাতেই শকট নিপাত করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবী উদ্ধারের উপযোগী পূর্বে যে-প্রকার বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অর্জুন বৃক্ষদ্বয়ের উন্মূলনের জন্য কোন প্রযত্ন প্রদর্শন করেন নাই। ছোট শিশুর মত হামাগুড়ি দিতে দিতে বৃক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া হস্তের দ্বারাই বৃক্ষদ্বয়ের উন্মূলন করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময় স্বয়ং ভগবান্—এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি?”

“অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।

ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে।।”

এই ‘ব্রজের সহিত হয়’—লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। নৈমিত্তিক লীলাতে অনেক মহিমা দেখাইয়াছেন। কিন্তু নিত্যলীলা হইতেছে প্রেমময়।

“রাগভক্তি, বিধিভক্তি—হয় দুইরূপ।

স্বয়ং ভগবান্, ভগবান্—দুই ত’ স্বরূপ।।”

“সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ বিলাস।

ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস।।”

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করিলেন,—

“বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং

বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।

রক্তান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ-

বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদগীতকীর্ত্তিঃ।।”

জীবমাত্রেরই মনোমুগ্ধকর ঈশ্বর অভিমুখে আকর্ষণভাবের জন্যই বংশীধ্বনি। এই ধ্বনি যাঁহাদের হৃদয়তন্ত্রীকে একবার স্পর্শ করে তাঁহারা বিশ্বসংসার বিস্মৃত হইয়া এক কৃষ্ণস্বরূপে চিন্তা সমর্পণ করেন।

কৃষ্ণের বেণুধ্বনির এমন অপরূপ সামর্থ্য যে সকল রসের পুষ্টিসাধনে সর্বজাতীয় জীবের হৃদয়ে ভাবের স্মৃতি প্রদান করে। গোপীগণ বলিলেন,—নন্দনন্দন কৃষ্ণের মোহন বেণুবিশিষ্ট মুখারবিন্দ ভোগ করা যাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই এ জীবনে বিধাতা তাহাকে প্রকৃত সুখ হইতে বঞ্চিতই করিয়াছেন।

“ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োহপি হরিণ্য এতা যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।

আকর্ষ্য বেণুরগিতং সহকৃষ্ণসারাঃ পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ।।”

দেখ দেখ সখি! এই বিবেকহীন নিকৃষ্ট যোনি হরিনীগণের জন্মও সার্থক। তাহারা নন্দনন্দন কৃষ্ণের বংশীধ্বনি দূর হইতে শ্রবণ করিয়াই স্ব-স্ব পতি কৃষ্ণসার মৃগকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং বিচিত্র বেশধারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয় অবলোকনরূপ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে বিহিত পূজারই অনুষ্ঠান করিতেছে।

সমস্ত রসের বিষয় একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ‘রসো বৈ সঃ’—রস স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি অন্যান্য অবতারগণেরও রস আছে। যেমন—মীন বা মৎস্যদেবে—বীভৎস রস, কূর্মে—অদ্ভুত রস, বরাহদেবে—ভয়ানক রস, নৃসিংহদেবে—বৎসল রস, শ্রীবলদেবে—হাস্যরস, শ্রীবামনে—সখ্যরস, শ্রীরামচন্দ্রে—করুণরস, পরশুরামে—রৌদ্ররস, বুদ্ধদেবে—শান্তরস এবং কঙ্কিতে—বীররস। সুতরাং কোন অবতаре সব রস নাই। একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত রস অর্থাৎ দ্বাদশ রস রহিয়াছে। তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু।

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।

কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্ত নঃ।।

রাসরস-প্রবর্তক বংশীবট-তটস্থিত শ্রীমদ্ গোপীনাথ গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

“প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আশ্বাদন।

রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।।

রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।

এই দুই হেতু হেতে ইচ্ছার উদগম।।

প্রেমরসের নির্যাস আস্বাদন করিবার জন্য এবং রাগভক্তি প্রচার করিবার জন্য রসিকশেখর কৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হন।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—“স্বাংশ অবতাররূপে রামাদি অবতার বৈকুণ্ঠ হইতে এবং কৃষ্ণ গোলোকের ব্রজধাম সহিত স্বয়ং প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। পরমপুরুষ কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও সেই স্বয়ংরূপেই প্রকটতা স্বীকার করেন—ইহাই গুঢ় তাৎপর্য।”

স্বয়ং ভগবান্ সম্বন্ধে নিম্ন শ্লোকে জানা যায়,—

“যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা

য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ।

ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স্বয়ময়ং

ন চৈতন্যাং কৃষ্ণজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।”

উপনিষদ্ যাঁহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভু অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি অংশস্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশীস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই। সুতরাং—

“স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।

আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।।”

বাঙ্গাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিদ্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব

প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ-তিথিতে গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব হয়ে থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, কি শৈব প্রত্যেকেই কালীপূজা ও দীপাবলী উৎসবের ঠিক পরেই এই মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। বর্তমানে এই উৎসব অত্যন্ত জনপ্রিয় ও পুণ্যদায়ী অনুষ্ঠান। অবশ্য উৎসবের পিছনে আছে একটি ভাগবতী ইতিহাস।

শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা গোপরাজ নন্দ এই তিথিতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সামনে ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করতেন। কিন্তু একবার বাদ সাধলেন শ্রীকৃষ্ণ। বললেন, ইন্দ্রকে এত তোষণ করার কোন কারণ নেই। নন্দরাজ তা শুনে রুষ্টস্বরে বললেন, তুমি এখন নিতান্ত শিশু, দেবতাদের নিয়ে এমন মর্যাদাহানিকর মন্তব্য করো না। ইন্দ্র পর্জ্জন্যদেব। তিনি জল দান করেন বলেই মানুষের এত সমৃদ্ধি। তাঁর নামে যজ্ঞ সেই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

উত্তরে কৃষ্ণ বললেন,—পিতা, আপনি খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ দিয়ে আমায় প্রতিপালন করছেন। কিন্তু তার জন্য ত' আমি ঘটা করে পিতৃপক্ষ করি না। কারণ, সন্তানকে পালন করা পিতার কর্তব্য এবং পুত্রও এজন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। এ দান প্রতিদান স্বতঃস্ফূর্ত। এখানে যজ্ঞের কোন স্থান নেই। সেরকম মানব জাতিকে জলদান করা ত' ইন্দ্রের শ্রীভগবান্ আদিষ্ট কর্তব্য। এর মধ্যে ইন্দ্রযজ্ঞ আসছে কেন? আমরা ত' আমাদের উপচার গোবর্দ্ধনকে নিবেদন করতে পারি। কারণ, আমাদের গোধন এই গোবর্দ্ধনকে ঘিরে বেড়ে উঠেছে।

কৃষ্ণের যুক্তি ফেলতে পারলেন না নন্দরাজ। তিনি ইন্দ্রপূজার সকল উপচার নিবেদন করলেন গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে। গিরিরাজের অনুকরণে তৈরী করলেন অম্লের কুট বা পাহাড়। আর কৃষ্ণ গিরি গোবর্দ্ধনে প্রকটিত হয়ে আমি গিরিরাজ বলে সেসব উপচার নিমেষে গ্রহণ করলেন। তা দেখে গোপকুল মুগ্ধ, বিস্মিত, ভীত, আবার অনেকে হর্ষিত।

নন্দরাজার কীর্তিকলাপ দেখে ক্রুদ্ধ হলেন ইন্দ্র। আদেশ দিলেন সংবর্তক মেঘ, ঝড় ও ঝঞ্ঝাকে গোকুলে প্রলয়ঙ্কারী অবস্থার সৃষ্টি করতে। প্রমাদ গণলেন ব্রজবাসীরা। শুরু হল তুমুল বৃষ্টিপাত। সঙ্গে প্রবল ঝড়ের দাপট ও ঘন ঘন বজ্রপাত। সারা গোকুল জলে ভরে গেল। ব্রজবাসীদের আশ্বস্ত করলেন কৃষ্ণ। গোধন সমেত তাঁদের নিয়ে এলেন সেই গোবর্দ্ধন পর্বতের কাছে। তারপর দুহাতে গোবর্দ্ধনকে ভূমি থেকে উৎপাটিত করে নিজের হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে তুলে ধরলেন। গোবর্দ্ধনের তলায় আহ্বান করলেন সব ব্রজবাসীদের আশ্রয় নিতে। সাতদিন সাতরাত প্রবল বর্ষণে সিক্ত হল সারা ব্রজভূমি। কিন্তু জলে ভাসাতে পারল না গোবর্দ্ধনের সংলগ্ন অঞ্চল। হার মানলেন ইন্দ্র। লজ্জায় অধোবদন হলেন। দিবাকরের আলোয় আবার ঝলমলে হয়ে উঠল সারা ব্রজভূমি। ধেনু ও ধেনুবৎসদের অক্ষত রাখার জন্য ধেনুমাতা সুরভী অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেন কৃষ্ণকে। অনুতপ্ত ইন্দ্র বললেন,—“আপনি গোকুলের গোধন রক্ষা করেছেন, আপনাকে আমি ‘গোবিন্দ’ নামে অভিহিত করলাম।”

এই ঘটনার স্মরণেই গোবর্দ্ধন-পূজা ও অনকুট-মহোৎসব। বাংলায় এই মহোৎসব আয়োজনের পিছনে আছে শ্রীমন্নহাপ্রভু-পার্বদ প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের বিরাট অবদান। মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীক্ষেত্রের গম্ভীরায় গোবর্দ্ধন শিলার পূজা করতেন। পরবর্ত্তিকালে সেই শিলা তিনি তাঁর অন্যতম পরিকর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দেন।

কথিত যে, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ভীষণ জাগ্রত। গোবর্দ্ধন শিলা পূজার আগে প্রাণ প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন হয় না। তাই বহু তাপিত পীড়িত মানুষ আজও গিরিরাজ পরিক্রমা করেন তাদের মনস্কামনা পূরণের জন্য। গৌড়ীয় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনুক্ষণই শ্রীরূপ ও রঘুনাথের এই বাক্যটি উচ্চারণ করতেন,—

“প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্।

নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্।।”

হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর, আমাকে তোমার কাছে নিবাস করাও।

—শ্রীস্বরূপানন্দ দাসাধিকারী (ডাঃ সমীর কুমার চট্টোপাধ্যায়)

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৩ পৃষ্ঠার পর]

বৈষ্ণব ধর্মটিই জীবের স্বরূপ ধর্ম। এই ধর্মটি থাকে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে। ভক্তি ব্যতীত ভগবান্ লাভ হয় না। শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।।”
(৩।৩।৫৩ সূত্রের মাধ্ব-ভাষ্য-ধৃত মাঠর-শ্রুতি-বচন) অর্থাৎ—“ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট নিয়ে যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান, সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা।”

নিজের সুখবাসনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে সেব্য ভগবানের প্রীতিবিধানই হল ভক্তি। ভক্তিই জীবের দুর্জ্জাতিত্ব নষ্ট করে পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করতে সমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ বলেছেন,—

“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।।” (ভাঃ ১১।১৪।২১)

অর্থাৎ—“শ্রদ্ধাজনিত অনন্যভক্তি-প্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হয়ে থাকি। একাপ্রভাবসম্পন্ন ভক্তি চণ্ডালগণকেও জাতিদোষ হতে পবিত্র করে থাকে।” শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ “সম্ভবাৎ”-শব্দের “জাতিদোষাৎ”—এরূপ অর্থ করেছেন। ‘পুনাতি বিশুদ্ধি করে।’ সুতরাং এই উর্জ্জিতা (কেবলা) ভক্তির প্রারদ্ধ-পাপ-নাশকত্ব পর্যন্ত দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভজনপ্রভাবে দুর্জ্জাতিত্ব নষ্ট হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে,—

“অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্যবসিতো হি সঃ।।

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।” (গীতা ৯।৩০-৩১)

ভগবান্ বলেছেন,—যিনি অনন্যভজনপরায়ণ হয়ে আমাকে ভজন করেন, তিনি যদি নিরতিশয় দুরাচারবিশিষ্ট হন, তথাপি তাঁকে সাধু বলে জানবে। যেহেতু তিনি মদুদ্ভক্তিতে সম্যকপ্রকারে নিশ্চয় বুদ্ধিবিশিষ্ট।” “(কেবল সমীচীন নিশ্চয়-দ্বারাই কি করে সাধু বলে বিবেচিত হবে? তাতে বলছেন,—) সেই অনন্য ভজনপরায়ণ ব্যক্তি অবিলম্বে ধর্মপরায়ণ হয়ে নিত্য শান্তি লাভ করে থাকেন। হে কৌন্তেয়! তুমি (আমার হয়ে) প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার ভক্ত কখনও নাশপ্রাপ্ত হন না। ভক্তিতে প্রথম প্রবৃত্ত ভক্তও কৃতার্থ হন।”

গীতার উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় “ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব”—শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন,—“সাধারণতঃ জীবগণ ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন হয়ে ভক্ত বা বৈষ্ণব হয়ে থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি সাধুসঙ্গবলে ব্রাহ্মণত্ব সম্পত্তির পূর্বেই অনন্যভক্তি লাভ করে থাকেন, তাঁকেও সাধু বলে স্থির করতে হবে। কেননা, মৎকৃপায় অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি ধর্মাত্মা অর্থাৎ ভক্ত্যধিকার-যোগ্য ব্রাহ্মণত্ব ভক্তির

আনুসঙ্গিক ফল ক্রমেই লাভ করবেন। হে কৌন্তেয়! তাঁর পুনর্জন্মাদি-রূপ পতন কখনই হবে না,—ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। এই জন্মেই আমি তাঁকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে বিশুদ্ধ পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব দিয়া প্রেম প্রদান করব।” কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, ভক্তগণের প্রায়শ্চিত্ত নেই কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ভক্তগণের পাপাচরণে প্রবৃত্তি নেই, সুতরাং তাঁদের প্রায়শ্চিত্ত নেই। এ সম্বন্ধে “কৃষ্ণাঙ্গিষ্যপদামধুলীড়.....রজঃ পুনঃ স্যাৎ” (ভাঃ ৬।৩।৩০) শ্লোক দ্রষ্টব্য। শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন,—

“অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।

কৃষ্ণ তাঁরৈ শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত।।” (চৈঃ চঃ মঃ ২২পঃ)

শ্রীমদ্ভগবদগীতার-৯।৩।১ শ্লোকে শ্রীবলদেব ভাব্যের মর্মেও পাওয়া যায়,—“আমার একান্তী ভক্ত অতি পবিত্র সর্বেশ্বর আমাকে হৃদয়ে ধারণ করায় আমার দ্বারাই আগন্তুক দুরাচার বিধৌত হয়ে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা অর্থাৎ সদাচারনিষ্ঠমনা হন। পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করায় আমার স্মৃতি-প্রতিকূল বিষয় হতে নিত্য নিবৃত্তি বা শান্তি লাভ হয়।”

ভক্তি সম্পদটা যাঁর কাছে আছে, তাঁর সঙ্গদ্বারা তাঁর কৃপায় ভক্তি লাভ হয়। শাস্ত্র স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন,—“কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় ভক্তসঙ্গ।” (চৈঃ চঃ)। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করেছিলেন,—“শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয় জীবের হয় সার?” তখন রায়রামানন্দ উত্তর দিয়েছিলেন,—“কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।” (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫০) অনন্যভক্তগণ সর্বদা শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গে দিন অতিবাহিত করতে ইচ্ছা করেন এবং তাঁরা সেব্যের সুখবিধান ব্যতীত অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করেন না। শ্রীগীতায় অনন্যভক্তগণের স্বভাব ও ভক্তির প্রকার বর্ণনা করে ভগবান্ জানিয়েছেন,—

“মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরস্পরম্।

কথয়ন্তুঃ চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।” (গীতা ১০।৯)

অর্থাৎ—সেই অনন্যভক্তগণ আমার নাম-রূপ-গুণ-লীলামধুর্যের আশ্বাদনলুপ্ত ও আমা ব্যতীত ধ্যান-ধারণা করতে অসমর্থ হয়ে আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক সর্বদা পরস্পর আমার রূপ-গুণ-লীলাদি ব্যাখ্যাসহকারে ভাব বিনিময় ও আমার কথা শ্রবণ-কীর্তন করতে করতে সাধন অবস্থায় ভক্তি-সুখ ও সাধ্যাবস্থায় রমণ-সুখ লাভ করেন।

অনন্যভক্তগণের সহিত হৃদয়ের সঙ্গে, মনের সঙ্গে প্রীতির ভাব নিয়ে দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত থাকলে প্রকৃত সঙ্গ হয়। আমাদের প্রাক্তন কন্মফলে অসতৃষ্ণগুণি মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। ঐগুলি ত্যাগ না করলে সাধন-ভজনের উন্নতি হয় না। অনন্যভক্তগণের সঙ্গ থাকলে অসতৃষ্ণগুণি ঘুচে যায় ও সতৃষ্ণগর উদয় হয়। বিষয়ীর সঙ্গ করলে বিষয়-তৃষ্ণা, ভোগীর সঙ্গ করলে ভোগ-তৃষ্ণা, ত্যাগীর সঙ্গ করলে ত্যাগ-তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। আর শুদ্ধভক্ত বা অনন্যভক্তের সঙ্গ করলে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের তৃষ্ণা ও গুরু-বৈষ্ণবের সেবা-তৃষ্ণার উদয় হয়। শাস্ত্র তাই বলেছেন,—“ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে” (বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৪।৩০) অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সহিত সঙ্গ হলে ভক্তির উদয় হয়। প্রাকৃত বর্ণাশ্রমীদের সহিত সঙ্গ করলে শুদ্ধভক্তি লাভের সুযোগ থাকে না। শ্রীল সচ্চিদানন্দ

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণাশ্রম ধর্মের অকস্মণ্যতা, নিকৃষ্টতা ও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করে তাহা পতিয়াগপূর্বক শুদ্ধভক্তসঙ্গে উত্তম ভজনের অনুকূল ধর্মসমূহ পালনের বাঞ্ছা তাঁর “স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্” স্তোত্রে ব্যক্ত করেছেন,—

“ন বর্ণে সত্ত্বির্মে ন খলু মমতা হ্যাশ্রমবিধৌ
ন ধর্মো নাধর্মো মম রতিরহাস্তে কচিদপি ।
পরং তত্ত্বধর্মো মম জড়শরীরং ধৃতমিদ-
মতো ধর্মান্ সর্বান্ সুভজন-সহায়ান্ভিলষে ॥”
“ন মে পত্নী-কন্যা-তনয়-জননী-বন্ধুনিচয়া
হরৌ ভক্তে ভক্তৌ ন খলু যদি তেযাং সুমমতা ।
অভক্তানামন্ন-গ্রহণমপি দোষো বিষয়িণাং
কথং তেযাং সঙ্গাকরিভজন-সিদ্ধির্ভবতি মে ॥” (স্বনিয়ম ৫, ৮)

অর্থাৎ—“ব্রাহ্মণাদি বর্ণে আমার আসক্তি নেই, ব্রাহ্মচর্যাди আশ্রমবিধানে সত্যই (আমার) মমতা নেই ; এই পৃথিবীতে কি ধর্ম, কি অধর্ম—কোনটিতেই আমার আগ্রহ নেই । পরন্তু সেইসকল ধর্মসাধনে আমার এই জড়শরীর (এতাবৎকাল) ধারণ করেছে । এক্ষণে শুদ্ধভক্তির অনুকূল ধর্মসকল আমি বাঞ্ছা করি ।”

“পত্নী, কন্যা, পুত্র, জননী ও বন্ধুগণ আমার কেহ নয়—যদি শ্রীহরিতে, ভগবদ্ভক্তে ও ভক্তিতে তাদের সুদৃঢ় মমতা বাস্তবিক না থাকে । অভক্ত বিষয়িগণের অন্নগ্রহণও দোষ (অধঃপাতকর) ; অতএব তাদের সঙ্গ করলে কিরূপে আমার হরিভজনে সিদ্ধিলাভ হবে ?”

শ্রীচৈতন্যপার্ষদপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁর ‘শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্’ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যভক্ত-মহিমা প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

আচার্য্য ধর্মং পরিচর্য্য বিষুং বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্ ।

বিনা ন গৌরপ্রিয় পাদসেবাং বেদাদি-দুষ্প্রাপ্য পদং বিদন্তি ॥” (২২শ্লোক)

“বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালন, বিষুং (রাম-নারায়ণাদি বিযুক্তত্বের) অর্চন, শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র বিচার প্রভৃতি করেও গৌরপ্রিয়জনের পাদপদ্মসেবা ব্যতীত বেদাদির দুর্লভ পদ শ্রীরাধাগোবিন্দের চিহ্নিলাসক্ষেত্র শ্রীধাম-বৃন্দাবনের সন্ধান কেহই জানতে পারেন না ।”

সুতরাং ইহাই সহজে প্রতীয়মান হয় যে, কৃষ্ণভক্ত বা গৌরভক্তের সঙ্গ ও সেবা ব্যতীত নিছক বর্ণাশ্রমাদি ধর্মপালন নিরর্থক ।

ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ প্রাকৃত গুণ-কর্মের দ্বারা বিভক্ত এবং সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণই চারিবর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । শাস্ত্রে বলেছেন,—“ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ” অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানলে ব্রাহ্মণ বলে কথিত হয় । অতএব ব্রাহ্মণ ব্রহ্মের উপাসক ; কিন্তু শুদ্ধভক্ত পরব্রহ্ম কৃষ্ণের উপাসক । শ্রীমদ্ভগদগীতায় (১৪।২৭) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,—“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্” অর্থাৎ আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় । ব্রহ্মের স্বরূপ কি ? তদুত্তরে ব্রহ্ম যে কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, তাহা ‘ব্রহ্মসংহিতায়’ ব্রহ্মার স্তবে জানা যায়,—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটী-

কোটীশেষবসুধাদিবিভৃতিভিন্নম্।

তদ্বন্দ্বা নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রঃ সং ৫।৪০)

“কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্যদ্বারা পৃথক্কৃত নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁর প্রভা হতে উৎপন্ন হয়েছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।” গোপালতাপনীতে পাওয়া যায়,—“ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিরেব চ”—অর্থাৎ “ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিঃ।” শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

তঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।

উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।

সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকাস্তি ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১২, ১৫)

ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণগণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধামে যেতে সক্ষম হন না এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত সেই পরব্রহ্মকে দর্শনেরও তাঁদের সুসৌভাগ্য হয় না। উপনিষদে কৃষ্ণ-ধামের উল্লেখ আছে,—

“ঋচোহক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।

যন্তন্ন বেদ কিম্চা করিষ্যতি য ইত্যদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥”

(শ্বেতাস্বতর ৪।৮)

অর্থাৎ—“ঋক্-মন্ত্রের প্রতিপাদিত ‘পরব্যোমস্থ’ যে অক্ষর পরব্রহ্ম যাঁকে আশ্রয় করে সমস্ত দেবতা বিরাজিত রয়েছেন, সেই পরমপুরুষকে যিনি অবগত না হন, তিনি ঋক্ অর্থাৎ বেদাদি অধ্যয়নের দ্বারা কি করবেন? যাঁরা তাঁকে জানেন, তাঁরা কৃতকৃতার্থ হন।” পুরুষবোধিনী শ্রুতিতে আছে,—“গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে দ্বৈপার্শে চন্দ্রাবলী রাধিকা” অর্থাৎ ‘গোকুল’ নামক ‘মাথুরমণ্ডলে’ ভগবানের দুই পার্শ্বে ‘চন্দ্রাবলী’ ও ‘শ্রীমতী রাধিকা’ অবস্থান করছেন।” ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মার স্তবে উল্লিখিত আছে,—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্বভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রঃ সং ৫।৩৭)

“আনন্দ চিন্ময়রসকর্তৃক প্রতিভাবিতা, স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপা চতুঃষষ্টি কলাযুক্তা হ্লাদিনী-শক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়বৃহরূপা সখীবর্গের সহিত যে অখিলাত্বভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজন করি।” এইভাবে ব্রাহ্মণের উপাস্য ব্রহ্মাকে শাস্ত্রে বহু স্থানে ভগবান্ গোবিন্দের ত্রিপাদ-বিভূতিরূপ চিজ্জগতের বহিঃপ্রাকারস্থিত তেজোবিশেষ বলে বর্ণনা আছে এবং ভগবান্ স্বয়ং সর্ব্বোপরি গোলোক-নামা নিজধামে বিরাজিত থেকে গৌণ বিক্রমদ্বারা সমস্ত ধামে সেই সেই প্রভাবসকল বিধান করছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীবৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা

বৈষ্ণব-চরণ,	করি গো বরণ,
লইনু শরণ,	তার' আমায়।
দেহ পদছায়া,	তার' ভব-মায়া,
রাখ আত্মকায়া,	তব ঐ পায় ॥ ১ ॥
এ ঘোর সংসার,	দুঃখের আগার,
সবই অসার,	সাধন-হীনে।
দেহ কৃপা-বল,	সাধন সুফল,
করহ সচল,	অধম দীনে ॥ ২ ॥
ত্রিতাপেতে পড়ি',	জ্বলে পুড়ে মরি,
তোল কেশে ধরি',	কর' রক্ষণ।
সংসার অনল,	জ্বলিছে প্রবল,
ভক্তিরূপ জল,	কর' সেচন ॥ ৩ ॥
নাহি মাগি ভুক্তি,	আর কৰ্ম-মুক্তি,
দেহ শুদ্ধভক্তি,	কৃষ্ণ-সেবায়।
এ অধম দাস,	করে অভিলাষ,
বৈষ্ণবানুদাস,	কর' আমায় ॥ ৪ ॥

—শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬০ পৃষ্ঠার পর]

নমস্তেহস্ত দান্নে স্ফুরদীপ্তি-ধান্নে ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধান্নে ।

নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ নমোহনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ :—(হে দামোদর !) আপনার উদর-বন্ধন-মহারজ্জুকে নমস্কার । নিখিল ব্রহ্মতেজের আশ্রয় ও চরাচর বিশ্বর আধার-স্বরূপ আপনার উদরকে নমস্কার, আপনার প্রিয়তমা রাধিকাকে এবং আপনার অলৌকিক লীলাবিলাসকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই শ্লোকের উপর যে দিগদর্শিনী টীকা লিখেছেন তারই টীকানুবাদ :—“এই প্রকার স্তুতি সমাপন-মুখে নিজের প্রার্থিত-বিষয় সিদ্ধির নিমিত্ত, অথবা ভক্তিবিশেষের উদ্রেকহেতু ভগবানের অসাধারণ পরিকর, অবয়ব ও পরিবারাদি প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথগ্ভাবে ‘নমস্তেহস্ত’-ইত্যাদি শ্লোকে প্রণাম করছেন।” পূর্বে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে। ভগবান্ বললে তিনি একাকী নন, তাঁর সবকিছু নিয়ে। তাঁর নাম,

রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর প্রভৃতি সবকিছু নিয়েই সেই ভগবান্। এখানে সেই কথাই বলছেন। শুধু যদি ভগবানকে প্রণাম করা যায়, তাহলে হয়ত' কিছু দোষ-ত্রুটি থেকে যায়। আমরা শাস্ত্র আরম্ভের প্রথমে যে একটা মঙ্গলাচরণ দেখতে পাই, সেই মঙ্গলাচরণের রীতি অনুসারে প্রথমে গুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করা হয়। ক্রমশঃ ক্রমশঃ গুরু, পরমগুরু, পরমেশ্বরি গুরু, পরাৎপর গুরু ইত্যাদি সকলকে স্তব করা হয়। আশ্রয়-বিগ্রহের বন্দনা শেষ হলে তারপর বিষয়-বিগ্রহের বন্দনা আরম্ভ হয়। ঠিক এইরূপ রীতি আছে। কেবল যদি আশ্রয়-বিগ্রহের বন্দনা করা হয়, তাহলে বিষয়-বিগ্রহ বাদ পড়ে যান। আবার যদি কেবল বিষয়-বিগ্রহের বন্দনা করা হয়, তাহলে আনুগত্যের অভাব হয়ে যায়। আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়-বিগ্রহের বন্দনা, সেবা। সেই রীতিই এখানে লক্ষ্য করছেন।

শ্রীদামোদরাস্টকমের প্রথমে সেইরূপ শুভারম্ভ রয়েছে। আবার যখন শেষ করতে যাচ্ছেন, তখনও তার মধ্যে আবার বন্দনা রয়েছে। হরিনাম করব আমরা তার পূর্বে কিছু মঙ্গলাচরণের রীতি আছে। “আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।।” যে কোন অনুষ্ঠানের প্রথমেই ভগবানের নামোচ্চারণ করতে হবে। “গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—তিনের স্মরণ।। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ।।” হরিকে বাদ দিয়ে গুরু-বৈষ্ণব নন, বৈষ্ণবকে বাদ দিয়ে শ্রীহরি নন। অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহ ও বিষয়-বিগ্রহ—উভয়েরই বন্দনা করবার এরূপ রীতি আছে।

“আপনার উদর-বন্ধনকারী এই মহাপাশকে নমস্কার।” ভগবান্ এবং ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রণাম করা হচ্ছে, বন্দনা করা হচ্ছে। আছে এ রীতি। মা যশোদা তিনি শুনেছেন, জেনেছেন তাঁর ছেলে স্বয়ং ভগবান্। তা জানা সত্ত্বেও, শোনা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ছেলেকে ভগবান্ বলে মেনে নিতে পারছেন না। যদি মেনে নেন তাহলে সেখানে ঐশ্বর্যের আধিক্য প্রমাণিত হয়। বিশুদ্ধ বাৎসল্য ভাব—সেখানে ঐশ্বর্যের কোন কথা নেই। তাই তাঁর ছেলে যে স্বয়ং ভগবান্ তা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। নামকরণ করার সময় গর্গক্ষাষি এসেছেন নন্দালয়ে। গর্গক্ষাষি বলছেন,—হে নন্দরাজ! তোমার এই ছেলে সাধারণ শিশু নন। বলে দিলেন অনেক কথা সেখানে। তোমার এই ছেলের নামকরণ করতে গিয়ে আমার বড় অসুবিধা হচ্ছে। বলদেবের নামকরণ করতে গিয়ে কোন অসুবিধা হয় নি, কিন্তু যখনই তোমার এই ছেলের নামকরণ করতে যাচ্ছি তখনই মুষ্কিলে পড়ে যাচ্ছি। কি নামকরণ করা হবে? যত যত নাম আমি মনে করছি সব নাম চাপা পড়ে যাচ্ছে। কিসে চাপা পড়ছে? একটা নামে। তোমার এই পুত্র অনন্তলীল। যত কিছু আমি মনে করছি বা ধ্যানে পাচ্ছি এক কৃষ্ণনামেই সব চাপা পড়ে যাচ্ছে। আমি নূতন কি নাম রাখব? তোমার এই পুত্র জগতের সবচেয়ে প্রাচীন ব্যক্তি, অতি বৃদ্ধ, বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ। তুমি এর নামকরণ করতে বলছ, কি করে এর নামকরণ করব! তোমার এই ছেলে পূর্বে বহুবার এসেছে।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহুতোহনুযুগং তনুঃ।

শুল্কোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।

তোমার এই ছেলে সত্যযুগে ব্রহ্মচারিবেশে তপস্যামূর্তিতে এসেছেন। রক্তমূর্তিতে—

যজ্ঞমূর্তিতে ইনি ত্রেতাযুগে এসেছেন। তোমার এই পুত্রই পীতরূপে আবির্ভূত হবেন। “ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ”—এখন এই কৃষ্ণমূর্তিতে এসেছেন। দৈত্য-দানব-নিপীড়িত এই ধরিত্রীদেবীকে রক্ষা করেছেন তোমার এই পুত্র। একে সাধারণ শিশু মনে করো না। স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ এসেছেন তোমার ঘরে, এঁকে খুব আদর-যত্নে লালন-পালন করবে। কিন্তু এত বলা সত্ত্বেও যখনই ছেলে কিছু অন্যায় করছে তখনই মা যশোদার হাতে লাঠি উঠে যাচ্ছে। বিশুদ্ধ বাৎসল্যের এই স্বভাব। সেখানে ঐশ্বর্যের কোন স্থান নেই। গুনলেও বিশ্বাস হচ্ছে না।

কখনও গোপবালকগণের সঙ্গে তিনি অনেক মাটি খেয়েছেন ব্রহ্মাণ্ডঘাটে। তারা সব এসে নালিশ দিয়েছে মা যশোদার কাছে। বিশেষ করে বলদেব এসে নালিশ দিয়েছেন। Universal Mother মা যশোদা। মা, কানাই আজ অনেক মাটি খেয়েছে। কেন খেয়েছে বলতে পারি না, তবে অনেক মাটি খেয়েছে। অন্য কেউ বললে হয়ত’ কিছুটা সন্দেহ হত, কিন্তু বলদেব খুব গভীর প্রকৃতির। বড় দাদা ত’। গাভীর্য্য না থাকলে বড় দাদা হওয়া যায় না। দাদাগিরি আর বড়দাদাগিরি এক নয়, তফাৎ আছে। খুব শান্তশিষ্ট এবং খুব গভীর প্রকৃতির বলদেব। তিনি এসে নালিশ দিচ্ছেন, মা, কানাই আজ অনেক মাটি খেয়েছে। কথাটা অবিশ্বাস করার উপায় নেই। মা যশোদা বলছেন, কানাই, বলদেব কি বলছে? তুই নাকি আজ অনেক মাটি খেয়েছিস্? বাড়ীতে কি খেতে পাস্ না, তোকে কি খেতে দেওয়া হয় না?

ভগবান্ যিনি তাঁর বুদ্ধি ত’ সকলের উপরে, তাঁর যুক্তি ত’ সকলের উপরে। সকল প্রশ্নের তিনি উত্তর দিতে পারেন, দিয়ে রেখেছেন শাস্ত্রগ্রন্থে। আজ সাক্ষাৎভাবে মা প্রশ্ন করে বসেছেন, কি করবেন তিনি? তাঁর ত’ সব জানা আছে। তখন কানাই বলে দেন, দেখ মা, ওরা ত’ সব বলছে আমি মাটি খেয়েছি, বুঝলাম; কিন্তু আমি যে মাটি খেয়েছি তার ত’ কোন চিহ্ন থাকবে। দেখ, আমার মুখটা দেখ, আমি হাঁ করছি। হাঁ করার সঙ্গে সঙ্গে মা যশোদা অবাক হয়ে গেছেন, অভিভূত হয়ে পড়লেন। আমার এই বাচ্চার মুখে একি দেখছি—সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড! আশ্চর্য্য লাগে, আয়নায় যেমন আমরা নিজেদের প্রতিবিস্ম দেখি ঠিক তেমন মা যশোদা নিজেকে দেখলেন তাঁর (কৃষ্ণের) মুখের মধ্যে। নন্দ মহারাজকেও দেখলেন, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও দেখলেন। ভেলকি, ভোজবাজী লেগে গেছে। তখন কি করলেন? তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ডাকলেন শিশুর রক্ষাবন্ধন করতে হবে। তাঁরা এসে সব মন্ত্র পড়ছেন—নারায়ণ গোপালের মস্তক রক্ষা করুন, হস্ত রক্ষা করুন ইত্যাদি প্রতি অঙ্গ উল্লেখ করে করে রক্ষাবন্ধন করছেন তাঁরা গোপালের। ব্যাপারটা কি? সেখানে মায়ের কাছে একটু ভেলকি, ভোজবাজী দেখিয়ে সে-সময়ে Situation manage করেছেন। বহু ক্ষেত্রে এমন হয়েছে। তাঁর সব যুক্তি, তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানা আছে।

তাঁর যে ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতার দ্বারা মা হাতে লাঠি নিয়েও তাঁকে মারতে পারছেন না। কান্না শুরু করেছে, চোখে জল গড়াচ্ছে না, কিন্তু রগড়ে রগড়ে মা যশোদা চোখে যে কাজল দিয়েছিলেন তা একটু জলের সঙ্গে মিশে খুব সুন্দর চেহারা হয়ে গিয়েছে—কালো ভূত চেহারা হয়ে গিয়েছে। ঐ কান্নার ভাব দেখে, ভয়ে ভীত দেখে মা যশোদা

হাতের লাঠি ফেলে দিয়েছেন। কাঁদতে হবে না তোকে, কিন্তু তোকে বাঁধব, তুই এত দুষ্ট হয়েছিস্ যে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই এসে নালিশ করছে তোর বিরুদ্ধে। তুই কখন কি করিস্ তা আমি বুঝি না। তুই ভোরবেলায় পাড়ার লোকের ঘরে গিয়ে ক্ষীর, সর, ননী, ছানা সব চুরি করে খাস্, তারা নালিশ দেয়। যে ঘরে কিছু পায় না তাদের ঘরে শুয়ে থাকে বাচ্চা ছেলেগুলোকে চিম্টি কেটে কাঁদিয়ে দিয়ে আসে। গৃহস্থের বাড়ীতে যে ফলের (শশা) গাছ আছে তার গোড়া কেটে দিয়ে চলে এল। ঘরের ভিতরে ঢুঁকে ননী, মাখন হাতে না পেয়ে উদুখল ঠেলে নিয়ে গিয়ে তা পাড়ছে, বা নীচে একটা লাঠি দিয়ে খোঁচা দিয়ে দিল। হাঁড়ি ফুটো হয়ে ননী, মাখন পড়ছে আর গোপাল নীচে হাঁ করে আছে। নিজে যাচ্ছে না, বহু বাঁদর জুটে গেছে, কাক এসে গেছে, তাদেরকে সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন—খা, খা, তোরা খা। বৃন্দাবনে সেই বাঁদরের অত্যাচার এখনও আছে। কি ব্যাপার! তোর বিরুদ্ধে এত নালিশ।

মাখন চুরি করতে যাচ্ছেন, সেই সময় গোপী চিৎকার করতে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ঈশারা করে দিচ্ছেন, খবরদার! কথা বলবে না। বালগোপাল চরিতের মধ্যে ত' এসব লীলাগুলো বর্ণনা আছে।

দধিমথননির্নাদৈন্ত্যন্তনিদ্রঃ প্রভাতে

নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিশ্টিঃ।

মুখকমলসমীরেরাশু নির্বাপ্য দীপান্

কবলিত নবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ॥

সেই বালগোপাল, বালকৃষ্ণ তিনি আমাদের পালন করুন, পোষণ করুন। “দধিমথন-নির্নাদৈন্ত্যন্তনিদ্রঃ প্রভাতে”—মা যশোদা উঠে চলে গেছেন ভোরে, বালগোপালও সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেল। ঘর ঘর করে মাখন টানার আওয়াজ হচ্ছে। ঐ শব্দ শুনে তিনিও চলে গেছেন। “নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিশ্টিঃ”—গোপীগণের ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। আলো জ্বলছে, আলো না নেভালে কিছু করা যাচ্ছে না, তাই ফু দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলেন। সেই যে বালগোপাল—তিনি আমাদের পালন করুন, পোষণ করুন।

সব্যে পাণৌ নিয়মিতরবং কিঙ্কিণীদাম ধৃত্বা

কুঞ্জীভূয় প্রপদগতিভির্মন্দমন্দং বিহস্য।

কত বুদ্ধি! গহণাগুলো গায়ে আছে, চলতে গেলে শব্দ হবে টুং টাং টুং টাং, তাই সেগুলোকে সব চেপে ধরেছে। ছোট ছোট দরজা, তাই গোপাল কুঁজো হয়ে ঢুকছে। গোপাল নিজেই ত' বাচ্চা, কিন্তু দরজাগুলো এত ছোট ছোট যে সে কুঁজো হয়ে ঢুকছে। খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছে, কেন না চুরি করতে যাচ্ছে ত' তাই। নিজে নিজে হাসছে। হাসিটা কেন? চুরি করতে যাচ্ছে, যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে মুন্সিল্ হয়ে যাবে—সে এক ভয় আছে।

অশ্লোভঙ্গ্যা বিহসিত-মুখীবারয়ন্ সম্মুখীনা

মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্॥

ঈশারা করে দিচ্ছে মুখে হাত দিয়ে, খবরদার! চিৎকার করবে না। “মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্॥” ওখান থেকে চুরি করে মাখন খেয়ে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে

মা যশোদা যখন স্নান সেরে চলে এসেছেন ভোরবেলায় তখন তাঁর পিছন পিছন ঘুরছেন। এ ছেলে কখন এসব দুষ্টুমি করে! গোপীগণের যে-সব নালিশ আসছে মা যশোদার কাছে তা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমার ছেলে ত' আমার কাছে শুয়ে থাকে। আর আমি বাথরুমে গেছি, এইটুকু সময়ের ভিতরে কি করে সে! কোথায় গেল! ঠিক এর ভিতরে কাজ সেরে সময়মত হাজির হয়ে গেছে সে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না তিনি। যার জন্য কষ্টকর পরিশ্রম স্বীকার শুরু করতে হয়েছিল তাঁকে। রাজরাণী ত' তিনি। হাজার হাজার গাভী, গোবৎস। তার ভিতরে আবার খুব বাছা বাছা গাভীরা তাঁর জন্য। চাকর-বাকর দিয়ে কাজ করাই, এরা বোধ হয় ভাল করে কাজ করে না—মাখন, ননী খুব যত্ন করে তৈরী করে না, সেজন্য বোধ হয় আমার গোপাল বাড়ীতে না খেয়ে লোকের বাড়ীতে চুরি করে বেড়ায়। তাই মা যশোদা এই কষ্টকর পরিশ্রম করতে বসেছেন—যে পরিশ্রম তাঁর অভ্যাস নেই। আমি নিজেই তৈরী করব, দেখি গোপাল খায় কিনা। নিজে তৈরী করার ব্যাপারটা কি? আমি নিজহাতে সেবা করব। ঝি-চাকরাণীকে দিয়ে কাজ হবে না, তারা ত' অন্তরের সহিত কাজ করবে না। তারা ত' মাইনের চাকর, যেমন মাইনে পাবে তেমন কাজ করে দিয়ে যাবে। মা যশোদা নিজহাতে ঠাকুরের সেবা করতে হবে—সেটা শিক্ষা দিচ্ছেন জগদ্বাসীকে। কষ্টকর পরিশ্রম হলেও ঝি-চাকরাণীকে দিয়ে হবে না, ভগবানকে নিজহাতে খাওয়াতে হবে।

যখন দধিমস্থন করছেন সেইসময় কিন্তু তাঁর মুখটা চুপ নেই, কৃষ্ণেরই গুণমহিমা তিনি কীর্তন করছেন। অন্য কিছু নয়। ‘গোপাল কৃষ্ণ গোপাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মুখে’—এই বলে যাচ্ছেন। তার মানে এটাও শিক্ষা দিচ্ছেন তিনি—তোমরা সংসারে সেবা করবে, সেবার ভিতরেও তোমরা নাম কর, নাম কখনও বাদ যাবে না। ঠাকুরের আরতির সময় যিনি আরতি করেন তিনি মুখে মহামন্ত্র উচ্চারণ করবেন। যে কোন ভক্ত্যঙ্গ যাজন করা হোক না কেন তাতে নাম-সঙ্কীৰ্তনঙ্গ অবশ্যই মিশ্রিত করতে হবে—শাস্ত্রের নির্দেশ, আদেশ। “যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কৰ্তব্য্যা তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব।”—যে কোন ভক্ত্যঙ্গ যাজন করি না কেন আমরা, তার মধ্যে নাম-সঙ্কীৰ্তন অবশ্যই মিশ্রিত করতে হবে। তা না হলে সে ভক্ত্যঙ্গ যাজন সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে না, সম্পূর্ণ হবে না। সেইজন্য শাস্ত্রে এইসব বিধিবিধান আছে।

প্রসাদ পাচ্ছেন বৈষ্ণবগণ, ভগবানের গুণগান কীর্তন করছেন। মহাপ্রসাদের গুণগান করছেন। যে কোন কাজ করবেন তার ভিতরে ভগবানের নাম উচ্চারিত হবে এবং মহামন্ত্র উচ্চারিত হবে বিশেষভাবে। প্রসাদ পেতে গেলে মহাপ্রসাদের গুণমহিমাও বর্ণনা হচ্ছে,—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।।

ব্রহ্মবন্নির্বিষ্কারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।

বিষ্কারং যে প্রকুব্বন্তি ভক্ষণে তদ্বিজাতয়ঃ।।

কুষ্ঠব্যাদিসমায়ুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ।

নিরয়ং যাস্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ।।

মহাপ্রসাদ সেবার সময়ে এইসব মহাপ্রসাদের গুণমহিমা কীর্তন করা হচ্ছে। সবসময়ই প্রতিটি অনুষ্ঠানের মধ্যে এই নাম-সঙ্কীর্ণনাস্থ থাকবেই। তবে সেটা সর্বাপেক্ষাসুন্দর হবে— এই হল শাস্ত্রের নির্দেশ।

মা যশোদা শিখাচ্ছেন—হাতে কাজ কর আর মুখে নাম কর। সেবা আর নাম দুটো এক তাৎপর্যাপন্ন। তথাপি দেখাচ্ছেন সেবার সঙ্গে তুমি নাম করে যেতে পার, তোমার মুখটা ত' আছে। নাম কর। ভুল কেউ না বোঝেন—নামগ্রহণ ও ঠাকুরের অন্যপ্রকার সেবা এক নয়, একই তাৎপর্যাপন্ন। তথাপি বলছেন,—তুমি সেবাকাজ করছ হাতে, মুখে নাম করে যাও। নৈরন্তর্য্য নামে, চিন্তাভাবনা, শিক্ষা দেওয়া রয়েছে শাস্ত্রে।

সেই যে ভগবান্ তিনি সর্বত্র একইভাবে লীলাপ্রকাশ করছেন যে তা নয়। ভগবান্ থেকে যে ইন্দ্রিয় আমরা পেয়েছি সেটা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করার নামই ভক্তি। “হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরূচ্যতে।।” পূর্বের আলোচনা করেছি ভগবান্ উপরওয়াল মালিক। তাঁর থেকে আমরা ইন্দ্রিয়বৃত্তি পেয়েছি; আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তির এক একটা এক এক রকমের ক্রিয়াশীল। কিন্তু ভগবানের যে ইন্দ্রিয়বৃত্তি—ভগবানের যে হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মুখ প্রভৃতি যা কিছু এর সবগুলোরই এমনই বৈশিষ্ট্য যে এর এক এক অঙ্গের দ্বারা তিনি অন্য অঙ্গের Purpose serve করতে পারেন বলা আছে। সে সম্বন্ধে উদাহরণও দেওয়া আছে। ভগবান্ কিছু জীবজন্তুর মধ্যে এমন কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন, সে ক্ষমতা মানুষের মধ্যে নেই। ভগবান্ এবং তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবটারই বৈশিষ্ট্য আছে, যে বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষ রক্ষা করতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করছি আমরা, দেখছি শাস্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা-মহাত্ম্য কীর্তন করছেন, আবার দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক যে শ্রীমদ্ভাগবতম্ তার প্রতিটি স্কন্ধের অবয়বের হিসাব দিয়েছেন,—

পাদৌ যদীযৌ প্রথমদ্বিতীযৌ তৃতীয়তুৰ্যৌ কথিতৌ যদূরু।

নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভূজান্তরং দৌর্যুগলং তথান্যৌ।।

কণ্ঠস্ত রাজনবমো যদীযৌ মুখারবিদং দশমঃ প্রফুল্লম্।

একাদশো यस্য ললাটপটং শিরোহপি তু দ্বাদশ এব ভাতি।।

তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।

অপারসংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্।।

ভাগবতের এই যে স্তব করা হচ্ছে তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, এটি কল্পনা নয়। এটা কাল্পনিক ব্যাপার নয়। আমারই মঠেরই আমারই কোন এক সতীর্থ কোন এক সময় তিনি আমাকে দশমস্কন্ধ ভাগবত পাঠ করতে দেখে বলেছিলেন, আপনি দশমস্কন্ধ পাঠ করছেন কেন? আপনার ত' একাদশ-দ্বাদশ স্কন্ধ পাঠ করবার কথা। আপনি দশমস্কন্ধ নিয়ে বসেছেন কেন? আমি তাঁকে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলাম,—আপনাদের শ্রীমুখ থেকেই ত' শুনি “স্বাদু স্বাদু পদে পদে”। শ্রীমদ্ভাগবত যদি তাই হয়—অস্থি-বস্কলহীন যে বস্তু, যার সবটাই রস, তার কোন্টা ভাল আর কোন্টা খারাপ—এ বিচার ত' করা যাবে না। সেখানে দশমস্কন্ধ কমা হবে, আর একাদশ-দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রেষ্ঠ হবে—এমন কি প্রাকৃত বিচার

আমরা করব ভাগবত সম্বন্ধে? তিনি ত' মূর্তিমান্ বিগ্রহ। ভগবান্ যখন লীলা প্রকাশ করেন এই ভৌমব্রজে তখন একরকম, কিন্তু যখন চলে যান এ জগৎ থেকে তাঁর নিজস্ব লোকে, নিজালয়ে—অপ্রাকৃত গোলোক-বন্দাবনে ফিরে যান, তখন এখানে ব্যবস্থা কিছু ত' রেখে যাবেন তিনি। যা কিছু তিনি বলে গেছেন এখানে সে তত্ত্বদর্শনটা তিনি রেখে যান। কৃষ্ণ এসেছিলেন, তাঁর পরিকর সব এসেছিলেন। ভগবান্ যখন তাঁর লীলা গুটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছেন তখন কি তিনি একা গেছেন—এমন প্রমাণ ত' নেই। সকলকে গুটিয়ে নিয়ে গেছেন।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাভিঃ সহ।

কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণাকৌহধুনোদিতঃ।।

তিনি যখন গেছেন তখন তাঁর পরিকরবর্গ যাঁদের নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সবাইকে নিয়ে চলে গেছেন। রেখে যাচ্ছিলেন উদ্ধবকে। যার জন্য তাঁর কান্নাকাটি আরম্ভ হয়েছিল। তিনি বললেন, আমার কাজ আমি করে গেলাম, তোমাকে রেখে গেলাম। আমার কথা যা বললাম সেটা তুমি জগতে প্রচার কর। এইজন্য তোমাকে রেখে যাচ্ছি। আমার কাজ হয়ে গেছে। বিচারটা কি সেখানে? ভগবান্ উদ্ধবকে রেখে যাচ্ছেন। আমি চলে যাচ্ছি, তোমরা কান্নাকাটি করো না। এই ভাগবত পুরাণ-সূর্য্য উদিত হলেন, অর্থাৎ তাঁর সাক্ষাৎ বাণী রেখে গেলেন। স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁর বাণী দুইই একই তত্ত্ব—এটা প্রমাণ করছেন ভগবান্। আমি এখানে সাক্ষাৎভাবে থাকতে না পারলেও এই নিয়ে তোমরা থাকবে। আমি এবং আমার বাণী একই, অভিন্ন—Identical, সেই বিচারটা দেখাচ্ছেন। ভগবান্ এবং ভগবানের বাণী অভিন্ন; নাম-নামী অভিন্ন। নাম করতে গিয়ে যদি আমরা সেই নামের স্বরূপ না বুঝি, নামীর স্বরূপ না বুঝি, তাহলে নাম করে কি হবে? নাম করতে গেলে সেজন্য তাঁর স্বরূপ উপলব্ধির বিশেষ প্রয়োজন আমাদের। তিনি ত' অভিন্ন বস্তু।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তিনি মাকে স্বাস্তনা দিচ্ছেন, বলে যাচ্ছেন মাকে, মা, তুমি কে? যে মাকে দিয়ে তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের কাছে ক্ষমা চাওয়ালেন, তোমার অপরাধ আছে একজন বৈষ্ণবের কাছে। মাকে দিয়ে অপরাধ ক্ষালন করাচ্ছেন। কে মা? জগতের সাধারণ কর্মফলবাধ্য গর্ভধারিণী মা নন। তাই নীতি-আদর্শ দেখাচ্ছেন তিনি। অখিললোকশিক্ষক, ত্রিলোকগুরু তিনি জগৎকে সাধন-ভজন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছেন। তিনি মাকে দিয়ে অপরাধ ক্ষালন করাচ্ছেন। “কে বলে তোমাকে অদ্বৈত, তোমার ত' দ্বৈত বুদ্ধি”—শচীমা এই কথাটা কখনও বলে ফেলেছিলেন অদ্বৈতকে। কেন? তুমি এমনই লেখাপড়া শেখালে, এমনই শাস্ত্র অধ্যয়ন করালে এদের যে আমার ছেলে সব সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাচ্ছে! ঐ কথা বলে ফেলেছিলেন বলে মাকে দিয়ে লৌকিকভাবে অপরাধ ক্ষালন করালেন। আবার তিনি যাঁকে মা বলে স্বীকার করেছেন তিনি সাধারণ যে সে নারী নন, আর পিতাও সাধারণ পুরুষ নন, সেটা ত' তিনি জগৎকে জানিয়েছেন। ভাগবতেও তাঁর মহিমা রয়েছে।—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।।

নন্দঃ কিমকরোদ্ধ্বান্ন শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।

যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যঃ স্তনং হরিঃ ॥

ভয়ঙ্কর ব্যাপার! নন্দ-যশোমতীর গুণগান করছেন। তাঁরা যে সৌভাগ্য পেয়েছেন, অধিকার পেয়েছেন, জগতের মানুষ তা পায় না। এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে পিতামাতা বলে মেনে নিয়েছেন ভগবান্। যার জন্য রঘুপতি উপাধ্যায় বলছেন,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্ত ভবভীতাঃ।

অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম ॥

ভবভীত মানবগণ তারা কেউ শ্রুতির উপাসনা করছেন, কেউ স্মৃতির উপাসনা করছেন, আমি কিন্তু তা করব না। রঘুপতি উপাধ্যায় কি বলছেন?—“অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম ॥”—আমি নন্দ-যশোমতীকে বন্দনা করি। আমি ত’ কৃষ্ণকে চিনি না, ভগবানকে চিনি না, জানি না। তাঁকে জানতে গেলে, বুঝতে গেলে, তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে গেলে নন্দ-যশোমতীকে আশ্রয় করছি আমি গুরুরূপে। সেখানে কৃষ্ণ বন্দনা করতে গিয়ে নন্দ-যশোমতীর বন্দনা করছেন। তত্ত্বদর্শন বুঝতে হবে এগুলো।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শচীমাকে বলছেন, আমি যে তোমাকে মাতৃত্বে বরণ করেছি, তুমি ত’ সাধারণ নারী নও।

“আরো দুই জন্ম মোর সঙ্কীর্ণনারঙে।

হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥

মোর অর্চা মূর্তি মাতা তুমি সে ধরণী।

জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী ॥”

কি বললেন কথাটা? আমি যেভাবে এসেছি তোমার কাছে আরও দুইভাবে এখানে প্রকটিত। সে দুটো ভাব কি কি? “মোর অর্চা মূর্তি মাতা তুমি সে ধরণী।” আমি অর্চামূর্তিরূপে থাকব, আছি। “জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী ॥” আর এক হল নাম-বিগ্রহরূপে। এক অর্চামূর্তিতে, আর এক শ্রীনাম-মূর্তিতে—এই দুটো আমার স্বরূপ। তুমি ত’ যে সে ব্যক্তি নও। সব জিনিসের তাৎপর্য আছে।

নাম বিগ্রহস্বরূপ, একরূপ বলছেন। তফাৎ নেই। মায়াবাদীকে গালাগালি দিচ্ছেন, সমালোচনা করছেন চৈতন্যমহাপ্রভু,—

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।

সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥

বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।

সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে ॥

মানছে না। মায়াবাদী বিগ্রহকে বলছে প্রাকৃত জড়। নামকে বলছে জড়। অপরাধ। “মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী”। তত্ত্ববিरोধ করছে, তত্ত্বসিদ্ধান্তে বিরোধ করছে সে। সেজন্য কথা এসেছে। পাশাপাশি রেখে সবটা বিচার করতে হবে। স্ফয়ং ভগবান্, স্বয়ংরূপ ভগবান্, তাঁর শ্রীমূর্তি, তাঁর শ্রীনাম একই বস্তু। তাঁর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রত্যেকটী সচ্চিদানন্দময়। এই কথাই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ”—এই সূত্রেতে আনন্দের অভ্যাস

এই কথাটা শঙ্করাচার্য্য বলতে চেয়েছেন তাঁর শারীরিক ভাষ্যে। ‘ময়’ শব্দটিকে তিনি চাপা দিতে চাচ্ছেন। তিনি বলতে চাচ্ছেন—আনন্দের অভ্যাস। কিন্তু কথাটা তা নয়। ব্রহ্মসূত্রের মূল যে সূত্র সেটা হল “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ”। আনন্দময় যে বস্তু, সচ্চিদানন্দময় যে বিগ্রহ, তাঁর সম্বন্ধে অনুশীলন। সেখানে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তিনি যে ‘ময়’-প্রত্যয় করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা অন্যদিকে দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন আনন্দস্বরূপ ভগবান্। তাহলে তাঁর মায়াবাদ স্থাপিত হয়। কিন্তু বিষয়বস্তু ত’ তা নয়। তিনি আনন্দময় এবং সেখানে ‘ময়’-প্রত্যয়েরও অন্যান্য আচার্য্যবর্গ ব্যাখ্যা দিয়েছেন ‘প্রাচুর্য্যাৎ’ প্রচুর আনন্দ। সুতরাং তিনি কেবলমাত্র আনন্দ নন। ‘আনন্দং ব্রহ্ম’—এটা বললে হবে না, আনন্দময়। পরবর্ত্তিকালে মধ্বাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তিনি আনন্দমাত্র নন, তিনি আনন্দময় বস্তু। তাঁর স্বরূপটাই আনন্দময় বস্তু। বাঁচতে চাই কেন আমরা?—আমরা অজর, অমর, সেজন্য আমাদের বাঁচবার ইচ্ছা। আমাদের কারোর মরবার ইচ্ছা নেই, সকলেরই বাঁচবার ইচ্ছা। কেন?—আমরা সেই বস্তু ত’। জীবাত্মা অজর, অমর, শাস্বত, শুদ্ধ, সনাতন বস্তু। ভগবান্ যেমন, জীবাত্মার স্বরূপও তাই।

ন জায়তে শ্রিয়তে বা কদাচিন্মায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

সেই বস্তু জীবাত্মা। তার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। তাহলে কার জন্ম হয়?—প্রাকৃত বস্তুর, জড় দেহের। দেহী আত্মা যখন কোন শরীরে প্রবেশ করল, তখন বলা হচ্ছে এর জন্ম। আর দেহী আত্মা যখন কোন দেহ থেকে প্রত্যারিত হচ্ছে, তখন তাকে বলা হয় মৃত্যু। এই হল জন্ম-মৃত্যু রহস্য। আত্মার জন্ম-মৃত্যু নেই—সেই কথা শাস্ত্র বুঝাচ্ছেন। তত্ত্বদর্শনটা আমাদের বুঝতে হবে। বাহ্য ইন্দ্রিয়ে কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেটা দেখে তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না, তত্ত্ব নির্ণয় করা হবে না। “যাবজ্জীব নিবসতি দেহে কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে ॥”—যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই দেহাধারে জীবাত্মার অধিষ্ঠান আছে ততক্ষণ পর্য্যন্তই আমাদের পরস্পরের মধ্যে কুশল জিজ্ঞাসা। “গতবতি বায়ু দেহাপায়ে ভার্য্যা বিভ্রতি তস্মিন্ কায়ে ॥” কিন্তু এই দেহাধার থেকে যখন চলে যায় জীবাত্মা তখন কি আর কোন কুশল জিজ্ঞাসা থাকে? তখন কি আমরা কেউ জিজ্ঞাসা করি, ভায়া, কেমন আছ হে? কুশল ত’?—এটা জিজ্ঞাসা করি না। তাহলে কাকে লক্ষ্য করে এটা? জীবাত্মাকে কেন্দ্র করে এ প্রশ্ন। যতক্ষণ দেহাধারে জীবাত্মা অধিষ্ঠিত, ততক্ষণ কুশল জিজ্ঞাসা। সবটার বিচার ত’ এরকম করেছেন।

“আপনার উদর-বন্ধনকারী এই মহাপাশকে নমস্কার করি।” ভগবান্কে নমস্কার করছেন এবং তাঁর উদরকে নমস্কার করছেন। কোন্ উদর?—যে উদরে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব আছে। যিনি অনন্ত বিশ্বের মূল্যধার, যাঁর থেকে সৃষ্টি, যাঁর থেকে সংস্থিতি এবং যাঁর থেকে প্রলয়—সবকিছু সংঘটিত হচ্ছে, সেই তত্ত্ববস্তু হলেন পরব্রহ্ম। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

(রেজিষ্টার্ড)

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

এস্. টি. ডি. : ০৩৪৭২ ৮৮ ৪০০৬৮ ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪০৫ (ইং ১৬।১২।৯৮)

“নারায়ণঃ নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীঃ সরস্বতীঃ ব্যাসঃ ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাদ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫১২ শ্রীগৌরাদ ; ২০শে মাঘ, ১৪০৫ (ইং ৩।২।৯৯) বুধবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া-তিথি হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী ৫ই গোবিন্দ, ২২শে মাঘ, ১৪০৫ (ইং ৫।২।৯৯) শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদিপঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরিকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্গবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—২০শে মাঘ, বুধবার—ব্রাহ্মমূহুর্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরু-মহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজনগীতি-কীর্তন, পূর্বাঙ্কে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলি-প্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা।

২১শে মাঘ, বৃহস্পতিবার—পূর্বাঙ্কে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বৈষ্ণবীয় দয়া ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা।

২২শে মাঘ, শুক্রবার—পূর্বাঙ্কে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলিপ্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য চরিত্র সম্পর্কে ভাষণ।

✠	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।	✠
ধর্মঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।		নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
✠	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	✠

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সৃষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫০শ বর্ষ } ১২ মাঘ, কারাগোদশায়ী, ৫১২ শ্রীগৌরাদ
২৯ দৌব. বৃহস্পতিবার, ১৪০৫, ইং ১৪/১/৯৯ { ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-নুতি-সূত্রকল্প

[ত্রিদণ্ডিস্বামী-শ্রীমন্তুক্তিরক্ষক-শ্রীধর-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রোত্র-নেত্র-গত্যতীত-বোধ-রোধিতাঙ্কুতং
প্রেম-লভ্য-ভাব-সিদ্ধ-চেতনা-চমৎকৃতম্ ।
ব্রহ্ম-শব্দ-বেদ-তন্ত্র-মৃগ্য-সত্য-সুন্দরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪৫ ॥

যাহা চক্ষু ও শ্রুতির অগোচর—যাহা বুদ্ধির গतिकেও স্তব্ধ করিয়া দেয় এবং যাহা
প্রেমরসে অবস্থার সুপ্রতিষ্ঠিত চেতনাকেও চমৎকৃত করে (অর্থাৎ তাঁদেরও বোধগম্য হয়
না) এইরূপ—ব্রহ্ম ও শব্দ—তাঁদের প্রকাশিত শাস্ত্র—বেদ ও তন্ত্রসমূহ যাহাকে কেবলমাত্র
অহেতু করিয়া চলিতেছে—সেই সত্যসুন্দর দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরান্দ-সুন্দরেরই
অনি স্তব করি ॥ ৪৫ ॥

বিপ্র-শূদ্র-বিজ্ঞ-মূর্খ-যাবনাদি-নামদং
বিত্ত-বিক্রমোচ্চ-নীচ-সজ্জনৈক-সম্পদম্ ।

স্ত্রী-পুমাди-নির্বিবাদ-সার্ববাদিকোদ্ধরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪৬ ॥

যিনি—ব্রাহ্মণ, শূদ্র, পণ্ডিত, মুখ, এমন কি যবনাদি অনার্য্যকুলকেও শ্রীহরিনামে শুদ্ধ করিয়াছেন ও ধনী-নিধন, সবল-দুর্বল, সজ্জনমাত্রেরই সম্পদ-স্বরূপ এবং যিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র চিদচিদ্বিশ্বের সার্ববাদিসম্মত উদ্ধারকর্তা—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪৬ ॥

সিন্ধু-শূন্য-বেদ-চন্দ্র-শাক-কুণ্ড-পূর্ণিমা

সাক্ষ্য-চান্দ্রকোপরাগ-জাত-গৌর-চন্দ্রমা।

জ্ঞান-দান-কৃষ্ণনাম-সঙ্গ-তৎ-পরাংপরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪৭ ॥

চৌদশত সাত শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সাক্ষ্যকালে চন্দ্রগ্রহণ যোগে শ্রীগৌরচন্দ্রমা (শচীর অঙ্গনে) আবির্ভূত হন। সেই পরাংপর-তত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহরি যিনি জনগণের পবিত্র গঙ্গাজ্ঞান, নানা রত্ন, দ্রব্য দান ও সর্বোপরি শ্রীহরিনাম-সংকীৰ্ত্তন-সঙ্গে অবতীর্ণ হন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪৭ ॥

আত্ম-সিদ্ধ-সাবলীল-পূর্ণ-সৌখ্য-লক্ষণং

স্বানুভাব-মত্ত-নৃত্য-কীর্ত্তনাত্ম-বণ্টনম্।

অদ্বৈক-লক্ষ্য-পূর্ণ-তত্ত্ব-তৎ-পরাংপরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪৮ ॥

যিনি স্বতঃসিদ্ধ সহজ-লীলাময় পরিপূর্ণ আনন্দ-তত্ত্বের লক্ষণসমূহের আকর—যেহেতু আত্ম-সুখানুভবের আতিশয্যে মত্ততাজনিত নৃত্য ও সেই সুখ-বিলাস বা বিভজনের প্রয়াসজনিত কীর্ত্তন—এই দুইটি পূর্ণ অদ্বয়তত্ত্বের স্বাভাবিক ও মৌলিক বাস্তব লক্ষণ-বিশিষ্ট—অতএব যিনি অসমোদ্ধ—একমাত্র পরাংপর-তত্ত্ব—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪৮ ॥

নীল-শৈল-সিন্ধু-তীর-সর্ব-শেষ-ঘোষণং

সর্ব-সাধ্য-শেষ-সিদ্ধি-রাধিকাঙ্ঘ্রি-রাধনম্।

গৌর-বাক্য-প্রসাদ-লব্ধ-ভাগ্য-ধারি-সুন্দরং

প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীনীলাচলধামে সিন্ধুতীরে বিরাজমান শ্রীমন্নহাপ্রভুর সর্বশেষ উপদেশ—আমরা শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের পারম্পর্য্যে যাহা জানিতে পারি—তাহা এই যে শ্রীরাধিকা-কৈঙ্কর্য্যই জীবের সর্বোত্তম সাধ্য-পরাকাষ্ঠা। শ্রীগৌর-সরস্বতী শ্রীগুরুপাদপদ্ম-প্রসাদে লব্ধ মহা সৌভাগ্যবন্তগণের (শ্রীরাধাকৈঙ্কর্য্যের আদর্শগাথা “শ্রীরূপমঞ্জরীপদ.....লইল শরণ”—এই তত্ত্বপ্রাপ্তগণের) সমীপে যিনি পরমসুন্দর—সেই দেবতা-প্রেমময়-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪৯ ॥

প্রেম-হেম-দেব-দেহি দাসরেব মন্যতাং

ক্ষম্যতাং মহাপরাধ-রাশিরেষ গণ্যতাম্।

ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যকেষু কাম্যমেব নাপরং

প্রেম-হেম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৫০ ॥

হে সোণার ঠাকুর! (সুবর্ণবর্ণ হেমাঙ্গ) হে প্রেমনিধে! তোমার প্রেম বিতরণ কর। এ অধম দাসের কথা একটু চিন্তা করিও, তার অশেষ অপরাধরাশি ক্ষমা করিও, এবং তোমার দাসের দাসেরও দাসগণের সমাজে একজন দাস বলিয়া গণনা করিবে—এই প্রার্থনা—ইহা ছাড়া আর কোন কামনাই আমার না হোক। হে প্রেমময় সোণার ঠাকুর শ্রীগৌরানন্দ-সুন্দর তোমারই আমি স্তব করি ॥ ৫০ ॥

প্রেম-সুন্দর-পঞ্চাশৎ-নুতি-সূত্রং পঠেন্নরঃ।

ধন্য-ভাগ্যঃ প্রভৌ-গৌরে প্রাপ্য প্রেম পরং ব্রজেৎ ॥ ৫১ ॥

যে ভাগ্য-ধন্য জন এই প্রেম-সুন্দর-পঞ্চাশৎ-নুতি-সূত্র পাঠ করিবেন, তিনি ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরে প্রেমধন লাভ করিয়া পরাৎপর গতি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৫১ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬৯ পৃষ্ঠার পর]

মনোধর্ম

১। বদ্ধজীবের ধ্যান মনের ধর্ম কেন?

“ধ্যান—মনের ধর্ম। মন যতক্ষণ শুদ্ধ চিন্ময় না হয়, ততক্ষণ ধ্যান কখনও চিন্ময় হইতে পারে না।”

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

২। আত্মা, জগৎ ও মুক্তি-সম্বন্ধে মনোধর্মীর ধারণা কিরূপ?

“কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আত্মা প্রথমে মনুষ্যাকারে এই স্থূল জগতে সৃষ্ট হইয়াছে; সংসারের উন্নতিরূপ ধর্ম-আচরণ করত ক্রমশঃ আত্মার উচ্চগতি হইবে—এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই জড়জগৎ নরবুদ্ধিদ্বারা স্বর্গপ্রায় হইয়া পরমানন্দ-ধামস্বরূপ হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ আত্মার দেহান্তর ঘটিয়া পরে নিব্বাণরূপ মোক্ষ হইবে—এরূপ স্থির করেন। এইসকল সিদ্ধান্ত অন্ধকর্তৃক হস্তীর আকার নিরূপণের ন্যায় বৃথা তর্কমাত্র। সারগ্রাহিগণ এই সকল বৃথা-তর্কে প্রবেশ করেন না; যেহেতু নরবুদ্ধিদ্বারা এসকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না।”

—উপক্রমণিকা, কৃঃ সং

৩। জড়-নিঃস্বার্থবাদ কি আকাশকুসুম-কল্পনা নহে?

“নিঃস্বার্থবাদের স্থিতি অসম্ভব। মিরাবৌর (Mirabeau) নামে ভন্ হল্‌বাক্ (Von Holbach) ‘সিস্টেম অব্ নেচার্’ (System of Nature) নামক যে গ্রন্থ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে প্রচার করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিচারের সহিত লিখিয়াছেন যে, জগতে

নিঃস্বার্থপরতা নাই ; পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকেই আমরা ধর্ম বলি। আমরাও দেখিতেছি যে, নিঃস্বার্থপরতা একটি আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক বাক্য-বিশেষ। নিঃস্বার্থপরতার প্রয়োজন এই যে, অক্রেমে নিজ-সুখ সাধিত হয়। ‘নিঃস্বার্থ’ শব্দ শুনিলে অন্য স্বার্থপ্রিয় লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয় সহজ-সাধন হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি ঐ সকল কার্য্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ-লাভের জন্য নিজ-জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন করেন।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৪। শয়তানের পৃথগ্ অস্তিত্ব স্বীকার করা উচিত কি?

“‘শয়তান’ বলিয়া একটি অদ্ভুত ব্যাপার কল্পনা না করিয়া অবিদ্যাতত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যিক।”

—জৈঃ ধঃ ১১শ অঃ

মায়াবাদ

১। মায়াবাদী কাহারা?

“মায়াবাদী—সমস্ত সন্ধিষয়ে যাহারা মায়া লইয়া বিবাদ উঠায়, ব্রহ্মকে মায়ার অতীত করিয়া ঈশ্বরকে মায়াসঙ্গী করে এবং ঈশ্বরের অবতার-সকলের দেহকে ‘মায়িক’ বলে! জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে, অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহংবুদ্ধি মায়া-নির্ম্মিত,—এরূপ বলে ; সুতরাং জীব মুক্ত হইলে, শুদ্ধজীব বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না, এরূপ সিদ্ধান্ত করে এবং মুক্তি হইলে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ হয়,—এরূপ শিক্ষা দেয়।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ আ ৭।২৯

২। অদ্বৈতবাদ কি বেদের সার্বদেশিক মত? অদ্বৈতবাদের জন্মভূমি কোন্টী?

“বহুদিন হইতে ‘অদ্বৈতবাদ’ নামক একটি বাদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের একদেশে আবদ্ধ হইয়া এই মতটি উদ্ভূত হইয়াছে ; অদ্বৈতবাদ যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিত প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ হয় না। আলেক্সান্ডারের সহিত কয়েকটি পণ্ডিত ভারতে আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, ইহা আংশিকরূপে তদেশস্থ পণ্ডিতগণ নিজ-নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।”

—তঃ সূঃ, ৩০সূঃ

৩। মায়াবাদিগণ বৌদ্ধ অপেক্ষাও নিন্দনীয় কেন?

“বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায়, তাঁহাকে বৈদিক আর্য্যগণ নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়া যে নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয় ; কেন না, স্পষ্ট শত্রু অপেক্ষা মিত্ররূপে সমাগত প্রচ্ছন্ন শত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।১৬৮

৪। মায়াবাদীর ভাষ্য কি ব্যাসসূত্রের বিরুদ্ধ নহে?

“ব্যাসের সূত্রে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে। মায়াবাদী সেই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের চিন্ময়-বিগ্রহ অস্বীকৃত এবং জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তাও অস্বীকৃত হওয়ায় তাহা শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের অত্যন্ত বিরুদ্ধ।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।১৬৯

৫। জীবসত্তা কি ব্রহ্মবিবর্ত হইতে পারে?

“জীব নিত্যসিদ্ধ চিদ্রূপ ; জীবের প্রকৃত বন্ধন বা ক্লেশ নাই ; কেবল দেহাত্মাভিমানরূপ বিবর্তভ্রমেই এত যন্ত্রণা হইতেছে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান এবং শুক্লিতে রজত-জ্ঞান—এই দুইটি বিবর্তের বৈদিক উদাহরণ। এই উদাহরণকে ভালভাবে বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী জীবের সত্তাকে ব্রহ্মবিবর্ত বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। সৎগুরুর কৃপায় যখন জীব জানিতে পারেন যে, ঐ দুইটি উদাহরণ জীবের সত্তা সম্বন্ধে বিহিত হয় নাই, কেবল জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-দেহে যে আত্মবুদ্ধি, তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, তখন তিনি সুপথ দেখিতে পান।”

—চৈঃ শিঃ ১।৬

৬। মায়াবাদী কিরূপে কৃষ্ণপরাধী?

“যিনি মায়াবাদী তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-অপরাধী। তিনি বলেন যে, কৃষ্ণমূর্তি, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা—মায়িক। ‘মায়িক’ শব্দের অর্থ মায়ামিশ্রিত অর্থাৎ জড়ময়। মায়াবাদীর মতে, শুদ্ধতত্ত্ব—নিরাকার ও নির্বিশেষ, কার্য্য-উপরোধে সেই শুদ্ধতত্ত্ব মায়াকে আশ্রয় করিয়া রাম-কৃষ্ণাদি জড়ীয় শরীর স্বীকার করেন ; শুদ্ধতত্ত্বের নাম—ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা চৈতন্য ও রাম-কৃষ্ণাদি মূর্তি—জড়োদিত, রাম-কৃষ্ণাদি নামও জড়-শব্দাধীন এবং রাম-কৃষ্ণাদির বিলাসও জড়শ্রিত। তবে জীবে ও রাম-কৃষ্ণাদিতে ভেদ এই যে, জীব কর্ম্মদোষে বা গুণে জড়শরীর পাইতে বাধ্য হন। কিন্তু চৈতন্য নিজ ইচ্ছাতে জড়-শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে কার্য্য করেন এবং নিজ ইচ্ছামতে পুনরায় জড়শরীর ত্যাগ করেন। অতএব রাম-কৃষ্ণাদির নাম, স্বরূপ, লীলা মায়ার আশ্রয় হইতে হয়। যে-পর্য্যন্ত সাধক জ্ঞান লাভ না করেন, সে-পর্য্যন্ত রাম-কৃষ্ণাদির উপাসনা করিবেন। জ্ঞান-লাভ হইলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, চৈতন্য—এইমাত্র জপ করিবেন, তখন আর রাম-কৃষ্ণরূপ জড়ীয় নাম ও ধ্যানে প্রয়োজন হয় না। মায়াবাদী সুতরাং রাম-কৃষ্ণ-স্বরূপকে শুদ্ধতত্ত্ব অপেক্ষা হয়ে জ্ঞান করেন। এইজন্যই মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী।”

—‘মায়াবাদী কাহাকে বলি?’ সঃ তোঃ ৫।১২

৭। মায়াবাদীর কৃষ্ণকীর্তন কি নামাপরাধ নহে?

“মায়াবাদী সাধনকালে যে কৃষ্ণকীর্তনাদি করেন, তাহাও অপরাধ। তাঁহার কৃষ্ণকীর্তনে শুদ্ধভক্তের অনুমোদন করা উচিত নয়। কেন না, তাঁহার সংসর্গে নামাপরাধই সম্ভব। মায়াবাদী যদিও কীর্তনে অশ্রু-পুলকাদি ও অন্যান্য সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ করেন, তাহা শুদ্ধ নয় ; তাহা কেবল সাত্ত্বিকভাবাভাস প্রতিবিশ্ব-লক্ষণ অপরাধ-বিশেষ।”

—‘মায়াবাদী কাহাকে বলি?’ সঃ তোঃ ৫।১২

৮। মায়াবাদি-ভাষ্য ও বিচারাদি ভক্তমাত্রেরই অশ্রাব্য কেন?

“যদিও তোমার চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শঙ্করভাষ্যাদি শুনিয়া বিকৃত হয় না, তথাপি সেই মায়াবাদে ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ নিরাকার ; এই জগৎ—মায়ামাত্র বা মিথ্যা ; জীব বস্তুতঃ নাই,—কেবল অজ্ঞান-কল্পিত এবং ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান”—ইত্যাদি বিচার আছে। এই সকল কথা শুনিলে ভক্তের নিতান্ত দুঃখ হয়।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ অ ২।৯৮-৯৯

৯। নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদের মূল কোথায়?

“অজ্ঞান হতে প্রাকৃত-পূজা এবং অতিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ। প্রাকৃতপূজা দুই প্রকার—অর্থাৎ অদ্বয়রূপে প্রাকৃতধর্মকে ভগবজ্জ্ঞান এবং ব্যতিরেকভাবে ঐ ধর্মের ভগবদ্বুদ্ধি। প্রাকৃতদ্বয়-সাধকেরা ভৌমমূর্তিকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন ; প্রাকৃত-ব্যতিরেক-সাধকগণ প্রকৃতির ধর্মের ব্যতিরেক ভাব-সকলকে ব্রহ্মা বোধ করেন—ইহারাই নিরাকার, নির্বিকার ও নিরবয়ব-বাদকে প্রতিষ্ঠা করেন।”

—‘উপসংহার’, কৃঃ সং

১০। জড়-তর্কনিষ্ঠা ও অতিজ্ঞানের ফল কি?

“অতএব নিরাকার ও সাকারবাদ, উভয়ই অজ্ঞানজনিত ও পরস্পর বিবদমান। জ্ঞানকে অতিক্রম করত যুক্তি তর্কনিষ্ঠ হইলে আত্মাকে নিত্য বলিতে চাহে না ; এই অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অনুগত হইয়া স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার নির্বাণকে অনুসন্ধান করে, এই অতিজ্ঞানজনিত চেষ্টা দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না।”

—‘উপসংহার’, কৃঃ সং

১১। থিয়সফিষ্ট-মত কি অদ্বৈতবাদের প্রকারান্তর নহে?

“আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে থিয়সফিষ্ট মত প্রচারিত হইতেছে, তাহাও অদ্বৈতবাদ। পণ্ডিতাভিমानी ব্যক্তিগণ যে মতের পোষকতা করেন, তাহাতে বিচার-শক্তিরহিত ব্যক্তিগণ কাজে কাজেই অনুমোদন করিয়া থাকে। অস্মদেশে দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাভিমानी ব্যক্তিগণ ঐ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজকাল বৈষ্ণবমত ব্যতীত অন্য সমস্ত মতই ঐ মতের অনুগত।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

১২। নাস্তিকতা ও নির্বাণবাদ কি চেতনের অস্বাস্থ্যলক্ষণ নহে?

“সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি (জীব) যখন নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করেন, তখনই কুতর্কদ্বারা ঐ বিশ্বাসকে ক্রিয়ৎপরিমাণে আচ্ছাদন করত হয় নাস্তিকতা, নয় অভেদবাদের অন্তর্গত নির্বাণবাদকে মনে স্থান প্রদান করেন। ঐসকল কদর্য্য বিশ্বাস কেবল অপ্রাপ্তবল চেতনের অস্বাস্থ্য-লক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে।”—চৈঃ শিঃ ১।১

১৩। অতিজ্ঞান বা অভেদবাদ কি সদ্যুক্তির নিকট দাঁড়াইতে পারে?

“সদ্যুক্তির দ্বারাও অতিজ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নলিখিত চারিটি বিচার প্রদত্ত হইল,—

১। ব্রহ্মনির্বাক্যই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা হইতে আত্মসৃষ্টি হইয়াছে, কল্পনা করিতে হয় ; কেন না, তিনি এমত অসৎ সত্তার উৎপত্তি না করিলে আর কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দোষ করিবার জন্য মায়াকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিলে ব্রহ্মোত্তর স্বাধীনতত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।

২। আত্মার ব্রহ্মনির্বাক্যে ব্রহ্মের বা জীবের কাহারও লভ্য নাই।

৩। পরব্রহ্মের নিত্য বিলাসসত্ত্বে আত্মার ব্রহ্মনির্বাক্যের প্রয়োজন নাই।

৪। ভগবচ্ছক্তির উদ্বোধনরূপ বিশেষ-নামক ধর্মকে সর্বাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সংস্থানের অভাব হয় এবং ব্রহ্মের অস্তিত্বেও সংশয় হয়। বিশেষ পদার্থ ‘নিত্য’ হইলে আত্মার ব্রহ্মনির্বাক্য ঘটে না।”

—উপসংহার’, কৃঃ সং

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত সকল জীবই হরিচরণ-সেবক। যাঁহারা ভগবানের চরণসেবা করেন তাঁহাদের সেবনধর্ম কম হইয়া আসিলে তাঁহাদের সঙ্গে প্রচুর সেবাধর্ম অবস্থিত কৃষ্ণভজানন্দীদের পার্থক্য হয়। ইঁহারা কোন সময় আধিকারিক দেবতা হন। যেমন ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিাদি করেন, সেই সমস্ত কার্য হরিভক্তির মুখ্য বিচার নহে। গৌণ-বিচারে তাঁহাদের যোগ্যতা আছে। ব্রহ্মা, রুদ্রাদি ভগবদাজ্ঞা পালন করেন, তাহা নিজসেবা হইতে পৃথক্। যাঁহাদের গুরুসেবাপ্রবৃত্তি ন্যূন হইয়াছে, তাঁহাদের হরিসেবা প্রবৃত্তি অধিক নাই। আধিকারিক দেবগণের আলোচনায় ইঁহার পরিচয়। দেবতা, মনুষ্য বা পশু হউন, সকলেই ভগবৎসেবক। তাঁহারা নিজ নিজ অধিকারোচিত অবস্থা লাভ করিয়াছেন। চেতনধর্ম ভগবৎসেবা ন্যূনাধিক আবৃত্ত হইয়া চতুর্দশ-ভুবনে আমাদের অধিষ্ঠান লক্ষিত হয়।

“স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।”

অন্তরঙ্গাশক্তিপরিণত নিত্যজগৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থিতির জ্ঞানলাভই জাগরর বা চেতনে উদ্বুদ্ধ হওয়া। শ্রুতি তাই তারস্বরে বলিতেছেন,—

“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।”

আত্মার বৃত্তি চালনা করিতে বলিতেছেন। আত্মা জাগিলেই হরিসেবা, নতুবা অন্য চিন্তা হইয়া যায়। নিজাভীষ্ট-সেবা লাভ করিয়া ধন্য হও।

‘হরিচরণ’-শব্দে যাঁহা সমস্ত বস্তুকে ধারণ করেন। পূজ্যের আলোচনায় শ্রীচরণাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। তাহাতে সেবনধর্ম আরম্ভ হয়। শ্রীহরির আকার, প্রকার, রূপ, গুণ, আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপাদি আলোচ্য। তাহা কিরূপে কোথায় পাওয়া যাইবে? ভগবান্ বলিতেছেন,—

“জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমম্বিতম্।

সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।।

বেদান্তভাষ্য ভাগবতের মধ্যে শ্রীহরির যাবতীয় রহস্য স্পষ্টীভূত রহিয়াছে। বিশেষ-জ্ঞানলাভ না হইলে তিনি স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত নিষ্কিয় কেবলজ্ঞানী হন। ‘বিজ্ঞান’ অর্থে বিশেষজ্ঞান বা অনুভূতি। ইহার অভাবে অজ্ঞান পুষ্ট হইলে সদানন্দবর্জিত ভাব। তখন সদানন্দের অন্তঃসূত জ্ঞানের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া মেপে নেওয়ার কার্যে অগ্রসর হইতে হয়। বাস্তববস্তুর বিরাগ বর্ণন করিলে এবং তাহাতে গুণ-লীলাদি বর্ণিত না হইলে নির্বিশেষ-ভাব আইসে। বিজ্ঞান—পরিকরবৈশিষ্ট্য। সম্বিদাভিমাণে জ্ঞাতৃত্ব বা জ্ঞেয়ের পরিচয় অগ্রাহ্য করিলে গুণময় জগতে আসিতে হয়। বিজ্ঞান, রহস্য, তদঙ্গ আলোচনা ব্যতীত শক্তি বা শক্তি-পরিণাম বুঝিতে পারা যায় না। চিচ্ছক্তি-পরিণত জগতে বৈচিত্র্য নাই, এইরূপ বিচার মন্দ প্রসব করে। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থশক্তির বিষয় চিন্তা না করিয়া বৈচিত্রে বাধা দিলে নির্বিশেষ চিন্তা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। ‘গৃহাণ গদিতং ময়া’। জ্ঞান কেবল জ্ঞাতার অধিষ্ঠানে রহিয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে অবতরণ করিলেই আমাদের অবগতির বিষয় হয়। আমাদের চিদিন্দ্রিয়ে প্রকাশযোগ্যতা আসে। বস্তুতে বিশেষ-ধর্মের আলোচনার অভাবে নির্বিশেষবাদের জন্ম।

জ্ঞানং যদাপ্রতিনিবৃত্তগুণোন্মিচক্র-

মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।

কৈবল্যসম্মতপথস্তথ ভক্তিযোগঃ

কো নির্বৃত্তো হরিকথাসু রতিং ন কুর্যাৎ ॥ (ভাঃ ২।৩।১২)

হরিকথা শুনিতে শুনিতে যে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে তাহাতে সর্বতোভাবে আসক্তি প্রবৃত্তির তরঙ্গসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ জ্ঞান উপস্থিত হইলে আত্মপ্রসাদ আপনি আসে। তাহাতে ইহলোকের ও পরলোকের বিষয়াসক্তি বিনাশ পায়। সেই জ্ঞানের ফলস্বরূপ কৈবল্যের দ্বারা প্রাপ্ত প্রেমসংজ্ঞক ভক্তিযোগও ঐ কথাগুলির শ্রবণ ফলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা করে না।

রহস্য ও অঙ্গের বিচার-গ্রহণ ব্যতীত কৈবল্য-বোধের বিকৃত ধারণা হয়। জগতে নানাভাবে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব বা বাধা উপস্থিত হয়। জ্ঞানের আবরণ উন্মোচন করিয়া তদীয় প্রকৃত অবস্থা দর্শন না করিলে নিরঙ্গবিচারের চিন্তাশ্রোতে অহংগ্রহোপাসনাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। যেকাল পর্য্যন্ত ভগবল্লীলা-কথা শ্রবণ না হয় ততকাল জাগতিক ধারণার মিশ্রণে অদ্বয় জ্ঞানের সিদ্ধি মনে করি। নিত্য জগতের আলোচনার অভাবে নির্বিশেষ-যুক্তি প্রবল হয়। সবিশেষ-বিচারে হরিচরণপ্রাপ্তি ঘটে। তদনন্তরে সেবা। ‘জ্ঞানং যদাপ্রতিনিবৃত্ত-গুণোন্মিচক্রম্’ গুণজাত জগতের বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতীব হেয়, সুতরাং ত্যাজ্য ; তাহাতে নির্বিশেষ পর্য্যন্ত গতি। ‘আত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।’ জ্ঞানের অনুপাদেয়তার অধিষ্ঠান উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞানানন্দের ক্রিয়া যাহাতে সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে উপস্থিত হয়, এমন কোন ব্যক্তি আছে যে সেই হরিকথা পরিত্যাগ করিয়া অনাপ্রতীতিতে ব্যস্ত হয়? ভক্তি ত্যাগপূর্বক অভক্তিস্থানে আসিতে কে অগ্রসর হয়? অজ্ঞানী অভক্তগণই গুণোন্মিচক্রে প্রতিনিবৃত্ত হইবার যোগ্য। বিজ্ঞানের সহিতই জ্ঞান সুষ্ঠুতা লাভ করে। অনুদ্ঘাটিত ব্যাপারকে উদ্ঘাটিত করাই প্রকৃত কার্য্য।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

তজ্জোষণাদাম্বপবর্গবর্জ্জনি শ্রদ্ধা-রতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ।।

বীর্য্যসংবিৎ—যাহাতে মহিমার সম্যক্ জ্ঞাপন হইয়া থাকে অর্থাৎ বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান হয়। সাধুর প্রকৃষ্ট-সঙ্গেই হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন শ্রীহরির বীর্য্যের যাবতীয় রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। তাহাতেই শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া ভাবভক্তির চরমপর্য্যায় পর্য্যন্ত উদয় হয়। বিজ্ঞানরহিত জ্ঞানে ভক্তির অস্তিত্ব থাকে না। বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞানেই প্রকৃত ভক্তির অবস্থান এবং তাহারই পর্য্যয়ে প্রয়োজনতত্ত্ব প্রেমের উদ্ভব।

অঙ্গ—তদ্রূপবৈভব। তটস্থশক্তির পরিণতি জীবে মিশ্রভাব। নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ-ভেদে জীবের অবস্থা দুই প্রকার। পূর্ণজ্ঞানময় পরমপুরুষের রহস্য-জ্ঞানের অভাবে নিরঙ্গ, অব্যক্ত প্রভৃতিতে বা নিরীশ্বর সাংখ্য বা কেবলাদ্বৈত-বিচারে প্রবেশ হইয়া থাকে। মায়া—প্রকৃতি। প্রকৃতিবাদী নাস্তিক। বৌদ্ধগণ মায়াবাদী এবং পঞ্চোপাসনা-প্রণালী-সৃষ্টির মূলকর্তা শঙ্করের মতও মায়াবাদ। ঐ মতাবলম্বী প্রচ্ছন্ন তার্কিক, মুখে বেদমানা সম্প্রদায়। তাহারা বেদ-প্রতিপাদ্য বিষুণ্কে স্বীকার করে না, আধিকারিক বিষুণ্ই স্বীকার করে। বৈষম্য-বিবর্জিত ব্রহ্মের তারতম্য তাহাদের প্রমাণের বিষয় হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষুণ্ই শ্রেষ্ঠ, পূর্ণতম। কেবল জড়গুণ-রাহিত্য বলিলে বিরজার অবস্থান হয় অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মলোক লক্ষ্য করা হয়, পরব্যোমের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। বিরজার গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা আছে। তাহারই স্থৌল্যবিচারে ভজনীয় বস্তুর সন্ধান নাই। বিরজার পরেই নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীদিগের স্থান। তদতীত হইয়া পরব্যোমে নারায়ণধাম ব্যুৎপত্ত্যুৎপত্ত্যুক্ত। সেই নারায়ণ চতুর্ভুজ, ব্যুহের একত্ব বিধায় মূলবৈকুণ্ঠের কর্তা স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্ব বলদেব প্রভুর বিলাস। বাস্তববস্তু—নন্দনন্দন। গুণজাত জগতের চিন্তায় যে-সকল নাম আছে, তাহা অভিন্ন নহে। গৌণ ও মুখ্যনামের বিচার-গ্রহণের আবশ্যিকতা আছে। ভগবদ্বস্তু নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার সহিত অভিন্ন। ভেদ মায়িক জগতে। হরিচরণ-সেবকের হরি ও নির্বিশেষবাদীর হরি পৃথগ্ বস্তু। শেষোক্তটী কাল্পনিক মাত্র, মানবচিন্তার একটা খেয়াল। তাহা ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে তদীয় তনুভা, অঙ্গকান্তি।

হরিচরণসেবা রতিপর্য্যয়ে পঞ্চভাগে বিভক্ত। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ব্যভিচারীর সম্মিলনে শাস্তাদি রসের উদ্ভব। মুখ্য রসপর্য্যায়ের শোভা সম্পাদনে গৌণরসগুলির পরিপোষকতা মাত্র। মুক্তজীবের ৫০ গুণ, দেবতার ৫৫ গুণ, নারায়ণের ৬০ ও কৃষ্ণের ৬৪ গুণ। শঙ্কর ‘উৎপত্ত্যসম্ভবধিকরণে’ পঞ্চরাত্র গর্হণ করিয়াছেন। তাহা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত মত। ভগবানের নিকট যাহাতে না পৌঁছিতে পারে তজ্জন্য তিনি আদিষ্ট হইয়া এইরূপে ভ্রান্তমতে মোহিত করিলেন।

‘হরি’ বলিলে কৃষ্ণ এবং বলদেব হইতে সমস্ত অবতারগণকে বুঝায়। গুণত্রয়ের বৈচিত্র্যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড। মর্য্যাদা-পথের পথিকগণের ন্যূনাধিক জড়ভাব বা আধ্যাত্মিকতার অনুসারে অবতারাবলীর আবিষ্কার। ‘হরি নির্গুণ’ বলিলে জড়জগতের গুণরাহিত্য বুঝায়। নির্বিকার নিরাকার ব্রহ্মের বা কেবল জড়গুণরাহিত বস্তুর চরণ নাই। ঈশ্বরে কদাপি দেহ-দেহী ভেদ নাই। হরিকে জড়জগতের ব্যাপার মনে করিলে, ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-পর্য্যয়ে গ্রহণ করিলে গোখর হয়।

“প্রাকৃত করিয়া মানে বিষু কলেবর।

বিষুণিন্দা নাহি আর ইহার উপর।।”

পঞ্চোপাসকের বিষ্ণুপূজা গোখরের বিষ্ণুপূজা।

“প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।”

“যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।

যন্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচ্চিদ্ধনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।

আপনাদিগকে অত্যন্ত জ্ঞানবান্ মনে করিয়া তাহারা যোগী, কন্মী বা জ্ঞানী হয়। ভক্তিযোগ-ত্যাগীদের এবংবিধ দুর্গতি। আধ্যাত্মিকতা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হরিসেবা। শ্রীগৌরসুন্দর-রামানন্দ-সংবাদে বিষয় যাঁরা বিশেষভাবে আলোচনা করেন তাঁহারা ভক্তির পর্যায়গুলি বুঝিতে পারেন। হরিই আরাধ্য। হরিকে ত্যাগ করিয়া অজ্ঞান নামক বিকারে প্রবেশ করিলেই সর্বনাশ। রসেই হরিসেবা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রসদ্বারাও হরিদাসগণের প্রকারভেদ।

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্বসাগরস্য।

সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু।।

যোষিৎ ও যোষিৎসঙ্গীর দুঃসঙ্গ কদাপি যেন আমাদের গ্রাস না করে। নিত্য-ব্রজবাসিগণকে আক্রমণহেতু জড়ের প্রকৃতি-জনগড্ডলিকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে গুরুপদে যে সমস্ত লোক বরণ করিয়াছে, তাহাদের দৌরাভ্যের হাত হইতে মুক্তির প্রয়োজনীয়তা সর্বত্রই অবতারণার সমূহের প্রদর্শিত গৌরব প্রাকৃত গৌরব মনে করিলে নিতান্ত অমঙ্গলে প্রবেশ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণাশ্রিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলেই বিকৃত বা বিরোধী। হরিসেবা ব্যতীত চন্দ্রদর্শনে নিজের শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনে চন্দ্রকারের বৃত্তিই প্রদর্শিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগতজনের কেবল ঐ বিচার হইতে নিষ্কৃতি দৃষ্ট হয়।

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা

যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুনিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।

জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-

মাবিক্ষুব্ধতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ।।

শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিযোগের আবিষ্কার করিলে প্রকৃত বিষয়-রসে মগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের বিবাদ ছাড়িলেন। যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ুকে নিরোধ করিবার সমস্ত প্রক্রিয়াকে বর্জন করিলেন। তাপসেরা তপস্যা পরিহার করিলেন। জ্ঞানসন্ন্যাসী নির্ভেদব্রহ্মের অনুসন্ধান ত্যাগ করিলেন। কেবল ভক্তিরসই তখন জগতে দৃষ্ট হইত, অন্য কোন রস প্রকাশিত ছিল না। হরিচরণ-সেবকের একমাত্র আশ্রয় শ্রীচৈতন্যের মার্গাবলম্বন। তাহাতেই বৃন্দাবনের সমস্ত বৃক্ষলতা-গুল্মাদির জন্ম প্রার্থনীয় হইবে। তখন শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করিতে পারা যাইবে।

আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধিনাম্।

যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথং চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রতিভির্বিমৃগ্যাম্।।

সমস্ত শ্রুতি যে মুকুন্দের চরণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, সেই চরণ আশ্রয়ের জন্য যে গোপীবর্গ আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব, এমন কি, আর্য্যদিগের ধর্ম্মপথ, যাবতীয় শ্রীলতা-ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, সেই গোপীদিগের চরণধূলির সেবক তরু-গুল্ম-ঔষধির মধ্যে যেন আমার জন্মলাভ ঘটে ; এই প্রার্থনাই পঞ্চম পুরুষার্থের শেষ সীমা।

আততায়ী

‘আততায়ী’ বলিতে সাধারণতঃ বধোদ্যত, অনিষ্টকারী, আক্রমণকারী প্রভৃতি ব্যক্তিকে বুঝায়। নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণিধনাপহঃ।

ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়্ভেতে আততায়িনঃ ॥

“অগ্নিদ (যে ঘরে-আগুন দেয়), গরদ (যে বিষ দেয়), বধার্থ অস্ত্রধারী, ধনাপহারী, ভূমি অপহারী, অপরের দারাপহরণকারী—এই ছয়জন আততায়ী।” “অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিনের ন্যায় আততায়ীর নিকট ইহলোক পরলোক দুইলোকই সমান, যেহেতু সে অসৎ উপায় অবলম্বনে জড়ীয় সুখবাঞ্ছা করিতে গিয়া সর্বদা উভয়লোকেই অশেষ দুঃখ লাভ করে এবং অন্তিমে কঠোর যাতনা ভোগ করিবার জন্য যমদূতগণকর্তৃক ভয়াবহ নরকসমূহে নিক্ষেপিত হয়। যে নিরুণ্য ব্যক্তি পরের প্রাণ বধ করিয়া নিজকে পরিপোষণ করে, তাহার নিধন-দণ্ডই তাহার পক্ষে মঙ্গল, যেহেতু প্রায়শ্চিত্তহীন পাপফলেই সেই মানব অধোলোক প্রাপ্ত হয়। পরগৃহে অগ্নিদানকারী, দস্যুবৃত্তিকারী, বিষপ্রদানকারী সারমেয়াদন নরকে পতিত হয়। সাতশত সংখ্যক যমানুচর কুকুর তাহাদের বজ্রতুল্য দন্তের দ্বারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত পাপীকে ভক্ষণ করে। ধনাপহারী সূচীমুখ নরকে পতিত হয়। যমদূতগণ ঐ ধনপিশাচ পাপীকে সর্বাপেক্ষে তত্ত্ববায়ের ন্যায় সূত্র বয়ন করে। পরদার হরণকারী তামিশ্র নরকে পতিত হয়। এই স্থান ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। এইস্থলে ভোজ্য ও পানীয় অভাবে এবং দণ্ড, তাড়না ও তর্জনাতির যাতনায় সর্বদা পীড়মান থাকিতে হয়। আততায়ীর ভোগ করিবার জন্য যে অনেক প্রকার যাতনাময় নরকসমূহ রহিয়াছে তাহা শাস্ত্রের বর্ণনা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।

আততায়ীদের কর্তব্যাকর্তব্য বিচার নাই, স্বার্থসুখই তাহাদের জীবনের সর্বস্ব। ‘বোপ বুঝে কোপ মারা’ অর্থাৎ অবসর বুঝিয়া কার্যসাধন করিবার চেষ্টার মধ্যে তাহাদের কোন ক্রটি নাই। যেরূপ মিছরি মাখানো ছুরির উপরিভাগ মিষ্টরসযুক্ত, কিন্তু ভিতরে প্রাণঘাতক শক্তি, তদ্রূপ আততায়ী মুখে মিষ্ট কথা বলিয়া অপরের অনিষ্ট অর্থাৎ সর্বনাশ সাধনের চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করে। “এই শত্রুটিকে নাশ করিলাম, অন্যন্য শত্রুগণকে শীঘ্র নাশ করিব ; আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই স্নিগ্ধ, আমিই বলবান, আমিই সুখী”—ইহা চিন্তাপূর্বক তাহার হিংসার আগুন লইয়া খেলা করিতে গিয়া হিংসার আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। যাহারা অধিক পণ ও অধিক সুদ গ্রহণের মাধ্যমে গরীবকে সর্বশাস্ত করিয়া নিজেদের লাভের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতে চাহে, তাহাদের কি উপাধি দেওয়া যাইতে পারে? উপোসী ছারপোকা যেরূপ সুযোগ পাইলেই প্রাণ ভরিয়া রক্ত শুষিয়া লয় ; তদ্রূপ আততায়ী ছলে বলে কৌশলে নিজের স্বার্থ পরিপূর্ণ করিতে গিয়া জঘন্য কৰ্ম্ম করিতে দ্বিধা বোধ করে না। এমন কি, জিনিসের অধিকারীর নিকট হইতে কোন জিনিস চাহিয়া লইয়া তদ্বারা তাহারই অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইতে তাহাদের বিবেকে বাঁধে না।

মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হইলে সেই কুকুরের দংশনে যে রূপ সাংঘাতিক রোগ হইবার সম্ভাবনা ; তদ্রূপ স্বার্থসিক্তির জন্য যাহারা অন্ধ হইয়াছে তাহাদের দ্বারা সমাজের অশেষ ক্ষতি অনিবার্য। পিপীলিকার পাখা বাঁচিবার জন্য উঠে না, মরিবার জন্যই উঠে। লোভের ডানায় ভর করিয়া অনিষ্টকারী ব্যক্তি সুখলাভের চেষ্টা করে, কিন্তু পরিণামে তাহার রাশি রাশি দুঃখই লাভ হইয়া থাকে। আগাছার বাড়ি অধিক হয় যে রূপ পতনের জন্য, তদ্রূপ সমাজবিরোধীদের দৌরাভ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নিজেদের ধ্বংসের নিমিত্তই।

আততায়ী অত্যন্ত মূঢ়, যেহেতু সে গৃহে আসক্তচিত্ত, পুত্র ও ধনৈষণায় আতুর এবং স্ত্রৈণ ও অলসমতি, ‘আমি’ ‘আমার’—এইরূপ জ্ঞানে বদ্ধ হয়। শ্রীভাগবতে (১১।১৭।৫৭-৫৮) পাওয়া যায়,—“গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাাদিগকে সর্বদা ধ্যান করে এবং অসৎকর্মের জন্য মৃত্যুর পর ‘অন্ধ’ নামক অতিমিসী যোনিতে প্রবেশ করে।” আততায়ীকে ক্রুর সর্পের সহিত তুলনা করা হয়। সর্পের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে সর্প মানুষের কোন ক্ষতি করিতে পারে না, কিন্তু আততায়ীকে শত সহস্র সদুপদেশ প্রদান করিলেও অসৎকর্ম হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত করা যায় না। চাণক্য বলিয়াছেন,—

সর্পঃ ক্রুরঃ খলঃ ক্রুরঃ সর্পাৎ ক্রুরতরঃ খলঃ।

মন্ত্রৌষধি বশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্যতে।।

“সর্প নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। কিন্তু দুর্জ্ঞান তদপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুর। সর্পকে মন্ত্র ও ঔষধের দ্বারা বশ করা যায়, কিন্তু স্বভাব-দুর্জ্ঞানকে কোন কিছুর দ্বারাই বশে আনা যায় না।” মাছের শোকে বিড়ালের ক্রন্দন যেমন হাস্যকর ব্যাপার, তেমনই স্বভাব-দুর্জ্ঞানের অপরের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করা অত্যন্ত অবাস্তুর কথা। স্বভাব-দুর্জ্ঞান জিলিপির প্যাঁচের ন্যায় কুটিল মনের সাহায্যে দুঃখের ভাণে অপরের সর্বনাশের চিন্তা করিয়া থাকে। জ্বলন্ত আগুনে ঘি প্রদান করিলে যে রূপ আগুন নিভিবার পরিবর্তে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ যাহারা শান্তিলাভের নিমিত্ত অসৎ উপায়কে অবলম্বন করে, তাহাদের শান্তির পরিবর্তে অশান্তির অনলই লাভ হয়। ক্রুর ও স্বভাব-দুর্জ্ঞান ব্যক্তিগণ সর্বদা ভক্ত ও ভগবানের বিদ্বেষ করিয়া থাকে। সেই বিদ্বেশী নরাদমগণ এই সংসার-মধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং জন্মে জন্মে ভগবানকে লাভ করিতে না পারিয়া দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হওয়া ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন গতি নাই।

দুর্যোধনের মামা শকুনি অত্যন্ত অসৎপ্রকৃতির ছিলেন। তাহারই প্ররোচনায় ও পরামর্শে দুর্যোধন ধর্মভীরু পাণ্ডবগণকে নানাপ্রকারে নির্যাতিত করে, ইহার ফলে দুর্যোধনের সর্বনাশ হয়। শকুনির ন্যায় কুমন্ত্রণাদাতা সর্বনাশকর ব্যক্তিমাট্রেই ‘আততায়ী’। দুঃসমিতি অশ্বখামা নিজ প্রভু দুর্যোধনের বা নিজের উভয়ের কাহারও প্রয়োজন সিদ্ধ না করিয়া অকারণে দ্রৌপদীর নিদ্রিত পঞ্চ শিশুসন্তানকে হত্যা করিয়া ‘আততায়ী’ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছিল। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌরবপক্ষীয় সেনাগণকে আততায়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। শাস্ত্রমতে

আততায়ী বধে কোন পাপ নাই (মনুসংহিতা ৮।৩৫০-৩৫১)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (ভাঃ ১।৭।৫৩) “ব্রহ্মবন্ধূর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ” শ্লোকে বলিয়াছেন,—“ব্রাহ্মণ অধম হইলেও বধ্য নহেন, পক্ষান্তরে শস্ত্রপাণি প্রাণঘাতক আততায়ী বধ্যযোগ্য।” যাহারা ‘নিজের নাক কাটিয়া অপরের যাত্রা ভঙ্গ’ করে অর্থাৎ নিজের যত ক্ষতি হউক না কেন, অপরের কিছুতেই মঙ্গল হইতে দিব না—এই সর্বনাশা চিন্তাধারায় মগ্ন থাকে তাহাদের হইতে দূরে অবস্থান না করিলে অমঙ্গল অবশ্যস্তাবী। ‘ন্যাড়া ছাদে ঘুড়ি উড়াইতে’ অর্থাৎ ভয়াল সংসারারণ্যে চিরকাল অবস্থানপূর্বক অশেষ দুঃখ ভোগ করিবার জন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাহাকেও উপদেশ করেন না। জগতের তথাকথিত বন্ধুবর্গও ‘আততায়ীর’ মধ্যে পরিগণ্য, যেহেতু তাহারা তাহাদের মৃত্যুপথের পথিক করিবার জন্য আপাত-প্রীতিপ্রদ কার্যেই আমাদিগকে উৎসাহিত ও প্রমত্ত করিয়া তোলে। যাহারা ভবব্যাদি পোষণ করিয়া রাখিবার জন্য দরদ দেখায়, জগতের লোক তাহাদিগকে আত্মীয় ও বন্ধু বলিয়া মনে করে। কেহ কেহ আবার বন্ধুর নামে নির্বিশেষবাদের আশ্রয় লইয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করে। সাধুগণ কুসিদ্ধান্তের অস্থিরতা ও ভ্রম হাতে-কলমে দেখাইয়া দিলেও কিছুতেই কুতর্কিকগণ নিজেদের ভ্রম স্বীকার করিতে চাহে না, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। এই দুরন্ত কলিকালে সাধুগণের সঙ্গ ব্যতীত আততায়ীর উদ্যত হিংসারূপ খড়া হইতে বাঁচিবার অন্য কোন উপায় নাই। সাধুগণের উপদেশ আপাত অপ্রিয় তিক্ত মর্ম্মভেদী হইলেও তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগের নিত্য মঙ্গল বরণ করা উচিত।

—ত্রিদিগ্গিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

বিষ্ণুমায়া

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮০ পৃষ্ঠার পর]

যেই সংসারে কাহারও একটা পুত্র জন্মিল, অমনই আনন্দে উন্মাদ হইয়া পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে ডাকিয়া আনিয়া, গৃহস্থ মহাধুমধাম আরম্ভ করিয়া দিল। পাড়ার মেয়েরা আসিয়া সকলেই একত্রিত হইয়া সুমধুরস্বরে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, আহা রে, আমাদের নরুর (নরেন্দ্রের) কি ভগ্নি গো! এমন সোণার চাঁদ আর কাহারও হয় না, মরি মরি কিরূপ যেন কাঁচা সোণা, যেন রাজপুতুর, কি হাসি ওমা! কি চেকনাই গো ছেলের কপালে যেন রাজটীকা জ্বলছে—আহা ষাট ষাট লক্ষীর ষাট শত্বরের মুখে ছাই দিয়ে আমার সোণার চাঁদ খোঁকা বেঁচে থাকুক, আমার চুলের সংখ্যা যত তত বৎসর পরমাই হউক, রাজহস্তী ছুটলেই খোকাকে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসাবে তাহলে মায়ের কোন দুঃখই আর থাকবে না। রাজার মা হয়ে আনন্দে মনের সুখে কাল কাটাবে।

ছেলে হয়েছে শুনে সবাই আনন্দে আটখানা, কিন্তু এর পরিণাম যে কি ভীষণ! তা কেউ একবার ভাবলে না। কেবল উলুধনি। আর খোকা হওয়াতে হাস্যের ফোয়ারা ছুটিতেছে, কি আনন্দের হাটই আজ মিলেছে। ক্রমে ক্রমে প্রতিবাসিনীরা তৈল, পান,

সিন্দুর লয়ে যে যার বাড়ীতে প্রস্থান করিলেন। ইহার দু'দিন বাদেই ছেলেটি যখন বিসৃচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তখন এই ছেলের মা-ই আনন্দের পরিবর্তে পুনরায় শিরে করাঘাতপূর্ব্বক যখন—হারে আমার বাপরে, আমার যাদুরে, কোথায় গেলিরে আমার বাছাধন রে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন শুরু করিয়া দিলেন, অমনই কোন প্রতিবেশিনী আসিয়া (চক্ষে জল না আসিলেও, চক্ষে অঞ্চলাবৃত করিয়া) নাকি সুরে কাঁদ কাঁদ সুরে খোকার মাকে বুঝাইতে লাগিলেন। আ-হা-হা বোন, সবে একটীমাত্র সোণার চাঁদ ছেলে কি হল—এমন সর্ব্বনাশ কারো কি কখনও হয়, পোড়া বিধাতার চোখে এত সুখ সহিবে কেন? এমনি করে মাথায় বজ্র হানতে হয় গা, অসময়ে নিয়ে গেল গো—অসময়ে নিয়ে গেল ! আ-হা-হা! প্রাণভরা ছেলে গো—প্রাণভরা ছেলে, এমন সোণার চাঁদ এমনটী আর কখখনো হবে না। আমরা সব আশায় ছিলাম, পরীর এমন (পরিমলের) এমন সোণার চাঁদ খোকা হল, আমরা সব এসে আহোদ আহুদ করব, পোড়া বিধাতা তাতেও বাদ সাধলে। দুদিন বাদে ছেলের অন্তপ্রাশন হবে, তারপর চূড়ো, পৈতে, বে-থা, আরও কত কি, আমরা দশজনে সাধ আহুদ করব—মরণ আর কি এরই মধ্যে কোথেকে পোড়া যম এসে সুখের মুখে ছাই দিয়ে সব আশায় বঞ্চিত করলে। যে পরের সুখ দেখিতে পারে না তার ভাল কখখনো কোন কালে হবে না—একথা আমি জোর করে বলতে পারি—একশবার বলবো আর যমের মুখে ঝাঁটা! (ভেউ ভেউ করে ক্রন্দন) দেখ বোন, বিধাতার কি ইচ্ছে, সবই অদেষ্ট! অদেষ্ট মন্দ হলে কেউ কারো সুখ দিতে পারে না, এই দেখ না বোন ওপাড়ার হরিষ মুখুয়ো তার এমন দুগ্গা পিত্তিমের মত বউটী দেখতে দেখতে কলেরা হয়ে যমের মুখে চলে গেল। দুঃখের কথা আর বলব কি অমন কাঁচা সোণার মত রং চিতার আঙনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সাথে কি আর কান্না পায়, বিচার নাই, পোড়া বিধাতার বিচার নাই, সময় অসময় বুঝবে না, কোথেকে কার কোন সর্ব্বনাশ করে বসবে, তার ঠিক নাই। আজ রাজরাণী, কাল হয়ত' পথের ভিখারী হয়ে ভিক্ষে করছে। সবই বিধাতার লীলা, তা না হলে আজ এ সর্ব্বনাশ হয়? যা, এই দেখনা ভুল হয়ে গেল, কি বলছিলুম—ঐ হরিষ মুখুয়োর কথা, তার বউ ত' গেলই, তারপর (অশ্রুপাত করিতে করিতে) সে কথা কি আর বলিতে পারি বোন, সে কথা বলতে বুক ফেটে যাচ্ছে, একে একে মা গেল, বোন গেল, মেয়ে গেল, ভাই গেল, বাপ গেল, কেউ রইল না দিদি! সকলকেই যমের মুখে দিয়ে বসে আছে। এখন পেট ত' সঙ্গে আছে, যাও বোন ওঠ! চট করে স্নান করে এস, দুটো মুখে দাও, এমন করে আর কয়দিন শরীর টিকবে বল?

তাই বলছি সবই মায়া, এ মায়িক সংসারে কেহ কারও নয়, সবই দু'দিনের জন্য, কেবল ভগবানের সেবাই নিত্য। তাঁহার সেবা ভুলিয়া জীব মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এই সংসারে ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতেছে।

কেহ রাজা, কেহ রাণী, কেহ মন্ত্রী, কেহ হাকিম, কেহ খানসামা, কেহ মেথর, কেহ ছোট, কেহ বড়—এইরূপ মায়ার মুখোস পরিয়া স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়াবীশ ভগবান্ বিমুগ্ধকে ভলিয়াই জীবের এই দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

কোন ভামিনীও স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার শবদেহের সম্মুখে সকলের অজ্ঞাতসারে ক্ষিপ্ৰহস্তে অতি সন্তুর্পণে পাছে সাধের নেকলেস্‌টী ভাঙ্গিয়া যায় (যাহা সন্মাত্র নূতন প্রস্তুত হইয়াছে) এই আশঙ্কায় হার, বালা, অনন্ত মাকড়ী কুমকা, নঁথ ইত্যাদি অলঙ্কারগুলি খুলিয়া—পরিশেষে—ওগো আমার কি হল গো—আমি কোথায় যাব গো, আমার আর কেউ নাই গো—আমার কি উপায় হবে গো! আমার আশা-ভরসা সব গেল গো! হায়! হায়!! পোড়া বিধির মনে এই ছিল গো, কোথায় গেলরে আমার ইত্যাদি শব্দে বিনাইয়া বিনাইয়া পাড়াগুদ লোককে জড় করাইয়া নিজের পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন।

একমাত্র বিষুভক্তি বিনা সবই মায়া, মায়ার খেলা এই রক্ত-মাংসপিণ্ড-চামড়ার খলিকে ভোগ্যবুদ্ধি করিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া—আমি আমার করাতে জীবকুলের বিষম অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। এই মায়ার ভেকি হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে যাহার মায়া অর্থাৎ গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

দেখনা ছোট ছোট মেয়েরা খেলাঘর করে পুতুল খেলা করে, যেন সত্য সত্যই পুতুলের ওপর কত টান—এক দণ্ড না দেখিলে প্রাণ ছুঁফুঁ করে। কখন বা পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে, গুরকী ইটের গুড় দিয়ে অন্ন তৈরী করে ভোগ সাজাচ্ছে, চৈপাতা দিয়ে দধি, মাটির সন্দেশ, মাটির পায়ের দিয়ে পুতুল জামাইকে নানা উপকরণ দিয়ে খাওয়াচ্ছে। পরিশেষে ছোট পাক্কী এনে কনেকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে আনন্দে হাবুডুবু খাচ্ছে। বালিকাদের পুতুলখেলাতেই আনন্দ, কিন্তু এ পুতুলখেলা বই ত' নয়, এতেই এত আনন্দ। আর যখন ঐ মেয়েটি বড় হয়ে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরালয় যাইবে তখন ঐ সাধের পুতুলগুলি পেটরায় তুলিয়া পুতুলের পরিবর্তে নিজেই কনে সাজিয়া পতির সংসারে ঘরকন্না করিতে যাইবে। তখন এ সুখ এ আনন্দের তুলনায় পুতুলখেলার যে আনন্দ কিছুই নয়, তাহা বোধগম্য হইবে। তদ্রূপ আমরা সকলেই এইরূপ মায়ার সংসারে আসিয়া সকলেই ভোক্তা হইয়া (পুরুষ-অভিমনে) পুরুষ সাজিয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি জাগতিক সুখসমূহের আমিই একমাত্র ভোক্তা অর্থাৎ কর্তা সাজিয়া পূর্বোক্ত বালিকাদের মত পুতুলখেলা করিতেছি। কিন্তু যখন সদগুরুকৃপায় আমার আবরণ উন্মোচন হইবে তখন দিব্যনয়নে দেখিতে পাইব আমরা সকলেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য অর্থাৎ প্রকৃতি। নিজে প্রকৃতি হইয়া কি-প্রকারে অন্য প্রকৃতিকে ভোগ করিতে পারে? ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এই ভ্রান্তি এই মায়া যখন আমরা গুরুকৃপায় জানিতে পারিব তখন সেই আরাধ্য প্রিয়তম সর্বপ্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণপতি বলিয়া চিনিতে পারিব। পূর্বোক্ত বালিকা যেমন প্রথমে পতিকে দেখে নাই, কিন্না চিনে নাই, কিন্তু ঘটক যেমন সম্বন্ধ স্থির করিয়া ঐ বালিকার বরকে সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন, সেইরূপ গুরুরূপী ঘটক আমাদের প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করাইয়া দিবেন। শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণই ভক্তিরূপ অভিধেয় এবং শ্রীকৃষ্ণই প্রেমরূপ প্রয়োজন তত্ত্ব; যেমন বালিকা প্রথমে প্রণয়ের ভালমন্দ কিছুই বুঝিতে পারে না, কিন্তু যখন ঐ বালিকা যুবতী হয়, তখন যেমন কেহ ঐ যুবতীকে পতিকে কি-প্রকারে সেবা করিতে হয় তাহা অন্যে না বুঝাইলেও নিজে নিজেই বুঝিতে পারে যে কি-প্রকারে সর্বাস্ত্র দিয়া প্রাণপতির সেবা করিতে হয় তদ্রূপ “হৃষীকেশ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরূচ্যতে।”

সর্ব ইন্দ্রিয়ের পতি শ্রীকৃষ্ণকে সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা কি-প্রকারে সেবা করিতে হয়, তাহা আমরা গুরুরূপা সখীদ্বারা অর্থাৎ যিনি গুরুদেব তিনি সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা কি-প্রকার ভগবানকে সেবা করিতেছেন, আমরা তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়া যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা প্রাকৃত জগতে দেখিতে পাই কোন ধনী লোককে তুষ্ট করিতে হইলে তাহার পুরাতন ভৃত্যের নিকট গিয়া আমাদের সবিশেষ জানিতে পারিলে ঐ ধনবান্ প্রভুকে তুষ্ট করিতে পারি, তদ্রূপ জগতের স্বামী যিনি তাঁহাকে তুষ্ট করিতে হইলে যিনি সর্বদা সেবায় নিযুক্ত আছেন এমন যে গুরুদেব তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করিলে কি-প্রকারে তাঁহার সন্তোষ সাধন করিব? অতএব শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণের কি-প্রকারে সেবা করিতে হয় জানিতে পারিব, তখন সেবানন্দে মত্ত হইয়া দিবানিশি তাঁহার সেবা করিতে থাকিব।

এ সংসারে আমরা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বাস করি সত্য, কিন্তু এ সকলই অনিত্য, নশ্বর অর্থাৎ জড়। কারণ, এ আনন্দ ক্ষণিক মাত্র, দুদিনের জন্য মাত্র, চিরস্থায়ী নহে। ইহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কখনই সম্ভবে না, আজ আছে কাল নাই। ইহার দৃষ্টান্ত নিম্নে দিতেছি, যথা—

এক বন্ধুর সঙ্গে পথে আমার সাক্ষাৎ হইল, আমি বন্ধুকে দেখিয়া নমস্কার দিলাম, তিনিও প্রতি নমস্কার করিলেন, ‘ভাল আছেন ত?’ বলিলে তিনিও যে ‘আজ্ঞে, ভাল আছি’ বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই রহিল না। ইহা জড় সম্বন্ধ; সেইরূপ পিতা-মাতা যে সন্তানকে স্নেহ করেন অথবা সন্তান যে পিতামাতার প্রতি ভক্তি করেন, প্রত্যেকের ভিতরেই প্রচ্ছন্নভাবে কিছু না কিছু স্বার্থের সংস্রব আছে।

আমরা এই সংসারে কত প্রকার অনর্থই না দেখিতে পাই। স্বামী স্বার্থের প্ররোচনায় স্ত্রীকে ভোগ্যবুদ্ধি করিয়া কত প্রকারেই না লাঞ্ছনা প্রদান করেন। তাহার পরিবারও সময় বুঝিয়া স্বার্থের খাতিরে অলঙ্কারাদি আদায় করিবার ছলে কপট ভক্তি দেখাইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতেছেন।

কোন পুত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিম্নস্থিত পিতার প্রতি অবজ্ঞাভাব প্রদর্শন করেন, কেহ বা নিজহস্তে পিতাকে বন্দী করিয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেছেন। কোন ভৃত্য অর্থলোভে স্বীয় প্রভুকে সংহার করিয়া তাহার আজীবন সঞ্চিত অর্থরাশি হরণ করিয়া প্রস্থান করিতেছে। এক সখা অন্য সখাকে বিষপান করাইয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিতেছে। সর্বত্রই এই ভাব। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই মায়িক সংসারে যে শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাব আছে তাহা সমস্তই অনুপাদেয়, হেয়, নশ্বর, কিছুতেই ইহারা শাস্ত চিরস্থায়ী অবিনশ্বর সুখ প্রদান করিতে পারে না, যেহেতু ইহারা সকলই জড় উপাদানে নির্মিত। পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তিভাজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একস্থানে গাহিয়াছেন,—

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব-মীন!

নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন ॥

অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হ'য়ে মায়া-পাশে।

রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড যথা পরাধীন।।

এখন ভকতিবলে, কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু-জলে।

ক্রীড়া করি' অনায়াসে, থাক তুমি কৃষ্ণধীন।।

অতএব যখন গুরুকৃপায় এই মায়িক প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যে বৈকুণ্ঠানন্দের সন্ধান করিতে পাইব তখনই নিত্য সুখ যে কি, তাহা আশ্বাদন করিতে সমর্থ হইব। সেই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বৈকুণ্ঠরাজ্যে সকলই চিন্ময়। বিগত হইয়াছে কুণ্ঠা-ধৰ্ম্ম যাহাতে, তাহাই বৈকুণ্ঠবস্তু। ইহা নির্দোষ এবং আনন্দময়। তদুপরি মাধুর্য্যময় গোলোক-বৃন্দাবনে সকলই নিত্য আনন্দে বিরাজমান। এখানে মায়িক জগতের কোন অবরতা বা হেয়তা নাই, সমস্ত উপাদেয় ও চিন্ময়। এখানেও শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাব আছে, তাহা নিত্য ও চিরস্থায়ী। মায়িক জগতে যেমন জন্ম, জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক, হাহাকার প্রভৃতি ত্রিতাপজ্বালায় জীবকুল সর্বদা অস্থির, এখানে সেইরূপ নয়, এখানেই সমস্তই সুখময়—সুখময় বৃন্দাবনে কোন অভাব নাই, এস্থান দিব্যজ্যোতিতে পরিপূর্ণ—পৃথিবীস্থ চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, তারকা এবং বিদ্যুতের প্রভায় এস্থান আলোকিত নহে। এস্থান স্বয়ংপ্রকাশ কোটি সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল আর কোটিচন্দ্রসম সুশীতল চিদানন্দভূমি। এখানে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক অশাস্তি কিছুই নাই, আছে নিত্যানন্দ। সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় সকলেই আনন্দময় ও চৈতন্যময়। এস্থানে যমুনা নদী প্রেমে উজান বহিয়া যায়, ভূমি চিন্তামণিসদৃশ, কানন, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প সমস্তই মধুময়। এখানে সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ পরিচারিকা। তাহাতে নানাভাবে নানা উপকরণে সকলেই মনপ্রাণে সেবা করিয়া সেবানন্দে মগ্ন আছেন। হুাদিনীশক্তি পরিবেষ্টিত পরমপুরুষ ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, গোপ, গোপী, সখাগণসহ ব্রজধামে নিত্যলীলা করিয়াও জগতের হিতের জন্য পরিকরসহ এ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন।

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।

কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।।

যাহার ভক্তিচক্ষু আছে তিনিই দিব্যদৃষ্টিদ্বারা তাঁহার এ প্রপঞ্চময়ী লীলা শ্রীগুরুকৃপায় দেখিতে পারেন। এ নিত্যানন্দধামে নিরানন্দ বলিয়া কোন বস্তু নাই।

এ স্থানে সনক-সনন্দন মুনিবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন, রক্তক, পত্রক প্রভৃতি দাসগণ দাস্যভাবে সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম প্রভৃতি রাখালগণ সখ্যভাবে সেবা করিতেছেন। নন্দ-যশোমতী প্রভৃতি বাৎসল্যভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিতেছেন। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনাগণ মধুরভাবে সৰ্ব্বাঙ্গদ্বারা সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সেবা করিতেছেন।

ধবলী, শ্যামলী প্রভৃতি গোবৃন্দ, রাখালগণ, বেত্র, বেণু, বিশান সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভগবানের সেবায় দেহ-মন সমর্পণ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু মধুর ভাবই ব্রজে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব। যেমন আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, অনলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস পৃথিবীর গুণ ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ

যেমন ক্রমান্বয়ে পর পর অবস্থিত আছে তদ্রূপ এক মধুর ভাবেই পরপর শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচভাব, বাৎসল্যের লালন ও পালন, কান্ত্যভাব অর্থাৎ মধুরভাবে সর্ব্বদা দিয়া সেবা—এই পঞ্চবিধ ভাবই মধুর রসে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই ভাবই ব্রজে শ্রেষ্ঠ ভাব। অতএব পরিশেষে বক্তব্য এই যে, একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারা এই দৈবী বিষ্ণুমায়া হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিত্যকালের জন্য গোলোকে নিত্যসেবা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব।

জিজ্ঞাসা—সমাধান

১। দীক্ষা কয় প্রকারের হয় ও কি কি?

দীক্ষা তিন প্রকার, যথা,—বৈদিকী, পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী।

(ক) বৈদিকী :—পূর্ব্বের কস্মী শ্রীঅনিরুদ্ধ ভট্ট ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববিদগণের মতানুসারে বৈদিকী পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। তৎপরে ভীমভট্ট, গোবিন্দানন্দ ভট্ট, নারায়ণ ভট্ট, জয়দেব ভট্ট প্রভৃতি ভট্টবৃন্দ কস্মীগণের জন্য পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ জন্মগত ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে যে দীক্ষা হয়, তাহাকে বৈদিকী দীক্ষা বলে। কিন্তু “শ্রীভগবৎ ধর্মানুষ্ঠিতা বৈদিকী পদ্ধতিঃ কস্ম পদ্ধতিভ্যোহতিশয় শ্রেষ্ঠতমা।” অর্থাৎ সকল কস্মীগণের মত অপেক্ষা শ্রীভগবৎকস্মিনিষ্ঠগণের মত শ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রীভগবৎকস্মে অনুষ্ঠিত বৈদিকী পদ্ধতি কস্মি-পদ্ধতিসমূহ হইতে অতিশয় শ্রেষ্ঠ। যোগ্য ব্যক্তিই বৈদিক প্রয়োগের অনুষ্ঠান করেন।

(খ) পৌরাণিকী :—শিষ্যের যোগ্যতা দেখিয়া “শুদ্ধান্তঃকরণমিতি বিচারেণ”—বিচার করিয়া যে দীক্ষা দেওয়া হয়, তাহা পৌরাণিক। যথা,—ধ্রুব। শ্রীনারদ গোস্বামী ধ্রুবকে এই দীক্ষা দিয়াছিলেন।

(গ) পাঞ্চরাত্রিকী :—পঞ্চরাত্র সাত্বত শাস্ত্রবিশেষ। তাহার শাসন অনুসারে যে দীক্ষা তাহা সাধারণতঃ তিনপ্রকার—১। বৈদিক, ২। পৌরাণিক ও ৩। পাঞ্চরাত্রিক।

বৈদিক ও পৌরাণিক পূর্ব্বের বলা হইল। পাঞ্চরাত্র-শব্দে পাঁচটি জ্ঞানবিষয়ক প্রণালী। “রা” ধাতুর অর্থ দান করা। পাঞ্চরাত্র বিষয়ক কথা যে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়, তাহাই পাঞ্চরাত্র। জ্ঞানবচনই ‘রাত্র’। জ্ঞান পাঁচপ্রকার। তজ্জন্য পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রকে পাঞ্চরাত্র বলেন।

“রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।

তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।।”

১। সাত্ত্বিক জ্ঞান, ২। নির্তুণ জ্ঞান, ৩। সর্ব্বপর জ্ঞান, ৪। রাজসিক জ্ঞান, ৫। তামসিক জ্ঞান। রাজসিক জ্ঞান ভক্তের প্রাপ্য নহে, তামসিক জ্ঞান পণ্ডিতের বাঞ্ছনীয় নহে।

সদগুরুর নিকট হইতে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির পূর্ব্বের জাতির বিচার করিলে অপরাধ হয়। ভাবী যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য যে দীক্ষা তাহা পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা।

২। পঞ্চসংস্কারের দীক্ষায় কি পৈতা থাকে না?

“তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।

অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ।।”

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটি সংস্কার।

“তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ষকারকঃ।

অর্থ-পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ।।”

হরিতাপ, হরিপুণ্ড্র, বিষুদাস্যবোধক নাম, বিষুমেন্ত্র ও বিষুয়াগ—এই পঞ্চসংস্কার-বিশিষ্ট হইলে বৈষ্ণব। পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় এই জন্মেই ব্রাহ্মণতা লাভ হয়।

“যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।

তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।”

রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা যেমন কাঁসা স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সদগুরু নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেয়ই বিপ্রত্ব সাধিত হয়।

“যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।

যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেত।।” (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

অর্থাৎ—যে পুরুষের বর্ণপ্রকাশক যে লক্ষণ উক্ত হইল, যদি অন্য বর্ণেও তাহা দৃষ্ট হয়, তবে তাহার বর্ণও সেই লক্ষণদ্বারা বিনির্দিষ্ট হইবে। মহাভারতেও দেখা যায়,—

“শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্মণং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।

ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ।।”

(মহাভারত শল্যপর্ব ১৮৯।৮)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দেখা যায়,—

“অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্লা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।

তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রীতবত্থনা।।”

নারদ পঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন,—

“শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নঃ দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।”

বিভিন্ন শ্রীত ও স্মার্তপ্রমাণ ও প্রাচীন প্রথানুসারে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর জগন্নাথলকর বৃত্ত ব্রাহ্মণতা বা দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম পুনঃ প্রচলন করিয়াছিলেন।

পাঞ্চরাত্রিকগণ অর্চনপর। অযোগ্য ব্যক্তি অনুষ্ঠানপ্রভাবে যোগ্যতা লাভ করেন। বৈষ্ণবী দীক্ষা হইলে দ্বিজত্ব সাধিত হয় এবং তখনই তদুচিত উপনয়ন সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং অবশ্যই (পৈতা) উপনয়ন থাকিবে।

৩। নারীদের শালগ্রামশিলার ও প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের অর্চনের অধিকার আছে কি ?

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভ ২৯৮ সংখ্যায় “স্মৃত্যর্থ সার” এবং পদ্মপুরাণ হইতে যে শ্লোক উদ্ধার করিয়া অর্চন অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে আমরা দেখিতে পাই,—“সর্বের চাগম মার্গেন কুর্য্য বেদানুসারিণা।” অর্থাৎ সকলেই স্ত্রী-শূদ্রাদি পর্যাস্ত সকল বর্ণই বেদানুসারে পঞ্চরাত্র-বিধানানুযায়ী ভগবানের অর্চন করিবেন।

বিষ্ণু-শিলাবতারের—যাঁহাকে গণ্ডকী ও গোমতী শিলা বলা হয়, তাঁহার সেবা করিবার অধিকার বিষ্ণুসম্প্রদেয় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই আছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

“স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ দৈহিক। এক আত্মা স্ত্রী এবং অপর আত্মা পুরুষ—এইরূপ নিত্য ভাব আছে—এমত বোধ হয় না। যেহেতু স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীরগত ভেদমাত্র, আত্মগত নয়। সুতরাং শালগ্রামশিলা অর্চনের এবং শ্রীবিগ্রহ-সেবার অধিকার আছে।” ইহার উদাহরণ—শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্যপরম্পরায় শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর দীক্ষিতা শিষ্যা শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর জীবনচরিত দ্রষ্টব্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজাহ্নবদেবীর জীবনচরিত দ্রষ্টব্য।

৪। সন্ন্যাসিগণের ডোর-কৌপীন কেন? উহার অর্থ কি?

গৃহী সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পঞ্চসংস্কার প্রাপ্ত হন। পঞ্চসংস্কার প্রাপ্ত পুরুষ যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চাহেন তখন সন্ন্যাসগুরু উহাকে অবশিষ্ট পাঁচটি সংস্কার প্রদান করেন। সেই পাঁচটি সংস্কার যথা,—(ক) মুণ্ডন, (খ) তীর্থস্নান, (গ) কৌপীন গ্রহণ, (ঘ) কৌপীন প্রাণপ্রতিষ্ঠা, (ঙ) অচ্যুত গোত্র স্বীকার।

মায়াতরঙ্গময় সংসার হইতে উদ্ধারের জন্য, সংশোধনের জন্য, জিতেদ্রিয় হইবার জন্য এবং অচিরে পবিত্র হইবার জন্য সন্ন্যাসিগণের ভবতাপ-নিবারক ভিক্ষুপোযোগী ডোর-কৌপীন গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

কৌপীনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—লজ্জারূপা ভগবতী ভবতারণ কৌপীন। অনন্তরূপী ডোর ধারণে শুভপ্রদ। ভাবভক্তির অধিকারী ব্যক্তিগণ যোনি-সম্মত দক্ষিণগ্রস্থিযুক্ত অনন্ত রূপ ডোর সহিত কৌপীন ধারণ করিবেন।

কৌপীন—পৃথিবীরূপ, ডোর—অনন্তরূপী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুকী, পবন, অগ্নি, চন্দ্র, শুক্র ও বৃহস্পতি—কৌপীনে এই নয় দেবতা বিরাজমান। কাহারও মতে—দেবতা ত্রয় কৌপীনে অবস্থিত, অপর দেবতাগণ নহে। গ্রন্থিমধ্যে বিষ্ণু এবং দুই পার্শ্বে ব্রহ্মা ও রুদ্র অবস্থিত। কৌপীন ধারণদ্বারা গোপীভাব সাধন করিয়া দেয়।

৫। শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের এবং ছয় গোস্বামীর পৈতা ছিল কি?

ছয় গোস্বামীর পৈতা ছিল। শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ পরমহংস ছিলেন। তিনি বিবিজ্ঞানন্দী। ত্রিশ বৎসর ব্রজমণ্ডলে তীব্র ভজন করেন। তিনি মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য এবং পরিত্যক্ত মাটির ভাঁড়ে রন্ধন করিয়া কোনও প্রকারে জীবনধারণ করিতেন। কখনও গঙ্গাজল, গঙ্গামৃত্তিকা খাইয়া, কখনও বা অভুক্ত অবস্থায় থাকিয়া নিরন্তর হরিনাম করিতেন। তিনি কৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগবিশিষ্ট ছিলেন।

অবশ্য নিত্যসিদ্ধ পরমহংসগণ বর্ণাশ্রমাতীত তত্ত্ব, তাঁহাদিগকে আর নূতন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয় না, সুতরাং তাঁহারা উপনয়ন গ্রহণ নাও করিতে পারেন।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের
৭৮তম শুভাবির্ভাব-তিথি-পূজা-বাসরে দীনাতিদীনের

প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি

(১)

জয় জয় ব্যাসগুরু শ্রীভক্তি বামন ।
জয় বাঞ্জাকল্পতরু, পতিতপাবন ॥
জয় মোর প্রাণেশ্বর, সর্বগুণধাম ।
তব হৃদে শ্রীহরির সতত বিশ্রাম ॥
কৃষ্ণ-নবমী-তিথিতে তোমার উদয় ।
সেই হেতু এই তিথি পূজনীয়া হয় ॥
নবধা ভকতি-মধ্যে আত্মনিবেদন ।
নবমী ভকতি বলি' শাস্ত্রেতে বর্ণন ॥
আত্মনিবেদনাখ্য ভক্তি করিতে প্রচার ।
উদিত হ'য়েছ তুমি অবনী মাঝার ॥
জগদগুরু শ্রীকেশব সিদ্ধ মহাজন ।
তুমি তাঁর কৃপাশক্তি, পরম প্রেষ্ঠজন ॥
শ্রীহরির নির্দ্ধারিত আচার্য্য-আসন ।
শ্রীগুরুর আজ্ঞামত করিলে বরণ ॥
তাঁর প্রতিষ্ঠানে তুমি অধ্যক্ষ-সভাপতি ।
তোমার চরণে রাখি অনন্ত প্রণতি ॥

(২)

‘শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক’,—চারি সম্প্রদায় ।
প্রচারিত এ জগতে শ্রীহরি-কৃপায় ॥
“সম্প্রদায়-বিহীনা মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ ।”
‘পদ্মপুরাণে’তে ব্যক্ত হয় হেন কথা ॥
সম্প্রদায়-পারম্পর্য্য যে করে স্বীকার ।
সেই শুদ্ধভক্তি লভি' যায় মায়া-পার ॥
‘এবং পরম্পরা প্রাপ্তম্’—শ্লোকে ‘গীতা’ কয় ।
গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় জ্ঞান লাভ হয় ॥

চারি সম্প্রদায় মধ্যে 'ব্রহ্ম-সম্প্রদায়'।
 সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলি' সর্বশাস্ত্রে গায় ॥
 'ব্রহ্ম-সম্প্রদায়'-ভুক্ত শ্রীঈশ্বরপুরী।
 যাঁরে দীক্ষাগুরু কৈলা প্রভু গৌরহরি ॥
 গৌরাস্ত্রের অতি প্রিয় রূপানুগজন।
 হেন রূপানুগ গুরু শ্রীভক্তি বামন ॥
 হেন গুরু-কৃপা যাঁর একান্ত সম্বল।
 তাঁর পূত পদ-রেণু সাধনের বল ॥

(৩)

গুরু সমস্যা জগতে অতি গুরুতর।
 কে খাঁটি, কে মেকী গুরু চেনা দায় বড় ॥
 মূল্যবান মণিরে না চিনে অজ্ঞজন।
 জহুরী চিনিতে পারে জহরের গুণ ॥
 অসদ্গুর ভেঙ্কিতে ভুলি' অজ্ঞজন।
 তাঁর পাদপদ্মে করে আত্মসমর্পণ ॥
 যে গুরু মায়ার দাস,—মায়ামুক্ত নয়।
 তাঁর পদাশ্রয় লৈলে নরকগতি হয় ॥
 দুষ্ক ও চুনগোলার বর্ণ শুভ্র হয়।
 কিন্তু উভয়ের গুণ এক কভু নয় ॥
 দুষ্কপানে দেহে যথা হয় উপকার।
 সদ্গুরু তেমতি ভবসিন্ধু-কর্ণধার ॥
 চুনগোলা পানে যথা হয় অপকার।
 অসদ্গুরুর সঙ্গ তথা তমোদ্বার ॥
 সদ্গুরু চিনিতে শিক্ষা দেয় মহাজন,—
 সাধু-শাস্ত্র গুরু-বাক্য ঐক্য করি' জান ॥

(৪)

জয় জয় ভক্তিদাতা আচার্য্য ঠাকুর।
 নিজাধ্য গুরু-পদ সেবিলে প্রচুর ॥
 আচার্য্য-লক্ষণ যাহা শাস্ত্রেতে কীর্তিত।
 সে-সব লক্ষণ তোমাতেই বিরাজিত ॥

শ্রীলোকনাথের শিষ্য প্রভু নরোত্তম।
 শ্রীজীব-সকাশে কৈলা শাস্ত্র অধ্যয়ন॥
 নরোত্তমের যবে ভক্তিসিদ্ধান্ত স্মুরিলা।
 আনন্দে শ্রীজীব তবে তাঁরে প্রশংসিলা॥
 শ্রীজীব-কৃপায় তিনি আচার্য্য হইলা।
 ‘ঠাকুর মহাশয়’—হেন উপাধি পাইলা॥
 কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, ভক্তিসিদ্ধান্তে দক্ষতা।
 আচার্য্য-পদবী প্রাপ্তির বিশেষ যোগ্যতা॥
 ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী তোমাতে প্রকাশিত।
 অমানী-মানদ তুমি, মহাভাগবত॥
 মুকুন্দ-ভক্তির মূল—শ্রীগুরু-চরণ।
 তব পদ-সেবা মুই মাগি অনুক্ষণ॥

(৫)

জয় জয় গুরুদেব ভকতি কাণ্ডারী।
 জয় জয় নিত্য গৌর-সেবা দানকারী॥
 তোমা’ মাঝে নিত্যানন্দ-শক্তি প্রকাশিত।
 তোমার গুরুত্ব তাই সবার বিদিত॥
 যে গুরুতে নিত্যানন্দ-শক্তি নাহি স্মুরে।
 গুরুত্বের অভাবে তাহে গৌর বহু দূরে॥
 রাবণ-কংসাদিসম দ্রোহী ব্যক্তিগণ।
 বুঝিতে না পারে কভু তব কৃপা-কণ॥
 তোমার কৃপায় টুটে মায়ার বন্ধন।
 ভজিতে ভজিতে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
 শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা রুদ্ধ নাহি হয়।
 গৌড়ীয় গুরুরূপে তাই তোমার উদয়॥
 আমি মূর্খ দীন হীন, নাহি ভক্তিধন।
 কৃপা করি’ তব পদে কর আকর্ষণ॥
 তোমার চরণে মোর প্রণতি পুষ্পাঞ্জলি ;—
 জন্মে জন্মে দিও মোরে চরণের ধূলি॥

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর

ই ১২।১২।১৯৯৮

}

শ্রীগুরু-কৃপাপ্রার্থী—

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৯ পৃষ্ঠার পর]

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।

যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।”

সেই বস্তু হলেন ভগবান্। তিনি নিরাকার নন, তিনি নির্বিশেষ নন, তিনি নিঃশক্তিক নন, তিনি নিগুণ নন। Positive sideএ তাঁর সবই আছে।

গীতার মধ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে এক জায়গায়, অর্জুন প্রশ্ন করেছেন, স্বগুণ-নিগুণ নিয়ে প্রশ্নটা এসেছে। প্রশ্নের উত্তরটা কি দিয়েছেন সেখানে? কৃষ্ণ বলছেন, দেখ, এটা কোন প্রাকৃত ব্যাপার নয়। ভগবান্কে যদি নিগুণ, নিরাকার, নিঃশক্তিক বল, তাহলে ভগবানের গুণপনা ব্যাখ্যা হয় না। ওটা একটা Negative side। কিন্তু তিনি Positive sideএ আছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রমাণ পাচ্ছি আমরা। কোথায়?—

“যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধন্তে সবিশেষমেব।

বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।”

সবিশেষ এবং নির্বিশেষ দুটো কথার মধ্যে নির্বিশেষ শব্দটা Negative। সবিশেষ-শব্দটা Positive। Positiveটা আছে বলে Negativity। সুতরাং তিনি সবই। যদি বলি তিনি সবিশেষ, তাহলে কি তিনি নির্বিশেষ নন? এ ব্যাখ্যা কি নেই? শাস্ত্রে এ ব্যাখ্যা আছে। কিভাবে নির্বিশেষ? প্রাকৃত জগতের কোন বৈশিষ্ট্য তাঁর নেই, অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য সমন্বিত—সেই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। ‘নিগুণ’-শব্দের ব্যাখ্যা কি করছেন ভাগবতে?

“হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নিগুণো ভবেৎ।।

শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলছেন। “হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ।” তাঁর কি কোন গুণ নেই? সর্বগুণে গুণায়িত তত্ত্ব তিনি। তাই বলছেন, “পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।” সেই যে পরমপুরুষ, সেই যে পুরুষোত্তম, সেই যে লীলাপুরুষোত্তম তিনি প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত। মায়াতীত, গুণাতীত, ত্রিগুণাতীত বিশেষণগুলো আছে ভগবানের। নিগুণ-শব্দের এই অর্থ। প্রাকৃত গুণবর্জিত অবস্থাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর শক্তি আছে, তিনি শক্তিমান্ তত্ত্ব। শাস্ত্রে প্রশ্ন করা হয়েছে—আমাদের পরমোপাস্য যে তত্ত্ব, তিনি কি নিঃশক্তিক? তদুত্তরে বলছেন,—না, তিনি শক্তিমান্। তত্ত্ববস্তু হচ্ছেন “অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।” কথাটা বলা হয়েছে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব তিনি, তিনি পরমপুরুষ, তিনি পুরুষোত্তম, তিনি লীলাপুরুষোত্তম। ব্যাখ্যাগুলো সব দেওয়া আছে উপনিষদে। গীতা, ভাগবতেও দেওয়া আছে। অধোক্ষজ তত্ত্ব তিনি। আমাদের এই যে ইন্দ্রিয়বৃত্তি এই ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা আমরা সেই তত্ত্বকে জেনে উঠতে পারি না, বুঝে উঠতে পারি না। অধোক্ষজ-শব্দের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেই ব্যাখ্যা হল—“অধঃ কৃতমতিক্রান্তং বদ্ধজীবানাম্ ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজ।” অপ্রাকৃত, ইন্দ্রিয়াতীত। আমাদের প্রাকৃত চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ওটা আসে না। ‘অবাদ্বানসগোচরঃ’, ‘যতো বাচো

নিবর্ত্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ’—এসব কথাগুলো বলছেন উপনিষদে। সেই তত্ত্ববস্তু হচ্ছেন পরব্রহ্ম ভগবান্। তাঁকে শুধু নিরাকার, নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিঃশক্তিক—এই Negative sideএ বলে দিলে হবে না।

“এই মহাপাশটি কি-প্রকার? শোভমান তেজসমূহের আশ্রয় বা আধার-স্বরূপ।” সন্ন্যাস গ্রহণ করেন সন্ন্যাসিগণ। ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী, যতি তাঁদের ডোর, কৌপীন আছে। ডোর-কৌপীন কি? ডোর হল অনন্তরূপী, আর কৌপীন হল লজ্জারূপা ভগবতী। বলদেব প্রভু দশদেহ ধারণ করে ভগবানের সেবা করছেন—আসন, বসন, ভূষণ, শয্যা, পাদুকা, যজ্ঞসূত্র, ছত্র ইত্যাদি। অনন্তদেবের পূজার মন্ত্র রয়েছে। জগন্নাথদেবকে স্নান করান হচ্ছে, নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার সময় তাঁকে স্নান করান হচ্ছে, অভিষেক করান হচ্ছে পুরুষসূক্ত-মন্ত্র পড়ে। ভগবান্ শয়ন করে আছেন কার উপরে মহাসমুদ্রে?—অনন্তনাগের উপরে।

শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ,

অবতারী নারায়ণ,

যাঁর অংশ কলাতে গণন।

যাঁর লীলা লাবণ্যধাম,

আগম-নিগম গান,

সেই রাম রোহিণীনন্দন।।

“ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃহাহত্যতিষ্ঠদশাস্তুলম্।।”

এই সব মন্ত্র রয়েছে। শেষশায়ী, কারণাক্ষিশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরাক্ষিশায়ী বিষ্ণু শুয়ে থাকা লোক। নারায়ণ মানে কি? এখানে ‘নার’-শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন বিষ্ণুর অঙ্গ জাত যে ঘর্ম্ম তারই কারণবারি। তাতে যাঁর অয়ন অর্থাৎ শয়ন, তিনি হলেন নারায়ণ। এঁরা ত’ সব শেষশায়ী বিষ্ণু। দেবতাগণ ক্ষীরসাগরের তীরে গিয়ে প্রার্থনা করছেন। ক্ষীরসমুদ্রের তীর পর্যন্ত যাওয়ার অধিকার। সেখানে গিয়ে ক্ষীরাক্ষিশায়ী বিষ্ণুর কাছে স্তব করছেন—

শান্তাকারং ভূজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশম্।

বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।।

লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।

বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হারং সর্বলোকৈকনাথম্।।

ভাগবতে প্রণাম করছেন, গর্ভস্তুতি করছেন ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃষ্ণের জন্মের পূর্বে,—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

সত্যস্য সত্যমৃতসত্যানেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।

হে সত্যাত্মক ভগবান্! তোমাতে প্রপন্ন হই আমরা। দেবকীর গর্ভস্তুতি করছেন। ব্যাপার কি? ক্ষীরসমুদ্রের তীর পর্যন্ত গেছেন, ওই পর্যন্ত তাঁদের দৌড়। সেইখানে সব খবরাখবর হচ্ছে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ তত্ত্বদর্শন। ক্ষীরাক্ষিশায়ী বিষ্ণুর কাছে জানাচ্ছেন। গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু জেনে যাচ্ছেন, কারণোদশায়ী বিষ্ণু জেনে যাচ্ছেন, মহাসঙ্কর্ষণ জেনে যাচ্ছেন, মূল সঙ্কর্ষণ জেনে যাচ্ছেন। মূল মালিক সেখানে এসেছেন—যাঁর প্রায়ই আসা হয় না, আসতে হয় না। এঁদের দিয়ে কাজ করেন ভগবান্। কিন্তু মূলই—কৃষ্ণচন্দ্র তিনি

এসেছেন। তিনি নিজে ত' একা আসবেন না, তিনি ত' একা নন। তিনি যুগল। রাধারাণী বেঁকে বসলেন, না আমি যাব না। কেন যাবে না? তোমার কি হল? যেখানে যমুনা নেই, যেখানে গিরিরাজ নেই, যেখানে যমুনাপুলিন নেই সেখানে গিয়ে আমাদের শান্তি-স্বস্তি হবে না। তুমি চিন্তা করছ কেন, এখান থেকে সব নিয়ে যাব। ভগবান্ কারও ধার করা জায়গায় লীলাবিলাস করেন না। তাঁর নিজস্ব স্থানে তিনি লীলা প্রকাশ করেছেন—শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। গর্গসংহিতায় দেখবেন আপনারা খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা আছে।

“বেদ-নাগ-ক্লেশ-ভূমিং স্বধান্নঃ শ্রীহরিঃ স্বয়ম্।।”

৮৪ ক্লেশ ভূমি অপ্রাকৃত ব্রজভূমি থেকে তিনি এখানে প্রকট করলেন। সেইখানেই ভগবান্ লীলাবিলাস করেছেন। সুতরাং প্রাকৃত কোন ব্যাপার নয়। ব্রহ্মসংহিতার মধ্যে দেখবেন গোকুল সম্বন্ধে এবং গোলোক সম্বন্ধে খুব সুন্দর বিচার দেওয়া আছে। ব্রহ্মা বর্ণনা করেছেন। সেখানে দুটো বিচার আছে—গোকুলে গোলোক দর্শন এবং গোলোকে গোকুল দর্শন। এসব বিচারগুলো গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছাড়া অন্য কেউ জানেন না, বোঝেন না। কাকে বলে গোকুলে গোলোক দর্শন, আর গোলোকে গোকুল দর্শন তা সাধারণ মানুষ বুঝবে না। খুব কঠিন তত্ত্বসিদ্ধান্ত। এগুলো সব বর্ণনা আছে ব্রহ্মসংহিতায়। অপ্রাকৃত ব্রজ থেকে, অপ্রাকৃত গোলোক থেকে ভগবান্ এখানে যে ভূমি প্রকট করেছেন তার নামই হল ভৌম ব্রজ। ভগবান্ সেখানে লীলাবিলাস করেছেন।

তত্ত্বদর্শন হল চিন্ময়, তাঁর লীলাও চিন্ময়ী। যিনি যে বস্তু তাঁর সবটাই সেই। তাঁর ধাম নিয়ে তিনি আসছেন। “সপার্যদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি।”—কথাটা আছে। ভগবান্ তাঁর সমস্ত কিছু—পারিষদবর্গ নিয়ে অবতীর্ণ হন। সুতরাং তিনি একা আসছেন এমন কথা নয়। আবার যাওয়ার সময় সব নিয়ে চলে গেছেন। তিনি এলেন, জন্মগ্রহণ করলেন প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় এমন কথা নয়। সাধারণ মানুষ মরলে ত' ওরকম ব্যাপারটা হয় না। কিন্তু ভগবান্ সকলকে নিয়েই তাঁর যানে আরোহণ করেছেন বর্ণনা আছে ভাগবতে। কৃষ্ণের বিমান Take off করছে, সকলকে নিয়ে তিনি বিমান start করেছেন, কিছুটা উঠেও গেছে, সেই সময় উদ্ধব কান্নাকাটি করছেন। যে অবস্থায় উঠেছিল ঠিক সেই অবস্থায় থেকে গেল। এখানকার এরা ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে কিনা জানিনা। পৃথিবী থেকে কয়েক হাত উঠেছেন সেই সময় চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে লাগলেন উদ্ধব,—

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণাদর্মপি কেশব।

তাত্ত্বং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি।।

ঠাকুর একসঙ্গে এলাম, আমাকে নিয়ে এলেন, আর যাওয়ার সময় আমাকে ফেলে যাচ্ছেন কেন? আমি কি অন্যায় করেছি? ঠিক ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেল তাঁর বিমান। কান্নাকাটি করো না, বন্ধ কর। আমার যা করবার তা আমি করে গেলাম—ভূভার হরণ করবার কথা ছিল গীতায় তা করেছি।

পরিব্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

আমি সব করে গেলাম, কিন্তু তোমার কাজ এখনও বাকী। যে কথা আমি জগতে

বলেছি সে কথা তুমি প্রচার কর, এই তত্ত্বদর্শন তুমি জগদ্বাসীকে শিক্ষা দাও। এইজন্য তোমার কাজ বাকী। তুমি কি কবে বলেছিলে সেই সত্যযুগে, সে কথা সবাই ভুলে গেছে, আমিও ভুলে গেছি। তুমি আবার বল—উদ্ধব বলছেন। সেই অবস্থায় বিমান দাঁড়িয়ে থাকল আর ভগবান্ উদ্ধবকে উপদেশ করে যাচ্ছেন। দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে আরম্ভ করে একেবারে শেষ সনাতন ধর্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত সব বলে গেলেন। যেটা ভাগবতে ‘উদ্ধব-সংবাদঃ’ বলে বর্ণিত হয়েছে। তখন উদ্ধব বললেন, আমাকে তুমি কেন রেখে যাচ্ছ তা বুঝতে পেরেছি আমি এবার। কি বলছেন তিনি?—আমি তোমার উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য হয়ে থাকব এখানে।

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোহলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি।।

ভগবানের কাছে পড়া দিচ্ছেন তখন। আমি বুঝতে পেরেছি আমাকে কেন থাকতে হবে। তোমারই বিষয়াশী ভৃত্য হয়ে আমি তোমারই গুণগান করব। কৃষ্ণ বলে দিয়েছেন, তোমার সময় হলে তুমি চলে যাবে। তাঁকে আশ্বস্ত করে গেছেন। কখন যাব?—

“ভজিতে ভজিতে, সময় আসিলে,
এ দেহ ছাড়িয়া দিব।”

ভক্তের যখন ইচ্ছা তখন চলে যাবেন। সাধন-ভজনের দ্বারা এটা হবে।

“আপনার উদর-বন্ধনকারী এই মহাপাশকে নমস্কার করি। এই মহাপাশ কি-প্রকার? শোভমান তেজসমূহের আশ্রয় বা আধার-স্বরূপ। এতে সেই মহাপাশেরও অসীম জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম-ঘন-রূপত্বই যে বস্তুর অভিপ্রায়, তা বুঝাচ্ছে।

“তৎপর আপনার উদরকে নমস্কার করি।” প্রথমে ভগবানকে নমস্কার করেছেন, তৎপরে তাঁর বন্ধনরঞ্জুকে নমস্কার করছেন, তারপর তাঁর উদরকে নমস্কার করছেন—অনন্ত বিশ্বের আধার যে উদর। “যেহেতু সেই পাশবন্ধনের দ্বারাই আপনার উদরের সৌন্দর্য্যাদি এবং বাৎসল্য-লীলাদি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সে উদর কি-প্রকার? তা বলছেন,—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রপঞ্চজাত সমস্ত বিশ্বের আধার।” “জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্ম-বাদো”—ভাগবতে বলছেন। জননিবাস ভগবান্, নিখিল বিশ্ব তাঁর মধ্যেই অবস্থিত। নিখিল বিশ্বের উদ্ভব, স্থিতি এবং প্রলয়—ধ্বংস সবটাই যে বস্তুর মধ্যে রয়েছে, তিনি হলেন পরংব্রহ্ম ভগবান্। “সেই উদরের নাভিপদ্ম থেকেই চতুর্দশ-ভুবনাত্মক পদ্বের উৎপত্তি হয়েছিল। এবং সেই বৃন্দাবনে বাল্যলীলা-সময়ে মাতা যশোদাদেবীকে দুইবারই নিজের ‘বিশ্বরূপ’ দেখিয়েছিলেন। ভগবানের এই প্রকার উদর-বন্ধনের দ্বারা সমগ্র বিশ্বেরই বন্ধন-প্রতীতি হচ্ছে। মাতা যশোদাদেবী যে সমগ্র বিশ্বকেই বশীভূত করেছিলেন—এটাও এই বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে।”

ঋষি যে সম্বোধন করছেন, ভগবানকে প্রণাম করছেন, তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রণাম করছেন, তাঁর বন্ধন-রঞ্জুকে প্রণাম করছেন এবং তাঁর উদরকেও প্রণাম করছেন। “সর্বব্যাপক অসীম ভগবানের বন্ধন কখনও সম্ভবপর নহে; তথাপি বন্ধন-স্বীকারে নিজের ভক্তবাৎসল্য-বিশেষ এবং তাহা দ্বারা জগতের অসঙ্খ্য অবস্থিতি প্রভৃতির সমাবেশ যুক্তি-তর্কের অগোচর—এটাও জানাচ্ছেন। এতে ঐশ্বর্য্য-বিশেষই প্রকাশিত হচ্ছে।” ভগবান্ কোন বন্ধনেই

বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন না। ভক্তির দ্বারা তাঁকে বন্ধন করা যায়। প্রেমরজ্জুতে তিনি বন্ধনপ্রাপ্ত হন, প্রেমরজ্জুতে তাঁকে বাঁধা যায়, ভক্তিরজ্জুতে তাঁকে বাঁধা যায়। “কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি।”—সেই কথাই এখানে বলছেন।

“‘দাম’-নমস্কারের পর ‘উদর’-নমস্কারের তাৎপর্য্য এই যে,—উদরের উপরেই ‘দামটী’ বর্তমান আছেন। অথবা পর পর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাবার জন্যই প্রথমে দামের, পরে উদরের নমস্কার করা হয়েছে।

এক্ষণে তাঁর প্রিয়তমজনের কৃপাতেই বাঞ্ছিত বস্তু, এমন কি, বাঞ্ছার অতীত দুঃপ্রাপ্য সমস্ত বস্তুও প্রাপ্ত হওয়া যায়।—এই অভিপ্রায়ে তাঁর প্রিয়তমা ভগবতী শ্রীরাধিকাকে ‘নমঃ’-ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রণাম করছেন।” সেই ভগবানকে নমস্কার করলে পরে নিখিল বিশ্বকেই নমস্কার করা হয় অর্থাৎ ভগবান্ ত’ তাঁর শক্তি ছাড়া নন—যে শক্তির বিচার শাস্ত্রে সুন্দরভাবে জানানো হয়েছে। হ্লাদিনী শক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি, স্বরূপশক্তি, পরাশক্তি—একই তত্ত্বকে লক্ষ্য করছেন। অনন্ত শক্তিমান্ ভগবান্। তাঁর অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তির কথাই শাস্ত্রে সর্বত্র বর্ণিত হয়েছে। প্রথম—হ্লাদিনী, অন্তরঙ্গা শক্তি, দ্বিতীয়—জীবশক্তি, তৃতীয়—মায়াশক্তি। এই তিন শক্তি নিয়ে শাস্ত্রে সর্বত্র আলোচনা হয়েছে। এখানে অন্তরঙ্গা শক্তি, স্বরূপশক্তি, বা হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধাদেবীর কথা উল্লেখ করেছেন বিশেষভাবে। কেন? ভগবৎ-শব্দের দ্বারাই ভগবান্ সমস্ত ঐশ্বর্য্য, শক্তিসামর্থ্য্য যা কিছু সবটা নিয়েই তিনি, ব্যাখ্যা রয়েছে। তথাপি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি ছাড়া তিনি প্রণাম নেবেন কিনা বিচার্য্য।

রাধাদেবী তিনি কখনও কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে পূজা গ্রহণ করছেন না, আবার কৃষ্ণও রাধাদেবীকে বাদ দিয়ে পূজা গ্রহণ করছেন না। সম্পর্কটা এই। সেই তত্ত্বদর্শন এখানে বলছেন। যদি রাধারাণীকে বাদ দিয়ে আমরা কৃষ্ণভজন করতে যাই, তাহলে কৃষ্ণ সুখী হন না ; আবার রাধাদেবীর আনুগত্যে যদি কৃষ্ণভজন করতে যাই, সেখানেও কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে রাধাদেবীর ভজন নয়। তথাপি শাস্ত্রানুসারে সাধন-ভজনের যে ক্রম বর্ণিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, আমরা আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে সাধন-ভজনপথে অগ্রসর হব। সেই আশ্রয়-বিগ্রহ গুরু-বৈষ্ণবকে ধরা হবে। সেই আশ্রয়-বিগ্রহের চরম হচ্ছেন শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। তাঁকেই বলা হল শাস্ত্রে মূল আশ্রয়-বিগ্রহ। তাঁর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান-তাৎপর্য্য স্বীকৃত হয়েছে। আবার রাধাদেবীকে যদি আমরা পেতে চাই তাহলে সেখানেও আনুগত্য রয়েছে—মঞ্জরীর আনুগত্য রয়েছে, সখীগণের আনুগত্য রয়েছে, তবে রাধারাণীর কৃপা পাচ্ছি। আবার রাধাদেবীর কৃপা না হলে কৃষ্ণসেবায় কোনরূপ অধিকার আমাদের মিলতে পারে না—একথাও বিশেষভাবে জানানো হয়েছে।

“শ্রীরাধিকার প্রণামদ্বারা সকল গোপীকারই প্রণাম উপলক্ষিত হয়েছে।” রাধারাণীকে প্রণাম করলে ভগবানের অন্যান্য যত শক্তি আছে সকলকেই প্রণাম করা হয়। যেমন কৃষ্ণকে প্রণাম করলে অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, দেব-দেবী, মুনি-ঋষি সকলকেই প্রণাম করা হয়, তদ্রূপ এখানে রাধাদেবীকে প্রণাম করলে ভগবানের যত শক্তি আছে, সব শক্তিরই প্রণাম করা হয়। “যৎপূজনেন বিবুধাঃ পিতরোহর্চিতাশ্চ”—যে গোবিন্দের পূজা করলে সমস্ত

পিতৃপুরুষগণের পূজা করা হয়ে যায়, সম্মান করা হয়ে যায় ; “তুষ্ठा ভবন্তি ঋষিভূত-সলোকপালাঃ”—যে গোবিন্দের উপাসনা করলে, পূজা করলে ঋষিগণ সন্তুষ্ট হন, প্রাণীজগৎ সন্তুষ্ট হন, লোকপালগণ সন্তুষ্ট হন ; “সর্বের গ্রহাস্তরগিসোমকুজাদিমুখ্যা”—যে গোবিন্দের পূজা করলে সমস্ত গ্রহশান্তি হয়ে যায়, পৃথক্ পৃথক্ করে আর গ্রহশান্তির প্রয়োজন হয় না ; “গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি”—আমি সেই গোবিন্দকে ভজনা করি। শাস্ত্রে এইরূপ বিচার প্রদর্শিত হয়েছে। আমি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বের বন্দনা করতে চাচ্ছি না। একজনকে কি দুজনকে—মূল শক্তি-শক্তিমানকে যদি আমি বন্দনা করি, তাহলে সকলেরই বন্দনা হয়ে যায়।

“গোপীগণের মধ্যে মুখ্যতমরূপে এখানে কেবলমাত্র রাধিকাকেই প্রণাম করছেন।” তাঁকে প্রণাম করলেই সকলের প্রণাম হয়ে যাবে। “রাধিকা”—এই শব্দটী বলবার উদ্দেশ্য প্রকাশ করছেন—যিনি সর্বদাই শ্রীভগবানের আরাধনায় অর্থাৎ প্রীতি-বিশেষ উৎপাদনে রতা (নিযুক্তা)।” রাধিকা সর্বসাধিকা—যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এমনভাবে আরাধনা করেছেন যে আরাধনা পৃথিবীতে কেউ করতে পারেন নাই, পারেন না। আ—রাধ-ধাতু থেকে আরাধনা শব্দ এসেছে। যিনি সব থেকে ভগবান্ শ্রীহরিকে সেবায় পরিতুষ্ট করেছেন, আরাধনায় পরিতুষ্ট করেছেন, তিনি হলেন শ্রীরাধাদেবী। “এই ‘আরাধনা’-শব্দগত অর্থার্থ বা তাৎপর্য হতে ‘রাধিকা’ নামটী এসেছে। সেজন্য ‘হৃদীয় প্রিয়ায়ৈ’—অর্থাৎ ‘তোমার প্রিয়া শ্রীরাধাদেবীকে’ আমি নমস্কার করি।” যদি রাধাদেবীকে নমস্কার জানানো না হয় তাহলে কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান হয় না, যেহেতু কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান্। তিনি নিঃশক্তিক, নিরাকার, নির্বিশেষ, নির্গুণ নহেন। তিনি সশক্তিক।

“রাধিকা—এই নাম রুচি-সংজ্ঞা। সুতরাং আরাধনাদি ব্যতিরেকেই সেই রাধিকা আপনার নিত্য প্রিয়া। তাতে আবার আপনাকে প্রীতি করে বলে আপনার সমস্ত ভক্তজনই যাঁর প্রিয় হন, আপনি যে তাঁর প্রিয় হবেন, সে-সম্বন্ধে আর কি বলব? “ভগবান্ যাঁকে সবথেকে বেশী ভালবাসেন, তাঁকে যদি কেউ ভালবাসেন, তাহলে নিশ্চয়ই ভগবান্ খুশী হন। “আপনি তাঁর (শ্রীরাধিকার) নিত্যপ্রিয়।” শ্রীরাধারাগী আপনার প্রিয়া, আপনিও তাঁর নিত্যপ্রিয়। “এতে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণের প্রতি প্রেম-বিশেষই সূচিত হচ্ছে। সেই রাধিকার প্রিয়—আপনাকে নমস্কার করি।” আপনি কেমন?—আপনি রাধিকার প্রিয়। যেখানে রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করছেন, “রাধার দাসীর কৃষ্ণ, সর্ববেদে বলে।” কৃষ্ণের পরিচয় দিচ্ছেন। আবার অস্মদীয় গুরুবর্গ যাঁরা তাঁরাও পরিচয় দিচ্ছেন রাধাদাস্য—বার্ষভানবীদয়িতদাস। অদ্ভুত ব্যাপার! কৃষ্ণের নাম বলছেন। কৃষ্ণের নামের আগে দিয়েছেন বার্ষভানবীদয়িত—বৃষভানুন্দিনী শ্রীরাধার যিনি সর্বোত্তম প্রিয়, প্রিয়তম, সেই শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর দাম্পত্যদাস। কে কৃষ্ণ? ‘রাধার দাসীর কৃষ্ণ’। আনুগত্যের কথা সেখানে আসছে। সেটাই দেখাচ্ছেন ‘বার্ষভানবীদয়িতদাস’-শব্দে। কৃষ্ণদাস-শব্দে কৃষ্ণের পরিচয় দিচ্ছেন—বৃষভানুন্দিনীর যিনি সবথেকে প্রিয়বস্তু, তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণের দাস। “আপনি যাঁর প্রিয় হন, তিনিই জগতের বন্দনীয়। রাধিকাদেবী আপনারও প্রিয় অর্থাৎ আপনিও স্বয়ং তাঁকে প্রীতি করে থাকেন। সেইজন্য আমি সেই শ্রীমতী রাধিকাকে নমস্কার করছি।” তাঁর কৃপা হলে আমি তোমার কৃপা পাব।

তৎপর স্তুতি-শেষে সেই রাধিকার সহিত রাস-ক্রিয়াদি লীলার পরম উৎকর্ষত্ব বর্ণন করবার ইচ্ছা করেও তা পরম গোপ্য বস্তু বলে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না করেই ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’—‘সমস্ত কার্যই মধুরতার সহিত সমাপন করা কর্তব্য’—এই ন্যায়ানুসারে, কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কেতের দ্বারা উদ্দেশ্য করেই ‘নমোহনন্ত-লীলায়’-বাক্যে প্রণাম করছেন।” এই অনন্তলীলা-শব্দের দ্বারা ভগবানের নিগূঢ় যে রাসবিলাস সেটীও প্রকাশিত হচ্ছে। ‘নমোহনন্ত-লীলায়’ বাক্যে সাধারণতঃ যাঁর লীলার অন্ত নেই, সেই অনন্তলীল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার বুঝায়। কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ সত্যব্রত মুনির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং নিজ ভাবানুসারে উক্ত বাক্যের একটি নিগূঢ় অর্থ নির্ণয় করেছেন। যথা—‘শ্রীরাসলীলাকেই নমস্কার’।” অনন্তলীলাকে নমস্কার মানে রাসলীলাকে নমস্কার। “অনন্ত-শব্দে যার অন্ত নেই বা শেষ নেই ; অর্থাৎ নিত্য, অশেষ বা অসংখ্য ইত্যাদি অর্থ হয়। ‘লীলায়’-শব্দটি ‘লীলা’-শব্দের চতুর্থীর একবচন (নমঃ-শব্দ-যোগে)। এবং লীল-শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে, ‘লী’ + ‘ল’ = লীল। ‘ল’-শব্দের অর্থ আলিঙ্গন করা—(লী-ধাতু ক্ৰিপ্ ভাবে ‘লী’) এবং ‘ল’-শব্দের অর্থ গ্রহণ করা—(লা-ধাতু ড = ল)। সুতরাং ‘লীলা’-শব্দের দ্বারাই গোপীগণের আলিঙ্গন করা হয় যাহাতে সেই রাস-ক্রীড়াদি লীলাকেই নমস্কার বুঝাচ্ছে। এজন্য ‘অনন্ত-লীলায়’ বলতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী নিজেও ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ বাক্যের সার্থকতা করেছেন।

আর একটা বিষয় এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। দামোদরাস্টকের অন্তিম শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ জানিয়েছেন যে, কৃষ্ণের রাস-ক্রীড়াদি লীলা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও তা ‘পরম-গোপ্যত্বেন অনভিবাঞ্ছয়ন্ ★★ কিঞ্চিদেব সঙ্কেতেনোদ্दिशन् প্রণমতি।”—এর তাৎপর্য্য এই যে, রাসলীলার পরম গোপনীয়ত্বহেতু সত্যব্রত মুনি কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কেত অথবা একটুমাত্র ইঙ্গিত করেছেন।” বলতে চাচ্ছেন না পরম গোপনীয় বস্তু। সর্বসাধারণে প্রকাশিতব্য বিষয় নহে, সেজন্য শুধু উল্লেখমাত্র করে তিনি চুপ করে যাচ্ছেন গোপনীয়ত্ব-হেতু। “এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যেখানে-সেখানে, যখন-তখন রাসলীলার শ্রবণ-কীর্তন করা নিতান্ত অবিধি। শুধু তাই নয়, অনধিকারী ব্যক্তি যদি কাম দূর করবার জন্য ছলনা করে রাসলীলা মনে মনেও চিন্তা, আচরণ বা অনুকরণ করেন, তবে তিনি রাসলীলার গৌরবহানি করার অপরাধে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হবেন ; এবং অকালপক্ব প্রাকৃত সহজিয়াবাদের ন্যায় কামুক ও গৃহাসক্ত হয়ে পড়বেন।” অধিকার বিচারের কথা এখানে বলছেন। কে আলোচনা করবেন রাসলীলা-প্রসঙ্গ? কার পক্ষে শ্রোতব্য? এসব নিয়ে ভাগবতে যেমন আলোচনা আছে, তেমন গোস্বামিগণেরও খুব সুন্দর আলোচনা আছে। একটা দুটো শ্লোক নিয়ে যেমনভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আলোচনা করেছেন, আশ্চর্য্য লাগে সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করলে।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিবেগঃ শ্রদ্ধাঘ্নিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।

ভক্তিঃ পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হ্রদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

ব্যাপারটা কি? ব্রজবধূগণের যে লীলাদি কৃষ্ণের সঙ্গে সেটা শুনতে গেলে, আলোচনা করতে গেলে অধিকারী হতে হবে। কিভাবে শুনবে? ‘শ্রদ্ধাযিতঃ’। ‘শ্রদ্ধা’-শব্দের অর্থ কি?—

‘শ্রদ্ধা’-শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।

কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।।

শ্রদ্ধা-শব্দের অর্থ হল সুদৃঢ় বিশ্বাস। সে বিশ্বাসটা কি? কৃষ্ণভক্তি করলেই সবকিছু লাভ হয়, অন্য কিছুর দ্বারা হয় না—এই সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং সেখানে তত্ত্ববস্তুর সম্বন্ধে ভুলবুঝাবুঝির কোন কথা নেই। সাধারণ মনুষ্য ভগবানের অপ্রাকৃত রাসাদিক লীলা শ্রবণ করলে তাদের ভ্রান্ত ধারণা এসে যাবে। অপ্রাকৃত চিল্লীলামিথুন সেই যে শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর তাঁকে সাধারণ প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা বলে ভ্রম হবে। সেইজন্য শাস্ত্র সাবধান করেছেন। রাসপঞ্চাধ্যায় আলোচনার শেষে ব্যাসদেব প্রথমে বলছেন,— “বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষেগঃ শ্রদ্ধাযিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।” শ্রদ্ধাযিত হয়ে কেউ বর্ণনা করতে পারেন। শ্রদ্ধাযিত মানে আগে শ্রবণ, পশ্চাৎ কীর্তন। আগে কীর্তন নয়, আগে সদগুরুর মুখে শ্রবণ, পরে কীর্তন। ‘অনুশৃণুয়াৎ’—শুনতে হবে গুরু যা বলছেন, গুরু যদি অধিকার বিচার করেন আমাকে তাহলে আমি শুনবার অধিকারী। তিনি যদি বার বার করে নিষেধ করেন, না তোমার অধিকার নেই, তাহলে চুপ করে যাওয়া উচিত। অনুশ্রবণ মানে গুরুমুখে কীর্তিত তত্ত্বদর্শন শ্রবণ। “ভক্তিঃ পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাম্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।” হৃদ্রোগ কাকে বলছেন? প্রাকৃত কামনা-বাসনাকে হৃদ্রোগ বলছেন। সেটা নষ্ট হবে কখন? যদি আমাকে অধিকারী বিবেচনা করেন গুরুপাদপদ্ম, বৈষ্ণববৃন্দ, তাহলে তাঁদের কথা অনুশ্রবণ করতে হবে, অনুধাবন করতে হবে হৃদয়ে অন্তরে। তবে তাঁদের কৃপাপ্রভাবে সেটা স্ফূর্তি হতে পারে, তৎপূর্ব্ব নয়।

“রাস-লীলার শ্রবণ-কীর্তনের কারণে ও অধিকার নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের সেই রাস-লীলারই শেষে যা বর্ণিত হয়েছে তা বিশেষভাবে আলোচ্য। যথা,—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনীশ্বরঃ।

বিনশ্যত্যাচরনৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহক্লিজং বিষম্।। (ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

কি কথা বলতে যাচ্ছেন এখানে? শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রাসপঞ্চাধ্যায় বর্ণনা করেছেন। প্রথমে অধিকারী নির্ণয় করেছেন—কে আলোচনা করবার অধিকারী। আলোচনা করার শেষে আবার নিষেধনামা জারি করেছেন তিনি। কি? আমি এই যে রাসপঞ্চাধ্যায় বর্ণনা করলাম ‘নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু’—এটা কেউ যেন কখনও আচরণ না করে। আচরণ দূরের কথা ‘মনসাপি হনীশ্বরঃ’—ঐশ্বরিক ক্ষমতা যদি কেউ লাভ না করেছেন; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যর্য যদি কেউ জয় না করেছেন, তিনি যদি কখনও এটা মনে মনেও চিন্তা করেন; ‘বিনশ্যত্যাচরনৌঢ্যাদ্’—‘নৌঢ্যাদ্’—মূঢ়তা হেতু যদি কেউ এটা কখনও আলোচনা করতে যান ‘যথাহরুদ্রোহক্লিজং বিষম্’—দেবাসুর সংগ্রামের শেষে কি উঠেছিল?—গরল। সেটা কেউ গ্রহণ করতে পারেন নি, সেটা গ্রহণ করেছিলেন শিবঠাকুর। তাও তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, ইতিহাস আছে। তৎকৃপাপ্রভাবে সেটা

তিনি তাঁর কণ্ঠদেশে ধারণ করেন। যার জন্য তাঁর নাম হল শিতিকণ্ঠ বা নীলকণ্ঠ। সকলেরই এ যোগ্যতা ক্ষমতা, অধিকার নেই। শিবঠাকুরের ছিল বলে তাঁকেই ঐ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এখানে সাধারণ মনুষ্যগণকে লক্ষ্য করে বলছেন, অনধিকারী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলছেন,—যদি কেউ এই অপ্রাকৃত রাসাদিক লীলা প্রাকৃত জড় অবস্থায় আলোচনা করতে যান, তাহলে ‘যথাহরুদ্রোহন্ধিজং বিষম্’—রুদ্র না হয়ে, রুদ্রের ক্ষমতা লাভ না করে যদি কেউ বিষপান করতে যান, তাহলে তার যে অবস্থা হবে, এখানে অনধিকারী ব্যক্তি যদি এই রাসলীলা আলোচনা করতে যান, তাহলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। উপকারের বদলে অপকার হয়ে যাবে। সুতরাং ভগবানের উন্নতোজ্জ্বল-রসের যে-সব লীলাগুলি আছে—বস্ত্রহরণ-লীলা, নৌকাবিলাস-লীলা ইত্যাদি সকলের আলোচনার অধিকার নেই।

“এর তাৎপর্য এই যে, ‘ঈশ্বর’ অর্থাৎ প্রকৃত যোগ্য ক্ষমতা-সম্পন্ন অধিকারী না হলে মনের দ্বারাও কখনও রাসলীলা চিন্তা, আচরণ বা অনুশীলন করবে না। সাক্ষাৎ শিব সমুদ্রোত্তীর্ণ বিষপানের একমাত্র অধিকারী। কিন্তু অনধিকারী অরুদ্র ব্যক্তি অর্থাৎ অপাত্র ‘মহাপাত্র’ সেজে যদি রাসলীলার শ্রবণ-কীর্তনরূপ বিষ পান করেন তাহলে মৃত্যু অর্থাৎ আসন্ন-মৃত্যুরূপ সংসার-বন্ধদশা অবশ্যভাব্যী।

রাসলীলা সর্বলীলা-চূড়ামণি এবং তার ফলও সর্বচূড়ামণি ; সুতরাং তার অধিকারীকেও সর্বচূড়ামণি হতে হবে। যে-কোন হৃদ্রোগগ্রস্ত, কামুক, অপাত্র ব্যক্তির পক্ষে রাসলীলা কোনপ্রকারেই আলোচনীয় নহে। অজ্ঞতা দূর করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করা একান্ত আবশ্যিক হলেও প্রাথমিক বিদ্যার্থীকে অথবা অল্পজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে ভর্তি হতে দেওয়া হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়াসক্ত স্বল্পজ্ঞ ব্যক্তিকে রাসলীলার সর্বোত্তম শিক্ষা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।”

জীবের কৃত্য*

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর]

এই পৃথিবীতে যাবতীয় বিষয় ত্রিগুণময় ; তন্মধ্যে সাধারণতঃ সাত্ত্বিক বিষয়ই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু নিগুণতাই সংসার হতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হওয়ায় ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের শ্রীচরণাশ্রয় করে সহজেই নিগুণতা লাভ করতে পারেন। ত্রিগুণ-জয় সম্বন্ধে শ্রীভগবানের উক্তি, যথা,—

এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্মন্বনিবন্ধনাঃ।

যে নেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।। (ভাঃ ১১।২৫।৩২)

অর্থাৎ—“হে সৌম্য! পুরুষের গুণ-কর্ম-নিবন্ধনজনিত এই সকল সংসার-ভাব ঘটে

* বর্তমান প্রকাশিত অংশটি অসাবধানতাবশতঃ মূল পাণ্ডুলিপি হইতে বাদ পড়িয়াছিল। ইহা ৮ম সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর এবং ৯ম সংখ্যা ৩৩৯ পৃষ্ঠার পূর্বে সংযোজিত হইবে। অতএব পাঠকবৃন্দকে উক্ত অংশ সংযোজনপূর্বক পাঠ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। —গৌঃ সং

থাকে। যিনি চিত্তজাত এই গুণসমূহকে ভক্তিয়োগের দ্বারা জয় করতে পেরেছেন, তিনি মর্নিষ্ঠ হয়ে মোক্ষলাভে সমর্থ হন। শ্রীভগবান্ নিগুণ, তাঁর আশ্রিত ভক্তও নিগুণ; অব্যবহিতা অনন্যা ভক্তিও নিগুণা, সেই নিগুণা ভক্তির উপকরণসমূহও নিগুণ। জাগতিক বস্তুসমূহ ভক্তের দ্বারা ভক্তির উপকরণরূপে ভগবৎসেবায় নিয়োজিত হলেই শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে।”

বর্ণাশ্রম ধর্মের মূল নিগুণ বিষুও হলেও বর্ণাশ্রম পালনকারীদের সাধনটি নিগুণ নয়। বর্ণাশ্রমধর্মিগণ গুণজাত বর্ণাশ্রমধর্মে স্থিত হয়ে নিগুণ বিষুর উপাসনা করায় তারা দুর্বল। অসুররাজ হিরণ্যকশিপু বর্ণাশ্রমধর্মীদের উপর প্রচণ্ড আঘাত করেও নির্বিঘ্নে অবস্থান করেছিল, তজ্জন্য তাকে কোনরূপ বিপদে পড়তে হয়নি। ভাগবত-ধর্মিগণের সাধ্যবস্তু নিগুণ এবং তাঁদের সাধনও নিগুণ। ভাগবদ্বদ্ব্যর্থ অপ্রতিহতা,—তাকে কেউই বাধা দিতে পারে না, সেই ধর্ম এমনই শক্তিশালী যে সমস্ত বাধাকে অনায়াসে অতিক্রম করে থাকে! সেই ভাগবদ্বদ্ব্যর্থবলম্বী শিশু প্রহ্লাদের উপর যখন মহাদৈত্য হিরণ্যকশিপু চরম আঘাত হেনেছিল, তখনই হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছিল এবং পরিশেষে বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে তার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছিল। এই কলিকালে কলির দৌরাভ্য বর্ণাশ্রমধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করায় বর্ণাশ্রমধর্মে বেদ-বিহিত কর্মানুষ্ঠান লুপ্ত হয়ে গেছে। কলি বর্ণাশ্রমধর্মের উপর আধিপত্য করে বর্ণাশ্রমধর্মকে নাশ করে দিলেও নিগুণ ভাগবদ্বদ্ব্যর্থের নিকট কলি পরাজিত। যে ধর্ম মানুষকে কৃষ্ণ-দাসত্ব-ধর্মে স্থিত করাতে পারে এবং যে ধর্মে কৃষ্ণ ভক্তের নিকট বশীভূত হন, সেই ধর্মই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বর্ণাশ্রমধর্মীরা যে হরিতোষণপরা ভক্তির উদয় হয়, তাহা গুণীভূতা ভক্তি, তাতে ভুক্তি লাভ হয় অথবা কখনও মুক্তি পর্য্যন্ত যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কখনও প্রেমভক্তি লাভ হয় না, হবেও না। প্রেমভক্তিই জীবের সাধ্য ও পরমপুরুষার্থ,—তাহা একমাত্র ভক্তসঙ্গ ও শুদ্ধ হরিনামের দ্বারাই লাভ করা সম্ভব হয়।

যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিই তিনি পুরুষ বা স্ত্রী যেই হোন না কেন, তিনি পাঞ্চরাত্রিক বিধিমতে বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত হলে শালগ্রাম-পূজায় অধিকার পেতে পারেন। সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-বংশের সন্তানের শূদ্রতা বর্তমান থাকে। ত্রিবিধ জন্ম সম্বন্ধে শাস্ত্র-বচন,—

মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌজিবন্ধনে।

তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ॥ (মনু ২।২৬০)

“শ্রুতিতে কথিত হয় যে, দ্বিজের মাতৃকুক্ষি হতে প্রথম জন্মই শৌক্ৰ জন্ম, পরে উপনয়ন হলে দ্বিতীয় জন্মলাভ হয়, তৎপর যজ্ঞদীক্ষা লাভ করলে তার তৃতীয় জন্ম হয়ে থাকে (অতএব জন্ম ত্রিবিধ—‘শৌক্ৰ’, ‘সাবিত্র’ ও ‘দৈক্ষ’)।” দীক্ষার দ্বারাই দ্বিজত্ব বা বিপ্রতা লাভ হয়। হরিভক্তিবিলাসে বর্ণিত আছে,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিলাস, ৭ সংখ্যা ধৃত তত্ত্বসাগর বচন)

অর্থাৎ—“যেদ্রুপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রুপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেয়ই বিপ্রতা সাধিত হয়।” শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ-কৃত দিগ্‌দর্শিনী টীকা—নৃণাং সর্বেষামেব দ্বিজত্বং ‘বিপ্রতা’, অর্থাৎ ‘নৃণাং’ পদে দীক্ষিত সকলেরই ; ‘দ্বিজত্বং’ পদে বিপ্রতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিক্রুপ দ্বিজত্ব নয়)।

পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার পরে আর দ্বিজত্বের লক্ষণাভাব থাকে না। স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই পাঞ্চরাত্রিকী বৈষ্ণবী দীক্ষার পর শালগ্রাম-পূজার অধিকার লাভ হয় ; যথা—শাস্ত্র-বচন—

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।

পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাস্বতং পদম্॥ (পদ্মপুরাণ)

“কি স্ত্রী, কি শূদ্র, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়াদি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—ইহাদের যে কেহ (পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষান্তে) শালগ্রামচক্র পূজা করে নিত্যপদ অর্থাৎ ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করেন।”

স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে,—

এবং শ্রীভগবান্ সর্বৈঃ শালগ্রামশিলায়কঃ।

দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিঃ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥

“সূতরাং (সদগুরুপদাশ্রয়ে যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণপূর্বক) শ্রীভগবানের পূজা-পরায়ণ হলে বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র—সকলেই শালগ্রামশিলারূপী ভগবানের অর্চনা করবেন।”

স্ত্রী-শূদ্রাদির শালগ্রাম পূজা-বিষয়ে যে নিষেধাজ্ঞা আছে, তাহা কেবল অবৈষ্ণবদের জন্য প্রযোজ্য। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তদ্বিষয়ে কথিত হয়েছে,—

অতো নিষেধকং যদ্যদ্বচনং শ্রুয়তে স্মৃটম্।

অবৈষ্ণবপরং তত্ত্বদ্বিজৈঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৫।২২৪)

“স্ত্রী-শূদ্রাদির শালগ্রাম পূজা-বিষয়ে যে-সমস্ত নিষেধপর বচন স্পষ্টরূপে শ্রুত হয়, তত্ত্বদর্শিগণ তাহা অবৈষ্ণবপর বলেই জানেন।”

বিষ্ণু বা কৃষ্ণমস্ত্রে দীক্ষিত হলে মহিলারাও শালগ্রাম পূজা করতে পারেন। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যায়, শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি জাহ্নবা মাতা ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা দেবী শালগ্রাম পূজা করতেন।

ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নন, যথা—শাস্ত্র-প্রমাণ ;—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তান্তে তু ভাগবতা নরাঃ।

সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ—“শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্ত হলে তাদিগকে কখনই শূদ্রবুদ্ধি করতে হবে না, তারা ‘ভাগবত’ বা ‘বৈষ্ণব’ বলে অভিহিত হন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি সর্ব বর্ণমধ্যে তারাই শূদ্র, যারা শ্রীভগবান্ জনার্দনে ভক্তিহীন।”

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ষষ্ঠবার বিদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীগৌড়ীয় গুরুবর্গের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, বিদ্যালঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপুণ্ডরীক ব্রহ্মচারী, শ্রীধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজনাথ দাসাধিকারী প্রমুখ ২৫ জন বিদেশী ভক্ত সঙ্গে লইয়া গত ২৯।১১।৯৮ তারিখে সিঙ্গাপুর পৌঁছান।

সিঙ্গাপুরে পক্ষকালানধিক প্রচারকালে শ্রীল মহারাজ ভজনরাজ্যের প্রথম সোপন শরণাগতি হইতে আরম্ভ করিয়া উন্নত অবস্থা পর্য্যন্ত বর্ণনা করেন। ভজনের প্রয়োজনীয়তা, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামীর জীবনীর মাধ্যমে ভগবান্ সকলের পালন-পোষণ করেন, শ্রীদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত—তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার্থ স্বরূপতঃ এবং বাহ্যতঃ গৃহত্যাগ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইয়াছিলেন—প্রভৃতি বিষয়ে তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ আলোচনা করেন। অন্তর সিঙ্গাপুরের প্রথম পর্বের প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ মালয়েশিয়ার রাজধানী কোয়ালালামপুর যাত্রা করেন।

মালয়েশিয়াতে বিভিন্ন প্রকার যোগের মধ্যে ভক্তিয়োগের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকট-রহস্য, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে শ্রীল মহারাজ বলেন,—

যুবরাজ কংস আকাশবাণীর মাধ্যমে জানিতে পারিলেন,—“রে মূঢ় কংস! যাহাকে তুমি এত প্রীতির সহিত রথ চালনা করিয়া লইয়া যাইতেছ, ইহার অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার হস্তারক হইবে। ইহা শুনিবামাত্র কংস আকাশবাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভগ্নী দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। বসুদেব মহারাজ নিমিত্ত-কারণ হইয়া কংসকে প্রতিরোধ করিলেন। পরবর্তিকালে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানই কংসের হস্তারক হইল।” অবশেষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় যুক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নন্দনন্দনত্ব স্থাপন করেন। পূতনা-বধ, শকটাসুর-বধ, তৃণাবর্তাসুর-বধ, দামবন্ধন-লীলা, ফল-বিক্রয়িণীর প্রতি কৃপা প্রভৃতি লীলার তাৎপর্য্য এবং সাধক-জীবনে এই সকল লীলার প্রভাব ও শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। বিশেষ করিয়া দামবন্ধন-লীলায় প্রত্যেকবারই দুই অঙ্গুলি রজ্জু কম হওয়ার কারণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে প্রচারে গিয়া মর্কটন্যায় ও মার্জারন্যায় দুইটির উদাহরণ দিয়া কিভাবে সামঞ্জস্য করেন, তাহার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহ-তিথি কুয়ালালামপুরস্থিত আশালতা দাসী নামক এক সাংবাদিকের বাসভবনে উদ্ঘাপিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-লীলা, উপদেশ এবং বিচারধারা প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজ উদাহরণসহ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত তত্ত্বের বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা আলোচনাকালে বকাসুর বধ, অঘাসুর বধ লীলা বর্ণনান্তে শ্রীল মহারাজ ব্রহ্মমোহন-লীলা রহস্য বর্ণন করেন। ব্রহ্মমোহন-লীলার রহস্য নিম্নরূপ,—

ব্রজের মাতৃস্থানীয়া গোপীগণ নিজপুত্র অপেক্ষা কৃষ্ণকে অধিক স্নেহ করিতেন,

তঁাহাদের মনে কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবার ইচ্ছা প্রবল ছিল। ব্রজের গাভীগণ নিজ বৎস অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক স্নেহ থাকায় কৃষ্ণকে নিজ বৎসরূপে লাভ করিবার জন্য দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করিত। ব্রজের গোপকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণপ্রিয়তমরূপে লাভ করিবার জন্য মনে মনে সর্বদা চিন্তিত থাকিতেন। “এক কার্য্যে প্রভু করেন কার্য্য পাঁচ সাত।” যোগমায়ার দ্বারা ব্রহ্মাকে আকর্ষণ করিয়া তঁাহাকর্তৃক গোবৎস এবং সখাগণকে চুরি করাইয়া পূর্বোক্ত কার্য্যগুলি করাইলেন। শ্রীব্রহ্মা শ্রীব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আদিগুরু। তিনি কৃষ্ণের লীলাতে এরূপ ব্যবধান ঘটাইতে পারেন না। ভগবান্ নিজ ভক্তের দ্বারা এইরূপ কার্য্য করাইয়া ব্রজবাসিগণের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। অতঃপর ধেনুকাসুরবধ-লীলারহস্য প্রসঙ্গে বলেন,—ধেনুকাসুর অজ্ঞতার প্রতীক। এই অজ্ঞতাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম দূর করেন। এইজন্য শ্রীগুরুতত্ত্বের মূল শ্রীবলদেব প্রভু ধেনুকাসুর বধ করিয়া সাধকের হৃদয়ের অজ্ঞতা দূর করেন।

মালয়েশিয়ার প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ পুনরায় সিঙ্গাপুরে দ্বিতীয় পর্ব্বের প্রচারের জন্য যাত্রা করেন। সিঙ্গাপুরস্থিত শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম তথা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্রক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ৭৮তম শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ‘শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব’ অনুষ্ঠিত হয়। এই পবিত্র তিথি সম্বন্ধে শ্রীল মহারাজ পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্মের শ্রীগুরুসেবার প্রতি উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন,—

“পূজ্যপাদ মহারাজ তৃণাদপি শ্লোকের মূর্ত্তিমান্‌স্বরূপ। তঁাহাকে আমি কখনও আত্মপ্রশংসা করিতে শুনি নাই। পরমারাধ্য গুরুদেবের সেবাই ছিল তঁাহার প্রাণধনস্বরূপ। শ্রীল মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অভিধান। অদ্যাবধি কোন বিষয় একবার পড়িলে বা শুনিলে দ্বিতীয়বার পড়িবার বা শুনিবার প্রয়োজন হয় না। Poetryর কথাই বা কি, তিনি ছাত্রজীবনে যে-সকল Prose পড়িয়াছেন এত বৎসরের অন্তরালেও তাহা কণ্ঠস্থ হইয়া আছে।

কোন একসময় ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্রে প্রভুপাদের পরিকল্পনা কারাগৃহে অবস্থান করেন। তখন শ্রীল মহারাজ একাই তঁাহাদের বহুমুখী সেবার দ্বারা পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন। উকিলের নিকট প্রত্যহ যাতায়াত, দুইবেলা রান্না করিয়া শ্রীল গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের জন্য প্রসাদ লইয়া যাওয়া, মামলার তদ্বির করা প্রভৃতি কোন সাহায্যকারীর সাহায্য ছাড়া একাই করিয়াছেন। মঠে আসিয়া বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য আসন করা, পাতা দেওয়া, লবণ দেওয়া, পুনরায় প্রসাদ গ্রহণের পর জায়গা সংস্কার করা, রাত্রিতে পায়খানা পরিষ্কার করা প্রভৃতি ছিল তঁাহার দৈনন্দিন সেবা। তবেই ত’ তিনি গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপাভাজন হইয়াছেন। আমাদিগকেও গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপাভাজন হইতে হইলে তঁাহার পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে।”

অতঃপর শ্রীল মহারাজ শ্রীসনাতন-শিক্ষার কিয়দংশ এবং নাম-সঙ্কীর্ণনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক সিঙ্গাপুরের দ্বিতীয় পর্ব্বের প্রচার সমাপ্ত করিয়া ইন্দোনেশিয়া রওনা হন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীবীনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যালঙ্কার

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

“ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ” (ভাঃ ১১।১৪।৩)—শ্রীব্রহ্মার নিকটেই সর্বপ্রথম ভগবদ্ভক্তিমূলক ধর্মের প্রকাশ এবং তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে করিয়াছেন। তখন হইতে বস্তুতঃ ভাগবত ধর্মের সূচনা। সেই বেদ-সংজ্ঞিতা বাণী-নির্ব্বারের সাবলীল গতি কালপ্রবাহে কৰ্মজড়-স্মার্তবাদ, চিহ্নজড়-সময়বাদ, শূন্যবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ—এইপ্রকার বিভিন্ন উষরক্ষেত্রের ভীষণ প্রতিকূলতায় রুদ্ধ হইয়া দ্বাদশ মহাজনের হৃদয়গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল। অবশেষে তাহা বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমন্নন্দাচার্য্যের শুদ্ধ-দ্বৈতবাদের অনুকূল পরিবেশ পাইয়া স্বাচ্ছন্দ্য গতি হইলে সমগ্র ভক্তকূল তাহাতে অবগাহন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। অতঃপর গৌড়ীয়গগনে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয়ে সেই বেদ-বাণী-নদীতে জোয়ার আসিল—বেদগোপ্য কৃষ্ণপ্রেমের উন্নতোজ্জ্বল নীলমণিসকল সেই প্লাবনের আলোড়নে প্রকাশিত হইয়া পড়িল—সমস্ত সুমেধগণ তাহা কণ্ঠহার করিয়া উচ্চ সঙ্কীর্ণনে মুখর হইলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে দুরন্ত কলি তের অপসম্প্রদায় প্রসব করিলে বিদ্বভক্তিবাদের আবর্ত্তে অজ্ঞ সমাজ বিভ্রান্ত হইতে লাগিল। ভক্তির ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপার কৃপায় শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী পুনরায় গতিশীলা হইলেন,—সমগ্র গৌড়ীয়-সমাজ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পরমহংসকুলমুকুটমণি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সেই মন্দাকিনীর সিদ্ধান্ত-বারি সমগ্র ভারতবর্ষ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সঞ্চারিত করিলে সমগ্র বিদ্বৎসমাজ শ্রীচৈতন্য-মহিমালোকে উদ্ভাসিত হইলেন।

তাহারই অন্তরঙ্গবর জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী সেই সারস্বত-বাণী সংরক্ষণ করিতে বেদ-উদ্ধারক শ্রীবরাহদেবের কৃপায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিলেন। শ্রীসরস্বতী ও শ্রীকেশব—এই উভয়েরই সাক্ষাৎ পরমকৃপাভাজন ও শ্রীসমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভ ৭৮তম আবির্ভাব-তিথিবাসর শীতের কুহেলিকা ভেদ করিয়া সমুপস্থিত হইলে তদনুরাগিগণ ব্যাসপূজার উষ্ণ আয়োজনে উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন।

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৪০৫ (ইং ১২।১২।১৯৯৮) শনিবার শ্রীসমিতির বৈদ্যবাটীস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠে পারমার্থিক বৈদ্যবর শ্রীবামনদেবের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। চতুর্দিক হইতে তদগুণমুগ্ধ সতীর্থগণ, তৎস্নেহাস্পদ আশ্রিতগণ ও তৎকৃপাপ্রার্থীগণের সমাগমে শ্রীব্যাসপূজা সার্থকমণ্ডিত হইয়া উঠিল।

শ্রীব্যাসপূজা কিছু ব্যক্তিপূজা নহে বা মায়াবাদিগণের ‘অনবগত-গুরু’ পূজাভিনয়ও নহে—ইহা সংসম্প্রদায়ী গুরুবর্গের পূজা—যে পূজায় সদগুরু জগদগুরু এবং জগদগুরুর সদগুরুত্ব সংস্থাপিত হইয়া অখণ্ড গুরুত্বের প্রতি পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণিপাত সম্ভব হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় দ্বিসহস্রাধিক ব্যক্তি মহাপ্রসাদ-সেবা-সৌভাগ্যে ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন।

অপরাহ্নে সমিতির শ্রীআচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হইলে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ “আদৌ গুরুপূজা”-তত্ত্বের যথার্থ বিচার উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। উক্ত সভায় পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম গোবিন্দ মহারাজ (রিষড়া), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ বন মহারাজ (মায়াপুর), শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী সভা অলঙ্কৃত করিয়া অকপটে বেদ-সংজ্ঞিতা শাস্ত্রত বাণী, সর্বশাস্ত্র-সার—কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভিন্ন গুরুতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিয়াছিলেন। সর্বশেষে শ্রীল সভাপতি মহারাজ সকলপ্রকার তত্ত্বের অপূর্ব মীমাংসামূলক এক তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিলে সকলের হৃৎকর্ণ পরিপূরিত হইয়া যায়। যথাশীঘ্র সেই হরিকথামৃত শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে—যাহাতে অনুপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দ তাহা আশ্বাদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

—নিজস্ব সংবাদ

সত্যবস্তু

(সনেট)

মসি-বর্ণ মেঘপুঞ্জ আবরি' তপন
যথা দিবাভাগে, করে তামসী নিশির
প্রহেলিকাস্তৃত স্বপ্ন বীজের বপন
তৎ সদৃশ সূর্য্যোপম সত্যবস্তুটীর
অভঙ্গুর নিত্যসত্তা সদা সুপ্রোজ্জ্বল
নিত্য নবতমরূপে স্বকেন্দ্রে সদাই
করে অধিষ্ঠান।—যত পাষণ্ডী চপল
বস্তু সত্তা,—অতি তুচ্ছ কুহেলির ছাই
ভস্ম প্রমণ্ডিয়া কহে বস্তু অভাবক
হেতু হেথা বিদ্যমান।—কিন্তু প্রাজ্ঞগণ
অবশ্য বুঝেন ভস্ম মাঝারে পাবক
বিদ্যমান।—জলদান্তে কৃতান্ত জনন (সূর্য্য)
ঝলকে।—মায়িক বস্তু পরিণামশীল।
সত্যবস্তু নিষ্প্রপঞ্চ মুক্ত অনাবিল।

—শ্রীনারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিষ্টার্ড)

এস্. টি. ডি. : ০৩৪৭২ ☎ : ৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২

জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) ।

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্বাদে ও সমিতির বর্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সেবানুগত্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ১২ই ফাল্গুন, ১৪০৫ (ইং ২৫।২।৯৯), বৃহস্পতিবার হইতে ১৮ই ফাল্গুন, ১৪০৫ (ইং ৩।৩।৯৯), শনিবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন এবং নগর-সঙ্কীৰ্ত্তনমুখে ষোলকোশ শ্রীধামপরিক্রমা হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্কবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যনুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—২৯শে পৌষ, ১৪০৫

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী

সত্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির 'সভাপতি-আচার্য্য' অথবা 'সম্পাদক'-এঁর নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌরধাম-পরিভ্রমণ ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১২ই ফাল্গুন (ইং ২৫।২।৯৯), বৃহস্পতিবার ;—(১) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (কীর্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী ; এবং (২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ১৩ই ফাল্গুন (ইং ২৬।২।৯৯), শুক্রবার ;—(৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য) —গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; এবং (৪) শ্রীঋতুদ্বীপ (অর্চনাখ্য)—রাতুপুর। শ্রীএকাদশী-ব্রতোপবাস।

৩। ১৪ই ফাল্গুন (ইং ২৭।২।৯৯), শনিবার ;—(৫) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য) —জাহ্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পাট) ; এবং (৬) শ্রীমোদক্রমদ্বীপ (দাসাখ্য)—মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)। সূর্যোদয়ান্তে পূর্বাহ্ন ৯।৫৪ মধ্যে একাদশীর পারণ।

৪। ১৫ই ফাল্গুন (ইং ২৮।২।৯৯), রবিবার ;—(৭) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৮) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)।

৫। ১৬ই ফাল্গুন (ইং ১৩।৩।৯৯), সোমবার ;—(৯) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন।

৬। ১৭ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।৯৯), মঙ্গলবার ;—শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর উপবাস ও সঙ্কীর্্তন-মহোৎসব।

৭। ১৮ই ফাল্গুন (ইং ৩।৩।৯৯), বুধবার ;—সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)। প্রাতঃ ৬।৩ গতে পূর্বাহ্ন ৯।৫২ মধ্যে শ্রীগৌর-জয়ন্তী-ব্রতোপবাসের পারণ।

জ্ঞাতব্যঃ—যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘাটি এবং যাঁহারা মঠে রাত্রিবাসে ইচ্ছুক তাঁহারা মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন। ১১ই ফাল্গুন (ইং ২৪।২।৯৯) বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইতে হইবে ; এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্বেই কেহ আসিলে থাকা ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।

❖“শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট” এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান আয়কর-মুক্ত।

✠	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।	✠
ধর্মঃ স্তুতিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাসু যঃ ।		নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
✠	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	✠

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সৃষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫০শ বর্ষ } ১৩ গোবিন্দ, ক্ষীরোদশায়ী, ৫১২ শ্রীগৌরাদ
৩০ মাঘ, শনিবার, ১৪০৫, ইং ১৩/২/৯৯ { ১২শ সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীকৃষ্ণপঞ্চকম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-কৃতম্]

॥ মনঃ শ্রীকৃষ্ণায় ॥

যমলার্জুনভঞ্জনমাশ্রিতরঞ্জনমহিগঞ্জনঘনলাস্যভরং
পশুপালপূরন্দরমভিসূতকন্দরমতিসুন্দরমরবিন্দকরম্ ।
বরগোপবধূজনবিরচিতপূজনমুরুকূজননবরোণধরং
স্মরনম্মবিচক্ষণমখিলবিলক্ষণতনুলক্ষণমতিদক্ষতরম্ ॥ ১ ॥

যিনি যমলার্জুনভঞ্জন ও আশ্রিতজনরঞ্জন এবং কালিয়সর্পের গঞ্জনকারী, যিনি কালিয়সর্পের ফণার উপরে সুন্দর নৃত্য করিয়াছেন, যিনি পশুপালন কার্যে সুদক্ষ, গোবর্দ্ধন পর্বতের ওহায় যিনি অভিসার করেন, যিনি অতি সুন্দর ও পদ্মহস্ত, ব্রজবণিতাগণ স্বীয়-যৌবনাদি স্ফূর্ণে যাঁহার পূজা করিতেছেন, যিনি মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট বংশীধারণ করিয়াছেন, যিনি কন্দর্প-কেলি বিষয়ে সুপণ্ডিত, সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন যাঁহার কলেবর এবং যিনি সকল কার্যেই অতিশয় দক্ষ ॥ ১ ॥

প্রণতানিপঞ্জরমম্বরপিঞ্জরমরিকুঞ্জরহরিমিন্দুমুখং
 গোমগুলরক্ষিণমনুকৃতপক্ষিণমতিদক্ষিণমমিতাত্মসুখম্ ।
 গুরুগৈরিকমণ্ডিতমনুনয়পণ্ডিতমবখণ্ডিতপুরুহৃতমখং
 ব্রজকমলবিরোচনমলিকসুরোচনগোরোচনমতিতাম্রনখম্ ॥ ২ ॥

যিনি প্রণতজনগণের অশনিপঞ্জর অর্থাৎ অভয়স্থান, যাঁহার বসন পীতবর্ণ, যিনি শত্রুরূপ মাতঙ্গসমূহের সিংহ, চন্দ্ৰের ন্যায় যাঁহার বদনকমল, যিনি গাভীগণের পালনকর্তা, যিনি কৌতুকবশতঃ শুকসারসাদির কণ্ঠধ্বনির অনুকরণ করেন, যিনি অতিশয় সরল, যাঁহার লীলানন্দ অপরিমিত, যিনি সুন্দর গৈরিক ধাতুদ্বারা মণ্ডিত, যিনি প্রণয়কোপ-পরায়ণা শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণী প্রভৃতি প্রণয়িনীগণের মানভঞ্জে সুপণ্ডিত, যিনি ইন্দ্ৰের যজ্ঞ খণ্ডন করিয়াছেন, যিনি শ্রীবৃন্দাবনরূপ কমলের প্রকাশে সূর্য্যস্বরূপ, যাঁহার ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্রভাবে গোরোচনা বিরাজ করিতেছে, যাঁহার হস্ত-পদাদির নখসমুদয় সুন্দর তাম্রবর্ণ ॥ ২ ॥

উন্মদরতিনামকশাগিতশায়কবিনিধায়কচলচিল্লিতং
 উদ্ধতসঙ্কোচনমম্বুজলোচনমঘমোচনমমরালিনতম্ ।
 নিখিলাধিকগৌরবমুজ্জ্বলসৌরভমতিগৌরভপশুপীযুরতং
 কোমলপদপল্লবমম্রমুবল্লভরুচিদুর্লভসবিলাসগতম্ ॥ ৩ ॥

মদমত্ত কন্দর্পের শাগিত শায়কের ন্যায় অলতায় যিনি বিরাজিত, যিনি দুর্বৃত্তদানবগণের বিক্রমনাশক, যিনি অম্বুজলোচন ও অশেষ পাপনাশন, সমুদয় দেবগণ যাঁহাকে পূজা করেন, সুতরাং সর্বাপেক্ষা যিনি গৌরবশালী ও উজ্জ্বল সৌরভবিশিষ্ট, যিনি সর্বদা গৌরবর্ণা ব্রজরমণীগণে পরিবৃত্ত, যাঁহার পদপল্লব অতি সুকোমল, ঐরাবত হস্তীর গমন অপেক্ষা যাঁহার সুন্দরগতি ॥ ৩ ॥

ভুজমূর্দ্ধিবিশঙ্কটমধিগতশঙ্কটনতকঙ্কটমটবীষুচলং
 নবনীপকরশ্চিতবনরোলশ্চিতমবলশ্চিতকলকণ্ঠকলম্ ।
 দুর্জ্জনতৃণপাবকমনুচরশাবকনিকরাবকমরুগোষ্ঠদলং
 নিজবিক্রমচর্চিত ভুজগুরুগর্ভিত গন্ধর্ভিত দনুজাদিবলম্ ॥ ৪ ॥

যিনি বিশালশঙ্ক, ভক্তগণ সঙ্কটাপন্ন হইলে তাহাদিগকে পালন করেন, যিনি অরণ্যভ্রমণে সমুৎসুক, যিনি অভিনব কদম্বকুসুমাকীর্ণ বনের ভ্রমরস্বরূপ, কোকিলের ন্যায় যাঁহার কণ্ঠধ্বনি, যিনি দুর্জ্জনরূপ তৃণরাশির অনলস্বরূপ, যিনি অনুচর গোপবালক-দিগকে দাবাগ্নি প্রভৃতি নিখিল ভয় হইতে রক্ষা করেন, যাঁহার ওষ্ঠাধর সুন্দর অরুণবর্ণ, যিনি নিজশক্তিদ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত বিশালবাহু দানবদিগকে বিনাশ করেন ॥ ৪ ॥

শ্রুতিরত্নবিভূষণরুচিজিতপুষ্পমলিদূষণয়নাস্তগতিং
 যমুনাতটতল্লিতপুষ্পমনল্লিতমদজল্লিত দয়িতাপুরতিম্ ।

বন্দে মহিবন্দিত নন্দমমন্দিত কুলমন্ধিতখলকংসমতিং

ত্বামিহ দামোদর হলধরসোদর হর নোদর মনুবন্ধরতিম্ ॥ ৫ ॥

॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণপঞ্চকম্ ॥

হে দামোদর! তোমার কর্ণযুগলে সুশোভিত রত্নপ্রভার সূর্য্যের শোভা পরাভূত হইয়াছে, তুমি চঞ্চল নয়নোপান্তস্থিত কজ্জল শোভাদ্বারা ভ্রমরশোভা তিরস্কার করিয়াছ, তুমি যমুনাতীরে পুষ্পশয্যায় শয়ান, তুমি প্রেমোন্মত্ত মধুরভাষিণী প্রেয়সীগণের সহিত আনন্দকর, তুমি পিতা বলিয়া নন্দমহারাজকে বন্দনা কর, তুমি গোপবংশ উজ্জ্বল করিয়াছ, তুমি ভক্তগণের প্রতি অনুরাগ-যুক্ত, অতএব হে হলধরসহোদর! আমরা তোমাকে বন্দনা করি, আমাদের সংসারভয় দূর কর ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক সমাপ্ত ।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৭ পৃষ্ঠার পর]

পৌত্তলিকতা

১। উপাসনাকাণ্ডে মূর্ত্তিপূজা ত্যাগ করা সম্ভবপর হয় কি?

“ঈশ্বরের প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই, সত্য ; কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অবশ্যই স্বীকৃত। ঐ সচ্চিদানন্দের পূর্ণাভির্ভাব বদ্ধজীবে সম্ভবপর নহে, অতএব মনুষ্য পরমেশ্বরের যে কোন ভাব ধ্যান করে, তাহাই অসম্পূর্ণ পৌত্তলিক ভাব হইবে। বাক্যের দ্বারা পৌত্তলিকতা সহজেই পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু উপাসনাকাণ্ডে তাহা সম্ভব হয় না।”

—তঃ সূঃ ৩৫ সূঃ

২। মোক্লেম শাস্ত্রে ঈশ্বরের শুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপ কি অস্বীকৃত হইয়াছে?

“শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদকাজীকে বলিয়াছেন যে, কোরাণে কেবল জিসমানি মূর্ত্তিরই নিষেধ; শুদ্ধ মুজররদি মূর্ত্তির নিষেধ নাই। সেই প্রেমময় মূর্ত্তি পয়গম্বর সাহেব নিজ অধিকার-মতে দেখিয়াছিলেন ; অন্যান্য রসের ভাবসকল অবগুষ্ঠিত ছিল।”

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৩। প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক কাহারো?

“অসভ্য বন্যজাতিগণ, অগ্নিপূজকগণ ও জোভ (Jove) স্যাটার্ণ (Saturn) প্রভৃতি গ্রহের পূজক গ্রীসদেশীয় ব্যক্তিগণ—প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা কিরূপ?

“জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনাক্রমে যুক্তিদ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত নির্বিশেষ-ভাবে যখন ‘ঈশ্বর’ বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৫। কাহারো তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক?

“চরমে নির্বাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্য্যের সগুণ মূর্ত্তিসকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিত মূর্ত্তি সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক-মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে ‘পঞ্চোপাসনা’ বলা যায়, তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৬। চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা কি?

“যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তি-ধ্যানই চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৭। পঞ্চমশ্রেণীর পৌত্তলিক কাহারো?

“যাঁহারা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন, তাঁহার—পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৮। শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও পৌত্তলিকতায় ভেদ কি?

“শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও পৌত্তলিক মতে অনেক ভেদ আছে। পরমার্থ-তত্ত্বের নির্দেশক শ্রীমূর্ত্তিসেবনদ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় ; কিন্তু নিরাকারবাদরূপ ভৌতিক তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা অথবা মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই ‘পৌত্তলিকতা’ অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবন্নির্দেশ।”

—কৃঃ সং ৬।১২

সমন্বয়বাদ

১। পূর্ব্বমহাজন-মত-অবহেলাকারী কি কপটী নহে?

“সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।

না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান।।”

—‘উপদেশ’,—১৭ কঃ কঃ

২। সমন্বয়বাদিগণের জল্পনা-কল্পনা কিরূপ? নবগৌরাঙ্গবাদীরা কিরূপে দমিত হইল?

“যিনি চারিশত বর্ষপূর্ব্বের কেবল বৈষ্ণবমতের অনুকূল ছিলেন, তিনিই আবার আসিয়া সেই মতের পরিবর্ত্তে সর্ব্বমত-সামঞ্জস্যকারী একপ্রকার মত প্রচার করিলেন। এই ধর্ম্মই জগতের সাধারণ ধর্ম্ম হইবে। তাঁহারা আরও বলিলেন,—কোন মত আশ্রয় করিলে বিশ্বপ্রেম স্থান পায় না। সমস্ত মতকে এক করিয়া রাখিতে পারিলে জগজ্জীবের বিশ্বপ্রেম উদিত হয়। * * * বিগত বৎসরে মহাপ্রভু তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দণ্ড দিয়াছেন। কতকগুলিকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়াছেন ; বাকী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া নিজে নিজে পৈতৃক ব্যবসা আশ্রয় করিয়াছেন। দুই একজন কেবল এখনও গৌরাঙ্গপ্রকাশের যত্ন পাইতেছেন, তবে ভদ্রসমাজে কিছু হইল না দেখিয়া অবশেষে ডোমপাড়া আশ্রয় করিয়াছেন। মহাপ্রভুর কি খেলা! কলি যতই

মস্তক উত্তোলন করে, মহাপ্রভু ক্ষণমাত্রে তাহার মুণ্ডের উপর মুদ্রার আঘাত করিয়া তাহার চেষ্ঠা বিফল করিয়া দেন।”

—‘নববর্ষে বিগতবর্ষের আলোচনা’, সসঙ্গিনী সং তোঃ ৮।১

৩। প্রকৃত পরমহংস কাঁহারা এবং তাঁহাদের আচরণ কি?

“অলম্পটরূপে শরীরযাত্রা নির্বাহপূর্বক সন্তুষ্ট অন্তঃকরণে কৃষ্ণৈকজীবন হইয়া সারগ্রাহী জনগণ বিচরণ করেন। যে-সকল লোকের দিব্যচক্ষু আছে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে ‘সমস্বয়যোগী’ বলিয়া জানেন, যাঁহারা অনভিজ্ঞ বা কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংসারাসক্ত বলিয়া বোধ করেন ; কখনও কখনও ভগবদ্ভিমুখ বলিয়া এ স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহী জনগণ স্বদেশীয় বিদেশীয় সর্বলক্ষণসম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, উপাসনা-লিঙ্গ ও ব্যবহারসকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতা বলিয়া অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এই সকল লোকই পরমহংস এবং পারমহংসী সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের শাস্ত্র।”

—‘উপক্রমণিকা’, কৃঃ সং

৪। ভিন্ন ভিন্ন আচার ও সাধনা দৃষ্ট হয় কেন?

“যাঁহারা যে স্বভাব, তাঁহারা সেই স্বভাবের দেবভাব, তদনুগত শাস্ত্রবাক্য এবং তদবলম্বী সঙ্গী ভাল লাগে। ‘সমশীলা ভজন্তি বৈ’—এই ন্যায়ানুসারে জগতে ভিন্ন ভিন্ন দেবভাব, ভিন্ন ভিন্ন সাধনা ও ভিন্ন ভিন্ন আচার স্বভাবতঃ হইয়া পড়ে। উপাস্যবস্তু এক বই দুই নহে।”

—‘শ্রীলঘুভাগবতামৃত-সমালোচনা’, সং তোঃ ১১।৩

৫। নিরপেক্ষতা কি ভক্তিধর্ম? তদ্বারা কি সৎস্তুনিষ্ঠা প্রকাশ পায়?

“নিত্যবস্তুনিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল আর কিছুতেই নাই। যদি সর্বনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে জগতে আর অশ্রেষ্ঠ কি আছে? যে যাহাতে নিষ্ঠা করে, তাহাই যদি ভাল, তবে ভাল-মন্দের বিচার কি? মুড়ি-মিশ্রি তবে এক হইয়া পড়ে। জীবের আর সাধন-ভজনের প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে বেশ্যানিষ্ঠ লম্পট এবং তৎসঙ্গনিম্পূহ পরমহংস—এ দুয়ের ভেদ কি? তাহা হইলে অতৎ ও তৎ দুইই এক! অতএব সৎস্তু-নিষ্ঠাই—শ্রেয়ঃ, অসৎস্তুনিষ্ঠাই—দোষ। সকল বিষয়ে নিরপেক্ষতা ভাল বলা যায় না ; বরং সংসাপেক্ষ হইয়া নিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দেওয়াই কর্তব্য।”

—সমালোচনা, সং তোঃ ২।৬

সভ্যতা

১। ‘সভ্যতা’-শব্দের অর্থ কি?

“সভ্যতা-শব্দের অর্থ—সভায় বসিবার যোগ্যতা, তাহাই সরল ভদ্রতা।”

—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

২। বর্তমান সভ্যতার স্বরূপ কি?

“ভিতরের দৃষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহারাই বর্তমান নাম—সভ্যতা (?)।”

—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

৩। ধূর্ত লোক কিরূপে সভ্যতা রক্ষা করে?

“ধূর্ত-লোকের সভ্যতার গৌরব কেবল বৃথা-তর্ক ও দেহবলের দ্বারা পরিরক্ষিত হয়।”

—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

৪। তুচ্ছ সভ্যতার জন্য ভক্তিধন হারান উচিত কি?

“ভক্তিমুদ্রা দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
‘বাতুলতা’ বলিয়া তাহায়।
যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি, হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায়?”

—‘অনুতাপলক্ষণ উপলব্ধি’, ২, কঃ কঃ

৫। কলিকালের সভ্যতা কি পাপাচারমাত্র নহে?

“লোকরঞ্জন বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি সভ্যতা হয়, তবে বেশ্যাগণ তোমাদের অপেক্ষা সভ্য! ★ ★ মদ্য-মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র, তাহা ভোজন করিয়া যে ‘সভ্যতা’ হয়, তাহা কেবল পাপাচারমাত্র। আজকাল যে অবস্থাকে ‘সভ্যতা’ বলে, তাহা কলিকালেরই সভ্যতা!”

—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্যা তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যোঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।
বৃহদ্বস্ত ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম।।
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যো তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ।।

ভগবানের স্বরূপ ঐশ্বর্য্যো মায়াগন্ধ নাই। মায়িক বিচারে যে-প্রকার দরিদ্রতা বা ঐশ্বর্য্যাসকল আছে, ভগবত্তায় সেরূপ নাই।

ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।

শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়।

কৃষ্ণমায়ার হস্ত হতে পরিত্রাণ পেতে হলে শ্রবণাদি অবশ্য কর্তব্য। ভজনের সহস্রপ্রকার ভেদ আছে, সংক্ষেপতঃ ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের কথা ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে পাওয়া যায়। প্রভুদের বাক্যে নবধা ভক্তির কথা পাই। তন্মধ্যে শ্রবণ সর্ব্বাগ্রে দরকার। নচেৎ অন্য অঙ্গসকল যাজন হয় না।

সেই সর্ব বেদের অভিধেয় নাম।

সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদগম।।

সাধনভক্তির পর্য্যায় লঙ্ঘন করে আপনাকে উন্নত মনে করলে অমঙ্গল অবশ্যজ্ঞাবী।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তি।

সাধকানাময়ং প্রেমং প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।

সাধনভক্তিপর্য্যয়ে ৮ প্রকার ক্রম, তদন্তর্ভুক্ত শ্রদ্ধা—সুদৃঢ়বিশ্বাস। বর্তমান সময় ছেলেবেলা থেকে যে-সকল কথা শুনেছি, তাতে প্রতারণিত হই নাই মনে করে তাতে বিশ্বাসযুক্ত হয়েছি। ঐ সকল কথা শুনতে শুনতে শিশু হতে পৌগণ্ড, তাহাতে কৈশোর, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ অবস্থার মধ্যে আমরা চলছি। কেহ পণ্ডিতাভিমानी, কেহ মূর্খ প্রভৃতি ভাবে দিন যাপন করি। জাগতিক কথায় শ্রদ্ধা কিছুদিন পরে আরও উন্নত হয়ে সাহিত্য, বেদ, বেদাঙ্গষ্টক পড়ি, পরে—

অহ্মাপৃত্তার্থকরণা নিশি নিঃশয়ানা নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।

দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োহপি দেব যুত্প্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি।।

যে-সকল বস্তুতে শ্রদ্ধা করা হল, তারা আমাদের অমঙ্গলের কারণ হল। কৃষ্ণের সংসারে অগ্রসর হতে হবে—এ চিন্তা ত্যাগ করে জগতে কি করে শ্রেষ্ঠ হব—এ বিচার প্রবল হয়। নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি যাতে উদিত হয় তা পরিত্যাগ করে জড়ের প্রভু হবার বাসনায় দিনাতিপাত করলাম। নানবিধ মত প্রকাশ হল। শারীর মঙ্গল, স্থূলসূক্ষ্ম শরীরের উন্নতিচেষ্টা, জগতের সমৃদ্ধি বিস্তার প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত হল, বাস্তববেদ্য জানা হল না। চতুর্বর্গ কুপথে নিয়ে গেল।

আমরা অশ্রদ্ধাধান। যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হরিকথা কীর্তন করেন, তবে আমাদের মঙ্গল হয়। জড়জগতের পদার্থে বিশ্বাসে মঙ্গল হয় না। হরিকথায় শ্রদ্ধা কিরূপে হয়?

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব

জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।

স্থানে স্থিতা শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্গনোভি-

র্যে প্রায়শোহজিত জিতোহ্যসি তৈস্তিলোক্যাম্।।

সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য হলে শ্রদ্ধা হবে, ভগবদনুসন্ধানপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হবে। কিরূপে তাঁর নিকটে যেতে পারি, কে আমরা, কেন এখানে এসেছি, এ সকল জানা দরকার। ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা হলে তাঁর নিকট যাবার সৌভাগ্য হয়। হরিকথায় রতিবিশিষ্ট হলে মঙ্গল হবে। ভগবানের রঞ্জনকার্য্যই রতি। তাতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হয়ে সাধুসঙ্গ, আত্মার স্বরূপবোধে শ্রদ্ধায়ুক্ত হয়ে সাধুর বচন শ্রবণ করা দরকার। মনে মনে কথা সৃষ্টি করলে বা যাকে তাকে সাধু বলে মানলে সুবিধা হবে না। বেদাঙ্গে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হয়ে সেবা ত্যাগ করে ইতরকথায় নিজের উন্নতিকামী হলে হবে না। জড়ের কথায় শ্রদ্ধা হলে স্বরূপবোধের অভাবে অশ্রদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গ হয়। নিজে গুরু সেজে অশ্রদ্ধ ব্যক্তিদের উপদেশ করতে ইচ্ছা হয়। ধনীর দরিদ্রের সঙ্গ বা দরিদ্রের ধনীর সঙ্গ সঙ্গত হয় না। পণ্ডিত মূর্খের সঙ্গ করলে পাণ্ডিত্য ক্ষয়

হয়। মূর্খ পণ্ডিতের সঙ্গ করলে পণ্ডিত হতে পারে। সমজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ যারা তাদের নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠের সঙ্গ হওয়া দরকার; নচেৎ জীবন বৃথা। আমি একদিকে সে অপরিদিকে গেলে, ঘড়ির দম দেওয়া ভুলে গেলে হবে না। জহুরী না হলে ঠকে যাব। কৃপানিধানের আশ্রয় করা একমাত্র কর্তব্য। হরিকথা শ্রবণ না করে কেউ সংসারে প্রবিষ্ট করলে অমঙ্গল। জগদ-ভোগ ও ত্যাগ—দুই প্রকারই অমঙ্গলজনক। তা হতে পৃথক্ হওয়া দরকার।

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।

বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ (ভাঃ ১১।১৯।১৮)

নশ্বর জগতের প্রতি অভিনিবেশ দৃঢ় হলে অমঙ্গল বরণ করা হবে। বিরিঞ্চিলোক লাভ করলেও অমঙ্গল। কর্ম্মী, জ্ঞানী হলে হরিভজনে চিত্ত যাবে না। বিষয়ীর সন্দর্শন মহা অপরাধের কথা।

কালনেমি, রাবণ ত্রিদণ্ডগ্রহণের অভিনয় করে অসুবিধা করেছিল। সজ্জা নিলেই সাধু হবে না। সদসদ্বিচার হওয়া দরকার। যে সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করে না, সেই অসৎ। যা হরিকথা নয়, তাও অসৎ বুঝায়।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।

হরাবভক্তস্য কুতো মহদগুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

আমি কে? কেন ত্রিতাপাদি ভোগ করি?—এ বিচার হওয়া দরকার। স্বরূপের পরিচয় না হলে প্রকৃতিজনের মর্যাদায় ব্যস্ত হব—বিষয়াগ্রহ প্রবল হবে। সুতরাং শ্রদ্ধাযুক্ত না হলে, সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ না হলে, তাঁদের সঙ্গে হরিকথা শ্রবণ না করলে সুবিধা হবে না। কর্ণে ‘সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য’ বাণী প্রবেশ না করলে—কৃষ্ণগানে শ্রদ্ধা না হলে ইতরধর্ম্মে আসক্ত থাকতে হবে। “সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্” হলে কর্তব্য পালন হবে।

সংসারটী সমুদ্রতুল্য অতি দুস্তর। আমরা এটী পার হতে অসমর্থ। বিশ্বের শক্তিকালিত হয়ে বিশ্বে উন্মত্ত হবার যত্ন থাকলে সুবিধা হবে না—শত জন্মেও মঙ্গল হবে না।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চ্যতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।

অব্যাকৃতং ভাগবতোহথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধা কলাত্যায়ে॥

হরিকথায় শ্রদ্ধা হলে সুবিধা। আমরা বিবিধ দুঃখে আচ্ছন্ন, তা হতে উদ্ধারের উপায়—হরিকথা শ্রবণ করা। তা চিন্ময়ী কথা, ভোগপর বা ত্যাগপর কথা নহে।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।

ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

জীবন্মুক্ত না হলে জীবন্মৃত। ভগবানের ভূত্য বিচারের দ্বারা সকল মঙ্গল, নচেৎ শ্রেষ্ঠ হবার চেষ্টায় জড়ের অভিনিবেশদ্বারা ভয় হবে।

“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োহস্মৃতিঃ।

তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্তৈক্যেশং গুরুদেবতাত্মা।”

অব্যভিচারিণী ভক্তি পরিত্যাগ করে অন্য কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হলে অমঙ্গল। ভক্তি আশ্রয় করে এ সকল বিষয় ছেড়ে দিলে জগতের কথায় শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়ে হরিনাম হবে না। হরিনামকে জাগতিক শব্দবিশেষ মনে করতে হবে না। মিছাভক্ত হলে মঙ্গল হবে না। অসদ্বিচারযুক্ত হয়ে সম্প্রদায় সৃষ্টি করলে সংসম্প্রদায়ে সৌখ্য স্থাপন করব না।

কনককামিনীর প্রতি ধাবমান হলে মঙ্গল হয় না। যারা নানাকথায় ব্যস্ত তাদের দুঃসঙ্গ ত্যাগ করা কর্তব্য। ভাগবতের নিকট অধ্যয়ন করতে হবে। যারা ভক্তসঙ্গ করে না, তাদের ভাগবত শ্রবণ হয় না।

“বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।”

নাম গ্রহণ-ফলে অশেষ অঘ বিনষ্ট হবে, তা না হয়ে অঘ বৃদ্ধি হলে, নাম হচ্ছে না জানতে হবে।

সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্তব্য। যাদের বৈকুণ্ঠনামে শ্রদ্ধা নাই, তারা লৌকিক, কৌলিক, ব্যবহারিক গুরুর নিকট নামগ্রহণ করে অমঙ্গলে আবদ্ধ থাকেন।

‘যদপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্য্য তদা কীর্তনাখ্যভক্তি-সংযোগেনৈব’—এ বিচার-রহিত হয়ে কীর্তন ত্যাগ করে অন্য ভক্তি হলে হবে না। তীর্থবাসাদিও কীর্তনাখ্য ভক্তিসংযোগে হওয়া দরকার।

গুরুপাদপদ্মে অকৃত্রিম শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া দরকার। সর্বক্ষণ শ্রীগুরুর চরণ স্মরণ করতে হবে,—‘বিশ্রভেণ গুরো সেবা’।

বার্ষভানবীর নখশোভা-দর্শনে অসমর্থ ব্যক্তি হরিকথা শোনে না। কীর্তনাখ্য ভক্তির পূর্বে শ্রবণাখ্য ভক্তি ; নচেৎ গোলমাল হবে।

পরম মোক্ষপ্রদ শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বাসস্থান হলে সমস্ত মঙ্গল। ইহা নিত্য বাসস্থলী। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ‘কন্নিভ্যঃ পরিতো হরেঃ’ শ্লোকে রাধাকুণ্ডের সর্বোৎকর্ষের কথা জানিয়েছেন। রাধাকুণ্ড কিরূপে আশ্রয় করতে হবে আলোচনা করা দরকার। আশ্রয় করছি অভিমান করলে বিষয়ী হতে হবে। ২৪ ঘণ্টা হরিভজন দরকার। মহাভাগবতের সেবাবঞ্চিত হলে হরিভজন হয় না। মধ্যম ভাগবতের আনুগত্য এবং কনিষ্ঠে আদর করা ব্যতীত ভজন হয় না। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের সর্বক্ষণ সঙ্গপ্রভাবে মঙ্গল অবশ্যপ্রাপ্য। শুদ্ধতা ত্যাগ করলে মঙ্গল নাই। শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ ত্যাগ করে—গুরুপাদপদ্ম ত্যাগ করে হরিসেবা হয় না। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবার আলোচনা কর্তব্য।

ভ্রম-সংশোধন

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯ম	৩১৩	৯	অহং	অহো
১০ম	৩৭৭	৯	হৃদৈশেহর্জুন	হৃদৈশেহর্জুন
”	৩৭৯	২৫	ভূমিরাপহনলো	ভূমিরাপহনলো
”	৩৮৪	২৯	শ্রিয়োহস্ত	শ্রিয়োহস্ত
”	৩৮৫	৩	ভক্তবিনোদ	ভক্তিবিনোদ
”	৩৮৫	৯	সোহস্যংশবিভবঃ	সোহস্যংশবিভবঃ
”	৩৯২	৩৩	গৃহুতোহনুযুগং	গৃহুতোহনুযুগং
”	৩৯৬	২৫	শিরোহপি	শিরোহপি
”	৩৯৭	৯	পুরাণাকৌহধুনোদিতঃ	পুরাণাকৌহধুনোদিতঃ
”	৩৯৯	১৫	শাস্বতোহয়ং	শাস্বতোহয়ং

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তথা পাণ্ডবগণ ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং অতিশয় ভাগ্যবান, কারণ তাঁহাদের গৃহে মনুষ্যরূপী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গূঢ়রূপে বাস করেন—ইহা জানিয়াই ভুবনপাবন মুনিগণ তাঁহাদের গৃহে সর্বদা গমনাগমন করিতেন। মহাজনের অন্বেষণীয় নররূপী শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুল-পুত্র, আত্মা, পূজনীয়, আজ্ঞানুবর্তী ও গুরু অর্থাৎ হিতোপদেষ্টারূপে নিত্যকাল বর্তমান। পাণ্ডবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় ও নিত্যভক্ত। তাই বেদব্যাস-প্রণীত মূল সংস্কৃত মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভক্তশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের যে নরকদর্শনের কথা উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা সম্ভবপর কিনা—আমাদের আলোচনার বিষয়। এক মহতী শিক্ষা-সমন্বিত ব্যাপার প্রকাশ করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা নরকদর্শনের অভিনয় করাইয়াছিলেন। উক্ত লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ স্মার্তবাদ নিরাস করিয়া আমাদিগকে বিবর্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য প্রিয়পুত্র অশ্বখামার মৃত্যুর পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে জয়ী করাইতে যে কোন প্রকারে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইবার জন্য অশ্বখামার মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য্য একমাত্র মহা সত্যবাদী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য ব্যতীত অন্য কাহারও বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ‘অশ্বখামা হতঃ’ ইহা দ্রোণাচার্য্যকে বলিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যদ্রষ্ট হইবার ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহা বলিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনের দ্বারা কৌরবপক্ষীয় অশ্বখামা নামক এক বৃহৎকায় হস্তীকে নিহত করিয়া ধর্মরাজকে “অশ্বখামা হতঃ” ইহা বলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ধর্মরাজ শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে ‘অশ্বখামা হত ইতি গজঃ’—ইহা বলিয়াছিলেন। ধর্মরাজের ‘অশ্বখামা হতঃ’—এই বাক্যটি উচ্চারিত হইবামাত্র ‘ইতি গজঃ’ শব্দদ্বয় উচ্চারণকালে বিপুল শঙ্খধ্বনি করিয়া ঐ শব্দদ্বয় দ্রোণাচার্য্যকে শুনিতে দিলেন না। তখন দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোকে মুহ্যমান হইয়া নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে ধৃষ্টদ্রুমন্ তাঁহার শিরচ্ছেদ করিয়াছিলেন।

সর্বশক্তিমান্ স্বতন্ত্র ইচ্ছাসম্পন্ন ভগবান্ নানাপ্রকার বিধি ও নিষেধের বাধ্য করিয়া এই প্রাকৃত জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ স্বরূপজ্ঞানবর্জিত হইয়া এখানে লৌকিক ও বৈদিক বিধি-নিষেধের অন্তর্গত হন। বদ্ধজীব নিজের স্বতন্ত্রতাক্রমে এই প্রাকৃত জগতের সুখ-দুঃখ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হন। “সদা সত্য কথা বলিবে”, “মিথ্যা কথা বলিবে না”, “চুরি করা মহাপাপ” প্রভৃতি নীতিবাক্যসকল প্রাকৃত জগতের নীতি বা বিধিমাত্র। প্রাকৃত নীতির দ্বারা জীবের কোন মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। উপরোক্ত নীতিবাক্যসমূহ মুখ্যবিধি অর্থাৎ ভক্তিনীতির অনুগত হইলেই জীব প্রকৃত সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণ করিতে সক্ষম হন। জাগতিক বিধি বা নীতিতে

পরমেশ্বরের চিন্তা তথা সেবার ব্যবস্থা নাই বলিয়া তাহা অন্যপ্রকারে সুন্দর হইলেও, মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ নয়। জাগতিক বহিস্মুখ নীতির সহিত মুখ্যবিধির আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। মুখ্যবিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবদুপাসনা অর্থাৎ ভগবানের স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পূরণ। জাগতিক বিধিসকল নশ্বর জগতের উপযোগী জানিয়া যাহারা সেইসকল ধারণাসমূহ সম্যক্রূপে পরিহার করিয়া ভগবানেরই সেবা করেন, তিনি দেহধারিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভগবানের আজ্ঞাপালনকারী জাগতিক বিধি-নিষেধের অনেক উর্দ্ধে বসবাস করেন। শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

যে করয়ে প্রভু, আজ্ঞা-পালন তোমার।

সেই জন বিধি-নিষেধের পার।। (চৈঃ ভাঃ)

প্রাকৃত জগতে সেব্য, সেবক ও সেবনধর্ম্ম কালাধীন ও দেশাধীন। আপনাকে তদ্রূপ কালক্ষোভ্য পাত্র বিবেচনা করিলে ভোগী বা ত্যাগীর অভিমান বদ্ধজীবকে অহঙ্কারবিমূঢ় করিয়া থাকে। তখন জাগতিক হিত ও অহিতের বিচারে ভগবৎসেবা-বিমুখতা প্রবল হয় এবং বদ্ধজীব উহাকেই উৎকৃষ্ট বিধি জ্ঞান করিয়া ভ্রমগ্রস্ত হন।

আর্থিক বা নৈতিক ধর্ম্মের নামান্তরই—স্মার্ত-ধর্ম্ম, আর পারমার্থিক বৈধ-ধর্ম্মের নাম—সাধনভক্তি বা ভক্তিধর্ম্ম। যে-সকল কর্ম্ম কেবল জগতের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণসাধক, সেই সকল কর্ম্ম নৈতিক বা স্মার্তধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। পরম স্বতন্ত্র স্বরাট পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছারূপা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পূর্ত্তি বা সাক্ষাৎ আদেশ প্রতিপালনই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সেবা। যাঁহারা ভগবৎপ্রীতি বা ভগবৎসেবাকেই পরম স্বতন্ত্রা সম্রাজ্ঞীরূপে বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে নৈতিক বিধির অধীনা মনে করেন, তাঁহারা স্মার্ত এবং তাঁহাদের মতবাদ—স্মার্তধর্ম্ম বা কর্ম্মকাণ্ড। স্মার্তরা ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে জাগতিক বিচারে অসত্য বা দুর্নীতি-পুষ্ট মনে করেন। জাগতিক নীতিসমূহ জড়বিচারে প্রপঞ্চে সর্বোত্তম ; কিন্তু তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় কৃষ্ণপ্রীতি বা ভক্তিনীতি অপেক্ষা কিছুই নহে। স্মার্তগণ অপ্রাকৃত পারমার্থিক বিচারান্ত্রিত প্রেমিক ভক্তগণকে কম নৈতিক জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রীতির এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে, তাহার নিকট পরমোপাদেয় নৈতিক আদর্শ পর্য্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। ‘কর্তব্যবুদ্ধি’ কৃষ্ণপ্রেমার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেবাকার্য্যে উন্মুখ হইলে যে সুদুরাচার লক্ষিত হয়, তাহাও সমাদরে বরণীয়। যাঁহারা ভক্তিকেই পরম স্বতন্ত্রা সম্রাজ্ঞীরূপে লক্ষ্য করেন, তাঁহারা পারমার্থিক। কৃষ্ণভক্তি না হইলে প্রাপঞ্চিক কর্তব্যবুদ্ধি বা অবিশ্বাসপ্রবণতা অপসারিত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশপালন বা স্বতন্ত্র ইচ্ছাপূরণ করাই সত্যপালনের পরাকাষ্ঠা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমসত্য পুরুষ—তাহা সকল শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।২।২৬) “সত্যব্রতং সত্যপরং” শ্লোকে দেবতাগণ ভগবানের স্তুতি করিয়াছেন,—“হে ভগবন্! আপনি সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ আপনি যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহার সত্যতা সংরক্ষণ করিয়া থাকেন ; অতএব আপনি সত্যব্রত। সত্যই আপনাকে পাইবার উপায় বলিয়া আপনি সত্যপর। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—এই ত্রিবিধকাল আপনি সমভাবে

বর্তমান থাকেন বলিয়া আপনি ত্রিসত্য, আপনি পঞ্চভূতের উৎপত্তির কারণ, আর পঞ্চভূতের উৎপত্তির পরেও আপনি তাহাতে অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান এবং ভূতনাশে অর্থাৎ প্রলয়কালে আপনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। আপনি ঋত অর্থাৎ সুসত্যবচন এবং সত্য অর্থাৎ সমদর্শন উভয়েরই প্রবর্তক। অতএব আমরা সত্যাত্মক আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।” অতএব সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে কখনও মিথ্যা আশ্রয় করিতে পারে কি? ভগবান্ সত্যস্বরূপ বলিয়া তাঁহার বচনও পরমসত্য। স্মার্তগণ বাহ্য দেহ ও মনের বিচারে আসক্ত; তাহারা ভক্তিনীতির কোন কিছুই জানেন না; তজ্জন্য তাহারা জাগতিক সত্যবাদীর অভিনয়কারী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের পরমসত্যবাক্যে অর্থাৎ সাক্ষাৎ আদেশে “অর্দ্ধকুকুটি বিচার” আনয়ন করিয়া নিজেদের অমঙ্গলের পথ পরিষ্কার করেন। পরমস্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ অভিলাষকে উল্লঙ্ঘন করিবার ফলে জাগতিক সমল-সত্য পালন করিয়াও স্মার্তদের নরকদর্শন তথা নরক যাতনা ভোগ করিতে হয়। হেয় ধর্মযুক্ত জগতে কোন সত্য নাই। জাগতিক সত্য বা নীতি কোনকালেই নিশ্চল বা নিশ্চিত নহে।

অভক্তি নীতি অপেক্ষা ভক্তিনীতি অনন্তকোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। ভক্তিনীতির নামই পরমসত্য। “ভগবানের প্রতি ভক্তিদ্বারাই সকল সম্পন্ন হইবে”—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত জাগতিক বিধির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া ভক্ত একমাত্র ভগবানের শরণাগত হন। “ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুরাগ, ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগ”—এই উভয়পক্ষীয় অনুরাগের নামই ভক্তনীতি, তাহাই পরমসত্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ়ানুরাগী পরমভক্ত যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণের আদেশ লঙ্ঘন করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রকৃতপক্ষে স্মার্তগণের গতি প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজভক্ত যুধিষ্ঠিরের মনে নৈতিক সত্য ও মিথ্যার বিচার আনয়ন করিয়া তাঁহাকে নিজ আদেশ পালনে অস্বীকৃত করাইয়াছিলেন। “সত্যমেব জয়তে” অর্থাৎ সত্যের জয় সর্বত্র, “নাস্তি সত্যং পরো ধর্মঃ”। ন পাপমনুতাং পরম্” অর্থাৎ “সত্যের বাড়া ধর্ম নাই, মিথ্যার বাড়া পাপ নাই”—প্রভৃতি প্রবাদবাক্যসমূহের ‘সত্য’ শব্দটী ভক্তিনীতির অমলসত্যকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। নতুবা মিথ্যারই নামান্তর জাগতিক সত্যকে বহুমানন করিয়া স্মার্তগণের কখনও নরকদর্শন করিতে হইত না। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলে জাগতিক মিথ্যাই পরমসত্য বলিয়া পরিগণিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অসন্তুষ্টিতে জাগতিক সমল সত্যও বিপর্যয় আনয়ন করিয়া থাকে। শাস্ত্রবাক্য যথা,—

অরির্মিত্রং বিষং পথ্যং ধর্মম্ অধর্মমুচ্যতে।

সুপ্রসন্নো হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্যয়ঃ।।

কেহ যদি ধর্মরাজ্যের ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র বাহ্যবিচারে ধর্মরাজ্যের সত্যবাদিতার আদর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই সকল সমল সত্যকে অমল বলিয়া গ্রহণ ও পালন করিয়াও তাহাকে নরক দর্শন করিতে হইবে।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।

স্বকর্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি’ মজে।।

বাহ্যবিচারে বাহ্য অসত্য বা দুর্নীতিপুষ্ট বলিয়া মনে হয়, তাহাও যদি ভগবানের সেবাকল্পে সাধিত হয়, তাহা হইলে তাহাই পরম সত্য। শাস্ত্রে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ে বলিয়াছেন,—

মরিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধৰ্ম্মায় কল্পতে ।

মামনাদৃত্য ধৰ্ম্মোহপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ ॥

পাপং ভবতি ধৰ্ম্মোহপি ভবাভক্তেঃ কৃতো হরে ।

নিঃশেষ ধৰ্ম্মকর্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে ॥ (ভক্তিসন্দর্ভ)

ভগবান্ বলিতেছেন,—“বাহ্যবিচারে যাহা পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা আমার নিমিত্ত কৃত হইলে তাহাই ধৰ্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর আমাকে অনাদর করিয়া ধৰ্ম্মও যদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে আমার প্রভাবে সেই ধৰ্ম্মই পাপরূপে পর্য্যবসিত হইবে।” ভক্ত বলিতেছেন,—“হে হরে! তোমার অভক্তজনের কৃত ধৰ্ম্ম পাপরূপে পরিণত হয়। নিঃশেষ অর্থাৎ যাবতীয় ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠানকারীও যদি তোমার অনুরাগবিহীন হয়, তাহা হইলে সেইরূপ অভক্ত নরকে গমন করে।”

পরমসত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আজ্ঞা অপেক্ষা বাহ্যিক নৈতিক সত্য-মিথ্যা বিচারকে উৎকৃষ্ট মনে করিয়া যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশ পালন করিতে কুণ্ঠিত হইবার অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের কথা মহাভারতে বর্ণিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ কোনকালেই যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হয় নাই বা হইতে পারে না। কারণ, ভক্তকে যদি নরকদর্শন বা নরক যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে ত’ কাহারও ভগবদ্ভক্তনে প্রবৃত্তি দেখা যাইত না। তবে শাস্ত্রে কোথাও কোথাও যে ভক্তের নরক গমনের কথা উল্লেখ রহিয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য কি? পরমকারুণিক ভক্তগণ নরক যাতনাগ্রস্ত জীবগণকে উদ্ধার করিবার মানসেই নরকে গমন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্তিই ভক্তের নিকট পরমোপাদেয় বস্তু। নরকে অবস্থানকালীন ভক্তের কোন ক্লেশ বা দুঃখ অনুভব করিতে হয় না; কারণ, ভক্ত যে সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমানন্দেই মত্ত থাকেন। সুতরাং ভক্তের নরক যাতনা ভোগ করিবার অবসর কোথায়?

ধৰ্ম্মরাজ স্বর্গে যে ইন্দ্রমায়া-রচিত নরক দর্শনের অভিনয় করিয়াছিলেন তাহা স্বর্গারোহণ পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—“ব্যাভেনৈব ততো রাজন্ দর্শিতো নরকস্তব। ন চ তে ভ্রাতরঃ পার্থনরকার্হা বিশাম্পতে। মায়ৈষা দেবরাজেন মহেন্দ্রেণ প্রযোজিতা।” অর্থাৎ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—“হে রাজন্! আপনাকে ছলপূর্ব্বক নরক দর্শন করান হইয়াছে। আপনার ভ্রাতৃগণও কদাপি নরকগমনের যোগ্য হইতে পারে না। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রযোজিতা মায়াদ্বারাই আপনার ছল নরক দর্শন হইয়াছে।”

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ‘মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে’র ৩২শ অধ্যায়ে (১০৮-১০৯ শ্লোক) লিখিয়াছেন,—“যুধিষ্ঠির স্বর্গে যে নরক দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে নরক নহে; কারণ স্বর্গে নরকের কোন অবস্থান নাই, উহা ইন্দ্রজালের ন্যায় ইন্দ্রমায়া-সৃষ্ট নরকমাত্র। ইহা দ্বারা ভগবান্ জানাইলেন যে, জগতের ভগবদ্ভক্তিবহীন সত্যবাদি-সম্প্রদায় নিশ্চিত সত্য বলিতে পারে না, অনেক সময় অজ্ঞাতসারেও সহজ-কপটতাক্রমে তাঁহাদের বাক্য অসত্য হইয়া পড়ে এবং সেই অসত্যের জন্য তাঁহাদিগকে নরক দর্শন করিতে হয়। যাঁহাদের পরাৎপর পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে বিশ্বাস নাই, যাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, ‘জাগতিক খণ্ডবিচারে সর্বধৰ্ম্ম বিবর্জিত হইলেও বাসুদেবের আজ্ঞায়

কিঞ্চিৎ পাপও স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহারা কৃষ্ণের ভক্ত নহেন, স্মার্তমাত্র। তাঁহারা বাহ্যে সত্যবাদী হইলেও তাঁহাদের নরক দর্শন হইয়া থাকে, কারণ তাঁহারা পরম বাস্তবসত্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা পরিত্যাগ করিয়া খণ্ড সমল-সত্যে অত্যাগ্রহবিশিষ্ট, ইহাই মহাভারতে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনাভিনয়ের তাৎপর্য।”

শ্রীকৃষ্ণ শরণ্য—শরণাগতের বন্ধু। তাঁহার অভিরুচিমূলক কৰ্ম সম্পাদন করাই প্রত্যেক জীবের কর্তব্য। অন্যথায় স্মার্তগণের জড়নীতির শৃঙ্খল তাহাকে অনন্তকালের জন্য ভব-কারণাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৫০শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধৰ্ম গ্রন্থে লিখেছেন,—“শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার ইয়ত্তা, অতএব কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তিচেষ্টা। ব্রহ্মানুশীলন ও পরমাত্মানুশীলন-রূপ চেষ্টাসমূহ জ্ঞান-কর্মের অঙ্গবিশেষ,—ভক্তি নয়। চেষ্টা-প্রাতিকূল্য সম্বন্ধেও দেখা যায়, অতএব আনুকূল্য-ভাব ব্যতীত ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না।” কাজেই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মানুশীলনকে ‘ভক্তি’ বলা যায় না। ব্রাহ্মণের কৃষ্ণানুশীলনেও আনুকূল্য-ভাব, অন্যাভিলাষ-শূন্যতা, জ্ঞান-কর্ম-যোগাদির দ্বারা অনাবৃত্ত—এরূপ লক্ষণাদি পরিদৃষ্ট হয় না। কর্ম্মাধিকার সমাপ্ত না করলে কি ভক্ত্যাধিকার লাভ হয়? ভক্তিধর্মে সকল মানুষেরই অধিকার আছে, সেখানে জাতি-কুলাদির কোন বিচার নেই। ভগবদ্ভক্তি লাভ হলেই সকলেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারেন। ‘নারদীয় পুরাণে’ কথিত হয়েছে,—

শ্বপচোহপি মহীপাল বিষ্ণু-ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।

বিষ্ণুভক্তি-বিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥

অর্থাৎ—“হে রাজন! চণ্ডালও বিষ্ণুভক্ত হলে তিনি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এমন কি, যে সন্ন্যাসী বিষ্ণুভক্তিবিহীন, তিনি চণ্ডাল হতেও নিকৃষ্ট।”

যন্মাম সৰ্ব্বং শ্রবণাৎ পুরুষোহপি বিমুচ্যতে। (ভাঃ ৬।১৬।৪৪)

“যাঁর নাম একবার মাত্র শ্রবণ করেই পুরুষ অর্থাৎ অধার্মিক চণ্ডালও তৎক্ষণাৎ সংসার ও জাতিদোষ হতে পরিমুক্ত হয়।”

তথাকথিত বর্ণাশ্রমীর সাধন ভুক্তি ও মুক্তির সাধন, উহা জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাবের সাধন নয়; তাহা আরোপসিদ্ধা ভক্তিমাত্র,—শুদ্ধভক্তি নয়। ভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮।২২) বলেছেন,—“ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বন্যথা”, অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-কামনাদি যাতে নেই, সেইরূপ একমাত্র ঐকান্তিক ভক্তিদ্বারাই তাহা লভ্য। নিগুণ ভক্তির আশ্রয়কারী ভক্তগণ নিগুণভক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ নিগুণত্ব বা গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন; কিন্তু ব্রাহ্মণাদি বর্ণাশ্রমীদের যে ভক্তি, তাহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি অর্থাৎ নামে মাত্র ভক্তি। তাকে নিগুণ অনন্যা ভক্তি বলা আদৌ যুক্তিযুক্ত হয় না। বর্ণাশ্রমীদের তত্ত্বজ্ঞানহীনতা-দোষে তাঁদের

চিন্তে শুদ্ধভক্তির উদয় হওয়া সম্ভব নয় এবং তাঁরা সাধুসঙ্গ না পেলে শুদ্ধভক্তিলাভে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণের শুদ্ধভক্তি থাকলে তাঁরা ব্রহ্মের উপাসক না হয়ে পরব্রহ্ম কৃষ্ণেরই উপাসক হতেন। ভক্তির স্বভাবই কৃষ্ণের উপাসনায় নিযুক্ত রাখা ও কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির চিন্তা-ভাবনায় নিরন্তর মগ্ন রাখা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়েছে,—

ভক্তির স্বভাব—ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।

দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥

ভক্ত-দেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।

গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্মল ভজন॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১০৫-১০৬)

ব্রাহ্মণগণ এবং অন্য বর্ণের মনুষ্যগণ সাধারণতঃ পঞ্চোপাসক হওয়ায় তাঁদের ভক্তির একাগ্রতা ও শুদ্ধতা বিঘ্নিত হয়—এতে সন্দেহ নেই। আমাদের স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগে—বর্ণাশ্রম কি নিত্য? তদুত্তরে জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বক্তৃতায় বলেছেন,—“প্রত্যেক জীব-মাত্রে বাহিরের খোলসকে (খামকে) আশ্রম বলে মনে করেন। আমি নিত্য ভগবৎ-সেবক, ভগবৎ-সেবাই আমার নিত্য ধর্ম। আমি বর্ণী বা আশ্রমী নই, সুতরাং বর্ণাশ্রম ধর্ম আমার নিত্য ধর্ম কি করে হবে? বর্ণাশ্রম ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালিত হলে ইহ ও পরলোকে সুবিধা হয়। দেহ থাকা পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম। ইহা ঐহিক মঙ্গলের উপযোগী, চতুর্দশ ভুবনে ঔপাধিক স্থিতি ইহার আবশ্যিকতা আছে, কিন্তু নিত্য জগতে ইহার কিছুই উপকারিতা নেই। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই, আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বাণপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই। ভগবানের সহিত আমার সম্বন্ধ, ভগবানকে না ভুললে সেবক আমি, আমার সুবিধা হয়। ভগবান্ চেন, জীবও চেন। জীব ভগবানের অংশ, জীব ভগবানের ন্যায় বিভূ-চেতন নয়, জীব অণুচেতন ; জীব ভগবানের অধীন।

বর্তমানে জীব চেতনের বা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে দুর্গতি লাভ করেছে। ভগবৎসেবা হতে বিচ্যুত হয়েই আমাদের দুর্গতি এবং তাঁর সেবা হতেই সুবিধা।”

বৈষ্ণবীয়-বিচারে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম বিহিত আছে, তাকে দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম বলা হয়ে থাকে ; আর তথাকথিত প্রাকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম যাহা সমাজে দৃষ্ট হয়, তাহা আসুরিক বর্ণাশ্রম ধর্ম। এক্ষণে উক্ত দ্বিবিধ বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণী আলোচ্য ; যথা,—“দৈব ও আসুর ভেদে বর্ণাশ্রম ধর্ম দ্বিবিধ। হরিনামপরায়ণ শুদ্ধভক্তগণ ভক্তির অনুকূলে যে আশ্রমধর্ম স্বীকার করেন, উহা ‘দৈব’। যে বর্ণাশ্রম ধর্মে ভাগবত ধর্ম অনুষ্ঠিত হয় না, উহাকে ‘আসুর’ নামে অভিহিত করা হয়। ভক্ত্যাভিলাষী কোন ব্যক্তিরই ‘আসুর বর্ণাশ্রম ধর্ম’ পালনীয় নয়। ‘হরিনাম’ গ্রহণ বললে—দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম তাতেই অনুসৃত আছে জানতে হবে।”

তথাকথিত কর্মকাণ্ডীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম জীবনোপায় হলেও উহা বাহ্য, তদপেক্ষা বহু উচ্চত্তরের ধর্ম শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু শাস্ত্র-সিদ্ধান্তমূলে স্থাপন করেছেন। বৈষ্ণব পরম-হংসগণের আনুগত্যে দৈববর্ণাশ্রম ধর্মে অবস্থিত হয়ে নিত্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা

করলে পরিশেষে সর্বসাধ্যসার প্রেমভক্তিতে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। কৰ্মকাণ্ডীয় বর্ণাশ্রম ধৰ্ম পালনে আত্মধৰ্মের পরিচয় পাওয়া দুরূহ। ‘দৈববর্ণাশ্রম’ সম্বন্ধে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের ভাষণে যাহা জানা যায়, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে এস্থলে উল্লেখ করছি,—

“বৈষ্ণব উত্তম বা অধম কুলে অবতীর্ণ হলেও তিনি সেই ‘উত্তম’ বা ‘অধম’ কোন কুলবিশেষেরই অন্তর্গত নন। বৈষ্ণবকে প্রাকৃত উত্তম কুল অর্থাৎ কৰ্মমার্গীয় ব্রাহ্মণ বললেও তাঁকে পুণ্যের অধীন জীববিশেষ জ্ঞান করাতে তচ্চরণে অপরাধ কৃত হল। কারণ পাপ-পুণ্য—উভয়ই হেয়তা ও অবরতায়ুক্ত প্রাকৃত ব্যাপার। বৈষ্ণব পাপ-পুণ্যের অধীন নন। দীক্ষিত বৈষ্ণবের একমাত্র পরিচয় বা অভিমান যে, তিনি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের দাসানুদাস। পরমহংস বৈষ্ণবগণই—জগদগুরু ; তাঁরা বর্ণাশ্রমাতীত। কিন্তু যাঁরা ভক্তসাধক অর্থাৎ পরমহংস বৈষ্ণবের চরণাশ্রয়পূর্বক বিষ্ণুসেবাপর, তাঁরা দৈববর্ণাশ্রমে অবস্থিত। তাঁরা বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণবদাস বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণ। তাঁদের সহিত প্রাকৃত কৰ্মমার্গীয় ব্রাহ্মণগণকে সমজ্ঞান করলে বা বৈকুণ্ঠযাত্রী পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণ নশ্বর ও প্রাকৃত পুণ্যবানের পদ—যাহা ভগবদ্ভক্তের বিচারে পরিত্যাগের বস্তু—আশা করছেন—এরূপ বিচার করলে অজ্ঞতা বা অপরাধেরই পরিচয় পাওয়া যাবে। দৈববর্ণাশ্রম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত প্রেমধর্মের প্রতিকূল নয়। কারণ রায়-রামানন্দ-সংবাদে “রায় মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য” আদৌ দৈববর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম-পালনে সেশ্বর-নৈতিক বা ধর্ম-জীবনারম্ভ হয় বলেই বিষ্ণুপুরাণের বাক্যদ্বারা প্রমাণ করেছেন। তবে অদৈব বর্ণাশ্রমী বা নামমাত্র বর্ণাশ্রম পরিপালনকারিগণ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত বাক্যের দোহাই দিয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিরোধকেই বা কৰ্মমার্গে বিচরণকেই বর্ণাশ্রম ধর্ম বলে মনে করেন, তা তাদের বিবর্তজ্ঞান মাত্র। যথা,—“চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্নকৰ্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি’ মজে।।” * * * স্বভাব ও বৃত্ত-অনুসারে বর্ণ নিরূপণই ভাগবত, ভারত, মহাপ্রভু ও যাবতীয় আচার্য্যগণের অভিমত। আচার্য্য শ্রীধরস্বামী বলেন,—স্বভাবদ্বারা বর্ণ নিরূপণই মুখ্য ব্যবহার। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলেছেন,—

“সহজে নিৰ্মল এই ‘ব্রাহ্মণ’-হৃদয়।

কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়।।

‘মাৎস্য’-চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলা।

পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা।।”

অতএব বিষ্ণুসেবাপরায়ণ নিৰ্ম্মৎসরগণই ‘ব্রাহ্মণ’। তাঁরা বৈষ্ণব পরমহংসগণের আনুগত্যে দৈববর্ণাশ্রম ধর্মে অবস্থিত হয়ে বিষ্ণুসেবা করতে করতে নৈসর্গিক উন্নতি লাভ করতে পারবেন এবং নিরপরাধে অহৈতুক বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম ত্যাগ করে নিত্য স্বধর্ম বা সর্বসাধ্যসার অর্থাৎ সাধনের সিদ্ধি প্রেমভক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়ে লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আত্মস্বরূপের পরিচয় প্রদান করতে পারবেন—“নাহং বিপ্রো ন চ.....গোপীভর্তৃঃ পদকমলয়োদাস-দাসানুদাসঃ।” শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগগণ প্রাকৃত-বিচারপরায়ণ নাস্তিক ব্যক্তিগণের ন্যায় জাতিভেদ বা

‘ছুৎসর্গ পরিত্যাগ’ প্রভৃতি কথা লয়ে সময় ক্ষেপণ করেন নি।” তিনি ‘আত্মধর্মের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জানিয়েছেন,—“আত্মধর্ম বলতে তটস্থা শক্তি বুঝায় না। জীবশক্তিকেই তটস্থা শক্তি বলা হয়। তটস্থাবস্থায় প্রকৃতপক্ষে অবস্থিতি হতে পারে না। জল ও স্থলের মধ্যস্থিত সুসূক্ষ্ম রেখাকে ‘তট’ বলে। যেমন তটদেশে দণ্ডায়মান ব্যক্তি হয় জলে, না হয় স্থলে অবস্থান করে, ঐরূপ সুসূক্ষ্ম তটদেশে দাঁড়াতে পারে না, তদ্রূপ জীবাত্মাও তটস্থাবস্থায় থাকতে পারে না। ‘জীব’ হয় মাঝার প্রতি উন্মুখ হয়, না হয় ভগবদুন্মুখ হয়ে থাকে। ‘আত্মধর্ম’ বলতে জীবাত্মার নিত্য স্বাভাবিক ধর্ম—তারই নাম বৈষম্যতা বা ‘বৈষম্য ধর্ম’। যেখানে আত্মস্বরূপের বিস্তৃতি, সেই স্থানে জীবের স্বরূপধর্ম যে ‘বৈষম্যতা’, তা সুপ্ত।”

ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্যাди চারি আশ্রম অবলম্বনকারিগণ ও পঞ্চোপাসকগণ আত্মধর্মে বিশ্বাস স্থাপন না করে দেহ-মনের অনিত্য ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বহুমান করে থাকেন ও সন্তুষ্টি লাভ করেন। সামাজিক ও ব্যবহারিক জাতি-কুলগত ব্রাহ্মণগণ তাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ নন, কারণ সকল বর্ণকে নিয়মিত করার গুরুত্ব তথাকথিত উক্ত জাত্যভিমानी ব্রাহ্মণগণের নেই। ভাবভক্তির মর্ম নিজে আচরণ করে অন্যকে শিক্ষা দেওয়াই তাত্ত্বিক বা পারমাথিক ব্রাহ্মণের একটি বিশেষ লক্ষণ। ভগবানের শুদ্ধ ভজনপরায়ণ উত্তম বৈষম্যই ব্রাহ্মণের গুরু হওয়ার যোগ্য এবং তিনি সর্ব বর্ণেরই গুরু। শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুর বাণীতে পাওয়া যায়,—“যেই ভজে সেই বড়।”

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ-বিরচিত ‘ভক্তিরসামুদয়সিদ্ধি’ গ্রন্থে ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ মধ্যলীলায় ২২তম পরিচ্ছেদে চতুঃষষ্টি প্রকার বৈধ ভক্তাদি উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত সাধনভক্তির চৌষষ্টি ভেদের মধ্যে কুলধর্ম, বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মের কোন কথা নেই। সুতরাং শরীর, ইন্দ্রিয় ও আত্মকরণদ্বারা সেই সেই ধর্মাদির সৃষ্টি অনুষ্ঠানেও শুদ্ধভক্তির বিন্দুমাত্র লাভ হতে পারে কি? ভগবান্ শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু-কর্তৃক পরমার্থরাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষারূপে ‘দৈববর্ণাশ্রমের’ আবশ্যকতা উপদিষ্ট হয়েছে। সাধনের মূলে সাধুসঙ্গ ও সদগুরু-পদাশ্রয় না হওয়ায় সেইসেই বর্ণাশ্রমধর্ম-পালনকারীদের বিপদ ও পতন হতে কে রক্ষা করবে? এবং কে-ই বা তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে? সাধনকালে যে-পর্যন্ত হৃদয়ে কাম থাকে, সে-পর্যন্ত বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের উপযোগিতা; তাই কাম ত্যাগ করে শাস্ত্র-বিধিমনতে সাধন করাই সমীচীন। শাস্ত্র বলেন,—

দেবর্ষিভূতাপ্তুং পিতৃগাং ন কিঙ্করো নারমৃণী চ রাজন্।

সর্বার্য্যনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্।।

(ভাঃ ১১।৫।৪১)

অর্থাৎ—হে রাজন্! যিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করে বাসুদেবই সকল—এই জ্ঞানে সেই অখিল লোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্মে সর্বার্য্যতঃকরণে শরণ গ্রহণ করছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ ভূতসকল, আত্মীয়-স্বজন এবং অপর মনুষ্যগণের কারও নিকট দাস্য বা ঋণপাশে বদ্ধ নন।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

‘অপি চেৎ সুদুরাচারঃ’-শ্লোকের নিগূঢ় তাৎপর্য

‘অপি চেৎ সুদুরাচারঃ’ (গীতা ৯।৩০)-শ্লোকটির শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর-কৃত টীকার বঙ্গানুবাদ,—

নিজভক্তের প্রতি আসক্তি আমার স্বভাব ; দুরাচার ভক্তের প্রতিও তাহা বিযুক্ত হয় না। তাহাকেও আমি উৎকৃষ্ট করিয়া থাকি, ইহা বলিতেছেন,—“অপি চেৎ” ইত্যাদি। সুদুরাচার অর্থাৎ পরহিংসা, পরস্ট্রী, পরদ্রব্যাদি গ্রহণে আসক্তও যদি আমাকে ভজন করে ; কি-প্রকার ভজনকারী, তাহা বলিতেছেন,—‘অনন্যভাক্’ অর্থাৎ আমা ব্যতীত দেবান্তরে ভজনহীন। আমার ভক্তে অন্য কদাচার দৃষ্ট হইলেও কি-প্রকারে তাহা সাধুত্ব? তাহা বলিতেছেন,—‘মন্তব্য’ অর্থাৎ মননীয়। তাহাকে সাধু বলিয়া জ্ঞান করা কর্তব্য। মন্তব্য-পদটী বিধিবাক্য। অন্যথা করিলে প্রত্যবায় অর্থাৎ দোষ বা ক্ষতি। এক্ষেত্রে আমার আজ্ঞাই প্রমাণ—ইহাই ভাব। যদি এইরূপ বিচারিত হয় যে, তোমার ভজন ও পরদার গ্রহণদ্বারা উভয় কার্যই আংশিকভাবে হওয়ায় সে সাধু ও অসাধু, ইহাতে বলিতেছেন,—সর্ব্বাংশে সাধু বিবেচনা করিতে হইবে। কখনও তাহার অসাধুত্ব দর্শন করিতে হইবে না—এই ভাব। সম্যক্যবসিতং—যাহার নিশ্চয়বুদ্ধি হইয়াছে। দুস্ত্যজ নিজপাপে নরক অথবা পশু-পক্ষী জন্ম হইলেও অনন্য শ্রীকৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করিব না—এইরূপ সুন্দর অধ্যবসায় অর্থাৎ দৃঢ় বদ্ববান্।

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয়ের শেষোক্ত মন্তব্যটী নিশ্চয়ই অসাধারণ। পরদারাসক্ত ব্যক্তিমাত্রই এরূপ কৃষ্ণভজননিষ্ঠ হইতে পারে না। ইহা উন্নত ভজনকারীর পক্ষে সম্ভবপর। সুতরাং এরূপ অধিকারীর পক্ষে পরদারগমন কার্য্যটী তুচ্ছ ; তাহা সাধারণ পরদারাসক্তি নহে। এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অতীব দুর্লভ।

‘অপি চেৎ সুদুরাচারঃ’—বাক্যটী শ্রীকৃষ্ণের। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকদ্বারা কত উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই একই তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যরূপে অতীব কঠিন ও অনমনীয় কি-প্রকারে হইতে পারেন? নিজ-বাকোর বিরুদ্ধাচরণ কখনই তাঁহাতে সম্ভবপর নহে। ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর ভাব কি ভয়ঙ্কর নির্ম্মম কঠোর! এমন কি, পূজনীয় ও পরমপ্রিয় সকলপ্রকার ভক্তের ঐকান্তিক প্রার্থনাকেও অগ্রাহ্য করিলেন। ইহা কি শুধু ভক্তকে সাবধান করাই উদ্দেশ্য? অথবা নিগূঢ় কোন বিচার অন্তর্নিহিত রহিয়াছে? কৃষ্ণের সহিত তুলনামূলক বিচার-ব্যতীত কেবল মহাপ্রভুর নিজলীলাতেও পরস্পর-বিরোধী আচরণ পরিদৃষ্ট হয়।

ছোট হরিদাসের ক্ষেত্রে মহাপ্রভু যেরূপ কঠোর, কালা কৃষ্ণদাসের ক্ষেত্রে সেরূপ কঠোর হইলেন না কেন? কালা কৃষ্ণদাসের অপরাধ ছোট হরিদাসের অপরাধ হইতে অত্যন্ত অধিক। ছোটহরিদাস প্রকৃতি-সম্ভাষণ-দোষে অপরাধী, পরদার-গমন অভিযোগ নাই। কালা কৃষ্ণদাসকে ভট্টথারী স্ত্রীর সহিত বাস করিতে দেখা যায়। ছোট হরিদাস অনন্যভাক্ ছিলেন। তিনি মহাপ্রভু ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্বের ভজনকারী ছিলেন না। এমনকি, দেহত্যাগের পরও অদৃশ্য থাকিয়া মহাপ্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইয়া সেবা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কালা কৃষ্ণদাস

পরস্তু-মোহে মহাপ্রভুর সেবা পরিত্যাগ করত ভট্টথারিদের দলে যোগ দিয়াছিল। এরূপ ঘৃণ্য বৃত্তিবিশিষ্ট কালা কৃষ্ণদাসকে মহাপ্রভু ‘দারমানা’ করেন নাই; গলে কলস বন্ধন করত নদীতে প্রাণবিসর্জনরূপ প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা দেন নাই। পরস্তু তাহাকে শোধন করিবার জন্য তাহাকে ভক্তদিগের হস্তে সমর্পণ করত নিজে দায়মুক্ত হইয়াছিলেন। এই দুই ক্ষেত্রে বিপরীত আচরণ করার কি নিগূঢ় বিচার, তাহা সাধারণের নিশ্চয়ই বোধগম্য নহে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সন্ন্যাসাশ্রম অঙ্গীকার করেন নাই। তাঁহার টীকাতে তজ্জন্য বৈরাগীদের বিচার বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। কেবল ভক্ত বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন। ভক্ত বলিলে যদ্যপি গৃহী ও ত্যাগী উভয়কেই ধরা যাইতে পারে, তথাপি স্পষ্টভাবে ত্যাগী-পদের প্রয়োগ নাই। পরস্তু ছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি,—

“প্রভু কহে—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।

দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥

* * * *

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।

ইন্দ্রিয় চরাএগ বলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥”

আচার্য্যগণ স্বয়ং আচরণ করিয়া কখনও অনধিকার চর্চা করেন নাই। ছোট হরিদাস প্রভু বৈরাগী বা চতুর্থাশ্রমী ছিলেন বলিয়াই মহাপ্রভুর বিচার শাস্ত্র ও অধিকার-সম্মত। স্বয়ং চতুর্থাশ্রমী না হইয়া ত্যাগীর বিচার করা অসম্মত।

কালা কৃষ্ণদাসের প্রতি মহাপ্রভুর বিচার ভিন্নপ্রকার কেন? কৃষ্ণদাসের প্রতি হরিদাস প্রভুর ন্যায় কঠোর আচরণ কেন করা হয় নাই? ইহাতে লক্ষিতব্য যে, শাস্ত্রই এরূপ বিধান প্রদান করিয়াছেন। গৃহীদের স্ত্রীসঙ্গ-দোষকে শাস্ত্র মার্জ্জনা করিয়াছে।—

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণ-স্পর্শ-সংলাপ-ক্ষেপনাদিকম্।

প্রাণিনো মিথুনীভূতানগৃহস্থোহগ্রতস্তজেৎ ॥ (ভাঃ ১১।১৭।৩৩)

অর্থাৎ স্ত্রীলোকের প্রতি নিরীক্ষণ, স্পর্শ, সংলাপ, ক্রীড়াদি এবং মৈথুনরত প্রাণীগণকে অগৃহস্থ ত্যাগ করিবে। এক্ষেত্রে অগৃহস্থ-পদ ব্যবহারদ্বারা গৃহস্থগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও বৈরাগী বা সন্ন্যাসীদের প্রতি নিবেদ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত কার্যগুলি অনুমত গৃহস্থপক্ষে মার্জ্জনীয়। গৃহস্থ যদি নিষ্কিঞ্চন, ভজনোন্মুখ এবং ভবসাগরের পরপারে যাইতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁহার পক্ষেও ইহা নিষিদ্ধ। যথা, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে মহাপ্রভুর খেদোক্তি,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবন্তভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্বসাগরস্য।

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু ॥

কৃষ্ণদাস গৃহী বলিয়া তাহার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শিত হয় নাই। পরস্তু ছোট হরিদাস বৈরাগী ত্যক্তগৃহ ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি কঠোরতা সঙ্গতই হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ গৃহস্থলীলা প্রকাশ করায় বৈরাগী ও সন্ন্যাসিগণের সমালোচনা বা বিচার প্রদর্শন করেন নাই; কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিজে সন্ন্যাসী বলিয়া বৈরাগী হরিদাস প্রভুর প্রতি যোগ্য বিচার প্রদর্শন করিয়া সঙ্গত আচরণ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্লোকটীতে গৃহী ও ত্যাগীদের প্রতি ভিন্ন ভাব প্রকাশ থাকিলেও উভয়ক্ষেত্রেই অধিকারোচিত মঙ্গলজনক

এবং একই তাৎপর্য্যপর বুঝিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একই তত্ত্ব হইলেও কৃষ্ণ গৃহস্থ এবং মহাপ্রভু সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া আশ্রমোচিত লীলায় ভিন্নতা অসিদ্ধান্তপর হয় নাই। স্ত্রী-সভোগ সকল মানবের পরমার্থের প্রতিকূল। গৃহী ব্যক্তি হীন অধিকারযুক্ত বলিয়া তাহাদের বিবাহের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ঐ ভোগপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করানই উদ্দেশ্য, জানিতে হইবে। ‘কর্নামোক্ষায় কর্নামি’ (ভাঃ ১১।৩।৪৪) বাক্যে তাহাই প্রকাশিত। ‘লোকে ব্যবয়ামিষমদ্যাসেবা’ (ভাঃ ১১।৫।১১) শ্লোকটিতেও “আসু নিবৃত্তিরিষ্টা” বাক্যদ্বারা ইহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। মহাপ্রভুর বিতরিত প্রেমমার্গে কাম-গন্ধের অবকাশ নাই। কাম—অন্ধতম, প্রেম—চিন্ময়-ভাস্কর। উজ্জ্বলরসের লীলা ভোগপর স্ত্রীসঙ্গ নহে। বন্ধজীবের তাহা বোধগম্য হয় না। তজ্জন্য বদ্ধাবস্থায় তাহার আলোচনা নিষিদ্ধ।

আরও লক্ষিতব্য—শাস্ত্রবাক্য মানবগণের অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী—উভয়ের জন্যই ব্যবস্থিত। স্ত্রী-জাতির প্রতি নিরীক্ষণাদি করিতে কেবল পুরুষকেই নিষেধ করা হইয়াছে। স্ত্রীজাতির প্রতি এইরূপ শাসনবাক্য প্রয়োগ করা হয় নাই কেন? ইহাতে স্ত্রীজাতি কি পুরুষজাতি হইতে উন্নত বলিয়া বুঝিতে হইবে, না তাহারা শাসিত হইবার অধিকার হইতেও হীনস্বভাবযুক্ত বুঝিতে হইবে? দ্বিজবন্ধু, শূদ্র ও স্ত্রীজাতিকে বেদে অধিকার প্রদত্ত হয় নাই—দেখা যায়। কিন্তু ‘অপি চেৎ সুদুরাচারঃ’ বাক্যে কি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে? শাস্ত্রবাক্যে কখনই বিরোধ হইতে পারে না। অতএব শ্লোকটিতে স্ত্রীজাতির মহত্ত্ব বলা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বাধিক মহত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা হীন অধিকারীও পরমপূজ্য এবং সাধুরূপে গণ্য হইবার যোগ্য বলা হইয়াছে। নতুবা ‘স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু’—(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪) বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্যভাক্ত ভজন করা নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য বুঝিতে হইবে। এই গুণের স্বভাবতঃ অধিকারী কে, পরবর্ত্তী “কিং পুনর্ভাক্ষণা” (গীতা ৯।৩৩) শ্লোকে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

‘অপি চেৎ সুদুরাচারঃ’ ও পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে উপাস্য তত্ত্ব বহু থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও সর্ব্বোত্তম ফলজনকত্ব বিধোষিত হইয়াছে। উপাসকের অযোগ্যতা সর্ব্বাধিক হইলেও অনন্যভাবে যিনি শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ উপাসকের সর্ব্বাধিক অযোগ্যতাকে অতি সহর বিদূরিত করত তাঁহাকে সাধুত্ব ও পরাশাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাই দৃঢ়ভাবে ও সত্যরূপে প্রকাশ করিবার জন্য স্বীয় ভক্ত ও সখা অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা করিতে আদেশ করিয়াছেন। নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও ভক্তপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তাঁহার স্বভাব—ইহাও ইহাতে সূচিত হইয়াছে। উপাসক যতই অযোগ্য, অধম, এমন কি, দুরাচারী বেদবহির্ভূত ম্লেচ্ছ, দুশ্চরিত্রা গণিকা স্ত্রী, কেবল মাত্র কৃষিও বাণিজ্যনিরত বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি হীন কুলোদ্ভব নরনারীগণও যদি অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে পরাগতি ও নিত্যশাস্তি প্রদান করিয়া ধন্য করেন। একরূপ ফল শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য উপাস্যের ভজনদ্বারা লাভ করা যায় না—ইহাই পরিব্যক্ত। তজ্জন্য নরমাত্রেয় কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া ধন্য হইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ২।৭।৪২ শ্লোকে বর্ণিত “যদি নিবর্ত্তীকম্” গুণটি থাকা প্রয়োজন।।

—ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিদ্রম মহারাজ

শ্রীচৈতন্য-ভাব বনাম অচৈতন্য-যুক্তি

“বঞ্চিতোহস্মি বঞ্চিতোহস্মি বঞ্চিতোহস্মি ন সংশয়ঃ।

বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোহপি মম নাভবৎ।।”

আজ হতে কিঞ্চিৎ পাঁচশতাধিক বৎসর পূর্বেই শ্রীচৈতন্য-পার্বদ ত্রিদণ্ডি-যতিবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁর “শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্”—গ্রন্থে নিজ দৈন্যোক্তির আবরণে বর্তমানের কুযুক্তি-কূপে নিপতিত ভাগ্যহতদের প্রতি ইঙ্গিত করেই এইপ্রকার খেদোক্তি প্রকাশ করেছিলেন,—‘অহো! যুক্তিপূর সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশ্ব যেস্থলে শ্রীগৌররস-সিন্ধুতে অবগাহন করছে, আর সেস্থলে তোমারা তোমাদের কুযুক্তির এঁদো পুকুরকেই সর্বস্ব ভেবে কিনা সেই রসসিন্ধুর বিন্দুস্পর্শ হতেও বঞ্চিত হচ্ছে!’ বরং সেই স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধেই তোমরা যাবতীয় নিন্দা-খুৎকার উর্দ্ধে নিরন্তর নিক্ষেপ করছ। কিন্তু তা যে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে পরিণামে তোমাদেরই নানা অনর্থের ‘ছাৎলা-পড়া’ চিত্তকে আরও ঘৃণিত করে তুলছে, সেটীও তোমাদের অবুঝ মস্তিষ্কে ধরা পড়ছে না! শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর পুতপদাঙ্ক-অনুসারিগণকে এক যুক্তিহীন ‘ভাববাদী’ বলয়ে মাত্র আবদ্ধ বলে যে তোমরা নিজেদের সেই অন্ধকূপৈকনিষ্ঠা প্রতিনিয়ত প্রদর্শন করছ—তার এক কপর্দকও মূল্য নেই। চোখ খুলে দেখ—তোমাদের স্বপ্নের পাশ্চাত্য ভগতের সেই আদর্শগণ ভোগবিলাসপর সব যুক্তি বস্তাবন্দী করে কিভাবে শ্রীচৈতন্য-চরণে আশ্রয় নিয়ে কৃতকৃতার্থ হচ্ছেন! যে ভারতবর্ষের অপার মাহাত্ম্য ও অফুরন্ত সম্পদকে অবজ্ঞা করে কেবল জড়যুক্তির অনুসন্ধানে তোমরা পাশ্চাত্যমুখী হয়েছ, সেই পশ্চিমিগণ পারমার্থিক প্রযুক্তির প্রলোভনে কিভাবে সর্বপ্রযুক্তির আকর সেই নদীয়াচন্দ্র শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণকে সর্বস্ব করে নিয়েছেন। তথাপি তোমাদের চৈতন্যোদয় হচ্ছে না—তোমরা তোমাদের গোঁ ছাড়বে না। তাহলে এ সম্পর্কে ছোট্ট একটা গল্প বলি, শুন—

পঞ্চানন-নামে কোন এক গ্রাম্য বালক বেশ বড় হয়ে গেলেও উলঙ্গ থাকতেই ভালবাসত। তাই ‘ন্যাংটা পেঁচো’ নামেই সে গ্রামে বিশেষ পরিচিত ছিল। কিন্তু লেখাপড়া ও স্বভাব-চরিত্রে ভাল সেই পঞ্চানন পরবর্তিকালে সকলের প্রিয় হয়ে উঠল। কয়েক বৎসরের মধ্যে বি-এল, ডি-এল পাশ করে পঞ্চানন এখন উকিল। কিন্তু তার উন্নতিতে গাত্রদাহ হতে থাকা কিছু গ্রামবাসী থাকতে না পেরে আশ্ফালন করে উঠল—“আরে রেখে দে ঐ পেঁচোর কথা, নকল করে পরীক্ষায় পাশ করে আবার উকিল!” পঞ্চানন এখন রীতিমত বাবু, কয়েক বৎসরেই তাঁর জেলা-জজে পদোন্নতি হল। মাৎসর্য্যে অধীর হয়ে সেই গ্রামবাসীরা ‘যত সব গাঁজাখুরী কথা’ বলে তা উড়িয়ে দিল। কিন্তু কাগজে কলমে যখন পঞ্চানন বাবু জজ-সাহেবের নাম দেখিয়ে দেওয়া হল, তখন তারা বলে উঠল,—“আরে ন্যাংটা পেঁচো জজ হলে কি হবে, নিশ্চয়ই বেতন পায় না।”

তোমাদের অবস্থা হয়েছে ঠিক তাই। সব দেখে শুনেও তোমাদের একই কথা—“ওদের কেবল ঐ ভাবই—যুক্তি নেই।” তাহলে বলি শুন—কেউই যুক্তি ছাড়া থাকতে পারে না। তোমরা যেমন ভগবানকে মানার কোন যুক্তি পাও না; তেমনই সাধুগণও

ভগবানকে অস্বীকার করার কোন যুক্তিই খুঁজে পান না। চোর যেমন তাদের চৌর্য্যবৃত্তির পুষ্টিকারক যুক্তি আবিষ্কার করে নেয়, তোমরাও তেমন ‘ভগবান্ নেই’ যুক্তি দেখিয়ে তাঁর সম্পদ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে পরস্পর ‘মাসতুতো ভাই’ হয়েছ। কিন্তু ভায়া! যতই বল, সাধুর যুক্তি এবং অসাধুর যুক্তি, চক্ষুস্থানের যুক্তি ও অন্ধের যুক্তি, বৃদ্ধের যুক্তি এবং শিশুর যুক্তি, পণ্ডিতের যুক্তি ও মূর্খের যুক্তি কখনও এক হয় না। তাই বলে অসাধু যদি সাধুকে, অন্ধ চক্ষুস্থানকে, শিশু বৃদ্ধকে, মূর্খ পণ্ডিতকে ‘অযৌক্তিক’ বলে ঘোষণা করে, এবং ‘ধ্বনি-ভোট’ যদি তা নিরক্ষুশ-সংখ্যাধিক্যও হয়, তবেও কি তা বাস্তব-বিচারে যুক্তিগ্রাহ্য? “Vox populi is not vox dei.”—জনপ্রিয় মতবাদ মাত্রই যথার্থ বিচার নয়। যুক্তির মধ্যে যে তারতম্য থাকে, তা দুঃখের বিষয়, তোমাদের জানা নেই। যেস্থলে উচ্চতর যুক্তি (Higher logic) বর্তমান, সেস্থলে নিম্নযুক্তির (Lower logic) স্থান কোথায়? কেবল মূর্খদের মুখেই তখন তা শোভা পেতে থাকে। অন্ধের যুক্তি নেতিবাচক, আর চক্ষুস্থানের যুক্তি ইতিবাচক—এই উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? অবশ্যই দ্বিতীয়টি। আবার অন্নদৃষ্টি-সম্পন্নের যুক্তি অপেক্ষা নিশ্চয়ই উঁচুমানের যুক্তি, যাঁদের দূরদৃষ্টি আছে। একজন যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি কি তা অস্বীকার করতে পারেন?

তোমাদের জড় চোখের দর্শন কেবল এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পর্য্যন্ত। মনস্তত্ত্ববিদগণের দর্শন সেই দশটি ইন্দ্রিয়ের পরিচালক অন্তরীন্দ্রিয় মন অবধি। আর আত্মদর্শিগণ দেহ, মন এমনকি বুদ্ধিকেও অতিক্রম করে আত্মবস্তুর দর্শন করেন। তাঁদের সেই দর্শনটি দেখ কত সুন্দরভাবে উপমা-সহকারে বর্ণিত হয়েছে,—

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।

বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্॥” (কঠোপনিষৎ)

শরীর যদি রথতুল্য হয়, তবে ~~আত্মা~~ রথারোহী, সেক্ষেত্রে বুদ্ধি—সারথি, মন—লাগাম, ইন্দ্রিয়-সমস্ত—ঘোড়া এবং সেই জড়বিষয়সকল—সেই ঘোড়াগুলোর চারণক্ষেত্র। তাদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকেই পরস্পর একটি বিশেষ ছন্দে সুসংবদ্ধ। সেই ছন্দপতন যখনই ঘটে, তখনই আমাদের শারীরিক, মানসিক যতপ্রকার ক্লেশ উদয় হতে থাকে। সেই আত্মবিদগণের প্রদর্শিত পথ ছাড়া এই ছন্দের সুসংহতি কোনক্রমেই সম্ভব নয়—“নান্যঃ পস্থা বিদ্যাতে অয়নায়।” তাহলে দেখ, তাঁদের সেই দিব্যদর্শনের সাথে তোমাদের জড়দর্শনের তুলনা! আত্মতত্ত্ব, পরজগৎ প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমাদের সকল যুক্তিই নেতিবাচক—আর তাতেই তোমাদের অন্ধত্ব প্রমাণিত হয়। ছানি পড়া চোখের কি কোন কার্য্যকারিতা থাকে? আত্মদর্শনক্ষেত্রে তোমাদের চোখগুলোও ঠিক সেইপ্রকার—ছানি পড়া চোখ। জড়চোখে সমস্ত দর্শনই তোমাদের জড়ীয়। জড়ত্বের জ্বরে তোমরা সবসময় জর্জরিত হয়ে আছ। যাঁরা চক্ষুস্থান—স্বচ্ছদৃষ্টি-বিশিষ্ট, সেই তাঁদের দর্শনে তোমরা বিশ্বাসী হতে পার না—ঘোলা চোখ নিয়ে সেই দূরদর্শী তাঁদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে বরং স্পর্ধা কর এবং তার অবশ্যভাবী ফল হিসাবে গুরু-বিষয়ে লঘু মন্তব্য করে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা—উভয়ই আবাহন কর। “দুর্ভাগার এই ত’ লক্ষণ।”

তোমাদের যে-সকল যুক্তি, তা সমস্তই অচৈতন্যপর। সর্বক্ষম, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান সেই মূল-চৈতন্য বস্তুর স্বীকৃতি অপেক্ষা অচৈতন্যের ধারণাতেই তোমাদের যত আনন্দ। তোমাদের জীবন—এক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলবিশেষ। সেস্থলে নিত্যচৈতন্য বস্তুর নিত্য ভূমিকা সম্বন্ধে তোমাদের কোনরকম জ্ঞানগম্যিও থাকার কথা নয়। মূলেই যাদের গলদ, ফলকালে তারা বলদ বৈ আর কি? সমগ্র বিশ্বে তোমাদের অচৈতন্যবাদী তাবৎ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদদের ‘বুদ্ধি’ একত্রিত হয়েও যে চৈতন্য (Consciousness) নামক বস্তুটির হৃদিস তোমাদের পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না*—সেই চৈতন্যের স্রষ্টা কিনা এক জড় রাসায়নিক ক্রিয়া!—চৈতন্যের পিতা কিনা এক অচৈতন্য! ধিক্ তোমাদের চৈতন্য! ধিক্ তোমাদের বিচার-বিশ্লেষণ-ক্ষমতা!! চৈতন্যের কার্যসকল (Effects) দর্শন করে তাদেরকেই চৈতন্যের কারণ (Cause) মনে করে ভ্রমে পতিত হও। এইপ্রকার বুদ্ধিবিভ্রমে পতিত হয়ে দধি থেকে দুধের সৃষ্টি করতে চাওয়ার মতই তোমাদের এই চৈতন্য-বিশ্লেষণ। চৈতন্য যে কি বস্তু, কোথায় তার উৎপত্তি, কিভাবে তার গতাগতি সংঘটিত হয়, তা নিয়ে এই বৈদিক সনাতন ধর্ম্মে যে সহস্র সহস্র উপনিষৎ, পঞ্চরাত্র, পুরাণ, উপপুরাণ, সংহিতা প্রভৃতির সম্ভার আছে, তার সহস্র ভাগের একভাগও অন্য কোন ধারায় বা ধারায় নেই। অথচ এ সমস্ত পরিত্যাগ করে ভারতবাসী তোমরা যে অচৈতন্যযুক্তির দিকেই ধাবিত হও, তাতে তোমাদের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করণীয় থাকে না।

‘ভাব’ ও ‘যুক্তি’কে পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী বলেই তোমরা মনে কর। কিন্তু, তোমরা জান না যে, ভাবহীন যুক্তি নিছক শুষ্কযুক্তি। ‘ভাব’—স্বরবর্ণের মত—নিজের স্বর, নিজের বর্ণ সকলই আছে। অপরদিকে ‘যুক্তি’—ব্যঞ্জনবর্ণ-তুল্য—নিজস্ব ‘বর্ণ’ আছে বটে, তবে স্বর নেই; স্বরবর্ণের স্বর এসে যুক্ত হলেই তা প্রাণবন্ত হয়। তাই যুক্তি মূলতঃ ভাবাধীন, অপরদিকে যুক্তিদ্বারা ভাবের ব্যাখ্যা প্রায়শঃই সম্ভব নয়। কারণ, যুক্তি সসীম, কিন্তু ভাব

*“In my search for the secret of life, I ended up with atoms and electrons, which have no life at all. Somewhere alone the line, life has run out through my fingers.”

—Albert Szent Gyorgyi in his book called “Biology Today.”

(—জীবনের রহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার গবেষণা শেষ পর্য্যন্ত কিছু অণু-পরমাণুতেই এসে উপনীত হল, যাদের কোন জীবন নেই। সেই গবেষণার কোনস্থানে যেন ‘জীবন’ আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়েছে।)

‘We can admittedly find nothing in physics or chemistry that has even a remote bearing on consciousness. Yet all of us know that there is such a thing as consciousness, simply because we have it ourselves. Hence consciousness must be part of nature, or more generally, of reality.’

—Niels Bohr, Noble Laureate, Physics.

(—আমরা অকপটতার সাথে দেখি যে, পদার্থ বিজ্ঞান বা রাসায়ন বিজ্ঞানে কিছুই নেই, যাতে ‘চৈতন্য’-বিষয়ে কোন দূর-ধারণাও সম্ভব হয়। অথচ আমরা সকলে জানি যে, ‘চৈতন্য’ বলে একটা ব্যাপার আছে—এই সাধারণ কারণে যে, আমাদের নিজেদেরই তা আছে। অতএব চৈতন্য অবশ্যই প্রকৃতির, বা আরও সাধারণভাবে, বাস্তবেরই একটা অংশ।)

অসীম। চেতনধর্মের এই 'ভাব' এবং 'যুক্তি'র সহাবস্থান অবধারিত—অনেকক্ষেত্রে একে অপরের সম্পূরক। 'Computer'-বস্ত্রে যুক্তির প্রাচুর্য্য আছে বটে, কিন্তু ভাবের অভাব—তাই কখনই তা মানুষের সমকক্ষ নয়; নতুবা রোবট প্রভৃতির দ্বারা স্ত্রী-পুত্রের অভাব পূরণ করা যেত। সেই ভাবকে অস্বীকার করে যাঁরা কেবল যুক্তিনির্ভর হন, সমাজে তাঁরা সেই নিষ্প্রাণ যন্ত্রবৎ—সেই স্বরহীন ব্যঞ্জনবর্ণের মতই অপাংক্তেয়। কেবল যুক্তিবাদী কেউ যদি হৃদয়স্থ ভাবের চাক্ষুষ প্রমাণের জন্য একেবারে হৃৎপিণ্ড-ব্যবচ্ছেদেই অগ্রসর হন, তবে তার মানসিক ভারসাম্য নিয়েই প্রশ্ন উঠবেই। দুঃখদায়ক ভাবে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আনন্দকর ভাবে হৃদয় উল্লসিত হয়, ভয়জনক ভাবে হৃদয় কম্পিত হয়—এই সকলেরই বাহ্যিক অভিব্যক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। সুতরাং ভাবের অস্তিত্ব নিতান্তই অনস্বীকার্য্য।

মানুষ নিজের ভাব-অনুযায়ী যুক্তি-অনুসন্ধানে যত্নশীল হয়। এই জন্যই একই পিতার ঔরসে ও একই মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেও, একই পরিবেশ ও একই শিক্ষায় লালিত-পালিত হয়েও অনেকক্ষেত্রেই পরস্পর যুক্তিভেদ দেখা যায়। কারণ, ভাবের কার্য্যরূপে আছে প্রবৃত্তি—যা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে তিনপ্রকার। সুতরাং প্রবৃত্তির ভেদে যুক্তিভেদ অবশ্যজ্ঞাবী। আবার প্রবৃত্তির তারতম্য-অনুসারে যুক্তিরও তারতম্য স্বীকার্য্য—সব যুক্তির একই মূল্যায়ন নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ নয়। পুনরায়, যুক্তিদ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিচারটীও নিজ নিজ ভাব তথা প্রবৃত্তি-সাপেক্ষ ব্যাপার। সুপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি যথার্থ যুক্তিনিষ্ঠ—তিনি সুযুক্তিগ্রাহী ও কুযুক্তি পরিত্যাগী—তিনি 'নাই যুক্তি' অপেক্ষা 'আছে যুক্তি'রই প্রাধান্য অনুভব করেন—তিনি উভয় যুক্তিকেই সম-মর্যাদা দান করেন না, বা উভয়কেই অকর্ম্মণ্য-জ্ঞান করেন না। সুতরাং যথার্থ যুক্তিনিষ্ঠের সাথে যুক্তিগত বিরোধ উৎপন্ন হয় না—সমস্যা হয় মত কুতর্কিক, বদ্ধ্যাতর্কপরায়ণ ও পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির সাহচর্য্যে।

"My doxy is orthodox—heterodoxy is another man's doxy"—এই বিচার অবলম্বনে নিশ্চয়ই উচ্চতর যুক্তিতে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

তোমাদের অচৈতন্যপর-যুক্তিপ্রবণতা, সূক্ষ্মবিচার করে দেখ, তার মূলে আছে অচৈতন্যপর ভাব। শাস্ত্রীয় ভাষায় এটাকে 'আসুরিক ভাব'* বলা হয়েছে। এইজন্যই 'নিত্যচৈতন্য'-পর সহস্র যুক্তিও তোমাদের ভাবানুকূল হয় না, সুতরাং তা যুক্তিগ্রাহ্যও হয়ে উঠে না। বর্ণমালার সাথে প্রথম পরিচয়কালেই যদি কেউ যুক্তির অবতারণা করে—'অ কেন অ', তবে তার পক্ষে নিশ্চয়ই সেই বর্ণমালা আর বরণীয় হয়ে উঠে না। জড়বিজ্ঞান-লাভের ক্ষেত্রে সেই সেই 'Axiom' (স্বতঃসিদ্ধ সত্য)তোমরা কিন্তু যুক্তির অপেক্ষা না করেই তা গলাধঃকরণ করেছ। সেইপ্রকার আত্মবিজ্ঞান লাভের সময়েও সেই সম্পর্কিত

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগ-যোগে এই অচৈতন্যপর-ভাবের বিভিন্ন পরিচয় দেওয়া হয়েছে। "অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহরণীশ্বরম্। অপস্পরসম্ভূতং কিমন্যং কামহেতুকম্॥" (গীতা ১৬।৮)। একদল বলছেন—জগৎ অসত্য, রজ্জ্বতে সর্পভ্রমের ন্যায় তা এক ভ্রান্তিমাত্র এবং 'অপ্রতিষ্ঠ' অর্থাৎ আকাশকুসুমের মত নিরাশ্রয়। অন্য এক গোষ্ঠী বলছেন—'অনীশ্বর' অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টাদির কারণরূপে কোন ঈশ্বর নেই এবং 'অপরস্পরসম্ভূতম্' অর্থাৎ কার্য্য-কারণের পরস্পর সম্বন্ধে বিশ্বসৃষ্টি হয়নি, তা একান্ত আকস্মিক—হঠাৎ করে হওয়া কিছু। আবার কারও মতে—স্বেচ্ছায়ই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে—'কামহেতুকম্'। এইপ্রকার সর্ব্ব আসুরিক ভাবের গতিবিধি সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবানের নখদর্পণে।

সকল 'Axiom' সংশয়াতীতভাবেই গ্রহণীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ক্ষেত্রেই তোমরা যত যুক্তির অবতারণা করে সেই অধ্যায় হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হও এবং অচৈতন্যভাবকেই যত্নসহকারে ও যুক্তি-সহযোগে লালন-পালন কর। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণকে যে তোমরা 'ভাববাদী' বলয়ে আবদ্ধ বল, তাতে তোমরা যে 'অভাববাদী', তা প্রমাণিত হয়। সুতরাং অভাবী দরিদ্র কিভাবে ধনলাভের মহিমা বুঝবে—বন্ধা নারী কিভাবে গর্ভবতী নারীর অবস্থা অনুভব করবে?

“যতদিন ভাবে না হবে না হবে

তোমার অবস্থা আমার মত।

শুনে না শুনিবে বুঝে না বুঝিবে

জানাইব আমি যাতনা যত।।”

তোমাদের সকল যুক্তিই উদর ও উপস্থকে কেন্দ্র করে ভ্রাম্যমান। তাই তোমাদের বিচারে দেহ ও মনের সম্পর্কে যত লৌকিক ধর্ম, লৌকিক অর্থ এবং লৌকিক কাম—এই ত্রিবর্গের যুক্তিই যুক্তি। দেহ ও মন উভয়েরই উদ্দেশ্যে যে আত্মা, তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান তোমাদের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য! সকলেই ত' আর তোমাদের সব স্থূল যুক্তি নিয়ে সেই ত্রিবর্গের ত্রিতাপকে মেনে নিতে প্রস্তুত নন। সুখ-দুঃখের অপরিহার্য নাগরদোলায় চড়ে, এমন কি, লাগাম-ছাড়া ভোগের মধ্যেও অনেকেই রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেন। তখন তাঁরা নিজেদেরকে কেবল আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনপর সেই পশুদের থেকে কোন পৃথক্ হতে না দেখে মরমে হত হতে থাকেন। মানবোচিত চেতনা তখনই সেই মুকুলিত অবস্থা থেকে বিকচিতোন্মুখ হয়ে উঠে। মনুষ্যাকার হয়ে কেবল ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব হওয়া অপেক্ষা আত্মানুসন্ধানই তখন অধিক যৌক্তিক বলে অনুভূত হতে থাকে। ফলে ত্রিবর্গের যুক্তি তাঁদের কাছে ম্লান হয়ে চতুর্বর্গ মোক্ষের যুক্তিই অবলম্বনীয় হয়ে উঠে। ভায়া! ভারতবাসীর বৈশিষ্ট্যই হল সেই আত্মানুশীলন—যে-আত্মানুশীলনের একমাত্র পীঠস্বরূপ ভারতভূমির প্রতি সর্ববিশ্ব সর্বদাই নতমস্তক। পাশ্চাত্য দার্শনিকের যে স্বীকারোক্তি—*What India thinks today, the whole world thinks tomorrow*—তা নিশ্চয়ই তোমাদের জড়চিন্তা, জড়প্রযুক্তিকে লক্ষ্য করে নয়। কারণ, সেই বিচারে পাশ্চাত্য জগৎ হতে অনেক পশ্চাতেই তোমরা অবস্থান করছ। তাদের সে-মস্তব্য ভারতীয় আর্য্য-ঋষি-মুনিগণের আত্মাপর ভাবনা-চিন্তা-গবেষণাকে লক্ষ্য করেই।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সমগ্র জগদ্বাসীর নিকট চতুর্বর্গ 'মোক্ষ' অপেক্ষাও পঞ্চমবর্গ 'ভগবৎপ্রেমের' যৌক্তিকতা সংস্থাপন করলেন। জগতে যে দুঃখ, সমস্যা ও উদ্বেগের পরম্পরা, তা ভগবানের প্রতি জীবের বিমুখতারই এক অবশ্যান্তাবী ফল। রাজদ্রোহী 'আমিই রাজা' বলে ঘোষণা করায় যে-প্রকার রাজরোষে পতিত হয়, সেই প্রকার 'আমিই প্রভু' অভিমান করে জীব ভগবান্ হতে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টায় সে মহামারার দণ্ডযোগ্য হয়ে পড়ে। দণ্ড ব্যক্তিকে রাজনির্দেশে জল্লাদের দ্বারা নদীতে চুবিয়ে শাস্তি দেওয়া হয় এবং প্রাণবায়ু নির্গত হবার পূর্বেই তাকে জল হতে উত্তোলন করে কিছুক্ষণ নিশ্বাস গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে সেই ব্যক্তিকে দীর্ঘকাল ধরে আরও বিভিন্নপ্রকার শাস্তি দেওয়া যায়।

কারাগারে কারাধ্যক্ষের দেওয়া আহার, বস্ত্র, বাসস্থানের যে বিভিন্ন ব্যবস্থা, তা প্রকৃতপক্ষে তাঁর অনুগ্রহ নয়—তাঁর শাস্তিপ্রদান-সূচীরই এক অভিন্ন অংশ। সে-অবস্থায় কারাধ্যক্ষের সন্তোষ উৎপাদন করে চললে শাস্তির মাত্র কিছু লাঘব হতে পারে মাত্র, কিন্তু কারামুক্তি ঘটে না—কারণ, রাজনির্দেশ ছাড়া কারামুক্তি অসম্ভব। সেইপ্রকার ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া কারাধ্যক্ষ-রূপে ভগবদ্ভিমুখতার শাস্তি-হিসাবে জীবগণকে সর্বদা সমস্যা-সঙ্কুল ও কোন না কোন দুঃখে নিপতিত রাখেন এবং তাঁর সেই শাস্তিপ্রদান-সূচীরই অঙ্গরূপে মাঝে মাঝে কিছু কিছু জড়সুখের ব্যবধানও রচনা করেন। সে-অবস্থায় কারারক্ষিণী মায়াদেবী বা অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণকে তোষণ করে চললে এই জগতে দুঃখের মাত্রা কিছু লাঘব হয় বা কিছু সময়ের জন্য সুখ-সুবিধাদি লাভ হতে পারে মাত্র ; কিন্তু তাতে দুঃখের চিরনিবৃত্তি কখনই ঘটে না বা এই চৌদ্দভুবনের চৌহদ্দি থেকে মুক্তিলাভও হয় না। যে-মুহূর্তে সেই রাজদ্রোহী নিজেকে রাজার অনুগত বলে প্রমাণ করে এবং রাজাও বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ আনুগত্যের পরিচয় লাভ করেন, সে-মুহূর্তে সে কারামুক্ত হয়ে রাজার অনুগ্রহভাজন হয়। সেইপ্রকার জীব যেকালে ভগবদ্ভিমুখতা পরিত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে ভগবদাসত্ব স্বীকার করে এবং ভগবান্ অন্তর্যামিন্যরূপে তার সেই স্বীকৃতির নিষ্কপটতা অনুভব করেন, সেইকালে তার সমস্ত ক্রেশের পরিসমাপ্তি হয়ে ‘ভগবৎপ্রেম’ লাভের যোগ্যতা অর্জিত হয়।

সুতরাং মোক্ষ বলতে সমগ্র দুঃখের যে আত্যাত্তিক নিবৃত্তিকেই অনেকে লক্ষ্য করেন, তা প্রকৃতপক্ষে ‘ভগবৎপ্রেম’ লাভেরই আনুষঙ্গিক ফল। কারাগার হতে মুক্তিলাভের পর নিজ পরিবারবর্গের সাথে মিলনসুখই যদি উপভুক্ত না হল, তবে সেই কারামুক্তির কি ফল? বরং সেক্ষেত্রে সেই কারামুক্তি তখন অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠে না কি? সুতরাং কারামুক্তির প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাও নিজ পরিবারবর্গের সাথে মিলনসুখ উপভোগের প্রয়োজনীয়তাই অধিক। সেইপ্রকার ‘মোক্ষ’ই নয়—‘ভগবৎপ্রেম’-আস্বাদনই জীবের পরম প্রয়োজন। সমুদ্রের সঙ্গলাভেই যেমন নদীর সার্থকতা, জলচ্যুত মৎস্যের যেমন জলের আশ্রয়লাভেই তার পরমস্বস্তি, বৃক্ষমূলের সাথে সংযোগরক্ষা-ক্রমেই যেমন পত্র-ফুল-ফলাদির চিরসজীবতা—সেইপ্রকার শ্রীহরির সঙ্গ-সান্নিধ্যই জীবাত্মার সর্ববৃত্তি ও পুষ্টি। লৌহকণিকা যেমন কোন শর্তসাপেক্ষে নয়, নিজ-ধর্মবশেই চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়, তেমনই ক্রেশনিবৃত্তির জন্য সেই মোক্ষের শর্তে নয়, ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক ‘ভাবে’র বশেই জীবের পরতত্ত্ব-অনুশীলন। পরমাত্মা শ্রীহরির সাথে জীবাত্মার নিত্যসম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধহীন হওয়াতেই জীবের যত ক্রেশ এবং সেই সম্বন্ধ-স্থাপনেই জীবের শাস্বত শান্তি। সুতরাং সুবুদ্ধিগণ কেবল ত্রিতাপ হতে পরিত্রাণের জন্য মোক্ষের অনুসন্ধান করেন না, বরং ভগবানের সাথে হাত-সম্বন্ধ-স্থাপন করে ভগবৎপ্রেমকেই পরম-প্রয়োজন জ্ঞান করেন। আর সেক্ষেত্রে তোমরা যে সেই পরম প্রয়োজনীয় ভগবদ্ভাবকে উপহাস করে ভগবদ্ভাবের অভাবকেই যৌক্তিক জ্ঞান কর, তাতে তোমাদের শিশুমস্তিষ্কই প্রমাণিত হয়।

‘ভাব’, ‘প্রেম’, ‘আনন্দ’ প্রভৃতি চেতন বস্তুমাত্রেরই সহজাত ধর্ম, নতুবা অচেতন বস্তুর সাথে আর কি পার্থক্য? হিংস্র প্রাণীও স্নেহ-মমতায় বশীভূত হয়। অত্যন্ত কঠোর-

হৃদয় ব্যক্তিও কারও না কারও প্রতি স্নেহশীল হয়ে থাকে। সুতরাং চেতনতার অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতা যে কেবল অন্যতমই নয়, বরং সর্বপ্রধান, তা সামান্য বুদ্ধির দ্বারাই বোধগম্য হয়। কিন্তু এই ‘ভাব’ ও ‘প্রেমের’ বিষয় যখন একমাত্র ভগবান, তখনই তা পরমানন্দজনক হয় এবং সেইকালে পরমাত্মা শ্রীহরির সাথে সম্বন্ধিত হওয়ায় ‘আমার’, ‘তোমার’—এই সংকীর্ণ চিন্তার উর্দ্ধে সমগ্র বসুধাকেই নিজের আত্মীয় জ্ঞান হতে থাকে। নতুবা অনিত্য বস্তুগুলোকে নিয়েই ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকলে তার পরিণতি অবশ্যই যে দুঃখদায়ক, তা আর কি বলতে? ঘর পোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়, চূণ খেয়ে গালপোড়া যেমন দই দেখলেও ভয় পায়, তেমনই চেতনধর্মগত এই ‘ভাব’, ‘প্রেম’ প্রভৃতির নামেও অনেকেই পূর্ব পূর্ব দুঃখময় অভিজ্ঞতায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তখন জলাতঙ্ক রোগীর মত প্রেমাতঙ্কে আত্মধর্মগত ‘প্রেম’, ‘ভক্তি’, ‘ভাব’—এসবের বিরুদ্ধেও যুক্তি দেখাতে থাকেন। সেইসকল যুক্তি যেহেতু চেতন বস্তুর সহজাত-ধর্মেরই বিরোধী, অতএব সেই সব যুক্তিকে ‘অচৈতন্য-যুক্তি’ই বলা যুক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক কাশীবাসী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী এইপ্রকার অচৈতন্য-যুক্তিনির্ভর হয়েই মহাপ্রভুর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন,—“মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম নাহি জানে। ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে।।” ভগবানের সাথে যারা বিদ্বেষ করে, তারা ভক্তগণেণ নিকট অসম্ভাব্য। কিন্তু পিতা যে-প্রকার তাঁর বিদ্বেষী সন্তানের সাথে প্রতিযোগিতা করে সেই সন্তানের প্রতি বিদ্বেষ করেন না, সেইপ্রকার জগৎপিতা পরমকারুণিক শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই গর্বির্ত সন্ন্যাসীর প্রতি বিদ্বেষ না করে বরং তাঁর সংশয়-মোচনেই অগ্রসর হয়েছিলেন,—“দেখুন, আমি নিজের ইচ্ছায় নর্ত্তন, কীর্ত্তন করি না। কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের স্বভাব এই—নিষ্কপটে সেই নাম গহীত হলে হৃদয়কে তা অনর্থমুক্ত করে সেস্থলে এরূপ ‘ভাব’ উৎপন্ন করে যে, তাতে উন্মত্ত হয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম এমনকি মোক্ষও তখন তৃণতুল্য মনে হয় এবং লোকের হাস্য-প্রশংসার প্রতি অবধানশূন্য হয়ে তাঁকে নর্ত্তন-কীর্ত্তনে নিযুক্ত করায়।” সেই শুদ্ধজ্ঞানী-সন্ন্যাসিগণ তখন মহাপ্রভুর অতুল প্রভাবে শ্রীনামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করে অবশেষে তাঁরাও সেই অপ্রাকৃত ‘ভাববলয়ের’ প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষী হন,—“সেই হতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন। ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ নাম সদা করয়ে গ্রহণ।।”—(চৈঃ চঃ ১।৭।১৪৯)। শুদ্ধ মরুভূমিতে আজন্ম বসবাসকারী কারও পক্ষে যেমন সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা কোন দেশের কথা কর্ণগোচর হলেও যেমন তা কল্পনায় আনা সম্ভব হয় না, তেমনই শুদ্ধযুক্তি-সর্বস্ব তোমরা এই প্রাকৃত জগতের অতীত যে সেই অপ্রাকৃত ভাবরাজ্য, তার কথা কিভাবে বুঝাবে?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা অর্জুনকে লক্ষ্য করে আত্মবিজ্ঞান ও আত্মনিবেদনের ওহ্যতম উপদেশ প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর সেই নিত্য পরমানন্দময় ধামের সংবাদ দিয়েছিলেন—যেস্থানে জীবকে শোক-মোহ, রোগ-যন্ত্রণা, জন্ম-মৃত্যুর দুর্বিপাকে পতিত হতে হয় না, যেস্থানে জীব পরমপ্রেমময় শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে প্রতিপদে পূর্ণামৃত-আস্বাদনে মগ্ন থাকেন। কিন্তু সহস্র পুণ্যকর্মেরও, এমনকি শুদ্ধবৈরাগ্যের নিরন্তর চর্চায়ও সেই প্রেমময়-ধামে জীবের প্রবেশাধিকার হয় না—জড়বিলাস কিংবা জড়বিরাগপর মানবের মেধা কোটি

মানসিক প্রয়াসেও সেই রহস্যের প্রাপ্তে উপনীত হতে সমর্থ নয়—“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)। সেই কারণেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুরূপে তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার অত্যাৱশ্যকতা। ভগবান্ জীবের কোন্‌প্রকার আচরণে তাদের নিকট বশীভূত হন, সৰ্ব্বসমর্থ হয়েও বশ্য-জীবের গাঢ় প্রেম উল্লঙ্ঘনে সমর্থ হন না—সেইটাই তিনি জগদ্‌গুরু ভূমিকায় জগদ্বাসীকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন—এইটাই যে তাঁর কি-প্রকার ঔদার্য্য, দয়া, তা যতখানি ভাববেদ্য, ততখানি ভাষা-প্রকাশ্য নয়। ভবিষ্যপুরাণে শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি দেবগণের স্তুতিতে ঘোষিত হয়েছে তাঁর সেই পরমকরণার কথা, যা পূর্বের কোন সৃষ্টবস্তুতে বা সৃষ্টিকর্তাতে বা অবতারগণে এমন কি অবতারী শ্রীকৃষ্ণেও দেখা যায়নি।—

“অনর্পিতচরীং চিরাং করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

সমপয়িতুম্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ।।” (ভবিষ্য পুরাণ)

“—সুবর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর কান্তিপুঞ্জি যিনি পরমোজ্জ্বল, সেই শচীনন্দন শ্রীহরি আমাদের হৃদয়-গুহায় সর্বদা প্রকাশিত থাকুন। পূর্ব পূর্ব যুগে যা তিনি জগৎকে কখনও দান করেননি, যা তাঁর একান্তই নিজের ভক্তিসম্পত্তি, সেই উন্নতোজ্জ্বল রস দান করবার জন্য তিনি পরমকরণাবশতঃ কলিকালে অবতীর্ণ হয়েছেন।”

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরমপ্রেমময় বাণী আজ সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মনীষি, চিন্তাবিদ ও যুক্তিবাদী সমাজের কাছে বিশেষ আদৃত হচ্ছে এবং উত্তরোত্তরভাবে তার আবেদন বর্দ্ধিত হচ্ছে। “পৃথিবী পর্য্যন্ত আছে যত দেশ-গ্রাম। সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম।।” (চৈঃ ভাঃ ৩।৪।১২৬)—মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থক রূপায়ণে কোন্‌ না বিদ্বৎসমাজ আজ সেই পরমালোকে উদ্ভাসিত হয়নি? কিন্তু হায়! আলোর নীচে অন্ধকারের মতই আত্মবিস্মৃত তোমরা কতিপয় ভাগ্যহত জন তা হতে বঞ্চিত হয়ে আছ। যাঁর পূতপদাঙ্ক বক্ষে ধারণ করে আজ ভারতভূমি বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশ সমগ্র বিশ্বের নিকট নমস্—সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রেমবন্যা তোমাদের দ্বারস্থ হলেও তোমরা দুষ্কৃতির তাড়নায় তাতে অবগাহন করে ধন্যাতিধনা হতে পারছ না। বরং তোমাদের দুষ্ট চক্রের চক্রান্তে যেরূপ ভগবান্ ভূত বনে যাচ্ছেন, অপরদিকে ভূত ভগবানে পরিণত হচ্ছে। তাই বহির্ভারতে যেস্থলে যিনি স্বয়ং ভগবান্‌রূপে সর্বত্র পূজিত হচ্ছেন, সেস্থলে সেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে তোমরা পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে বর্তমান ও পরবর্তী সকলের কাছে জন্ম-মৃত্যুর অধীন একজন সাধকরূপে পরিচিত করাচ্ছ। এই না হলে তোমাদের আসুরিকভাবে চরিতার্থকরণ! হে গৌড়বাসিগণ! তোমরা গৌড়ীয়নাথ শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপালোক থেকে নিজেদেরকে আর বঞ্চিত না করে তাতে সর্বাত্মসম্পনে রত হও। এতে তোমরাই কৃতার্থ হবে। শচীমাতার পুত্রকে তোমরা ‘ঘরের যোগী’ মাত্র জ্ঞান করে বসো না—সমগ্র বিশ্ববাসী আজ তাঁরই কোটীচন্দ্র সুশীতল চরণছায়ায় প্রাণ জুড়াচ্ছেন—বেদগোপ্য কৃষ্ণপ্রেমের শাস্তবাহিনী সমগ্র সুযুক্তিপ্রিয়গণের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। তোমরাই বা বাদ যাবে কেন?

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ

হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদ। ‘সোনা’কে শুদ্ধভাষায় ‘হিরণ্য’ ও ‘বিছানা’ বা ‘গ্রাসাচ্ছাদনকে’ ‘কশিপু’ বলে। সুতরাং ‘হিরণ্যকশিপু’ অর্থে ‘কনক-কামিনী’। হিরণ্যকশিপু সর্বদা কনক-কামিনীতে রত ছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি দিব্য একশত বৎসর জল পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। ভূরি ভূরি পিপীলিকা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া তাহার ত্বক্, মাংস, মেদ, শোণিত ভক্ষণ করিতেছিল, অস্থিসকলে কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহার দ্রুতপ মাত্রও ছিল না, তিনি সমাধিলাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাহার তপস্যা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যবিত হইয়া বলিয়াছিলেন, —“নৈতৎ পূর্ব্বযশচতুন্ন করিষ্যন্তি-চাপরে” (ভাঃ ৭।১৩।১৯), পূর্ব্বকালে ঋষিগণ পর্যন্ত একপ তপস্যা করিতে পারেন নাই, পরেও কেহ করিতে পারিবেন না। সুতরাং হিরণ্যকশিপু যথেষ্ট তপঃপ্রতিষ্ঠাও ছিল।

যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃষ্ট আহ্লাদ বা আনন্দ বিরাজিত, তিনিই প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের হৃদয়ে পরিপূর্ণ-নিত্য-আনন্দ-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণু প্রকাশিত ছিলেন। অতি শিশুকাল হইতে প্রহ্লাদের ভগবানের প্রতি স্বাভাবিকী মতি ছিল।

হিরণ্যকশিপু শিশুসন্তান প্রহ্লাদকে নিজগুরু শুক্রাচার্য্যের পুত্র যশ ও অমর্কের নিকট শিক্ষা-গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদের সমবয়স্ক অন্যান্য দৈত্যবালকগণও যশমর্কের পাঠশালায় পাঠ অভ্যাস করিত।

প্রহ্লাদের ঐ সকল স্ত্রী-পুত্রাদির চিন্তায় বিরত, কপট, আচার-রহিত, দেহাসক্ত গুরুস্বরের নিকট বিদ্যা শিখিবার মোটেই ইচ্ছা হইত না। তবুও পিতার আদেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামমাত্র উহাদের পিকট পাঠাভ্যাস করিতেন। তাঁহার মন সর্বদাই বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পদচিন্তায় পড়িয়া থাকিত। একদিন ঐ গুরুদেয় তাহাদের গৃহমেধীর কার্য্যানুরোধে অন্যত্র গমন করিলেন। প্রহ্লাদ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বিষ্ণুভক্ত-নারদের নিকট হইতে যে-সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমপাঠী বালকগণের নিকট কীর্তন করিতে লাগিলেন।

যাহারা মনে বৃদ্ধবয়সে ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল হইলে হরিভক্তি আচরণ করা যাইবে, হরিভজনের উদ্দেশ্যে হরিসেবা-প্রতিকূল স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী। স্বর্গতুল্য জনক, অন্ধকূপসদৃশ গৃহ, ক্ষুদ্র স্বদেশ বা সমাজরূপ অসৎসম্পদ পরিহার করা মহা অন্যায় বা শাস্ত্র-বহির্ভূত কার্য্য; যাহারা মনে করেন শরীরের পোষণ, দেশের ও সমাজের উন্নতিই মানবের প্রথম কর্তব্য; যাহাদের ধারণা ভক্তির নায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ প্রভৃতিও পরাশক্তি-লাভের এক একটা স্বতন্ত্র পন্থা; যাহারা সর্বোপরেস্বর স্বতন্ত্রপুরুষ একমাত্র সেবা বা বিষয়-তত্ত্ব বিষ্ণুর সহিত তদবীনস্থ সেবক ও আশ্রয়তত্ত্বের দেবগণকে সমপর্যায়ে গণনা করেন, তাহাদের অদূরদর্শী দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ক্ষুদ্র ভাস্ত ধারণা পাঁচ বৎসরের বালক প্রহ্লাদের উপদেশ সারগ্রাহী হইয়া পাঠ করিলে বিদূরিত হইবে এবং ভক্তিই যে একমাত্র সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য ইহা উপলব্ধি হইবে।

প্রহ্লাদ বালকগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—“ভাইসকল, মনুষ্য যখন শিশু থাকে, তখন

তাহাদের অজ্ঞানাবস্থা, সুতরাং সেই সময় তাহারা হরিকথা শ্রবণ, কীর্তন করিতে পারে না, কিন্তু শিশুকাল অতিক্রম করিয়াই কৌমারকাল উপস্থিত হয়। পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত কৌমারকাল। সেই কৌমারকালে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গেই হরিকথা শ্রবণ-কীর্তনরূপ ভক্তিধর্ম যাজন করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমােরই কর্তব্য। কারণ এই মনুষ্য জন্ম খুব দুর্লভ, চৌরাশি লক্ষবার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, কৃষি, বৃক্ষ, লতা ও কতপ্রকার অসভ্য মনুষ্য প্রভৃতি হইয়া বহু ভাগ্যফলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। আবার ঐ সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও নিস্তার নাই, কাহার কোন্ সময় মৃত্যু হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু এই মনুষ্যজন্ম পদ্মপত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল হইলেও একমাত্র এই জন্মেই জীবের পরম প্রয়োজন লাভ হইতে পারে।

সুতরাং এই জন্মে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলজনক কার্য্য। কারণ অন্য সকল বস্তুই নশ্বর। একমাত্র বিষ্ণুই সর্বজীবের প্রিয় আত্মা, বন্ধু এবং তিনিই সকলের ঈশ্বর।

হে দৈত্যবালকগণ, যদি তোমরা মনে কর—মাত্র আমাদের জীবনের প্রারম্ভ, ভোগসুখের কত আশা পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা এ সময়ে কেন উহা পরিত্যাগ করিব? তদুত্তর এই যে, এই সুখভোগের জন্য যত্ন করা বৃথা। কারণ, দুঃখের জন্য কেহ যত্ন না করিলেও যেমন দুঃখ অদৃষ্টবশতঃ যথাকালে আসিয়া থাকে, সুখও তদ্রূপ। আর সুখাদি ভোগ কুকুর, শৃগাল, শূকর প্রভৃতি জন্মেও পাওয়া যায়।

সুতরাং সুখের চেষ্টা করিলে বৃথা পরমায়ুর ক্ষয় হয় মাত্র। মুকুন্দের চরণসেবা-দ্বারা যেরূপ মঙ্গললাভ হয়, অন্য কিছুতেই সেরূপ মঙ্গললাভ হয় না। অতএব সংসারে আসিয়া যতদিন দেহ সুস্থ ও সতেজ থাকে এবং যে-কালপর্য্যন্ত তাহা বিনষ্ট না হয়, ততদিন অতি সত্বর সর্বাগ্রে নিত্যমঙ্গলের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য।

মানুষের পরমায়ু শত বৎসর মাত্র। কিন্তু যে-ব্যক্তি আবার অজিতেন্দ্রিয়, তাহার আয়ু তাহারও অর্ধেক, কারণ সে রাত্রিকালে নিদ্রা ও স্ত্রী-সঙ্গাদিতে কাটাইয়া দেয়। আবার সেই অর্ধ পরমায়ুর মধ্যেও বাল্যকাল অজ্ঞানাবস্থায় যায়, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোরকাল খেলাধুলায় যায়; পাঁচ হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ডকাল—খেলা ও কিছু বিদ্যাভ্যাসে যায়; এগার হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর—বিদ্যা উপার্জনে কাটিয়া যায়। তারপর যৌবন স্ত্রীসঙ্গে ও অর্থাদি-চেষ্টায় অতিবাহিত হয়। যৌবনের পর প্রৌঢ়কাল, তাহা সংসারের ও স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য অর্থচিন্তায় কাটিয়া থাকে। বৃদ্ধকালে দেহ জরাগ্রস্থ হয়, তখন কিছুই ভাল লাগে না। এতদিন যে-সকল বাজে কার্য্য করা হইয়াছিল, তাহারই স্মৃতি আসিয়া হৃদয়ে নানাবিধ অশান্তি প্রদান করে। এখন অভূতপূর্ব কাম, বলবান্ মোহ—এই উভয়দ্বারা ঐ পুরুষ গৃহে আসক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং ঐ সময়ও বৃথা চলিয়া যায়। অতএব তাহারা সারা জীবনের ভিতরে আর হরিসেবার সময় পায় না।

হে বালকগণ! যদি তোমরা বল যে এখন কিছুকাল সংসারাদি সুখভোগ করিয়া লই, পরে হরিভজন করা যাইবে—এরূপ মনে করা বৃথা, কারণ, একবার গৃহে আসক্ত হইয়া

পড়িলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া সহজ নহে। প্রবৃত্তিযুক্ত গৃহধর্ম লোকসকলকে অজিতেন্দ্রিয় করিয়া ফেলে। সুতরাং কোন্ ব্যক্তি তখন মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, দেশ, সমাজ প্রভৃতির স্নেহপাশে বদ্ধ এবং গৃহে আসক্ত চিত্তকে তত্তৎস্থান হইতে মোচন করিতে উৎসাহী হয়?

কোন্ ব্যক্তি তখন দুর্দমনীয় ধনতৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারে? ধনকে তখন প্রাণ হইতেও প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, ধনের জন্য প্রাণ যায় যাউক, সেইদিকেও দ্রক্ষেপ না করিয়া মানুষ ধনলাভের সেবায় প্রমত্ত হইয়া পড়ে। কখনও চোর হইয়া রাত্রিতে ধনীর গৃহে প্রবেশ করে, বণিক হইয়া বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে গমন করে, কখনও বা রাজার সেবক হইয়া যুদ্ধাদিতে গমন করিয়া থাকে।

আবার যে প্রিয়তমা পত্নী কতপ্রকারে দেহের সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিয়া সর্বদা হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে রহস্য ও মনোহর আলাপাদি স্মরণ হইলে কোন্ ব্যক্তির ঐসকল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতে পারে? মাতা-পিতার ও বন্ধুবর্গের স্নেহপাশ স্মরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গ হরিভজন-প্রতিকূল হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে পারে? ছোট ছোট শিশু-সন্তানগণের আধ আধ কথা, তাহাদের মৃদু মধুর হাস্য, অঙ্গভঙ্গি শ্রবণে ও দর্শনে অনুরক্তচিত্ত হইয়া কোন্ ব্যক্তি সেই মোহজাল অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়?

নাবালক সন্তানগণের অসমর্থতা ও যোগ্য পুত্রসন্তানগণের নৈপুণ্য দেখিতে পাইয়া, স্বশুরালয়স্থা অসহায়া কন্যার কথা স্মরণ করিয়া, বৃদ্ধ, রুগ্ন কিংবা সন্তানাদির বিয়োগহেতু শোকাকাতর পিতামাতার অবস্থা ভাবিয়া, দ্রাতি, ভগিনী, আত্মীয়-স্বজনের কথা স্মরণ করিয়া, নানাবিধ সরঞ্জামপূর্ণ পৈতৃক গৃহ, কিংবা নিজহাতে গড়া অট্টালিকা বা কুটীর, কুলপরম্পরা-প্রাপ্ত জীবিকা, স্বহস্তে পালিত পশু, স্বহস্তে রোপিত ফলদায়ক বা ফলোন্মুখ বৃক্ষরাজি, বিশ্বস্ত ভৃত্যবর্গ—এইসকল স্মরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি ঐ সকল হরিসেবার বিঘ্নকর অসংসদ্ব হইলেও তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে? যেমন গুটীপোকা নিজ গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহা হইতে বাহির হইবার দরজাও অবশিষ্ট রাখে না, আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে, সেইরূপ ঐ সকল গৃহমেধী পুরুষ অতৃপ্তকাম হইয়া লোভবশতঃ অনবরত গৃহমেধীর কন্মই করিতে থাকে—হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপর কার্য্য করে না। সুতরাং মোহান্বিত ব্যক্তি কি-প্রকারে ঐ সকল কার্য্যে যে দোষ বর্তমান, তাহা দেখিতে পাইবে? সে ঐ গৃহমেধীর কন্মকেই জীবনের কর্তব্য বা ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কর্তব্য বলিয়া ভাবের ঘরে চুরি করত কামারকে ইম্পাত ফাঁকি দেওয়ার ন্যায় নিজেই চিরবঞ্চিত, লাঞ্ছিত, ক্রিতাপ-তপ্ত এবং কাম-ক্লেবধেব দাস হইয়া নিরত তার লাঞ্ছি-বাঁটায় নির্যাতিত হইয়া থাকে এবং অনন্ত নরকের পথের পথিক হয়। উহারা উপস্থ ও জিহাগত কণ্ডুনের ন্যায় তুচ্ছ, পরিণামে ক্লেশকর অকিঞ্চিৎকর সুখকেই বহুমানন করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা কি-প্রকারে দূরন্ত মোহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে?

গৃহমেধী ব্যক্তি দূরন্ত মোহে এইরূপ প্রমত্ত হইয়া পড়ে যে, কুটুম্ব-ভরণে আপনার পরমায়ু যে ক্ষয় হইতেছে এবং পুরুষার্থসকল যে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহা জানিয়াও

জানিতে পারে না। প্রত্যহ ত্রিতাপে জর্জরিত হইয়া দুঃখিতচিত্ত হইলেও ঐসকলকে দুঃখ বুদ্ধি করে না। নিজ-কুটুম্বভরণকেই সুখ মনে করে।

ঐ সকল অজিতেন্দ্রিয় কুটুম্বভরণরত ব্যক্তির চিত্ত-বিত্তের প্রতি এইরূপ অভিনিবিষ্ট হয় যে, সে পরস্ব হরণ করিলে পরকালে নরক ও ইহকালে রাজদগুরুপ শাস্তি জানিয়াও লোভের দাস হইয়া অপরের ধনাদি হরণ করিয়া থাকে।

হে প্রিয় দৈত্যবালকগণ! বিদ্বান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া কুটুম্বপোষণে প্রবৃত্ত হয়, প্রকৃত তাহার নিত্য স্বরূপধর্ম কি, তাহা অনুসন্ধানে অন্ধ হইয়া পড়ে। তাহারাও 'ইহা আমার ও উহা আমার'—এইরূপ বুদ্ধিতে মায়িক ভেদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন।

হউক না কেন তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত বা শাস্ত্রজ্ঞ, গৃহেতে আসক্ত হইলে কেহ কখনও আত্মাকে মোচন করিতে সমর্থ হয় না। কারণ তখন ঐ ব্যক্তি কামিনীগণের ক্রীড়ামৃগ হইয়া পড়েন এবং কামিনীগণের সন্তানসন্ততিগুলি তাহার পায়ের শৃঙ্খলসদৃশ হয়।

অতএব হে দৈত্যবালকগণ! যদি তোমরা নিত্য মঙ্গল চাও, তাহা হইলে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য সত্যবস্তু নারায়ণ ও নারায়ণের ঐকান্তিক ভক্তগণের সঙ্গ কর।

ধিক্কার ও ভিক্ষা

ধিক্ মোর নর-জন্ম, ধিক্ মোর প্রাণ।
 ধিক্ মোর দেহেন্দ্রিয়, ধিক্ মান, জ্ঞান।।
 কুকুর, শৃগাল আদি যত প্রাণিগণ।
 তারাও সকলে করে দেহের পোষণ।।
 সন্তান-বাৎসল্য তাদের, কিছু কম নয়।
 তারাও তাদের যত্নে অতি ব্যগ্র রয়।।
 আহার-বিহার তারাও করে প্রতিদিন।
 তারা তবে আমা হ'তে কিসে ঘৃণ্য হীন।।
 'স্বাবর' বলিয়া বৃক্ষে যদ্যপি বা জানি।
 গৃহমেধী আমি কিসে নিজ শ্রেষ্ঠ মানি।।
 হাপরও মোর মত সদা শ্বাস লয়।
 আমার শ্রেষ্ঠত্ব তবে কি-প্রকারে হয়।।
 নরের বৈশিষ্ট্য মাত্র কুষেণের সেবায়।
 লভিয়াও সে সৌভাগ্য হারাইনু হায়।।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কেহ যাহা ভাগ্যে পায়।
 লভি' সে সদগুরু আমি, না সেবিনু হয়।।
 জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে যুবা, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়।
 ধন্য হ'ল সেবি' যাঁ'র, না সেবিনু মূঢ়।।
 প্রতি দণ্ডে প্রাণী সব যায় যমালয়।
 আমাকেও যেতে হবে, না হ'ল প্রত্যয়।।
 এ মূঢ়তা হয় মোর যাবে আর কবে।
 অনিত্য জানিব হয় কবে এই ভবে।।
 বুঝিয়াও নাহি বুঝি, শুনেও না শুনি।
 অজর, অমর ব'লে নশ্বরেরে মানি।।
 ভক্তিপথে নর-নারী হচ্ছে আওয়ান।
 আমিই একলা হেথা বসে শ্রিয়মাণ।।
 শিক্ষিত ও অনিশ্চিত সোৎসাহে সকলে।
 সেবিছে গুরুর পদ, আমিই বিরলে।।
 ইহার কারণ জানি আমি সুনিশ্চয়।
 মায়া, মোহ, ধৈর্য্যভাব ভিন্ন কিছু নয়।।
 তৃণাদপি সুনীচতা, সহিষ্ণুতা আর।
 এবেও না হ'লে হয়, এ দুঃখ অপার।।
 বহু জনমের পর লভি' নরদেহ।
 কৃষ্ণ ভুলি' ভাবি শুধু ধন, ধান্য, গেহ।।
 বিষয় সকল জন্মে যদ্যপি মিলয়।
 তার তরে করছি তবু বৃথা আয়ুষ্কয়।।
 দুর্লভ মানব দেহ তরণীর সম।
 যাতে গুরু কর্ণধার অমিতবিক্রম।।
 সে দেহ সে গুরু লভি' চেষ্টা না করিনু।
 তরিবারে ভবসিন্ধু, মোহে মজে রৈনু।।
 অনুকূল বায়ু অই হচ্ছে প্রবাহিত।
 কৃষ্ণকৃপা বরষিত হচ্ছে অবিরত।।
 জাদ্যালসো তবু আমি হয়ে অভিভূত।
 ডুবিতেছি ভবান্নবে আত্মঘাতী মত।।

এ দেহ পতন হবে না জানি কখন।
 হেলায় সুযোগ গেল, না কৈনু গ্রহণ॥
 শিরোপরি ঝুলিতেছে কাল-রূপ অসি।
 অনিবার্য মৃত্যু অই শিরে আছে বসি'॥
 ক্ষণ পরে মৃত্যু হবে, হবে বাক্ রোধ।
 কৃষ্ণনাম নাহি লই এ হেন নিবোধ॥
 দেহেতে থাকিতে বল না সেবি ধামেরে।
 হাত, পা গুটায় আছি শত ধিক্ মোরে॥
 পিঞ্জরে শুকের প্রায় মুদিয়া নয়ন।
 করিতেছি আমি মাত্র আয়ুর গণন॥
 মুক্ত পাখীগুলি অই উড়ে উড়ে যায়।
 দূর হ'তে শুধু বলে, “তুই চলে আয়”॥
 দরজা না খুলি' দেয়, পথ না দেখায়।
 তাই হেথা বদ্ধ হয়ে মোর প্রাণ যায়॥
 যদি আমি বলি, এই লোহার পিঞ্জর।
 ভাঙ্গিব কেমনে তাহা বলহ সত্বর॥
 তারা বলে এত কথা শুনতে সময় নাই।
 যে ভাবেতে পার তুমি চলি' এস ভাই॥
 মুচ্চি হাসিয়া তারা বলে “চলে আয়”।
 বাহির হইব কিসে না বলে উপায়॥
 কেহ বলে আসা এত সোজা কথা নয়।
 বামনের চাঁদে আশা নাহি লজ্জা ভয়॥
 আমি বলি ভাগ্য জোরে তুমি সব উড়।
 পূর্বকৃত কৰ্মফলে আমি বদ্ধ মুঢ়॥
 দ্বারখোলা পেলে আমি আসিব চলিয়া।
 জীর্ণ পক্ষ দেখি' মোরে দিও না তাড়িয়া॥
 দেখো যেন তাড়া খেয়ে ফিরিতে না হয়।
 আবার পিঞ্জরমারো এই অনুনয়॥
 ঘৃণা না করিহ মোরে এই এক ভিক্ষা।
 সদয় হইয়া মোরে দিও ভক্তিশিক্ষা॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।
- ২। সাধারণ ডাকযোগে “শ্রীপত্রিকা” গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ৩০.০০ টাকা ও ষাণ্মাসিক ১৭.০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১.০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বিদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি. পি. তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য।
- ৩। যে কোনও সময়ে “শ্রীপত্রিকা”র গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হয়।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোস্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।
- ৫। “শ্রীপত্রিকা”র কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।
- ৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি “শ্রীপত্রিকা”য় প্রকাশিত হইবে না। সং-আলোচনা সর্বদা আদরণীয়।
- ৭। কোন কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে ‘কার্য্যাধ্যক্ষ’ অথবা ‘প্রকাশক’ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়, শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ; ২৮, হালদার বাগান লেন; কলিকাতা-৭০০ ০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

- ১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী, ৯। জৈবধর্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১০। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১১। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১৩। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৪। শ্রীদামোদরাস্টকম্, ১৫। অর্চন-দীপিকা, ১৬। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৭। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ১৮। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ১৯। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২০। উদ্ধারের পথ, ২১। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২২। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৩। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৪। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ২৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী, ২৬। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য, ২৭। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কণ্ঠহার, ২৮। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, ২৯। প্রেম-প্রদীপ, ৩০। শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্ররত্নমালা, ৩১। মাধুর্য্য-কাদম্বিনী, ৩২। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ৩৩। The Bhagavat, ৩৪। Nam-Bhajan, ৩৫। Life Story of Impersonalism (Mayabad) or Victory of Vaishnavism (Vaishnava Vijaya), ৩৬। The Vedanta, ৩৭। Vaishnavism, ৩৮। Rai Ramananda, ৩৯। Relative World, ৪০। A Few Words on Vedanta।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ — তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ — চৌমাথা, পোঃ চুচুড়া (হুগলী)।
- ৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ — কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা) ইউ.পি.।
- ৪। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ — দানগলি, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) ইউ.পি.।
- ৫। শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ — রাণাপতঘাট, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) ইউ.পি.।
- ৬। শ্রীভক্তিবাদান্ত গৌড়ীয় মঠ — সন্ন্যাস রোড, পোঃ কঙ্কাল (হরিদ্বার) ইউ.পি.।
- ৭। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ — গৌরবাটসাহি, পোঃ পুরী (পুরী) উড়িষ্যা।
- ৮। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ — ২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
- ৯। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ — পোঃ গোলোকগঞ্জ (ধুবড়ী) আসাম।
- ১০। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ — পশ্চিম খাগড়াবাড়ী, পোঃ কোচবিহার (কোচবিহার)।
- ১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র — পোঃ বান্দিয়াহাট (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
- ১২। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ — শক্তিগড়, পোঃ শিলিগুড়ি (জলপাইগুড়ি)।
- ১৩। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ — পোঃ আশুতিয়াবাড় (মেদিনীপুর)।
- ১৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ — সিধাবাড়ী, পোঃ রূপনারায়ণপুর (বর্ধমান)।
- ১৫। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ — পোঃ বাসুগাঁও (কাকড়াঝাড়) আসাম।
- ১৬। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ — পোঃ তুরা (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়।
- ১৭। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ — মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জিলিং)।
- ১৮। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ — পোঃ মাথাভাঙ্গা (কোচবিহার)।
- ১৯। শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ — শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫ (বর্ধমান)।
- ২০। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ — রংপুর, শিলচর-৯ (কাছাড়) আসাম।
- ২১। শ্রীদুর্বারাধারি গৌড়ীয় আশ্রম — ঈশাপুর, পোঃ মাঠবন (মথুরা) ইউ.পি.।
- ২২। শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠ — ১/১, কালীতলা লেন, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)।
- ২৩। শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ — গাড়ীখানা রোড, পোঃ বিদ্যাপাড়া (ধুবড়ী) আসাম।
- ২৪। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী — মণিপুর, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
- ২৫। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম — গদখালি, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
- ২৬। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয় — দেয়ারাপাড়া রোড, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

BOOK POST
To

SL. NO.

From :-

Ph.: 555-8973
SHRI GOUDIYA-PATRIKA OFFICE
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, HALDER BAGAN LANE,
CALCUTTA-700 004